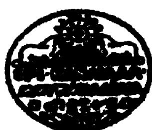
ইতিহাস চর্চার ধারা

সম্পাদক

অনিরুদ্ধ রায়



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা * * * * * ২০০৫

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি ২০০৫

প্রকাশক ঃ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ ঃ
জেনিথ অফসেট
২০বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৪

"বিদেশী শিক্ষাধিক্‌কারের হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা স্বদেশীয় ভাবে, স্বদেশী প্রণালীতে, স্বদেশের সহিত হৃদয়মনের যোগ রক্ষা করিয়া স্বদেশের বায়ু ও আলোক প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে একান্ত প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মনের যে প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছে তাহাকে নিজের বা পরের ইচ্ছামত বিকৃত করিলে আমরা জগতে নিষ্ফল ও লজ্জিত হইব। সেই প্রকৃতিকেই পূর্ণ পরিণতি দিলে সে অনায়াসেই বিদেশের জিনিসকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে এবং আপনার জিনিস বিদেশকে দান করিতে পারিবে।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

১৯৭৭ সালে সাম্প্রদায়িক বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জনমত সংঘটিত হওয়ার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের জন্ম প্রধানতঃ বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করে ইতিহাসকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এর জন্মলগ্ন থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে। বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনা ও পঠন-পাঠন ইতিহাস সংসদকে যে পশ্চিমবঙ্গের ছড়ানো-ছিটানো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ইতিহাসের ছাত্র ও এমনকি ইতিহাস অনুরাগীদেরও এইদিকে আকৃষ্ট করেছিল। সেটা কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে যায়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই কাজ আরম্ভ ও নিঃস্বার্থভাবে বছরের পর বছর করে গিয়েছেন। এর ফলে বাংলার ইতিহাসের আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান ব্যক্তিগতস্তরে ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। এই অভূতপূর্ব প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায় **ইতিহাস অনুসন্ধানের**, যেখানে বার্ষিক সম্মেলনের প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়, পাতাগুলি থেকে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সেটি একটি বিশেষ প্রকাশনা হিসাবে বার হয়েছিল। তার কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে হাজার পাতার উপরে দাঁড়িয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে ওঁর নেতৃত্বে প্রতিবছরই বার্ষিক অধিবেশন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিগত বছর ধরে এবং প্রতিবছরের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

বার্ষিক অধিবেশন ছাড়াও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও তৎপরতায় ইতিহাসের পঠন-পাঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ইতিহাস সংসদ আলোচনা সভা করেছে কলকাতায় এবং দূর-প্রত্যন্ত কলেজ ও স্কুলে, যে আলোচনায় স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ইতিহাস অনুরাগীরা অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। এছাড়াও হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা যেগুলিতে অনেক সময়েই বাংলার বাইরে থেকেও অধ্যাপকরা এসে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং যেগুলি পরে বাংলাভাষাতে পুস্তিকা আকারে প্রকাশনা করা হয়েছে। এই বিশাল কর্মকান্ডের নেতৃত্ব ও দর্শন যুগিয়েছেন অক্লান্তভাবে অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতির পদ থেকে কালের নিয়মে অবসর নেবার পর, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কার্য্যকরী সমিতি তাঁর সম্মানে একটি সাম্মানিক গ্রন্থ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করে। সিদ্ধান্ত করা হয় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ইতিহাস সংসদের

কার্যকলাপের বিবরণী ছাড়া **ইতিহাস অনুসন্ধানে** ও অন্যান্য প্রকাশনায় ওঁর ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা পেশ করা হবে। এই সাম্মানিক গ্রন্থের মূল অংশটি হবে **ইতিহাস অনুসন্ধানের** মূল নিবন্ধকারদের রচনা ও আরো কয়েকটি বিদগ্ধ ও প্রবীন ইতিহাসবিদদের **ইতিহাস অনুসন্ধানে** প্রকাশিত প্রবন্ধ। এর ফলে একদিকে যেমন বিগত বছরের ইতিহাস চিন্তা-চেতনার বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি বর্তমান কালের পাঠক-পাঠিকারা কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ পাবেন যেগুলি আজ আর সহজলব্ধ নয়। কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে এই সামান্য প্রকাশনা সাম্মানিক গ্রন্থ হিসাবে অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে প্রদান করে নিজেদের ধন্য বলে মনে করছে।

কার্যকিরী সমিতির সদস্যরা ছাড়াও ইতিহাস সংসদের আরো কয়েকজন সদস্য ও কয়েকজন ইতিহাস অনুরাগী এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। এজন্য ওঁদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। প্রকাশক ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় এটি যথাসময়ে প্রকাশনা করার জন্য ধন্যবাদার্হ। আমরা আশা করি আরো বহুকাল আমরা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যথারীতি মন্ত্রণা ও উপদেশ পেতে থাকব। ওঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও ইতিহাস সংসদ

১৯৩১ এর ২৬ জানুয়ারী, তখন এই দিনটিই ভারতের স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষিত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই দিন ভারতবর্ষের সর্বত্র ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

সুভাষচন্দ্র বসু তখন কলকাতার মেয়র। ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা সচিব। সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি মিছিল জাতীয় পতাকা হাতে যাত্রা করল অক্টরলনী মনুমেন্টের দিকে, ওখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য। সুভাষচন্দ্রের একপাশে ক্ষিতীশ প্রসাদ একটি বড় বাঁশের মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে হাঁটছিলেন। পতাকা দিয়ে সুভাষের মাথা কে আড়াল করে, যাতে অশ্বারোহী সার্জেন্টের লাঠি সুভাষের মাথায় না পড়ে। অন্য পাশে হাঁটছিলেন প্রসিদ্ধ দেশনেত্রী দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর কন্যা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। পুলিশ সার্জেন্টের লাঠির আঘাতে ক্ষিতীশ প্রসাদের মাথা ফেটে গেল, গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

রক্তাক্ত দেহে ক্ষিতীশ প্রসাদকে বাড়িতে আনা হল। বাবার ঐ অবস্থা দেখে জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌতম ভীষণ ভয় পেয়ে বিচলিত হয়ে তার ঠাকুরদা যামিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন ইংরেজ পুলিশ তার বাবাকে মেরেছে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে গৌতম বলে উঠলেন বড় হয়ে আমি ইংরেজকে মারবো। গৌতমের তখন ৭ বছর বয়স।

১৯২৪-র ৯ই ডিসেম্বর (বাংলা ২৪ অগ্রহায়ন) কলকাতা ২, পাম প্লেসেই জন্ম হয় গৌতমের। বাবা ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ন বিদ্যারত্নের কন্যা মণিমালা দেবীর পুত্র। মা মঞ্জুশ্রী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। গৌতম চট্টোপাধ্যায় বড় হয়ে ওঠেন বাংলার নবজাগরণের প্রভাব ও জাতীয়তাবাদের বাতাবরনে।

ক্ষিতীশ প্রসাদ সুভাষ চন্দ্রের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও একজন দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন কংগ্রেসী, সারা জীবন তিনি খদ্দর পরেছেন। বাড়িতে কোন বিলিতি কাপড় জামা খেলনা বা খাবার ঢুকতোনা। স্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত গৌতমরা দু-ভাই খদ্দরের হাফ হাতা জামা ও হাফ প্যান্ট পরত। এনিয়ে তারা বেশ গর্বিত ছিল।

১৯৩৪ 'এ দশ বছর বয়সে বালিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যায়তনে ভর্তি হন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। চতুর্থ শ্রেণীতে। তার ক্লাশের বহু ছেলেই Cubs'র সদস্য ছিলেন, কিন্তু গৌতম ভর্তি হলেন না ইংরেজদের পতাকাকে অভিনন্দন জানাতে হবে বলে।

ছেলেবেলা থেকেই একটি অসাম্প্রয়দায়িক পরিবেশে বড় হওয়ায় বালিগঞ্জ স্কুলে মুসলমান সহপাঠির সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে তার সময় লাগেনি। ক্লাশে শফিউল হোসেন তার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল। আজও তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বাবার খিলাফত পন্থী মুসলমান বন্ধুদের উৎসবের দেওয়া খাবার অনায়াসে তাদের বাড়িতে ঢুকেছে। খৃষ্টান বন্ধুদের দেওয়া খাবারও তারা পরম আনন্দে খেয়েছেন।

যুগটাই বোধহয় ছিল অন্যরকম। শুধু গৌতম চট্টোপাধ্যায় কেন তার বন্ধুরাও ছিলেন ইংরেজ শাসনের প্রবল বিরোধী। ১৯৩৪, এ ভর্ত্তি হবার পর পরই একদিন স্কুলে গিয়ে দেখলেন স্কুলের গেটে তালা, বড় করে নোটিশ ঝোলানো আছে — মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ বিপ্লবীদের গুলিতে মারা গেছেন — তার সম্মানে আজ স্কুল বন্ধ। ছাত্ররা বলাবলি করেন অত্যাচারী ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিপ্লবীরা হত্যা করেছেন এত আনন্দের কথা, দু:খ করবো কেন?

১৯৩১, এ ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে এবং তার তিনমাস জেল হয়। তখন জেলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ইংরেজের কারাগার দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং ইংরেজ বিরোধী মনোভাব আরও তীব্র হয় - এর কোনটাই রাজনৈতিক বোধ নয় পারিবারিক ব্যাপার। স্কুলের ছাত্র অবস্থায় গৌতমের ধারনা হয়েছিল জেলে যায় দেশপ্রেমিকরা এবং বড় মানুষেরা।

১৯৩৬ সালে রজনী মুখার্জী ওদের পাম প্লেসের বাড়িতে আসেন এবং ওখানেই থেকে যান। তিনি গৌতমের কাকা। রজনী মুখার্জী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করতেন। কমিউনিষ্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী ছিলেন এবং কলকাতার বন্দর শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর কাছেই গৌতম প্রথম মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম শোনেন এবং লেনিনের ছবি দেখেন। খুব একটা স্পষ্ট ধারনা তখন হয়নি। তবে এরা যে মুক্তি সংগ্রামী সম্ভবত তা বুঝতে পেরেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় একটি বই লেখেন 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ'। বইটি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে লেখা। বইটি ছেপে বের হবার আগেই প্রতিটি অধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ পড়ে শুনিয়েছিলেন তার বড় নাতি গৌতমকে, তিনি তখন ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র। এই বইটিই সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে তার মনে গভীর ভালবাসা জন্মাতে সাহায্য করেছিল।

১৯৪০ 'এ ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হন তিনি। ৪ জুলাই ক্লাশ শুরুর দিনই ছাত্র ধর্মঘট। সুভাষচন্দ্রর ডাকে হলওয়েল স্মারক চিহ্নটি অপসারনের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এটা ছিল হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের মিলিত সংগ্রাম। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মিছিলে হাঁটা শুরু হল। মিছিলকে বাধা দেয় পুলিশ এবং লাঠি চালায়। ছাত্র নেতা ওয়াসেকের মাথা ফাটে। পরদিন আবার ছাত্র ধর্মঘট।

বিনাবিচারে আটক কয়েকশত বিপ্লবী বন্দী দেউলি জেলে অনশন শুরু করেন। তাদের মুক্তির দাবীতে আবার ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট হয় দেশব্যাপী।

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। সোভিয়েতের সমর্থনে কলকাতায় বিরাট ছাত্র মিছিল হয়। টাউন হলের সভা থেকে জন্ম হয় একটি নতুন সংগঠন — Friends of the Soviet Union। সভার সভাপতিত্ব করেন প্রবীন বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় বন্ধু প্রদ্যোৎ মুখোপাধ্যায়ের (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক) প্রভাবে লেবার পার্টিতে যোগ দেন, কিন্তু ক্রমশ কমিউনিষ্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। Pat Sloane র Russia without illusions আর Edger Snow's Red star over China'র এই দুটি বই পড়ে তিনি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৯৪২ 'র, ৯ আগষ্ট গান্ধীজির ডাকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। ইংরেজরা ৮ আগষ্ট রাতে গান্ধীজি সহ সমস্ত বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করল। কমিউনিষ্টরা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেয়নি, তারা জনযুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। জনগন কমিউনিষ্টদের এই নীতিকে মোটেই পছন্দ করেনি। ১৯৪৩'র ফেব্রুয়ারীতে গান্ধীজি জেলের মধ্যেই তিন সপ্তাহের জন্য অনশন শুরু করেন। ছাত্র ফেডারেশন গান্ধীজির মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। কমিউনিষ্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'তে সোমনাথ লাহিড়ী একটি অসামান্য প্রবন্ধ লেখেন। "যে কৃশতনু মানুষটির জীবনদীপ নিবু নিবু করিয়াও জ্বলিতেছে, তাহাতো কেবল একটি মানুষের জীবনই নয়, তাহাকে ঘিরিয়া অনির্বান জ্বলিতেছে ৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্খা।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশের রাজনীতি, স্বাধীনতার শেষ পর্বের লড়াই, ছাত্র আন্দোলন, মিটিং মিছিল ছাত্রদের, যুবকদের অস্থির করে তুলল। শুধু লেখাপড়ার মধ্যে আটকে থাকতে চাইলেন না তারা। দেশের কাজে ঝাপিয়ে পড়া কমিউনিষ্ট মতবাদের দিকে

আকৃষ্ট হওয়া — কিছু একটা করা — স্কুল কলেজের ছাত্রদের বৃহত্তর রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনলো। আগেও তাই হয়েছে। দেশের সেরা ছেলে মেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন মৃত্যুকে পরোয়া না করে। কমিউনিষ্ট মতাদর্শও আমাদের দেশের ও বিশ্বের তরুণ, তরুণীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী বোমার ভয়ে অনেকেই কলকাতা ছাড়ছিলেন। ক্ষিতীশ প্রসাদও তার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে কৃষ্ণনগরে বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন। ১৯৪৩ 'র ফেব্রুয়ারী মাসে গৌতম চট্টোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছেন। কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব মামুদের কাছ থেকে তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ ও উৎসাহ পেয়েছেন। মাষ্টারমশাই নানান ধরনের বই পড়তে দিয়েছেন ছাত্রকে। ছাত্র ও শিক্ষকের এই সম্পর্ক যতদিন মামুদ সাহেব বেঁচে ছিলেন অটুট ছিল।

ক্ষুদ্র গন্ডী থেকে একেবারে বিশাল সমুদ্রে এসে পড়লেন তিনি। ১৯৪৩ 'র মন্বন্তর যতটা না প্রাকৃতিক কারণে তার চেয়ে বেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পদলেহী মজুতদারের চক্রান্তে হল। গ্রাম বাংলার উজাড় করে গরীব চাষীরা শহরে এল। বুড়ো, বাচ্চা ছেলে মেয়ে কত যে মরল তার হিসেব নেই। 'ফেন দাও মা ফেন দাও' — ধ্বনিতে কলকাতার আকাশ বাতাস মথিত হল। কমিউনিষ্ট কর্মীরা ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা একদিকে মজুতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলেন অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য লঙ্গর খানা খুলে খাবার, বাচ্চাদের জন্য দুধ ও ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। গড়ে উঠল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' দলমত নির্বেশেষে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানের স্কোয়াড সারা ভারতে বিশেষত: পাঞ্জাবে গিয়ে গান গেয়ে বাংলার জন্য সাহায্য চাইল। এই সমস্ত কিছুর পিছনে কমিউনিষ্ট পার্টীর তৎকালীন সম্পাদক পি. সি. যোশীর অবদান অসামান্য। কমিউনিষ্ট কর্মীরা যে শুধু কমিউনিষ্ট মতবাদেই বিশ্বাসী হলেন তা নয়, একটা মানবিক আদর্শ তাদের গড়ে উঠতে সাহায্য করল।

এই সময়কার কবি, সাহিত্যিক নাট্যকাররা বাংলার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। কবি সুকান্তর 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতিক্ষায়', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান', তারাশঙ্করের প্রসিদ্ধ উপন্যাস মন্বন্তর, গোপাল হালদারের 'উনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথ ও তেরশো পঞ্চাশ' — দুর্ভিক্ষের জীবন্ত ছবি তুলে ধরে। ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠক সুনীল মুন্সীর উদ্যোগে প্রকাশিত হল Bengal Painters Testimony —বাংলার দুর্ভিক্ষকে নিয়ে আঁকা বহু প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর

ছবির একটি সংকলন। সোমনাথ হোর, জয়নাল আবেদিন, গোপাল বসুর ছবি আজও মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কমিউনিষ্ট কর্মী ও ছাত্ররা মানুষের মনে একটা স্থায়ী আসন লাভ করলেন।

১৯৪৪ 'র ডিসেম্বর মাসের শেষে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। সভাপতি সুপন্ডিত অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উদ্বোধক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় (দুর্ভিক্ষের সময় চিকিৎসকদের সংগঠক)। মূল বক্তা ছিলেন সরোজিনী নাইডু। গৌতম চট্টোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে এম. এ. ক্লাশের ছাত্র। এই সভাতেই তার পরিচয় হয় সর্বভারতীয় ছাত্র নেতাদের সঙ্গে। তিনি তখন কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক। পরিচয় হয় পাঞ্জাবের ছাত্র নেতা সৎপাল ডাঙের সঙ্গে, আজও তিনি লড়ে যাচ্ছেন—তার জীবনটাই একটা লড়াই।

যুদ্ধ শেষ হয় ও আসে যুদ্ধোত্তর গণসংগ্রামের যুগ। সমগ্র ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশ স্বাধীন করার জন্য একের পর এক গণবিস্ফোরণ ঘটে চলেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজিত কয়েকজন প্রধান সেনানীর বিচার শুরু হয় দিল্লীর লাল কেল্লায়। তাদের মুক্তির দাবীতে প্রথম ব্যাপক সংগ্রাম শুরু করলেন কলকাতার ছাত্র সমাজ ১৯৪৫ এর ২১ নভেম্বর। কোন বাধা না মেনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাহসের সঙ্গে ছাত্ররা এগিয়ে চললেন। 'চল চূর্ণ করি এ জীর্ণ কারাগার।'

১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অপর এক সেনানী রসীদ আলির মুক্তির দাবীতে সারা ভারত জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সব দলের ছাত্ররা একসঙ্গে লড়লেন। লড়াইয়ের রাজপথে কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের ছাত্রদের পতাকা এক হয়ে গেল মিলে মিশে। কলকাতার ছাত্ররা লড়াইয়ের পুরোভাগে, সারা বাংলার শ্রমিকরা হরতাল পালন করল কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে। এই অস্থিরতার যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে অনেকেই আটকে থাকতে পারলেন না, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে রাজপথের লড়াইয়ে সামিল হলেন। এর পর প্রথমে ছাত্র নেতা হিসেবে পরে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী হিসেবে তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত হলেন। এই গণসংগ্রামের স্মৃতি ধরা আছে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা Letters of Blood পুস্তিকায় এবং ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন সরকারের ৭৫ বছর বয়েসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে 'Almost Revolution' নামে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে।

এই ছাত্র বিদ্রোহ থামতে না থামতেই শুরু হল নৌ-বিদ্রোহ। নৌ সেনাদের সমর্থনে মোম্বাইয়ের ৫ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করল ১৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী।

সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাঙ্কে চড়ে বৃটিশ ফৌজ এল, ধর্মঘট ভাঙতে পারলো না। গুলিতে ২৭০ জন শ্রমিক বহু নওজোয়ান ও ছাত্র ছাত্রী মারা গেলেন। নৌ সেনাদের সমর্থনে পাশে এসে দাড়াল বিমান বাহিনী। জাতীয় নেতৃত্বের দুই প্রধান প্যাটেল ও জিন্নাহ'র চাপে নৌ সেনারা আত্মসমর্পন করলেন। তাদের পাশে কিন্তু সেদিন কমিউনিষ্টরা এবং সাহসী নেত্রী অরুনা আসফ আলি ছিলেন।

ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হলো এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা পর্ব শুরু হল। এর মধ্যে ১৯৪৬'র আগষ্টে কলকাতায় এক বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল। সেদিন ছাত্ররা ছাড়া যারা কলকাতায় তখন সাহসের সঙ্গে দাঙ্গাকে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তারা হলেন ট্রামের হিন্দু মুসলমান বাহাদুর শ্রমিকরা। একটা কথাই তখন সবার মনে হয়েছিল "মৃত্যুর মৃত্যু হোক"।

১৯৪৬ এর আগষ্ট মাসে গৌতম চট্টোপাধ্যায় আমন্ত্রণ পেয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রাগ শহরে বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেসের জন্মলগ্নে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ভারত থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে যান। এই কংগ্রেস উৎসর্গীকৃত ছিল ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং দলমত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর ছাত্র ঐক্য গড়ার কাজে। বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেস থেকে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে উঠে। গৌতম চট্টোপাধ্যায় তার কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। পৃথিবীর নানান দেশের সমস্যা সংগ্রাম ও ছাত্র সংগ্রামের আলোচনায় সবাই সমৃদ্ধ হয়েছিলেন।

সম্মেলনে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট গোটওয়াল্ড ছাত্রদের একদিন নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান ও তাদের শুভেচ্ছা জানান। এই ছাত্র কংগ্রেসের অনেকেই যখন যুগোশ্লোভিয়াতে যান তখন সেখানকার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের উদ্যোগকে প্রশংসা করেন এবং ভোজ সভার আয়োজন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বাইরে যাবার ছাড়পত্র (passport) ছাত্ররাই ব্যবস্থা করেছেন, কারণ কমিউনিষ্ট ছাত্র পরাধীন ভারতে সহজে ছাড়পত্র পেতেন না। শুধু তাই নয় যাবার খরচ সবটা বাড়ি থেকে দেওয়া সম্ভব ছিলনা, তাই ছাত্ররা কলেজে কলেজে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। অনেক কলেজে গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে বক্তৃতা করতে নিয়ে গেছেন — তারপর অর্থ সংগ্রহ করেছেন — বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দেবার প্রায় সমস্ত খরচ এভাবেই সেদিনকার ছাত্ররা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এগুলো মনে রাখার মত ঘটনা।

সম্মেলনে ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীরাও অনেকে ছিলেন (তারা সবাই বিদেশে পড়াশুনা করছিলেন)। অনেক বিদেশি ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গভীর বন্ধুত্ব

হয়েছিল। তাদের অনেকেই কোন না কোন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, অনেক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়েও গেছেন যাদের অনেকের সঙ্গেই গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের পরে দেখা হয়েছে।

সম্মেলনে মনে রাখার মত একটি ঘটনা — একটি স্পেনীয় ছাত্রী ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর কারাগার থেকে পালিয়ে বহু কষ্টে প্রাগে এসে পৌঁছায়। তাকে যখন মঞ্চের উপরে তুলে পরিচয় করানো হয়, তখন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটি স্পেনের প্রগতিশীলদের রনধ্বনি 'নো পাসরান' (They shall not pass) ধ্বনিতে ফেটে পড়লো।

দেশে ফিরে গৌতম চট্টোপাধ্যায় সারা বাংলা ঘুরে বেড়িয়েছেন বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেসের সম্বন্ধে বক্তৃতা করে এবং একটি পুস্তিকা লেখেন —'I saw YogoSlavia'।

১৯৪৬ এর অক্টোবরে গৌতম চট্টোপাধ্যায় দেশে ফেরেন। কলকাতার দাঙ্গা থেমেছে, কিন্তু তখনও কলকাতা থমথমে। দাঙ্গা ছাড়াচ্ছে ভারতবর্ষের নানান জায়গায়। সাম্রাজ্যবাদ দেশটাকে ভেঙ্গেচুরে দিয়ে যেতে চাইছে। নোয়াখালিতে বিভৎস দাঙ্গা শুরু হল। গান্ধীজি একাই চললেন নোয়াখালিতে, সঙ্গে কোন সশস্ত্র রক্ষী নেই, আছেন নির্মল বসু, সুচেতা কৃপালনী, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্ত, মনিকুন্তলা সেন, রেনু চক্রবর্তী প্রমুখ। এইখানে কমিউনিষ্টদের দাঙ্গা বিরোধী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা দরকার। নোয়াখালির গায়ে লাগা কুমিল্লা জেলার হাসনাবাদ থানার ১০ হাজার মুসলমান চাষী লাল ঝান্ডা হাতে হিন্দু মুসলমান কৃষক নেতাদের নেতৃত্বে নোয়াখালির দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের সফল ভাবে রুখে দিল। গান্ধীজি তাদের আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট দেশ স্বাধীন হল দেশ ভাগের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে। ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বরে কলকাতায় হিন্দু উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। গান্ধীজি দাঙ্গা থামাতে আমৃত্যু অনশন আরম্ভ করলেন। ছাত্র ফেডারেশন সহ সমস্ত ছাত্র সংগঠনের ডাকে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী রাস্তায় নেমে এলেন — মুখে তাদের ধ্বনি "গান্ধীজিকে বাঁচাতে হলে কলকাতাতে শান্তি চাই।" ছাত্ররা তিনদিন রাতে ঘুমোতে বাড়ি যায়নি, দিনরাত দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছেন। ৩ দিনে কলকাতার দাঙ্গা বন্ধ হল। ৫ সেপ্টেম্বর গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করলেন। বল্লেন 'জয়তু কলকাতার ছাত্র সমাজ'।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঐদিন কলকাতায় ছিলেন না। ১ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নীলফামারিতে হিন্দু মুসলিম ছাত্রদের একটি ঐক্যবদ্ধ সভায় বক্তৃতা করে ট্রেনে কলকাতা ফিরছিলেন। ইতিমধ্যে দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ায় পোড়াদহ

স্টেশনে মুসলমান ছাত্ররা ট্রেন আটকাল এবং মুসলমানদের ট্রেন থেকে নেমে আসতে বলল। হিন্দুদের মধ্যে প্রচন্ড ভয় এরা বদলা নেবে না তো! গৌতম চট্টোপাধ্যায় তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি। তিনি ষ্টেশনে নেমে মুসলমান ছাত্রলীগের কর্মীদের নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনারা নিশ্চিত থাকুন কলকাতার ছাত্ররা দাঙ্গা থামাতে রাস্তায় নেমেছে আপনারা ট্রেনটি ছেড়ে দিন। ট্রেনটি ছেড়ে দিল মুসলিম ছাত্র নেতারা।

ঐ যুগের ছাত্ররা শিক্ষা ও পরীক্ষা নিয়েও কম ভাবেননি। ছাত্র নেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের পরীক্ষা সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলনের ফলেই ঐ সময় থেকে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা শুরু হয়। মুসলমান ছাত্র নেতা মুনীর চৌধুরী এবং গীতা মুখার্জী নতুন যুগের শিক্ষা নামে যৌথ ভাবে একটি পুস্তিকা রচনা করেন।

ভারত স্বাধীন হল ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে। মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বেতার ভাষনে বললেন "Many years ago we made a tryst with destiny, now the time has come to redeem that sacred pledge." সারা দেশে খুশীর জোয়ার — কোন মন্ত্রবলে যেন হিন্দু মুসলমান এক হয়ে গেল। আবার মনে গভীর বেদনা এবং জাতির কলঙ্ক, আমাদের দেশ (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান) দ্বিখন্ডিত হোল। হঠাৎই অনেক মানুষ (হিন্দু ও মুসলমান) জানলেন আমার যে দেশ ছিল, সেটা আর আমার দেশ নেই। এ যে কি কষ্টকর অনুভূতি তা বলে বোঝানো যাবেনা।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী দিল্লীতে প্রার্থনারত গান্ধীজিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়মসেবক সংঘের সদস্য নাথুরাম গড্‌সে গুলি করে হত্যা করল। সমস্ত ভারতবর্ষ এবং বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে এ সংবাদ শুনল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনসাধারনের চাপে সাময়িক ভাবে হিন্দু মহাসভাকে বেআইনী ঘোষণা করলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জাতির জনকের মৃত্যুর কথা ঘোষনা করে রেডিওতে বললেন— "A light has gone out of our life and it was no ordinary light." কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক স্বাধীনতায় একটি অসামান্য সম্পাদকীয় লিখলেন সোমনাথ লাহিড়ী 'শোক নয় ক্রোধ'।

১৯৪৮ এ কমিউনিষ্ট পার্টির ২য় কংগ্রেস, কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এর কয়েকদিন পরেই স্বরাষ্টমন্ত্রীর নির্দেশে সারা ভারতে কমিউনিষ্টদের উপর প্রচন্ড দমননীতি নেমে আসে। ২৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ

ঘোষনা করল, স্বাধীনতা পত্রিকা নিষিদ্ধ হল, ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হল। বিনা বিচারে বহু কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হলেন — হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার এরাও কারারুদ্ধ হলেন। যারা গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করলেন তাদের মধ্যে গৌতম চট্টোপাধ্যায় একজন। প্রায় সাড়ে চার বছর আত্মগোপন করে কাজ কর্ম চালাবার পর ১৯৫২ সালে ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা প্রত্যাহৃত হয়।

১৯৪৯ সালে বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় বন্দী মুক্তির দাবীতে একটি মহিলা মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে মৃত্যু হয় লতিকা, প্রতিভা, আমিয়া, গীতার। মহিলারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৯৪৯ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মুখপত্র 'ঘরে বাইরের' সম্পাদিকা হিসেবে গ্রেপ্তার হন মঞ্জুশ্রী দেবী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মা। জেলে বন্দী কমিউনিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে বন্দী মুক্তির দাবীতে তিনিও ৫৩ দিন অনশন করেন। ১৯৫০ এ তিনি মুক্তি পান।

১৯৫৬ তে দীর্ঘ ১০ বছর পর গৌতম চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এই কলেজেই তিনি বরাবর পড়িয়ে ১৯৮৬ তে অবসর গ্রহণ করেন। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ছাত্র ছাত্রীদের খুব প্রিয় অধ্যাপক। যেভাবে তিনি গতানুগতিকতা মুক্ত হয়ে ইতিহাস পড়িয়েছেন তা ছাত্রদের আকৃষ্ট করেছে। তিনি ইতিহাসকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন এবং ভাবতে শিখিয়েছেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির কাজও তিনি সমান উৎসাহে করেছেন।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অধ্যাপক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং দীর্ঘ কয়েক বছর অধ্যাপক সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক সমিতি সমস্ত দলমতের একটি ঐক্যবদ্ধ সমিতি। বিশেষ করে রাজনীতির জগতে এত বিভেদ এত দলাদলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অধ্যাপক সমিতি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। অধ্যাপক সমিতি শুধু বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন নয়, শিক্ষার উন্নতি, পাঠক্রমের সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সর্ব কিছু নিয়েই ভাবনা চিন্তা করেছে। ঐ সময়টা অধ্যাপক সমিতির গৌরবের যুগ। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমিতির ঐক্য দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপকদের নিরাপত্তা রক্ষিত হয়েছে।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম চট্টোপাধ্যায় নানান ধরনের গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক থেকে গবেষণা মুলক গ্রন্থ রচনা করেছেন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে, এখনও করছেন। তখন ইন্টার মিডিয়েট ক্লাস চালু ছিল। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল সেন দুজনে মিলে

ইংলন্ডের ইতিহাস ও গ্রীসরোমের ইতিহাস লেখেন। 'ইংলন্ডের ইতিহাস' একটি উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক।

তারপর প্রি ইউনিভার্সিটি ক্লাস চালু হবার পর তিনি লেখেন 'আধুনিক পৃথিবী'। এই বইটির তথ্য সন্নিবেশ, ব্যাখ্যা, তথ্যের মূল্যায়ন পুরোনো রীতি ভেঙে কিছুটা নতুন ভাবে লেখা। বইটি পড়তে ভাল লাগে।

১৯৭৩ সালে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য লেখেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। প্রশান্ত চ্যাটার্জী ও মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় সহযোগী লেখক ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' লেখেন স্নাতক (সাম্মানিক) স্তরের জন্য, সহযোগী লেখক মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়।

বেশ কয়েকটি গবেষণা মূলক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন দীর্ঘ চার দশক ধরে। ১৯৬৭ তে তার সম্পাদিত গ্রন্থ Awakening in Bengal Early Nineteenth Century. ইয়ং বেঙ্গল বা ডিরোজিয়ান গোষ্ঠী একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩৮, Society for the Acquisition of General Knowledge (সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা)। এই সভার প্রতিমাসের অধিবেশনে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করা হত। সেই প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদনার কাজ তিনি করেছেন। এটি একটি আকর গ্রন্থ।

১৯৬৭তেই চিন্মোহন সেহানবীশির উৎসাহে রুশ বিপ্লবের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে ছোট বাংলা বই *রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন লেখেন।*

১৯৭০ এ প্রকাশিত হয় *Communism and Bengal's Freedom movement.*

১৯৭২ সালে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের (ICHR) তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক রামশরণ শর্মা, গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার আইন সভার বিবর্তন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ক একটি বই লিখতে অনুরোধ করেন। একই পরিকল্পনায় আসাম সম্বন্ধে অমলেন্দু গুহ, উত্তর পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে অমিত গুপ্ত, এবং পাঞ্জাব সম্বন্ধে সত্যরাই গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ তে *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle (1862-1947).*

১৯৭৮ এ লেখেন লেনিন ও সমকালীন বাংলাদেশ সহযোগী লেখক মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। বইটির পরিশিষ্টে তিনটি আকর্ষনীয় চরিত্রের সম্পর্কে আরও আকর্ষনীয় তথ্যপূর্ণ বর্ণনা আছে—শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেন চক্রবর্তী এবং অবনী মুখার্জী।

১৯৭৮ এ সম্পাদনা করেন Kaleidoscope এবং *The Reformer — Bengal in early 19th Century Selected Documents.*

১৯৯২ এ সম্পাদনা করেন 'সংহতি, লাঙ্গল ও গনবানী' — তিনটি উন্নত মানের পত্রিকা।

১৯৯২ এ লেখেন 'সমাজতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা ও ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন'। ১৯৭৩ এ নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোতে একটি বক্তৃতা করেন যা পরে পুস্তিকা হিসেবে ছাপা হয় — *Subhas Chandra Bose and Indian Communist movement — a case study of Cooperation and Conflict.*

সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে NCERT লিখতে অনুরোধ করায় যে বইটি লেখেন তা হল *Subhas Chandra Bose — A biography*। এছাড়া দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল — 'ইতিহাসের পাতা থেকে' — দৈনিক কালান্তরে প্রকাশিত দেশ বিদেশের বিস্মৃত ইতিহাসের সংকলন। অন্যটি হল — বিপ্লবীদের মুখোমুখি ১৯৪২ ও মেদিনীপুরের বিপ্লবের কথা — সহযোগী লেখক শুভাশীষ বিশ্বাস।

এছাড়া অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেছেন। এখনও নিয়মিত লেখেন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'কালান্তরে' এবং অন্যত্রও।

১৯৮৯ এ ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইন্টার ন্যাশানাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন (IFLA) একটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে ২৪ আগষ্ট, ১৯৮৯ সালে। ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত হন অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। এই লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন ড: অশীন দাশগুপ্ত। সম্মেলনে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন আমাদের জাতীয় গ্রন্থগারের ডিরেক্টর। বহু দেশ থেকেই আমন্ত্রিতরা এসেছিলেন। সম্মেলনে গৌতম চট্টোপাধ্যায় যে প্রবন্ধটি পেশ করেন তা হল "Indian Press in the fight for Liberty of Newspapers (1857-1947)" উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সম্মেলনটি সংগঠিত করার জন্য IFLA এক বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে। যারা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সম্মেলনের এক বছর আগে। প্রবন্ধটি IFLA-র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য এবং ১৯৮০ থেকে '৮৪ পর্যন্ত সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন।

বি.এ., বি.এস.সি. এবং বি.কম ক্লাসে ইংরাজী বাংলা বাধ্যতামূলক না করার প্রস্তাব এসময় আসে। অবশ্য বি. এ. ক্লাস ছাড়া এই দুটি ভাষা বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখায় অবশ্য পাঠ্য ছিল না। সিদ্ধান্ত হল স্নাতক স্তরে প্রত্যেককেই ইংরাজী বাংলা পড়তে হবে, তবে পাশ ফেল থাকবেনা। পরে পরিবর্তন হয়ে এখন যেটা হয় দুটো

বিষয় মিলিয়ে পাশ করতে হবে এবং একটি বিষয়ে নূন্যতম ১০ পেতে হবে। ঠিক হয়েছিল এম. এ. ক্লাসে ছাত্র ছাত্রী বিকল্প বাংলা ভাষায়ও পরীক্ষা দিতে পারবে।

পড়াশুনা ও রাজনীতি ছাড়া গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি ভালবাসার নাম 'ইতিহাস সংসদ'।

১৯৭৭ সালে বর্তমান বিজেপির পূর্বসুরি জনসংঘের সমর্থনপুষ্ট জনতা দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সংঘ পরিবারের চাপে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রামশরন শর্মা, বিপান চন্দ্র, বরুন দে, অমলেশ ত্রিপাঠি, রোমিলা থাপার, হরবনস মুখিয়া, সুমিত সরকার প্রমুখদেবর লেখা ইতিহাসের বইগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ধর্ম নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা এই বইগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সরব হন দেশের প্রগতিশীল ইতিহাসবিদগণ। কলকাতা থেকে সাহসী প্রতিবাদ জানিয়ে অধ্যাপক সুশোভন সরকার "Crusade against Modern Historians" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ অমৃত বাজার পত্রিকায় পাঠান প্রকাশনার জন্য। অমৃত বাজার পত্রিকা ছাপতে সাহস না দেখিয়ে চিঠি পত্রের কলমে সেটি প্রকাশ করে। সুশোভন সরকারের এই লেখাটি পুস্তিকাকারে ছেপে বরুন দে, গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসবিদগণ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯৭৭) বিতরণ করেন। ঐ অধিবেশনে রামশরন শর্মা প্রমুখদের লেখা বইগুলোর উপর আক্রমণকে ঐতিহাসিকরা ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার উপর নির্ভরশীল ইতিহাস পাঠনপাঠনের উপর আক্রমণ বলে মনে করেন। সাম্প্রদায়িক বিষ বপনের উদ্দেশ্যে ইতিহাসের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ইতিহাস অনুরাগী মানুষকে সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয় ঐ অধিবেশন থেকে। ভুবনেশ্বর অধিবেশনের প্রস্তাবে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—এক, এই প্রস্তাবে শুধু জনতা শাসনকালে নয়, পূর্ববর্তী শাসনকালে জরুরী অবস্থার সময়ে ইতিহাস পাঠ্যবইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রতিবাদ করা হয়। দুই, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার প্রসারে আঞ্চলিকস্তরে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ইরফান হাবিব উত্থাপিত বরুন দে, অমলেন্দু গুহ, গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সমর্থিত এই প্রস্তাব বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয় এবং পরাজিত হয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের পতাকাবাহী ইতিহাসবিদগণ।

কলকাতায় ফিরে আসার পর সুশোভন সরকার তার বাড়িতে ডেকে পাঠান আবদুল ওয়াহাব মামুদ, অধীর চক্রবর্তী, বরুন দে, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও মনসুর হবিবুল্লাহকে এবং পরামর্শ দেন "তোমরা পশ্চিমবঙ্গে একটি ইতিহাসের সংগঠন

তৈরী কর যা বাংলা ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চ্চার কেন্দ্র হবে।" ১৯৭৮ এ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের হল ঘরে সতেরো জন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা নিয়ে তৈরী হল একটি প্রস্তুতি কমিটি। আব্দুল ওয়াহাব মামুদ হলেন সভাপতি এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায় হলেন আহ্বায়ক। প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভা সংগঠিত করা হয় শিশির মঞ্চে। আলোচ্য বিষয় "ইতিহাস চর্চ্চায় সাম্প্রদায়িকতার বিপদ"। বক্তা ছিলেন ইরফান হাবিব, বরুন দে, অশীন দাশগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শতাধিক শিক্ষক আলোচনা সভায় যোগ দেন। এই সভাটি ইতিহাস সংসদের প্রতিষ্ঠার একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮২ সালে ইতিহাস সংসদকে আরও নির্দিষ্ট সাংগঠনিক রূপ দিতে রচনা করা হল এর গঠনতন্ত্র এবং সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী নিবন্ধভূক্ত করা হলো ইতিহাস সংসদকে। গঠিত হলো নতুন কার্যকরি সমিতি। আব্দুল ওয়াহ মামুদ হলেন প্রধান উপদেষ্টা। সভাপতি হলেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। ইতিহাস সংসদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখলেন *"ইতিহাস সংসদ কি ও কেন"* (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ১)। ইতিহাস সংসদের প্রথম স্মরনিকাতে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই ছোট নিবন্ধটি প্রকৃত অর্থে ছিল ইতিহাস সংসদের ঘোষনাপত্র—যা আজও প্রাসঙ্গিক।

ইতিহাস সংসদের বিগত দুই দশকের সময়কালে গৌতম চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্য্যন্ত। বর্তমানে তিনি সংসদের কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য। ইতিহাস সংসদের সাংগাঠনিক কাজে তিনি যে সহনশীলতা, সহমর্মীতা ও গণতান্ত্রিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন সংগঠনের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সর্বকনিষ্ট সদস্যের মতামতকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালনা করার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। একথা সুবিদিত যে তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অথচ ইতিহাস সংসদের কার্যক্রমকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচী থেকে পৃথকভাবে পরিচালিত করতে পারতেন। ইতিহাস সংসদ যে দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গে একটি মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে তার অনেকখানি গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের বিচক্ষণতার ফল।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল এক - উনবিংশ শতাব্দির বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন। দুই - ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। এই বিষয়গুলির উপর যে সমস্ত প্রবন্ধ সদস্যরা বার্ষিক অধিবেশনে

উপস্থিত করতেন সেগুলি তিনি বিশেষ মনেযোগ সহকারে শুনতেন এবং ঐ প্রবন্ধগুলিকে আরো সমৃদ্ধ করার পরামর্শ দিতেন। বর্তমান প্রজন্মেও অনেক গবেষক যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও কৃষক-শ্রমিক গণ-আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁরা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের এই পরামর্শগুলিতে। আমাদের কাছে শ্লাঘার বিষয় যে ঐ সমস্ত খ্যাতিমান গবেষকগণ তাঁদের প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থগুলিতে সংগঠন হিসাবে ইতিহাস সংসদ ও ব্যক্তি হিসাবে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। ইতিহাস সংসদের এটাও একটা বড় প্রাপ্তি।

শুধু গজদন্ত মিনারে বসে গবেষণার কোন মোহ ছিল না গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের। বরং ইতিহাসের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে প্রত্যান্ত অঞ্চলে বিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। রাজধানী দিল্লী অথবা বিদেশের কোন আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় আমন্ত্রণ অপেক্ষা কম অগ্রাধিকার দিতেন না পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জের কোন আলোচনার সভায় যোগ দেওয়ার অনুরোধকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত অঞ্চল উত্তরবঙ্গের মাথাডাঙ্গা, ধুপগুড়ি ও কালিয়াগঞ্জ থেকে শুরু করে মেদিনীপুরের তমলুক, বর্ধমানের শ্যামসুন্দর, হাওড়ার উলুবেড়িয়া, উত্তর ২৪পরগণার গোবরডাঙ্গায় ইতিহাস সংসদের আয়োজিত আলোচনা সভায় গৌতম চট্টোপাধ্যায় যোগ দিতে ট্রেনের সাধারণ শ্রেণীতে অক্লেশে যাতাযাত করেছেন সংসদের অন্যান্য বয়ঃকনিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে সমান উৎসাহে।

ইতিহাসের গবেষনার পাশাপাশি ইতিহাসের পঠনপাঠন বিষয়েও গুরুত্ব দিতেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। তিনি মনে করতেন ইতিহাসের পঠন পাঠনের উপর ইতিহাসের শিক্ষকদের আরও অনেক বেশী সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত বিভিন্ন বুলেটিন ও স্মরনিকাতে এবিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এই রকমের তাঁর লেখা একটি নিবন্ধ পরিশিষ্ট-২ এ সংযোজিত হল।

ইতিহাস চেতনায় গৌতম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চার বিরুদ্ধে আপোষহীন যোদ্ধা। মন্দির মসজিদ বিতর্কের প্রেক্ষাপটে তাঁর উদ্যোগেই ১৯৯০ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও ইতিহাসবিদদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি সাম্প্রাদয়িকতা বিরোধী ঘোষণাপত্র ইতিহাস কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিদের বিতরণ করা হয়। পরবর্ত্তীকালেও বিভিন্ন সময়ে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অথবা প্রগতিশীল ইতিহাস চর্চা আক্রান্ত হলে ইতিহাস সংসদের বক্তব্যকে সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ে যেতে ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে ইতিহাস সংসদের কার্যকলাপ আজ সারা ভারতের ইতিহাস মহলে সুবিদিত এবং ইতিহাস

সংসদের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস-র সম্পর্কের বিস্তার ঘটেছে। ইতিহাস সংসদের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই তাদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ ইতিহাস কংগ্রেস-এ পাঠ করে প্রশংসিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ইতিহাস কংগ্রেস আয়োজিত নবীন গবেষকদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের পুরস্কারগুলির সিংহভাগই অর্জন করেছেন ইতিহাস সংসদের সদস্যগণ। এই কৃতিত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সচেতন মানুষ গর্বিত। ইতিহাস কংগ্রেস-এর সঙ্গে ইতিহাস সংসদের-এর সদস্যদের নৈকট্য স্থাপনে অন্যতম চালিকা শক্তি ছিলেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চায় দায়বদ্ধ ইতিহাস সংসদ ১৯৯২-র ডিসেম্বরে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের অব্যবহিত পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে এই জঘন্য বর্বরচিত কাজের বিরুদ্ধে সমস্ত মতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ইতিহাসবিদদের সমবেত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। সমাবেশে গৃহীত ঘোষণাপত্রটিকে সর্বসম্মত রূপ দিতে গৌতম চট্টোপাধ্যায় বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ঘোষণাপত্রটি সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রস্তাবটির পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট - ৩।

ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তির প্রয়াস ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব ভারত, বাংলাদেশে তথা পাকিস্থানের প্রগতিশীল ইতিহাসবিদ মাত্রই উপলব্ধি করেন। ইতিহাস চর্চার এই ধারাকে সমৃদ্ধ করতে ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল বাংলাদেশ ও ভারতে ইতিহাসবিদদের একটি যৌথ সম্মেলন। বিষয় ছিল 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে ভারত ও বাংলাদেশ।' আলোচনা সভায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ, ডঃ মুনতাসির মামুন, ডঃ সুফী মোতাহর হোসেন, লেখক ও সাংবাদিক শ্রী অজয় রায় ও বিশিষ্ট শিল্পী ও অভিনেতা আসাদুজ্জামান নুর প্রমুখ। ভারতের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ, গোলাম কুদ্দুস, বরুণ দে, মৃণাল সেন, পবিত্র সরকার, অমলেন্দু দে, উৎপল দত্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব দাশগুপ্ত, শুভঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের শেষে ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকে গৌতম চট্টোপাধ্যায় একটি যুক্ত ঘোষণাপত্র পেশ করেন। সমর্থন করেন বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সালাউদ্দীন আহমদ। ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রাদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের বুদ্ধিজীবিদের যুক্ত ঘোষণাপত্রটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। গৌতম চট্টোপাধ্যায় রচিত এই ঘোষনাপত্রটি দেশের শান্তির প্রয়াসে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত। (ঘোষনাপত্রের পূর্ণাঙ্গ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৪)।

অনেকটা এই উদ্যোগের ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তিকালে বাংলাদেশে বহু বিশিষ্ট গবেষক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী ইতিহাস সংসদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ইতিহাস সংসদের সদস্য সংখ্যা দুশোরও বেশী। বাংলাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাঁদের গবেষনালব্ধ প্রবন্ধগুলি সংসদের বার্ষিক সম্মেলন গুলিতে নিয়মিত পেশ করেন। বাংলাদেশ বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বিগত কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি নিয়ে একটি পৃথক প্যানেল গঠন করতে হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় দুই প্রতিবেশী দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার ধারা সমৃদ্ধ হয়েছে। উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করতে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইতিহাস সংসদের এই উদ্যোগে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চা যখনই আক্রান্ত হয়েছে তখনই দায়বদ্ধ ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠস্বরে, তার লেখনি। ১৯৯৯ সালে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর গৈরিকি অভিযান। আক্রমনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলি। শিক্ষা ও গবেষনা সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ পদে সংঘ পরিবারের মনোনিত সদস্যদের নিযুক্ত করা হয়। ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ কেও একই ভাবে গঠন করা হয়। অনুসন্ধান পরিষদের নবনিযুক্ত সভাপতির নির্দেশে "Towards Freedom" প্রকল্পের অর্ন্তগত দুটি গ্রন্থ যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার ও কে.এল. পানিক্কার—ঐ গ্রন্থ দুটির প্রকাশনার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার উপর এই অনৈতিক ও অগনতান্ত্রিক আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান সারা দেশের শিক্ষক সমাজ ও বিবেকবান বুদ্ধিজীবীগণ। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রতিবাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ইতিহাস সংসদ। "Towards Freedom" প্রকল্প সম্পর্কে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে যে মিথ্যা ও কুৎসা রটনার আশ্রয় নেয় সংঘ পরিবার। তার বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্য ও সত্যকে তুলে ধরার প্রয়োজনে ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় **"টুয়ার্ডস ফ্রিডম বিকৃতি ও কুৎসা বনাম তথ্য ও সত্য"**। পুস্তিকাটিতে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা, ইরফান হাবিব, বিনয় ভূষন চৌধুরী, শ্রিপ্রা সরকার, কে.এন.পানিক্কার, সুমিত সরকার, সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, নারায়নী গুপ্ত প্রমুখের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকায় গৌতম চট্টোপাধ্যায় ভারতে ফ্যাসিবাদের সর্বনাশা বিপদের উৎস সন্ধানে" শীর্ষক নিবন্ধে মন্তব্য করেন যে 'ভারতে যে অখন্ড হিন্দু রাষ্টের স্বপ্ন দেখেন সংঘ পরিবার ও আর এস এস তা ফ্যাসিষ্ট মডেলেই গড়ে তুলতে চান তাঁরা। তার পথে

বাধা ভারতের সমস্ত গনতান্ত্রিক, উদারপন্থী ও ধর্মনিবপেক্ষ মানুষেবা, যার সামনের সারিতে অবশ্যই আছেন বামপন্থীরা। তাই তাদের উপর এই সর্বাত্মক আক্রমণ, যার বর্শাফলক উঁচানো বুদ্ধিজীবী সমাজের বিরুদ্ধে, কারণ তাঁদের কণ্ঠরোধ করতে না পারলে নতুন প্রজন্মকে ফ্যাসিষ্ট আদর্শে শিক্ষিত ও দীক্ষিত কার যাবে না। ভারতের জাতীয় জীবনে এত বড় বিপদ আর কখনও আসেনি। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি নয়। এখনই ভারতীয় ফ্যাসিবাদের প্রতিটি আক্রমনের বিরুদ্ধে তৎপর ও সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস চর্চ্চায় সাম্প্রদায়িকতা তথা উগ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধিতার পাশাপাশি বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ইতিহাস সংসদের বার্তা বা স্মরনিকা গুলিতে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলিতে স্থান পেয়েছে ফরাসি বিপ্লব এবং বর্মা, ইন্দোনেশিয়া অথবা ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ১৯৯৮ সালে "সুশোভন সরকার স্মারক" বক্তৃতায় তার বিষয় ছিল "সর্বহারা বিপ্লবের জয়শঙ্খ"। কমিউনিষ্ট ইস্তাহার প্রকাশের দেড়শো বছর পূর্তি স্মরন করে তার প্রদত্ত ঐ বক্তৃতায় মার্ক্স ও এঙ্গেলস রচিত কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে লিখেছিলেন "পৃথিবীতে যতদিন চলবে মানবমুক্তির সংগ্রাম ততদিনই অর্থবহ থাকবে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের মর্মবানী"।

ভিয়েতনামের পূর্ণ বিজয়ের পচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০০০ সালে ইতিহাস সংসদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল '**অজেয় ভিয়েতনাম**' শীর্ষক একটি পুস্তিকা। ঐ পুস্তিকায় গৌতম চট্টোপাধ্যায় ভিয়েতনাম মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র-যুব সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মৃতিচারণ করে 'কলকাতার ছাত্র সমাজের কাছে কমরেড হো.চি.মিন-এর চিঠি' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে পূর্ণ বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট—৫। এইভাবেই সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইতিহাস সংসদকে সদাজাগ্রত রাখতে থেকেছে ও তার দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

ইতিহাস সংসদের জন্ম হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চার আঁধার হিসেবে। ইতিহাস সংসদ একটি ছোট সংগঠন থেকে আজ বড় হয়েছে। সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। প্রবন্ধপাঠের উৎসাহও বেড়েছে। নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে সম্মেলনে এবং অন্যান্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে। এটা আশার কথা। একইসঙ্গে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায়

ধর্মান্ধ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তান্ডব এখনো অব্যাহত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস সংসদকে সমস্তরকম ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে এবং প্রগতিশীল ইতিহাসচর্চাকে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ইতিহাস সংসদের এই অঙ্গীকারের চলমান অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন চল্লিশের দশকের ছাত্র আন্দোলনের প্রেরণায় এখনো উজ্জীবিত অশীতিপর 'তরুণ' গৌতম চট্টোপাধ্যায়।

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট - ১

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ঃ কি ও কেন?

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস কি?

ইতিহাস কি? এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা ও মতামতের শেষ নেই। বহুদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে ইতিহাস হচ্ছে সবচেয়ে কীর্তিমান ব্যক্তিদের কৃতিত্বের কাহিনী। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় ইতিহাসের আলোচনা করে আজ একথা স্পষ্ট, যে সমাজ ও জাতির ক্রমবিকাশের ধারাই হ'ল ইতহাসের মূল কথা। কীর্তিমান ব্যক্তিরা অবশ্যই ইতিহাসে নিজেদের ছাপ রেখে যান, কিন্তু ইতিহাস হ'ল সমগ্র যুগের ও সমাজের পরিক্রমা, কীর্তিমান ব্যক্তিদের কাহিনী তার একটা অংশ মাত্র।

দুঃখের কথা, এদেশের বেশীর ভাগ ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকে আজও ভরা থাকে রাজা-বাদশাদের যুদ্ধবিগ্রহ বা শাসন ব্যবস্থারই বর্ণনা, অথবা নীরস, অজস্র সন-তারিখের ফিরিস্তি। কিন্তু ইতিহাস তো শুধু রাজা-বাদশাদের কাহিনী বা কিছু চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ নয়। হাজার বছর ধরে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে মাঠে মাঠে সোনালী ফসল ফলিয়েছে যে চাষীরা; গণগণে আগুনের সামনে তেতেপুড়ে, গলদঘর্ম হয়ে লোহা পিটে ইস্পাত করেছে বা খনির পাতালপুরী থেকে ধনরত্ন তুলে এনেছে যে শ্রমিকরা তাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার কাহিনীই তো ইতিহাসের মর্মকথা। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে নানারকমের সমাজ গড়ে তুলেছে, তার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি নিয়েই তো ইতিহাসের কারবার। তবে টুকরো টুকরো ছবি নয়, সমাজের ক্রমবিকাশের যে মূল ধারা, তাকে নিয়েই ইতিহাসের মূল আলোচনা।

ইতিহাসের আর একটি মূল কথা হ'ল পরিবর্তন। সে পরিবর্তন সব সময় সমান তালে চলে না। কখনও বা তা চলে মৃদুমন্দ গতিতে। তখন শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজ থেকেছে মোটের উপর একই রকম। আবার কখনও তা চলেছে প্রচণ্ড বেগে, সব ভেঙ্গে চুরে, সমাজ ও রাষ্ট্রের খোল-নলচে একেবারে বদলে দিয়ে—তখনই ইতিহাসে ঘটে বিপ্লব, আসে যুগান্তর।

সমাজ-ব্যবস্থার গভীরে ইতিহাসে রয়েছে নানান শ্রেণী ও শ্রেণী বৈষম্য। উৎপাদন-প্রথা ও আর্থিক বিধি ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা। যেমন ইতিহাস দেখা গেছে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ,

দাসতন্ত্র, সামন্ত্রতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও একেবারে সম্প্রতি সমাজতন্ত্র। ভারতের ইতিহাসে শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণী সংঘাতের সঙ্গে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে জাতিভেদ প্রথা ও ধর্মীয় মতভেদ, যাদের জটিলতাও কম নয়। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর রাজনৈতিক পালাবদলেব ইতিহাসকে বুঝতে হ'বে এই সব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে মিলিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে বাস্তব অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গেও, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং পেশাদারী শিক্ষাজগতের বাইরে জনসাধারণের মধ্যে ইতিহাসের পঠন-পাঠন ও চর্চার ক্ষেত্রে, আমরা এইসব মূল কথা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে ভিত্তি করেই এগোতে চাইছি। সহজ, সাবলীল, বাংলা ভাষায় সমাজবিকাশের এই সব কাহিনী অর্থাৎ ইতিহাসকে এই নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে ছাত্র সমাজ ও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ ও পরিবেশন করতে চাইছি।

এ কাজ বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু দুঃখের ও ক্ষোভের কথা, অল্পসংখ্যক ইতিহাসবিদ ছাড়া দীর্ঘদিন এদিকে অনেকেই দৃষ্টি ফেরান নি। কিন্তু আজ আর এ নিয়ে দীর্ঘসূত্রতার অবকাশ নেই। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে অশুভ শক্তিবা ইতিহাসের এই যুক্তিগ্রাহ্য, প্রগতিশীল চর্চা ও পঠন-পাঠনের উপর গুরুতর আক্রমণ সুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদ ও তাঁদের অন্ধ অনুকারকের প্রভাবও এখন পর্যন্ত নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

ইংরেজ শাসকদের লেখা ইতিহাসকে অন্ধ অনুকরণ করে এদেশেরও বহু ইতিহাসবিদ বলেছেন (আজও বলেন) যে ভারতে ইংরেজ শাসন নাকি একদিক থেকে পরম আর্শীবাদ, তারাই নাকি ঘটিয়েছিল আমাদের দেশে নবজাগরণ। অথচ প্রকৃত কথাটা তো এই যে ইংরেজরা এদেশে এসেছিল লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি নিয়ে, ভারতকে করেছিল তার লুণ্ঠণের ও শোষণের উপনিবেশ। ভারতের চাষীমজুর, সাধারণ মানুষকে শোষণ করে তারা নিজেদের দেশে সংগঠিত করেছিল শিল্প-বিপ্লব। ইংরেজরা আমাদের সমাজের কাঠামোটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল, যার ফলে ভারত তার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্য আর ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। দেশ ও দেশের জনসাধারণ ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী দুর্বিসহ যন্ত্রণা। ইংরেজরা তাদের শাসন ও শোষণকে অটুট রাখার জন্য, ভারতের সমস্ত ভেদপন্থী ও অনৈক্যের শক্তিকে উৎসাহ দিয়েছিল। যে সব ছেলেমেয়েরা জন্মেছে ও জন্মাচ্ছে ভারত স্বাধীন হবার পর, তাদের কাছে কি বলা হ'বে না ইংরেজ-শাসনের এই সর্বনাশা কাহিনীর কথা? তা বল্লে, তা কি হ'বে ইতিহাসের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা?

ইতিহাসের এই সব একপেশে ভাষ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছি আমরা—পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের নামে, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রজাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রচাব আমরা বন্ধ করতে চাই, তাদের শোনাতে চাই সমাজবিকাশের মূল ধারাগুলির কথা—ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিকোণ থেকে। এই কাজে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীর সমর্থন পাবার ভরসা রাখি।

আমরা কি করতে চাই?

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার বাইরে জনসমাজেও ইতিহাসের পঠন-পাঠন ও চর্চার ক্ষেত্রে নানান সমস্যা নিয়ে (পাঠক্রমের গলদ, পড়াশুনোর সমস্যা, সাম্প্রদায়িক ও উগ্রজাতীয়তাবাদী বিকৃতি) নিয়ে আলাপ আলোচনা করা, সম্ভব হ'লে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা—আপাততঃ এইটুকুই আমাদের উদ্দেশ্য। সে কাজ কোনও বিশেষ স্কুল বা কলেজে অথবা পাড়া বা অঞ্চলে আলোচনাচক্রের মাধ্যমেও হ'তে পারে। এই সমস্ত কাজে সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও ইতিহাস অনুরাগীর ঐকান্তিক সহযোগিতা আমরা কামনা করি।

ইতিহাসের গভীর চর্চা ভারত জুড়ে যতটুকু চলছে, প্রতি বৎসরে তার পরিচয় আমরা পাই ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন থেকে। সে কাজ ভালভাবেই চলছে ও চলবে এবং তার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে ও থাকবে। কিন্তু শুধু গভীর প্রবন্ধ লিখে দায়িত্বপালন সম্পূর্ণ হবে না। তাই প্রয়োজন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আলোচনা-চক্রের, সহজ বাংলায় সুলভে পুস্তিকা প্রকাশের এবং অন্যান্য জনপ্রিয় কায়দায়, ব্যাপক জনসাধারণেব মধ্যে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাকে পৌছে দেওয়া। প্রত্যেক দেশের সভ্যতার পাদপ্রদীপ ইতিহাস। ইতিহাসকে প্রগতিশীল রূপ দেবার দায়িত্ব আমার, আপনার সকলের। এই দায়িত্বেরই একটি প্রথম পদক্ষেপ এই ইতিহাস সংসদ। ইতিহাস সংসদের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য আমরা সমস্ত ইতিহাস অনুরাগী দের সক্রিয় সহযোগিতা চাইছি, যাতে অদূর ভবিষ্যতে এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ইতিহাস অনুরাগীর মিলনের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

পরিশিষ্ট—২

ইতিহাসের পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক সমাজের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগেই। সন তারিখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ বৃত্তান্তের চেয়ে জোর বেশী পড়েছে সমাজের ক্রম বিকাশের মূল ধারার উপর, যুগ যুগ ধরে মানুষ যে নানান রকম সমাজ গড়ে তুলেছে তার উপর। একটা দেশের ও পৃথিবীর মানব-সমষ্টির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা ও সংগ্রামের কাহিনীই তো ইতিহাসের মর্মকথা। পাঠ্যক্রমের এই প্রগতিশীল পরিবর্তন এসেছে একেবারে স্কুলের নীচের তলায় ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী থেকে কলেজগুলিতে সাম্মানিক স্নাতক-স্তর পর্যন্ত।

গতানুগতিকতা বনাম আধুনিক ইতিহাস পাঠ

ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের এই সামগ্রিক ও প্রায় আমূল পরিবর্তনের ফলে ছাত্রছাত্রীদের সামনে প্রকৃত ইতিহাস-চর্চার দরজা যেমন খুলে গেছে, তেমনই দেখা দিয়েছে বেশ কিছু গুরুতর সমস্যা। প্রায় এক শতাব্দী ধরে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ইতিহাসকে রাজ-বৃত্তান্ত ও সনতারিখের ফিরিস্তি হিসাবে পড়তে ও মুখস্থ করতেই অভ্যস্ত। হঠাৎ তার বদলে ইতিহাসকে সমাজ বিকাশের কাহিনী হিসাবে তলিয়ে দেখার পাঠ্যক্রম একটা নতুন চ্যালেঞ্জ। কি ছাত্রছাত্রীরা কি শিক্ষক-শিক্ষিকারা চট করে এতদিনকার গতানুগতিক ইতিহাস পড়া ও পড়ানোকে ছাড়তে পারছেন না। যে সবই বই ধরে পড়ানো হচ্ছে, তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বেশীর ভাগ বই আজও লেখা হচ্ছে পুরাণো, গতানুগতির রীতিতে, যা খাপ খায় না নতুন পাঠ্যক্রম ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার সঙ্গে।

শিক্ষক-মহলে প্রশ্ন উঠেছে যে বিশেষ করে স্কুলের নীচের দিকে ইতিহাস পাঠ তো প্রধানতঃ বর্ণনা-ধর্মীই হওয়া উচিত, শিশুমন বিশ্লেষণ ধর্মী ইতিহাস পাঠকে

অল্প বয়সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ঠিক কথা, কিন্তু এটা তো হতে পারে না যে শিশু বয়সে ছেলেমেয়েরা ভ্রান্ত বা খণ্ডিত ইতিহাস পড়বে ও জানবে, আর বড় হয়ে তা তলিয়ে পড়বে। আসলে ইতিহাসের মূল কথাগুলো, সহজ বর্ণনার মধ্যে দিয়েই বিকাশের মূল ছবিটা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাতে ইতিহাস তাদের কাছে মুখস্থ করার বিরক্তিকর কাজের চেয়ে, ঢের বেশী চিত্তাকর্ষক ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

আমি একটি ছোটছেলের কথা জানি, যে এখন ইতিহাসের একজন কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক। সে যখন স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ত, তখন থেকেই ভালবাসত ইতিহাস পড়তে। তাই সে পড়ে ফেলেছিল ছেলেবেলাতেই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নানান ইতিহাসের বই। পরবর্তী জীবনে এই পড়াশুনো তার ইতিহাস চেতনাকে প্রখর করতে সাহায্য করলেও, স্কুল সবসময় তা তার পক্ষে সুখকর হয়নি। হিউ এন সাং সম্বন্ধে নীচের দিকে ক্লাসে পরীক্ষাতে এক প্রশ্নের উত্তরে বাইরে পড়া জ্ঞান থেকে বহু সঠিক কথা লেখার ফলে, তার নম্বর কাটা গিয়েছিল এবং ইঁচড়ে-পক্কতা দেখানোর অভিযোগে তাকে ধমক খেতেও হয়েছিল।

এ সমস্যা শুধু ঐ ছাত্রটির নয়, অনেক ছাত্রেরই এবং শুধু স্কুলে নয়, কলেজেও।

কারণ নাম ধাম 'যুদ্ধ বিগ্রহ, সনতারিখ মুখস্থ করার বদলে, একটা দেশ বা দুনিয়ার মানুষের সমাজ কি ভাবে বদল হল, কখনও মৃদুমন্দ তালে, বিবর্তনের পথে, কখনও অকস্মাৎ, বিপ্লবের পথে— তা শুনতে বা পড়তে ছেলেমেয়েদের ভালই লাগে। তাদের মন নতুন ও সজীব—নতুনকে গ্রহণ করতে ছাত্রমন অনেক বেশী প্রস্তুত।

শিক্ষক সমাজে রক্ষণশীলতার প্রভাব

কিন্তু আমাদের, শিক্ষকদের পক্ষে এই পরিবর্তন গ্রহণ করা অনেক বেশী কঠিন কাজ। কারণ আমরা বহু বছর ধরে গতানুগতিকভাবে ইতিহাস পড়তে, বুঝতে ও পড়াতে অভ্যস্ত। তাছাড়া আমরা অনেকেই ইতিহাসের গতিশীল গবেষণা-কর্ম ও তা থেকে প্রাপ্ত নতুন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় রাখি না। ফলে নতুন তথ্যের আলোকে যেসব নতুন বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, তা বহু শিক্ষকের কাছেই থেকে যায় প্রায় অপরিচিত। রক্ষণশীল মন, নতুন ধ্যানধারণাকে অনেক সময়ই গ্রহণ করতে চায়না।

দু চারটি দৃষ্টান্ত দেব। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ানোর সময় গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলে অনেকেই এখনও পড়িয়ে যান। সে যুগের সমাজে সামন্ততন্ত্রের প্রাথমিক যে সুত্রপাত দেখা দিয়েছিল, যে কঠোর শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণ চলেছিল, তার কথা প্রায় উল্লেখই করা হয় না ক্লাস ঘরে। দ্বিতীয়ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজে যে অনেক বেশী সমৃদ্ধি ও নতুনত্ব এনেছিল তার পূর্ববর্তী কুষাণ-যুগ, সে সম্বন্ধে খুব আবছা ধারণা আজও থেকে গেছে অন্ততঃ স্কুলের স্তরে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে।

তবে তার চেয়েও বেশী রক্ষণশীলতা দেখানো হয় মধ্যযুগের ইতিহাস পড়ানোর সময়। সেখানে এখনও জোর পড়ে মুসলমান শাসনে কি পরিমাণ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উৎপীড়ন ছিল তারই উপর, ঐ যুগের ইতিহাসে সমাজে যে সব গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল বা ধর্মীয় সহনশীলতার যে ধারাটি ঐ যুগে ইতিহাসের অন্য একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান ছিল—তা প্রায় অনুচ্চারিতই থেকে যায়। তার ফলে কিশোর মনে, হয় তো অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভিত্তি জন্মায় সাম্প্রদায়িক চেতনার, ইতিহাসের যথাযথ সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করালে, যা কখনই হতে পারত না।

প্রগতিশীল ইতিহাসবিদদের উপর আক্রমণ

এরকম শিক্ষকও বিরল নন, কি স্কুলে, কি কলেজে, যাঁরা ক্লাস ঘরে ইতিহাসের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান সম্মত ধ্যান ধারণাকে আক্রমণ করেন, প্রগতিপন্থী ইতিহাসবিদদের বই পড়তে বারণ করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসবিদদের মধ্যে ডি, ডি কোশাম্বী বা রমিলা থাপর এবং মধ্যযুগে ইরফান হবিব প্রমুখ পণ্ডিতরা এইসব আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেন। অবশ্যই অন্য চিত্রও আছে। বহু প্রধান ও নবীন শিক্ষক, বহু পরিশ্রম করে, ইতিহাসের সর্বাধুনিক গবেষণা কর্ম ও তার থেকে পাওয়া বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের সঙ্গে ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় ঘটাচ্ছেন। তা সহজ ভাষায়, মোটা দাগে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু এখনও ইতিহাসের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় ধারার প্রচেষ্টাটি দুর্বল তার ধারক ও বাহকরাও সংখ্যাতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

ইতিহাসবিদদের ও ইতিহাস সংসদের দায়িত্বে

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের জন্মলগ্ন থেকেই অন্যতম প্রধান বিঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসের গতানুগতিক ও মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া পঠন-পাঠনের

বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। ইতিহাস পড়ানো ও চর্চার নামে ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে শুধু রাজ বৃত্তান্ত বা প্রচ্ছন্ন (কখনও কখনও প্রকট) ভাবে সাম্প্রদায়িকতা বা উগ্র জাতীয়তার প্রচার আমরা খণ্ডন করতে চাই। এ যুগ ও অনাগত যুগের ছেলে মেয়েদের আমরা পড়াতে শোনাতে ও বোঝাতে চাই সমাজবিকাশের মুল ধারাগুলির কথা, ইতিহাসেব পথ ধরে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যে সংঘাত চলে এসেছে তার কথা, মানব-সভ্যতার বিবর্তন ও মাঝে মাঝে বৈপ্লবিক রূপান্তরের কথা।

একাজ করতে হবে বিভিন্নস্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথাযথ, সহজবোধ্য অথচ সর্বাধুনিক তথ্য ও যুক্তিনির্ভর ইতিহাসের বই লিখে এবং ক্লাস ঘরে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষকভাবে তা পড়িয়ে এবং ছেলে মেয়েদের মনে ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে। একাজ কঠিন,কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষক ও ইতিহাসবিদদের সামনে এটাই তো প্রকৃত চ্যালেঞ্জ। তাঁরা এই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হলে, ইতিহাস সংসদ সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের সহায়তা করবে।

পরিশিষ্ট - ৩

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে

সম্মেলনের ঘোষনাপত্র

(১৯৯৩-র ১৭ জানুয়ারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসবিদদের সমাবেশ থেকে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ঘেষনাপত্রের পূর্ণ বয়ান।)

১৯৯২ এব ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায যা ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করা হয়েছে তা একটি মসজিদ মাত্র নয়, প্রচন্ড আঘাত কবা হয়েছে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাব আদর্শকে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতী ও পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্যকে। প্রচন্ড আঘাত করা হয়েছে ভারতেব গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধাবনাকে, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে। বিষাক্ত করা হয়েছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে। ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসের এক পুরাকীর্তিকে ধ্বংস করা শুধু গর্হিত অপরাধই নয়, ইতিহাসকে বিকৃত করার নগ্ন অপচেষ্টা মাত্রা। আমরা পশ্চিমবঙ্গের সমবেত ইতিহাসবিদ, ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকরা একবাক্যে এই ধ্বংসকান্ডের তীব্র নিন্দা করি ও ঘোষণা করি যে আমাদের ঐতিহ্য বিরোধী এই বর্বরতার ক্ষমা নেই।

ভারতের ও বিশ্বের ইতিহাস পাঠ ও বিশ্লেষণ আমাদের মনে এই দৃঢ় ধারণারই জন্ম দিযেছে যে ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতা ইতিহাসের সকল পর্বে বিভিন্ন দেশের ও বিশ্বের সমুহ ক্ষতিসাধনই করেছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা দেশে দেশে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধকেই ডেকে এনেছে, জাতীয় ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতাকেই বিপন্ন করেছে— সে ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানিতেই হোক আর বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশেই হোক। তাই আমরা সহমত হয়ে, আমাদের যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস চেতনার উপর দাঁড়িয়ে ঘোষনা করছি যে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের যে কোন প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের ও এই উপমহাদেশের সর্বনাশই ডেকে আনবে।

তুলনামূলকভাবে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির-ব্যাপকতা ও তীব্রতার দ্বারা কম আচ্ছন্ন। তথাপি আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। তাই আমরা ঘোষনা করছি যে স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে, গবেষনার ক্ষেত্রে ও আমাদের সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রে আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার সপক্ষে সর্বদাই দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবো। ধর্মনিরপেক্ষতা,

পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তিতেই, মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বার-গীর্জার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতেই ভারত এক সমৃদ্ধ, সমুজ্জ্বল রাষ্ট্র হিসেবে একবিংশ শতাব্দীর পথে এগিয়ে যেতে পারবে। তার বিকল্প ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ, যা সকল ধর্মের নরনারীর ও আমাদের মিলিত মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সমূহ সর্বনাশ করবে।

সভা এই ঘোষণাপত্রটি সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদকে উদ্যোগী হতে বলে।

পরিশিষ্ট - ৪

ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে

বাংলাদেশ ও ভারতের বুদ্ধিজীবীদের যুক্ত ঘোষনাপত্র

(ইতিহাসবিদদের সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ৩১/১/৯১)

আমরা বাংলাদেশ ও ভারতের ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সংস্কৃতি কর্মী ও বুদ্ধিজীবিরা, পারস্পরিক খোলাখুলি আলোচনা ও মত বিনিময়ের পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আমাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের সর্বসাধারণের ও আমাদের উভয় রাষ্ট্রেরও প্রগতি ও কল্যাণ একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের পথেই সম্ভব। আমাদের কঠিন ও জটিল অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটাও গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি যে সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তা শুধু আমাদের উভয় রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সম্মিলিত অগ্রগতিকেই বিড়ম্বিত করে না, আমাদের নিজ নিজ দেশের সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকেও বিপর্যস্ত করে। ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আমাদের উভয় দেশ সহ সকল দেশের সমাজকেই পিছন দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সভ্যতার পরিবর্তে হিংস্র বর্বরতার নিশানই তাদের হাতে থাকে।

আমাদের উভয়ের অভিজ্ঞতা অতীতে এবং আজও প্রমাণ করে যে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ ও উন্মত্ততা সৃষ্টি করে দেশের কায়েমি স্বার্থবাজ ধনলোভী ও ক্ষমতালোভী স্বার্থপর ব্যক্তিরা, গোষ্ঠীরা বা দলেরা ও বহুক্ষেত্রে তাদের ইন্ধন যোগায় আন্তর্জাতিক মুনাফালোভী কায়েমী স্বার্থও তাই এই সর্বনাশা শক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহজও নয়, ক্ষণস্থায়ীও নয় - দীর্ঘ বহু বছর একটানা নিরন্তর এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বস্তরে অভিযানই আশু ও জরুরী প্রয়োজন।

এ অভিযানে অংশীদার হবার প্রয়োজন সকলেরই - শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কদের, গণতান্ত্রিক সমস্ত রাজনৈতিক দলদের, নানাবিধ গণসংগঠনদের, ছাত্রযুবসমাজের, মেয়েদের এবং অবশ্য বুদ্ধিজীবিদের। কারণ ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তার বীজ রোপিত হয় মানুষের মনে, চিন্তায় ও চেতনায়। তাকে পরিব্যপ্ত করে সমাজকে বিষাক্ত করে পাঠ্যপুস্তকে, সংবাদপত্রে, বেতারে, দুরদর্শনে, চলচিত্রে অশুভ প্রচারের মাধ্যমে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা চিন্তাধারার দিক থেকে মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসের পতাকাবাহী হলেও, তাদের আক্রমণের অস্ত্র একান্তভাবেই আধুনিক

এবং মধ্যযুগীয় রাজা বাবর নয়, হিটলার-মুসোলিনির মতো ফ্যাসিষ্ট স্বৈরতন্ত্রীরাই তাদের আদর্শ। তাই সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী শক্তিদেরও সর্বাধুনিক কৃৎকৌশলকেও ব্যবহার করেই সাম্প্রদায়িকতার রাহুকে পরাভূত করতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম-বিরোধিতা বা ধর্মহীনতা নয়। প্রত্যেক ধর্মের মূল নীতি মানবতাবাদ ও সৌভ্রাত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা সে মানবতাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। একমাত্র ধর্মনিপেক্ষ রাষ্ট্রই সব ধর্মের মানুষদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় অধিকারকে নিরাপদ ও সুনিশ্চিত করতে সক্ষম।

মধ্যযুগের মরমী সাধকেরা, *ধাবা ফরিদ*, নানক, কবীর দাদু, রবিদাস, *নামদের* দারাশিকো বর্বরতার বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা করে মানুষের মিলনের জয়গান গেয়েছেন। আধুনিক যুগেও তাই তাঁদের এই সমন্বয়ের বাণী গ্রহণীয়।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের মধ্যে এমন কতকগুলি সমস্যা রয়েছে যা রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিরা এর সুযোগ নিয়ে উভয় দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে এইসব সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। এই কাজ উভয় রাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রচেষ্টার পরিপূরক স্বাধীন উদ্যোগ নিতে উভয় রাষ্ট্রের সর্বসাধারণকে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিদের কাছে আমরা সনির্বন্ধ আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা, শুধু বাংলাদেশ ও ভারতেরই নয়, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপালের, ভুটান ও মালদ্বীপের অর্থাৎ এই উপমহাদেশের সর্বসাধারণের কাছে আহ্বান জানাই ঃ আসুন, আমাদের সকলের নিজস্ব ও সম্মিলিত কল্যাণ ও প্রগতির স্বার্থে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয়, ভাষাগত ও জাতিগত সহনশীলতার আদর্শকে সুউচ্চে তুলে ধরি এবং ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তার অশুভ শক্তিদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত নিরন্তর অভিযানকে দুর্বার করে তুলি। একমাত্র সেই পথেই আমাদের সকলের কল্যাণ ও প্রগতি সম্ভব।

(উত্থাপক) গৌতম চট্টোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের পক্ষে
(সমর্থক) সালাহ্উদ্দিন আহমেদ্, সভাপতি,
বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত
৩১/১/৯১

পরিশিষ্ট - ৫

কলকাতার ছাত্রসমাজের কাছে কমরেড হো-চি-মিনের চিঠি

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৭ এর জানুয়ারি মাসে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অতর্কিত আক্রমনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে রত এশিয়ার তথা সারা বিশ্বের জনগণের কাছে সমর্থন চেয়ে আহ্বান জানান হ্যান বেতার কেন্দ্র মারফৎ ভিয়েতনামের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ। সেই আহ্বানে সারা দিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন ২১ জানুয়ারি কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চলে। সেই গুলি চালনায় নিহত হন দুজন ছাত্র - ধীররঞ্জন সেন ও সুখেন্দু বিকাশ। পরদিন ২২ জানুয়ারি পুলিস গুলি চালায় মৈমনসিংহের ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর। শহীদ হন তরুন ছাত্রকর্মী অমলেন্দু ঘোষ। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন অনিতা নামে একজন ছাত্রী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে এই গুলিচালনা ও ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে ও ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সহমর্মিতা জানিয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ও শহরতলীতে কয়েকশত শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করেন।

ছাত্র ও শ্রমিকদের দাবি ছিল যে দমদম বিমান বন্দরকে ফরাসী জঙ্গী বিমানদের ব্যবহার করতে দেওয়া চলবেনা। ২১জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি এই দাবির সমর্থনে বাংলার ছাত্র ও শ্রমিকদের এই বিপুল সংগ্রামের ফলে, ভারতের অর্ন্তবর্তী কালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু সংবিধান পরিষদের সামনে প্রতিশ্রুতি দেন যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে দমদম বিমান বন্দর ব্যবহার করতে দেওয়া হবেনা, কিন্তু কয়েকদিন পরে কমিউনিষ্ট পার্টির দৈনিক বাংলা মুখপত্র "স্বাধীনতা" জানতে পারেন যে রাত্রের অন্ধকারে গোপনে ফরাসী বোমারু বিমান দমদম বিমান বন্দরকে ব্যবহার করছে, পেট্রোল ভরার প্রয়োজনে। স্বাধীনতার সাহসী সাংবাদিক প্রভাত দাসগুপ্ত ও মাধব মুনসী এবং ফোটোগ্রাফার খবর পেয়ে রাত্রে গিয়ে ফরাসী বোমারু বিমান ও ফরাসী সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা বৈমানিকদের ছবি

তুলে তা "স্বাধীনতায়" ছেপে দেন। সেই ছবি ও সংবাদ সহ, সংবিধান পরিসদের একমাত্র কমিউনিষ্ট সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী নেহরুকে বলেন যে আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দমদম বিমান বন্দর ফরাসীরা ব্যবহার করে চলেছে। তখন নেহেরু কঠোর নির্দেশ দেন যে আর একদিনও যেন এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় এবং এবার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছিল।

এর একদশক পরে উত্তর ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কমরেড হো-চি-মিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর আমন্ত্রনে ভারতে আসেন। সেই সময় তিনি অল্প দিনের জন্য কলকাতাতেও আসেন। সেখানে কলকাতার পুরসভায় তাঁকে দেওয়া অভ্যর্থনায় তাঁর দেখা হয় ১৯৪৭ এর ২১শে জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আহত ছাত্রকর্মী (১৯৫৮তে "স্বাধীনতা"র সংবাদদাতা) রণমিত্র সেনের সঙ্গে। তাকে সাদর আলিঙ্গন করে তার মারফৎ তিনি কলকাতায় ছাত্রসমাজকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান।

এর কিছুদিন পরে ভারতে নিযুক্ত গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের কনসাল জেনারেল কলকাতায় দুই প্রাক্তন ছাত্রনেতা কমলাপতি রায় ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনের স্বাক্ষর যুক্ত তাঁর দুটি ছবি পাঠান। যার পিছনে লেখা ছিল — ভিয়েতনামের বন্ধু কমলাপতি রায় ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে হো-চি-মিনের প্রীতি উপহার। তার সঙ্গে ইংরাজিতে লেখা কনসাল-জেনারেল ন্‌গুরাজ-কো-থাকের একটি চিঠি। সেই চিঠিটির ঈষৎ সংক্ষেপিত বাংলা ভাষান্তর এখানে ছাপা হল ঃ

প্রিয় বন্ধুরা,

আমাদের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিন আমাদের জানিয়েছেন যে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে আপনারা তাঁকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তা পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি আপনাদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। খুবই দুঃখের কথা যে এবারে তাঁর হাতে সময় এত কম যে এবার তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। ১৯৫৮-র ১৩ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যখন তাঁকে পৌর সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তখন ১৯৪৭ এর ২১জানুয়ারির মিছিলে দুজন অংশগ্রহনকারী শ্রী সুব্রত কুমার ও শ্রী রণমিত্র সেনের সঙ্গে তাঁর দেখা করার সুযোগ হয়। আমাদের রাষ্ট্রপতি সে দুজনের প্রতি এবং তাঁদের মারফৎ আপনাদের সকলের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রদান করেছিলেন তা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে জানেন।

আমাদের রাষ্ট্রপতি, সবিনয়ে একথাও জানাতে বলেছেন যে আপনারা দুজন সহ ভারতবর্ষের সমস্ত ভাই-বোনেরা ভিয়েতনামের জনসাধারণকে যে ভ্রাতৃত্ব মূলক সমর্থন জানিয়েছিলেন, তা চিরদিন আমাদের হৃদয়ে গাঁথা থাকবে। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের গোড়ার দিকে আমাদের মুক্তি সেনাবাহিনী ছিল অনভিজ্ঞ। তাদের খাবার, রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্রও ছিল কম। তখন, ১৯৪৭এর জানুযারিতে কলকাতা শহরে, ভারতীয় ছাত্র ও যুবকেরা আমাদের সমর্থনে যে সংগ্রাম করেছিলেন, পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তা আমাদের মনে নতুন জোর ও সাহস এনে দিয়েছিল। ইতিহাসের সেই কঠিন মুহুর্তে আপনাদের সমর্থন ভিয়েতনামের মানুষকে শুধু উৎসাহই দেয় নি, আমাদের জয়লাভে বাস্তব সাহায্যও করেছিল।

ইতি

নয়া দিল্লী
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮

আপনাদের প্রিয় বন্ধু
ন্‌গুয়েন-কো-থাক্

মধ্যযুগের ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

ইকতিদার আলম খান

যে উদারনৈতিক চিন্তাসমূহ ভারতীয় সংবিধানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট আছে, এবং যেগুলি আধুনিক ভাবতীয় রাষ্ট্র সংগঠনের সাধারণ কার্যপ্রণালীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে, সেগুলি বাস্তবে একটি যথার্থই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, অর্থাৎ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো ভূমিকা পালন করাই সম্ভব হবে না, তেমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। জোরটা পড়ে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার উপর নয়, বরং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তার মধ্যস্থতা করার ভূমিকার উপর। কিন্তু, একই সঙ্গে, রাষ্ট্রকে দেখা হয় হিন্দু সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা সংস্কার করার হাতিয়ার রূপে। ইসলামিক প্রতিষ্ঠানদের ক্ষেত্রেও তার কাছ থেকে অনুরূপ, কিন্তু কম দৃশ্যমান ভূমিকা পালনের আশা করা হয়।[১] সুতরাং আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রকে বলা যায় একটি ধর্মোত্তর সংগঠন, যাকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। নিজেকে একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম না করলেও, এই রাষ্ট্র দেশের সবকটি প্রধান ধর্মকে, এবং তাদের মাধ্যমে ঐ ধর্মগুলির অনুবর্তী জনগণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে, আধুনিকীকরণ ও ধনবাদী বিকাশের ঘটমান প্রক্রিয়াকে যে সামাজিক রীতিগুলি সাহায্য করে তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানে আনতে চায়। এ থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় সংবিধানের নিয়ামক নীতির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা গাঁথা আছে, তা ভারতীয় ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় একটি বুর্জোয়া-ভূস্বামী জোটকে একটি অনুন্নত ও কৃষ্টিগতভাবে খণ্ডিত সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও ধনবাদী বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

এই বিশেষ ধরণের ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ব ইতিহাস কি, তা একটি বিতর্কিত বিষয়। সমাজবিজ্ঞানীরা ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। তাঁদের উত্তর নির্ভর করেছে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্র সংগঠন তার বর্তমান রূপ পাওয়ার পিছনে কোন কোন শক্তি ও প্রভাবের হাত ছিল, সে বিষয়ে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন

* প্রথম সম্মেলন, কলকাতা, ১৯৮৪

উপলব্ধি। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার অনেকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাস্তব রূপ নিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে।[২] এগুলি ছিল গান্ধীবাদী বাষ্ট্রতত্ত্বের সারগ্রাহী কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর বফা ও মীমাংসাব ফল। ভাবতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাব অন্তর্নিহিত ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আচরণের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে, এই প্রস্তাবনাও বিবেচনাযোগ্য।[৩] কিন্তু মনে হয় যে এই প্রশ্নের উত্তর আরেকটি, এবং সম্ভবত বেশী প্রাসঙ্গিক দিক থেকে দেওয়ার চেষ্টা করা যায়। তা হল, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ভারতীয় বাষ্ট্রের স্থাযী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির রেখাচিত্র আঁকা। এই পথে অনুসন্ধান চালাতে পাবলে বোঝা যাবে, আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যসমূহের উৎস কি পরিমাণে প্রাক-আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া যাবে। বর্তমান লেখকের পূর্বতন একটি নিবন্ধে দেখানো হয়েছে, মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির কার্যপ্রণালীর নিবিড় অনুসন্ধান দেখায়, ১৮শ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতে যে বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক সংগঠনের বিবর্তন ঘটছিল, তার সমস্ত বিশেষ দিকগুলি সহ ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা যেন তারই একরকম সম্প্রসারণ।[৪] বর্তমান প্রবন্ধে আমি ঐ একই যুক্তির উপর আরও বিস্তৃত আলোচনা করব, এবং ইতিমধ্যে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ উদঘাটিত হয়েছে তার উল্লেখ করব।

এই প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর আধিপত্যাধীন মধ্যযুগীয ভারতীয় বাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা প্রাসঙ্গিক হবে। এই রাষ্ট্রগুলি অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বজায় থাকত, দুটি স্পষ্টত সনাক্ত করা যায় এমন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক যুদ্ধ ও দখল কায়েম করার পর কার্যোপযোগী আপোষ রফার ভিত্তিতে। এই গোষ্ঠী দুটি হত রাজার প্রধানত মুসলিম সেনাধ্যক্ষরা এবং মূলতঃ হিন্দু স্থানীয় পরম্পরাগত প্রধানরা। উভয় গোষ্ঠীই প্রাপ্তিসাধ্য সামাজিক উদ্বৃত্ত দখল করার ভিত্তিতে বজায় থাকত এবং বিভিন্ন স্তর থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করত। সুতরাং রাজার সেনাধ্যক্ষদের এবং বংশানুক্রমিক প্রধানদের একই শাসক শ্রেণীর দুটি খণ্ড রূপে দেখা যুক্তিসঙ্গত হবে। এই বৃহত্তর শাসক শ্রেণীর প্রাথমিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য। অবশ্যই, এই রাষ্ট্রগুলিতে আদায়কৃত উদ্বৃত্তের সিংহভাগ দখল করত রাজা ও তার উচ্চতম কর্মচারীরা, এবং তার ফলে অবধারিতভাবে বংশানুক্রমিক প্রধানরা বহু সময়ে ক্ষুব্ধ হত, এমন কি রাষ্ট্রীয় আয়ের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে রাজা ও তার সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। পারসিক রচয়িতারা বহু ক্ষেত্রে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে

দেখতেন তাঁদের ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার চশমা পরে। ফলে তাঁদের উপলব্ধিতে ভ্রান্তি ছিল। তাঁরা এই সংঘাতগুলিকে একটি ধর্মযুদ্ধের অঙ্গ বলে চরিত্রায়ণ করেন। তাঁদের উপলব্ধি অনুযায়ী, একজন মুসলিম শাসকের কর্তব্য ছিল অবিরাম এইরকম ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই, যখন রাজস্ব সংকোচনের পরিস্থিতি দেখা দিত শাসকশ্রেণীর এই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন হিংস্র ও দীর্ঘায়ত হয়ে পড়ত। অন্যদিকে, যখন একটি রাষ্ট্রের হাতে থাকত দ্রুতহারে প্রসারমান সম্পদ, তখন শাসক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কমে যাওয়ার ঝোঁক দেখা দিত, এবং হিন্দু নেতারা মুসলিম রাজন্যবর্গ ও তাদের সেনাধ্যক্ষদের আধিপত্যাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মতা দেখানোতে অনেক বেশী উৎসাহিত হত। কখনো কখনো শাসকশ্রেণীর মধ্যে তুলনামূলক শান্তির সঙ্গে সঙ্গে আসত রাষ্ট্রের কার্যপ্রণালীর নিয়ামক নীতিতে পরিবর্তন, যার লক্ষ্য হত অ-মুসলিম গোষ্ঠীদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও তাদের জন্য স্থান করে নেওয়া।

উপরে শাসক শ্রেণীর যে পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে, যে রাষ্ট্র তার প্রতিনিধিত্ব করত, তা ইসলামিক ধর্মরাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত হয়ে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রচারের জন্য একনিষ্ঠতা দেখালে বেশীদিন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারত না। জিয়াউদ্দিন বারাণী এবং আবুল ফজল সার্বভৌমিকতার সমস্যা প্রসঙ্গে যে মন্তব্যগুলি করেছেন তা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণ করে যে শুধু মুঘল সাম্রাজ্য নয়, দিল্লীর সুলতানতন্ত্রও পুরোদস্তুর ইসলামিক ধর্মরাষ্ট্র ছিল না এবং বাস্তবে তারা তাদের রাষ্ট্র সংগঠনের মধ্যে অনেকগুলি সুস্পষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বহন করত। এ কথাও মনে কবা যায় যে তাঁরা রাষ্ট্রতত্ত্বের যে সমস্ত আবশ্যক চরিত্র ব্যাখ্যা করেন তারা কিছু কিছু প্রথম ইসলামিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বের বদলে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতত্ত্ববিদদের রচনা থেকে ধার করা ছিল। এই হল আরেকটি ইঙ্গিত, যা দেখিয়ে দেয় মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলিতে কোন ধরণের এবং কতটা রূপান্তর ঘটছিল, যা তাদের একটি মিশ্র শাসক শ্রেণীর বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলছিল। নীচে আমরা বারাণী ও আবুল ফজলের রচনাবলী বিশ্লেষণ করে উপরে উল্লিখিত দুটি বক্তব্য প্রমাণ করার মাধ্যমে এই রাষ্ট্রগুলির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রসমূহের অনুসন্ধান আরম্ভ করব।

বারাণীর—ফতোয়া-ই জাহান্দারী—দিল্লী সুলতানতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র বোঝা সম্ভব করে তোলে। মুহম্মদ হাবিব লিখেছেন যে ঐ রাষ্ট্র "কোনো অর্থেই একটি ধর্মরাষ্ট্র [theocratic state] ছিল না। ইসলামের শরিয়ত নয়, রাজা কর্তৃক সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় আইন বা জাওয়াবিৎ ছিল তার ভিত্তি।" বারাণীর সংজ্ঞা অনুযায়ী জাবিতা হল "রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য রাজা নিজের উপর বাধ্যতামূলক কর্তব্যরূপে চাপিয়ে দেন এমন

কার্যপ্রণালী, এবং যা থেকে তিনি নিজে কখনো বিচ্যুত হন না।" একথা স্পষ্ট, যে এই জাওয়াবিৎ বহু সময়ে রাজন্যবর্গ ও রাজার সেনাধ্যক্ষদের প্রতি আনুকূল্য দেখাবে। বাবাণী একটি সাধু আশা পোষণ করেন যে সুলতান কর্তৃক সৃষ্ট জাওয়াবিৎ যেন শরিয়তেব ধারা ভঙ্গ না করে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যে জাওয়াবিৎ কোনো ধর্মগ্রন্থ বা উলেমা কর্তৃক তার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সৃষ্ট ছিল না। রাজা এই আইনগুলির প্রণয়ন করতেন তাঁর রাজ্যের জন্য কি ভাল, তিনি নিজে তা যেরকম বুঝতেন তার ভিত্তিতে। মুহম্মদ হাবিবের ভাষায় "বারাণী আমাদের কোনো সন্দেহেই রাখেন নি। কোনো সংঘর্ষের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন (অর্থাৎ জাওয়াবিৎ) শরিয়তের চেয়ে বড় হত।"[৫] প্রয়োগক্ষেত্রে ভারতের মুসলিম শাসকদের দ্বারা প্রণীত বহু জাওয়াবিৎ রাষ্ট্রের উপর ইসলামিক শরিয়তের প্রভাবকে লঘু করে দিত। পঞ্চদশ শতকে কাশ্মীরের জয়নুল আবেদীন গোহত্যা নিষেধ করে যে জাবিতা প্রণয়ণ করেন[৬] এবং যা শুধু আকবরের শাসনকালে[৭] নয়, এমন কি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনকালেও সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে বলবৎ ছিল[৮], এই ধরণের জাওয়াবিতের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে সেটির কথা বলা যায়। এ কথা বোঝা দরকার যে মুঘল সাম্রাজ্যে গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা, এবং পবিত্র বলে মনে করা হত এমন অন্যান্য প্রাণীহত্যার উপরও নিষেধাজ্ঞা, কেবল হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদিচ্ছার ইশারাজ্ঞাপক পদক্ষেপ ছিল না। এই জাওয়াবিতগুলির সঙ্গে ছিল কড়া শাস্তির ব্যবস্থা। গোহত্যা বা ময়ূর বধের দায়ে অভিযুক্ত মুসলিমদের যে সরকারী কর্তৃপক্ষ শাস্তি দিয়েছে, এমন ঘটনা নথিভুক্ত আছে। এটা স্পষ্টতই শরিয়তের মর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা।[৯]

রাষ্ট্রের কর্তব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বারাণী স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরেন যে "প্রশাসনিক জীবনে স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল প্রত্যেককে নিজের যথাযথ কাজের ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখা, কারণ তা হলে দেশের প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থার উন্নতি হয়।" তাঁর মতে, "যখন একটি পেশাভুক্ত ব্যক্তিগণ মুনাফার প্রেরণায় অপর একটিকে গ্রহণ করেন, তখন (রাষ্ট্রের) জীবন স্থিতিশীল থাকে না।" ফতোয়া-ই-জাহান্দারীর এক জায়গায় তিনি জনগণের পেশা অনুসারে সমাজে বুদ্ধিজীবি, যোদ্ধা ও কারিগর, এই তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করতে বলেন। আরেক জায়গায় তিনি ছ'টি পেশাগত গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন : যোদ্ধা, কৃষিজীবি, ফাটকাবাজ, দোকানদার, ব্যবসায়ী এবং রাজকর্মচারী। এই গোষ্ঠীগুলির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বারংবার বলেন যে সমাজের ভালর জন্যই এদের পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে।[১০] এই যে গোষ্ঠীগুলিকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, তারা হল জন্মের ভিত্তিতে মানুষের

যে দুটি বড় ভাগ তিনি দেখিয়েছেন, সেই স্ফাজিল ও আরাজিলের মধ্যে বিভাজনের পর। মানুষের জন্ম ও পূর্বপুরুষ অনুযায়ী বিভাজন কোরাণোত্তর পর্বের ইসলামিক সমাজে নতুন বিভাজন নয়। যে সব মুসলিম তাত্ত্বিকরা আব্বাসিদদের পরবর্তীকালের তুর্কী আধিপত্যাধীন রাষ্ট্রগুলির কার্যপদ্ধতিকে ভিত্তি করে সাধারণীকরণ করেছেন, এই বিভাজন তাঁদের রচনায় কেন্দ্রীয় বলে স্বীকৃত পেয়েছে।[১১] কিন্তু সমাজ তিনটি বা ততোধিক পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত, এবং এক পেশা থেকে আরেকটিতে যেতে না দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে তাদের মধ্যে ভারসাম্য রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে, এই তত্ত্ব গ্রহণ করে বারাণীর রাষ্ট্রতত্ত্ব গোড়ার দিকের মুসলিম তাত্ত্বিকদের স্বীকৃত অবস্থান থেকে সরে গেছে। এদিক থেকে তিনি যেন কৌটিল্য, নারদ প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় লেখকদের সুপরিচিত নির্দেশের অনুবর্তী, যে শাসকের কর্তব্য হল কোন ব্যক্তিকে তার বর্ণ বা জাতির নিয়মের বাইরে পদক্ষেপ করতে না দেওয়া।[১২]

সার্বভৌমিকতার সমস্যা প্রসঙ্গে আবুল ফজলের মন্তব্যগুলির গভীর অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে দিল্লীর সুলতানতন্ত্রের জন্ম থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রক্রিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি সার্বভৌমিকতার নতুন যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখার রীতিকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয়। আইন-ই মঞ্জীল আবাদীতে (যাকে ব্লকম্যান অসতর্কভাবে অনুবাদ করেছিলেন "আইন-ই, দ্য হাউসহোল্ড") আবুল ফজল রাজশক্তির সংজ্ঞা দেন নিম্নরূপ ঃ "ঈশ্বর নিঃসৃত একটি আলোক, ফারর-ই ইজাদী, যা ঈশ্বর রাজাদের কাছে কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতা ব্যতীতই প্রদান করেন।" "ফারর-ই ইজাদী অবগত হওয়ার ফলশ্রুতি" হিসেবে অন্যতম সদগুণ হত এই, যে রাজা সর্বদাই "ধর্মীয় গোষ্ঠীগত পার্থক্যের" উর্ধ্বে থাকবেন। ধর্ম বা অন্য যে কোনো রকম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে প্রভেদ না করে, তাঁর সমস্ত প্রজাকেই তিনি সমানভাবে রক্ষা করবেন ও বদান্যতা দেখাবেন।[১৩] সার্বভৌমিকতার এই নতুন তত্ত্বের কাঠামোর ভিতরে জিম্মিদের উপর নির্দিষ্ট কতকগুলি ধরনের বাধানিষেধ চাপিয়ে দেয় যে ধারাগুলি, সেগুলির কোনো স্থান ছিল না। এই তত্ত্ব রাষ্ট্রকে বিশেষ কোনো একটি ধর্মের প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হতেও দেয় না। বরং অন্যদিকে, আবুল ফজল কর্তৃক লিপিবদ্ধ সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা তাঁর রাজ্যে সার্বজনীন মিলনসাধন (সুলহ্-ই কুল) করতে বাধ্য ছিলেন। আইন-ই আকবরীর তৃতীয় খণ্ডে, আহ্ওয়াল-ই হিন্দুস্তান শীর্ষক একটি আলোকদায়ক অংশে ভারতীয় সমাজে দৃশ্যমান "ভুল বোঝাবুঝি" ও "বিবাদসমূহের কারণ ব্যাখ্যাকালে তিনি আকারে ইঙ্গিতে বোঝান যে

ধর্মীয় নিপীড়ন, অন্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন অনুসরণ করা (ওয়ারজিদান-ই তুন্দ বাদ-ই তাগলিদওয়া আফসুরদান-ই চিরাঘ-ই খিরাদ) এবং জনগণের পক্ষে একে অপরের পথ বা ধর্মকে ভাষাগত প্রাচীরের ফলে বুঝতে না পারা (বেগাঙ্গি-ই জুবানহা ওয়া নাদানীস্তান-ই বাসিচ-হা-ই ইয়েক দিগের) ইত্যাদি নেতিবাচক উপাদানগুলি, যা সামাজিক সংঘর্ষে অংশ নেয়, সেগুলিকে যে সারানো যায় না তার কারণ প্রধানত রাজাদের উদাসীনতা।[১৪] এই অংশটি থেকে নির্ভুলভাবে বেরিয়ে আসে যা আবুল ফজলের মতে, হিন্দুস্তানে যে রাজা সুল্‌হ্‌-ই-কুল প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহী, তাঁকে সর্বাগ্রে আবুল ফজল উল্লিখিত সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণসমূহ অপসারণ করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তা হল, জনগণকে বিভিন্ন ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করানো, এবং তার জন্য, যাঁরা সমাজের বাছাই করা অংশ, তাঁরা যাতে পরিচিত একটি ভাষায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলি পড়তে ও বুঝতে পারেন, তা সম্ভব করে তোলা। এই অনুচ্ছেদটি পড়তে পড়তে সমস্ত প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্মগ্রন্থগুলিকে পারসিক ভাষায় অনুবাদ করাবার জন্য আকবরের প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, ধর্মীয় বিদ্বেষ কাটানোর এই মনোরম প্রতিবিধানের দিকে পদক্ষেপ হিসেবেই ঐ অনুবাদ প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল।

এটা দেখার মত, যে সার্বভৌমিকতাকে ফারর-ই ইজাদী রূপে প্রতিপন্ন করার তত্ত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধভুক্ত করা গিয়েছিল কেবল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন আকবরের রাজপুত নীতির ফলে রাজার সেনাধ্যক্ষদের গঠন উল্লেখযোগ্যরকম পরিবর্তিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে রাজপুত দলপতিরা উচ্চ মনসবদারদের ২২.৫% স্থান দখল করেছিলেন, ও তাঁদের শক্তি ক্রমশ বাড়ছিল।[১৫] একথা স্পষ্ট যে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহযোগে এই তত্ত্বের উত্থান, (যার প্রতিফলন ঘটেছে আইন-ই-আকবরীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবুল ফজলের মন্তব্যসমূহে) কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রে উচ্চপদস্থ সেনাপতিমণ্ডলীর গঠনের উপরিউল্লিখিত রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সম্ভবত এই তত্ত্ব এমন এক শাসকশ্রেণীর কৃষ্টিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের জানান দিচ্ছিল, যে শ্রেণীর মধ্যে রাজপুত দলপতিদের গুরুত্ব মোট উদ্বৃত্তের অংশ লাভ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ব্যবহার উভয় দিক থেকেই স্থিরভাবে বাড়ছিল।

কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখা ভাল, যে ফারর-ই ইজাদী তত্ত্ব আবুল ফজলের নিজস্ব অবদান ছিল না। বাস্তবে, সার্বভৌমিকতার এই নতুন এবং স্পষ্টতই অ-ইসলামিক চেতনা আকবর সিংহাসনে আসীন হওয়ার আগে থেকেই মুঘল রাষ্ট্রনীতিতে উপস্থিত ছিল। হুমায়ুন নাকি জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার অনুষ্ঠানের

জন্য বিশদ আচারাদি গ্রহণ করেছিলেন। রফিউদ্দিন ইব্রাহিম শিবাজীর বক্তব্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান জালওয়া-ই কুদ্‌স ("দেবত্বের প্রকাশ") নামে পরিচিত ছিল। বোঝা যায়, রাজাকে ঐশ্বরিক মহিমায় অঙ্কিত করার প্রচেষ্টা ছিল। বস্তুত, নিষ্ঠাবান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা এই প্রথা চালু করার জন্য তাঁকে দৈব প্রতিষ্ঠা অবলম্বনের প্রচেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করেন।[১৬] সম্ভবত এই ধরনের কোনো সন্দেহবশঃতই শাহ তমাস্‌প তুরস্কের সুলতান সেলিমকে রচিত একটি পত্রে হুমায়ূনকে শরিয়ত খারিজ করার জন্য সমালোচনা করেন।[১৭] এ থেকে মনে করা উচিত যে ফারর-ই ইজাদী তত্ত্বের অন্তর্নিহিত শাসক শ্রেণীর নতুন কৃষ্টিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্য হুমায়ূন সিংহাসনে আসার মধ্যেই মাথা তুলেছিল, এবং সম্ভবত তা ছিল পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীকাল জুড়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হিন্দু নেতাদের দিল্লীর সুলতানতন্ত্রের প্রশাসনে প্রবেশ করার ফল।

যে সমস্ত রাজরা দৃশ্যমানভাবে অসহিষ্ণু ধর্মীয় নীতির অনুবর্তী ছিলেন, তাঁদের শাসনকালেও রাষ্ট্রের সাধারণ কার্যপদ্ধতি যে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোটামুটিভাবে সুলহ্‌-ই কুল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, এই স্ববিরোধী ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করতে হলেও শাসকশ্রেণীর পরিবর্তমান কৃষ্টিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্যের এবং তৎসংলগ্ন রাজপুত দলপতিদের গুরুত্বের বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার উল্লেখ করতে হবে। এই দাবীর সমর্থনে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শাহজাহানের শাসনের গোড়ার দিকে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষেধ করা নির্দেশ বলবৎ থাকা[১৮] বা আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও ১৬৭৯ পর্যন্ত জিজিয়া কর স্থগিত থাকা,[১৯] অথবা আওরঙ্গজেবের শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন তিনি অন্যক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু আচরণ গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে মুঘল রাষ্ট্রের সামরিক চাকরীতে হঠাৎ করে অনেক বেশী অ-মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া।[২০] আবুল ফজল কর্তৃক নিবন্ধভুক্ত সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূলনীতিগুলি যে মুঘল রাষ্ট্রনীতিতে স্থায়ীভাবে স্থান পেয়েছিল, তা আরো প্রমাণিত হয় আখাম-ই আলমগীরীতে সংরক্ষিত আওরঙ্গজেবের পত্রাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন উক্তি থেকে। মুঘল রাষ্ট্রের জীবনে শরিয়তের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব তাঁর এক সেনাধ্যক্ষকে লেখেন "ধর্মের সঙ্গে ঐহিক জীবনের কি সম্পর্ক আছে? আর ধর্মের বিষয়ে ধর্মান্ধতা কেন প্রবেশ করবে? আপনার জন্য আপনার ধর্ম আছে, আর আমার জন্য আমারটা (লাকুম দিনকুম ওয়া লিদিন)। যদি সমস্ত আইন মানা হত তবে সমস্ত রাজপুতদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা আবশ্যক হত।" আর একটি চিঠিতে তিনি ঘোষণা করেন, "কারো ধর্ম নিয়ে আমাদের কি চিন্তা থাকতে পারে? যীশুকে তাঁর ধর্ম অনুসরণ করতে দাও, আর মোসেস্‌কে তাঁর নিজের ধর্ম।"

আবুল ফজল কর্তৃক নিবন্ধভুক্ত রাষ্ট্রতত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তিনি যেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিত্বকে ন্যায়সঙ্গত বলে ব্যাখ্যা করার জন্য শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তির উল্লেখ করেন। আবুল ফজল আইন-ই আকবরীতে বেওয়া-ই রোসি ("জীবিকার উপায় রক্ষা") শীর্ষক অংশে লিখেছেন, "যেহেতু মানবচরিত্রে অগণিত বৈচিত্র্য আছে এবং প্রতিদিন আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিক্ষেপ বৃদ্ধি পায়, এবং মদমত্ত লালসা দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, এবং চিন্তাহীন ক্রোধ তার লাগাম ছিঁড়ে ফেলে, যেখানে এই অসম্মানজনক পিশাচ পীড়িত শূন্যতায় বন্ধুত্ব দুর্লভ, এবং ন্যায়বিচার দৃষ্টির অগোচর, সেই প্রকার অনিশ্চিতির জগতের জন্য প্রকৃতপক্ষে স্বৈরতন্ত্র ব্যতীত কোনো প্রতিষেধক নেই। আর প্রশাসনে এই দাওয়াই অর্জন করা যায় কেবল ন্যায়বান রাজাদের মহিমার মধ্যে। যদি একজন বিচক্ষণ শাসকের আশা ও ভীতির অনুমোদন ব্যতীত একটি গৃহ বা এলাকার প্রশাসন সম্ভব না হয়, তবে এই বিশ্বজোড়া ভীমরুলের চাকের গোলযোগকে সর্বশক্তিধর ক্ষমতার উপশাসকের কর্তৃত্ব ছাড়া কিভাবেই নিস্তব্ধ করা যাবে? কোনো কোনো নির্জনবাসী মনে করেছে যে তা দৈব প্রক্রিয়ায় সম্ভব। কিন্তু কি করে এরকম ক্ষেত্রে জনগণের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম রক্ষা করা যাবে? সার্বভৌম রাজার সাহায্য ছাড়া একটি সুশৃংখল প্রশাসন চালু করা কখনোই সম্ভব হয় নি।" তিনি আরো বলেন যে "সার্বভৌমিকতার পাওনা (পারাঞ্জ-ই জাহানবাণী) এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জীবনধারণের উপাদানের আবর্তন নির্ভর করছে বিচক্ষণ শাসকের ন্যায়বিচার ও বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ প্রজাদের ন্যায়পরায়ণতার উপর।"[২১]

এম. আথার আলি সঙ্গতভাবে মন্তব্য করেছেন যে আবুল ফজল যে কথা বলে রেওয়া-ই রোজির বর্ণনা করেন তা হবসের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব মনে করিয়ে দেয়।[২২] কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে রাজা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্য পালন করার জন্য মূল্য পাওয়ার অধিকার অর্জন করা হয়ত প্রাচীন ভারতের তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে ধার করা তত্ত্ব। নারদ যেখানে ব্যাখ্যা করেন যে কৃষিপণ্যে রাজার ভাগ হল জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাঁর 'বেতন', সেখানে যেমন এই চিন্তা খুব স্পষ্টভাবে উপস্থিত। ইউ. এন. ঘোষালের মতে এই চিন্তা বৌদ্ধ লেখকদের রচনায় আরো দৃঢ়ভাবে উপস্থিত। একথা প্রমাণিত হয় আর্যদেবের চতুহস্তকতে একটি অনুচ্ছেদে, যেখানে রাজার সঙ্গে এক কাল্পনিক আলোচনাকালে লেখক বলে ওঠেন : "তুমি কি করে গর্ববোধ কর—তুমি, যে নিছক ব্যাপক জনতার দাস (গণদাস); যার খাদ্য জোটে এক-ষষ্ঠাংশ (প্রজাদের খাদ্য শস্যের) ভাগ মাত্র?"[২৩]

ভূমিকর রাজার 'বেতন', এই প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বটিকে খুব উপর উপর দেখলেও এর সঙ্গে আবুল ফজলের "পারাঞ্জ-ই জাহানবাণী" তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। একই ভাবে, বলা যায় যে আবুল ফজল সমাজকে যে চারটি পেশাদার গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিলেন, (যোদ্ধা, কারিগর ও ব্যবসায়ী, শিক্ষিত, এবং কৃষক ও শ্রমজীবি,) এবং তাঁর নির্দেশ, যে "রাজার পক্ষে তাদের প্রত্যেককে যথাযথ স্থানে রাখা বাধ্যতামূলক",[২৪] এবং প্রাচীন ভারতীয় তাত্ত্বিকদের সৃষ্ট রাজকীয় কর্তব্য, অর্থাৎ বর্ণধর্ম বলবৎ রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই পর্যন্ত এসে এমনকি সাহস করে বলা যায় যে আবুল ফজল যে তাঁর সার্বভৌমিকতা তত্ত্বে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে অনেক উপাদান মিশ্রণ করছিলেন, তা একটি নিঃসঙ্গ বা আকস্মিক ঘটনা ছিল না। তা ছিল, মুসলিম শাসক গোষ্ঠীসমূহের প্রাধান্যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে লোককথা এবং প্রাচীন ভারতের জ্ঞানী তাত্ত্বিকদের রচনায় প্রাপ্য রাষ্ট্রবিদ্যা ও সার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত বহু অভিজ্ঞান ও তত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামজস্যপূর্ণ। খুবই মুসলিম আধিপত্যাধীন একটি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রেও এই ধরনের প্রথা ও তত্ত্ব কিভাবে মাথা তুলত তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায় ইসলাম শাহ্ শূরের রাজত্বকালে চালু করা হয়েছিল এমন একটি প্রথার উল্লেখ করে। বাদাউনীর রচনা অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রদেশে উচ্চপদস্থ অভিজাতকের প্রতি সপ্তাহে রাজার "জুতো ও তৃণ"কে সম্মান প্রদর্শন করতে হত। তাঁদের ঐগুলি দেওয়া হত রাজশক্তির দৈহিক উপস্থিতির প্রতীক রূপে।[২৫] এই প্রথা যে চিন্তার প্রয়োগ, তা হল, যে রাজা শাসন করছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোনো বস্তু রাজশক্তির সংযুক্ত সম্মান ও কর্তৃত্বের অংশীদার বলে মনে করা উচিত, এবং সেটিকে তাঁর দৈহিক উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে দেখা যায়। এই চিন্তা সম্পূর্ণভাবে ইসলামিক তত্ত্ব বহির্ভূত। অন্যদিকে, এর সঙ্গে রামায়ণে উপস্থিত চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই রকম আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় সৈয়দ বংশ শাসিত বঙ্গরাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে বাবরের মন্তব্য থেকে। তিনি লিখেছেন, "বঙ্গদেশের একটি বিস্ময়কর প্রথা হল যে পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার বিরল। রাজকীয় পদটি স্থায়ী—এবং বাঙালীরা রাজপদটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে—বাঙালীরা বলে, আমরা সিংহাসনের প্রতি বিশ্বস্ত, যিনি সিংহাসনে আসীন, আমরা তাঁকেই অনুগতভাবে মেনে চলি।"[২৬] একটি বস্তুকে, একটি সিংহাসনকে রাজকীয় শক্তিতে বিভূষিত করার এই চিন্তাকে যে বাবর বিস্ময়কর মনে করবেন তা বোধগম্য। ভারতের বাইরে ইসলামিক ঐতিহ্যে তার কোনো ন্যায়সঙ্গত স্থান নেই। কিন্তু বাবরের এই বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে হিন্দু লোকবিশ্বাস

থেকে ধার নেওয়া এই তত্ত্বটি ক্রমে ক্রমে মুসলিম বংশ শাসিত রাষ্ট্রগুলিতেও গৃহীত হচ্ছিল। বাঙালীরা রাজার প্রতি অনুগত হওয়ায় পরিবর্তে সিংহাসনের প্রতি অনুগত হওযার বাবর উল্লিখিত ঘটনা সিংহাসন বাত্তসির গল্পগুলির প্রারম্ভের ক্ষুদ্র কাহিনীটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, যাতে বলা হয়েছিল যে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন যে ঢিপির নীচে ছিল, সেই ঢিপিতে সে বসত সেই তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও ন্যায়পরাণতা, এই দুটি রাজকীয় ক্ষমতা অর্জন করত।[২৭]

তবে একথা অনস্বীকার্য যে দিল্লীর সুলতানতন্ত্র ও মুঘল সাম্রাজ্য, উভয় রাষ্ট্রেই দেশের অধিকাংশ এলাকায় শরিয়ত সার্বজনীন দেওয়ানী আইন রূপে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একদিকে রাষ্ট্রের পরিচালক নীতি হিসাবে শরিয়তের ব্যবহার এবং অন্যদিকে সামান্য সংস্করণসহ দেওয়ানী মামলায় ন্যায় বিচারের পদ্ধতিতে সুশৃংখল করার জন্য শরিয়তকে কিছু আইনের সমাবেশ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করতে হবে। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলিকে শরিয়ত বলবৎ করার প্রসঙ্গে বাস্তবে একটি দ্বিমুখী বিকাশ দেখা যায়। একদিকে, সাধারণ প্রবণতা ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ব্যবহারের সঙ্গে হিন্দু দলপতিদের সক্রিয় সংযোগের অননুমোদনকারী ধারাগুলিকে অগ্রাহ্য করা বা পরিবর্তন করা। অন্যদিকে, একইসঙ্গে হিন্দু নেতাদের এক বড় অংশ সহ শাসক শ্রেণীর সবকটি অংশই কার্যত শরিয়তকে একটি ব্যবহারযোগ্য দেওয়ানী আইনব্যবস্থা বলে মেনে নেয়।

সাধারণভাবে একথা স্বীকৃত হয় যে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে ধরে রাখার জন্য শরিয়ত একটি কার্যকর আইনী ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মুঘল সাম্রাজ্যের অ-মুসলিম উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলির কয়েকটিতেও শরিয়ত সাধারণ আইন সংহিতারূপে ব্যবহৃত হত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিতে কাজীর আদালত ছিল, এবং ঐ আদালত কেবল মুসলিমদের নয়, অ-মুসলিমদের মামলারও বিচার করত।[২৮] এ থেকে মনে করা যেতে পারে, যে হয়ত মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির আপাতঃভাবে "ধর্মীয় শাসন" সংক্রান্ত বৈচিত্রগুলিও ভারতীয় ঐতিহ্যের থেকে ততটা দূরবর্তী ছিল না, যতটা অনেক সময়ে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে শাহ নওয়াজ খানের একটি উক্তির করা মনে করা যেতে পারে, যে কাজীদের "পথপ্রদর্শন করে দেশপাণ্ডেদের নথি আর জমিদারদের মুখের কথা।"[২৯] এই উক্তি দেখায়, মুঘল শাসনে শরিয়তের ক্রিয়ামূলক প্রবণতা কি ছিল, যার ফলে তা অ-মুসলিম নেতাদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথের মতে "আইন প্রণয়ন করে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করা যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে", এই "বিপ্লবী নীতি" ভারতে প্রবর্তন করার কৃতিত্ব

ইংরেজদের। তিনি সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ ছিল হিন্দুধর্মের একটি প্রবণতা, যে তার সমস্যাবলী সমাধান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু তিনি যখন দৃঢ়ভাবে বলেন যে "সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে আইন প্রণয়নের অধিকার সর্বপ্রথম বৃটিশ যুগে কায়েম করা হয়েছিল", তখন তিনি খুব শক্তি জমিতে দাঁড়িয়ে নেই। স্মিথের অনুমান, যে প্রাক্-বৃটিশ শাসকদের কোনো "আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতা" ছিল না, সমপরিমাণে অ-গ্রহণযোগ্য।[৩০] বস্তুত, মধ্যযুগের ভারতীয় শাসকরা হিন্দু এবং মুসলিমদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথার সংস্কারের জন্য জাওয়াবিত সৃষ্টি করার প্রমাণের প্রায় শেষ নেই। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলি যে সময়ে মুসলিম এবং অ-মুসলিম, উভয়েরই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অংশগ্রহণ করত, তা মনে করার জন্যও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কখনো কখনো মুসলিম শাসকরা বিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতি (caste) বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী মেটানোর জন্যও সালিসি করতেন।

সতীদাহ প্রথা নিয়ন্ত্রণে মুসলিম রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বেশ দ্রুত এসেছিল। ইব্‌ন বতুতার কাছ থেকে জানা গেছে যে তুঘলকদের শাসনকালে কোনো সতীদাহের পরিকল্পনা থাকলে সংশ্লিষ্ট নারীর আত্মীয়রা আইনত স্থানীয় শিকদারকে খবর পাঠাতে বাধ্য ছিল, এবং শিকদার তার একজন প্রতিনিধিকে ঘটনাস্থলে পাঠাত, যাতে বলপ্রয়োগ করা না যায়।[৩১] আপাতঃভাবে মনে হয়, গোটা সুলতানী যুগেই এই ধরনের আইন বলবৎ ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই আইন কতটা প্রয়োগ করা হত তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আকবর যখন বিবাহ পূর্ণ নিষ্পাদিত হয় নি এমন তরুণী বিধবাদের দাহ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন,[৩২] তখন তিনি অন্তত তুঘলক আমল থেকে বিদ্যমান একটি জাবিতার সম্প্রসারণ করছিলেন মাত্র। এইরকম একটি আইন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এমনকি, আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও বিধবাদের সতীদাহে বলপ্রয়োগের অভিযোগে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ঘটনার কথা জানা যায়।[৩৩] হিন্দু ধর্মের উপর মুসলিম রাষ্ট্রের "হস্তক্ষেপের" এই দিকটি জিজিয়া কর চাপিয়ে দেওয়া বা পৌত্তলিকতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার মত পদক্ষেপের সঙ্গে মূলতভাবে ভিন্ন ছিল। সতীদাহ বিরোধী আইনটির চরিত্র ছিল সংস্কারবাদী, এবং এর পিছনে হিন্দুদের অপমান করার বা ইসলাম ধর্মান্তকরণের কোনো বাসনা ছিল না। আরো মনে হয় যে অন্তত দোয়াব অঞ্চলে, যেখানে প্রশাসন বেশী দক্ষ ছিল, যেখানে রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।[৩৪]

ভারতীয় ইসলাম প্রসঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের সংস্কারবাদী আগ্রহ আরো বেশী ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ প্রবণতা ছিল কোরাণ ও সুন্নাহের গোঁড়া ব্যাখ্যার অগোচর

সমস্ত আচার ব্যবহার দমন করা। ভারতে সাধারণ মানুষের ইসলাম ধর্মের চিরদিনই একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। তা হল, কবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, উরস ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণ, এবং অনেকগুলি পূজাপদ্ধতি, আচার ও সামাজিক প্রথার চল। গোঁড়া মুসলিমরা চিরকাল এগুলিকে অপছন্দ করতেন। উলেমা সবসময়ই রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই ধরণের বিদাত অপসারণের চেষ্টা করতেন। ফিরোজ তুঘলক তাঁর স্মৃতিচারণে যে পদক্ষেপগুলি বিবৃত করেন,(৩৫) এবং আওরঙ্গজেব সঙ্গীত ও আমোদপ্রমোদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন,(৩৬) তা একই শ্রেণীভুক্ত। কখনো কখনো, শরিয়তের নীতি খণ্ডনকারী কিছু জাওয়াবিতও বলপ্রয়োগ করে চাপিয়ে দেওয়া হত। মুসলিম সামাজিক রীতিকে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে আকবর প্রণীত কিছু জাওয়াবিত, যথা বাল্যবিবাহ, নিকটাত্মীয়দের বিবাহ ইত্যাদির প্রতি অননুমোদনপূর্বক বাধা প্রকাশ করা,(৩৭) বা কমবয়স্ক ছেলেদের সুন্নৎ করা, অনেক ক্ষেত্রে শরিয়তের ধারার বিরোধী ছিল। বস্তুত, আকবর প্রায় বহুবিবাহ নিষেধ করার কাছে এসেছিলেন। তিনি এর ব্যতিক্রম করতে রাজী ছিলেন কেবল স্ত্রী উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে ব্যর্থ হলে।(৩৮) গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছুদিনে কোনো ধরনের প্রাণীহত্যা নিষেধমূলক নিয়মাবলী ছিল একই রকম জাওয়াবিত যা আকবরের পরও বেশ কিছুকাল বলবৎ ছিল।(৩৯)

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় মুসলিম রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সর্বপ্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় তুঘলক আমল থেকে। ১৩৮৫ বিক্রম (১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ) সালের একটি লিপি, যা মধ্যপ্রদেশের বাতিহাগড়ে পাওয়া গেছে, তা মুহম্মদ বিন তুঘলকের নির্দেশে গো-মঠ নির্মাণের কথা জানায়। লিপিটির বক্তব্য অনুযায়ী নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেছিলেন খাজা জালালুদ্দিন, যিনি তাঁর কর্মচারী ধানৌকে প্রতিষ্ঠানটির একজন প্রশাসকরূপে নিয়োগ করেন।(৪০) সমসাময়িক একটি জৈন রচনা অনুযায়ী মুহম্মদ বিন তুঘলক শত্রুঞ্জয় মন্দির পরিদর্শন করেন এবং "জৈন সংঘের একজন নেতার উপযোগী আরাধনামূলক কাজ করেন"।(৪১) এই প্রমাণ দেখায় যে অবস্থাটা ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনের গোড়ার দিকের মত। আপাতঃভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ "প্যাগোডার অপবিত্র ও সম্মানহানিকর ধর্মোপাসনা"(৪২) থেকে সরে রাখতে অসুবিধা বোধ করত। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণকারী প্রাচীন রীতিগুলি মুসলিম রাজবংশগুলির যুগেও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

এই ধরণের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় মুঘল যুগের তথ্যপ্রমাণ থেকে। গোঁড়ামির সঙ্গে ১৫৭৯ সালে তাঁর বিচ্ছেদের পর, তাঁর প্রজাদের বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে

একমাত্র বিচারক যে তিনি, আকবর নিজের এই ভাবমূর্তি প্রক্ষেপ করতে খুব সচেষ্ট ছিলেন।[৪৩] হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আকবর এমন কতকগুলি কর্তব্য গ্রহণ করেছিলেন যা ভারতে মুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ছিল। কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী একটি জাতির মধ্যে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীদের আপেক্ষিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি রায় দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রদেশের ব্রাহ্মণরা সগর্বে বলেন যে আকবর তাদের সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে "সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ" ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছিলেন।[৪৪]

"হিন্দুস্তানের একেশ্বরবাদীদের, এবং বিশেষত কাশ্মীর প্রদেশে বসবাসকারী তাঁর উপাসকদের হৃদয়কে একত্রে বন্ধন করার উদ্দেশ্যে" কাশ্মীরে একটি মন্দির স্থাপনের জন্যও আকবরকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়।[৪৫] এই মন্দিরের জন্য আবুল ফজল যে পারসিক লিপি রচনা করেন তার আঙ্গিক এবং তার বিষয়বস্তু, উভয়েই অশোকের লিপিগুলির কথা পাঠকের স্মরণে আনে। ১৫৬৬ সালে, যখন আকবর গোঁড়া উলেমার প্রভাবাধীন ছিলেন, তখনকার একটি তথ্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের মুঘল কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণের ছবি তুলে ধরে। ঐ বছর তিনি যখন পাঞ্জাব থেকে ফিরছিলেন তখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী যোগী ও সন্ন্যাসীদের প্রধানরা তাঁর কাছে আসেন। তাঁদের মধ্যে বিতর্কের বিষয়বস্তু কুরুক্ষেত্রের প্রধান মন্দিরের কাছে একটি স্থানে, যেখান থেকে ভিক্ষালব্ধ আয় বেশী হত, সেখানে কোন গোষ্ঠীর অধিকার থাকবে। আকবর মনে করেছিলেন যে সন্ন্যাসীদের দাবীর অধিকতর যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু তিনি কোনো রায় দেওয়া থেকে বিরত থাকেন কারণ উভয় গোষ্ঠীই আসলে চেয়েছিল যে তাদের মধ্যে একটি লড়াইয়ে তিনি যেন রেফারীর ভূমিকা পালন করেন। এটা নাকি এরকম বিবাদ মেটাবার পরীক্ষিত পদ্ধতি ছিল। যে লড়াই শুরু হয় তাতে সন্ন্যাসীরা সংখ্যায় কম থাকলেও ভিক্ষুকের বেশধারী রাজকীয় যোদ্ধাদের সাহায্যে তাঁরা যোগীদের বিতাড়িত করেন।[৪৬] মুঘল রাষ্ট্রের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আকবরের মৃত্যুর পরেও বহুদিন থেকে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আকবরের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে যান। একটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর এক রাজপুত্র সেনাধ্যক্ষ সৃষ্ট একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তির সৌন্দর্যবোধ প্রসঙ্গে বিচারকের ভূমিকা পালন করেন ও মূর্তিটি সরিয়ে দেন।[৪৭]

এ ধরণের বৈশিষ্ট্য কেবল মুসলিম আধিপত্যাধীন রাষ্ট্রগুলিতে আবদ্ধ ছিল না। হিন্দু রাষ্ট্রগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আরো প্রকটভাবে দেখা যেত। হিন্দু শাসকরা হিন্দু ধর্মের প্রতি যে ধরণের তদারকীর ভূমিকা পালন করতেন, ভারতীয় ইসলামের

প্রতিও অনুরূপ ভূমিকা পালন করার প্রবণতা দেখান। এই প্রবণতার একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হল শাহ রুখ মীর্জার প্রতি কালিকটের রাজার পত্র, যাতে তিনি কালিকটের মসজিদগুলির শুক্রবারের ধর্মোপদেশে তাঁর নাম উল্লিখিত হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন।[৪৮] একই পর্যায়ে পড়বে মসজিদ ও অন্যান্য মুসলিম প্রতিষ্ঠান যেগুলি স্বরাজ এলাকার মধ্যে পড়ত সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মারাঠা রাষ্ট্রের অর্থদানের নীতি।[৪৯]

এই আলোচনা শেষ করতে গিয়ে আমি ব্যাখ্যা করতে চাই যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির "ধর্মনিরপেক্ষ" বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আমার মন্তব্যের অর্থ এই নয় যে উল্লেখযোগ্য পর্বজুড়ে ধর্মের অসহিষ্ণু ও আক্রমণাত্মক ব্যাখ্যা যে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পেরেছিল তাকে কমিয়ে দেখানো হচ্ছে। কখনো কখনো একটি বিশেষ ধর্ম প্রচারের জন্যও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু সেরকম যুগ ছিল অল্পসংখ্যক, অল্পকালব্যাপী, এবং মধ্যযুগের ভারতে তথ্যকথিত মুসলিম রাজনীতি থেকে তার বিপরীতমুখী প্রবণতাগুলি কখনোই পূর্ণ মাত্রায় অনুপস্থিত ছিল না।

একই সময়ে, এটাও দেখা যাচ্ছে যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র অনেক সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সালিসের ভূমিকা পালন করার প্রবণতা দেখাত। রাষ্ট্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা সংস্কার করারও একটা ঝোঁক দেখায়। সময়ে সময়ে, মধ্যযুগের ভারতে রাষ্ট্র কেবল কর্তৃত্বপূর্ণ গোষ্ঠীদের নয়, বরং কম প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশগ্রহণ করত। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই কয়েকটি দিক থেকে একথা স্বীকার করা উচিত যে ঐ দিক থেকে আধুনিক ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা হল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিকাশমান, সাংস্কৃতিকভাবে বহুধাবিভক্ত, শাসকশ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রবিদ্যা সংক্রান্ত চিন্তার সম্প্রসারণ।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ এম. এন. রায়. র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট, বম্বে, ১৪ মে ১৯৫০, ভি. কে. সিংহ সম্পাদিত সেকুল্যারিস্‌ম ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৮, পৃঃ ১৫৪ তে পুনর্মুদ্রিত; ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট, ১৯৬৩, পৃঃ ২১৬-৩৪; ও সেতলওয়াদ, সেক্যুলারিসম, প্যাটেল মেমোরিয়াল লেকচার, ১৯৬৫ পৃঃ ১৭,২২।

২. নিখিল ভারত কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে (১৯৩১) একটি প্রস্তাব গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম এমন একটি রাষ্ট্রের উল্লেখ করা হয়, যা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সালিসি করতে পারবে।

এই প্রস্তাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় "রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখাবে।" রাধাকৃষ্ণন পরে এই চিন্তার আরও বিকাশ ঘটান এবং বিশেষভাবে বলেন যে একে "সেক্যুলারিস্‌ম বা নাস্তিকতার সঙ্গে" গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ সেতলওয়াদ, সেক্যুলারিসম, পৃঃ ১৭,২২।

৩. বেদান্তের দর্শন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে, রাধাকৃষ্ণনের এই যুক্তির সংক্ষিপ্তসারের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ডোনাল্ড ইউজিন স্মিথ, ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট, পৃঃ ১৪৭।

৪. ইক্‌তিদার আলম খান, 'দ্য সেক্যুলার স্টেট ইন ইণ্ডিয়া; হিস্টোরিক্যাল পারস্পেক্টিভ; এসেস ইন অনার অভ প্রফ. এস. সি. সরকার, পি, পি, এইচ, ১৯৭৬, পৃ ১৬৬।

৫. মুহম্মদ হাবিব, দ্য পলিটিক্যাল থিয়োরী অভ দ্য দিল্লী সুলতানেট, কিতাব মহল, এলাহাবাদ, মুখবন্ধ, পৃঃ ৬।

৬. জয়নুল আবেদীন কর্তৃক গোহত্যা নিষেধ করা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, আবুল ফজল, আইন-ই আকবরী, ২য় খণ্ড, নাভাল কিশোর, পৃঃ ১৮৫।

৭. আবদুল কাদার বাদাউণী, মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ২৬১।

৮. মোগল সাম্রাজ্যের জনৈক অধস্তন কর্মচারী, সুরাট সিং, ১৬৪৪-৪৭-এর মধ্যে রচনা করেন তাজকিরা-ই পীর হাসু তেলি। এই গ্রন্থের পৃঃ৩০বি—৩৭এ পড়লে মনে হয়, পাঞ্জাব অঞ্চলে শাহজাহানের শাসনের মধ্যভাগ পর্যন্ত গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল।

৯. আবদুল কাদার বাদাউনী, মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ, তয় খণ্ড, পৃঃ ১১৮, এবং ট্রাভেলস অভ ফ্রে সেবাস্টিয়ন ম্যানরিক ১৬২৯-১৬৪৩, অনুবাদ, একফোর্ড লুয়ার্ড, ২য় খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৮২৭, পৃঃ ১১৩।

১০. মুহম্মদ হাবিব অ্যাণ্ড আফসার উমর, দ্য পলিটিক্যাল থিয়োরী অভ দ্য দিল্লী সুলতানেট, পৃঃ ৩৮, ৯৭।

১১. নিজামুল মুল্ক, তুসি, শিয়াসৎনামা, তেহরাণ, ১৩৪৮, পৃঃ ২১৬।

১২. আর শ্যামাশাস্ত্রী, কৌটিল্যাস অর্থশাস্ত্র, মহীশূর, ১৯৬৭, পৃঃ ৭, এবং ইউ. এন. ঘোষাল, দ্রঃ দ্য ক্লাসিকাল এজ. আর. সি মজুমদার (সম্পাদিত), ১৯৭০, পৃঃ ৩৪৫।

১৩. আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, এইচ ব্লকম্যান কর্তৃক অনুদিত, পৃঃ ৩-৪।

১৪. আইন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড, নাভাল কিশোর, পৃঃ ৩-৪।

১৫. দ্রষ্টব্য ঃ আথার আলি, মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার আওরঙ্গজেব, ১৯৬৬, পৃঃ ৩১।

১৬. রফিউদ্দিন ইব্রাহিম শিরাজী, তাঝ্‌ কিরাত উল-মুল্‌াক, পাণ্ডুলিপি, বৃটিশ লাইব্রেরী, নং ২৩, ৮৮৩, নবম পরিচ্ছেদ।

১৭. দ্রষ্টব্য ঃ আজিজ আহমদ, স্টাডিস্‌ ইন ইসলামিক কালচার ইন দি ইণ্ডিয়ান এনভায়রনমেন্ট, অক্সফোর্ড, ১৯৬৪, পৃঃ ২৫।

১৮. দ্রষ্টব্য ঃ সুরাট সিং, তাঝকিরা-ই পীর হাসু তেলি, পৃঃ ৩০বি-৩৭এ।

১৯. এস. আর. শর্মা, দ্য রিলিজিয়স পলিসি অভ দ্য মুঘল এম্পারার্স, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় সতীশ চন্দ্র, 'জিজিয়া অ্যাণ্ড দ্য স্টেট ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং সেভেনটিন্‌থ সেঞ্চুরী,' জার্ণাল অভ দি ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অভ দি ওরিয়েন্ট, ১২, পৃঃ ৩২-৪০, যেখানে তিনি খুলাসাত-উস সিয়াক থেকে একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন,

যা থেকে মনে হয় যে আওরঙ্গজেব তাঁর শাসনের শুরুতেই জিজিয়াব পুনরায় প্রচলনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও, "কয়েকটি রাজনৈতিক প্রয়োজনের ফলে বিষয়টি মূলতুবি রাখেন"।

২০. আথার আলির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেখানে ১৬৫৮-৭৮ এর মধ্যে মোট অভিজাতবর্গের মধ্যে অ-মুসলিম অভিজাতরা ছিল ২১.৬%, সেখানে আওরঙ্গজেবের শাসনের শেষ দশকে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩১.৬%-এ। দ্য মুঘল নোবিলিটি আণ্ডার আওরঙ্গজেব, পৃঃ ৩৯।

২১. আইন-ই আকবরী, নাভাল কিশোর, পৃঃ ২০১-২০৫। তুলনীয় জ্যারেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪-৫৫, ৫৮-৫৯।

২২. আথাব আলি, 'থিয়োরীস অভ সভারেনটি ইন ইসলামিক থট ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেস ১৯৮১-র সম্মেলনের বিবরণীতে প্রকাশিত।

২৩. তুলনীয়, ইউ এন. ঘোষাল, দ্রঃ দ্য ক্লাসিকাল এজ, সম্পাদনা আর. সি. মজুমদার, পৃঃ ৩৪৫-৪৬।

২৪. ব্লকম্যান, আইন-ই আকবরী, অনু. পৃঃ ৪।

২৫. মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫।

২৬. বাবরনামা, অনুবাদ, এ. এস. বিভারিজ, পুনর্মুদ্রণ, লণ্ডন ১৯৬৯, পৃঃ ৩৮২-৮৩।

২৭. দ্রষ্টব্য, ফ্র্যাঙ্কলিন ইগারিটন, বিক্রমস্ অ্যাডভেঞ্চাবস, ২ খণ্ড, হারভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ১৯২৬।

২৮. দ্রষ্টব্য, ব্যারণ চার্লস হুগেল, ট্রাভলস্ ইন কাশ্মীর অ্যাণ্ড দ্য পাঞ্জাব, ১৯৭০, পৃঃ ৩১৭, সেখানে উল্লিখিত আছে যে রণজিৎ সিং জেনারেল আভিতাবিলকে লাহোরের কাজী ও প্রশাসক রূপে নিযোগ করেছিলেন।

২৯. মাসির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, কলকাতা, পৃঃ ২৩৯।

৩০. ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট, পৃঃ ২১৬-৩১, ৩০৪।

৩১. ইবন বতুতা—হাবিবুল্লা, ফাউণ্ডেশন অভ মুসলিম রুল ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩২৬-এ উদ্ধৃত। এর সঙ্গে গিবের অনুবাদ তুলনীয় কারণ সেখানে উল্লেখ করা নেই যে সতীদাহের সময়ে শিকদারের প্রতিনিধি থাকার কথা ছিল। ডেনিসন বস অ্যাণ্ড আইলিন পাওয়ার সম্পাদক, ট্রাভলস ইন এশিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকা, লণ্ডন ১৯৬৯, পৃঃ ১৯১-৯২।

৩২. বাদাউনী, মুন্তাখাবত তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৬।

৩৩. রামপুরে রক্ষিত ওয়াগা-ই সরকার রণ থম্ভোর ওয়া আজমীর পুঁথিটিতে এ ধরণের বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে।

৩৪. বৃটিশ শক্তি যতদিনে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার মধ্যেই গঙ্গেয় উপত্যকায় সতীদাহের ঘটনা নগণ্য হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, এর ব্যাপক প্রচলন ছিল বঙ্গদেশ ও রাজপুতনায়। ডোনল্ড ইউজিন স্মিথ, ইণ্ডিয়া অ্যাস এ সেক্যুলার স্টেট, পৃঃ ২১৭।

৩৫. ফুতুজাত-ই ফিরুজ শাহী, সম্পাদক, শেখ আবদুর রশিদ, ১৯৬৪, পৃঃ ৮-৯।

৩৬. খাফি-খান, মুন্তাখাপ উল-লুবাপ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৩-২১৪।

৩৭. আবুল ফজল, আইন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ব্লকম্যান অনুদিত পৃঃ ২৮৭-৮৮।

৩৮. আইন-ই আকবরী, ৩য় খণ্ড, নাভাল কিশোর, পৃঃ ১৯০, এবং জ্যারেট কর্তৃক অনুদিত, জে. এন. সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৪৮, পৃঃ ৪৪৯।

৩৯. মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১, ২০৩, ৩১১-১২। এর সঙ্গে দ্রষ্টব্য তাঝকিরা-ই পীর হাসু তেলি যেখানে অস্পষ্টভাবে বলা আছে যে গোহত্যার উপর নিষেধজ্ঞা জাহাঙ্গীরের শাসনকালেও বলবৎ ছিল।

৪০. হীরালাল, ডেস্ক্রিপ্টিভ লিস্টস অফ ইনস্ক্রিপশনস ইন সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস অ্যাণ্ড বেরার, নাগপুর, ১৯১৬, পৃঃ ৫০, মাহদি হাসান, তুঘলক ডাইনাস্টি, ১৯৬৩, পৃঃ ৩৩৪-৩৫-এ উদ্ধৃত।

৪১ এম. বি. জাভেরী, কম্প্যারেটিভ অ্যাণ্ড ক্রিটিক্যাল স্টাডি অভ মন্ত্রশাস্ত্র, পৃঃ ২৮, মাহদি হাসান, তুঘলক ডাইনাস্টি, পৃঃ ৩২১-এ উদ্ধৃত।

৪২. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য, রমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, 'দ্য স্টেট পেট্রনেজ টু হিন্দু অ্যাণ্ড মুসলিম রিলিজিয়নস বেঙ্গল ঃ পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেসেন্ট, ৫৬শ খণ্ড, জানুয়ারী —জুন, ১৯৩৯, পৃঃ ২৬। এখানে কোম্পানীর মাদ্রাজস্থ সরকারের কাছে কিছু যাজক সহ প্রায় দু'শ বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারী কর্তৃক পেশ করা একটি মেমোর‍্যাণ্ডাম থেকে কিছু অংশ পুনর্মুদ্রিত আছে। এই মেমোর‍্যাণ্ডামটি দ্য কোর্ট অফ ডিরেক্টরস ডেসপ্যাচ, অক্টোবর ১৮৩৭-এ উল্লিখিত আছে।

৪৩. মাজারের আবুল ফজল কৃত সংক্ষিপ্তকরণে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে আকবরকে কেবল গোঁড়া মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে সালিসি দেওয়া হয়নি, বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে সালিসিরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, আকবরনামা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯-৭০। মাজার এর মূল বয়ানের জন্য দ্রষ্টব্য, বাদাউনী, মুন্তাখাবুত তাওয়াবিখ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭১।

৪৪. দেবরাজ চানানা, 'দ্য স্যান্সক্রিটিস্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান সোসাইটি', এনকোয়্যারি, নব পর্যায়, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৪।

৪৫. মুহম্মদ আসকারি হুসেনী, দুরুল মনশুর; ব্লকম্যান, কর্তৃক আইন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, অনুবাদ, পৃঃ LIV-LV তে উদ্ধৃত।

৪৬. আবুল ফজল, আকবরনামা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭; বাদাউনী মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩।

৪৭. সৈয়দ আহমদ খান সম্পাদিত তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী, গাজীপুর ও আলিগড়, ১৮৬৩-৬৪, পৃঃ ১২৪।

৪৮. কামাল আল-দিন আবদুল রাজ্জাক (বৃটিশ লাইব্রেরী, অব ১২৯১, এফ, ২০৪বি) আজিজ আহমেদ, স্টাডিস্ ইন ইসলামিক কালচার ইন দ্য ইণ্ডিয়ান এনভায়রনমেণ্ট, পৃঃ ২০।

৪৯. এ ধরণের অনেক অনুদান ছিল। বিশেষভাবে না খুঁজে এলোমেলো একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায় ১৭৪৬-৪৭ সালের একটি সনদ থেকে। ঐ সনদে কসবা থানার মহাগিরি পাখাড়ি গ্রামে সদ্য নির্মিত একটি মসজিদের চিরাগবাত্তি ও অন্যান্য কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেড় বিঘা জমি দান করা হয়। দ্রষ্টব্য, দ্য পেশওয়াস ডায়েরী, ২য় খণ্ড, দলিল নং ১৭১, পৃঃ ১০১। (এই দলিলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য.আমি ডঃ মহেন্দ্র পাল সিংয়ের কাছে ঋণী।)

নতুন ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাস-বিকৃতি সম্বন্ধে কিছু সতর্কবাণী

এস. নুরুল হাসান

মাননীয় উপাচার্য, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ ঃ

মাননীয় উপাচার্য, প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করার জন্য—যে বিশ্ববিদ্যালয় বহন করছে ইতিহাসের একটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম। আমি একটি কথাই বলতে চাই যে আমার ভরসা আছে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রসিদ্ধ নামের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। একথা বলাই বোধ হয় যথেষ্ট। আমি আমার বন্ধু অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে এসেছি কারণ তার মধ্যদিয়ে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে ইতিহাসের বন্ধুরা আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নি। আমার সঙ্কল্প আছে যে প্রতি বছর আমি অন্ততঃ দুটি করে গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ রচনা করব এবং কলকাতায় আমার অবস্থানকালে আমি সেই সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হতে চাই না। আর তার জন্য অমি প্রেরণা চাইছি এখানে উপস্থিত তরুণ ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে।

মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন তরুণদের কাছ থেকে প্রেরণা না পেলে, সে নতুন করে ভাবতে পারে না। নিয়মিত তরুণ ইতিহাসবিদদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ অমি পাব না। তবে আমি আশা করি যে এইরকম, মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আমি একত্র হতে পারব।

---

* প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন মাননীয় রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ।

* তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬

উদীয়মান প্রজন্মকে অভিবাদন জানাবার পর, মাননীয় উপাচার্য ও সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে, আমি তরুণদের কিছু উপদেশ দিতেও চাই। অবশ্য আমি যখন তরুণ ছিলাম, তখন কেউ উপদেশ দিলে আমি খুবই অপছন্দ করতাম। কিন্তু মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন সে আর কি বা করতে পারে? সবসময়ে তরুণ থাকতে পারবে আমি খুবই খুসী হতাম। মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপাচার্য, আপনারাও তো আমারই সমবয়সী। তাই আশা করি আপনারা আমরা মনোভাবকে সমর্থন করবেন।

আমি আধুনিক যুগের ইতিহাস দিয়েই অলোচনা আরম্ভ করব—সে যুগ সম্বন্ধে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়, আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, আর আমি একান্তভাবেই শিক্ষানবীশ। নিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সমর্থকদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে (তাদের মধ্যে অচেতনভাবে রয়েছেন আমাদের দেশেরও কিছু ইতিহাসবিদ) ইতিহাসবিদের একাংশ তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছেন আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে। যে ভাষাতে এই গবেষকরা তাঁদের বক্তব্য রাখছেন, তা সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কার্যতঃ তাঁরা নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে এবং হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে।

ভারতের নবজাগরণে জাতপাতের ভূমিকার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে একজন গবেষক হিসাব করে দেখিয়েছেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করা ছাত্রদের বেশীরভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীয়। এই তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য কোনও কম্পিউটারের দরকার নেই যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, তিনিই উত্তর দেবেন—তাতো বটেই। ঐ যুগে এছাড়া আর কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে? শিক্ষা তখনও পৌছয়নি সাধারণ মানুষের কাছে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাই তো তখন শিক্ষার আলো পেয়েছিলেন। অন্যরা কি তখন শিক্ষা লাভ করেছিলেন?

নিতান্ত জানা কথারই পুনরুক্তি করেছেন ঐসব ইতিহাসবিদ। তাঁরা বলছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়ার যুগটা ছিল শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী। আমি কি প্রশ্ন করতে পারি যে ঐ যুগে ইংলণ্ডে বা ইউরোপের অন্য কোনও দেশে কোন শ্রমিকশ্রেণী-পন্থী পরাক্রান্ত আন্দোলন ছিল? তথাকথিত "বামপন্থী" বুলি ব্যবহার করে এঁরা ভ্রান্তভাবে অবমূল্যায়ন করছেন জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে। সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করার এটা একটা কৌশল মাত্র। তাই আমি আমার তরুণ ইতিহাসবিদ বন্ধুদের হুঁশিয়ার করে বলতে চাই ঃ সাবধান পা ফেলুন, নইলে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের ফাঁদেই আপনারা

পা দেবেন। সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের শৃঙ্খলে যতদিন ভারতীয় জনগণ আবদ্ধ ছিল, ততদিন তার বাইরে শোষণের রাজত্বের অবসান ঘটানোর প্রশ্নই তাদের কাছে অবান্তর ছিল।

আমার মনে পড়ছে ভারত স্বাধীন হবার ঠিক আগের দিনগুলির কথা, তখন আমি ইংলণ্ডে পড়াশুনো করছি। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন ও রক্ষণশীল ছাত্ররা তখন আমাদের প্রায়ই আক্রমণ করে বলত যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তো তোমাদের দেশের জনসাধারণ ধনিকদের ও জমিদারদের পায়ের নীচে নিষ্পিষ্ট হবে। তার উত্তরে আমরা সাফ জবাব দিতাম ঃ আমাদের দেশেব ধনিক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে আমরাই লড়ব, কিন্তু তার আগে তোমরা ইংরেজরা ভারত ছাড়!

এখন সাম্রাজ্যবাদ নতুন চেহারা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। অনুগ্রহ করে তাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করুন। সাম্রাজ্যবাদের নতুন আদর্শগত অভিযানের একটা কায়দাই হচ্ছে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রদের আত্মবিশ্বাসকে খর্ব করা, দুর্বলতা ও ত্রুটির ওপর জোর দিয়ে তাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা। তরুণ ভারতীয় ইতিহাসবিদদের চেতনায় উগ্র জাতীয়তাবাদকে গজাল মেরে ঢোকানো আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু নানান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেসব ইতিহাস বিকৃতি ঘটাচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমি তাঁদের সজাগ করে দিতে চাই।

আপনাদের বিবেচনার জন্য আমি একটি বক্তব্য রাখছি। আপনাদের অনেকেই ইউরোপের ইতিহাস পড়েছেন এবং পড়াচ্ছেনও। ১৫৫৬-র আউগস্‌বার্গের সন্ধির কথা ধরা যাক—যে সন্ধির মারফৎ দীর্ঘ ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। সেই সন্ধি মারফৎ এই নীতিই মেনে নেওয়া হয় যে রাজার ধর্মই হবে প্রজাদেরও ধর্ম। যে কোনও ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে, এ নীতি একেবারেই স্বীকৃত হয়নি। ১৫৭২-এ প্যারিস শহরে সংঘটিত হয় সেন্ট বার্থালোমিউর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অবশেষে ১৬১০-এ ঘোষিত হয় ন্যান্টেসের বিধানাবলী, যাতে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকৃত হয় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা।

অথচ এই একই সময় আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিচার করুন। ১৫৭২ই হচ্ছে সেই বছর যখন আকবরের রাজত্বে মোল্লাদের প্রশাসনিক আধিপত্যের উচ্ছেদ সাধন শুরু হ'ল। আকবরের মৃত্যুর আগেই ভারত-রাষ্ট্রে স্বীকৃত হয়েছিল ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র এগোচ্ছিল ধর্ম থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করার পথে। যে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা আমাদের দুর্বলতা দেখাতে এত তৎপর,

তাঁরা কেন আকবরের আমলে তাঁদের দেশগুলির কি হাল ছিল, সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন না?

ইউরোপের ইতিহাসে পড়াতে হয় যে প্রাশিয়ার সম্রাট মহামতি ফ্রেডারিক বা নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কতখানি প্রগতিশীল ছিলেন অথবা ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্র কেমন জনকল্যাণকর ছিল। কিন্তু সত্যই কি ফ্রেডারিক বা নেপোলিয়ন শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন? তাঁদের কি আদৌ "প্রগতিবাদী" বলা যায়? আর আমরা কি ভুলে যেতে পারি যে ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল প্যারী কমিউনের ধ্বংসস্তুপের উপর? যেসব বন্ধুরা প্যারি কমিউন সম্বন্ধে মার্কসের লেখা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন যে রক্ত বন্যায় বিধ্বস্ত ঐ পরাজিত বিপ্লবটি কত মহনীয় ছিল! তা'হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের বিপ্লবের সপক্ষে কথা বলবেন, এটা আসা করা কি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক?

ভারতে জাতীয়-চেতনার বিকাশ কোনও সহজ পথে হয়নি, যেমন তা হয়নি পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তেও। ভারত-ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদী বিকৃতি সম্বন্ধে আমাদের তাই খুবই সতর্ক থাকতে হবে। আমরা ভুলে যেতে পারি না যে ১৮১৫তে ভিয়েনা মহাসম্মেলনে রাষ্ট্রপতিরা, বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা পূর্ণ নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত বংশানুক্রিক রাজতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী। আর ১৮৬২তে পামার স্টোন, তাঁর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেন যে তিনটি ব্যক্তি মাত্র বুঝতে পেরেছেন স্লেশউইগ-হলষ্টেইম সমস্যা—একজন উন্মাদ ওলন্দাজ, আইনজীবী, প্রয়াত প্রিন্সন অ্যালবার্ট ও তিনি নিজে, যিনি সব "ভুলে গেছেন"? কি ভুলে গেছেন? আসলে ইউরোপের রাষ্ট্রপতিরা ১৮৬২ তেও জাতীয় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা মানতে রাজী ছিলেন না। আর ভারতীয় নেতারা ঐ যুগেই, তাঁদের সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী তুলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে "অর্থ নিষ্ক্রমণ" (Drain) তত্ত্বটি, তা যে চেহারাতেই আত্মপ্রকাশ করে থাকুক না কেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পরে কি চমৎকারভাবেই নাসেনিন সাম্রাজ্যবাদের মুখোস ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। তরুণ গবেষকদের আমি সযত্নে এইসব লেখা পড়তে অনুরোধ করি, যাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের দুর্বলতা দেখাতে গিয়ে তাঁরা যেন না সাম্রাজ্যবাদকেই ক্ষমার চোখে দেখেন।

শেষ করার আগে, আমি সংক্ষেপে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। এই সমস্যাটি ভূতের মত আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে। কখনও তা দেখা দেয়

ধর্মীয় মৌলবাদের চেহারা নিয়ে, কখনও উগ্র ধার্মিকতার রূপে, কখনও ভাষা বা জাতপাতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আকারে। প্রতিবারই তা দুর্বল করে আমাদের *ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোটিকে।* এরই মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারতকে অস্থিতিশীল করার নানান অপচেষ্টা। আমি আশা করি যে আমাদের তরুণ ইতিহাসবিদরা এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকবেন ও ইতিহাস-বিকৃতিকে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে দেবেন না।

আমি খুবই আনন্দিত যে ইতিহাস রচনার নানা প্রবণতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা চলেছে। আপনাদের রাজ্যে ইতিহাস-চর্চার বহু বিচিত্র ও মূল্যবান উপাদান-সমূহ রয়েছে। আমি আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ও আশা করি আগামী প্রজন্মকে আপনারা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হবেন।

ধন্যবাদ!

ইতিহাসের আলোকে ভারতের জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতার প্রশ্ন

অমলেন্দু গুহ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের এই তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে মুখ্য ভাষণদানের দায়িত্ব আমাব উপরে অর্পিত হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। সংসদের বয়স মাত্র বছর তিনেক। কিন্তু এরই মধ্যে, ইতিহাসচর্চায় এবং ইতিহাসচেতনার ক্ষেত্র বিস্তারে প°বঙ্গে এর অবদান আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসসাধনার ঐতিহ্য এই রাজ্যে অনেককাল ধরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও এখানে এমন একটি সংগঠনের প্রয়োজন ছিল যার মারফৎ ইতিহাস-গবেষকেরা ইতিহাসপ্রেমীদের সংগে মাঝে মাঝে একত্রিত হয়ে বাংলাভাষায় ইতিহাসচর্চার পরিবেশ গড়তে পারেন। সংসদ সেই প্রয়োজনের ফসল।

(১)

আমাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব পরিস্থিতির তথা ভারতের জাতীয় জীবনের এক মেঘাচ্ছন্ন মুহূর্তে। আজকের পৃথিবীর পয়লা নম্বরের সাম্রাজ্যবাদী দেশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা-গরম লড়াই চালিয়েই ক্ষান্ত থাকছে না, মানবজাতির অধিকাংশের ধিক্কার সত্ত্বেও বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ অফ্রিকাকে মদত দিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, মারণাস্ত্রসজ্জা এবং মারণাস্ত্র গবেষণার নেশায় মত্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে সম্ভাব্য এক তৃতীয় মহাযুদ্ধ তথা মহাধ্বংসের দিকেও ঠেলে দিচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে দেশে দেশে এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও, অসংবৃত অস্ত্রসজ্জার চরম বিপদ সম্পর্কে চেতনা এবং বিশ্বশান্তির স্বার্থে

---

* তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬

সোভিয়েট-মার্কিণ অস্ত্রসংবরণ চুক্তি ঘটানোর সপক্ষে আন্দোলন দ্রুত বাড়ছে। জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ চলতে থাকলে, চলতে দিলে, মানবসমাজ হঠাৎ একদিন এই গ্রহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কি না—এই প্রশ্নই এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন।

অপরদিকে, ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও আর এক পর্য্যায়ে দেখা দিয়েছে এক গভীব সংকট। স্বাধীনতার পরে বহুজাতিসম্ভাব্য খণ্ডিত ভারতকে অদূরদর্শী বুর্জোয়া নেতারা সাচ্চা সম্মিলিত রাষ্ট্রের রূপ না দিয়ে দিয়েছিলেন একীকৃত রূপ, যার মধ্যে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের স্বীকৃতি থাকলেও স্বশাসনের পরিসর খুবই সীমিত। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের প্রক্রিয়াটিকেও অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে, এমন কি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন-নির্দেশিত পুনর্গঠনের পরবর্তী অধ্যায়েও। অথচ, বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বর্ধমান পুঁজিবাদী বাজারের ফলশ্রুতি স্বরূপ নানা ভাঙাগড়া ভারতের জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। ছোট-মাঝারি শিল্প, ব্যবসা এবং চাষবাসের সংগে সম্পর্কিত নতুন নতুন উঠতি আঞ্চলিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী জন-সমাবেশের জোরে নিজেদের আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সদাব্যস্ত। ভাষা তো বটেই, এমন কি সুবিধামতো কোথায়ও ধর্ম (পাঞ্জাব), কোথায়ও জাতপাত (হরিয়ানা), কোথায়ও উপজাতিসত্ত্বা (নাগাল্যাণ্ড) আর কোথায়ও বা ভূমিপুত্রত্বের (আসাম) ভিত্তিতে সংকীর্ণ মঞ্চ বানাচ্ছেন। আর তারই ছাঁচে ঢেলে, তাঁরা নতুন করে জাতির সংজ্ঞাও তৈরী করছেন। তারপরে, জাতির নামে ভাই-বেরাদরদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন, ভারতের ভিতরে বা বাইরে স্বরাজ বা গৃহভূমি চাই বলে। শুধু তাই নয়, অঞ্চলভেদে কোনো না কোনো বিশেষ সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট জাতীয় আশা-আকাংখার দুষমণ বলেও চিহ্নিত হচ্ছে।

ভারতীয় বাস্তব পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত এধরণের গোষ্ঠীচেতনাকে সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ, অথবা সাম্প্রদায়িকতা —যে আখ্যাই দেওয়া হোক না কেন তার মর্মবস্তু জাতীর প্রশ্নের সংগে জড়িত। এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ায় শুধু যে ভারতের ঐক্য ও সংহতিই বিপন্ন তা-ই নয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের মূল্যবোধ এবং ভারতীয় শ্রমজীবী জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানেও ফাটল দেখা দিচ্ছে। অসম পুঁজিবাদী বিকাশের চাপে কি উঠতি জাতিগুলি ক্রমে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে? না, শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের রক্তমূল্যে অর্জিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঐক্যের ভিতে দাঁড়িয়ে,

মহাজাতীয় রাষ্ট্রকাঠামোতেই শামিল থেকে, অবশেষে তারা এক মহাজাতিতে লীন হবে?—এই প্রশ্নই বর্তমান ভারতে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন।

মহাযুদ্ধের আশংকার মূলে রয়েছে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, যার অপর নাম সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের শেষ অবস্থা। আর, দেশের সংহতিনাশের আশংকার মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিকতার চাপে অপ-গঠিত. আধা-গঠিত, আধা-পুঁজিবাদী আধা-সামন্তীয় পরিবেশে জাতিবিন্যাসের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির অসম্পূর্ণতা, বিকৃতি এবং জটিলতা। তাই, উপস্থাপিত জ্বলন্ত প্রশ্ন দুটিব প্রেক্ষিতে জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদ সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে চাই। আলোচনা ভারতের দেশকালের বেড়ার মধ্যেই সীমিত রাখার চেষ্টা করবো। তবে, তার আগে সাধারণ কয়েকটি কথা বলে নিতে হবে।

(২)

জাতি কি? জাতীয়তাবাদই বা কি? এক কথায় বলা যায়, স্বরাজ্যের দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা একই সংস্কৃতি ও মানসিকতা-সম্পন্ন জনসমষ্টিই জাতি, আর এই জনসমষ্টির পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধের ভাবাবেগজনিত প্রকাশই জাতীয়তাবাদ। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। জাতি ও জাতীয়তাবাদ তো হাওয়ায় উড়ে আসেনা, শ্রেণীসমাজের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই এর শিকড়, এবং একদিন এর লয় হবে। তাহলে, এর উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে কি কি বাস্তব উপাদান কারণ হিসাবে সক্রিয়? সেগুলিকে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় কি?

প্রচলিত কোনো সংজ্ঞা সম্পর্কেই সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। তবে, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা আপেক্ষিকভাবে পরিষ্কার। ক্ষমতালোভী বুর্জোয়ারা যখন উঠতির মুখে, বাজারই তাঁদের জাতীয়তাবাদ শেখায়। তখন বাজারের প্রসারের পথের অন্তরায় সরানোর জন্য তাঁদের দরকার হয় জনসমাবেশের সহায়ক একটি মতাদর্শের। তাই তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতিতে উপস্থিত একাধিক ঐক্যসূত্রের সুবাদে, সমষ্টিগত ভাবাবেগ জাগিয়ে এই মতাদর্শের গোড়াপত্তন করেন। জন্মেই জাতীয়তাবাদ পরিণত হয় একটি জনগ্রাহ্য স্বতন্ত্র শক্তিতে এবং, বিশেষ পরিস্থিতিতে, এমন কি সমাজবাদের সংগ্রামেরা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, যেমন হয়েছিল ভিয়েতনামে। জাতিবিষয়ক ব্যাপারটি তাই ইতিহাসে আধুনিক যুগের আওতায় পড়ে। দেশে দেশে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যাত্রারম্ভের দিন থেকেই জাতিগঠনের সচেতন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত।

আবার ঔপনিবেশিক দেশে এই সূত্রপাত ঐ সময়ে অন্যভাবেও হয়েছে। সেখানে প্রধানত শোষক বিদেশী পুঁজির হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ও বাজার স্বদেশী পুঁজির হাতে আনার লড়াই-এর মারফৎই জাতীয়তাবাদ বিকশিত। ভারতেও বাস্তব পরিস্থিতিতে নিহিত সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক ঐক্যসূত্র সম্পর্কে সচেতনতা এই দুই ভাবেই সঞ্চারিত হয়েছে।

ভারতের জাতীয় প্রশ্নের আলোচনায় প্রবেশের আগে, সাধারণভাবে আরো কিছু কথাও বলে নিতে চাই। আমার মনে হয় 'জাতি'র প্রচলিত নানা সংজ্ঞার মধ্যে স্তালিনের সংজ্ঞাই আপেক্ষিকভাবে সবচেয়ে বাস্তবানুগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংজ্ঞাও যান্ত্রিকতা দোষদুষ্ট। এই সংজ্ঞা অনুসারে ধর্মের ভূমিকা অবান্তর, কিন্তু ঐক্য জাতিগঠনের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত।[১] স্বয়ং লেনিনও জাতীয় বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষিক বন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে এই বন্ধনকে জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান আবশ্যিক উপাদানই বলেছেন। কিন্তু তিনি কখনো ধারণাটিকে ছকে ফেলার চেষ্টা করেননি। বরং দেখিয়েছেন যে সুইজারল্যাণ্ডের মতো দেশও আছে, যেখানে লোকেরা নানান ভাষায় কথা বলেন। তবু, ঐক্যের অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত জাতীয় সংস্কৃতি ও সুনির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের আধারে সুইস জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, অনেক লেখায় লেনিন কাজাক, তাজিক ইত্যাদি জনসমষ্টিকে 'মুসলমান জাতিগুলি' বলতেও দ্বিধা করেন নি।[২] এর-ও আগে এ্যাঙ্গেলস্ তো স্পষ্টই বলেছেন, ভাষা সর্বত্র "জাতীয়তা নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারেনা।" তিনি এই প্রসঙ্গে উদাহরণও দিয়েছেন। বলেছেন, হাঙ্গেরীর জার্মাণভাষীরা নিজেদের ভাষা না ছাড়লেও, অন্য সকল ব্যাপারে একীকৃত (Integrated) হয়ে "মনোভাবে, চরিত্রে ও আচার-অনুষ্ঠানে" পুরোপুরি মাগিয়ার বনে গিয়েছেন।[৩] আমাদের জীবনকালেই দেখেছি, ভাষার ঐক্য এক ভাষাভাষী পাঞ্জাবকে অখণ্ড রাখতে পারেনি। সে কি শুধুই বৃটিশ ভেদনীতির জন্য? ভাষার ঐক্য সত্ত্বেও আজ ধর্মীয় ঐক্যাশ্রয়ী ভাবাবেগের ধাক্কায় লেবানন ছিন্নভিন্ন। আমরা এও দেখছি যে নানা ভাষাভাষী ইহুদীরা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে উড়ে এসে ইজরাইলে জুড়ে বসেছেন, আর মৃত হিব্রু ভাষাকেই চালু করে, সেখানে তাঁরা এক নতুন জাতিতে রূপান্তরিত। সেখানে জাতীয়তাবাদ প্রধানত ধর্মীয়-ঐক্যাশ্রয়ী, যেমন দেখছি আমাদের আকালি-শাসিত পাঞ্জাব রাজ্যে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের এবং অধুনা

সিন্ধী জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে ভাষা এবং ধর্ম উভয়েরই স্পর্শকাতরতা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। জন-গণতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তানের সংবিধান-রচয়িতারাও জাতিত্বের অন্যতম উপাদান হিসাবে ক্রমে ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের দেশে।

এ্যাঙ্গেলসের আর একটি কথায় আসি। ১৮৬৬-তেই এ্যাঙ্গেলস সাবধান করে দিয়েছিলেন যে অনেক সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা, এমন কি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিগুলিকে পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্নতার পথে উস্‌কিয়ে দেয়। এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেনিনও ১৯১৬-তে যা বলেছিলেন, তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

''Engels emphasises that the proletariat must recognise the political independence and 'self-determination' ...... of the great, *major nation* of Europe, and points to the *absurdity of the 'principle of nationalities'* (particularly in the Bonapartist application, *i.e. of placing any small nation on the same level as* these big ones''—[Lenin, Collected Works, Vol. 22 (Moscow, 1964), p. 349n.]—(গুরুত্বচিহ্ন আমাদের)।

অর্থাৎ, লেনিন বলতে চেয়েছিলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা কোথাও টানতেই হবে। বড় আর ক্ষুদে জাতিদের ঢালাওভাবে একই মানদণ্ডে বিচার করাটা অবাস্তব। তাই বিপ্লবের পরে, সোভিয়েট দেশে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছিল অন্ততঃ চার রকমে। ইউনিয়ন রিপাবলিকের ব্যবস্থা শুধু বড় জাতিদের জন্য, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ। অন্যদের জন্য ভৌগোলিক বাধ্যবাধকতা, জনসমষ্টির মিশ্র চরিত্র ও সংখ্যা ইত্যাদির বিবেচনা সাপেক্ষে স্বশাসিত রিপাবলিক, স্বশাসিত অঞ্চল এবং স্বশাসিত সাংস্কৃতিক এলাকার ব্যবস্থা। সোভিয়েটের জাতিসমস্যার সমাধান-সূত্র খোল-নলচে সমেত ভারতের বেলায় প্রযোজ্য নয়। তবু এর থেকে অনেকটাই গ্রহণযোগ্য, যেমন নাকি বহুজাতিক চীনের অভিজ্ঞতা থেকেও।

প্রাক-বিপ্লব রূশ সাম্রাজ্যের সংগে জাতিবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভারতের তফাৎ অনেকটা। বৃটিশ শাসনের অবসানের পরে এখন আর আমাদের দেশে কোনো

একটি বিশেষ জাতিকে শাসক-নিপীড়ক জাতি বলে চিহ্নিত করা যায় না। এদেশে একচেটে পুঁজিপতিগোষ্ঠী জাতিত্বে পাঁচমিশালী, এবং এক গোষ্ঠীর বৃহদংশের গৃহভূমি কোনো বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ নয়। বড় বড় শহর ও পাঁচতারা হোটেলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এঁদের সংস্কৃতি ব্যাপক অর্থে সর্বভারতীয়। এঁরা সমগ্র ভারতকে একটি অখণ্ড বাজার হিসেবেই পেতে চান, প্রয়োজন মতো বা চাপে পড়ে বহুজাতিক সংস্থা এবং আঞ্চলিক বুর্জোয়ার সঙ্গে সমঝোতা ও ভাগাভাগির ভিত্তিতে। আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীও জাতি-ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। বড় বড় শিল্প শহরে, খনি ও বাগিচা এলাকায় এরও গড়ন পাঁচমিশালী। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যবহারিক সংস্কৃতিও ক্রমে সর্বভারতীয় চেহারা নিচ্ছে বস্তি এলাকার মিশ্র বসতিগুলিকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকশ্রেণীর বিন্যাসও তাই ভারতের ঐক্য রক্ষার অনুকূল, যদিও অনবরত শিল্পশ্রমিক রূপান্তরিত গ্রামীণ কৃষকেরা এখনো আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতপাত এবং জাতিদ্বেষকে শ্রমিকদের মধ্যে জীইয়ে রেখেছেন। "জাতীয় সমস্যা প্রধানত কৃষক সমস্যা" (স্তালিন) এবং কৃষক সমাজই আঞ্চলিক, বুর্জোয়া স্বার্থ ও আঞ্চলিকতার উৎসভূমি।

(৩)

যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে 'জাতি' ব্যাপারটির আলোচনা করা হ'ল তা কিন্তু আমাদের দেশের ভাববাদী ঐতিহাসিকদের প্রাসংগিক রচনায় অনুপস্থিত। তাঁদের অনেকের মতেই জাতির উপস্থিতি প্রাক আধুনিক যুগেও ছিল। অনেকেই অশোক বা আকবরের সাম্রাজ্যকে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন এবং পরবর্তী যুগের মারাঠা রাজ্যের বিকাশকে মারাঠি জাতির উত্থান হিসাবে চিত্রিত করতে প্রয়াসী। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শাসকশ্রেণীকে ঘিরে রাজ্যজোড়া সর্বভারতীয় বা আঞ্চলিক উপরতলার সংস্কৃতি যে স্থানবদ্ধ লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি গড়ে ওঠেনি, তা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য একে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে সচেতন সমষ্টিগত ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার কোনো নজিরই নেই। সমষ্টিচেতনা কুল, উপজাতি, জাতপাত, বর্ণ এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, জীবনযাত্রার এই বেড়াগুলি ডিঙিয়ে সাধারণীকৃত জাতীয় চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রাচীনযুগে রামায়ণে রামকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, 'স্বর্ণপুরী লংকায় আমার রুচি নেই, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের বাড়া'—। আবার আদি-মধ্য যুগে দেখি, আপন 'জনকভূমি' বা পিতৃভূমি বরেন্দ্রের মাটি ও গাছপালার জন্য ভাগ্যতাড়িত রামপালের উচ্ছ্বসিত মমতা সন্ধ্যাকর নন্দীর

'বামচরিত' -এ পরিস্ফুট। এতে স্বভূমি প্রীতির (Patriotism) প্রকাশ থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবাদ নেই। সেযুগে তো আধুনিক জাতির সমার্থক প্রতিশব্দই ছিল না প্রচলিত কোনো ভাষায়। জাতীয়তাবাদই বা থাকবে কি করে? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে এ প্রশ্ন ভাবিত করেছিল। ১৯১৯-এ তিনি লিখেছেন—

> "........যাহাদের মধ্যে জন্মগত বন্ধনের ঐক্য আছে তাহারাই নেশন। তাহাদিগকে আমরা জাতি বলিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ভাষায় একদিকে অধিকতর ব্যাপক, অন্যদিকে সংকীর্ণ। .... এমন স্থলে নেশনের প্রতিশব্দরূপে জাতি শব্দ ব্যবহার না করিয়া ইংরাজী শব্দটাই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি।......."

আলোচনায় nation, race এবং caste-এর বানানো বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে যথাক্রমে অধিজাতি, প্রবংশ এবং জাতি বা বর্ণ ব্যবহার করা যায় কিনা এ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে আসেন নি। বরং অবশেষে মন্তব্য করেছিলেন : "আমি নিজেই বলিয়াছি 'নেশন' কথাটাকে তর্জমা না করিয়া ব্যবহার করাই ভাল। ওটা নিতান্তই ইংরাজী অর্থাৎ ঐ শব্দের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয় সে অর্থ ইহার আগে আমরা ব্যবহার করি নাই।"[২] আরো পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথই মহাজাতিসদনের নামকরণের মাধ্যমে সর্বভারতীয় জাতীয় ঐক্যের দ্যোতক 'মহাজাতি' শব্দটি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। এই পটভূমিতে race অর্থে প্রবংশ, nation অর্থে মহাজাতি nationality অর্থে জাতি/জাতীয়তা, subnationality অর্থে অধিজাতি এবং caste অর্থে জাত—এই পরিভাষা ব্যবহার করার কথা ভাবা যেতে পারে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আনুনিক নেশন ও ন্যাশন্যালিটির, এমন কি প্রায়সমার্থক প্রতিশব্দের অভাবই প্রাক-বৃটিশ যুগের ভারতে জাতি ও জাতীয়তার অনুপস্থিতির কথা তুলে ধরে।

ঔপনিবেশিকতার পরিবেশে, ভারতে পুঁজিবাদের এবং জাতীয়তাবোধের দুর্বল উন্মেষ ঘটতে থাকে উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে। এর বাস্তব উপকরণগত ভিত্তি—যেমন ব্যাপক বাজার, আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্য ও শিল্পরীতি এবং ভৌগোলিক-রাজনৈতিক সংহতির ঐক্যসূত্র ইত্যাদি—ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছিল আরো আগে থেকেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে সমষ্টিগত আত্মসচেতনতা ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য ভারতের উঠতি বুর্জোয়ারা এই বাস্তব উপাদানগুলিকেই বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ সৃষ্টির কাজে লাগালেন।

ভারতব্যাপী বৃটিশ প্রশাসনের লৌহকাঠাম, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ইতিমধ্যে তাঁদের এই কাজকে সহজ করে তুলেছিল। এই পরিবেশেই অবশেষে বৃটিশরাজের বিকল্প হবু স্বাধীন রাষ্ট্রের বনিযাদ হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম।

প্রথম থেকেই কিন্তু ভারতে জাতীয়তাবাদের চেহারা দ্বৈত-সর্বভাবতীয় এবং আঞ্চলিক। এমন কি যাঁরা হিন্দু মুসলমান দুই 'জাতি'র কথা বলতেন, তাঁরাও ১৯৪০-এর আগে পর্য্যন্ত একই রাষ্ট্রকাঠামোতে মিলেমিশে থাকার কথাই বলতেন। একই লোক, হিন্দু কিংবা মুসলমান, নিজেকে একাধারে বাঙালী এবং ভারতীয়, অথবা অসমিয়া এবং ভারতীয়, বলে ভাবছেন—উনিশ শতকের ও পরবর্তী অসংখ্য সাহিত্যকর্মে তার ভূরি ভূরি প্রমাণও রয়েছে। অন্যত্র এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৫] মতাদর্শের ক্ষেত্রে, তাই, প্রথম থেকেই দ্বৈত জাতীয়তাবাদের অনুকূল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠাম-ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তাই বাস্তবানুগ হত। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমদিকে কংগ্রেসের রাষ্ট্রচিন্তায় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদই শুধু পরিস্ফুট হয়েছে, অবহেলিত হয়েছে আঞ্চলিক সত্ত্বা। প্রতিপক্ষ বৃটেন একীকৃত একজাতিক রাষ্ট্র। অতএব, তার বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছিল একীকৃত একজাতিক ভারতরাষ্ট্রের ধারণাকে। তার জন্য বুর্জোয়া নেতারা প্রয়োজনমতো তথ্যের সংগে কল্পনারও আশ্রয় নিয়ে ভারতবাসীকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে ভাষা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, মানসিকতা ইত্যাদির অনেক অনৈক্য সত্ত্বেও দেশব্যাপী একই বিমিশ্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শরিকানার দৌলতে ভারতীয়রা একজাতিভুক্ত। তাঁদের মন্তব্য ছিল, ভারতের সংবিধানও তাই বৃটেনের মতো এককেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই আপাত-নিরীহ বক্তব্যের আড়ালে লুকানো ছিল ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রগামী বৃহৎ এবং প্রবল অংশের শ্রেণীস্বার্থ। তাঁরা বুঝেছিলেন, সারা ভারতের শাসনক্ষমতা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত থাকলে দেশের অখণ্ড বাজারের সর্বত্র তাঁদেরই কর্তৃত্ব থাকবে। তাছাড়া, দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী ঐক্য থেকেও একজাতিত্বের অনুকূল জনমানস গড়ে উঠেছিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থার এই মডেল ভারতীয় মুসলমানদের পছন্দ না হওয়ারই কথা। কারণ, ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে কয়েকটি অংগরাজ্যে অন্ততঃ মুসলমান সংখ্যাধিক্য থাকতো এবং সেক্ষেত্রে, সর্বভারতীয় স্তরে দুর্বল মুসলমান বুর্জোয়ারা সেই রাজ্যগুলির বাজারে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারতেন। এ

প্রসংগে, ইস্তাম্বুল থেকে ১৯২৬-এ প্রকাশিত, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর রচিত The Constitution of the Frederated Republics of India উল্লেখ্য। বইটির সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনীতে। আর একটি ব্যাপারেও মুসলমানদের আপত্তি ছিল। উদারপন্থীদের সেকুলার ভাবধারা সত্ত্বেও, শুরু থেকেই হিন্দুমেলা, আর্য্যসমাজ, বীরাষ্টমী, গো-রক্ষা, বর্ণদম্ভ ইত্যাদি হিন্দুয়ানির নানা প্রতীকচিহ্ন, ভাবনা এবং তরিকা জাতীয়তাবাদ প্রকাশের ধারক এবং বাহক হয়ে উঠেছিল, যার কোনই অবেদন ছিল না ভারতীয় মুসলমান সমাজের কাছে। এই দুই কারণে এবং মুসলমানদের মধ্যে মৌলপন্থী এবং নিখিল-ইসলামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে জাতীয়তাবাদের মঞ্চ মুসলমানদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, জাতীয় কংগ্রেসের সার্বজনীন মঞ্চে ঐতিহ্য-সম্মত এক ধরনের উদারতা পূর্বাপর বজায় ছিল। কংগ্রেসে থেকেও সদস্যরা রুচি অনুযায়ী স্বধর্মাবলম্বীদের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনেও যোগ দিতে পারতেন। এইরকম পরিস্থিতিতেই সাম্প্রদায়িক মঞ্চে হিন্দু-হিন্দী-হিন্দুস্তান শ্লোগানের ক্রমবিকাশ। এইরকম পরিস্থিতিতেই ১৯০৬-এ মুসলিম লীগের জন্ম, স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্রের দাবি এবং পরবর্তী কয়েক বছরের বিকাশ। ভাষা-ভিত্তিক এবং বর্ণপ্রাধান্য-বিরোধী কৃষক-মনস্ক আঞ্চলিকতাবোধ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা নিতে থাকে ১৯২১-এর আন্দোলনের পরবর্তী দুই দশকে, কিন্তু তখনো মূলতঃ কংগ্রেস ও লীগের আওতার মধ্যেই।

১৯২১এ বুর্জোয়া নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টে সারা দেশে সাড়া জাগালেও, মতাদর্শের সীমাবস্থার দরুণ শেষ পর্যন্ত এর থেকে কংগ্রেস কোনো ফায়দা তুলতে পারেনি। ১৯২৮ সালে নেহরুর রচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের খসড়ায় 'অবশিষ্ট' (RESIDUAL) ক্ষমতা কেন্দ্রে ন্যস্ত করার কথা থাকায় মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব এবং ত্রিশের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়। 'অবশিষ্ট' ক্ষমতা কংগ্রেস পরবর্তীকালে প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করতে রাজী হল বটে, কিন্তু কোনো বিশেষ অঞ্চলের পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকার অস্বীকার করে প্রস্তাব পাশ করলো (লালা জগৎ নারায়ণের 'অখণ্ড ভারত' প্রস্তাবঃ এলাহাবাদ এ, আই. সি. সি)। এই পটভূমিতেই কুখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব চল্লিশের দশকে মুসলিম গণসমর্থন লাভ করে। পাকিস্তানকে যখন আর ঠেকানো গেল না, তখন স্বাধীন ভারতের সংবিধান-রচয়িতারা 'অবশিষ্ট' ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতেই রেখে দিলেন। পরবর্তীকালে,

নানাভাবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে কেন্দ্রের অনুকূলে আরও রদবদল ঘটানো হল। এর ফলে জাতীয় সমস্যা এক দিক দিয়ে হয়ে দাঁড়ালো আরো জটিল।

(৪)

আমাদের ইতিহাস-সাহিত্যে জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে জাতিগঠন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণধর্মী সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস কিংবা জাতীয়তাবাদের পূর্ণাংগ বৌদ্ধিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা বিরল। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসই কি লেখা হয়েছে? আমরা কি জানি কেন রাজবংশীরা কবে, কিভাবে, ধাপে ধাপে বাঙালী জাতিতে মিশে গিয়েছেন? নীহাররঞ্জন রায়ের **'বাঙ্গালীর ইতিহাস'** রয়েছে বটে, কিন্তু এমন এক কালপর্বের যখন রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ-বঙ্গাল, হরিকেল ছিল, কিন্তু বাঙালী ছিল না। আধুনিক যুগে বৃটিশ শাসন-শোষণের কাঠামোর মধ্যে কিভাবে হিন্দু-মুসলমান নানা জাত, উপজাতি, ভাষাগোষ্ঠী শ্রেণীগত ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণীত হয়ে বাঙালী জাতিতে পরিণত এবং বর্ণহিন্দুর সমাজপতিত্বে প্রক্রিয়াটির অসম্পূর্ণতা কোথায় এ সম্পর্কে গবেষণা কমই হয়েছে। জাতিগঠনের আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয়—এই দুই ধারা সমান্তরাল নয়, পরস্পরকে জড়িয়েই প্রবহমান। আঞ্চলিক জাতিগুলি পূর্ণবিকশিত না হতেই সর্বভারতীয় জাতিগঠনের অসমাপ্ত ধারার সাথেও মিশে যাচ্ছে। কারণ, আধুনিক যোগাযোগ ও গণমাধ্যম ব্যবস্থার কল্যাণে একটি সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একদিকে জাতীয় সমস্যা ক্রমেই জটিলতর ও তীব্রতর হচ্ছে, অন্যদিকে, বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যগুলির সংমিশ্রণে মহাজাতীয় সংস্কৃতি ও ঐক্যের বনিয়াদও শক্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় অর্থনীতির বিকাশের অসাম্য কমিয়ে আনতে পারলে এবং নিঃশর্ত ও স্বয়ং শাসনের ধারণাকে তৃণমূল পর্য্যন্ত পৌছাতে পারলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংহতি নিশ্চয়ই রক্ষা করা যায়। অনুমান করি, ভারতের জাতীয় বিকাশ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে এই প্রেক্ষিতই বেরিয়ে আসবে।

ভারতের জাতীয় চেতনা অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক মহলের চিন্তাধারা বিকাশে মার্কসবাদীদের চিন্তাভাবনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই, এই শেষোক্ত চিন্তাভাবনার একটি কালানুক্রমিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে, সমাজবিকাশের অমোঘ নিয়মেই ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে, উপজাতীয় ও ধর্মীয়

গোষ্ঠীচেতনা অতিক্রম করে জাতীয় চেতনার বিকাশ হয। জাতীয আন্দোলন জাতীয় রাষ্ট্রগঠনেব অভিমুখী হয়। সে অবস্থায় জাতিসত্ত্বাব বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই শ্রমিক শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্য অন্য একাধিক শ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামের পথে এগুতে হয়। এই তাত্ত্বিক দূরদৃষ্টির বলেই ১৯২৫ এই স্তালিন বলতে পেরেছিলেন : "ভারতকে আজকাল একটি সমগ্র জাতি বলিয়া প্রচার কবা হইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়া বহু অজ্ঞাত জাতি আত্মপ্রকাশ করিবে।" [৬] ভাবতে কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের মতো মার্কসবাদীবাও ভাবতেন, ভারতবর্ষ এক জাতি, এবং একজাতিক কাঠামোর মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। উদীয়মান জাতিগুলির সমস্যার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকে ১৯৪০ থেকে, এবং অচিরেই 'ভারত একটি বহুজাতিক দেশ' এই সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হন। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রয়োগ ভারতে কিভাবে হবে সে সম্বন্ধেও অলোচনা শুরু হয়।

দেখা গিয়েছিল যে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত যতই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল, ততোই মুসলমান জনসাধারণও তার সংগে জড়িয়ে পড়ছিলেন। তবু—

> "কেনই বা জাগ্রত মুসলমান জনগণ বিশেষ করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের সময়ে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হইল, এবং মুসলিম লীগ শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন হিসাবে দাঁড়াইতে পারিল? কেনই বা ঠিক এই সময়েই হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ তীব্রতর হইতে লাগিল?...... ("জাতীয় ঐক্য চাই", পিপল্‌স্ ওয়ার, ৮.৮.১৯৪২)। [৭]

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হ'য়ে তদানীন্তন কমিউনিস্ট দল উক্ত প্রবন্ধে এ-ও লক্ষ্য করেছিল যে, যত নিম্নস্তরেরেই হোক, শিল্পোন্নতির ফলে এবং নতুন শাসনতন্ত্র মারফৎ সীমিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের সুযোগ আসায় ঐ একই সময়ে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন এবং অন্যত্র বাঙালী-অসমিয়া, মারাঠী-কর্ণাটকী এবং অন্ধ্র-তামিলনাদ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। ঘটনার এই উভয়বিধ ধারাতেই যেমন একটি ভেদমুখী দিক আছে, তেমনি একটি প্রগতিশীল দিকও আছে—এই ছিল কমিউনিস্টদের সেদিনকার দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি।

> "বুর্জোয়া উন্নতির সংগে সংগে সর্বভারতীয় জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন দেশের দূর দূরাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সবচেয়ে

পশ্চাৎবর্তী জাতি ও সম্প্রদায়ের কৃষককুলকে তাহার আবর্তে টানিয়া আনিতেছে। সর্বভারতীয় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন বহুজাতিক আন্দোলনের সমৃদ্ধিশালী রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। ......দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্ণাটকের লিঙ্গায়েৎ কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এবং স্বভাবতই স্বাধীন ভারত স্বাধীন কর্ণাটক প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের আকাংখা জাগিযাছে। অন্ধ্র, তামিল, পাঞ্জাবী ও পাঠানদের সম্পর্কেও ইহা সত্য। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক রেষারেষির তীব্রতার ইহাই প্রগতিশীল দিক, আমাদেব ক্রমবর্ধমান জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলেই ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহা যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের এক নতুন রূপ, এই উপলব্ধিই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।"

১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগ ভারতের জন্য পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, এবং ইতিমধ্যে প্রসারিত গণভিত্তির চাপে শিল্পপতি বুর্জোয়াশ্রেণীব নেতৃত্বাধীন হয়ে পড়ছিল। "অতএব", প্রবন্ধের ভাষায়, "লীগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ নহে, ববং মুসলমান জনগণের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনারই ইহা অভিব্যক্তি। বৃহত্তর নিখিল-ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কাঠামোর মধ্যে সিন্ধী, পাঞ্জবী, মুসলমান, পাঠান প্রভৃতির স্বতন্ত্র জাতীয়তা-বোধেরই ইহা প্রকাশ।" কমিউনিস্টদের তরফ থেকে কংগ্রেসকে বলা হল— "পুরুষানুক্রমে একই ভূখণ্ডে, একই ভাষা, একই সংস্কৃতি ও একই অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থার মধ্যে বসবাসকারী স্বতন্ত্র জাতিদের স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রজীবন নির্বাহের অধিকার ও তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিলে তাহার ফলে মাতৃভূমির ব্যবচ্ছেদ কখনো ঘটিতে পারে না।" আশা প্রকাশ করা হয়েছিল, কংগ্রেস এমন প্রতিশ্রুতি দিলে পাকিস্তান প্রস্তাব মুসলিম জনসমর্থন হারাবে এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা ও স্বেচ্ছা-মিলনের ভিত্তিতে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় থাকবে। কংগ্রেস এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। মেনে নিলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জোয়ার এবং ভারত-বিভাজন ঠেকানো যেত কিনা, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর।

সে যা-ই হোক, প্রবন্ধটিতে উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতিতেই আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োগ সংক্রান্ত থিসিস ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত এবং ১৯৪৩-এর মে মাসে দলের প্রথম কংগ্রেস, ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর প্রাসংগিক ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনটি সহ, অনুমোদিত হয়েছিল। ভারতের বেলায় কোনো অঞ্চলের জাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নির্ণায়ক হিসাবে ভাষা ইত্যাদি উপাদানের পাশাপাশি

কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত আঞ্চলিক সংখ্যাগবিষ্ঠের ধর্মকেও উপাদান হিসাবে গণ্য করাটাই বাস্তবানুগ হবে—ডঃ অধিকাবীর এই পরামর্শ ছিল প্রাপ্ত মার্কসবাদী তত্ত্বের সঙ্গে নতুন সংযোজন। এরই ভিত্তিতে পশ্চিমা পাঞ্জাবী ও পূর্ববঙ্গীয়দের স্বতন্ত্র মুসলমান-প্রধান জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিবেদনটির উপসংহারে একথাও বলা হয়েছিল ঃ

> "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে রাজনৈতিক-বৈপ্লবিক প্রশ্ন হিসাবে দেখিতে হইবে, নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্ন হিসাবে দেখিলে চলিবে না।
>
> ...... পৃথক হইবার অধিকার মানিলেই যে সত্য-সত্যই এই অধিকার প্রয়োগ করা হইবে বা প্রয়োগ করা সমীচীন হইবে, তাহা নহে। সমগ্র সামাজিক পরিস্থিতি ও বিকাশের পটভূমিকাতেই ক্ষেত্র ও কাল বিশেষে এই শেষোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব। পৃথক হইলে সমগ্র সমাজ ও রাজনৈতিক বিকাশের পক্ষে কিরূপ ফল হইবে তাহা বিবেচনা করিয়াই বাস্তত ক্ষেত্রে এই সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব।" [১০]

এই স্পষ্টীকরণ সত্ত্বেও মুসলিম লীগের মধ্যে সামন্তীয় প্রভাব ও সাম্প্রদায়িকতাকে খাটো করে ও গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে এবং কমিউনিস্টদের অবস্থানে বাস্তবে নিয়মতান্ত্রিক বিচ্যুতি ঘটার ফলে, আত্মনিয়ন্ত্রণের থিসিসটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সরেজমিনে প্রকারান্তরে পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৪৬-এর ১৫ এপ্রিল তারিখে ক্যাবিনেট মিশনের কাছে পেশ করা স্মারকলিপিতে এই ভ্রান্তি অনেকটা সংশোধিত হল। কমিউনিস্ট দল অবশ্যই চেয়েছিল অখণ্ড ফেডারেল ভারত এবং একটি সীমানা কমিশনের মারফৎ ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রের বিচারে জাতিভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও বলেছিল যে পুনর্গঠিত প্রদেশগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেবে, না স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো ইউনিয়ন গড়বে—সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে নেবে। তখনকার সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ-সদৃশ পরিস্থিতিতে, যখন জাতীয় নেতৃত্ব হৃত-উদ্যোগ এবং বৃটিশবাহিনী ভারত ত্যাগে বদ্ধ-পরিকর, মনে হয়, কমিউনিস্টদের এই অবস্থান বাস্তবানুগ ছিল।[১১] অনুরূপ অবস্থানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল তখন অসমিয়া জাতির বংগাসাম গ্রুপিং বিরোধী ঐক্যবদ্ধ বিরাট আন্দোলন। সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতৃত্বের

সিদ্ধান্তকে পাল্টে দিয়ে সেদিন এই আন্দোলন ক্যাবিনেট মিশনের সর্বশেষ ত্রি-স্তর কনফেডারেশনের প্রস্তাবটিকে ভেস্তে দিতে এবং প্রকারান্তরে আসামের পূর্ব-পাকিস্তানভুক্তি রদ করতে পেরেছিল (আসাম বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব, ১৬ জুলাই, ১৯৪৬)।[১২] অনুরূপ অবস্থানের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

ভারত-বিভাগের আগেই লীগের ভূমিকা পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি কমিউনিস্টদের মনোভাব পরিবর্তিত হলেও, নিঃশর্ত জাতিভিত্তিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতির উপরে আস্থা ছিল অটল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই জায়মান জাতিগুলিকে শৃংখলিত করে এক কারাগারে রেখেছিল, কাজেই প্রাকস্বাধীনতা যুগে এই জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ ভাগ্য নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার মেনে নেওয়া উচিত—অবস্থানে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। বরং সেটাই ছিল মার্কসবাদ-সম্মত। কিন্তু অবস্থার জটিলতাকে অতি সরলীকৃত করে নেওয়ার ফলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুলও হয়েছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির ব্যাখ্যা কত দূর প্রসারিত ছিল, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত কউিনিস্ট দলের আসাম প্রাদেশিক সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে অঞ্চল ও কাছাড়সহ সমগ্র আসাম প্রদেশের ভারত থেকে পৃথক হওয়ার অধিকারসহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল। একই সাথে, পার্বত্যাঞ্চল এবং কাছাড়ের জন্যও বলা হয়েছিল আসাম থেকে পৃথক হওয়ার অনুরূপ অধিকারের কথা। অবশ্য এ ছিল অধিকারের কথা, বাস্তব প্রয়োগের কথা নয়।[১৩] নাগাল্যাণ্ডে, কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, এবং মিজোরামে উত্থাপিত ভারতের সংগে সম্পর্কছেদের দাবির প্রতি বাস্তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সাড়া বরাবরই নেতিবাচক ছিল সঠিকভাবেই। তা সত্ত্বেও, ১৯৬৪ পর্যন্তও কমিউনিস্ট কার্য্যসূচীতে ভারত থেকে পৃথক হওয়ার অধিকারের ধারাটি বলবৎ ছিল। পরে, এই ধারাটিকে কয়েক বছর নিষ্ক্রিয় রেখে, ১৯৭২-এ পাকাপাকিভাবে খারিজ করা হয়।[১৪] তখন থেকে বিচ্ছেদের অধিকার-বিহীন আঞ্চলিক স্বশাসনের ব্যবস্থাকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট ভাবা হয়, যেমন ভাবা হয় মাও-সে-তুঙের আমল থেকেই চীনদেশেও।

আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে আর একটি ভ্রমাত্মক ঝোঁকও কিছুকালের জন্য প্রকট ছিল। গুজরাটি এবং রাজস্থানীদের হাতে একচেটে পুঁজির কেন্দ্রীকৃত অবস্থান এবং এই পুঁজির আধিপত্য দেখে অনেকে আঞ্চলিক আন্দোলনগুলিতে এর বিরুদ্ধে আঞ্চলিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষণ

দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কোনো বিশেষ শোষক-নিপীড়ক জাতি নেই—আলোচনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সত্যে পৌঁছাতে তাঁদেরও বিলম্ব ঘটেনি।

(৫)

আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির একটি সঠিক অনুসিদ্ধান্ত হল, যতদূর সম্ভব ভাষা সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন এবং পুনর্গঠিত প্রদেশ রাজ্য-সমূহের জন্য ব্যাপক স্বশাসনের ব্যবস্থা। সর্বভারতীয় বুর্জোয়ারা এই প্রস্তাবকে বরাবর প্রবল বাধা দিয়ে এসেছেন। অপরপক্ষে, মার্কসবাদীরা বরাবর সক্রিয়ভাবে এই প্রস্তাবের সপক্ষে। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মহাগুজরাট, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র, ঐক্য কেরেলম্, বিশাল অন্ধ্র এবং সংযুক্ত কর্ণাটক আন্দোলন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জাতীয় উচ্ছ্বাসের আতিশয্য সত্ত্বেও এ আন্দোলনগুলি ছিল গণতান্ত্রিক এবং কৃষক-সমাজের আশা-আকাংখার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাঞ্জাবে ধর্ম, লিপি এবং ভাষাগত আনুগত্যের প্রশ্নে পরিস্থিতিতে জটিলতা থাকায়, সেখানে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ভেদবাদের পথে শিখিস্তান আন্দোলন হয়েছিল, মার্কসবাদীরা তখন তার বিরোধিতাই করেছিলেন।

ঐ দুই দশকে মিজোরামে বিচ্ছিন্নতার বীজ উপস্থিত থাকলেও অংকুরিত হতে পারেনি। বরং সামন্তীয় মিজো সর্দারী প্রথার উচ্ছেদ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রশ্নে আসামের সংগে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ এবং ভারত ইউনিয়নের মধ্যে আলাদা ভাষাভিত্তিক মিজোরাম রাজ্যগঠন—এই তিন প্রধান দাবির ভিত্তিতে সামন্তবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৫৯-এ দুর্ভিক্ষ-কবলিত মিজোরামে গঠিত হয়েছিল একটি আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতি (Mizo National Famine Front)। ত্রাণসামগ্রীবিহীন চরম দুর্দশা ও হতাশার মধ্যে ষাটের দশকে এই সমিতিই বিদ্রোহের মঞ্চে রূপান্তরিত হয়ে ভারত ও ব্রহ্মের সংলগ্ন সমস্ত মিজো এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাজ্যের আওয়াজ তুলেছিল। কাজেই, প্রথম পর্যায়ে এই অন্দোলনের প্রতি মার্কসবাদীদের নৈতিক সমর্থন থাকলেও, পরবর্তী পর্যায়ে ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে নাগা জাতীয় আন্দোলনের অস্ত্রত্যাগ এবং ভারতের মধ্যে স্বতন্ত্র নাগাল্যাণ্ড রাজ্য গঠনের জন্য ভারত সরকার এবং নাগা জাতীয় নেতৃত্বের বৃহদংশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সমঝোতা চুক্তি (accord) হয়েছিল, তাতে মার্কসবাদীদের আপত্তি ছিল না। আবার, আকালি শিখদের শিখিস্তানের দাবির মর্মবস্তুই যখন গুরুমুখী লিপি,

পাঞ্জাবী ভাষা আর সেকুলার পাঞ্জাবের পোষাক পরে পাঞ্জাবকে আর একবার দ্বিখণ্ডিত করলো তখনও মার্কসবাদীদের বাস্তবে সে অবস্থা মেনে নিতেই হয়েছে। সিকিমের ভারত-ভুক্তি আর এক ব্যাপার। যেভাবে সিকিম-দখল সম্পন্ন হয়েছিল, তা মার্কসবাদী মহলে উগ্র জাতীয়তাবাদী অপকর্ম বলেই সমালোচিত হয়েছিল।

ইতিহাসই দেখিয়ে দেয় যে আমাদের যুগে ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাজ্য প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রবণতা সমাজবিকাশের নিয়মানুবর্তী একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। প্রথম থেকেই বৃহৎ পুঁজিপতিরা, একচেটে বাজারের স্বার্থে একে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। লখ্নৌ চুক্তি (১৯১৬), ১৯২৮-এ নেহরুর প্রতিবেদন ইত্যাদি এবং অবশেষে সংবিধান ও তার একাধিক সংশোধনের মারফৎ মোটামুটি এ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক প্রবণতাটিকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। গণ-আন্দোলনের চাপেই এভাবে ধাপে ধাপে জাতীয় প্রশ্নের অনেকখানি সমাধান হয়েছে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের চাপে, কংগ্রেসের আগের ঘোষিত নীতি বিসর্জন দিয়ে, ১৯৪৯-এ বুর্জোয়া নেতারা দশ বছরের জন্য ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে আঞ্চলিক-জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারে তাদের সব বাধা ভেসে গিয়েছে।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন ও রাজ্য সীমানার রদবদল করে জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা অনেকখানি সম্ভব হলেও সর্বাঙ্গীন মীমাংসা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী বিকাশ সীমিত হলেও, তার ফলে গত দেড়শ বছর ধরে এক অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ অন্য অঞ্চলে গিয়ে হাজারে হাজারে বসতি গড়েছেন। দেশ বিভাগের ফলেও তাই ঘটেছে। এ-ধরনের ব্যাপক প্রব্রজনের ফলে গড়ে-ওঠা একাধিক জাতির মিশ্র বসতিগুলি এমনভাবে ছড়ানো যে, এমন কি গ্রামভিত্তিক গণভোটের সাহায্য নিয়েও, জাতীয় সীমানা নিখুঁতভাবে সরেজমিনে স্থির করা প্রায় অসম্ভব। কিছু রাজ্য (যেমন মণিপুর বা কাশ্মীর) আবার একাধিক ক্ষুদ্র জাতির ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত যুক্ত গৃহভূমি—কেউ সেখানে সংখ্যাগুরু, কেউ বা সংখ্যালঘু। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক জটিলতা ও বাধ্যবাধকতার বিবেচনায়, এইসব রাজ্যের স্থিতাবস্থায় অস্থিরতাসৃষ্টি যুক্তিযুক্ত নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। আসামে প্রধানত বাংলাভাষী কাছাড়-করিমগঞ্জ এবং পশ্চিম বাংলার প্রধানত নেপালীভাষা দার্জিলিং জেলাকে রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলেই কি জাতি সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা হবে? এই প্রসঙ্গে অক্টোবর ১৯৭৩-এ ভারতের জাতীয় সংহতি সাধন পরিষদে উপস্থাপিত পি. সুন্দরাইয়ার দলীয় বক্তব্যে

এই কথাই স্পষ্ট যে সুরাহা খণ্ডীকরণে নেই। সুরাহা আসামের ক্ষেত্রে ভাষিক সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক অধিকার দান এবং পঃ বংগের ক্ষেত্রে তদুপরি নেপালী ভাষাকে সাংবিধানিক মর্যাদাদান ও নেপালীভাষী এলাকা নিয়ে "বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন স্বতন্ত্র জেলা" সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। যদি এসব রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না থাকে, তবেই শুধু যেখানে অন্য ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এমন সব এলাকাকে রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক সত্ত্বার রূপ দিতে হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও, "রাজ্যে ভাষিক সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব ন্যূনতমে এসে ঠেকলেও তাদের ভাষাগত অধিকার রক্ষার সমস্যা থেকেই যাবে এবং এই অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের দায় ও গ্যারেন্টি কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাবে।" [১৫]

পুঁজিবাদী বিকাশ ও আগ্রাসনের আবর্তে পড়ে উপজাতীয় সত্ত্বাগুলির ভগ্নাবশেষ যা রয়ে গিয়েছে, তা হয় সুসংহত হয়ে নতুন নতুন জাতির রূপ নিচ্ছে, নয়তো জাতির মধ্যে লীন হচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য আর থাকছে না। এই বিবর্তনের ধারা বন্ধ করাটা এই মূহূর্তে কাম্যও নয়, সম্ভবও নয়। শুধু এর নিয়ম মেনে চলে, শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে এর প্রক্রিয়াকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা যায় মাত্র। যেখানে জাতিতে রূপান্তর এবং সংরক্ষিত জাতীয় গৃহভূমির ব্যবস্থাপনা সম্ভব, সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োগ কঠিন নয়। কিন্তু যে আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে সাবেক জনবসতিগুলির পাশাপাশি বহিরাগত ভিন্ন সংস্কৃতির শরিকরাও কয়েক পুরুষের বাসিন্দা এবং সংখ্যায় বিপুল, সেখানে কি করণীয়? ছোটনাগপুরে কর্মীসহ আদিবাসীরা জনসংখ্যার অর্ধেকও হবেন কিনা সন্দেহ। উত্তরবংগের জেলাগুলিতে রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসীদের সংখ্যানুপাত বহিরাগত জনাগমনের চাপে আরো অনেক কম। নগণ্যই বলা চলে এখন। পুরুলিয়া মেদিনীপুর বাঁকুড়ায় এমন একটি থানা এলাকা পাওয়াও প্রায় দুষ্কর, যেখানে আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলা যেতে পারে। শুধু দার্জিলিংয়ে তিনটি পার্বত্য মহকুমার ক্ষেত্রেই নেপালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু বাঙালীদের মতোই তাঁরাও ওখানকার অদিবাসী নন, বহিরাগত। ওখানকার আদিবাসী লেপচা এবং ভুটিয়ারা।

উঁচু জাতের বিরুদ্ধে উপজাতীয় ও নিম্নবর্ণের মানুষের সামগ্রিক সংগ্রাম যে শ্রেণী সংগ্রামেরই একটি রূপ—এই ব্যাপারটা মার্কসবাদীদের কাছে ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। চল্লিশের দশকে **মার্কস' সিষ্ট মিসেলিনিতে** প্রকাশিত অজয় ঘোষের "Notes on Chhotanagpur" প্রবন্ধটিতেই সম্ভবত সর্বপ্রথম ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের

আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের নানা লেখায় আমরা জাতীয় এবং উপজাতীয় সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনা পাই। মার্কসবাদী লেখকদের এইরকম কিছু রচনা ছাড়াও, সি. পি. আই (এম)-এর নবম কংগ্রেস (১৯৭২) গৃহীত একটি দলিল থেকে এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

> "কয়েকটি দিক থেকে উপজাতীয় জনসমষ্টি, বিশেষত সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র জাতিগুলি, শুধু শ্রেণীগতভাবেই নিপীড়িত নয়, অন্য উন্নততর জাতিসমূহের দ্বারা এক ধরনের 'জাতিগত' নিপীড়নও তাদের উপরে চলছে।"

আমাদের আধাসামন্তীয় সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে, দৃশ্য অদৃশ্য নানাভাবে, এমন কি আপাত-প্রগতিশীল মহলেও, বর্ণহিন্দু প্রাধান্য এবং জাতিদম্ভ সক্রিয়। অতএব উক্ত দলের কর্মসূচীতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে ঃ

> "উপজাতীয় এলাকার জন্য বা, যেখানে বিন্যস্ত জনসমষ্টির গঠন বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার দ্বারা চিহ্নিত, এমন সব এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যেই আঞ্চলিক সরকারসহ স্ব-শাসন চালু থাকবে এবং এই এলাকাগুলি উন্নয়নের জন্য পূর্ণ সাহায্য পাবে।" [১৬]

এই নীতির যথাযথ প্রয়োগের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড, দার্জিলিং ও অন্য অঞ্চলের অনুরূপ সমস্যার ভবিষ্যৎ স্থায়ী সমাধান নিহিত। একাধিকবার রাজ্যসমূহের ভাঙাগড়া হওয়া সত্ত্বেও এখনো ভাষা সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট একাধিক অঞ্চল সমেত গঠিত কয়েকটি রাজ্য রয়েছে। যেমন আসাম, কাশ্মীর, পঃ বঙ্গ, মণিপুর, বিহার ইত্যাদি। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক পরিস্থিতির জটিলতার দরুণ, এই রাজ্যগুলির খণ্ডীকরণ এখন সমীচীন নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। যদি কখনো তার প্রয়োজন হয়, শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে গ্রামভিত্তিক গণভোটের মাধ্যমেই শুধু তার মীমাংসা হতে পারে। [১৭] আর সে প্রয়োজন যাতে আদৌ দেখা না দেয়, তার জন্য স্বেচ্ছায় বিবিধের মিলনের (লেনিনের ভাষায়, Voluntary Integration) ভিত্তিতে সংহতিসাধনের ডাক দেওয়াটাই মার্কসবাদ সম্মত।

(৬)

ক্ষুদ্র ভাষণে ভারতের জাতিসমস্যার সব দিক তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই,

একটি প্রধান দিক নিয়েই মাকর্সবাদীদের চিন্তাধারার একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা উপস্থিত করার এই চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকে যে কয়টি কথা বেরিয়ে আসে, পুনরুক্তিদোষের ঝুঁকি নিয়েও, প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে সেগুলি তুলে ধরতে চাই আবার।

১) ইতিহাসের শিক্ষা এই যে স্পর্শকাতর কোনো জাতীয় দাবি ন্যায্য বলে স্বীকৃত হওয়ার পরেও যদি দীর্ঘকাল ধরে অপূর্ণ থাকে এবং দায়বদ্ধ গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব যদি এই দাবি হাসিলের জন্য যথাসময়ে সক্রিয় কার্য্যসূচী-ভিত্তিক (Actionoriented) আন্দোলন গড়ে না তোলেন, তবে রাজনৈতিক উদ্যোগ অবশেষে ভেদবাদী আঞ্চলিক উগ্রজাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে যায় এবং তাঁরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হন।

২) জাতির নামে বজ্জাতি বড় জাতি এবং ক্ষুদ্র জাতি উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। আমরা সাধারণত জাতীয়তাবাদ আর গণতান্ত্রিকতাকে একাকার করে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু তা ঠিক নয়। জাতীয় আন্দোলন গণতান্ত্রিক না-ও হতে পারে। যেমন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, হিটলারের জার্মাণ জাতির একীকরণ আন্দোলন বা সামন্তবাদীদের নেতৃত্বে তিব্বতের বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন, অবশ্যই জাতীয় আন্দোলন ছিল, কিন্তু গণতান্ত্রিক ছিল না। বিশেষ পরিস্থিতিতে, সত্যিই, বুর্জোয়া পণ্ডিতের ভাষায়, "জাতীয়তাবাদ বজ্জাতদের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়" (লর্ড এ্যাক্টন)।

৩) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদের অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন বলশেভিকরা। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ ধ্বসিয়ে তখন জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটলে ইউরোপে সর্বহারা বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হত। কিন্তু মহাযুদ্ধ-পরবর্তী নয়া-ঔপনিবেশিকতার যুগে, মার্কিন বুর্জোয়ারাই হয়ে পড়েছেন এই নীতির সবচেয়ে বড় প্রবক্তা।[১৮] তাঁদের অর্থ সাহায্যে তৃতীয় বিশ্বকে ডিঙিয়ে "চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং স্পর্শকাতর "আন্তর্জাতিক সীমান্ত-বিভাজিত জাতিগুলির" সমস্যা নিয়ে গবেষণা ও সেমিনার ইত্যাদি আকছার হচ্ছে। এই দৃশ্যপট মনে রাখা দরকার। তাছাড়া পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে রূপান্তরের যুগে জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক ভূমিকাটিই ক্রমে প্রধান হয়ে উঠছে। চাপা পড়ে যাচ্ছে সমান্তবাদ-বিরোধী, গণতান্ত্রিক ভূমিকা। এটাও লক্ষণীয়।

৪) পুঁজিবাদের বিকাশের একটা স্তরে, জনপ্রব্রজনের ফলে অনেক অঞ্চলই আর বিপুলভাবে একজাতি-অধ্যুষিত হয়ে থাকে না। যেখানে প্রধান জাতির সঙ্গে

পাশাপাশি সহাবস্থান করে অন্যান্য ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী। আর এ দৃশ্য সবচেয়ে বেশী দেখা যায় রাজ্য বা প্রদেশের সীমান্তঘেঁষা জেলাগুলিতে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয়তার মাপকাঠি (Principle of nationalities) অনুযায়ী বিভাজন প্রক্রিয়াকে অবশেষে এক জায়গায় থামাতেই হয়। তাই, জাতীয় প্রশ্নের শতকরা একশ ভাগ সমাধান জাতীয় চেতনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সম্ভব নয়। তবে,—

> "বর্তমানে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসীমা বেঁধে দেয়া, ট্রাইবেল ও উঠতি জাতিগুলোর জন্য আত্মশাসন ও সমস্ত জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচ, সকল ভাষার সমানাধিকার এবং এক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতিত্ব রদ, কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা কমিয়ে রাজ্যগুলির অটোনমি প্রসারিত করা প্রভৃতি দাবি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিতরেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জোরে কম-বেশি আদায় করা সম্ভব। এই ধরণের সমস্যাগুলো যতদূর মিটানো যাবে, ততই গণতান্ত্রিক ও শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের লড়বার সুযোগ বাড়ছে।" [১৯]

এই কয়েকটি কথা মনে রেখেই, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন নতুন জাতিগুলির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে যথোচিতভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাইরের কলকাঠি নাড়ানোর ফলেই ছোট ছোট জাতিগুলির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে, নচেৎ দেখা দিত না—এমন চিন্তা মার্কসবাদ-সম্মত নয়। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে শ্রেণী সংগ্রামে আলোড়িত জনসমাজের মধ্যে নানা অঞ্চলে নতুন নতুন জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটছে, আর বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ানো হচ্ছে তাদের বিপথগামী করার জন্য। এভাবে দেখাটাই মার্কসবাদসম্মত।

> "জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য গঠনের দাবি উঠলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায় না। এই ধরনের প্রত্যেকটি আন্দোলন ও দাবিকে গণতন্ত্রের দিক দিয়ে বিচার করেই কর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।" [২০]

স্বভাবত, এখানে ঘরের কাছের দার্জিলিঙ জেলার সাম্প্রতিক গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন তথা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবির প্রসংগ এসে পড়ে। আলোচনার খেই ধরে এ সম্বন্ধে কিছু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

(৭)

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বর্তমান দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল বৃটিশ ভারত তথা বঙ্গদেশের বহির্ভূত এবং জনবিরল। পরে নেপাল, সিকিম এবং ভূটানের রাজাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বিভিন্ন এলাকা নিয়ে বঙ্গদেশের মধ্যে ক্রমে দার্জিলিং জেলার সৃষ্টি। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সামন্তীয় শোষণে জর্জরিত নেপাল থেকে জনাগমন ঘটেছে এই জেলায়। এখনো অব্যাহত এই জনাগমন স্রোত। চাষবাসের জমি এবং চা ও সিনকোনা বাগিচায় কাজকর্মের খোঁজে নেপাল থেকে হাজারে হাজারে আগতদের অনেকেই উপজাতীয় এবং লিম্বু, রাই, শেরপা, তামাং ইত্যাদি নানা উপভাষাভাষী। আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য ঐতিহাসিক কারণে যেমন উত্তরবঙ্গে বাংলাভাষা রাজবংশীদেরো ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনি দার্জিলিং জেলায় খাস নেপালী ভাষা (খাস কুর) ক্রমে হয়ে পড়েছে নেপাল থেকে আগত অধিবাসীদের সার্বজনিক ভাষা। এমন কি, লেপচা ও ভুটিয়াদের সংগে ভাব বিনিময়েরও ভাষা। জেলায় শিলিগুড়ি মহকুমায়, নেপালীভাষীরা মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশের (৭%) বেশি হবে না এখন, কিন্তু বাকি তিনটি পার্বত্য মহকুমার একত্রিত জনসংখ্যার নব্বুই শতাংশই (৯০%) নেপালীভাষা। এই তিনটি মহকুমাকে তাই পশ্চিমবঙ্গের গোর্খাদের গৃহভূমি বলা যেতে পারে।

প্রধানত, এই গৃহভূমির উপরে দাঁড়িয়েই পঃ বঙ্গে গোর্খাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংকুরণ ও প্রসারণ ঘটেছে বিগত প্রায় একশ বছর পরে। দার্জিলিং শহর থেকেই ১৮৮৭তে টার্ণবিল (Turnbill) সাহেবের নেপালী ভাষায় ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। নেপালী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব ও দার্জিলিং-এর। ১৯০১-এ যখন সেখানে রেভা, গংগাপ্রসাদ প্রধানের সম্পাদনায় গোর্খা খবর কাগজ প্রকাশিত হয়, তখনো খোদ নেপালে কোনো সংবাদপত্র ছিল না। ১৯১৮ থেকে পরশমণি প্রধানের সম্পাদনায় **চন্দ্রিকা** মাসিক পত্রিকার প্রকাশ এবং ১৯২১ থেকে এলাহাবাদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে নেপালী ভাষার অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় থেকেই জেলার পার্বত্য এলাকার প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নেপালী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার আন্দোলন দানা বাঁধে (ত্রিশের দশকে কার্যকরী হয়) এবং নেপালী সাহিত্য আন্দোলনের ভিত্তি প্রশস্ত হয়। তার আগেই, ১৯১৭-তে দার্জিলিং-এর পর্বতবাসীদের পক্ষ থেকে বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করা এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে কয়েকজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোক উক্ত জেলার সংগে ডুয়ার্স

অঞ্চলকে যুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এই দাবিকে কেন্দ্র করেই, বৃটিশ শাসকদের উস্কানিতে ও রাজভক্তদের নেতৃত্বে, হিলমেন্স এ্যাসোসিয়েশন ১৯২১-২২ নাগাদ গড়ে উঠেছিল। এই এ্যাসোসিয়েশনের সত্যিকার কোন গণভিত্তি ছিল না। বরং বিশের দশকে গোর্খা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেপালী সাহিত্য সম্মেলন এবং পরবর্তী দশকে গোর্খা লীগ দার্জিলিংবাসী গোর্খাদের নবলব্ধ চেতনার মঞ্চ হিসাবে দেখা দিয়েছিল।[২১] তা সত্ত্বেও এ্যাসোসিয়েশনের বৃটিশ ঘেঁষা ভেদপন্থী কার্য্যকলাপ নানাভাবে চলতে থাকে। 'পাহাড়ি' দের সম্পর্কে বাঙালী অভিজাত এবং মধ্যবিত্তের আচার-আচরণে উচ্চমন্যতার প্রকাশ্যে এ ব্যাপারে ইন্ধন যোগাতে থাকে। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের কাছে এবং ১৯৪২-এ আবার ভারত-সচিবের কাছে দার্জিলিং-এর জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টির দাবি পেশ করা হয়। ১৯৪২ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দার্জিলিংবাসী গোর্খাদের যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। তবু উন্মেষমুখী গোর্খা জাতীয় চেতনায় এই আন্দোলনের ছাপ পড়তে শুরু করেছিল ১৯২১-২২ থেকেই।

১৯৪২-৪৩-এ নদীয়ার সুশীল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে জেলায় কমিউনিস্টদলের কার্য্যকলাপের সূচনা হয়েছিল। ফলে, চল্লিশের দশকে পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯২৮-এ প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় গোর্খা লীগের স্থানীয় শাখার প্রতিপত্তি মধ্যশ্রেণীর গোর্খাদের মধ্যে বাড়তে থাকলেও, নিম্নবর্ণের গোর্খারা, বিশেষ করে বাগিচাশ্রমিকরা, কমিউনিস্ট দলের প্রভাবের আওতায় আসতে থাকেন। তখনকার দলীয় কর্মসূচী অনুযায়ী কমিউনিস্টরাই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক নীতিকে গোর্খাদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। স্বাধীন ভারতে জাতি হিসাবে দার্জিলিং-এর গোর্খাদের থাকবে অন্তর্ভুক্ত থাকা বা না থাকার নিঃশর্ত অধিকার—এই আওয়াজের এবং শোষণবিরোধী আর্থরাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতে গোর্খা জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চে টেনে আনা সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের কথা নীতিগতভাবে বলা হলেও, বাস্তবে কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদকে পরাস্তই করা হয়েছিল। রতনলাল ব্রাহ্মণ, ভদ্রবাহাদুর হামাল, গণেশলাল সুব্বা প্রমুখের পরিণত রাজনৈতিক নেতৃত্বে বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে শ্রমিক ঐক্য দৃঢ় হয়েছিল। ফলে, পশ্চিমবংগে অবস্থিতির অনুকূলে জনমত গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে, বৃটিশঘেঁষা ভেদবাদীদের পুরানো স্বতন্ত্র পার্বত্যরাজ্য দাবির পক্ষে আর জনসমর্থন ছিল না। বরং, নেপালীভাষা সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলে

এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই স্বশাসিত গোর্খাল্যাণ্ড এলাকা গড়ার সুযোগ থাকলে স্থানীয় নেপালীভাষীদের জাতীয় আশাআকংখা পূর্ণতা পাবে—দার্জিলিং এমন একটি মনোভাবই গড়ে উঠেছিল। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল প্রধানত গোর্খা শ্রমিকশ্রেণীর নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক চেতনা। এখানে উল্লেখ্য যে ঠিক ভারত বিভাজনের পরে পরেই বৃটিশ চা-মালিকদের ইংগিতে গোর্খা লীগ এবং অন্যান্য ভেদবাদীরা দার্জিলিং, ডুয়ার্স, কোচবিহার, এবং আসামকে নিয়ে একটা আলাদা প্রদেশ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। তখন **দৈনিক স্বাধীনতায়** প্রকাশিত এক প্রবন্ধ এর তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছিল। [২২] জনসমর্থনের অভাবে গোর্খা লীগ অবশেষে তাদের ভেদবাদী এই অবস্থান থেকে ক্রমে সরে আসতেও বাধ্য হয়েছিল।

এই পরিবর্তনের ফলে, দার্জিলিং অঞ্চলে কমিউনিস্ট দল গোর্খা লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেস—এই তিন প্রধান সক্রিয় পক্ষের প্রতিনিধিরা যুক্তভাবে স্বাক্ষরিত একটি স্মরকপত্রে ১৯৫৭ সালেই দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকার জন্য স্বশাসনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। অনুরূপ দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভায়ও ১৯৬৭ এবং আবার, ১৯৮১ সালে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এপর্যন্ত রাজী হননি এই দাবি মেনে নিতে। যেসব কারণে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় মার্কসবাদীদের প্রভাব বেড়ে চলেছিল, তার অন্যতম হল পঃ বঙ্গের মধ্যে গোর্খাদের জন্য স্বশাসিত এলাকার অনুকূলে এই রাজনৈতিক অবস্থান। ১৯৫৫-তে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছেও মার্কসবাদীরা অনুরূপ প্রস্তাব রেখেছিলেন।

স্বতন্ত্র গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্যের বদলে রাজ্যের মধ্যেই স্বশাসিত গোর্খাল্যাণ্ড এলাকা সৃষ্টির প্রস্তাব কেন শ্রমজীবী গোর্খা জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, তা-ও বোঝা দরকার। ভারতের মোট নেপালীভাষী জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ মাত্র দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা ; বাকি ১০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গেই অন্যত্র এবং ৫৭ শতাংশ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালি গণআন্দোলন রয়েছে, যা বিপদে আপদে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ায়। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে খুবই ছোট রাজ্য। এ অবস্থায় রাজ্যকে দুটুকরো করলে কারো কোন লাভ নেই। বরং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, তখন উভয় অংশেই উগ্র জাতীয়তাবাদের শিকড় আরো শক্ত হবে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে দার্জিলিংকে পঃ বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আওয়াজ

উঠেছিল স্থানীয় রাজভক্ত ভূস্বামীদের কায়েমী স্বার্থেব তরফ থেকে। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেব প্রভাব থেকে দাজিলিংকে দূরে রাখা। আশির দশকে আবার এই আওয়াজ আরো প্রবলভাবে উঠেছে ঐ একই গোষ্ঠী এবং উঠতি স্থানীয় বুর্জোয়াদের তরফ থেকে। প্রায় ৪০,০০০ নেপালী অধিবাসীকে, নাগরিকত্ব না থাকার অজুহাতে, মেঘালয় রাজ্য থেকে হঠাৎ বহিস্কৃত করার ফলে উদ্ভূত উত্তপ্ত পরিস্থিতিই গোর্খা ভেদবাদীদের পুনরুত্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে। জনসাধারণের একটি বড় অংশকে বিভ্রান্ত করে তাঁরা একটি উগ্রজাতীয়তাবাদী ফ্রন্টো (GNLF) গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন ! উদ্দেশ্য, দার্জিলিং-এর শ্রমিক-কৃষকদের প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিষিয়ে তোলা এবং পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেব প্রভাব থেকে গোর্খা শ্রমজীবি সমাজকে বিচ্ছিন্ন করা। উন্মুক্ত কুকরি এবং রক্ততিলক প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে ধোঁয়াটে কথাবার্তার আড়ালে, উগ্র জাতীয়তাবাদীরা এক ফ্যাসিস্ট-সদৃশ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

কাগজ কলমে GNLF-এর দাবি ভারতের মধ্যেই স্বতন্ত্র গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্য আদায়ের দাবি বটে, কিন্তু মিজোরামের দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় এই দাবির শেষ কোথায় হবে। মিজোরামে যেমন "বৃহত্তর মিজোরামের" আওয়াজ ইতিমধ্যে উঠেছে, তেমনি "বৃহত্তর গোর্খাল্যাণ্ডের" দাবিও যথাসময়ে উঠবে। রাজকীয় নেপাল থেকে এক পূর্বমুখী জনপ্রব্রজনের শ্রোত অব্যাহত। ইতিমধ্যে এর ফলে দার্জিলিং, সিকিম এবং ভূটানে নেপালীভাষীরাই বিপুলভাবে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত। ডুয়ার্স অঞ্চলে, পার্শ্ববর্তী আসামে ও হিমালয়ের সানুদেশে অনেক নেপালী অধ্যুষিত পকেট গড়ে উঠেছে। অতএব, ভারতের বাইরে এবং ভিতরে লাগায়ো সমস্ত নেপালী ভাষী অঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর গোর্খাল্যাণ্ড গড়ার স্বপ্নও অনেকেই দেখতে সুরু করেছেন। কমিউনিস্ট প্রভাবমুক্ত এবং গণতন্ত্র বর্জিত এইরকম একটি এলাকা সৃষ্টির ব্যাপারে নয়া-সাম্রাজ্যবাদীদেরো উৎসাহ না থাকার কথা নয়। উল্লেখ্য, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ফৌজের জন্য আজও এই বৃহৎ এলাকা থেকে ব্যাপকভাবে গোর্খা রং রুট সংগ্রহ করা হয়।

এইসব কথা বিবেচনা করেই ভারতীয় গোর্খাদের প্রগতিশীল অংশ GNLF-এর আলাদা গোর্খা রাজ্য দাবির বিরোধিতা করেছেন। এই বিরোধিতা করতে গিয়ে অন্ততঃ ত্রিশজন গোর্খা রাজনৈতিক কর্মী উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হাতে এপর্য্যন্ত নিহত এবং সহস্রাধিক পরিবার গৃহহীন হয়েছেন। উগ্র গোর্খা জাতীয়তাবাদ

কিংবা উগ্র বাঙ্গালিয়ানার পথে নয়, বরং পারস্পরিক আলোচনা থেকে উদ্ভূত কর্মসূচী অনুযায়ী মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। নেপালী ভাষার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৬-এর ৩০শে জুলাই-এর মধ্যে আগত নেপালীদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা এবং রাজ্যের মধ্যে স্বশাসিত এলাকা সৃজনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পথেই পঃ বঙ্গের গোর্খাদের জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা বহুলাংশে সম্ভব। মার্কসবাদ অনুযায়ী এটা বর্তমান পর্যায়ে মূলত রাজনৈতিক আশা-আকাংখার প্রশ্ন, অর্থনীতির নয়। তবে, একথাও মনে রাখা দরকার যে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের অগ্রগতির চাবিকাঠি রয়েছে কৃষি-সমস্যার সমাধানে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে নয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে মার্কসবাদীদের কাছে তাই জাতীয় প্রশ্নের স্থান কৃষিসমস্যার নিচে। [২৩] বিমূর্ত নীতিবাগীশতার বা নিয়মতান্ত্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, রাজনৈতিক-বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জাতীয় প্রশ্নের মোকাবিলা করা উচিত। পরিস্থিতি বিচার করেই, ভারতে মার্কসবাদীরা সম্প্রতি ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের জন্য নতুন করে কোন রাজ্যকে খণ্ডিত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মনে এধরনের খণ্ডীকরণের ফলে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতাই শুধু বাড়বে এবং সেই রন্ধ্রপথে নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটবে। এ-ব্যাপারে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এমন কি আসামের অসম গণপরিষদ দলও একমত। [২৪]

উপসংহারে আবার বলতে চাই যে ছোটবড় অনেক জাতি উপজাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাতপাত নিয়ে গঠিত একটি দেশ, উদার ফেডারেল নীতি মেনে চললে জাতীয় প্রশ্নের সমাধান বহুলাংশে সম্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান কখনোই সম্ভব নয়। শ্রেণীসমাজে জাতীয় সমস্যা অল্পবিস্তর থেকেই যাবে। এমন কি যেসব দেশে সমাজবাদ কায়েম হয়েছে, সেখানেও এর ক্রমক্ষীয়মান জের নির্মূল হতে বহুদিন লাগবে। এই বাস্তবকে মেনে নিয়েই, সমাজ আন্তর্জাতিকতাবাদের পথে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে।

তথ্যনির্দেশক পাদটীকা

১. জে. ভি. স্তালিন, Marxism and the National Question (মস্কো, ১৯১৩)।

২. ভি. আই. লেনিন, "Right of nations to self-determination" (Collected Works, খণ্ড ২০, মস্কো, ১৯৬৪) ; "Critical remarks on the national question," প্রাগুক্ত এবং "The discussion on self-determination summed up" (Collected Works, খণ্ড ২২, মস্কো, ১৯৬৪)।

৩. এংগেলসের রচনা থেকে উদ্ধৃতির জন্য, পি. এন. ফেদোসেয়েভ, Leninism and the National Question (মস্কো, ১৯৭৭) পৃ ৫৯।

৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৫, (শতবার্ষিকী সংস্করণ, পঃ বঙ্গ সরকার, কলিকাতা) পৃ ২৮৪-৫।

৫. অমলেন্দু গুহ, "The Indian national question : a conceptual frame" Economic and Political Weekly, খণ্ড ১৭, জুলাই, ১৯৮২ এবং "Nationalism : Pan-India and regional in a historical perspective" (ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বর্ধমান অধিবেশনে পঠিত আধুনিক ভারতের ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ) Social Scientist, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

৬. উদ্ধৃতির জন্য, গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত এবং সত্যশংকর গুপ্ত অনূদিত পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য (কলিকাতা, ১৯৪৪) পৃ ৫৯।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১১ এবং পৃ ১৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮-৯।

১১. স্মারকলিপির জন্য, এইচ. এন. মিত্র সম্পাদিত, Indian Annual Register খণ্ড ১, জানুয়ারী-জুন ১৯৪৬, পৃ ২২০-২১।

১২. অমলেন্দু গুহ, Planter Raj to Swaraj : Feedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1926-1947 (নিউ দিল্লী, ১৯৭৭) পৃ ৩১০-৫।

১৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অসম প্রাদেশিক সম্মিলন ঃ রাজনৈতিক প্রস্তাব ঃ প্রথম অধিবেশন (গৌহাটি, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) পৃ ১৬-১৭।

১৪. সি পি আই (এম), Work Report (Political) of the Central Committee to the Ninth Congress.... Note on National Question and

Amendment to Party Programme Adopted by the Ninth Congress (কলিকাতা ১৯৭২)।

১৫. পি সুন্দরাইয়া, National Integration · A Critique of Govt. Policies (কলিকাতা, ১৮৭৪) , পৃ ২০-২৩।

১৬. উভয় উদ্ধৃতির জন্য, ১৪নং-এ উল্লিখিত "Note on National Question .... " (অনুবাদ আমাদের)।

১৭. লেনিন এবং স্তালিন, উভয়ের মতেই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তবে, এই অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকারও রয়েছে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর ও জনসাধারণের। যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তীয় স্বার্থের অনুকুলে যায়, তবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য তাকে বাধা দেওয়া।

লেনিন একথাও বলেছেন যে সীমিত স্ব-শাসন পরিস্থিতিভেদে অধিকতর স্ব শাসন, এমন কি পূর্ণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকেও একটি পদক্ষেপ হতে পারে। আবার, তা নাও হতে পারে। "The discussion on self-determination summed up", নং ২, পৃ ৩৪৪-৫।

১৮. সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ছোট ছোট জাতির আন্দোলন ব্যবহৃত হওয়ার বিরুদ্ধে এংগেলস্ এবং লেনিনের সতর্কবাণীর কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট নেতা জেম্‌স্ ই. জ্যাকসনের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। "জাতীয় প্রশ্ন আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার নয়া-ঔপনিবেশিক নীতির বিশেষ বিচরণক্ষেত্র। ..... জাতিসমূহের স্বাধীনতা ধ্বংসকারী সাম্রাজ্যবাদীরা আজকাল 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' অতি-বড় প্রবক্তা রূপে অবতীর্ণ। জাতীয়তাবাদের সকল রকমফেরের বড় মুরব্বী আজ ওয়াশিংটন। ..... ১৯৭৯ ৭ই আগস্টের বক্তৃতা, Political Affairs, ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, পৃ ৩।

১৯. উদ্ধৃতির জন্য অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, ভারতে জাতীয় প্রশ্ন ও মার্কসবাদ (কলিকাতা, ১৯৮৫) পৃ ১২। গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি সর্বপ্রথম প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল **দেশহিতৈষীতে** (শারদসংখ্যা, ১৯৭০)

২০. উদ্ধৃতির জন ভট্টাচার্য, **প্রাগুক্ত**, পৃ ৪৭। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি "জাতীয় প্রশ্ন ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সমস্যা....শিরোনামায় প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রাকশিত হয়েছিল **দেশহিতৈষীতে** (শারদসংখ্যা, ১৯৭৪)।

২১. বিস্তৃত তথ্যের জন্য, ১৯৭৯-এ ওয়ালটেয়ারে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত, বরুণ দে এবং প্রণবরঞ্জন রায়-এর "Notes for the history of Darjeeling District" দ্রষ্টব্য।

২২ "চা বাগান অঞ্চলকে বাংলা হইতে পৃথক করিবার প্রচেষ্টা", **দৈনিক স্বাধীনতা**, ৩রা অক্টোবর ১৯৪৭।

২৩. প্রকাশ করাত "Theoretical aspects of the national questions", Social Scientist, খণ্ড ৪, আগস্ট ১৯৭৫।

২৪. সংবিধনের তিন নম্বর ধারা অনুযারী যে কোন রাজ্যের সীমানা অথবা নাম পরিবর্তনের এবং নতুন রাজ্য সৃষ্টির ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা রদ করার জন্য উক্ত ধারাটির সংশোধন দাবি করেছে All Assam Students Union (AASU)।—সতীশচন্দ্র কার্কতি, "Should Assam be devided ?", the Statesman, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৬ দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য, আসাম, কাছাড় এবং পঃ বঙ্গ দার্জিলিং সম্পর্ক নানা দিক দিয়েই তুলনীয়।

ধর্ম ও পূর্ব-ভারতে কৃষক আন্দোলন ঃ
(১৮২৪-১৯০০)

বিনয়ভূষণ চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে মূল ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি। সংসদ কর্তৃপক্ষকে এর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে ইতিহাস গবেষণার প্রসারে সংসদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

আমার ভাষণের বিষয়—বাংলা ও বিহারের কয়েকটা বিশিষ্ট কৃষক আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা; সময়কাল—উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত।

(১)

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে কৃষক বিদ্রোহের সামগ্রিক রূপ বোঝানো যায় না, এর জন্য বিদ্রোহীদের মানসিকতা বিশ্লেষণ অপরিহার্য-এ কথা এখন মোটেই নূতন নয়। বিদেশে এবং ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

বিদ্রোহের উদ্ভবে অর্থনৈতিক কারণের ভূমিকা অনস্বীকার্য; কিন্তু বিদ্রোহের যৌথ সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র 'প্রভু' শ্রেণী সম্পর্কে কৃষকদের নিরুদ্ধ আক্রোশের ফল নয়। তাদের নানা বিশ্বাস ও ধারণা প্রতিরোধের সংকল্পকে প্রভাবিত করে। যেমন, একটা বিশ্বাস তাদের ও প্রতিদ্বন্দ্বীগোষ্ঠীর শক্তির আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত। বিদ্রোহ এক অর্থে ক্ষমতার লড়াই; অবস্থা বিশেষে এ ক্ষমতার ক্ষেত্র কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও বা ব্যাপক। প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় অনিবার্য, এ বিশ্বাস বিদ্রোহীদের সবক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত নাও করতে পারে। কিন্তু শত্রু অপ্রতিরোধ্য নয়, এ বিশ্বাস না থাকলে সংঘবদ্ধ আন্দোলন সহজে গড়ে ওঠে না। কৃষকদের বিচার বস্তুনিষ্ঠ নাও হতে পারে। হয়তো তাদের ক্ষমতাকে তারা বাড়িয়ে দেখেছে, বা শত্রুর ক্ষমতাকে যথাযথ মূল্য দেয়নি।

চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন, স্কটিশ চার্চ কলেজ, ১৯৮৭

ঐতিহাসিক কাজ এ বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি যাচাই করা নয়; কাজ তাকে চিহ্নিত করা এবং যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করা।

শুধুমাত্র প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত বোঝার ক্ষেত্রেই কৃষকদের নানা বিশ্বাসের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। এ সিদ্ধান্ত কৃষক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। পরবর্তী পর্যায়গুলির সঙ্গে কৃষকদের সাম্প্রতিক শ্রেণী-সম্পর্কের সংযোগ অনেক ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ। প্রায়ই দেখা গেছে, বিদ্রোহীদের প্রথম ঘোষিত লক্ষ্য পরে অনেক পাল্টে গেছে।[১] যে ধারণার উপর কোনো কোনো নূতন লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত, তার উৎস কৃষকদের অতীত দিনের যৌথ স্মৃতি; সে অতীত কোথাও বা সুদূর, কোথাও নিকট। বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা এ স্মৃতিতে বিধৃত হয়ে আছে, কিন্তু তাই স্মৃতির একমাত্র উপাদান নয়। সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য কৃষকদের সহজাত আকাঙ্ক্ষা, অনিবার্য আশাভঙ্গ, নূতন স্বপ্ন রচনা, এবং আরো অনেক কিছু স্মৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। অতীতের প্রায়-বিস্মৃত এমন মুহূর্তও এমনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাই, কৃষকদের সাম্প্রতিক শ্রেণী-সম্পর্ক এ অতীত-চারণা, ইতিহাস-চেতনার একটি উলপক্ষ্য মাত্র। অর্থাৎ যে ধারণা ও বিশ্বাস প্রভাবিত হয়ে বিদ্রোহীরা তাদের লক্ষ্য স্থির করে তা অত্যন্ত জটিল।

তাছাড়া, যেকোন কৃষক আন্দোলনের একটা বড়ো দিক, তার সংগঠন। কৃষকদের শ্রেণী-সম্পর্কের বিশিষ্ট বিন্যাস প্রতিরোধের মূল গতি ও ধারাকে নির্ধারিত করে; কিন্তু তার সংগঠন কৃষকদের যৌথ সমাজ-জীবনের নানা দিকের উপর নির্ভরশীল। এ সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নানা প্রাক্তন সংস্কার ও বিশ্বাস। বিদ্রোহের বিশিষ্ট মুহূর্তগুলিতে নূতন বোধও উন্মেষিত হয়।

বিদ্রোহীদের এ জটিল মানসিকতা বিশ্লেষণের একটা অপরিহার্য দিক তার উৎস নির্দেশ। এ উৎস স্বভাবতই বহুমুখী। একটা প্রধান উৎস হিসেবে ধর্মচেতনার রূপবিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

'ধর্ম' কথাটি আমি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছি। ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি, তাদের নানা রূপ বিকাশ, রূপান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা আছে; অনেকক্ষেত্রে তারা পরস্পরবিরোধী। একটা বিষয়ে নানা ব্যাখ্যায় মোটামুটি মিল আছে। তা হল, ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রে আছে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক কোন শক্তির ধারণা, যে শক্তি মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে; এমনকি তার ধারাকে নির্ধারিত করে। 'ভগবান' বলে কোন অস্তিত্ব কল্পনার সঙ্গে এ বিশ্বাসও যুক্ত হয়ে আছে যে, ভগবানের শক্তি মানুষের আয়ত্ত-বহির্ভূত। ভগবানের ঐশ্বর্য কোন কোন মানুষে আরোপিত

হতে পারে; এমনকি মানুষও ভগবানে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু সেখানেও মূল বিশ্বাস— সে মানুষ বিশেষ একজন; সাধারণ জীবনের ব্যবহারের নানা বস্তু, ধর্মীয় লক্ষণে মণ্ডিত হতে পারে। অনেক নৈতিক বিধান, আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নানা অনুশাসন ও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। তবে মানুষের প্রয়োজনে ধর্মের সৃষ্টি; তাই লৌকিক পরিবেশের ভিন্নতায় এ বিশ্বাসের রূপও পাল্টায়।

এ বিশেষ অর্থে কৃষক বিদ্রোহে ধর্মচেতনার ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে এর কয়েকটা বিশেষ দিক প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। আগেই বলেছি, বিদ্রোহী কৃষকদের মানসিকতার উৎস বহুমুখী। অন্যান্য অনেক প্রভাবের সঙ্গে ধর্মচেতনাও নানাভাবে মিশে থাকে। যে ধর্মবিশ্বাস কৃষক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, বহুক্ষেত্রে তা কৃষকদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র। পুরনো ধর্মবিশ্বাস যদি থাকেও বা, তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে; বা কৃষকেরা সচেতনভাবে তার অংশবিশেষ বেছে নিয়েছে। তাছাড়া ধর্মচেতনার বিশিষ্ট ভূমিকা আন্দোলনের সব পর্যায়ে সমান থাকেনি। সাধারণতঃ, এ ভূমিকা তখনই স্পষ্টভাবে দেখা গেছে, যখন বিদ্রোহী কৃষকেরা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পুনর্বিন্যাসের কথা ভেবেছে; কারণ তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ ছাড়া 'প্রভু' শ্রেণীর কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ ধর্মচেতনার ভূমিকা এক বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সম্পৃক্ত।

(২)

ধর্মের প্রভাবের দিক থেকে বিচার করলে দু'ধরনের আন্দোলন দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রভাব একান্তই সীমিত; এখানে ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকা প্রধানতঃ আন্দোলনের সংহতিরক্ষায়। দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলনে এ প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী এবং গভীর। এখানে বিদ্রোহের যৌথ সিদ্ধান্ত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সংগঠনের মূল শক্তি ধর্ম-প্রভাবিত কোন কোন বিশ্বাস। নেতার প্রতি অবিচল আনুগত্যের একটা প্রধান উৎস ধর্মীয় ধারণা। আন্দোলনের উপায় ও লক্ষ্যেও ধর্ম-বিশ্বাসের গভীর প্রভাব। তবে ধর্মবোধ অপরিবর্তনীয় কিছু মোটেই নয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে, আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় ধারণাও পাল্টে গেছে।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলন। তবুও প্রথম জাতের আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে, কারণ, দুই ভিন্ন ধরনের আন্দোলনে ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখার উপায়গুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এতে সহজ হবে।

(২.১)

এর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত[১] উল্লেখ করব—চম্পারণের নীলচাষী বিদ্রোহ (১৯০৮/০৯)।

এর আগের নীল-বিরোধী আন্দোলনে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দুর্লভ। আন্দোলনের ঐক্যরক্ষার জন্য তখন নেতাদের প্রধান নির্ভর ছিল নানা ধরনের পীড়ন-মূলক ব্যবস্থা। গোড়ার দিকে আন্দোলন বিরোধীদের সতর্ক করে দেওয়া হত, যদি তারা নিজেদের আচার-আচরণ না পাল্টায়, তাহলে পরিণামে অনর্থ ঘটবে। নীলকুঠির সঙ্গে যোগ-সাজসের অকাট্য প্রমাণ থাকলে শারীরিক নির্যাতন, বাড়ীঘর বা অন্যান্য সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা বিরল নয়। এ ধরনের প্রত্যক্ষ হিংসার পন্থা নেতারা যথাসম্ভব পরিহার করে চলত। কারণ, এর ফলস্বরূপ পুলিসী দমননীতি বিদ্রোহীদের সংগঠনকে অনিবার্যভাবে দুর্বল করত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আন্দোলন বিরোধিতার জন্য প্রধান শাস্তি ছিল অপরাধীদের একঘরে, সমাজচ্যুত করা। এটা বর্ণ-প্রথা সম্মত কোন বিধান নয়। প্রধানতঃ গ্রামের ধোপা-নাপিত তাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হত। এ শাস্তির গুরুত্ব শুধু এজন্য নয় যে, ধোপা-নাপিত ছাড়া কারো চলে না। এর একটা ধর্মীয় তাৎপর্যও ছিল। যেমন, নাপিতের কাজ শুধু ক্ষৌরকার্য নয়; পরিবারের নানা শুভ অনুষ্ঠানে তার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু—সবটাতেই এ ভূমিকা শাস্ত্রীয় নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অপরাধীরা তাই এসব মঙ্গ লাচার থেকে বঞ্চিত হত। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হত; যেমন, গোয়ালাদের উপর নির্দেশ ছিল, তারা যেন দোষীদের দুধ না দেয়।

এ শাস্তিবিধানের পেছনে যে ধারণা সক্রিয় ছিল তা হল এই, যে কৃষক-সম্প্রদায়ের যৌথ সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করার অপরাধের জন্য সর্বজনের ধিক্কার দোষীদের প্রাপ্য, এবং এ সামাজিক প্রতিবাদ এবং অনুশাসন তাদের বহুজনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিবৃত্ত করবে। যেখানে গ্রামবাসীরা যৌথভাবে, প্রধানতঃ নিষ্কর জমির মাধ্যমে, ধোপা-নাপিতের প্রাপ্য মিটিয়ে দিত, সেখানে এ অনুশাসন সম্ভবতঃ অনেক বেশি কার্যকরী হতে পারত।

চম্পারণে ১৯০৮/০৯ সালের আন্দোলনে সংহতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। এটা অপরিহার্যও ছিল। ১৮৬৭/৬৮ সালের পর চম্পারণে এ ধরনের

সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আর হয়নি। নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করার ঘোষণাও করা হল এ প্রথম। সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠন আরো জরুরী হয়ে পড়েছিল, কারণ নীলকরেরাও নানাভাবে প্রশাসনকে কৃষক-বিরোধী ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করছিল। তারা বোঝাতে চাইল—এ আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বিক্ষোভের প্রভাব সুস্পষ্ট। এমনও বলা হয়, বাংলার নেতাদের সঙ্গে চম্পারণের কৃষক নেতাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে; চম্পারণের আন্দোলন তাই শুধু নীলকরদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধেও; তাই নিজের স্বার্থেই সরকার এ আন্দোলনকে দমিয়ে দিক। বস্তুতঃ, চম্পারণের আগের কোন আন্দোলনে কৃষকদের রাজ-বিরোধী মনোভাব কখনো এত সুস্পষ্টও ছিল না। এর প্রধান কারণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নীলকরদের অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে কৃষকদের আর কোন সংশয় ছিল না। একটা দৃষ্টান্ত থেকে কৃষকদের নূতন মেজাজ বোঝা যায়। আগে বিদ্রোহের শুরুতেই কৃষকেরা বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত প্রশাসনকে জানিয়ে দিত। কারণ, তারা জানত, নীলকরদের পাল্টা আক্রমণে হিংসা অনিবার্য; আগে ভাগে সরকারকে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার অর্থ প্রশাসন যাতে সম্ভাব্য হিংসা সম্পর্কে সতর্ক থাকে। এবার কিন্তু বিদ্রোহীরা সরকারকে কিছুই জানাল না। প্রধানতঃ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে তারা প্রবল শত্রুকে প্রতিরোধ করতে ব্রতী হয়।

নীল চাষ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার সংকল্প প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা হল; কিন্তু এ সংকল্প কার্যকরী করার জন্য অপরিহার্য ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যথাসম্ভব সতকর্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল। অটুট সংহতি ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রেই নেতারা অনুগামীদের ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল।

এর আগে নীলকর-বিরোধী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত বিশেষ দূত মারফৎ গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হত। এবার তা করা হল সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে—দশেরা উপলক্ষে (১৯০৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত) বেতিয়ায় এক বিশাল মেলায়, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে কৃষকেরা সওদার জন্য এসেছিল।

সরকারী দলিল থেকে জানা যায়, এ প্রকাশ ঘোষণার আগেই নেতাদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল। মেলা শুরু হবার তিনদিন আগে দুই প্রধান নেতা, সেখ গুলাব ও শীতল রায়, কয়েকটা গ্রামের মাতব্বর চাষীদের নিয়ে বিখ্যাত চিনি ব্যবসায়ী ও মহাজন রাধেমলের বাড়িতে শলা-পরামর্শ করে। উদ্দেশ্য, নীল চাষ বন্ধের শপথ সম্পর্কে ওখানে আলোচনা হবে। এখানে ঠিক হয়, হিন্দু চাষীরা শপথ নেবে

গ্রামবাসীদের কাছে অতি পবিত্র এক পিপল গাছের তলায় প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তির সামনে, মুসলমান চাষীদের বলা হল, মক্কার কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তারা শপথবাণী উচ্চারণ করবে। আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ভয়ও দেখানো হল ধর্মের নামে। বলা হল, দোষী হিন্দুদের গণ্য করা হবে গোমাংসভোজী, আর মুসলমানদের শূকরমাংসভোজী হিসেবে। অর্থাৎ এমনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হবে যেন গুরু অপরাধের জন্য তারা ধর্মচ্যুত হয়েছে।

প্রতিরোধের নীতি এবং কৌশল ঠিক করার জন্য যে বৈঠক ডাকা হত, তা বসত রাত্রে, প্রায়শ মধ্যরাত্রে। বৈঠকের স্থান নির্বাচনে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। এ জায়গার নাম দেবী অষ্টান। পাশাপাশি গ্রামের লোক নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এখানে পুজো করত বলে, এ জায়গা অতি পবিত্র বলে গণ্য হত। যে দেবীর সামনে বিদ্রোহীরা ঐক্য রক্ষার শপথ নিত, তা হল কালী। কেন এ দেবীর নির্বাচন, কৃষকদের ভাষ্যে তার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। সাধারণতঃ কালীদেবী সংহারের ভয়ালতা ও নির্মমতার প্রতীক। সংকল্পের দুর্জয় দৃঢ়তার দ্যোতক ছিল কি তার সামনে নেওয়া শপথ? মধ্যরাত্রির ঘন অন্ধকার কি এ শপথের আদর্শ পরিবেশ? সরকারি বিবরণ থেকে জানা যায়, একটা জায়গা সম্পর্কে কৃষকদের আপত্তি ছিল। তাদের ধারণা, ওখানে ভূত-প্রেতে ভর করেছে। বাধ্য হয়ে নেতারা সময় পাল্টে দিল—মধ্যরাত্রির বদলে ভরদুপুরে। কারণ, তখন হয়ত ভূত-প্রেতের আনাগোনা থাকবে না।

চম্পারণের পরবর্তী আন্দোলনে (১৯১৭/১৮) এ ধরনের ধর্মীয় প্রভাব বিশেষ একটা দেখা যায় না। একটা সম্ভাব্য কারণ, মহাত্মার ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাব। তাদের বিশ্বাস ছিল, গান্ধীর আবির্ভাব সব ধরনের অন্যায় ও শোষণ থেকে তাদের পরিত্রাণের জন্য; পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তিও তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কাছে পরাভূত হবে। আন্দোলনের সংহতি রক্ষার জন্য ধর্মের নামে শপথের মূল্য তাই অনেকটা কমে গেল।

(৩)

কৃষক আন্দোলনের উপর ধর্মের গভীরতর প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নলিখিত আন্দোলনকে আমরা বেছে নিয়েছি ঃ

(ক) ময়মনসিংহের শেরপুর অঞ্চলে 'পাগলপন্থী' আন্দোলন (১৮২৪-১৮৩৩)। এক নূতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ('পাগলপন্থী') এবং নানা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের এ আন্দোলনের দু'টি প্রধান পর্যায়— গোড়ার দিকে জমিদারী অপশাসনের

বিরুদ্ধে এবং ১৮২৪ সালের শেষের দিক থেকে সম্মিলিত জমিদার ও ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। 'পাগল-পন্থা'র প্রবর্তক করিম শাহ। তাঁর মৃত্যুর (১৮১৩) পর তাঁর পুত্র টিপুর আমলেই এ নূতন ধর্মীয় গোষ্ঠী ক্রমেই কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

(খ) ওহাবী ও ফরাজী আন্দোলন (১৮৩১-১৮৬০) এখানেও নেতৃত্ব দুই নূতন ধর্মীয় গোষ্ঠীর। ওহাবী আন্দোলনের শুরু ১৮৩১ সালে। ফরাজী ধর্মমতের প্রধান প্রবক্তা শরিয়াতুল্লার পুত্র দুদু মিঞা ফরাজী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলে। তার মৃত্যুতে (১৮৬২) ফরাজী আন্দোলনের এক বিশিষ্ট পর্যায়ের অবসান ঘটে বলা চলে।

(গ) সাঁওতাল বিদ্রোহের বিভিন্ন ধারা (১৮৫৫-১৮৮২)।

(ঘ) মুণ্ডা বিদ্রোহের দুই পর্যায় (১৮৯৪-১৯০০)।

(ঙ) ওঁরাও আন্দোলন (১৯১৪-১৯২০)।

(৪)

এসব আন্দোলনের উপর ধর্মীয় প্রভাবের রূপ ও চরিত্র বিশ্লেষণের আগে এ আন্দোলনগুলি সম্পর্কে কয়েকটা ব্যাখ্যার উল্লেখ প্রয়োজন। বিশেষ করে যেখানে কৃষকদের ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। তাদের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এবং কোন কোন সিদ্ধান্ত আমার কাছে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নয়। তবে ঘটনা-পরম্পরার উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তগুলির বিচার প্রবন্ধের এ অংশে করা হয়নি, কারণ আন্দোলনগুলির বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে দেব।

এ ব্যাখ্যাগুলোতে কৃষক আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব সাধারণভাবে স্বীকৃত। কয়েকটা ব্যতিক্রম সংক্ষেপে নির্দেশ করছি।

(৪.১)

প্রথম ব্যাখ্যা ভিলেম শেণ্ডেলের (Willem Schendel)—আমাদের তালিকার প্রথম আন্দোলন, পাগলপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে। তাঁর সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) এ আন্দোলন পাগলপন্থী বলে পরিচিত নূতন এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর নামে অভিহিত হলেও ধর্ম এ আন্দোলনের গৌণ দিক মাত্র। জমিদার এবং সরকার-বিরোধী এ আন্দোলনের শুরুতে ধর্মের কোন ভূমিকাই নেই। আন্দোলনের প্রধান কারণ, জমিদারদের সম্পর্কে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান তিক্ততা। আন্দোলন শুরু হবার

আগে তিন-চার দশক ধরে জমিদারদের কার্যকলাপে কৃষকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ আন্দোলন তাই অনিবার্য ছিল।

(খ) এটা আসলে 'বহু ধর্মের জাতির' কৃষক আন্দোলন। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে আন্দোলনকারীদের অনেকেই পাগল-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। নেতৃত্ব পাগলপন্থীদের হাতে ছিল বলেই সবাইকে নির্বিচারে পাগল বলা হত।

(গ) আসল সংঘর্ষের সময় পাগল সম্প্রদায়ের তিন প্রধান, করিম, টিপু ও তার মা, প্রত্যক্ষ কোন অংশ নেয়নি। তাদের ভূমিকা ছিল একান্তই 'সিম্বলিক' (Symbolic)।

(ঘ) এমন কি প্রতিরোধের ডাক তারা দেয়নি। বিদ্রোহী কৃষকেরা তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

(ঙ) শেণ্ডেল এ আন্দোলন সম্পর্কে ফুক্সের[৪] সিদ্ধান্তও মানেন নি। ফুক্স মনে করেন, এ আন্দোলন সর্বতোভাবে 'স্বর্ণযুগ' সম্পর্কিত বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত। শেণ্ডেলের মতে, অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে নূতন আদর্শ জগৎ ও সমাজ গড়ে উঠবে, বিদ্রোহীদের এরকম স্পষ্ট কোন দর্শন ছিল না। অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে কৃষকেরা বলত বটে, কিন্তু এর উপর তাদের নির্ভরশীলতা ছিল একেবারেই সীমাবদ্ধ।

(চ) তাদের লক্ষ্যও ছিল একান্তই সীমিত ঃ সরকারি বিধি-বিধান-নিয়ন্ত্রিত জমিদারী প্রথা। রাজশক্তি সম্পর্কে তাদের আক্রোশের প্রধান কারণ, জমিদারদের বৈধ ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে তাদের আবেদন নিবেদনে কোন ফল হয়নি।

(ছ) ধর্মের যদি কোন ভূমিকা থাকে, তা পাগলপন্থীদের সংগঠনের জন্য; আগে থেকেই তা ছিল; বিদ্রোহের সময় তা বিশেষ কাজে এসেছে।

প্রতিরোধের সংগঠনের উপর ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে শেণ্ডেলের শেষ সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের যুক্তিতেই টেকে না। তাঁর মতে, এ অঞ্চলের কৃষকেরা বহু ধর্ম, বহু জাতিভুক্ত। অবশ্য এত ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা এক হতে পারত, যদি তারা বিশ্বাস করত, তাদের মধ্যে এক 'পরিত্রাতা'র আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁর প্রভাব ধর্ম ও জাতিগত বিভেদবোধ ভুলিয়ে এক নূতন ঐক্যবোধের সৃষ্টি করতে পেরেছে। আগেই উল্লেখ করেছি, শেণ্ডেল এ আন্দোলনে এ ধরনের পরিত্রাতার ভূমিকা স্বীকার করেন না। তাহলে, নূতন ধর্মমত প্রচারের জন্য তৈরি সংগঠন আন্দোলনের সংগঠনকে কেমন

করে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করল?

(৪.২)

অন্যভাবেও দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে বিদ্রোহী কৃষকদের ধর্ম ও রাজনীতি অসম্পৃক্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বিহারের ওঁরাও উপজাতির আন্দোলন সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যাকে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যায়। এ ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এর প্রবক্তা ওঁরাওদের ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রধান বিশেষজ্ঞ শরৎচন্দ্র রায়ের।[৫] তাঁর মতে ওঁরাও আন্দোলনের মূল প্রেরণা ধর্ম-সংস্কার; এর রাজনৈতিক প্রেরণা একেবারেই ক্ষীণ। তাঁর মতে, এ ধরনের ধর্মীয় আন্দোলন ওঁরাওদের ইতিহাসে অভিনব কোন ঘটনা মোটেই নয়। আগেও তা ঘটেছে। নূতন আন্দোলনে তিনি অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা দেখতে পান। রাজনীতির অস্তিত্ব তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মতে তা ওঁরাও আন্দোলনের নগণ্য দিক। তিনি এমনও বলেছেন, ওঁরাওদের মানসিকতার সঙ্গেও রাজনীতি সঙ্গতিহীন, বিশেষ করে রাজশক্তি প্রতিরোধের রাজনীতি।

আমরা পরে দেখব, আসলে ওঁরাও আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম ও রাজনীতির অভিন্নতা। রায়ের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বিচারসাপেক্ষ। ওঁরাওদের এ সময়কার ধর্মীয় চিন্তায় নূতন উপাদানের অস্তিত্ব তিনি লক্ষ্য করেননি, বা তাকে যথোচিত মর্যাদা দেননি।

(৪.৩)

অন্যান্য ব্যাখ্যায় ধর্মের ভূমিকা স্বীকৃত। কিন্তু সঠিক ভূমিকাটি কি, এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ।

একটি ব্যাখ্যায় ধর্মকে কৃষকদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক মানসিকতা সৃষ্টির উৎস হিসেবে শুধু দেখানো হয়েছে। এ মানসিকতার বিশিষ্ট রূপ, বিদ্রোহী কৃষকদের কর্মপ্রয়াসে এক গভীর বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা। এ বিশ্বাস মতে, দিব্যশক্তি-অনুপ্রাণিত এবং নির্দেশিত এক পরিত্রাতার নেতৃত্বে কৃষকেরা এক আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। সেখানে এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব থাকবে না। নূতন সমাজের বনিয়াদ সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য। শোষণ এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষকদের জয় অনিবার্য, কারণ তা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কৃষকরা তাই শুধু নিজের সীমিত শক্তির উপর নির্ভরশীল থাকবে না; দৈবীশক্তির প্রভাবে প্রবল শত্রুকুলের পরাক্রম খর্ব হবে।

এ ব্যাখ্যার প্রধান প্রবক্তা স্টিফেন ফুক্‌স।[৬] আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত সব আন্দোলন সম্পর্কেই তিনি এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য মনে করেছেন। এ বিশ্বাস কোন কোন কৃষক আন্দোলনকে কোন কোন সময় নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু ধর্ম-প্রভাবিত আন্দোলনের এটাই একটি মাত্র বা প্রধান লক্ষণ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে আন্দোলনের বিশেষ কোন মুহূর্তে এ বিশ্বাস সক্রিয় ছিল; কিন্তু পরে তা দুর্বল হয়ে গেছে, বা অন্য ধরনের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাছাড়া, কোন্ বিশেষ অবস্থায় এ ধরনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে, তার বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকের একটা প্রধান দায়িত্ব।

(৪.৪)

ধর্ম-প্রভাবিত কৃষক-আন্দোলনগুলির এক বিশেষ সরকারি ভাষ্যও আছে। এর উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, কারণ বিদ্রোহীদের সম্পর্কে সরকারি নীতি প্রধানতঃ এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে।

এ ভাষ্যের কয়েকটা প্রবণতা লক্ষণীয়। এক মতে কৃষক বা উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাস 'কুসংস্কার' বই কিছু নয়। কেন এ বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলা যাবে, তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। বিশেষ করে, উপজাতিদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে সরকারি মহলে এক অবজ্ঞার ভাবও ছিল। এটা মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। বহুবার সুস্পষ্টভাবে এ ধারণার কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে সভ্যতা, সংস্কৃতির দিক থেকে উপজাতিরা হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে অনেক নিকৃষ্ট। এমনকি উপজাতিদের আন্দোলনে ব্যাপক হিংসার প্রয়োগকে তাদের ধর্মবিশ্বাসের ফল বলেই সরকারি মহলের কেউ কেউ বলত।

আরও একটা ধারণার উপর সরকারি ভাষ্য গড়ে উঠেছে। তা হল ঃ আন্দোলনের শুরু নেতাদের উদ্যোগেই। সাধারণ কৃষক তাদের নির্দেশকে অনুসরণ করেছে মাত্র। নেতার উদ্যোগ কিন্তু আদৌ নিঃস্বার্থ নয়। বহু ক্ষেত্রে সে 'বিচক্ষণ ধাপ্পাবাজ প্রবঞ্চক' মাত্র।[৭] আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি তার লক্ষ্য। আন্দোলনের খরচ চালানোর অজুহাতে আদায় করা অর্থ প্রধানতঃ সেই আত্মসাৎ করত। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কৃষকেরা এ 'চাঁদা' দিত না; তা আসলে জোর করে আদায় করা হত। প্রবঞ্চনার দায়ে নেতার বিরুদ্ধে সরকারের ফৌজদারী মামলা তাই যুক্তিসঙ্গত। নেতা মিথ্যা ছলনায় কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল, এর কারণ, তাদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির অভাব, বিশ্বাস প্রবণতা, নেতা, বিশেষ করে ধর্মগুরুর প্রতি অন্ধ আনুগত্য। কৃষকদের

ধর্মচেতনা আসলে অন্ধ মোহ মাত্র।

সরকারী ভাষ্যের একটা প্রধান অর্থ এই যে, ধর্মচেতনা ও বিশ্বাসের দিক থেকে নেতা ও তার অনুগামীদের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান; কৃষকদের বিশ্বাস নেতার বিশ্বাস থেকে ভিন্ন। নেতার পক্ষে এ ব্যবধান অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে, প্রধানতঃ নিপুণ প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে। মিথ্যা ছলনায় বিভ্রান্ত হয়েই সাধারণ কৃষকেরা নেতাকে অনুসরণ করেছে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্রোহোত্তর সরকারী অনুসন্ধানে সংগৃহীত তথ্য বার বার এ ভাষ্যের অসারতা প্রমাণ করেছে; কিন্তু নূতন বিদ্রোহের সময় সরকার এ পুরনো ধারণা দিয়েই তাকে ব্যাখ্যা করেছে।

বস্তুত, এ পক্ষপাতদোষ আসলে তাদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য অপরিহার্য। না হলে বাস্তব সত্যকে স্বীকার করলে শাসন-ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন অনিবার্য হত, যাতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বই অনিশ্চিত হয়ে পড়ত।

(৪.৫)

কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্টতঃ সহানুভূতিশীল কোন ঐতিহাসিকের বিচারও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

নেতার উদ্যোগ যে সংকীর্ণ স্বার্থ-প্রণোদিত, এ সরকারি ভাষ্য তারা মানেন না। কিন্তু তার ধর্মবিশ্বাসের আন্তরিকতায় তারা সন্দিহান। একটা উদাহরণে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) নেতা সিধু ও কানু ঘোষণা করে, ভিন্‌দেশী দুষমণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের নয়; সাক্ষাৎ ভগবান ('ঠাকুর') তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে একথা বলে গেছেন; তাদের সংগ্রামে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। তাই দিব্যশক্তি প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করবে বলে তাদের জয় সুনিশ্চিত। এ ঘোষণার পরেই সাঁওতালদের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় কেটে গেল। দুর্বার এক আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা 'হুলের' জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের ঘটনাটি সিধু ও কানুর একান্তই সাজানো ব্যাপার। এটা তাদের নিছক কৌশল মাত্র। তারা ভেবেছিল, এভাবে বললেই ধর্মভীরু সাঁওতালরা বিশ্বাস করবে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে উদ্যোগী হবে। এক ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত ঃ "সিধু এবং কানু উভয়েই জানতেন পশ্চাৎপদ সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মের ধ্বনিই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।"[৮]

সাঁওতালরা 'পশ্চাৎপদ'—এ ধারণা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়— নেতাদের ঘোষণায় অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে সাঁওতালদের অনগ্রসরতার সম্পর্ক কোথায়? অনগ্রসর বলেই কি তারা বিশ্বাসপ্রবণ? অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস কি শুধু সাঁওতালদের মধ্যেই দেখা গেছে?

'সাব-অলটার্ন স্টাডিজে'র দ্বিতীয় খণ্ডে[৯] রণজিৎ গুহ একটা দিক থেকে এ সিদ্ধান্তের বিচার করেছেন। সে দৃষ্টিকোণ সাঁওতালদের ধর্মচেতনা। এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে 'হুল' বোধগম্য হবে না।

এ বিচার নিঃসন্দেহে মূল্যবান। বিদ্রোহী সাঁওতালদের মানসিকতার গঠন বিশ্লেষণে তা সাহায্য করবে। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা নির্ধারণের জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। এটা শুধু বোঝায়, সাঁওতালদের নানা কাজ ও চিন্তাভাবনা ধর্মচেতনা দ্বারা প্রভাবিত।

কিন্তু সিধু-কানুর ঘোষণা কিভাবে সাঁওতালদের চরম সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করল, তার বিশ্লেষণ দরকার। ধর্মচেতনা নিরাবয়ব, বিমূর্ত কোন ভাবনা নয়। নানা প্রতীক ('সিম্বল'), কল্প (মীথ্), সুনির্দিষ্ট সহজগম্য বিশ্বাসকে ঘিরে এ চেতনা রূপলাভ করে, এর বিস্তার ঘটে। সিধু-কানু কি এমন কোন প্রতীক বা ভাষা ব্যবহার করেছিল, যা সাঁওতালদের নির্দিষ্ট প্রতীক ও কল্পাশ্রয়ী ধর্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? অন্যান্য অনেক অঞ্চলের কৃষকেরাও যথেষ্ট ধর্মবিশ্বাসী ছিল। এ ধরনের ঘোষণা কি সেখানে কৃষকদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারত? তাহলে কোন্ পার্থক্যের ফলে এ ঘোষণা সাঁওতালদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল? তাই শুধুমাত্র ধর্মচেতনার উল্লেখই যথেষ্ট নয়; বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে বিকশিত এ চেতনার আঞ্চলিক রূপ ও স্বাতন্ত্র্যকেও বুঝতে হবে। যেমন, সিধু-কানুর ঘোষণায় কতগুলি প্রতীক বার বার ব্যবহৃত হয়েছিল ঃ অনবরত সাতদিন ধরে আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ঝরবে; তাতে দুষমনেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিশ্বসৃষ্টির সাঁওতালী কল্পের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হবার কিছু সময় আগে এবং ঠিক পরে গোটা সাঁওতাল অঞ্চলব্যাপী যে জনশ্রুতি[১০] দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ফলে বিদ্রোহের মানসিকতাকে বিপুলভাবে প্রসারিত করতে পেরেছিল, তাও সাঁওতালী লোক-গাথা এবং কল্পের নানা রূপ।

সিধু-কানুর ঘোষণা তাই নির্দিষ্ট একটা বাণী মাত্র নয়; কীভাবে তা সাঁওতালদের অনুপ্রাণিত করে, তা বুঝতে হবে। নানা অস্থিরতা, সংশয়; দ্বিধা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অস্পষ্ট শঙ্কা—এ সব কিছু তীব্র অনুভবের এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

সাঁওতাল সমাজের কাছে এ সময় বিপুল উদ্দীপনার মত এল সিধু-কানুর ঘোষণা।

(৪.৬)

ওহাবী এবং ফরাজী আন্দোলনের ব্যাখ্যায় বিশেষ ধরনের পক্ষপাতদুষ্টতা দেখা যায়।

এক ধরনের পক্ষপাতের কারণে, ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এ ভেদবোধ যে সক্রিয় হতে পেরেছিল, তার একটা কারণ, এ দু' ক্ষেত্রেই প্রতিরোধকারীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী, আর প্রতিপক্ষ প্রধানতঃ হিন্দু জমিদার। বিদ্রোহীদের আপাতপ্রতীয়মান অন্য ধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপকে,— যেমন, মন্দির পোড়ানো, মন্দিরের শুচিতানাশ, গোহত্যা, ব্রাহ্মণ-নির্যাতন—শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। অন্যদিকে, এ দুই আন্দোলনকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট পর্যায় বলে গণ্য করা হয়েছে।

কৃষক ও জমিদারের সম্প্রদায়গত ভিন্নতা কোন কোন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে আবিল করেছে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত হবার পরও পক্ষপাত বিশেষভাবে দেখা যায়। কিন্তু সমসাময়িক নানা বিবরণেও এটা সুস্পষ্ট।[১১] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বাংলায় এ দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক জটিল রাজনীতির সঙ্গে ক্রমেই সম্পৃক্ত হতে থাকে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে নূতন গোরক্ষা সমিতির কার্যকলাপে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বেড়েই চলল। তার ঢেউ বাংলায়ও এসে পড়ে, যদিও অন্যান্য অঞ্চলের মত সাম্প্রদায়িক ভেদবোধ এখানে তখনও অত তীব্র হয়নি।

সম্ভবতঃ, ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত বিহারীলাল সরকারের 'তিতুমীরে' এ ভেদবুদ্ধির ছাপ রয়েছে।[১২] লেখক ওহাবী আন্দোলনে উগ্র 'ধর্মোন্মত্ততা'র প্রকাশ দেখেছেন। তাঁর ধারণা মুসলমান সমাজে এ 'উন্মত্ততা' বিশেষভাবে প্রকট। 'উপক্রমণিকা'য় তিনি লিখছেন ঃ "মুসলমান-বিপ্লবটা সহজে কিছু ভয়াবহ হয়ে উঠে। কেননা, এ বিপ্লব-বিভ্রাটের মূল ধর্মান্ধতার উৎকট উদ্দীপনা ... নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের অনেকেই ধর্মের উন্মত্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে।" বিহারীলালের বিচারে, "তিতুমীর ইহজগতে দস্যু-দানব অপেক্ষা হীন হেয় বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে'।

এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মনোভাবকে গোটা সম্প্রদায়ের জীবন-চর্যা ও আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। অথচ ওহাবীদের সম্পর্কে মুসলমান সমাজের এক বড়ো অংশের তীব্র বিদ্বেষভাব কারো অজানা থাকার কথা

নয়। অন্যদিকে বিদ্রোহীকে হাতে অপদস্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু জমিদারের (বা নীলকরদের) আমলা। হিন্দুদের মন্দির পোড়ানো, গোহত্যা ইত্যাদি কাজকে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রকাশ বলে মনে হতে পারে। পরে আমরা দেখব, এর অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব।

তিতুমীর সম্পর্কে নির্মোহ বিচারবোধের অভাব পরবর্তীকালের কোন কোন ইতিহাসকার বা কাহিনীকারদের মধ্যেও দেখা যায়।[১৩] খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা গ্রন্থে ওহাবীদের অনেক কার্যকলাপকে উগ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রসূত বলে বলা হয়েছে।[১৪]

অন্যদিকে পাকিস্তানের ঐতিহাসিকেরা[১৫] ওহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের রূপলক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। তাদের মতে—মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ-বিরোধী নয়; হিন্দু সম্প্রদায়-বিরোধী ও এ দুই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশের একটা প্রধান রূপ ও পর্যায়; হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে ওহাবী-ফরাজীদের আক্রোশ শুধু জমিদার বলে নয়; হিন্দু বলেও।

এ আন্দোলন দুটির অন্য এক ব্যাখ্যায় পক্ষপাত দোষ ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। নরহরি কবিরাজের একটি বইকে[১৬] দৃষ্টান্ত হিসেবে নিচ্ছি।

তাঁর মতে, এ আন্দোলন প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত শ্রেণী সংঘর্ষ।

শ্রেণী-সংঘর্ষের উপাদান এতে অবশ্যই ছিল; এবং অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে তার যোগও সুস্পষ্ট। কিন্তু আন্দোলন দুটিতে এ যোগের সঠিক ভূমিকা কি, এবং আন্দোলনের উদ্ভব ও বিস্তারে অন্য কোন কারণ সক্রিয় ছিল কিনা, তা বিচার্য।

লেখক ধর্মের ভূমিকাকে বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম বহিরঙ্গমাত্র[১৭]; রূপটা ('ফর্ম')-ই ধর্মের; আন্দোলনের মূলবস্তু (কণ্টেণ্ট্'), সার, শ্রেণী-সংঘর্ষ। একটু ভিন্নভাবেও একে বলা হয়েছে ঃ জমিতে অধিকারকে কেন্দ্র করেই এ সংঘর্ষের উদ্ভব, কিন্তু কৃষকদের দাবীদাওয়াকে 'সতর্কভাবে ধর্মের কথায় সাজানো হয়েছে' মাত্র।[১৮] অর্থনৈতিক দাবীকে এভাবে উপস্থাপনের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক ওহাবী ফরাজী আন্দোলনকে মধ্যযুগের য়ুরোপের কয়েকটি আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন য়ুরোপের মত এখানেও ধর্মের ভাষাই একটিমাত্র সহজবোধ্য ভাষা।[১৯] কারণ, ধর্মীয় প্রভাবের গভীরতা। এটা আকস্মিক কিছু নয়। লেখক তাকে তদানীন্তন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশের ফল হিসেবে গণ্য করেছেন। উৎপাদন

শক্তি তখনও অপরিণত, সামাজিক বিন্যাস সামন্ততান্ত্রিক; তাই 'মানুষ ও সমাজেব গডনে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।[২০]

ধর্মের সঙ্গে ওহাবী-ফবাজী আন্দোলনের যোগ তাব সংগঠনকে খানিকটা সাহায্য করলেও লেখকের মতে পরিণামে তাকে দুর্বল করেছে। কৃষকশ্রেণীর শত্রুরা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় নিয়েছে। কৃষকদের শ্রেণী-ঐক্য ও সংহতি তাতে ব্যাহত হয়েছে; আন্দোলনের ব্যর্থতার এটাই প্রধান কারণ। এজন্যই আন্দোলন তার 'আদিম' চরিত্র কাটিযে উঠতে পাবেনি; 'সচেতনভাবে সংগঠিত' জমিদারী প্রথা-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হতে পারেনি; তা মুসলমান সম্প্রদায়ের এক 'ক্রুদ্ধ' গোষ্ঠীর স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া রূপেই থেকে গেছে।[২১]

এ প্রসঙ্গে মূল বিচার্য প্রশ্ন হল এই ঃ নূতন ধর্মীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত কৃষকেরা ধর্ম ও রাজনীতিব সম্পর্ক কিভাবে দেখেছিল? তারা কি তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছিল? তাদের কাছে ধর্ম কি ছিল শুধুই 'বহিরঙ্গ'? নাকি ধর্ম তাদের দিয়েছিল এক সমাজদর্শন, এক দৃষ্টিভঙ্গী, যার ফলে তারা তাদের একান্ত পরিচিত জগতের অভিজ্ঞতা, অভ্যস্ত সামাজিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দেখতে পেরেছিল? যে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন যদি মূলতঃ ক্ষমতার লড়াই হয়, তা হলে ধর্ম কি তাদের আত্মবিশ্বাস ও সংহতিবোধকে প্রখরতর করেছিল? যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, তাহলে ধর্ম শুধুমাত্র কৃষকদের দাবী উপস্থাপনের ভাষা হবে কেন?

বস্তুতঃ আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখকের কোন কোন মন্তব্য তার মূল সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, ধর্ম কৃষকদের 'এক-মেঠে' গোছের 'ভাবাদর্শ' জুগিয়েছে।[২২] যদি তাই হয়, তাহলে ধর্ম শুধু কৃষকদের দাবী জানানোর ভাষা নয়। আমরা পরে দেখব, এ 'ভাবাদর্শ' মোটেই 'একমেঠে' ধবনের কিছু নয়; তা ছিল সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ; গঠনের দিক থেকে তার মধ্যে কোন অপরিচ্ছন্নতা ছিল না।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য, এ ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন উপকরণের সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন, ধর্মবোধের গোড়াকার প্রবলতা নানা কারণে ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে; এবং অন্য কোন প্রবণতা প্রবলতর হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আন্দোলনের মূল গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে কোন সময়ে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না।

(৫)

আমাদের নির্বাচিত কৃষক-আন্দোলনগুলিতে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটা মাত্র প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছি। এখানে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্রোহী কৃষকদের ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র বিশ্লেষণের কয়েকটা পদ্ধতি নির্দেশ করা। আমরা কিন্তু আন্দোলনের ঘটনা-প্রবাহ উল্লেখ করে তাদের যথার্থতা বিচার করিনি। কারণ আন্দোলনের বিবরণ আমরা পরে দেব। আমরা শুধু এটুকু নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি, যে এ পদ্ধতিগুলি অনসুরণ করে কৃষকদের ধর্ম রাজনীতির জটিল সম্পর্ক বোঝানো শক্ত।

এ পদ্ধতির একটা সীমাবদ্ধতার উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ আন্দোলনগুলির বিশ্লেষণে বার বার আমরা এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। প্রভাবের আলোচনায় ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ এক ধারণা এ ব্যাখ্যাগুলিকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মকে মনে করা হয়েছে একটা অনড় কাঠামোর মত, তা যেন কয়েকটা সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস আর আচারের সমাহার মাত্র; বহু দিন আগে তা যা ছিল, এখনও তাই আছে। এ কাঠামো যেন দূরে থেকে কৃষকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করছে।

এ ধারণা বিচার সাপেক্ষ। নানা কারণে ধর্ম বিশ্বাসের রূপ পাল্টাতে পারে। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সময় কৃষকেরা তাদের বিশ্বাস ও আচার থেকে কোন কোন বিশেষ উপাদান বেছে নিতে পারে। এর ফলে অনেক পুরানো বিশ্বাস সম্পূর্ণ বর্জিত, বা রূপান্তরিত হতে পারে। যে ধর্ম কৃষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে প্রভাবিত করে, বহু ক্ষেত্রে তা পুরনো বিশ্বাস থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ। এ প্রভাবের উৎস সাম্প্রতিক কালের নূতন কোন বোধ, বিশ্বাস বা প্রেরণাও হতে পারে। রাজনীতির সঙ্গে মিশে গিয়ে পুরনো ধর্মের রূপও পাল্টে যায়। এই পরিবর্তিত ধর্মই কৃষকদের আন্দোলনে নূতন গতিবেগ সঞ্চার করে।

(৫.১)

আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলির বিশদ বিবরণ দেবার আগে, এ যুক্তির একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরের কোন কোন আন্দোলনের উল্লেখ করব।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কৃষকদের একান্ত গতানুগতিক আটপৌরে জীবনচর্যায় ধর্মের প্রভাব সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের তীব্র অনুভবের মুহূর্তগুলিতে ধর্মের প্রভাব থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। এর একটা প্রধান কারণ, সংগঠিত আন্দোলনে প্রেরণার উৎস

ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য তীব্র এক আকুলতা। অন্ততঃ এক বিশেষ ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। এদের অনুপ্রেরণা এ বিশ্বাস যে, আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতির রূপান্তর ঘটবে। অবশ্য অনেক কৃষক-আন্দোলনের উদ্দেশ্য অনেক সীমিত। কৃষকেরা সেখানে শুধু চেয়েছিল, তাদের প্রতিষ্ঠিত অধিকার যাতে খর্ব না হয়।

পরিবর্তনের জন্য এ তীব্র আকাঙ্ক্ষা আন্দোলনের ঠিক আগেই যে শুরু হবে তা নয়। অন্য রূপে অনেক আগে থেকেই তা শুরু হতে পারে। কৃষক গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দাবীদাওয়ায় যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে, তা মোটেই নয়।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ইতিহাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত নিতে পারি : প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুশাসন বিরোধী আন্দোলনের একটা রূপ 'হেরেসি' (heresy) হিল্টন দেখিয়েছেন।[২৩] ধর্মীয় প্রশ্নে এ প্রতিবাদের উদ্ভব হলেও সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসমীচীন। পক্ষান্তরে, এ প্রতিবাদকে ধর্মীয় আবরণে কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ মনে করাও ভুল হবে। আসলে চার্চের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দি পেরিয়ে এ প্রতিবাদ বৃহত্তর কোন আন্দোলনে পরিণত হতে পারত না, যদি না ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য কারণে এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হত। এ ধরনের প্রতিবাদ মধ্যযুগের য়ুরোপে বহুবার ঘটেছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সংগঠিত ব্যাপক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়নি। ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্সে চার্চ-বিরোধী Huguenot চিন্তা-ভাবনা এ রকমভাবেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।[২৪]

ঐতিহাসিক এবং সমাজতত্ত্ববিদদের একটা সিদ্ধান্ত এ প্রসঙ্গে আরো গুরুত্বপূর্ণ। তারা দেখিয়েছেন, মধ্যযুগের য়ুরোপে অনেক সামাজিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ছোট ছোট ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা ধর্ম ও নৈতিক জীবন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুশাসন সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিল। এ প্রতিবাদী গোষ্ঠীর প্রচলিত নাম সেক্ট (Sect)। তাঁরা অবশ্য দেখিয়েছেন, গোড়ার দিকের প্রতিবাদী মেজাজ পরে পরে ফিকে হয়ে এসেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত চার্চের বিধি-বিধান মেনে নিয়েছে, বা তার সঙ্গে মিশেও গেছে। অথবা তাদের নিজস্ব বিধান, নিয়ম-কানুন এমনভাবে গড়ে উঠল যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে চার্চের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকল না।

বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে স্বতন্ত্র এ সেক্টগুলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা[২৫] চার্চ ও সেক্টের মধ্যে দুটি পার্থক্যের কথা বিশেষভাবে বলেছেন।

চার্চ-ধবনের প্রতিষ্ঠান প্রচলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে মেনে নেয়; এ ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে পারে, সচরাচর এমন কোন বিধান অনুগামীদের অনুসরণ করতে বলেনি। অন্যদিকে, অন্ততঃ গোড়ার দিকে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অসাম্যের প্রতিবাদে সেক্ট ছিল মুখর। দ্বিতীয়তঃ, চার্চের শিক্ষা ও প্রচারের প্রধান ঝোঁক, মানুষের পারলৌকিক মুক্তির উপর সেক্ট প্রধানতঃ মানুষের ঐহিক কল্যাণ ও সুখ-শান্তির কথাই বলেছে।

বস্তুতঃ সেক্টের এ প্রতিবাদী চরিত্র ও আদি খ্রীষ্ট ধর্মের মৈত্রী ও প্রেমের বাণী-প্রচাব দুঃস্থ ও শোষিত সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

সামাজিক আন্দোলনের উপর চার্চ ও সেক্টের প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা আরো দুটো বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ধরনের আন্দোলনে চার্চের প্রচার ও বাণীর যে কোন ভূমিকা থাকতে পারে না, তা মোটেই নয়। তাঁরা বলেন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে বিদ্রোহী কৃষকেরা প্রেরণা পেতে পারে। এমনও হয়েছে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য সুদৃঢ় করার সচেতন চেষ্টা হিসেবে চার্চ কোন বিধি-বিধান নির্দেশ করল; কিন্তু প্রতিরোধের সময় কৃষকেরা তারই মধ্যে খুঁজে পেল নিজেদের কাজের সমর্থন, প্রতিবাদী চিন্তাধারণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।[২৬] ফিলিপাইনের কৃষক আন্দোলনের উপর মূল্যবান এক গ্রন্থে বিদ্রোহী কৃষকের চৈতন্য বিকাশের জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা আছে।[২৭]

দ্বিতীয়তঃ, সেক্টের প্রচার কৃষকশ্রেণীর সব গোষ্ঠীর কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় ছিল, তাও নয়। মধ্যযুগের য়ুরোপে অনেক আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা ছিল, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব সম্পর্কে বাইবেলের বাণী। প্রতিবাদী সাধারণ মানুষের কাছে এ বাণীর বিশেষ এক তাৎপর্য ছিল। তারা বিশ্বাস করত, এক পরিত্রাতার আবির্ভাবের ফলে সম্পূর্ণ নূতন এক পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, যেখানে কোন অর্থনৈতিক অসাম্য বা শোষণ থাকবে না। এ ধরনের আন্দোলনের এক প্রধান ইতিহাসকার কোন্ (Cohn) দেখিয়েছেন, যে বৃহত্তর কোন সঙ্কটকাল ছাড়া, (যেমন চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপব্যাপী প্লেগের বিধ্বংসী বিস্তার), মোটামুটি অবস্থাপন্ন, জোতজমার অধিকারী কৃষকেরা এ প্রচারে বিশেষ সাড়া দেয়নি।[২৮] এর প্রধান আকর্ষণ ছিল তাদের কাছে, যাদের চাষবাস বা অন্য কোন সূত্র থেকে নিশ্চিন্ত কোন আয় ছিল না— যেমন শহরের সর্বহারা শ্রেণী, গ্রামের গরীব চাষী, ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত কারিগর বা শ্রমিক যারা ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দার ফলে বা অন্য কোন কারণে সর্বস্বান্ত বা দুঃস্থ

হয়ে পড়েছে। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা কেন এ ধরনের আন্দোলনে যোগ দেযনি তাব প্রধান কারণ এর বৈপ্লবিক সমাজ-দর্শন। তা হল এই যে, জমি বা উৎপাদনের অন্যান্য উপকবণের ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ না ঘটলে নূতন আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থায় সৃষ্টি সম্ভব নয়; কারণ এ ক্ষেত্রে শ্রেণীতে অসাম্য অনিবার্য। ভূমিস্বত্বাধিকাবী কৃষকের কাছে এ সমাজ-দর্শনের তাই কোন আকর্ষণ ছিল না।

তাই, বাইরে প্রভাব যাই হোক, বিদ্রোহোন্মুখ কৃষকেরা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তার থেকে অংশমাত্র বেছে নেয়। পূর্ব-ভারতে উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মিশনারী প্রচারের পারলৌকিক তাৎপর্য সম্পর্কে উপজাতিদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ব্যাপটিজমের (baptısm) আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পর্কে তারা ছিল সমান নিস্পৃহ। খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণে তাদের উৎসাহের একটা প্রধান কারণ তাদের এ বিশ্বাস, যে রাজার জাত বলে মিশনারীরা যদি রাজপুরুষদের কাছে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানায়, তাহলে হয়তো কিছু প্রতিকার মিলতে পারে। অন্ততঃ গোড়ার দিকে মিশনারীদের আন্তরিকতায় তারা সন্ধিহান ছিল না। তাদের আশাভঙ্গ হল পরে। তখন তাদের এ ধারণা হল বহিরাগতদের শায়েস্তা করার তাদের পরিকল্পনায় মিশনারীরা সায় দিচ্ছে না। কিন্তু বাইবেলের কিছু কিছু বাণী তখনও তাদের অনুপ্রাণিত করেছে—বিশেষ করে শিষ্যদের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের ঘটনা।

তবে বাইরের সূত্র থেকে পাওয়া চিন্তাভাবনার নির্বাচিত অংশই শুধু এককভাবে কৃষক-আন্দোলনের ভাবাদর্শ গড়ে তুলতে পারে না। কৃষকেরা যেখানে সংঘবদ্ধ যৌথ সমাজজীবন টিকে থাকে, সেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিত্যকার সহযোগিতা, নানা আচার-অনুষ্ঠান এবং আরো নানাভাবে এ সব ধারণা কৃষকদের অচেতন স্মৃতিতে প্রোথিত হয়ে যায়। তাই নূতন সেক্ট-অনুগামীদের জীবন-চর্যাতেও প্রাক্তন বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে সেক্টের আদিরূপ অপরিবর্তিত থাকে না। আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলিতেও তাই দেখতে পাব।

পুরানো ধ্যানধারণা, লোকাচার, রীতি-নীতি কতটা বজায় থাকবে, তা প্রধানতঃ নির্ভর করে নূতন সমাজ-সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে কৃষকদের ধারণার উপর। বিদ্রোহী কৃষককুল যদি বিশ্বাস করে, প্রচলিত জীবন-চর্যা এ সৃষ্টির পথে অন্তরায়, তাহলে তাকে নির্মমভাবে বর্জনও করতে পারে।

পূর্ব-ভারতে উপজাতিদের আন্দোলনে এ বিরামহীন অন্বেষণ বিশেষভাবে দেখা

গেছে। বার বার পরাজয়ের ফলে তাদের এ বিশ্বাস জন্মে, যে শুধুমাত্র প্রতিরোধের নিপুণ সংগঠন দিয়ে শত্রুর পরাভব সম্ভব নয়; সামগ্রিক জীবন-চর্যার আমূল রূপান্তর না ঘটলে কখনও তারা শত্রুর সমকক্ষ হতে পারবে না।

(৬)

সময়ের দিক থেকে পাগল-পন্থী আন্দোলন আগে হলেও আমরা প্রথমে ওহাবী-ফরাজী আন্দোলন আলোচনা করব। এতে পাগল-পন্থী আন্দোলনের সঙ্গে এদের পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ হবে।

ওহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের ভিন্নতার নানা দিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতবর্ষে ওহাবী আন্দোলন বলে যা পরিচিত, তা প্রধানতঃ সরকার-বিরোধী আন্দোলন-প্রথমে শিখ রাজ পরে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাংলায় ১৮৩১ সালের ওহাবী আন্দোলন মূলতঃ জমিদার ও নীলকরবিরোধী কৃষক আন্দোলন। আমরা পরে দেখব, কিভাবে তা রাজবিরোধী রূপ নেয়। এর পর এখানকার কোন কৃষক-আন্দোলন ওহাবীদের নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ওহাবীদের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের সাহায্য নানাভাবে দেখা যায়, বিশেষ করে ১৮৮৪-এর দশকে।

ফরাজী-আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষকস্বার্থ রক্ষার আন্দোলন। এ আন্দোলনও মাঝে মাঝে অনিবার্যভাবে সরকার-বিরোধী রূপ নেয়, কারণ ফরাজী কৃষকেরা অহরহ প্রমাণ পেয়েছে, তাদের দুই প্রধান শত্রু জমিদার ও নীলকর সরকারী শাসন-যন্ত্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে পারত না। কিন্তু এ মানসিকতা ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসে। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সিপাহী বিদ্রোহের সময়কাল; অন্যত্র ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী জন-বিক্ষোভ ফরাজীদেরও প্রভাবিত করেছিল।

(৬.১)

ধর্ম এ দুই ভিন্নধারার আন্দোলনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা বোঝানোর জন্য তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। দুটি আন্দোলনই নূতন ধর্মীয় গোষ্ঠী (সেক্ট) পরিচালিত। আন্দোলনের দ্রুত বিস্তারের সময় গোষ্ঠী বহির্ভূত অনেক কৃষক সম্ভবতঃ এতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু নেতৃত্ব প্রধানতঃ এ গোষ্ঠীর হাতেই ছিল।

দুই আন্দোলনেরই প্রাথমিক প্রেরণা স্থানীয় পরিবেশ থেকে আসেনি। এর উৎস

এ অঞ্চল-বহির্ভূত এবং বৃহত্তর ধর্ম আন্দোলন—যাকে ঐতিহাসিকেরা 'ইসলামের পুনরুজ্জীবন' ('ইস্লামিক রিভাইভ্যাল') বলেছেন।

য়ুরোপে ধর্মীয় গোষ্ঠীর (সেক্ট) উদ্ভব ভিন্নভাবে হয়েছিল। তা স্থানীয় চার্চের বিধি-বিধান, অনুশাসন ও আধিপত্য-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাছাড়া, চিন্তার জগৎ, শিক্ষা-ব্যবস্থা—এ সবের উপর চার্চের বিপুল প্রভাবের জন্য যে কোন প্রতিবাদী সমাজ-দর্শন চার্চ-নির্দেশিত জীবন-চর্যা-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিত। মধ্যযুগের য়ুরোপে বহু আন্দোলনের এ বিশিষ্ট প্রবণতা এঙ্গেলস এ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯]

বারবারা মেটকাফ[৩০] 'ইসলামের পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যা ওহাবী-ফরাজী আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

যে দর্শনের উপর 'ইস্লামিক রিভাইভ্যাল' আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত, তা একটা সামগ্রিক জীবন-দর্শন।[৩১] এখানে সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ধর্ম, ব্যক্তির নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। যদি কোন আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আধিপত্য ইসলাম-অনুগামীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে ইসলামের জীবনাদর্শকেই ক্ষুণ্ণ করে। বিপর্যয় বা সংকট থেকে ইসলামপন্থীদের মুক্তির উপায় সম্পর্কে ধারণাও এ জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দর্শন অনুযায়ী ব্যাপক কোনো সংকটের উৎস ব্যক্তির নৈতিক অপকর্ষ, অসামঞ্জস্য ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে। এ অসম্পূর্ণতার ফলেই শত্রু প্রবল হয়। তাই ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়েই শত্রুর পরাভব ঘটবে।

ইসলাম অনুগামীদের নৈতিক অধোগতির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তারা নবী প্রবর্তিত ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। চরম বিচ্যুতি হল, এক ঈশ্বরের অখণ্ড মহিমা বহু জনের উপর আরোপ। এর ফলে মহম্মদ-নির্দেশিত বিধানের সঙ্গে অসম্পৃক্ত, অসংগতিপূর্ণ বহু বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান তারা গ্রহণ করেছে।[৩২] নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের তাই প্রয়োজন ইসলামের আদি, অবিকৃত সরল জীবন-চর্যায় ফিরে যাওয়া। 'পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন ইসলাম শাস্ত্রবিদ্, আদর্শনিষ্ঠ, শুদ্ধ চরিত্র ধর্মগুরু।

বৃহত্তর 'ইসলামিক পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনের এ বৈশিষ্ট্যগুলি ওহাবী ও ফরাজী

আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতবর্ষের বাইরে এ আন্দোলনের সঙ্গে দুই নেতারই ছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাদের দীর্ঘকালব্যাপী আধ্যাত্মিক অন্বেষণ থেকে তাদের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

আগেই বলেছি, সেক্ট প্রচারিত নূতন জীবনাদর্শ এর অনুগামীরা বেশ খানিকটা নিজের মত করে গ্রহণ করে। এ আন্দোলন দুটিতেই দেখা যায়, ইসলামের আদি আদর্শে ফিরে যাওয়ার আহ্বানে মুসলমান সমাজের সবাই সমানভাবে সাড়া দেয়নি। অন্ততঃ গোড়ার দিকে, বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা এর প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হয়নি।[৩৬] এ আন্দোলনের মূল শক্তি একেবারে সাধারণ অবস্থার মুসলমানদের আনুগত্য—গরীব চাষী, জোলা, পটুয়া, ঢালিয়া প্রভৃতি। কিন্তু এ নূতন ধর্মমতে ইসলামের আদি আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিহীন যে আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস বর্জনের কথা ছিল তার অনেকগুলিই শেষ পর্যন্ত বহু জায়গায় টিকে ছিল। ফরাজী-সম্প্রদায় সম্পর্কে রফিউদ্দীন আহমেদের[৩৭] দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য ঃ ফরাজী প্রভাবের দ্রুত প্রসার সম্পর্কে সমসাময়িক ধারণা খানিকটা অতিরঞ্জিত; ফরাজী অনুগামীদের একটা নগণ্য অংশই মাত্র নূতন জীবন-চর্যা সম্যক অনুসরণ করত। তাদের কাছ বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল ফরাজী নেতার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ও আদর্শ। ফরাজী নেতা শরিয়াতুল্লা ছিলেন সামাজিক বৈষম্যের কঠোর সমালোচক। এ আদর্শ কিন্তু স্থান, কাল, সামাজিক সম্পর্ক-নিরপেক্ষ কোন কিছু নয়। অনুগামীদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় অসাম্যের যে রূপ অনিবার্যভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল, তাই নেতার প্রচারকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন, সামাজিক অমর্যাদার দ্যোতক পারিবারিক পদবী 'জালা'র ব্যবহার তিনি নিষিদ্ধ করেন। জোলা সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যদের তিনি কারিগর বলে নিজেদের পরিচয় দিতে বলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আচার-অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত রীতিকে বর্জন করা সহজ ছিল না বটে, কিন্তু, অন্ততঃ গোড়ার দিকে, নূতন আদর্শে দীক্ষিত, অনুপ্রাণিত ওহাবী-ফরাজীদের কিছু কিছু তাদের আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমন, নেতাদের প্রচার থেকে তাদের ধারণা হয়েছিল, স্বেচ্ছায় যে ধর্মমত তারা গ্রহণ করেছে, তার অনুসরণ এবং প্রচারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ অন্যায় এবং অসঙ্গ ত। এক বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদের এ ধারণা আরো দৃঢ় হয়— সেটা হল, জমিদারদের সঙ্গে তাদের প্রজার সম্পর্ক। কৃষক হিসেবে তাদের চেতনার উপর একটা প্রধান প্রভাব পরাক্রান্ত স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। জমিদারের

নানা ধরনের কর্তৃত্ব তারা অবস্থা-বিপাকে মেনে নিয়েছে; কিন্তু তারা ভাবতে শিখেছে তাদের নূতন ধর্ম বিশ্বাস এ কর্তৃত্বের এক্তিয়ারে পড়ে না। কিন্তু দীর্ঘদিন যারা নিরঙ্কুশ প্রতাপ খাটিয়ে এসেছে, তাদের কাছে এ ধারণা সুধু যে গ্রহণীয় ছিল না, তা নয়; এটা তাদের মনে হয়েছিল অক্ষমণীয় স্পর্ধা। সংঘর্ষ তাই ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠল। শুরুতেই সংঘাতের এক রূপ; কিন্তু পরে পরে তা ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। ওহাবী-ফরাজী আন্দোলনে ধর্মবিশ্বাস এভাবে শ্রেণী-চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মবিশ্বাসের আদিরূপও তাতে অনেকখানি পাল্টে যায়।

(৬.২)

এজন্যই ওহাবী-ফরাজী আন্দোলন শুধুমাত্র কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়। আবার, এক বিশেষ ধর্মীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাদের ভিন্নধর্মী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মাঝে মাঝে ধর্মীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও শুধু ঐ কারণে তাকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেওয়া যায় না। কৃষকদের ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা বিশ্লেষণে আমরা আলাদাভাবে ওহাবী এবং ফরাজী আন্দোলনের আলোচনা করব।

ব্যাপক সঙ্ঘবদ্ধ, কৃষক-আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে কোন সর্বজনীন নিয়ম খাটে না। তবে যে কয়েকটা কারণ বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার মধ্যে একটা প্রধান হল, কৃষকদের ঐতিহ্যসম্মত অধিকারের উপর জোরালো কোন আঘাত দস্তুরবিরোধী আকস্মিক কোন দুর্বহ অর্থনৈতিক দাবী প্রতিহত করার জন্য তাদের সম্মিলিত সংকল্প।

ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব এবং প্রসার সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হয়েছিল। অবশ্য এটা সন্দেহাতীত যে, 'দাড়ির জরিমানা'[৩৫] থেকে ওহাবীদের সঙ্গে স্থানীয় পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিবাদের সূত্রপাত। নানাভাবে এ সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়। আর চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু এ সংঘর্ষের চরিত্র বোঝার জন্য আমাদের দুটো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে—জমিদার কেন ওহাবীদের এভাবে জরিমানা করল? আর এ জরিমানা বন্ধ করার জন্য ওহাবীরা ঐক্যবদ্ধ হল কেন?

'দাড়ির জরিমানা' পরাক্রান্ত কৃষ্ণদেব রায়ের এক বিশেষ ধরনের ফরমাশ। এর সঙ্গে অবৈধভাবে জমির নিরিখ বাড়ানোর কোন সম্পর্ক নেই। এটা জমির খাজনা নয়। যারা কৃষক নয়, তাদেরও এ জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু তা শুধুমাত্র ওহাবী সম্প্রদায়ের জন্যই। হরেক রকমের আবওয়াবের কোনটার সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই। *জমিদারের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খরচ মেটানোর জন্য আবওয়াব আদায় করা হত।*

'দাড়ির জরিমানা'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে জমিদারের কোন গোপনীয়তা ছিল না। সে প্রকাশ্যেই বলত, এর একমাত্র উদ্দেশ্য ওহাবী ধর্মমত প্রচারে বাধা দেওয়া।

এ জরিমানার একটা ব্যাখ্যা[৩৬] হল এই নীল চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করার সংকল্প ওহাবীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু নীল চাষ তখন 'খুব লাভজনক ব্যবসায়'। য়ুরোপীয় নীলকরেরা তো বটেই, দেশী জমিদারও এ চাষ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। জমিদারেরা কিন্তু "ইংরেজদের তাবেদারী করে নিজেদের ভাগ্য প্রসন্ন করার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইল। তাই সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত বিক্ষোভকে দমন করার জন্য জমিদারগণ নানাভাবে কৃষকদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো"। 'দাড়ির জরিমানা' এর একটা রূপ মাত্র।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়। ঐ সময় নীল চাষ মোটেই লাভজনক ছিল না। আর্থিক মন্দা[৩৭] তখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিদেশী বাজারে নীলের দাম তখন পড়তির দিকে। নীল চাষে স্থানীয় জমিদারদের তাই কোন উৎসাহ থাকার কথা নয়। আমাদের জানা এমন কোন তথ্য নেই যে ওহাবীরা তাদের কোন নীলকুঠি আক্রমণ করেছে। কোন কোন য়ুরোপীয় নীলকরদের সম্পর্কে তাদের ছিল তীব্র বিদ্বেষ ও আক্রোশ। কারণ কিন্তু নীল চাষ নয়। প্রধান কারণ, কয়েকজন নীলকর ওহাবীদের দমনের জন্য জমিদার ও সরকার পক্ষকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল।[৩৮] কিন্তু তা ওহাবী প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হবার পরে ঘটেছে। 'দাড়ির জরিমানা'র সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই।

ওহাবীদের কার্যকলাপ কি জমিদারের এমন কোন আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার জন্য তাকে এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়? কৃষ্ণদেব রায় বা অন্য কেউ সরকারের কাছে এ ধরনের কোন নালিশ করেনি। ফরাজীরা জমিদারদের কোন কোন আবওয়াবের যৌক্তিকতা মানেনি, এবং একজোট হয়ে জমিদারদের সেগুলি দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ওহাবীদের ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটেনি।

'দাড়ির জরিমানা'র জন্য জমিদারের কোন ধর্মী মনোভাবও সম্ভবতঃ ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই ওহাবীদের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। গোড়ার দিকে তারা এমন কিছু করেনি, যাতে হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে। গোহত্যা, মন্দিরের শুচিতা নাশ ইত্যাদি অনেক পরের ঘটনা। জমিদারদের সম্পর্কে ওহাবীদের তিক্ততা তখন চরমে উঠেছে।

আসলে এ জরিমানা গ্রামীণ সমাজে ওহাবীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করার

জন্য জমিদারদের একটা কৌশল মাত্র; কাবণ, নূতন ধর্ম বিশ্বাসে উদ্বৃত্ত, গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন, আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ওহাবীদলের প্রভাব গ্রামে জমিদারের চিরাচরিত আধিপত্যের নৈতিক ভিত্তি শিথিল করে দিচ্ছিল। ক্ষমতামদমত্ত পরাক্রান্ত জমিদারের পক্ষে এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিব অস্তিত্ব ববদাস্ত করা সহজ ছিল না।

কি এমন ঘটেছিল, যাতে জমিদার এতখানি বিপন্ন বোধ করছিল? গোড়ার দিকে ওহাবীদের ধর্ম প্রচারে শঙ্কিত হবার মত কিছু ছিল না। কিন্তু কয়েকটা ঘটনায় জমিদারেরা সতর্ক হল।

ঘটনাগুলির বিস্তারিত বিবরণ মেলে না। নানা জায়গায় এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ থেকে এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব। ওহাবী মতবাদ প্রচারের সঙ্গে এ ঘটনাগুলি সম্পৃক্ত। প্রধানতঃ ওহাবী প্রচারকদের সঙ্গে সনাতনপন্থী মুসলমানদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সেগুলি ঘটেছে। ওহাবী বিদ্রোহের কারণ-সংক্রান্ত সরকারী অনুসন্ধানে এ সম্পর্কে কিছু কিছু জানা গিয়েছিল।

ওহাবী নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার ছাড়া ইসলামের আদি আদর্শ থেকে বিচ্যুত মুসলমানদের নূতন ধর্মমতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ প্রচার ঐতিহ্যপন্থী সাধারণ মুসলমানের পছন্দসই ছিল না। এর কারণ এ নয় যে নূতন মতের দার্শনিক জটিলতা তাদের কাছে সহজবোধ্য ছিল না। প্রধান কারণ, দীর্ঘদিনের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান অত দ্রুত বর্জন করা কঠিন ছিল। পরিবর্তন বিরোধিতার এ মানসিকতা ওহাবী প্রচারকদের অসহিষ্ণু করে তোলে। এ নিয়ে স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে তাই তাদের বচসা, মনোমালিন্য ঘটত। সনাতনপন্থীদের বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার সম্পর্কে প্রচারকদের প্রকাশ সমালোচনা বা কটূক্তি অনিবার্যভাবে ক্ষিপ্ততার সৃষ্টি করে। ফরিদপুর অঞ্চলে ফরাজীরা নিজেদের ধর্মমত প্রচারের জন্য মাঝে মাঝে জোর-জুলুমেরও আশ্রয় নিত। এ নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে। ওহাবীদের সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ কিন্তু হয়নি। মতবিরোধ, বচসা, এর ফল স্বরূপ তিক্ততা— এই যা ঘটত।

কয়েকটা ক্ষেত্রে এ তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যে কেউ কেউ জমিদারের কাছে নালিশ করে, এবং বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য তাকে হস্তক্ষেপ করতে বলে। গ্রামের নানা বিবাদ-বিসংবাদে জমিদারের এ ধরনের সালিশী একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। ওহাবীরা জমিদারের এ হস্তক্ষেপ কিভাবে নিয়েছিল, এ সম্পর্কে বিস্তারিত

জানা যায় না। খুব সম্ভবতঃ তারা ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জমিদারের এ এক্তিয়ার স্বীকার করেনি। প্রজাদের নিঃসর্ত আনুগত্য পেতে অভ্যস্ত জমিদার ওহাবীদের এ আচরণে অপমানিত বোধ করল। কোন কোন জমিদার তাই শাস্তি হিসেবে ওহাবীদের জরিমানা করে। অন্যভাবেও ওহাবীদের হেনস্তা করার চেষ্টা করে।

বিশেষ কায়দায় দাড়ি রাখা ওহাবীদের ধর্ম বিশ্বাসের একটা অঙ্গ বলে এ জরিমানাকে তারা তাদের ধর্মের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত বলে গণ্য করল। ১৮৩০ সালের আগস্ট পর্যন্ত তারা কিন্তু আদালতের কাছে এ বিষয়ে কোন নালিশ করেনি। এ মামলাটাও ১৮৩১ সালের জুলাই মাসে খারিজ হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এর ফলেই মোটামুটি এ সময় থেকেই অন্যান্য জমিদারেরাও এ জরিমানা আদায়ে উদ্যোগী হয়। উপলক্ষ্য আগের মতই—জমিদারের কাছে ওহাবী বিরোধী মুসলমানদের নালিশ। উল্লেখযোগ্য এই যে, যে জমিদারের দাবী থেকে ওহাবীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের সূচনা হয় বলা যেতে পারে, তার কাছে এ অজুহাতও ছিল না।[৩৮] পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এ ধরনের নালিশের জন্য অপেক্ষাই করল না। সম্ভবতঃ তার ধারণা ছিল, ওহাবীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করতে হলে এখনই তাকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

কৃষ্ণদেব ধরেই নিয়েছিল, ওহাবীরা স্বেচ্ছায় এ জরিমানা দেবে না। যখন তার পেয়াদাদের তারা মেরে তাড়িয়ে দিল, এ বিষয়ে তার আর কোন সংশয় রইল না। দুর্বিনীত প্রজাদের শায়েস্তা করার চিরাচরিত নীতিই সে নিল। লাঠিয়াল বাহিনী পাঠিয়ে জরিমানা আদায়ের চেষ্টা করল। সঙ্ঘবদ্ধ ওহাবীদের সঙ্গে সংঘর্ষ তাই অনিবার্য হল। জমিদারের দলবল একটা মসজিদও পুড়িয়ে দিল।

মসজিদ পোড়ানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ জমিদারের ধারণা ছিল, ওহাবীদের জমায়েত ও সলাপরামর্শের একটা প্রধান কেন্দ্র ও মসজিদ পুড়িয়ে দিলে তাদের সংগঠন বেশ কিছুটা দুর্বল হবে।

কয়েকটা ঘটনা না ঘটলে ওহাবীদের সঙ্গে জমিদারের এ ক্ষমতার লড়াই সম্ভবতঃ তাদের সংগঠিত প্রতিরোধে রূপান্তরিত হত না। প্রথমতঃ, মসজিদ পোড়ানোর প্রতিবাদে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ওহাবীদের আর্জিতে কোন ফল হল না। এ ধরনের সংঘর্ষে জিলার শাসন কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থার নির্দেশ দেবেন, তা প্রধানতঃ নির্ভর করত থানা-দারোগার মতামতের উপর। ওহাবী বিরোধীরাই মসজিদ পুড়িয়েছে—জমিদারের এ ভাষ্য দারোগা রামরতন চক্রবর্তী সত্য বলে জানাল। জমিদার পক্ষের

কোন শাস্তি হল না। সরকারী দলিল থেকে বোঝা যায় আশেপাশের নানা প্রভাবশালী জমিদার কৃষ্ণদেবের পক্ষ নেয়। ওহাবীদের কাছে তা অজানা থাকার কথা নয়। তারা বুঝতে পারে, তাদের প্রতিরোধ শুধুমাত্র কৃষ্ণদেবের বিরুদ্ধে নয়।

মসজিদ পোড়ানোর অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে কৃষ্ণদেব অন্যভাবে ওহাবীদের দমন করতে চেষ্টা করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে খাজনা উসুল করার ব্যাপারে জমিদারদের বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইনে বাকী খাজনার অজুহাতে জমিদার প্রজাদের বেঁধে এনে তার কাছারির কয়েদখানায় পুরে রাখতে পারত। কিন্তু শুধুমাত্র বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার কদাচিৎ আইনের এ বিধান প্রয়োগ করত। 'হপ্তম' (সপ্তম আইন) প্রধানতঃ ছিল 'বেয়াদব' প্রজাদের শাসানোর অস্ত্র, বিশেষ করে যেখানে জোট বেঁধে তারা জমিদারের বিরোধিতা করত। এ ভাবেই কৃষ্ণদেব এ আইনকে কাজে লাগাল। তবে বেপরোয়া এ জমিদার কোন বৈধতার ধার ধারেনি। জমিদারী ক্ষমতার অপব্যবহার কতদূর যেতে পারে, কৃষ্ণদেবের কার্যকলাপ তার একটা দৃষ্টান্ত। দুষ্কর্মের জন্য নাটের গুরু এ জমিদার এক শিখণ্ডী খাড়া করল। পরে জানা গিয়েছিল, যে দুজন ওহাবী-শিষ্যকে হেনস্তা করার জন্য এতো চক্রান্ত। তারা আসলে কৃষ্ণদেবের প্রজাই নয়; এমনকি কৃষকই নয়; পুড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিল মাত্র। তবুও আটত্রিশ টাকা খাজনা বাকী পড়েছে, এ অজুহাতে তাদের জোর করে ধরে এনে জমিদারের কাছারিতে বেঁধে রেখে নানা ধরনের নির্যাতন করা হল।

এ জমিদারী জুলুম ওহাবী নেতারা মেনে নিল না। স্থানীয় আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চতর শাসক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ওহাবীদের প্রধান নেতাদের অন্যতম গোলাম মাসুম নিজেই দুই শিষ্যকে নিয়ে কলকাতা গেল (সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ) কিন্তু নানা কারণে এতে কোন সুফল হল না।

খুব সম্ভবতঃ, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত কলকাতাতেই নেওয়া হয়। অন্ততঃ সরকারী মহলের এটাই ধারণা। নিঃসন্দেহে প্রস্তুতি তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। তেইশে অক্টোবর নারকেলবাড়িয়ার এক মাতব্বর রায়ত মৈজুদ্দিন বিশ্বাসের বাড়িতে এক বড়ো জমায়েতে প্রতিরোধের কৌশল ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জমিদার কিছু একটা আঁচ করেছিল। তবে মনে হয়, সংঘর্ষ শুরু করার জন্য ওহাবীদের প্রস্তুতি যে সম্পূর্ণ, তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। ওহাবীদের ঠেকানোর

জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা তখনও সে করতে পারেনি। ওহাবীরা এ সুযোগ নিল। নভেম্বর ৬ তারিখ সংঘর্ষ শুরু হয়।

(৬.৩)

দু' সপ্তাহ (৬-১৯ নভেম্বর, ১৮৩১) বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। বিদ্রোহীদের মানসিকতা বোঝাব জন্য এর কয়েকটা বিশেষ দিক উল্লেখ করব মাত্র।

বিদ্রোহ যে সুসংগঠিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্রোহীরা ঝোঁকের মাথায় কিছু করেনি। কি তারা করতে যাচ্ছে, তা তারা পরিষ্কার জানত।

গোড়ায় 'লুঠতরাজে'র ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। বিদ্রোহীদের একটা প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ, ৪০ প্রকাশ্য বাজারে তারা গো-হত্যা করে, তার রক্ত এক মন্দিরের দেয়ারে ছিটিয়ে দেয়; আর গরুটাকে চাব টুকরো করে কেটে মন্দিরের চারপাশে ঝুলিয়ে দেয়। পরের দিনও (৭ নভেম্বর) তারা দুটো ষাঁড়কে এবাবে কাটতে যায়। দু'জন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা বাধা দিতে গেলে ওহাবীদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। ব্রাহ্মণদের তারা নির্মমভাবে প্রহার করে। একজন মারা যায়। তার পরের সপ্তাহেও এ ধরনের কয়েকটা ঘটনা ঘটে। সরকারী বিববণ মতে, কোন কোন জায়গায় বিদ্রোহীরা হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করার চেষ্টা করে। মোটামুটি, নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের সাফল্য অব্যাহত থাকে।

জমিদার-বিরোধিতাই বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজ-বিরোধী লক্ষণ ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে। গোড়ায় বিদ্রোহীদের প্রধান আক্রোশ ছিল বসিরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর উপর। কারণ, তাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণদেবের দুষ্কর্মের এক প্রধান সহায় ছিল এ দারোগা। অন্যান্য যেসব দারোগা তাদের নানাভাবে হেনস্তা করে, তাদের ধরার জন্যও ওহাবীরা দলবল পাঠায়।

রাজ-বিরোধিতা শুধু এ দারোগাদের বিনাশের চেষ্টা নয়। বস্তুতঃ, বিদ্রোহ শুরু হবার কয়েকদিনের মধ্যেই তিতু ঘোষণা করে, কোম্পানীর জমানার অবসান ঘটেছে[৪১] আবার মুসলমানদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা ফিরে আসবে। নারকেলবাড়িয়ায় 'বাঁশের কেল্লায়' ওহাবীদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে একটা পতাকাও ওড়ানো হয়েছিল।[৪২] তিতু নিজেকে 'বাদশাহ' বলে ঘোষণা করে। প্রচলিত এক কাহিনী[৪৩] অনুযায়ী, মইনুদ্দীনের বাড়িতেই মহাসমারোহে তার অভিষেক হয়। 'কিংখাপমণ্ডিত সিংহাসনে' উপবিষ্ট তিতুর জয়ধ্বনি করে তার অনুগামীরা। ওহাবীরাজ পরিচালনার

নানা দায়িত্ব তিতু বিশ্বস্ত এবং নিকট শিষ্যদের হাতে দেয়। সম্ভবতঃ বাদশাহী কর্তৃত্বের অঙ্গ হিসেবে তিতু স্থানীয় নানা জমিদারের কাছে প্রয়োজনীয় রসদ পাঠানোর জন্য পরোয়ানা পাঠায়।[৪৪] ওহাবীদের বিরুদ্ধে বারাসত ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্যর্থতায় তাদের এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়, যে ওহাবী-রাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

শুধুমাত্র সাংগঠনিক নৈপুণ্যই ওহাবীদের আত্মবিশ্বাসের প্রধান উৎস ছিল না। তাদের উপর অন্যান্য প্রভাবও সক্রিয় ছিল, বিশেষ করে নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব।

ওহাবী ধর্মমতের মধ্যেই এ নৈতিক বলের বীজ ছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসলে তাদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ; এটা তাই তাদের পবিত্র কর্তব্য। কথিত আছে[৪৫] ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ 'বাঁশের কেল্লা'য় তিতু তার অনুগামীদের এভাবেই উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। তিতুর এক নিকটতম সহযোগী সাজন গাজীর গানেও[৪৬] এ বিশ্বাসের উল্লেখ আছে।

ওহাবী ধর্মমতের সঙ্গে অন্যভাবেও তাদের আত্মবিশ্বাসের যোগ ছিল। ওহাবীরা বিশ্বাস করত, সংকট মুহূর্তে এক পরিত্রাতার আবির্ভাব হবে। আদি ওহাবী মত অনুযায়ী তার প্রভাবের প্রধান উৎস তাঁর চারিত্রিক শুচিতা, ইসলাম-শাস্ত্রে তাঁর সুগভীর জ্ঞান, তাঁর সত্যপরায়ণতা, উদ্দেশ্যসাধনে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। এসব গুণেই পরিত্রাতা তাঁর অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করবেন। অতিপ্রাকৃত কোন ক্ষমতা তাঁর উপর আরোপিত হয়নি।

কিন্তু নেতার অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকার সম্পর্কে বিশ্বাস ক্রমেই ওহাবী সংগঠনকে প্রভাবিত করে। এর জন্ম ১৮৩১ সালের বিদ্রোহের আগেই হয়েছে। শিখ-ওহাবী যুদ্ধে বালাকোটে (মে, ১৮৩১) ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর ঘটনা তাঁর শিষ্যরা মেনে নেয়নি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তংার মৃত্যু ঘটেনি। কারণ তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি; তারা বলত, কোন পরম সংকটের সময় তাঁর পুরনাবির্ভাব ঘটবে; ফলে তাদের জয় সুনিশ্চিত হবে।[৪৭]

১৮৩১-এর আন্দোলনে এ অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকার সম্পর্কে ওহাবীদের ধারণা অনেক ব্যাপক। এ এক ধরনের যাদুশক্তিতে বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস ছিল, ওহাবীদের সব হাতিয়ার মন্ত্রপূত; ওহাবী যোদ্ধাদের এ যাদুময় বর্ম ব্রিটিশের কোন অস্ত্রশস্ত্র ভেদ করতে পারবে না। ব্রিটিশদের কামান-বন্দুক তাদের তৈরি বাঁশের কেল্লায় প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে; তারা ব্রিটিশদের গোলাগুলি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়ে গিলে নেবে।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের বিশ্বাসের কথা ওহাবীরা প্রকাশ্যেই বলত। তিতুমীরের বিদ্রোহের উপর নানা কবিতায় এর উল্লেখ আছে; অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কবিতার সুর তীব্র শ্লেষাত্মক।[৪৮] ওহাবীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান যারা চালিয়েছিল, এসব কথা তাদের কানেও আসে। একজনের বিবরণে[৪৯] আছে, ওহাবীরা যুদ্ধের সাধারণ সতর্কতামূলক কৌশলের ধার ধারত না। নিশ্চিত বিনাশ জেনেও যেভাবে তারা ব্রিটিশ সৈন্যের একেবারে কাছে বেপরোয়াভাবে এগিয়ে আসছিল, তা তাকে বিস্মিত করেছিল। নদীয়া বিভাগের কমিশনার জানতে পারেন, কীভাবে ওহাবীদের বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের ব্যর্থতার পর তিতুমীর ও অন্যান্য ফকিরেরা তাদের অপরাজেয়তার কথা সবাইকে বোঝাচ্ছিল।[৫০] "আগ্নেয়াস্ত্র তাদের কখনও কোন ক্ষতি করতে পারবে না; সিপাহীদের ছোঁড়া গোলা তারা গিলে খেয়ে নিয়েছে।" নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ লিখছেন ঃ "তাদের পরিচালনায় ছিল দু' তিনজন ফকির। আক্রমণকারীরা শক্তসমর্থ, ধর্মান্ধ যুবা; স্পষ্টতঃ তাদের ধারণা ছিল, তারা মন্ত্রশক্তিতে সুরক্ষিত; কী নির্ভীক দৃঢ়সংকল্প চিত্তে তারা আমাদের গোলাবারুদের আওতার মধ্যে এগিয়ে আসছিল; দু' একজনের মৃত্যুতেও তারা পেছিয়ে যায়নি...লম্বা লাঠি আর কিছু তলোয়ার ছাড়া তাদের আর কি অস্ত্রশস্ত্র ছিল আমি বলতে পারি না; সম্ভবতঃ আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল থেকে তারা কয়েকটা গাদাবন্দুক ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল; আর তাদের ছিল এক ধরনের দিশী হাতিয়ার, যেগুলি ডাকাতরা সচরাচর ব্যবহার করে।"[৫১]

মনে হয়, তিতুমীর নিজে এ শক্তির অধিকারী বলে দাবী করত না। তার অনুগামীদের মধ্যে কয়েকজন সিদ্ধ ফকির নাকি ছিলেন; যেমন ফকির মিস্কান। তারাই সম্ভবতঃ এ ধারণা প্রচার করে যে, ওহাবীরা অপরাজেয় যাদুশক্তির অধিকারী।

(৬.৪)

আন্দোলনের যে দুটি বিশিষ্ট প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছি—জমিদার বিরোধী কোন কোন হিংসার ধর্মীয় রূপ, এবং ক্রমবর্ধমান রাজ-বিরোধিতা— সে সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথম প্রশ্ন ধর্মীয় প্রভাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন রাজ-বিরোধিতার পটভূমিকা সম্পর্কে।

কোন কোন ঐতিহাসিক[৫২] মনে করেন, বিদ্রোহীদের ধর্মচেতনা অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু এ ধর্মবোধ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবোধে রূপান্তরিত হয়নি; এর ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দু কোথাও নিম্নবর্ণের মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি; বা এ আন্দোলনের

ফলে নিম্নবর্ণের মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষায় ব্রতী হয়নি; কৃষক হিসেবে ওহাবীদের শ্রেণীচেতনাই আন্দোলনের মূল গতিপ্রকৃতিকে নির্ধারিত করেছে।

এ মতের সমালোচনায় কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন এ আন্দোলনে ওহাবী কৃষকদের শ্রেণীচেতনা একান্তই গৌণ; সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীচেতনা অন্য সব কিছুকে আচ্ছন্ন করেছে; কৃষকশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থরক্ষায় ওহাবীদের কোন উদ্যোগ ছিল না; নেতারা এক ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা সব সময় ভেবেছে; ভিন্ন ধর্মমতের কৃষকদের সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা ছিল না; নানা জোরজুলুমের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের দল ভারী করার জন্য ওহাবীদের চেষ্টা বরং হিন্দু এবং মুসলমান, দুই ধর্মের কৃষকদের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।[৫৩]

আসল সত্য কি? ওহাবী-জমিদার সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা ধর্মের ভূমিকা আগেই সমালোচনা করেছি। এখানে আলোচ্য, ঐ বিশেষ ধরনের ধর্মীয় চেতনা কি কৃষক হিসেবে ওহাবীদের চেতনার সঙ্গে সংগতিহীন?

শ্রেণীচেতনার অভাব বোঝাতে বলা হয়েছে, সমগ্র কৃষকশ্রেণীর কথা ভাবা হয়নি; এমনকি, ওহাবীদের নানা কার্যকলাপ অনেক কৃষককে আন্দোলন থেকে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু, আঞ্চলিক সমগ্র কৃষকগোষ্ঠীর স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা কৃষকদের শ্রেণীচেতনার একটি মাত্র লক্ষণ নয়। এ চেতনার একটা মূল লক্ষণ ক্ষমতাসীন জমিদারগোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ সম্পর্কিত চেতনা। নির্দিষ্ট কোন অর্থনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সে বিরোধ নাও ঘটতে পারে। প্রধানতঃ তা জমিদারের প্রবল ক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রজাদের থেকে খাজনা আদায়ের জন্য আইনসিদ্ধ ক্ষমতা নয়। খাজনা আদায় দিয়ে তার শুরু; কিন্তু বহু বিচিত্র রূপে তার বিস্তার এবং প্রকাশ।[৫৪] এর অজস্র দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কৃষকদের শ্রেণীচেতনা গড়ে উঠে। কোন বিশেষ অবস্থায় সে চেতনা ক্ষুদ্র কৃষকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে; ধর্মীয় বা অন্য কোন কারণে তার প্রসার ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ওহাবী আন্দোলনে এ চেতনা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আমরা আগে দেখেছি, ওহাবীদের ধর্মবিশ্বাস কিভাবে জমিদারের সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি করেছে। যে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের ধর্মমত প্রচারে বাধা দিয়েছে, তাদের সঙ্গে ওহাবীদের সম্পর্ক জমিদার-প্রজার; তারা কেউ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস বহির্ভূত নয়। তাছাড়া

শুধুমাত্র খেয়ালের বশে বা উগ্র হিন্দুয়ানীর জন্য তাবা ওহাবী-প্রভাব বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়নি। এর আসল কারণ, ওহাবীদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ওহাবী-প্রভাব খর্ব করার জন্য জমিদারের উপায়গুলিও শ্রেণী হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে আবওয়াব বসিয়ে তারা চেষ্টা করল, যাতে মুসলমান প্রজারা তিতুর দলে যোগ না দেয়। এ আবওয়াব দিতে অস্বীকার করায় ক্রুদ্ধ জমিদার অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য লাঠিয়াল পাঠাল। এও প্রজা পীড়নের এক জমিদারী কায়দা। ওহাবীরা তাতেও বশে এল না দেখে জমিদার 'হপ্তম' আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহার করতে থাকে। তবুও বিশেষ ফল হল না বলে জমিদার পাশাপাশি অঞ্চলের জমিদার, থানার পুলিস-দারোগা, এবং পরাক্রান্ত নীলকরদের ওহাবী-দমনের কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইলে।[৫৫]

ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে ওহাবীদের স্বাতন্ত্রবোধ এভাবে তাদের শ্রেণীচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। গোড়ার দিকে ওহাবীদের ধারণা ছিল, তাদের ধর্মমত প্রচারের সঙ্গে জমিদারী কর্তৃত্বের কোন বিরোধ নেই।[৫৬] তিতুর বিদ্রোহের উপর সমসাময়িক কোন কোন কবিতায়[৫৭] তাদের এ মনোভাবের পরিচয় মেলে। কিন্তু আস্তে আস্তে জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জমিদারবিরোধী হিংসার ধর্মীয় রূপ ব্যাখ্যা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে, কারণ ওহাবীদের বিরুদ্ধে শ্রেণীচেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবোধের যে অভিযোগ, তার প্রধান ভিত্তি এ ধরনের হিংসার ঘটনা।

আসলে এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দুর্লভ। এ অভিযোগের সপক্ষে সচরাচর যেসব ঘটনার[৫৮] উল্লেখ করা হয় তাদের সম্ভাব্যতা বিচার বর্তমান আলোচনায় সম্ভব নয়। তবে কোন কোন কাহিনীকার বা ইতিহাসকারের সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ ভ্রান্ত।[৫৯] বর্তমান আলোচনা তাই কয়েকটা গ্রহণযোগ্য তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঃ যেমন কয়েকটা গো-হত্যার ঘটনা, অন্ততঃ একটি মন্দিরের শুচিতা নাশ এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণ হত্যা। যদি অন্য ধরনের ঘটনার যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়, তাহলে বর্তমান আলোচনার সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করতে হবে।

আমরা ধরে নিচ্ছি, ওহাবীদের হিংসা প্রধানতঃ জমিদার, এবং তাদের প্রজাপীড়ন-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত নানাজনের বিরুদ্ধে। বহু কৃষকের ব্যাপক বিদ্রোহের সময় হিংসার এ মূল রূপের হেরফের হতেই পারে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদেব বা অন্যান্য ওহাবী-বিরোধী জমিদারেরা হিন্দুধর্মের প্রচার বা প্রসারের জন্য

সম্প্রতিকালে কোন উদ্যোগ নেয়নি; তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি বা প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্য তারা অন্য কোন কাজও করেনি, যেমন মন্দির বানানো। যদি তাই হত, তাহলে জমিদারের এসব উদ্যোগ ও কাজকে সচেতনভাবে বাধাদানের মধ্য দিয়ে কৃষকদের জমিদার-বিরোধী মানসিকতার একটা সম্ভাব্য প্রকাশ ঘটত। যেমন, নূতন বানানো মন্দির জমিদারের নূতন কর্তৃত্বের প্রতীক; তাই প্রতিবাদী কৃষকদের আক্রোশ মন্দিরের ক্ষতিসাধনের নানা চেষ্টার মধ্যে হয়ত আত্মপ্রকাশ করত।[৮০]

ওহাবীদের হিংসার ধর্মীয় রূপ তাই এভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এক বিশেষ ধর্মভুক্ত জমিদারশ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভিন্নধর্মী কৃষকগোষ্ঠীর আক্রোশ জমিদারের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা প্রতিষ্ঠান বা বস্তুর বিরুদ্ধে প্রকাশ পেতে পারে। ওহাবীদের ক্ষেত্রে একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল এই ঃ জমিদার-বিরোধিতার ধর্মীয় রূপ জমিদারের ওহাবী-বিরোধী কার্যকলাপের আদর্শেই গড়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, এ দুই ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের কোন অনড় যান্ত্রিক নিয়ম খোঁজার চেষ্টা অর্থহীন। জমিদারের ওহাবী-পীড়নের একটা রূপ তাদের ধর্মের উপর সরাসরি আঘাত— যেমন, 'দাড়ির জরিমানা', মসজিদ পোড়ানো ইত্যাদি। কথিত আছে, কৃষ্ণদেব প্রকাশ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছিল। অনেক হিন্দু-জমিদারীতে এ নিয়ম চালু ছিল; তবে কৃষ্ণদেব বা অন্যান্য জমিদার এরকম কোন ব্যবস্থা নিয়েছিল কিনা, তা সরকারি দলিল থেকে জানা যায় না।

জমিদারী-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ওহাবী-প্রতিরোধের একটা রূপ তাই জমিদারের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত। যদি গো-হত্যা সম্পর্কিত কৃষ্ণদেবের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা সত্য ঘটনা হয়, তাহলে পুড়া বাজারে ওহাবীদের গো-হত্যা তাদের প্রতিবাদের একটা অঙ্গ বলে গণ্য করা যায়। যদি এ নিষেধাজ্ঞা সত্য ঘটনা নাও হয়, তাহলেও প্রকাশ্যে গো-হত্যা এ প্রতিবাদের একটা সম্ভাব্য রূপ, কারণ হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে গরুর একটা বিশেষ স্থান আছে। মন্দিরের শুচিতানাশ মসজিদ পোড়ানোর প্রতিহিংসা। রামরাম চক্রবর্তীর উপর নির্যাতন ব্রাহ্মণ হিসেবে নয় জমিদারের কুকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দারোগা হিসেবে।

তবে ঘটনা যেভাবে শুরু হয়, তার চরিত্র পরবর্তী পর্যায়ে সমান নাও থাকতে পারে। পরে হয়ত ওহাবীরা এমন কিছু করেছিল, যার মধ্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাব ছিল। প্রাথমিক প্রেরণা থেকে এ বিচ্যুতিও ঐতিহাসিককে ব্যাখ্যা করতে হবে। আগেই বলেছি, এসব ঘটনার প্রচলিত অনেক বিবরণ স্পষ্টতঃ পক্ষপাতদুষ্ট।

তাছাড়া হিংসার ধর্মীয় রূপ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেন না ভুলে যাই, তার আরো নানা রূপ ছিল। যেখানে ধর্ম শত্রুর ক্ষমতার ভিত্তি বা রূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, সেখানে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ওহাবীদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস একান্তভাবে নগ্ন ক্ষমতার লড়াই। জয়ের জন্য সেখানে প্রয়োজন ঐক্য ও সংহতি, সামরিক ক্ষমতা (বস্তুতঃ অতি সাধারণ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র; বহু ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রগতিতে লাঠি চালনার ক্ষমতা), প্রতিরোধের নিপুণ কৌশল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব। ধর্মীয় রূপে হিংসার ভূমিকা এখানে ক্রমেই গৌণ হয়ে আসে।

ওহাবী আন্দোলনে রাজ-বিরোধিতা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কেউ কেউ[৬১] মনে করেন, এ রাজ-বিরোধিতার মূল প্রেরণা শত্রুর বিরুদ্ধে 'জেহাদের' মনোভাব; বলা হয়েছে, এটা ওহাবী মতবাদের একটা প্রধান অঙ্গ। অন্য একটা মতানুযায়ী[৬২] 'জেহাদী' মানসিকতার কোন ভূমিকাই ছিল না; ব্রিটিশদের সামরিক পরাক্রম সম্পর্কে তিতু সম্পূর্ণ সচেতন ছিল; তাই হাজার কয়েক অনুগামী নিয়ে সে ব্রিটিশরাজকে উচ্ছেদ করার কথা ভেবেছিল, তা ভাবাই যায় না; তাছাড়া যে ওহাবী-গোষ্ঠীর সঙ্গে তিতুর যোগ, তাদের প্রধান সংঘর্ষ শিখদের বিরুদ্ধে; ইংরেজ-বিরোধী কোন ফতোয়া তারা জারী করেনি।

এ দুই ব্যাখ্যার বিচার প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার ঃ এ বিষয়ে কোন অনিশ্চয়তা নেই যে তিতু কোম্পানীরাজের অবসান ও নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছিল। আমাদের বিচার্য প্রশ্ন ঃ রাজ-বিরোধিতার সিদ্ধান্ত তিতু কোন সময়ে, এবং কেন নিয়েছিল?

জেহাদের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ না হলে রাজ-বিরোধিতা সম্ভব নয়, এটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। আবার ব্রিটিশ শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা রাজ-বিরোধিতার পথ থেকে ওহাবীদের অনিবার্যভাবে নিবৃত্ত করবে, এটাও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য তিতুর প্রাথমিক কর্মসূচীতে রাজশক্তি উচ্ছেদের কোন ধারণাই ছিল না। তার মূল লক্ষ্যের কথা আগেই আলোচনা করেছি। বলা হয়েছে, নানা ব্রিটিশ-নীতির ফলস্বরূপ মুসলমানদের ক্রম-বর্ধমান অসন্তোষ তিতুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এ অসন্তোষ সম্পর্কে তিতুর সচেতনতা থাকলে তা তার মূল লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়নি। এ অসন্তোষ দূর করার উপায় হিসেবে সে ব্রিটিশ-রাজের অবসানের কথা ভেবেছিল এমন কোন তথ্য জানা নেই। তিতু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রামের কথা ভেবেছিলেন। এটা বানানো গল্প

বলেই মনে হয়।[৬৩]

তিতুর বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি আগেই আলোচনা করেছি। গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ আক্রোশ ছিল জমিদারের বিরুদ্ধে। তিতুর এ ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হয যে, স্থানীয় প্রশাসন জমিদারের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করার জন্য কিছুই করবে না। একেবাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল, হয়তো কিছু প্রতিবিধান মিলবে। বিদ্রোহ শুরু হবার পর সে কোম্পানী জমানার অবসান ঘোষণা করে; কিন্তু কয়েকজন কুখ্যাত দরোগার নির্যাতন করা ছাড়া বিদ্রোহীরা গোড়ায় বিশেষ কিছু করেনি। বস্তুতঃ আন্দোলন দমানোর জন্য প্রশাসনের নানা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ওহাবীরা ক্রমে ব্রিটিশ-বিরোধী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তখন ওহাবী-বিরোধী জোট যেমনভাবে গড়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে এ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব ছিল না। তখন কৃষ্ণদেবই শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ নয়; প্রতিবেশী নানা জমিদার তার পক্ষ নিয়েছে; তার সঙ্গে আর যোগ দিয়েছে জাঁদরেল কয়েকজন নীলকর। তারাই সম্ভবতঃ সরকাব পক্ষকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে; ওহাবীদের হিংসার কাজকে অতিরঞ্জিত করে বলেছে।

স্পষ্টতঃ সরকার পক্ষ প্রথম থেকেই ওহাবীদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। নদীয়া বিভাগের কমিশনারের মতে[৬৪],—বিদ্রোহ 'ধর্মোন্মাদ' এক দলের কাণ্ড; তিতু 'সর্দার ডাকাত'; বিদ্রোহ যে ছড়াতে পেরেছে,, তার একটা প্রধান কারণ, পাশাপাশি অঞ্চলের অনেক কুখ্যাত ডাকাত এদের দলে ভিড়ে গেছে।[৬৫] নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এক ঢালাও হুকুম জারী করে বলে, ওহাবীদের দেখলেই যেন ধরা হয়। এ আদেশ স্পষ্টতঃ এত অযৌক্তিক যে এ পরোয়ানা তুলে নেবার জন্য বড়লাট ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেয়।[৬৬] নদীয়া এবং বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটদের সামরিক অভিযান শুরু হবার পর তিতুর কোন সংশয় থাকল না, তার প্রধান লড়াই এখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে তিতুর সাফল্য তার দলকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। আগেই বলেছি, তাদের মধ্যে তখন এ বিশ্বাস জন্মায়, তাদের শরীর মন্ত্রশক্তিতে সুরক্ষিত।

তাই ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত যে আনুষঙ্গিক সব দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কোন কথা নেই। ব্রিটিশ-শক্তির প্রবলতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে তাকে প্রতিরোধ চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র— এটা আমাদের বিচার নয়। সমসাময়িক কালের অনেক তিতু বিরোধী পক্ষও তিতুর অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকার সম্পর্কে কথাবার্তাকে 'বুজরুগী' বলে ব্যঙ্গ করত।[৬৭] কিন্তু বিদ্রোহী

কৃষকদের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকেব কাজ এ ধাবণাগুলিকে চিহ্নিত করা, ভিন্ন জনের যুক্তিব আলোকে তাদের বিচার করা নয়।

(৬.৫)

ফরাজীদের উৎপত্তিও এক প্রতিবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে। এর প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়াতুল্লা আকস্মিকভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি তার জীবনের প্রায় কুড়ি বছর কেটেছে খোদ মক্কায়। দ্বিতীয়বার মক্কা সফরের পর হাজী দেশে ফেরে ১৮২০ সালে। বৃহত্তর 'ইসকাম পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে তার ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে। পূর্ব ভারতে ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ আছে। ওহাবীদের মত তার প্রচারেরও মূল কথা— স্থানীয় মুসলমানদের ইসলামের আদি শুদ্ধ সরল জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে হবে; নূতন ধর্মবোধ শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রশ্ন নয়; তা নূতন সমাজ সৃষ্টির অপরিহার্য উপকরণ। ফরাজী আন্দোলন বুঝতে গেলে নূতন ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত এ গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক উদ্ভবের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। পরে পরে এ মূল বিশ্বাসের উদ্দীপনা ক্ষীণ হয়ে আসে।

ওহাবীদের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও মূলতঃ এক প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলন অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

জমিদার, নীলকর ইত্যাদি শক্তি-গোষ্ঠীর সঙ্গে ফরাজীদের সংঘর্ষের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ফরাজীদের মূল লক্ষ্য ছিল জমিদারী শোষণ-ব্যবস্থা ও নীলচাষ প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো। এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে শরীয়াতুল্লার পুত্র দুদু মিঞার একটা উক্তির উল্লেখ করা হয়। দুদু বলত,[৬৮] জমি ভগবানের দান; এতে জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানা ভগবৎ-বিধান-বিরোধী; তাই অসঙ্গত। সমসাময়িক এক সরকারী প্রতিবেদনেও ফরাজীদের এ 'বিশেষ প্রিয় বিশ্বাসের' উল্লেখ আছে। এজন্যই নাকি তারা কোন ধরনের খাজনা দেওয়াকে অপছন্দ করত, এবং সে সুদিনের কথা বলত, যখন কোন রকম খাজনা দেওয়ার দায় থাকবে না।

এ ধরনের ধারণা সম্ভবতঃ ফরাজীদের অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের যে সব ঘটনা আমাদের জানা আছে, সেগুলি এ ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। জমিদারী প্রথা ও নীলচাষ প্রথার অবলোপ ফরাজীদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের লক্ষ্য একান্তই সীমিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘর্ষ ক্রমেই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ওহাবীদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, এখানেও মূলতঃ তাই ঘটেছে। ফরাজীদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এ সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ যোগ। আমাদের জানা তথ্যের ভিত্তিতে এ যোগ অনেক পরিষ্কারভাবে বোঝানো যায়।

মুসলমান সমাজের কোন কোন গোষ্ঠীর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাধারণ অবস্থার মুসলমান কৃষক, ভূমিহীন চাষী, দুঃস্থ জোলা ইত্যাদির মধ্যে ফরাজী মতবাদ যে ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জমিদারের প্রতিপক্ষ এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খর্ব হয়।

এর একটা কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। দীর্ঘদিনের সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সাধারণ মুসলমানদের কাছে অত সহজ ছিল না। অথচ ফরাজী নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এগুলো বাদ না দিলে খাঁটি মুসলমান হওয়া অসম্ভব; কারণ, তাদের মতে, এগুলি 'গর্হিত' ('Sinful'); আদি ইসলামের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন। অসহিষ্ণু নেতারা তাই মাঝে মাঝে এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানকে প্রকাশ্যে নিন্দা করত; তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য জোর-জুলুমেরও আশ্রয় নিত; সনাতনপন্থী কোন কোন মুসলমানের বাড়িঘরও নাকি জ্বালিয়ে দিত। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে শরীয়াতুল্লার ঢাকা জিলা নিবাসী দুই সাগরেদকে এ ধরনের অভিযোগে কঠোর সাজাও দেওয়া হয়।[৬৯] মাঝে মধ্যেই এ ধরনের ঘটনা ঘটত। ব্যাপক এক সংঘর্ষ ঘটে ১৮৩৯ সালে। সরকারী বিবরণ মতে, শরীয়াতুল্লার মৃত্যুর পর ফরাজীগোষ্ঠীর নূতন সর্ববাদীসম্মত নেতা তার পুত্র দুদু মিঞা জোরদার করে দলভারী করার চেষ্টা করে। নূতন নেতার মনোনয়ন উপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল ও যশোর থেকে আসা বহু ফরাজীর উপস্থিতি সম্ভবতঃ দুদুকে এ কাজে উৎসাহিত করে।[৭০]

জমিদারেরা কদাচিৎ প্রজাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কথা ভেবেছে। কিন্তু সংঘবদ্ধ এবং প্রভাবশালী বাইরের কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী তাদের নিজ এলাকার প্রজাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে জোর করে বাধা দেবে, এটা তারা সহজে মেনে নেয়নি। বিক্ষুব্ধ প্রজারা নালিশ করলে তাই তারা ফরাজীদের এ ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। ফরাজীরা প্রতিবাদ করে বলে, বিধর্মী জমিদারের এ হস্তক্ষেপ অসঙ্গত। ওহাবীদের ক্ষেত্রে দেখেছি, এভাবেই জমিদারের সঙ্গে তাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল।

জমিদারের সঙ্গে ফরাজীদের বিরোধের আরো কারণ ছিল। একটা প্রধান কারণ,

চিরাচরিত নানা আবওয়াব আদায়ে তারা সম্মিলিতভাবে বাধা দেয়। তার কারণ এ নয় যে আবওয়াবগুলির বোঝা তাদের পক্ষে দুর্বহ ছিল। কারণ, এগুলি তাদের মূল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। ওহাবীদের মত, ফরাজীদের ধর্মবোধেরও মূল ভিত্তি ভগবানের একত্বে বিশ্বাস। তাই তাদের নেতার নির্দেশ, এ বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন আচার বা প্রথা তারা মেনে নেবে না। অথচ হিন্দু জমিদারেরা হামেশাই মূর্তিপূজা-সংশ্লিষ্ট নানা পালে-পার্বণে মুসলমান প্রজাদের থেকে আবওয়াব আদায় করত। ফরাজীরা বলল, মূর্তিপূজা এবং ভগবানের অখণ্ডতায় তাদের বিশ্বাস পরস্পরবিরোধী, মূর্তিপূজার সঙ্গে কোনো ধরনের সংশ্রব তাদের ধর্মমতে নিষিদ্ধ, মুসলমানদের পক্ষে এ ধরনের আবওয়াব দেবার অর্থ, তারা মূর্তিপূজার মত গর্হিত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে।

ফরাজীদের এ প্রতিবাদের তাৎপর্য শুধুমাত্র জমিদারের আর্থিক ক্ষতি নয়; এটা আসলে জমিদারী এলাকায় তাদের দীর্ঘদিনের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের উপর আঘাত। তাই তারা এটা সহজে মেনে নেয়নি। লক্ষ্যণীয়, জমিদার 'দুর্বিনীত' ওহাবীদের যেভাবে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল, ফরাজীদের ক্ষেত্রেও তাই করল। তবে 'দাড়ির জরিমানা'র মধ্যে দিয়েই কাজ হাসিল হয়নি। শারীরিক নির্যাতনের নানা কৌশল তারা বাৎলাল।[৭১] তাছাড়া আদালতে মিথ্যা মামলা রুজু করে ফরাজীদের হেনস্তা করতে চাইল।

কিন্তু ফরাজী প্রভাব বৃদ্ধি রোধ করা গেল না। দুদু মিঞা 'দাড়ির জরিমানা'কে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করে বলল,[৭২] যেকোন জরিমানা করার অধিকার আছে একমাত্র সরকারের; জমিদারের ক্ষেত্রে এ ধরনের ক্ষমতা স্বীকার করা ভগবৎ-বিধান বিরোধী।

ফরাজীরা কিন্তু সামগ্রিক জমিদারী ব্যবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেনি। পূজা-পার্বণের উপলক্ষ ছাড়াও জমিদারেরা কত বিচিত্র ধরনের আবওয়াব আদায় করত। এ সম্পর্কে ফরাজীরা কোন প্রতিবাদ করেনি। তাছাড়া খাজনার হার বৃদ্ধি, নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া, নানা কৌশলে গ্রামের পতিত জমি দখলে আনার চেষ্টা—এ সবের বিরুদ্ধেও এ সময় ফরাজীরা কোন আন্দোলন গড়ে তোলেনি। এমনকি, নেতারা এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশও ফরাজী কৃষকদের দেয়নি। তদানীন্তন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের প্রতিবেদন থেকে[৭৩] ফরাজী মানসিকতার অন্য একটা দিক জানতে পারি। খাজনা আদায় নিয়ে এক মুসলমান জমিদারের সঙ্গে ফরাজীদের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছিল। জোরজুলুম করে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে

ফরাজীবা তার বিরুদ্ধে পঞ্চাশ মামলা রুজু কবে। উপাযন্তর না দেখে জমিদাব সদরে যায়। তাকে বলা হয়, যদি সে ফরাজী ধর্ম্মমত গ্রহণ করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ফরাজীদের সঙ্গে তার বিবাদ মিটে যাবে। জমিদার বাজী হওয়াতে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়।

প্রথাসম্মত আবওয়াব আদায়ে ফরাজীদের বাধাদান জমিদাবকে অনিবার্যভাবে শঙ্কিত করেছিল। কিন্তু নিজের প্রতিপত্তির স্থায়িত্ব সম্পর্কে তার আশঙ্কার আরো বড়ো কারণ, ফরাজী সংগঠনের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি এবং নৈপুণ্য। জমিদার দেখল, এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফরাজীরা তাদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে—এটা যেন জমিদারী শাসন-ব্যবস্থার এক অব্যর্থ বিকল্প।

প্রধানতঃ তিনভাবে ফরাজী সংগঠন[৭৪] গড়ে উঠে। এ ধারাগুলি কিন্তু কালানুক্রমিক নয়। নিজেদের নূতন ধর্মমতের জন্য ফরাজীরা সংঘবদ্ধ প্রচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এক ধরনের সংগঠন ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। ফরাজীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরূপ সমালোচনা ও প্রচারের জন্যও সংগঠন ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠে। এ সংগঠন বিকাশের তৃতীয় পর্যায় জমিদার, নীলকর ইত্যাদি প্রবল শক্তিগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা প্রতিহত করার চেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সংঘর্ষ ছাড়া সংগঠনের রূপ সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন হত।

তৃতীয় পর্যায়ের সংগঠনের দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল ঃ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা অর্থাৎ হিংসা দিয়ে হিংসাকে ঠেকানো; দ্বিতীয়তঃ, দলের সংহতি রক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রথম লক্ষ্য সম্পর্কে শরীয়াতুল্লা নিজে ক্রমেই সচেতন হয়ে ওঠে। কথিত আছে,[৭৫] ফরিদপুরের জালালউদ্দীন মোল্লাকে এক শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলার ভার দেওয়া হয়। তবে দুদুর আমলেই প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়।

সংকটের সময় দলীয় সংহতি রক্ষার জন্য দরকার ছিল কঠোর শৃঙ্খলা। এর একটা প্রধান ভিত্তি, নেতার উপর নিঃশর্ত অবিচল আস্থা ও আনুগত্য। গোড়ায় শরীয়াতুল্লা চাইত, শিষ্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে প্রভুত্বের কোন ছোঁয়াচ যাতে না থাকে, কারণ প্রভুত্ববোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ অনুগামীদের অধীনতাবোধ। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রচলিত নাম পীর-মুরিদ তার পছন্দ ছিল না। নূতন নাম দেওয়া হল—ওস্তাদ-কারিগর।[৭৬] সংগঠনের নূতন পর্যায়ে এ সম্পর্কের মূল ধারণা সম্ভবতঃ পাল্টে যায়। নেতাকে পরেও 'ওস্তাদ' বলা হত। কিন্তু তার কাছে অনুগামীদের

নির্বিচার আনুগত্যের শপথের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্য সম্পর্কে পুরনো সমতাব পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। ফরাজী-অধ্যুষিত অঞ্চলকে নানা এলাকায় ভাগ করে ওস্তাদ আলাদাভাবে তাদের দায়িত্ব বিশ্বস্ত অনুচরদের (খলিফা) হাতে দেয়। ওস্তাদের নির্দেশ তারা অনুসরণ করবে; এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছিল শুধুমাত্র ওস্তাদের।

ফরাজীদের সংহতিবোধের একটা প্রধান উৎস ছিল তাদের কোন কোন ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাস। গোড়াকার ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এ নৈতিক বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। এ ধর্মীয় বিশ্বাসের দেশ-কাল-নিরপেক্ষ এক সার্বজনীনতা ছিল। নৈতিকবোধে প্রভাবিত বিশ্বাসগুলি বিশেষ সংকট মুহূর্তের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নেতাবা অনুগামীদের এ নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল।

এ বোধের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় যে বিশ্বাস তা হল এই যে—ফরাজী—বিশ্বাসে দীক্ষিত মুসলমানেরা এক নিগূঢ় আত্মিক যোগে বদ্ধ; একজনের শুভাশুভ অন্যজনের শুভাশুভের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত,[৭৭] দরিদ্রতম ফরাজীর স্বার্থ এবং সমগ্র ফরাজীগোষ্ঠীর স্বার্থ অভিন্ন; কোন ফরাজীর স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে, এমন কোন কাজ অন্য ফরাজীরা করবে না; আদালতে অভিযুক্ত ফরাজীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না; তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যাতে না টিকতে পারে, সেজন্য দরকার হলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে; দলের স্বার্থরক্ষার জন্য সবাই সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দেবে[৭৮]; দলের প্রয়োজনে কোন কাজই গর্হিত নয়, এমনকি গুপ্তহত্যা পর্যন্ত। মারার পর শত্রুর মৃতদেহ তারা এমনভাবে লুকিয়ে ফেলতো যে পুলিসের পক্ষে তার উদ্ধার সম্ভব ছিল না। এদের সম্পর্কে পরে পরে ফরাজী সমাজে একটা কথা চালু হয়েছিল—তাদের 'আল্লার চিল' নিয়ে গেছে।

তাই, ফরাজীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নাশের জন জমিদারের যে মরিয়া হয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

(৬.৬)

নীলকর সাহেব-বিরোধী কোন ফরাজী আন্দোলন ও নীলচাষ প্রথার বিরুদ্ধে আগের বা পরের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। যেখানে নীল-প্রতিরোধ আন্দোলন

ব্যাপকভাবে হয়নি (১৮৫৯/৬০ সালে হয়েছিল), সেখানেও এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন—চাষীরা একজোট হয়ে নীলকরের দাদন নেয়নি; নিলেও অত্যন্ত অযত্নে, অবহেলায় নীল চাষ করেছে; কোন কোন ক্ষেত্রে বোনা নীলকে গোপনে উপড়ে ফেলে দিয়েছে; নীলকরের লোকেরা জোর করে নীল বুনতে গেলে চাষীরা তাদের বাধা দিয়েছে; নীলকুঠির দিশী আমলাদের নানাভাবে হেনস্তা করেছে এবং উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে নীলকুঠিও পুড়িয়ে দিয়েছে। ১৮৪০-এর দশকে বিদ্রোহী ফরাজীদের কর্মসূচীতে এসব বড়ো একটা দেখা যায় না। কারণ, নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, কোন কোন নীলকর সাহেব, বা তাদের প্রভাবশালী আমলা, গোমস্তা, যারা ফরাজীদের নানাভাবে উত্যক্ত করেছে, তাদের জব্দ করা। কাঞ্জীলালের মত আমলাকে তারা নির্মমভাবে খুনও করেছে।

ফরাজীদের প্রধান নীলকর-শত্রু জাঁদরেল ডানলপ সাহেবের সঙ্গে তাদের দীর্ঘকাল স্থায়ী বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

দুদু মিঞার বিচারের সময় (১৮৪৭/৪৮) ডানলপের সাক্ষ্য (৩রা আগস্ট, ১৮৪৭) থেকেই এ কারণ অনুমান করা যায়। ডানলপ বলে—প্রায় ন'বছর আগে দুদু এবং ফরাজীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সে ফদিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নানা খবর যোগায়। 'সে সময় থেকেই তারা আমার উপর কড়া নজর রেখেছে'।[৭৯] তাছাড়া, দুদুর নানা 'উৎপীড়ন' বন্ধের চেষ্টাও সে মাঝে-মধ্যে করেছে। দুদুর সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্কের আর একটা বিশেষ কারণও সে উল্লেখ করে ঃ "আমি কোনদিন তাকে আমার সমান মনে করিনি; আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি কখনও তাকে চেয়ারে বসতে বলিনি; আমার মনে হয়, এসব কারণে সে আমার উপর তিক্ত-বিরক্ত হয়।[৮০]

নীল চাষ নিয়ে কি এমন কিছু ঘটেছিল, যার জন্য এ সংঘর্ষ? ডানলপের উত্তর ঃ "নীলের ফসল তোলার সময় গত বছর নানা সময় দুদু আমার লোককে বাধা দেয়।"[৮১] ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাই সে সাহায্য চায়। এ প্রসঙ্গে তার সর্বশেষ মন্তব্য ঃ "এর বেশি অন্য কিছু আমি মনে করতে পারছি না।"

তাহলে এ সংঘর্ষের কারণ কি? ডানলপ ও তার লোকদের সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়, এটা মূলতঃ দুই প্রবল গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। দুদুর ক্রমবর্ধমান প্রভাব জমিদার ও নীলকরদের সমানভাবে বিব্রত করে। সরকারের পক্ষে যে দুদুর

মামলা পরিচালনা করে এভাবেই ডানলপের তীব্র ফরাজী-বিদ্বেষ ব্যাখ্যা করে। দুদুর কড়া নির্দেশ ছিল, বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তির জন্য ফরাজীবা যাতে কোনরকম আইন-আদালতের আশ্রয় না নেয়; কারণ তার বিচারই চূড়ান্ত। এ বিষয়ে স্থানীয় জমিদারের কাছে কোন নালিশ সে বরদাস্ত করত না। তার হুকুম অমান্য করার জন্য শাস্তি ছিল কঠোর। বলে, দুদু এবং তার বাবা "এতদিন সার্বভৌম রাজার মত শিষ্যদের আর্জি ও আবেদনপত্র নিয়েছে; তাদের জরিমানা করেছে; তাদের নানা বিবাদের বিচার ও নিষ্পত্তি করেছে।[৮২] নিজের এলাকায় ডানলপ এ ধরনের প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতাপ সহ্য করেনি। নানা ধরনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দুদুকে তাই বিব্রত করতে চাইল। এক মিথ্যা অভিযোগে দুদুকে গ্রেপ্তারও করা হয়। বিচারের সময় এর তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ঃ "এতে [দুদু] মিঞা ও তার গোটা শিষ্য সম্প্রদায়কে হেয় করা হল; প্রকাশ্য এ অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ঠিক করল, এমন কিছু তারা করবে, যাতে ডানলপ আর 'বাবুবা' ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারবে।"[৮৩]

(৬.৭)

ফরাজী সংগঠনে ও মানসিকতায় আস্তে আস্তে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশরাজ-বিরোধিতা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। দুদুর মৃত্যুর (১৮৬২) আগেই এ দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়। সরকারের কাছে এক আর্জিতে[৮৪] দুদু নিজেই তার মনোভাবের কথা জানায়। সে বলে—জমিদার ও নীলকরের বিরুদ্ধেই ফরাজীদের সংগ্রাম; স্থানীয় প্রশাসনের ফরাজী-বিরোধী পক্ষপাতদুষ্ট নানা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের কোন বিদ্বেষ নেই। দুদু এমনও বলে, স্থানীয় প্রশাসনে তাকেও কিছু দায়িত্ব দেওয়া হোক। তার উত্তরপুরুষদের যে ইতিহাস মুইনুদ্দীন খাঁ লিখেছেন, তা থেকে ব্রিটিশরাজের প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান আনুগত্যের প্রমাণ মেলে।

দ্বিতীয়তঃ, ফরাজীদের ভাবাদর্শে ও কর্মসূচীতে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠে। আমরা আগেই বলেছি, গোড়াকার ফরাজী আন্দোলনে হিন্দু জমিদার-বিরোধিতা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনা গোষ্ঠীচেতনাকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে। যেমন মুসলমান সমাজে ইসলাম-পরিপন্থী জীবনচর্যার প্রসারের কারণ হিসেবে তারা প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের প্রভাবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তারের ফলেও তাদের সম্প্রদায়গত আনুগত্য বোধ বাড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এ বোধ আরো প্রকট

হয়।

(৭)

ওহাবী-ফরাজী আন্দোলনের মত ময়মনসিংহ জেলার শেরপুব অঞ্চলের পাগলপন্থী আন্দোলনও বহুলাংশে এক ধর্মীয়গোষ্ঠী-নির্দেশিত। এ গোষ্ঠীর উদ্ভবও হয়েছিল আন্দোলনের মাত্র কয়েক দশক আগে। এখানেও আন্দোলনের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ধর্ম ও সমাজসংস্কার। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তা কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

পাগলপন্থীদের ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য আমরা কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব। (ক) ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে 'পাগল-পন্থা'র প্রভাব কিভাবে বিভিন্ন উপজাতি, ধর্ম ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত[৮৫] কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে? (খ) এ আন্দোলন কেমন করে কৃষকদের জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ে? (গ) কিভাবে প্রধানতঃ জমিদার-বিরোধী এ আন্দোলন এক বিশেষ সময়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়? (ঘ) আন্দোলিত পরিচালনায় পাগলপন্থী গোষ্ঠীর ভূমিকা কি ছিল?

(৭.১)

ঐ বিশেষ সময়কার পাগলপন্থীদের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, আচার, রীতি-নীতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে একমাত্র সমসাময়িক বিবরণ বিদ্রোহের উপর মরিসন-লিখিত সরকারী প্রতিবেদন।[৮৬] স্পষ্টতঃ বিদ্রোহীদের সম্পর্কে মরিসনের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য শুধু বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিই যথেষ্ট নয়; সে সংস্কৃতিভুক্ত মানুষগুলির সম্পর্কে এক গভীর সহমর্মিতাবোধ না থাকলে তাদের বিশ্বাসের অন্তরঙ্গ জগতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। রাজ প্রতিনিধি মরিসনের কোনটাই ছিল না।

তবুও এ বিবরণ থেকে কিছু কিছু তথ্য ও ইঙ্গিত মেলে। 'পাগল-পন্থা'র প্রবর্তক এক মুসলমান ফকির—করিম। এর প্রবর্তন বিদ্রোহের মাত্র পাঁচ দশক আগে, প্রধানতঃ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াস হিসেবে। শেরপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করে তিনি এ সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। তাঁর নূতন ধর্ম এক ধরনের দ্বৈতবাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে স্থানীয় অধিবাসীদের উপযোগী করে তিনি তাঁর ধর্মাদর্শ প্রচার

করেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীদের জীবন-চর্যা প্রচলিত রীতি-নীতি থেকে এতই ভিন্ন ছিল যে, অন্যরা তাদের 'পাগল' বলে ডাকত। স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে তাদের সংহতিবোধের উৎস-প্রীতি ও সৌভ্রাত্রবোধ; পরস্পরকে তারা 'ভাই' বলে ডাকত; আর গুরুর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা। করিমের ব্যাপক প্রভাবের দুটি প্রধান কারণ ঃ তাঁর পূতচরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা; এবং অলৌকিক ক্ষমতা, 'যাদু-বিদ্যা' কুশলতা। সুষঙ্গ জমিদার নিজেই তার জমিদারীর অন্তর্গত লাটেরকান্দী গ্রামে তার বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শিষ্যদের দানেই করিম পবিবারের ভরণপোষণ চলত।

পুত্র টিপুকেই করিম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেন। প্রধানতঃ তার উদ্যোগেই শিষ্য সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সরকারি প্রতিবেদন মতে, করিমের মৃত্যুর (আনুমানিক ১৮১৩) পর পাগল-পন্থা ও সংগঠনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সংগঠন পরিচালনাব ভার পড়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের উপর। শিষ্যরা বিশ্বাস করত, গুরুপত্নীও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না। কিন্তু মরিসনের ধারণায়, টিপুর না ছিল পিতার আদর্শনিষ্ঠা, না ছিল কোন বিদ্যাবুদ্ধি;[৮৭] স্থানীয় জনসাধারণের নৈতিক জীবন-শুদ্ধির কোন প্রয়াস তার ছিল না শুধু তাই নয়, তার জীবনে তাদের 'কুসংস্কারের' প্রভাব বাড়তে থাকে; তাদের অন্ধবিশ্বাসের তাগিদেই যাদু-বিদ্যার নানা কারুকলা দেখানোর দিকে তার প্রবণতা বাড়ে। এভাবেই শিষ্যদের উপর তার বিপুল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

করিমের প্রতি মরিসন শ্রদ্ধাবান; কিন্তু টিপুর চরিত্রে প্রশংসা করার মত তিনি কিছুই দেখেননি। রাজ-বিরোধী বিদ্রোহের নেতা টিপুর চরিত্র চিত্রণে রাজ প্রতিনিধির দৃষ্টিতে আবিলতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর বিবরণের কয়েকটি দিক কিন্তু লক্ষণীয় ঃ যেমন, শেরপুর অঞ্চলে নানা ধর্ম ও উপজাতিগোষ্ঠীর সহাবস্থান; পাগল-পন্থার সাম্প্রতিকতা; 'পাগল-পন্থা'র প্রবর্তক করিম শা'র ফকির হিসেবে পরিচিতি; কবিম অনুগামীদের 'পাগল' আখ্যা; করিমের বিপুল প্রভাব; এর একটা কারণ হিসেবে করিমের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে শিষ্যদের বিশ্বাসের উল্লেখ, এবং টিপুর আমলে পাগল-সংগঠনে দ্রুত পরিবর্তন।

মুসলমান ফকির হিসেবে করিমের পরিচিতি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপ কি? স্টিফেন ফুকস্ পাগল-পন্থাকে 'ইসলাম পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। ওহাবী-ফরাজী আন্দোলনের সঙ্গে এ বৃহত্তর

পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের যে প্রত্যক্ষ যোগ, পাগল-পন্থার ক্ষেত্রে তা মোটেই ছিল কিনা বলা শক্ত।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ওহাবী-ফরাজী গুরুর প্রচার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আচার থেকে মুসলমানদের ইসলামেব আদি অনাবিল ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়ে আনা। পাগল-পন্থার প্রচার ও আকর্ষণ মোটেই এ বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক করিমের শিষ্য হয়েছে। বস্তুতঃ পাগল-পন্থায় দীক্ষার জন্য কোন বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ছেড়ে আসার প্রয়োজন সম্ভবতঃ ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, ইসলামের নির্দেশ করিম সচেতনভাবে লঙ্ঘন না করলেও তাঁর সাধন-পদ্ধতির বিশিষ্ট একটা ধারা ছিল। ইসলামীয় দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেও সে ধারা এত ভিন্ন যে এর অনুগামীদের মুসলমান সমাজে স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা যায়। বস্তুতঃ এ পদ্ধতির এমন কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য ছিল, বহু ক্ষেত্রে এরা ইসলাম-বিরোধী বলে নিন্দিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, ইসলামের আদি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ওহাবী-ফরাজী নেতাদের তীব্রতম সমালোচনায় একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল এরা।[৮]

সাধনার এ বিশিষ্ট ধারার নাম সুফীবাদ। মরমীয়া সাধন পদ্ধতির এটা একটা রূপ। বিধিবদ্ধ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ভূমিকা এখানে একান্তই গৌণ। অন্তর্মুখী সাধনার মধ্য দিয়ে সাধক ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে; এর ফল সাধকের চেতনার সমুন্নতি; তার অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রকাশ। এ সাধন-পদ্ধতির নানা রূপ—ভক্তি, তন্ময় ধ্যান ইত্যাদি। এ রূপ যাই হোক, সাধনার মূল লক্ষ্য অহংবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সত্তার বিলোপের মধ্য দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি।

এ উপলব্ধি একান্ত ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ, বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা তাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ সাধন-পদ্ধতি গুরুর নির্দেশ ছাড়া সম্ভব নয়। যিনি নিজে ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, নির্দেশ দেবার অধিকার শুধু তারই। তার নির্দেশেই সাধক ও সাধনার জটিল ও দুর্গম পথ পেরিয়ে এ বোধের অধিকারী হতে পারে। গুরুর উপর অবিচল আস্থা এ সাধন-পদ্ধতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৯] ওহাবী-ফরাজীরা এ গুরুবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিল। ব্যক্তিসত্তার বিনাশের মধ্য দিয়ে

ঈশ্বরোপলব্ধি এ সাধনার এক অনিবার্য ফল, জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি বিষয়ে ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য; এমনকি সংসার ত্যাগ। কবিমের 'ফকির' আখ্যার মধ্যে এ বৈরাগ্য ও ত্যাগের ব্যঞ্জনা আছে। ইসলাম ধর্মে কিন্তু সংসার ত্যাগের বিধান নেই।[১০]

তাই মরমীয়া সুফীবাদ ইসলাম ধর্মতত্ত্বের অঙ্গ নয়। বস্তুতঃ, অন্যান্য অনেক ধর্মের মধ্যেও এ মরমীয়া সাধন পদ্ধতি বিকাশলাভ করেছে। সম্ভবতঃ, সুফী সাধনার যে ধারার সঙ্গে করিম শাহ্ যুক্ত তার উপব একটা প্রভাব বাউল-সাধনা। উল্লেখযোগ্য এই যে, বাউলরা 'পাগল' নামে পরিচিত ছিল। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভগবৎ-উপলব্ধির গভীর আনন্দে তারা চেতনার এমন এক স্তরে বিহার করতেন, যে দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত রীতিকে তারা একরকম উপেক্ষাই করতেন। করিম অনুগামীদের 'পাগল' আখ্যার সঙ্গে বাউলদের এ প্রচলিত আখ্যার যোগ থাকলেও থাকতে পারে। বাউল-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ দেহতত্ত্বও কি ঐ অঞ্চলের সুফীদের প্রভাবিত করেছিল? এ সিদ্ধান্ত গবেষণা-সাপেক্ষ। পাগলপন্থীদের উপর সাম্প্রতিক এক মনোজ্ঞ আলোচনা[১১] থেকে আমরা জানতে পারি, ওখানকার সূফী সাধনায় হিন্দু হঠযোগ পদ্ধতির প্রভাব ছিল। অবশ্য বাউল-দেহতত্ত্ব হঠযোগীদেব দেহকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন।

বলাই বাহুল্য, করিম শাহের বিপুল প্রভাবের কারণ সুফী সাধন-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন নয়। সুফী বা বাউল সাধনার কঠিন পথ যে অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় ছিলনা, তা ধরেই নেওয়া যায়। টিপুর আমলে পাগল-পন্থার জনপ্রিয়তার একটা কারণ, পাগল-সম্প্রদায় জমিদারবিরোধী আন্দোলনে আস্তে আস্তে যুক্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু গোড়ার দিকে এ যোগ প্রত্যক্ষ ছিল বলে মনে হয় না।

তাহলে শেরপুরের গ্রামীণ সমাজে করিম কিভাবে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন? পূতচরিত্র ধর্মনিষ্ঠ সিদ্ধ ফকির হিসেবে করিমের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধার কথা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের সময় মরিসন জানতে পেরেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পাগলপন্থার দ্রুত বিস্তারে করিমের প্রচারিত আদর্শের ভূমিকা সন্দেহাতীত। মরিসন খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, সাধারণ মানুষের উপযোগী করে করিম নিজের ধর্মাদর্শ প্রচার করেন। কিন্তু সে আদর্শ সম্পর্কে তার প্রতিবেদনে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। শুধু প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহের প্রায় একশ বছর পরে লিখিত এক বইয়ের[১২] ভিত্তিতে করিমের নৈতিক আদর্শ এবং সামাজিক দর্শন নিয়ে সম্প্রতি এক আলোচনা[১৩]

হয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হবার আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে করিমের প্রচারের যথাযথ বিবরণের জন্য এ বই নির্ভরযোগ্য কিনা, তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে।[৯৮] তবুও লেখক পাগল-পন্থী বলে, এবং নানা ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে পাগল-পন্থার আদি রূপ জানা তার পক্ষে সম্ভব ছিল বলে, তার বিবরণ আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি।

নৈতিক বিধানগুলি[৯৯] সহজ, সরল। ইন্দ্রিয় সংযম, সত্যবাদিতা ক্রোধজয়, পরনিন্দা পরিহার— লেখকের মতে পাগলগুরু এসব চারিত্রিক গুণের উপর বিশেষ জোর দিতেন। কতগুলি বিধান সম্ভবতঃ স্বল্প-সংখ্যক অনুগামীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যেমন কঠোর শৃংখলার সংগে রোজা পালন করা। "পাগলরা দিন ও রাত ধরেই উপবাস করত সন্ধ্যার পরে রোজার মত উপবাস ভাঙতো না।" সবার পক্ষে এ নিয়ম মানা অসম্ভব ছিল। করিমের সামাজিক দর্শনও ছিল সহজবোধ্য, যেমন ঋণের জন্য সুদ দাবী না করা, পণ না নেওয়া, ভগবান ছাড়া কারো অধীনতা স্বীকার না করা ভগবানের রাজ্যে কাকেও 'সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা' ইত্যাদি। প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ আগেই উল্লেখ করেছি।

এ সামাজিক দর্শন মৌলিকত্ব হয়তো বিশেষ ছিল না; কিন্তু জমিদারী অপশাসন-ক্লিষ্ট কৃষককুলের কাছে এ প্রচারের মূল্য ছিল অপরিসীম। বিশেষ- করে এ প্রচার একেবারে সাম্প্রতিক। বিশেষ এক পরিবেশে, বিশেষ এক ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ার অতি পরিচিত কথাও প্রাণময়, গভীর অর্থবহ্ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে করিমের ব্যাপক প্রভাবের একটা প্রধান কারণ, তার আদর্শ ও বাণী কোন প্রতিষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আগেই বলেছি, ইসলাম ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এর কোন অসঙ্গতি ছিল না; কিন্তু এমন নয় যে, অন্য কোন ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে এর অসঙ্গতি ছিল। ওহাব-ফরাজী গুরুরা চেয়েছিলেন, তাদের অনুগামীরা সত্যিকারের ইসলামপন্থী হবে। করিমের প্রচারে এ ধরনের সম্প্রদায়গত কোন ঝোঁক ছিল না। অন্ততঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওহাবী-ফরাজীরা জোর করে নিজেদের মত চাপাতে চেষ্টা করেছে। ভিন্ন ধর্মমত ও আচার সম্পর্কে করিমের ঔদার্য অনেক বেশী। সেজন্য বিভিন্ন ধর্ম-গোষ্ঠীর কৃষকের কাছে করিমের আদর্শের একটা সহজ আকর্ষণ ছিল। তাছাড়া, যাদের মধ্যে করিম নূতন আদর্শ প্রচার করেন, তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও নীতি এমন কোন অনড় কাঠামোতে ক্লিষ্ট হয়নি, যা অতিক্রম করে এ আদর্শে সাড়া দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। এ অঞ্চলে নূতন আবাদযোগ্য জমি লাভের আশায় নানা উপজাতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত কৃষকেরা ক্রমান্বয়ে

বসতি স্থাপন করে। নানা উপজাতির মিশ্রণের ফলে তাদের আদি সমাজ-সংগঠন, ধর্ম বিশ্বাসও অনেকখানি পাল্টে যায়। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে যে ধরনের যৌথ সমাজব্যবস্থা দেখা যায়, এখানে তা অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে।

করিম-পুত্র টিপু সম্পর্কে মরিসনের একটা মন্তব্য পাগলপন্থার জনপ্রিয়তা বুঝতে সাহায্য করে। টিপু-বিরোধী ঝাঁজ এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, আদি পাগলপন্থা কিভাবে স্থানীয় লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। মরিসনের মতে[১৬] "বিদ্যাবুদ্ধি, পড়াশুনো বলতে টিপু পাগলের কিছুই ছিল না। তাই বিকৃতরুচির পাহাড়িয়া এবং হাজং, ডালু, বোনাও, হত্রি, বংশী ও ডাই জাতিভুক্ত সর্ব নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের যাবতীয় বদ্ গুণ আস্তে আস্তে তার চরিত্রে ঢোকে। তার বাবার সব সৎশিক্ষা সে অচিরে ভুলে যায় ... সাধারণ এ মানুষগুলোর কুসংস্কারময়তার জন্য যাদু বিদ্যার নানা কসরৎ দেখিয়ে সে নিজেকে এক নামী ফকির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।"

পাগলা পন্থায় বিশিষ্ট ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ অবশ্যই ছিল; কিন্তু উপজাতি ও অন্যান্য কৃষক গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বহু যৌথ বিশ্বাস ধীরে ধীরে তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, পরিবর্তন-প্রয়াসী কৃষকসমাজ বহুক্ষেত্রেই নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাবকে নিজেদের অভ্যস্ত জীবন-চর্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। পাগলপন্থীদের ক্ষেত্রে এর একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবন-যাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে করিম তার শিষ্যদের কোন কঠোর, অনমনীয় অনুশাসনে আবদ্ধ করতে চাননি।

অব্যাহত প্রাচীন বিশ্বাসগুলির অন্যতম প্রধান ছিল যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস। টিপুর 'যাদু বিদ্যার কসরৎ' দেখানো সম্পর্কে মরিসনের মূল সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। তার ধারণা, সাধারণ মানুষের 'কুসংস্কার' ভাঙ্গিয়ে টিপু ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রভাব কায়েম করতে চেয়েছিলেন। যাদু বিদ্যার সামাজিক তাৎপর্য এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

যাদু বিদ্যায় বিশ্বাসের দুটি প্রধান দিক্ : যাদু শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি থেকে ভিন্ন; বস্তুতঃ প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্ব অর্জনের একটা প্রধান উপায় যাদু শক্তি; দ্বিতীয়তঃ, যাদু শক্তির যথাযথ প্রয়োগ বিশেষ কোন ব্যক্তির অনন্য সাধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে; এ প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে সমগ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে। এ প্রয়োগের সামাজিক কল্যাণের জন্যই যাদু বিদ্যায় বিশ্বাসের সঙ্গে পাগলপন্থার অনুসরণে কোন অসঙ্গতি ছিল না। প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণে মানুষের সীমিত ক্ষমতার জন্যই সচরাচর যাদু-

বিশ্বাসের জন্ম। কিন্তু এ ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটলেই যে এ বিশ্বাস দূর হয়ে যাবে, তা মোটেই নয়।

শ্রীভদ্র দেখিয়েছেন,[৭৭] এ ধরনের মিশ্রণ এ অঞ্চলের পীর-ঐতিহ্যের একটা লক্ষণীয় দিক্। তত্ত্বগতভাবে সূফীবাদের সঙ্গে এ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু যাদু বিদ্যা প্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতা পীরের উপর আরোপিত হয়। এর একটা কারণ, সূফী-সাধনায় গুরুর বিশিষ্ট ভূমিকা যার উল্লেখ বিভূতি ভগবৎ সাধনার পথ-নির্দেশক গুরুর উপর আরোপিত হতে থাকে।

কিন্তু ঐতিহ্যের প্রভাব এমনই প্রবল ছিল যে একেবারে গোড়া থেকেই গুরু করিম, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্র টিপুকে শিষ্যরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। কথিত আছে, করিমের বিপুল জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ, দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে তার ক্ষমতা সম্পর্কে শিষ্যদের বিশ্বাস। পাগলপন্থী ঐতিহ্যানুযায়ী করিম নিজেই এ ক্ষমতার অধিকার দাবী করতেন। নিজে তিনি দাবী করুন বা নাই করুন, তার এ ক্ষমতায় শিষ্যদের অবিচল আস্থাই যথেষ্ট ছিল।

পীর সাধানার স্থানীয় ঐতিহ্য যে এ বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঐতিহ্য না থাকলেও এ ধরনের বিশ্বাসের জন্ম হত না, এ ধারণা অমূলক। বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী উপজাতিদের অন্য তিনটি আন্দোলনে এ বিশ্বাস বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

উৎস যাই হোক, অলৌকিক যাদু ক্ষমতা প্রয়োগের নানা রূপ; কিন্তু তারাও নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন রূপে এ প্রয়োগ দেখা যেতে পারে। সাধারণভাবে, দৈনন্দিন জীবনের নানা বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে এ প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকে—যেমন কঠিন কোন রোগ নিরাময়, বা আকস্মিক কোন দুর্বিপাকের অবসান। কিন্তু পাগলপন্থী আন্দোলনে ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটা বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দুর্দশা দূর করার উপায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। নেতার অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী সুসংবদ্ধ এক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পাগলপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্যে এ মৌলিক রূপান্তরের কারণ শুধু জমিদারী স্বৈরাচারের আকস্মিক তীব্রতা বৃদ্ধি নয়। এ বিশ্বাস ছাড়া এ রূপান্তর সম্ভবতঃ ঘটত না।

(৭.২)

এটা অনস্বীকার্য যে জমিদার বিরোধী সংঘর্ষে পাগল নেতাদের ভূমিকা না থাকলে পাগলপন্থার প্রভাব এত বিস্তীর্ণ হতে পারত না।

এ সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় প্রাসংগিক নয়। তবে এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্যেব উল্লেখ প্রয়োজন।

(ক) জমিদারদের প্রজা-পীড়ন তখনকার বাংলাদেশে অতি সাধারণ ঘটনা। তবে শেবপুব জমিদারদের নানা বে-আইনী কাজকে এ ধরনের প্রজা-পীড়নের সমগোত্রীয় মনে করা সমীচীন হবে না। এ অঞ্চলের জমিদার প্রজার তিক্ত সম্পর্কের এমন কতগুলো কারণ ছিল, যা বাংলাব সব অঞ্চল সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

(খ) এ অঞ্চলের উপর মোঘল শাসন-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল অপ্রত্যক্ষ এবং একেবারেই সীমিত। প্রাক্-মোঘল যুগের সামন্তরা জমিদার হিসেবে মোঘলরাজ প্রতিনিধি কদাচিৎ জমিদারী পরিচালনা হস্তক্ষেপ করত। প্রজাদের খাজনার হার ও পরিমাণ নির্ধারণে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকাই ছিল না।

(গ) গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বাজশক্তিও জমিদারের এ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের বিশেষ চেষ্টা করেনি যদিও নানা কারণে মাঝে মধ্যে কোম্পানী এ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। একটা বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল। গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের উপর তুলো এবং অন্যান্য সামগ্রীর সওদায় জমিদারেরা যে জুলুম চালাত, সরকার তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তাতে এ জুলুম অনেকটা কমে; কিন্তু সমতলের কৃ,কদের উপর জমিদারের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত থেকে যায়।

(ঘ) প্রধানতঃ শরিকী বিবাদের ফলেই, ১৭৭০-এর দশক থেকে জমিদার প্রজা সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষবাসের দ্রুত প্রসারের ফলে এবং অন্যান্য কারণে এ বিবাদ আরো বাড়ে। বিভিন্ন জমিদার গোষ্ঠীর অন্তর্বিবাদ কোন কোন অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে মঙ্গলজনকও হতে পারে, কারণ জমিদারী প্রশাসন এতে দুর্বল হয়; খাজনা (ও আবওয়াব) আদায়ের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত আমলাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়। কৃষকেরা এর সুযোগ নিতে পারে প্রধানতঃ বিচ্ছিন্নভাবে জমিদারী অনুশাসনকে উপেক্ষা করে।

শেরপুরের শরিকী বিবাদ ভিন্ন ধরনের। তা শুধুমাত্র আইন-আদালত মারফত বিতর্কিত অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় নয়; প্রায়শঃ তা ছিল সহিংস, রক্তক্ষয়ী,—

বিবদমান গোষ্ঠীর লাঠিয়ালদের মধ্যে সংঘর্ষ। সদর দেওয়ানী আদালত বিবাদ মীমাংসার উপায় হিসেবে বাটোয়ারার বিধান দেয়; কিন্তু বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এ নির্দেশ উপেক্ষা করে। তাই আবার সংঘর্ষ ঘটে। এ সংঘর্ষ মাঝে মাঝে এমন পর্যায়ে পৌঁছাত, যে প্রশাসনকে সৈন্যবাহিনী তলব করতে হত— যেমন ১৮০৩ ও ১৮০৮ সালে। ১৮০৮ সালে আটাত্তর গ্রাম এভাবে সর্বস্বান্ত হয়।

(ঙ) তাছাড়া এ ধরনের সংঘর্ষের ফলে জমিদারদের অতিরিক্ত অর্থের যোগাড় করতে হত। তাই অনিয়মিত আবওয়াব আদায় করা ছাড়া তাদের অন্য উপায় ছিল না।

(চ) শরিকী সংঘর্ষ যখন চরমে উঠত, সরকার সাময়িকভাবে নিজের মনোনীত ব্যক্তির উপর জমিদারী পরিচালনার ভার দিত। ধারণা ছিল, এতে শরিকী কোন্দোল কমবে। কিন্তু ফল অনেক সময় বিপরীত হত। এর প্রধান কারণ সরকারী প্রতিনিধির অসততা। অবৈধ আবওয়াব আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপে হিতে বিপরীত হল। সরকার ভাবল, হুকুম জারী করে দীর্ঘদিনের এ জমিদারী রেওয়াজ বন্ধ করা যাবে। ১৮১৬ এবং ১৮১৮ সালে সরকার নির্দেশ দিল, আলাদাভাবে আবওয়াব আদায় করা চলবে না, একটা নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করতে হবে। এ আদেশ জমিদার মানেনি। ১৮২১ সালে কানুনগো পদ পুনপ্রবর্তনের জন্য সরকারী চেষ্টায় জমিদারেরা প্রমাদ গুনল। তাদের আশঙ্কা ছিল, এবার বেআইনী আবওয়াবের কথা সব ফাঁস হয়ে যাবে; এমনকি সরকারী আইন করে এগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করেও দিতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্য তারা আগে থেকেই খাজনার হার ও পরিমাণ বাড়িয়ে দিল।

(ছ) এ ধরনের জমিদারী স্বৈরাচার হামেশাই ঘটছিল এর একটা প্রধান কারণ, সরকারী প্রশাসনের শিথিলতা; বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা।

(৭.৩)

জমিদার বিরোধী বিক্ষোভ তাই ক্রমেই বাড়তে থাকে। সরকারী নথিপত্র থেকে প্রতিবাদী কৃষকদের সঙ্গে পাগল নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান সংযোগ অনুমান করা যায়।

করিমের মৃত্যুর (১৮১৩) পর থেকে পাগলপন্থী সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে। অন্ততঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে টিপুর আমলেই পাগলপন্থীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। মরিসন জানতে পারেন, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শেরপুরে এবং

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে টিপু নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম করে। পাগল দলের কোন কোন কাজকে মরিসন স্রেফ ডাকাতি বলেছেন।[৯৮] এ কাজের বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে জমিদার কৃষক সম্পর্কে তিক্ততা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যে 'ডাকাতি' হয়তো জমিদার-বিরোধী সংঘর্ষের কোন ঘটনা ছিল। সরকারী আইনে সংঘবদ্ধ কৃষক প্রতিরোধকে বর্ণনা করা অন্য কোন ভাষা নেই। অন্য একটা দৃষ্টান্ত থেকেও এটা স্পষ্ট হবে। মরিসনের প্রতিবেদন অনুযায়ী,[৯৯] টিপুর রাজদ্রোহমূলক এক ঘোষণার উপলক্ষ নাকি এক সাধারণ সিঁধেল চুরির ঘটনা (১৮২৪)। টিপু তখন তার সহগামীদের বলে— কোম্পানী রাজ শেষ হতে চলেছে; সেই হবে শেরপুর পরগণার সর্বেসর্বা ইত্যাদি। সিঁদেল চুরিতে সহগামীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য কোম্পানীরাজ অবসানের আসন্নতা সম্পর্কে বৈপ্লবিক ঘোষণার কোন প্রয়োজন ছিল কি?

পাগলপন্থী কৃষক বিক্ষোভের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত।

১৮২৩/২৪ সাল পর্যন্ত পাগল আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সীমিত—জমিদারের বেআইনী কাজে বাধা দেওয়া; অবৈধ আবওয়াব আদায়ের চেষ্টা প্রতিরোধ করা। কোথাও তারা একথা বলেনি যে জমিদারী কর্তৃত্বের অবসান হোক। সহিংস প্রতিরোধ কোন কোন ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল; কিন্তু আন্দোলনের প্রধান রূপ ছিল, সম্মিলিতভাবে আদালতে জমিদারের দাবীকে বেআইনী প্রমাণ করা। আদালতে গিয়েও কোন সুরাহা হচ্ছিল না বলে তারা ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল। আইন-মাফিক প্রতিরোধের ভঙ্গীও মোটেই গতানুগতিক ছিল না। সাধারণতঃ বাদী ও বিবাদী পক্ষ নিজেদের বক্তব্যের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য উকিল ইত্যাদি মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে পাগলপন্থীরা শুধু এতেই নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। দল বেঁধে তারা আদালতের কাছে জমায়েত হত।

(৭.৪)

১৮২৪ সালের শেষের দিকে এ আন্দোলনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে।[১০০] আন্দোলনের লক্ষ্য তখন শুধুমাত্র জমিদারী স্বৈরাচারের প্রতিরোধ নয়; জমিদারতন্ত্র ও কোম্পানীরাজের অবসান স্বাধীন পাগলরাজের প্রতিষ্ঠা। তাদের বিশ্বাস ছিল, শুধুমাত্র এতেই তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে, তাদের আরো বিশ্বাস ছিল, এ লক্ষ্য দুঃসাধ্য কিছু নয়; কারণ তাদের নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতার জন্য তাদের প্রতিরোধ দুর্জয় হবে।

আন্দোলনের এ মৌলিক পরিবর্তনের পটভূমিকা হিসেবে দুটো প্রধান ঘটনাকে চিহ্নিত করা যায়। ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে (১৮২৪-২৬) নানাভাবে জমিদারদের প্রজা পীড়নের তীব্রতা হঠাৎ বেড়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনা—বিদ্রোহীদের মানসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ এক পরিবর্তন; তাদের এক দৃঢ় প্রত্যয় যে ব্রিটিশরাজ জমিদার বিরোধী কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নেবে না।

আসলে, বিদ্রোহীদের এ নূতন উপলব্ধিই আন্দোলনে এ মৌলিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ। স্বর্ণযুগ আবির্ভাবের নিশ্চিত সম্ভাবনায় বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সব কৃষক বিদ্রোহেই এ উপলব্ধির প্রধান ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটানো। স্বভাবতই যত দিন এ বিশ্বাস থাকে যে তদানীন্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থা শোষক গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে, কৃষকদের ন্যায্য দাবীকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবে, অর্থাৎ রাজশক্তি প্রকাশ্যে জমিদার বা অন্য প্রবল শ্রেণীর পক্ষ নেবে না—তত দিন বিকল্প রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের প্রশ্ন আসে না। এ বিশ্বাস ভেঙ্গে গেলেই এ ভিন্ন মানসিকতার জন্ম হয়। এমন নয়, কৃষকদের বিচার সবক্ষেত্রেই অভ্রান্ত। যে ধারণাব উপর এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, সে ধারণা ভুল হতে পারে; কিন্তু এখানে যা প্রাসঙ্গিক, তাহল কৃষকদের এ বিশেষ মানসিকতা বোঝা। ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। সচরাচর এ উপলব্ধি আসে আকস্মিক কোন অভিঘাতের জন্য। এ আকস্মিকতার জন্যই মানসিকতায় এত দ্রুত পরিবর্তন আসে। এমন নয় যে রাজশক্তির ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কৃষকদের আগে কখনও অবিশ্বাস বা সন্দেহ জন্মেনি। কিন্তু নানা কারণে সে সন্দেহ এক নিশ্চিত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়নি। তা ছাড়া, এ নূতন ধরনের আন্দোলন সুরু করার আগে কৃষকদের নানা দিক বিচার-বিবেচনা করতে হয়; কারণ এতে ঝুঁকি অনেক; পরাজয় শোষক শ্রেণীর ক্ষমতা আরও মজবুত করবে, এটাও তারা জানত। তাই সংকল্পকে কার্যকরী করার আগে কৃষকদের মনে আসে নানা সতর্ক বিচার, দ্বিধা, সংশয়। এ নূতন আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিতে বহুদিন সময় লেগেছিল। ঝোঁকের মাথায় বিদ্রোহীরা কিছু করেনি।

রাজশক্তি সম্পর্কে এ নূতন ধারণার কারণও ভিন্ন। ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের পূর্বেকার অবিশ্বাসের কারণ, জমিদারের নানা বেআইনী কাজ বন্ধ করার জন্য সরকারী তৎপরতার অভাব। তাছাড়া, অসহিষ্ণু কৃষকেরা নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ

নিলে, সরকার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে 'উত্তেজনা' না বাড়ে। কিন্তু নূতন আন্দোলনের আগে যে ঘটনাগুলি কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তার প্রায় সবগুলির সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগ। এ ঘটনাগুলির তাৎপর্য শুধু আগেকার মত অতিরিক্ত খাজনা বা আবওয়াবের দাবী নয়। সমগ্র আঞ্চলিক কৃষি অর্থনীতির উপর এতে এক গুরু বোঝা চাপে। শুধু তাই নয়, আগে সংঘবদ্ধ কৃষকেরা নানাভাবে অতিরিক্ত খাজনার দাবী বেশ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারত। এখন তার কোন উপায় থাকল না।

নূতন ঘটনাগুলি ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সামরিক প্রয়োজন বলেই এ সম্পর্কিত সরকারী সব নির্দেশ অতি দ্রুত কার্যকরী করতে হত। অথচ এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার নিজে করতে পারত না। জমিদারের উপর নির্ভরতা তাই অপরিহার্য ছিল। আর এ জরুরী অবস্থায় সরকারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রজা-পীড়ন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।[১০১]

দূর বার্মা সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজনে সৈন্য চলাচল এক দীর্ঘ নূতন রাস্তা; শেরপুরের পাশ দিয়েই এ রাস্তা গিয়েছিল। এ অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতি এমন ছিল না, যে অনেক শ্রম উদ্বৃত্ত থাকত। কৃষিতে নিয়োজিত প্রযুক্তিতে এমন কোন উন্নতি হয়নি, যার ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যেতে পারত এবং চাষবাসের কাজ অপেক্ষাকৃত কম শ্রম দিয়ে চালানো যেত। যার ফলে চাষবাসের জন্য আগের মত শ্রমের দরকার হত না। অন্যান্য অনেক অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার মত, এখানেও শ্রম উদ্বৃত্ত থাকতো, বছরের কোন কোন সময়, যখন চাষের কাজ বিশেষ কিছু থাকতো না। কিন্তু জমি চাষ সুরু হওয়ার সময় থেকে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত উদ্বৃত্ত শ্রম তো থাকতোই না, প্রয়োজনীয় শ্রমে টান পড়ত। এর জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা বিশেষ ব্যবস্থা করত, বা ফসল কাটার সময় অনেক জায়গায় বাইরে থেকে মজুর আনতে হত। মোটামুটিভাবে বছরের পাঁচ-ছয় মাস শ্রমের এ টান চলত। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যে শেরপুরে নূতন রাস্তা বানানোর বেশীর ভাগ কাজ করতে হয়েছিল ১৮২৪ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত—; এবং নভেম্বরেই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের সূচনা। শ্রমের প্রয়োজন তো শুধু রাস্তা বানানোর জন্য নয়। সামরিক নানা কাজের জন্যই তো শ্রমের দরকার—বিশেষ করে বিরাট সৈন্যবাহিনী যখন সীমান্তের দিকে এগুচ্ছিল।

বিপুল পরিমাণ এ শ্রমের যোগান দেওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ছিল না।

যেখানে চাষবাসের জন্য বড় ধরনের সেচ ব্যবস্থা চালু ছিল, সেখানে গ্রামীণ প্রথা অনুযায়ী জমিদার এ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম গ্রাম থেকে বিনামূল্যে চাইতে পারত। সাধারণতঃ সেচ ব্যবস্থায় কোন বড় ধরনের মেরামতি দরকার হলে গ্রামবাসীরা বেগার শ্রম বিনা প্রতিবাদেই দিত। অন্যত্র গ্রামের শ্রমের উপর জমিদারের কোন অধিকার ছিল না।

তাই সামরিক কারণে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ শ্রমের যোগান দেওয়ার জন্য জমিদারের পেয়াদা বা আমলাদের জোর জুলুম করতে হত। সরকারের চাহিদার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা ছাড়াও দুটো কারণে এ কাজ জমিদারের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল। জমিদার মজুরদের যথোচিত মূল্যও দিচ্ছিল না বা দিতে পারছিল না। তারা হয়ত ভেবেছিল, জমিদারের হুকুম মেনে চলা প্রজার অবশ্য করণীয় দায়িত্ব; ঠিক ঠিক মজুরী দিতে না পারলেও প্রজাদের প্রতিবাদ দস্তুর সম্মত হবে না। (বাংলায় এবং বিহারে শ্রমিকদের বাজার দর থেকে অনেক কম মজুরী দেওয়া সম্পর্কে অভিযোগ য়ুরোপীয় নীলকরেরা এভাবে খণ্ডন করতে চেষ্টা করত।) কোন কোন ক্ষেত্রে একসঙ্গে অত মজুরী যোগানো জমিদারের পক্ষে সহজও ছিল না। আইন-অনুযায়ী সরকার জমিদারের প্রয়োজনীয় এ অর্থ দিতে বাধ্য ছিল। শেরপুরের জমিদারের অভিযোগ সরকার থেকে তাদের প্রাপ্যের অতি সামান্য অংশই নির্দিষ্ট সময়ে তারা পেয়েছে। এ অভিযোগ পরের সরকারী অনুসন্ধানে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সরকারী নির্দেশ পালনে জমিদারের অসুবিধের আর একটা কারণ প্রকাশ্য রাস্তায় দিনমজুর হিসেবে খাটতে অনেক কৃষকদের তীব্র আপত্তি ছিল। তাদের অভিযোগ, এ ধরনের দিনমজুরীতে তাদের জাত যাবে।[১০১] এমনিতে দিনমজুরী খাটার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। জাত খোয়া যাবে—এ অভিযোগে তারা অন্যের জমিতে মজুরী নিয়ে কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল, এমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। অনুমান করা যায়, জমিদারের ঠিকাদারেরা কৃষকদের এমনভাবে খাটাত, যাতে এ ধরনের কাজে তাদের খুব আপত্তি ছিল।

এ সব কারণে প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান জমিদারেরা স্বাভাবিক উপায়ে দিতে পারত না। তাই জোর জুলুমের আশ্রয় নেওয়া তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

একইভাবে, গ্রাম থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন সামরিক উপকরণের জন্যও কৃষক বা অন্যান্যরা ঠিক ঠিক দাম পেত না। সরকারী বিবরণে এ অভিযোগের সত্যতাও স্বীকৃত হয়েছে।

শুধু যে শ্রম এবং সামরিক উপকরণের যথাযথ মূল্য থেকে কৃষকেরা বঞ্চিত হয়েছিল তাই নয়। এসব উপকরণ যোগানোর জন্য জমিদারকে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে, এ অজুহাতে তারা প্রজাদের উপর নূতন এক আবওয়াব বসাল— খরচা রসিদি পল্টন ঃ অর্থাৎ সৈন্যদের রসদ যোগানোর খরচ হিসেবে কৃষকদের এটা দিতে হবে।

কৃষকদের ক্ষতি এখানেই শেষ নয়। যেখানে সামরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাস্তা যথেষ্ট ছিল না, জলপথ ব্যবহার অপরিহার্য ছিল সরকার প্রয়োজনীয় নৌকা সরবরাহের জন্যও জমিদারদের ভার দিল। কৃষক এবং অন্যান্যদের অভিযোগ, এর জন্য দেওয়া মূল্য পর্যাপ্ত ছিল না। তাছাড়া যাদের জীবিকা নৌকার ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত ছিল— যেমন মৎস্যজীবী বা ক্ষুদে ব্যবসায়ী, তাদের ক্ষতিই ছিল বেশি। কৃষকেরাও বহু ক্ষেত্রে গঞ্জে বা শহরে নৌকায় সওদা বিকিকিনি করত। এমনও ঘটেছে শত্রু যাতে নৌকা ব্যবহারের সুযোগ না পায়, সরকার সে জন্য হুকুমনামা জারী করে বলেছে ঃ সব নৌকা যেন বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়।

ব্রহ্মযুদ্ধের থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি তাই আগের থেকে গুণগতভাবে পৃথক। অতিরিক্ত খাজনা বা আবওয়াব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত জমিদারী স্বৈরতন্ত্রের যা চেহারা, মূল পরিস্থিতিতে তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তাছাড়া জমিদার ও রাজশক্তির স্বার্থের অভিন্নতা কৃষকদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

বিকল্প রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাই সমগ্র কৃষক সমাজের কাছে এ গভীর সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে হল। তার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন বর্তমান রাজশক্তির বিভিন্ন হাতিয়ারকে ধ্বংস করা বা পঙ্গু করা। এর জন্য দরকার সঙ্ঘবদ্ধ হিংসা। কৃষকদের কাছে বর্তমান রাজশক্তির একমাত্র প্রতীক ছিল স্থানীয় পুলিশ, আদালত। সামরিক বাহিনীর স্থানীয় রূপ হয়ত কিছু ছিল না; কিন্তু কৃষকেরা মাঝে মাঝে এর পরাক্রমের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছে। আর ধ্বংস করতে হবে জমিদারী আমলার কর্তৃত্ব; বহু বিস্তীর্ণ এর এলাকা—এর কার্যকারিতাও অনেক বেশী প্রত্যক্ষ।

এ সহিংস প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ক্ষণিক আক্রোশের ফল নয়। হিংসার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে নানাভাবে শত্রুর ক্ষতিসাধন—সম্পত্তির ক্ষতি। জমিদারের ঘরদোর, খামারবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া, সুযোগ পেলে শত্রুর প্রাণ সংহারও। বিদ্রোহীকৃষকদের এও বিশ্বাস ছিল, শত্রু এতে দুর্বল হবে; হিংসা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত

দেখে কৃষকদের সঙ্গে ব্যবহারে শত্রু আগের মত ঔদ্ধত্য দেখাবে না অনেক বেশী সতর্ক হবে। নূতন পরিকল্পিত আন্দোলনে হিংসা প্রয়োগের লক্ষ্য অনেক বেশী ব্যাপক—শত্রুর দৃঢ়মূল কর্তৃত্বকে উপড়ে ফেলা। অনেক কঠিন এ সঙ্কল্পের রূপায়ণ। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতার প্রয়োজন।

সরকারী নথিপত্র থেকে অনুমান করা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে তাদের প্রস্তুতি চলছিল। শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট নয়। দরকার ছিল শত্রুর অনিবার্য পরাজয় সম্পর্কে এক নিশ্চিত প্রত্যয়ের। মনে হয়, বিক্ষুব্ধ কৃষকদের কেউ কেউ এ বিষয়ে করিমের পত্নী, (যাকে শিষ্যরা 'মা-সাহেবা' বলে ডাকত) আর পুত্র টিপুর সঙ্গে, পরামর্শ করেছিল (They consulted sooth sayers')। তাঁরাই আশ্বাস দেন, যে শত্রুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে তাদের হয় জয় সুনিশ্চিত। টিপুর আমল থেকেই পাগল সংগঠনের দ্রুত পরিবর্তনের কথা আগে উল্লেখ করেছি। তাই তার অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল; কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে বিদ্রোহী কৃষকেরা নেতা খুঁজে বেড়িয়েছে। এখানে তেমনটি হয়নি। টিপুকে ধর্মীয় গুরু হিসেবে তারা আগেই মেনে নিয়েছে; এটা সহজেই অনুমেয়, জমিদারের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বৈরিতায় তারা টিপুর নানা নির্দেশও পেয়েছে। টিপুর এবং তাঁর মার অতিপ্রাকৃত, দৈবীশক্তিতে বিশ্বাস তাদের অনেক দিন ধরেই ছিল। এ অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের রূপটাই শুধু এখন পাল্টাল। এখন তারা বিশ্বাস করল, সামরিক সাজসরঞ্জামের দিক থেকে আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য তাদের হীনমন্যতার কোন কারণ নেই; কারণ টিপুর ও তার মা'র দৈবীশক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অপরাজেয় হবে।

বিদ্রোহীরা তাই নেতা বানায়নি; নেতৃত্ব আগে থেকেই ছিল; তার ভূমিকার রূপান্তর হল মাত্র।

নেতাদের আশ্বাস বাণীর কথা অতি দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। শিষ্যরা এখন বিশ্বাস করল ঃ নেতারা যাই ইচ্ছা করবেন, তাই করতে পারেন, এমনকি তাদের মন্ত্রপূত কাঠের বন্দুক ও তলোয়ার সত্যিকারের বন্দুক ও তলোয়ারের মতই কার্যকরী; তবে সে কাঠ যোগাড় করতে হবে এক বিশেষ গাছ থেকে; ব্রিটিশদের কামান পাগলদের দৈহিক কোন ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ নেতার অলৌকিক শক্তি অদৃশ্য দুর্ভেদ্য বর্মের মত কাজ করবে; মা-সাহেবা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে শুধুমাত্র কাপড় ঝেড়েই লুকানো সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করতে পারেন।[১০৩] আগেই উল্লেখ করেছি, নূতন ধর্মমতের ব্যাপক প্রসারেও পাগলদের যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস

দুর্বল হয়নি। বিদ্রোহের মুহূর্তে এ বিশ্বাস তাদের মানসিকতায় রূপান্তর ঘটায়।

(৭.৫)

বিকল্প সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আসন্ন আবির্ভাব সম্পর্কে পাগলদের সব বিশ্বাস টিপুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এটা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশরাজের বিকল্প হিসেবেই শিষ্যরা টিপুর সার্বভৌমত্ব কল্পনা করেছিল। সরকারী নথিপত্র থেকে এ বিশ্বাসের কয়েকটা দিক সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।[১০৭] সর্বাত্মক প্রতিরোধ সুরু হবার কিছু আগে বা পরে পাগলদের মধ্যে এ বিশ্বাস বিশাল এলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল। পাগলরা বলত, টিপু এবং তার মার মুখ থেকেই সরাসরি সব ঘোষণা এসেছে।

প্রতিরোধের সুরুতে টিপুর এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে—খুব শীগগির এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটবে; ফলে তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে; ব্রিটিশরাজের অবসান আসন্ন; তার বদলে আসবে পাগলরাজের ('Paugal Patriarch') নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব; ফকির টিপু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে 'বাদশাহ' বলে ঘোষণা করবে; জমিদারদের স্বেচ্ছাচার চিরকালের মত লুপ্ত হবে; আবওয়াব, বেগার—ইত্যাদির অস্তিত্বই থাকবে না; প্রতি 'কুর' চাষের জমির খাজনা ধার্য হবে মাত্র চার আনা; নূতন জমির জন্য প্রথম তিন বছর কোন কিছুই দিতে হবে না।

এ সব ভবিষ্যতবাণীর কৃষকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাণী কৃষক সমাজে কী বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায়। খ্যাতির মোহে কেউ কেউ টিপুর বাণী ও ভঙ্গীকে অনুকরণ করে 'ভবিষ্যদ্বক্তা'রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করল। যেমন তুর্কশাহ্ নামে এক ফকির বলে বেড়াচ্ছিল— কোম্পানীরাজের অবসানের পর সেই হবে সর্বেসর্বা; টিপু নয়; কোম্পানীর লোকজন হবে তার আজ্ঞাবাহী 'ভৃত্যে'র মত। তুর্কশাহের কিছু অনুগামী যে জোটেনি তা নয়; কিন্তু টিপুর কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিহত; এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর তুর্কশাহের কোন প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। এ ঘটনা এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এর থেকে বিদ্রোহী কৃষকদের মানসিকতা বোঝা যায়। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য তাদের তীব্র ব্যাকুলতার জন্যই তারা এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশ্বাস করেছিল। কৃষকদের চিত্ত জয় করার জন্য তুর্কশাহ্কেও বলতে হয়েছিল—কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হতে চলেছে। আসলে বিদ্রোহী কৃষকদের চেতনার রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন প্রধানতঃ জমিদারী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। নূতন আন্দোলনে সে লক্ষণ অবশ্যই ছিল; কিন্তু

সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে পাগলদের স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্বপ্ন। জমিদার বিরোধী ঘোষণায় অনিবার্যভাবে অবৈধ খাজনা ও আবওয়াব আদায়ের কথা এসেছে; কিন্তু সেখানেও দেখি সম্পূর্ণ নূতন এক ঘোষণা ঃ তারা জমিদারের কর্তৃত্বই স্বীকার করে না—কারণ একমাত্র নিয়মসম্মত কর্তৃত্ব তাদের নেতা টিপুর। টিপুর সার্বভৌমত্বে অন্য সব কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন।

অন্য কর্তৃত্বকে অস্বীকার বা অমান্য করার জন্য প্রথম থেকেই সহিংস প্রতিরোধের কোন দরকার ছিল না। যদি অমান্য করার জন্য শাসক শ্রেণী বা জমিদার তাদের উপর পীড়নের নীতি গ্রহণ করে, তাহলেই শুধুমাত্র হিংসার পন্থা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ ভাবেই পাগল-পন্থী আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আন্দোলনের গোড়ার দিকে পাগলরা বার বার বলত, সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নির্মীয়মান রাস্তায় তারা জমিদারের হুকুমত মজুর হিসেবে কাজ করবে না। কারণ এ ধরনের কাজের নির্দেশতো টিপুর থেকে আসেনি; তারা টিপুকেই একমাত্র বৈধ কর্তৃত্ব বলে মানে। পুলিশ প্রথম প্রথম কোন জোর জুলুম করেনি। তবে হুকুমনামা জারী করে বলেছে পাগলরা যেন দলবেঁধে জমিদারের আজ্ঞা অমান্য না করে। এর উত্তরে পাগলরা বলল এ ধরনের মেহনতে তাদের জাত্ যাবে; সৈন্যদের ঘোড়ার জন্য ঘাসকাটাও তাদের ইজ্জতের পক্ষে হানিকর। সরকারী দলিলে এর ফল হিসেবে লেখা হল ঃ 'পুলিশের কোন কথাই ওরা শুনছে না; অমান্য করছে জমিদারের কর্তৃত্বকে; রাস্তা তৈরীর কাজ একদম বন্ধ'।[১০৫]

১৮২৫ সালের সুরু থেকে পাগলপন্থী প্রতিষ্ঠার সব ব্যবস্থাই তখন হয়ে গেছে। 'টিপু পাগলের রাজদরবার' স্থাপিত হল শংকরপুর নামক জায়গায় তাঁর নিজের বাসস্থানে। ঠিক কোন সময় এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, সরকারী বিবরণে তার উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় 'কোষাগার এবং রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ' হিসেবে 'টপু ভাই সাহেবর' নাম ঘোষণা করল 'গোটা পাগল সম্প্রদায়'। কয়েকজন পাগলকে পুলিশ জেল থেকে ছেড়ে দিলে তারা বলে বেড়ালো, টিপুর দৈবীশক্তির জোরেই তাদের গা থেকে শেকলখুলে পড়েছে, আপনা থেকেই। সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও হল। জোরজুলুম করে টিপুর সাগরেদরা অর্থ আদায় করছে—সরকারী মহলের এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। আসলে কৃষকেরা জমিদারকে খাজনা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে তাদের পাগল রাজাকেই দিচ্ছিল। গ্রামে গ্রামে ঘুরে নেতারা কৃষকদের নির্দেশ দিল, জমিদারদের খাজনা দেওয়া চলবে না।

জমিদারের পেয়াদাদের সতর্ক করে দেওয়া হল, খাজনা আদায়ের জন্য তারা যাতে গ্রামে না ঢোকে। পুলিশের লোক কি করবে ঠাহর করতে পারছিল না, কারণ 'হাঙ্গামাকারীদের ভয়ে কেউ গ্রামে ঢুকতে সাহস করছিল না'।[১০৬]

টিপু নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছে; প্রশাসনের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে তার অনুগামীদের নিযুক্ত করা হয়েছে; রাস্তা তৈরীর কাজ প্রায় বন্ধ; জমিদারকে খাজনা না দেওয়ার জন্য নেতারা কৃষকদের 'প্ররোচিত' করছে; তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেই যাচ্ছে—পুলিশ হোক বা জমিদারের আমলা-পেয়াদা হোক তাদের হুমকি, শাসানি দেওয়া হচ্ছে—সারা শেরপুর জুড়ে মার্চের গোড়াতেও এ অবস্থা। পাগলপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য পাঠানো হল ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ড্যাম্পিয়ারকে। তাঁর মন্তব্য ঃ শেরপুরের অবস্থাকে 'প্রায় বিদ্রোহ' বলা চলে।[১০৬ক]

হতে পারে সন্ত্রস্ত প্রশাসনের বিবরণে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। তবে বিদ্রোহের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এমনিতে সরকারী বিবরণেও 'শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গ', 'অরাজকতা' সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন ঘটনার বিশেষ উল্লেখ নেই। আছে ভাসাভাসা অভিযোগ। কিন্তু পাগলরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশরাজকে উপেক্ষা করছে তার বদলে নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—প্রশাসনের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

সমগ্র আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার তাই 'রাজদ্রোহ' বলে গণ্য করল। শুধুমাত্র পুলিশ দিয়ে এদের দমানো সম্ভব হল না। সৈন্য নামানো হল পুলিশকে সাহায্যের জন্য। নির্দেশ দেওয়া হল, প্রথম সারির নেতাদের কোন দয়া দেখানো হবে না; তাদের বাড়ীঘর চুরমার করে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে; যেসব ক্ষেত্রে কৃষকেরা 'হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর', পুলিশ বা সেনাবাহিনী সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।

এভাবে আন্দোলনকে দমন করা হল। সরকার কিন্তু জমিদারী পরিচালনার গলদ স্বীকার করে নিল। কিছু সময়ের জন্য জমিদারদের সরিয়ে দেওয়া হল। পরিচালনার ভার সরকারী লোককে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য খাজনার হার, পরিমাণ এবং আবওয়াব আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এতদিন কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল তা দূর করা।

কোন কোন অযৌক্তিক আবওয়াব বাতিল করা হল। কিন্তু খাজনার হার ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি পুরনো ব্যবস্থাই বহাল থাকল।[১০৭] কৃষকেরা বারবার

অভিযোগ করেছে খাজনার হার নির্ধারণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একেবারেই দায়সারাভাবে করা হচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জমিদারী আমলার সাক্ষ্যকেই ধ্রুবসত্য বলে মানা হয়েছে; প্রতিবাদ করেও কোন সুরাহা হয়নি; বরং তাদের কপালে জুটেছে 'বর্বরোচিত ব্যবহার'; তাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে জমিদারের কর্তৃত্ব তাদের মানতেই হবে; এবং প্রচলিত দস্তুর তারা ভাঙ্গতে পারবে না। ঢাকা বিভাগের কমিশনার গোড়ায় কৃষকদের কিছু কিছু অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শেষে তিনিও তার মত পাল্টালেন। এমনও বললেন, কৃষক বিক্ষোভের আসল কারণ দু'-তিন জন দাঙ্গাবাজ প্রকৃতির নেতার উস্কানি; আন্দোলন জীইয়ে রাখলে তাদেরই লাভ।

প্রতিরোধ তাই আবার অনিবার্য হয়ে উঠল। কিন্তু প্রথম আন্দোলনের প্রায় আট বছর পরে (১৮৩৩) এটা সম্ভব হল। প্রথম পরাজয়ের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে নিতে স্বভাবতই অনেক সময় লেগেছে। কৃষকেরা অনেক মূল্য দিয়ে এটা বুঝতে পেরেছে জমিদার ও ব্রিটিশরাজের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা অত সহজ ব্যাপার নয়। তাই অনেক ব্যাপক প্রস্তুতির পর তারা লড়াইয়ের নামার সিদ্ধান্ত করল। তাছাড়া কৃষকেরা ভেবেছিল, সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে খাজনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের দীর্ঘদিনের অসন্তোষের কারণ দূর হবে। বিশেষ করে, কিছু সময়ের জন্য হলেও জমিদারদের অপসারণ তাদের খানিকটা আশ্বস্ত করেছিল।

আশাভঙ্গ যখন হল, কৃষকেরা আবার বড়ো সংঘর্ষের জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হল। এবারকার আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য দিক, নেতাদের দৈবীশক্তির উপর নির্ভরতা আগের মত ছিল না। এ শক্তি গতবারের সংঘর্ষে ব্রিটিশ সৈন্যের কার্যকারিতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি—এ রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের মোহভঙ্গের একটা কারণ হতে পারে। অবশ্য অমাদের অনুমানের একমাত্র ভিত্তি সরকারী বিবরণে নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস সম্পর্কে অনুল্লেখ। এমনও হতে পারে, সরকার এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি, বা জানলেও তাকে গুরত্ব দেয়নি। কারণ, সরকারী রিপোর্ট প্রধান জোর বিদ্রোহীদের সামরিক প্রস্তুতির উপর।

গতবারের তুলনায় এ প্রস্তুতি যে অনেক উন্নত ধরনের এতে সন্দেহ নেই।[১০৮] এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ী অঞ্চলের গারোদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করল। কারণ সম্ভবতঃ দুটি। নূতন অঞ্চলে সংগঠনের বিস্তার বিদ্রোহীদের

শক্তি বৃদ্ধি করবে। সমতলের জমিদারদের সঙ্গে পাহাড়ী গারোদের দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্কের কথা মনে রেখেই হয়ত বিদ্রোহীরা এ ধরনের চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয়তঃ সংঘর্ষ যদি পাহাড়ী অঞ্চলেও ছড়ায়, তাহলে পাহাড়ের ভৌগোলিক প্রকৃতি সম্পর্কে গারোদের জ্ঞান বিশেষ কাজে আসবে। সরকারী বিবরণে, এও বলা হয়েছে, পাগল সৈন্যদলে 'আসামের ভাড়াটে সৈন্যরা'ও আছে। খুব সম্ভবতঃ গারো সংলগ্ন আসামের কোন কোন অঞ্চল থেকে পাগলরা বেশ খানিকটা সমর্থন পেয়েছিল। তাছাড়া তারা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যও আগের থেকে অনেক বেশি প্রস্তুত ছিল। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী তিনশ বা চারশ জনের নানা দল বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিল; মূল বাহিনীতে ছিল প্রায় তিন হাজারের মত পাগল; জোনাকী পাত্র তার অধিনায়ক; অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে অবশ্য নূতনত্ব নেই—বর্শা, ধনু, বিষ-মেশানো তীর এবং কয়েকটা মাত্র বন্দুক। প্রয়োজন হলে অবশ্যই তারা রণকৌশল পরিবর্তন করত। যেমন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলে তারা গারো পাহাড়ের নানা অঞ্চলে সরে পড়ত। পাহাড়ী গারোদের সঙ্গে যোগাযোগ তখন খুবই কাজে এসেছিল।

উন্নততর প্রস্তুতি ও নিপুণ সংগঠনের জন্যই বিদ্রোহীরা বড়ো অঞ্চল জুড়ে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। প্রথমবারের মত, এবারও তাদের মূল লক্ষ্য নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা।

বিদ্রোহীদের এ সংগঠিত শক্তি স্থানীয় প্রশাসন অকপটে স্বীকার করেছে।[১০৯] "শেরপুর এবং গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল সম্পূর্ণটাই তাদের দখলে। অধিনায়ক জোনাকি পাত্রের ঘোষণা, শেরপুরে শুধুমাত্র তার কর্তৃত্বই মানা হবে; তার স্পর্ধা এতদূর গেছে যে, সে দূত মারফৎ এ অঞ্চলের এক প্রধান জমিদারকে হুকুম করেছে যেন তাকে অর্থ পাঠানো হয়; যেন জমিদার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সামনে হাজির হয়; অন্যথা, তাকে শাস্তিভোগ করতে হবে; তার সম্পত্তি, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে।"[১০৯ক]

বস্তুতঃ নূতন হারে খাজনা আদায় বহুদিন জমিদারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জমিদারের পেয়াদাদের বিদ্রোহীরা পিটিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিত। পেয়াদাদের রক্ষার জন্য (শেরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট) এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পাঠান। বিদ্রোহীরা তাঁকে এবং তার দলবলকে তোয়াক্কাই করেনি। এ রাজপুরুষের প্রতিবেদন ঃ "পাগলদের এমনই দুঃসাহস যে, আমার তাঁবুর পাশের গ্রামের এক তালুকদার ও তার ছয় পেয়াদাকে তারা ধরে নিয়ে গেছে; প্রায় পক্ষকাল তাদের পাহাড়ে আটকে

রাখার পর এক পেয়াদা সহ তালুকদারকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে; অন্যদের কোন খোঁজ এখনও নেই।"[১১০] 'প্রায় বছরখানেক ধরে' জমিদারের লোক গ্রামে ঢুকতেই পারছে না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ পাঠিয়েও কোন লাভ হয় না; অবস্থা বুঝে তারা সব সম্পত্তি নিয়ে পরিবার সহ পাহাড়ে পালিয়ে যায়। এক রাজকর্মচারী বেশ কয়েকটা 'বর্ধিষ্ণু গ্রাম' ঘুরে দেখেন, সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন সম্পত্তিই নেই; কারণ খাজনা আদায়ের জন্য পুলিশী ব্যবস্থা এড়ানোর জন্য তারা সরে পড়েছে; অন্যত্র ক্রোক করার মত কোন কিছুই সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু যেই না রাজকর্মচারী গ্রাম ছাড়লেন, অমনি আবার তারা স্ত্রী, সন্তান, গবাদি পশু ও জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল।

কিন্তু আগেরবারের মতই দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে তারা পেরে ওঠেনি।

(৭.৬)

পাগলপন্থার উদ্ভব ও প্রসার, কৃষক বিক্ষোভের সঙ্গে পাগল নেতাদের ক্রমবর্ধমান যোগ এবং দুই ভিন্ন পর্যায়ের (১৮২৪/২৫ ও ১৮৩৩) পাগল বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা থেকে এ অঞ্চলের কৃষকদের ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

(ক) পাগলপন্থা কৃষকদের কাছে ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য, দুশ্চর সূফী সাধন-পদ্ধতি বহু কৃষকদের কাছে গ্রহণীয় ছিল না। প্রধানতঃ করিমের সহজবোধ্য সামাজিক দর্শন ও নৈতিক আচার বিধি কৃষকদের আকৃষ্ট করেছিল। জমিদারতন্ত্রের যে ভয়াল রূপ ১৭৭০-এর দশক থেকে ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সামাজিক দর্শনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। করিম প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাস এবং নৈতিক বিধান কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলে বহু জাতি ও ধর্মভুক্ত কৃষকেরা তাকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল। তা ছাড়া, সিদ্ধ ফকিরদের অলৌকিক ক্ষমতায় এ অঞ্চলের কৃষকদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও পাগলপন্থার জনপ্রিয়তার একটা কারণ। পারিবারিক এবং সামাজিক নান দুর্বিপাক থেকে পীররাই পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ করবে—এই ছিল সাধারণ বিশ্বাস।

(খ) জমিদারী স্বৈরাচারের পটভূমিকায় ক্রমবর্ধমান কৃষক বিক্ষোভের সঙ্গে পাগল নেতৃত্বের যোগ পাগলপন্থার দ্রুত প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ। এ যোগের

নানা বৈশিষ্ট্য ১৮২৪/২৫ সালের বিদ্রোহের সংগঠনে ও লক্ষ্যে দেখা গেছে। বলা হয়েছে বিদ্রোহেব মূল উদ্যোগ মোটেই টিপুর ছিল না; বিক্ষুব্ধ কৃষকেরাই টিপুকে নেতা বানিয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি এক প্রচ্ছন্ন ধারণা যে টিপু যেন আকস্মিকভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রতিবাদী কৃষককুল ও পাগল নেতৃত্বের সম্পর্ক অনেক নিবিড়, সুদূরপ্রসারী এবং প্রত্যক্ষ। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি আন্দোলনের প্রাথমিক উপকরণ যাই হোক না কেন, একেবারে শুরু থেকে সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহেব বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে টিপুর যোগ অবিচ্ছেদ্য। এটা মেনে নেবার অর্থ কৃষকদেব উদ্যোগকে খাটো করা নয। নেতার অভিপ্রায় বা চিন্তা ধারণা কৃষকদের অভিপ্রায বা চিন্তা ধারণার অবিকল প্রতিফলন নয়। কৃষকদের সক্রিয় বিক্ষোভ নানাভাবে সংগঠিত হতে পারে। ১৮২৪/২৫ সালের বিদ্রোহের বিশিষ্ট রূপ টিপুর ধ্যানধাবণা অনুগামীদের উপর তার গভীর প্রভাব, পাগলপন্থী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতিবোধ এবং টিপু-ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরো নানাভাবে বহুলাংশে নির্ধারিত হয়েছিল।

(গ) সংগঠনের এ বিশিষ্ট রূপের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় ছিল এক ধরনের ধর্ম বিশ্বাস—নেতার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস। আগেই বলেছি, পাগলপন্থার জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ এ বিশ্বাস। কিন্তু বিদ্রোহের সময়কার এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। আগেকার বিশ্বাস হল প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির উপদ্রব বা অন্য ধরনের আকস্মিক দুর্বিপাক থেকে নেতার অলৌকিক ক্ষমতা তাদের উদ্ধার করবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিত ও রূপ স্বতন্ত্র : জমিদারতন্ত্র ও ব্রিটিশরাজের অবসান এবং স্বাধীন পাগলরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস নেতার অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে অপরাজেয় হবে।[১১১]

(ঘ) পাগলপন্থীদের বিশ্বাসে এ রূপান্তর তাই সংঘটিত হয়েছিল জমিদার ও রাজবিরোধী কৃষকচেতনার বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে ১৮২৪/২৫-এর আগে ও মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে জমিদার বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছে কিন্তু এ বিশ্বাস তখন সক্রিয় ছিল না। এ বিশ্বাসের উদ্বোধন হয় সেই সময়, যখন জমিদার বিরোধী আন্দোলন এক রাজবিদ্রোহী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। এর কারণ যুদ্ধজনিত এক বিশেষ অবস্থায় জমিদারী স্বৈরিতায় আকস্মিক তীব্রতা বৃদ্ধি নয়। এর পটভূমিকায় ছিল সুনিশ্চিত এক নূতন প্রত্যয় যে প্রজার কল্যাণ সাধনে রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে; রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পুনর্বিন্যাস ছাড়া কৃষকদের

দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে না। পাগলরাজ প্রতিষ্ঠাব দৃঢ সংকল্প ঘোষণা এ রূপান্তরিত বিশ্বাসের জন্মলগ্ন। আবার এ বিশ্বাস এই সংকল্পকেও প্রবল এবং সংহত করেছে।

(ঙ) মরিসনের কাছে এ ধরনের বিশ্বাস স্রেফ 'আহাম্মুকি' মনে হতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহী পাগল কৃষকদের চেতনার এ এক বিশিষ্ট ধর্ম। এমন নয় যে জমিদাব ও ব্রিটিশরাজের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় তাদেব শক্তির হীনতা সম্পর্কে কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতা পাগলদের এ বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল করেছে।[১১২] শত্রু পক্ষের শক্তি বিচারে কখনো তারা ভাবেনি তাবা এমনই হীনবল যে তাদের 'পারজয অনিবার্য'। ববং জয সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যয় তাদের নিত্যনিযত উদ্বুদ্ধ করেছে। এমন নয় যে তাদের নিজেদের কোন সামরিক প্রস্তুতি ছিল না; তাদের এ সহজ বিশ্বাস ছিল, নেতার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে তাদেব এ প্রস্তুতি হবে অপ্রতিরোধ্য। এ বিশ্বাসের মধ্যে মূঢ় কোন ছলনা নেই; নেই নিজেদের শক্তিকে বাডিয়ে দেখার মত আত্ম-প্রবঞ্চনা। এ বিশ্বাস একান্তই সহজাত। তা বিস্তৃত যুক্তজালের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সিদ্ধান্ত নয়—যা যুক্তির বিবিধ উপকরণের হেরফের বহুলাংশে পাল্টে যেতেও পারে। এ বিশ্বাসের আদিরূপ ভিন্ন; বিশেষ অবস্থায় তা রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু এ বিশ্বাস তাদের যথাসাধ্য সামরিক প্রস্তুতিব প্রচেষ্টাকে বিন্দুমাত্র শিথিল করেনি। এ বিশ্বাস তাদের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যান্য অনেক জায়গায় বিদ্রোহী কৃষকদের প্রস্তুতি উন্নততর ছিল না; কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাস তাদের অনুপ্রাণিত করেনি। কারণ যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের বিশ্বাসের জগৎ গড়ে উঠেছে তা স্বতন্ত্র।

(চ) ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বিদ্রোহী কৃষকরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত; আর জাতিগত বিচারেও তারা পরস্পরের থেকে আলাদা; তাই পাগলপন্থা ধর্ম হিসেবে তাদের মধ্যে কোন ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে পারেনি—শেগুেলের এ ধারণাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্রোহীরা যে একটিমাত্র উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এটা ঠিক। নূতন ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করাও সম্ভব নয়। তবে শেরপুরের আপামর কৃষককুল যে এ নূতন ধর্মমত গ্রহণ করেনি, তা অনুমান করা যায়। কিন্তু আন্দোলনে পাগলপন্থীর প্রভাব ছিল না এ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নয়।

আন্দোলনের সময় ধর্মবিশ্বাসের কোন্ বৈশিষ্ট্য তাকে প্রভাবিত করেছিল? এ বিশ্বাস সাধন-পদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; এর উৎস নেতাদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে আপামর কৃষক গোষ্ঠীর ধারণা—অন্ততঃ আন্দোলনের

বিশেষ মুহূর্তগুলিতে এ ধারণাই তাদের অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ বিশ্বাস তাই প্রধানতঃ ধর্মীয় বিশ্বাস। ব্যক্তিজীবনে বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীজীবনে ধর্মবিশ্বাস যাই থাকুক এ নূতন বিশ্বাস গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংস্কৃতি বা ধর্মগত ব্যবধান সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছিল।

যেখানে উপজাতিরা সরাসরি পাগলপন্থা গ্রহণ করেছে সেখানে এ গোষ্ঠী-চেতনা আন্দোলনের সংগঠনকেও সমৃদ্ধ করেছে। যেখানে পাগলপন্থাব প্রভাব মোটেই পৌঁছয়নি বা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানেও এ নূতন বিশ্বাসের ফলে কৃষকেরা বৃহত্তর এক গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নিজেদের মনে করত। আন্দোলনের মুহূর্তে বড়ো পবিবর্তনের প্রত্যাশায় যখন কৃষকেরা অধীর, অন্য সব ব্যবধান বা স্বতন্ত্র্যবোধ তখন লুপ্ত হয়ে যায়। আন্দোলনের সংগঠন অন্য ধরনের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়েব সংগঠনের থেকে ভিন্ন।

(৮)

একটা বিশেষ পর্যায়ে ওহাবী-ফরাজী আন্দোলন ও পাগলপন্থী বিদ্রোহে ধর্ম বিশ্বাসেব বিশিষ্ট ভূমিকা আলোচনা করেছি। ১৮৩১-এব পর বাংলায় ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহের বিশেষ কোন যোগ দেখা যায় না। দুদু-পববর্তী ফরাজী আন্দোলনে ধর্মবিশ্বাসের তুলনায় ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকাই ছিল বেশী। এ ভূমিকা প্রধানতঃ কৃষকদের সংহতি চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে ফরাজীদের গোড়াকার স্বাতন্ত্র্যবোধও অনেক দুর্বল এবং অস্পষ্ট হয়ে আসে। ১৮৩৩-এর পর পাগলপন্থীদের কোন বড় আন্দোলন হয়নি। হলে ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব কি রূপ নিত অনুমান করা শক্ত।

উপজাতিদের আন্দোলনে কিন্তু ধর্মের প্রভাব ক্রমেই বেড়েছে। বার বার তাদের পরাভব ঘটেছে, কিন্তু আবার তারা শত্রুকে প্রতিরোধ করেছে। ধর্মের মধ্যেই তারা প্রতিরোধের প্রেরণা খুঁজেছে। এরজন্য নিজেদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও আচারকে নূতনভাবে যাচাই করেছে। পুরনো বিশ্বাসের বেশ কিছু অংশ না ত্যাগ করলে, শত্রুর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব, এ ধারণা তাদের পরিবর্তমান মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে; কারণ নানাভাবে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধিও ঘটেছে। পুরনো ধর্মবিশ্বাসের রূপান্তর যেমন ঘটেছে, তাদের প্রাচীন ইতিহাসকেও তারা

নূতনভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছে। ধর্মচেতনা ইতিহাস চেতনার সঙ্গে মিশে গেছে। অনেক বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান তারা বর্জন করেছে বটে; কিন্তু গোষ্ঠী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে।

বর্তমান আলোচনা তিনটি উপজাতির আন্দোলনে সীমাবদ্ধ—সাঁওতাল, মুণ্ডা ও ওরাঁও। তিনটি আন্দোলনই দীর্ঘস্থায়ী ছিল। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় প্রভাবের রূপও অভিন্ন নয়।

তিনটি আন্দোলন সম্পর্কেই আমরা কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

(ক) উপজাতিদের আন্দোলনে দুটি ধারা ঃ সীমিত উদ্দেশ্যের আন্দোলন এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধনের আন্দোলন। এ দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলন কিভাবে শুরু হয়েছিল?

(খ) এ রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ধর্মবোধের ভূমিকা কি ছিল?

(গ) আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপজাতিদের ধর্মবোধই বা কীভাবে পাল্টে গেল?

(৯)

আমবা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতায় আস্থা সম্পূর্ণভাবে হারালেই বিক্ষুব্ধ কৃষককুল রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবে।

সাঁওতালদের মানসিকতায়ও পরিবর্তন কীভাবে ঘটল?

বস্তুতঃ, এ পরিবর্তন স্থানীয় প্রশাসনকে বিস্মিত করেছিল। সাঁওতালদের আচার আচরণে, ভাবে ভঙ্গীতে এর কোন পূর্বাভাস আগে দেখা যায়নি। প্রশাসন হয়তো তাদের মনোভাব সম্পর্কে সব খবর রাখত না; কিন্তু তাদের যারা প্রধান শত্রু যেমন মহাজন, তাদের তো জানার কথা। ধরতে গেলে ১৮৫৪ সালের মে-জুনের আগে মহাজন বা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সদাসতর্ক প্রশাসনের পক্ষে আশঙ্কাজনক এমন কোন কিছু সাঁওতালেরা করেনি।

প্রশাসনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সাঁওতালরা এর ন্যায়পরায়ণতায় সম্পূর্ণ আস্থাশীল। এ ধারণার ভিত্তি, মহাজন বা অন্যান্য দিখুদের সম্পর্কে অভিযোগ সরাসরি তারা স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিদের কাছেই জানিয়েছে। কারণ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্নতা বলতে কিছুই ছিল না। সাঁওতাল অঞ্চলে দীর্ঘকাল

ধরে সবকাবী প্রশাসনেব অনুপ্রবেশ এত ব্যাপক ও গভীর হয়ে পড়েছিল যে ব্রিটিশবাজকেই তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র উৎস বলে মেনে নিয়েছিল।

অন্যান্য গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এমন জায়গায় সাঁওতালরা কদাচিৎ গ্রাম পত্তন কবেছে। যেসব অঞ্চলে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে, তারা সেখানকার আদিবাসী ছিল না। বাইরে থেকে এসে প্রধানতঃ দুটো জায়গায় তারা বসতি স্থাপন করে—সরকারী এলাকা ডামিন-ই-কো, এবং আশেপাশের জমিদারী এলাকা। জনবিরল ডামিনে আসার জন্য সরকারই প্রথম তাদের উৎসাহ দেয়। গোড়ার দিকে রাজস্ব ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে দিয়েছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে রাজস্বের হার এবং পরিমাণ বাড়ে। সরকারী আমলার প্রভাবও তাই বাড়ে। রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত তহশীলদাবের সংখ্যা বেড়ে চলে। রাজস্বের হার বাড়ানোর নূতন নিয়মে প্রশাসনের কর্তৃত্ব ক্রমেই কায়েম হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব—এ ব্যবস্থা আগে চালু ছিল না। একজোড়া বলদ, গরু বা মোষ দিয়ে যত জমি চাষ করা সম্ভব, তার উপর রাজস্বের হার ঠিক করা হত। নূতন ব্যবস্থায় আমলাদের তদারকির সুযোগ বাড়ল। তাছাড়া নূতন বসতি স্থাপনের প্রয়োজনে মহাজনের উপর সাঁওতালদের নির্ভরতাও অপরিহার্য হল। অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী তারা তৈরী করতে পারত না বলে বাইরের ছোট বড় ব্যবসায়ীর উপর তাদের নির্ভর করতেই হত। এ ধরনের লেনদেনের বিস্তার অনিবার্যভাবে সরকারী প্রশাসনেরও বিস্তার। পুরনো জমিদারী অঞ্চলে প্রশাসনের ভূমিকা আরো প্রত্যক্ষ। আবাদ, জনসংখ্যা, ব্যবসা ইত্যাদি বাড়ার ফলে এ ভূমিকার ক্ষেত্র আরো বিস্তীর্ণ হয়।

প্রশাসনের উপর এ আস্থা ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। প্রধানতঃ মহাজনদের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সাঁওতাল মানসিকতায় এ পরিবর্তন আসে।

মহাজনী শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণার বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক, কারণ এ ধারণা তাদের বিদ্রোহের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। দেনার দায়ে মহাজনের কাছে জমি হারানোর ঘটনা পরবর্তীকালে বহু ঘটেছে; এভাবেই বহু সাঁওতাল পল্লী মহাজনের কবলে চলে গেছে। ১৮৫৫-এর আগে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা নগণ্য।

মহাজনী শোষণের তাৎপর্য শুধু চরম আর্থিক ক্ষতি নয়; মহাজনদের কাছে বিচিত্র ধরনের অধীনতার বেড়াজালে সাঁওতালরা ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছিল। তাদের প্রধান অভিযোগ, দেনার দায়ে তারা শুধু সর্বস্বান্তই হয়নি; তারা 'গোলামে' পরিণত হয়েছে। নিজেদের সামাজিক মান-মর্যাদা সব খুইয়েছে; তাদের মা, স্ত্রী বোনের

'ইজ্জত' নষ্ট হয়েছে; অথচ আদালতে এর কোন প্রতিবিধান নেই।

সাঁওতালদের বদ্ধমূল ধারণা, কর্জের জন্য সুদ আদাযেব প্রথা 'ন্যায়' বিরোধী। সাঁওতালদের এ কথা বোঝানোর জন্য 'সুবা' (সিধু বা কানু) একটা টাকা ও কিছু বীজ মাটিতে পুঁতে দিয়ে বলল টাকাটা টাকাই আছে; বাড়ছে না, অথচ একটা বীজ থেকে কত ধানের চারা ওঠে।[১১৩] নেতারা এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেনি। তারা সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছিল ধার নেওয়ার ফলে যদি চাষের উন্নতি হত বা তাদের রোজগার বাড়ত, সুদ নেবার একটা যুক্তি থাকত। এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় কেন সাঁওতালরা ধার নিত। ধারের ফলে রোজগার বাড়েনি, কারণ পরিবারের ভরণপোষণ মেটানোর জন্যই ধারের প্রায় সব টাকা খরচ হয়ে যেত। যদি সুদ আদায় ন্যায়ধর্মবিরোধী হয়, তাহলে দেনা আদায়ের জন্য মহাজনের নানা ফন্দি ফিকিরকে তারা প্রকাশ্য প্রবঞ্চনা বলে মনে করত। তারা বলত, মহাজনী হিসেব পদ্ধতি বোঝার মত বিদ্যে-বুদ্ধি তাদের ছিল না। যেখানে মহাজনরা আইন আদালত মারফত দেনা আদায়ের চেষ্টা করত সেক্ষেত্রে সাঁওতালদের অভিযোগ ছিল, আদালতের রায় মহাজনের একতরফা নালিশের উপর ভিত্তি করেই দেওয়া হত; তারা জানতেই পারত না, আদালত কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিল। শুধু তাই নয়। দেনা শোধের সামর্থ থাকলে মহাজনের সঙ্গে কোন রকমে বনিবনা রক্ষা করা সম্ভব ছিল; না থাকলে মহাজনের হাতে হেনস্তার শেষ ছিল না। সাঁওতালরা একবার অভিযোগ করে, প্রতিহিংসাপরায়ণ মহাজন তাদের রোয়া খেতে টাট্টুঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে।[১১৪]

তবুও মহাজন ছাড়া তাদের চলত না। আর দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত মহাজনরা তাদের ইচ্ছেমত খাটিয়ে নিত। ধারও শোধ হত না, এ ধরনের 'গোলামী' ('কামিয়াতী') থেকেও মুক্তি জুটত না। বংশানুক্রমে এ বাধ্যবাধকতা থাকত।

'কামিয়াতি' প্রথার ব্যাপ্তি ঠিক করা শক্ত। সম্ভবতঃ তখনও পর্যন্ত তা কয়েকটা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে মহাজনরা সতর্ক থাকত, যাতে কামিয়ারা অন্যত্র না পালিয়ে যায়। অন্য জায়গায় কাজের সুযোগ জুটলে মহাজন নানাভাবে তাদের আটকাতে চেষ্টা করত। সবেমাত্র তখন রেলপথ বানানোর কাজ সুরু হয়েছে। মজুরের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে এ কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী মজুরী দিতে হত। কাঁচা পয়সার আকর্ষণে সাঁওতালরা এ কাজ করতে আগ্রহী হয়। বিনি পয়সার শ্রম হারানোর আশঙ্কায় মহাজনরা তাদের নানাভাবে বাধা দেয়।

সাঁওতালদের কাছে মহাজনী প্রথার তাৎপর্য তাই শুধু ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্দশা

নয়—তা হল, মহাজনের সহস্র নাগপাশে ক্রমেই জড়িয়ে পড়া, আর নিত্যনিয়ত নিগ্রহ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পরিবারের ইজ্জত নাশ। এসব বোঝানোর জন্য সাঁওতালরা বলত তারা যেন মহাজনের কেনা 'গোলাম'। এসবের ফল সাঁওতালদের এক সুতীব্র গ্লানিবোধ।

অথচ এর থেকে পরিত্রাণের কোন সহজ উপায় ছিল না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মহাজনের এসব কাজ অবৈধ। সম্ভবতঃ স্থানীয় আদালতের যেসব উকিল মোক্তারদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল, তারাই তাদের এসব কথা বুঝিয়েছে। মনে হয় আদালতের কাছে সাঁওতালদের নানা আর্জিও তাদের লেখা।

আদালতে কোন প্রতিবিধান মিলল না বলে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতালরা মহাজনের কাজ বিচার করল। তাদের মতে, এ কাজ 'পাপ'।[১১৪ক] এ বিচারের মাপকাঠি নৈতিক। যা কিছু গর্হিত, শুধু তাই 'পাপ' নয়; সাঁওতালদের ধারণায় এটা ন্যায়বিরোধী বলেই পাপ। এ ন্যায়ের ধারণা, অলঙ্ঘনীয় কোন বিশ্ববিধানের ধারণা; এ বিধান সর্বত্র প্রযোজ্য। মহাজনের দুষ্কর্ম 'পাপ', কারণ তা এ সর্বত্রগামী নিয়মকে ভেঙ্গেছে।

অর্থনৈতিক বিচারে খানিকটা নির্দিষ্টতা থাকে। যেমন এক টাকা ধারের বদলে ধান বা অন্য শস্য আদায় করতে গিয়ে মহাজন সাঁওতাল চাষীকে কত ঠকাল, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা চাষীর ছিল। কিন্তু নৈতিক বিচারে থাকে এক অনির্দেশ্য সীমান্ত। মহাজন সম্পর্কে তিক্ততা যতই তীব্র হচ্ছিল, নৈতিক বিচারের অস্পষ্টতাও বাড়ছিল। এ তিক্ততা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল যখন তাদের অর্থনীতিতে মহাজনের ভূমিকা সাঁওতালরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল; এ দিখু দুষমণদের সম্পূর্ণ বিনাশ তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

(৯.১)

মহাজনদের সম্পর্কে তাদের তিক্ততা ক্রমেই বাড়ছিল বটে, কিন্তু ১৮৫৪ সালের মে-জুন পর্যন্ত তারা কোন হিংসা-প্রয়োগের কথা ভাবেনি। এমনও হয়েছে, মহাজনের কবল থেকে মুক্তির জন্য তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। ১৮৪৮ সালে তিন তিনটি গ্রাম এভাবে উজাড় হয়ে যায়। এ ধরনের ঘটনা সম্ভবতঃ বড়ো একটা ঘটেনি। এ ধরনের সিদ্ধান্তে ঝুঁকিতো ছিলই। অন্য জায়গায় জীবিকা যে কম কঠিন হবে তার কী নিশ্চয়তা আছে। তাছাড়া, ধর্মীয় কারণেও তারা সহজে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি

ছেড়ে যেতে চাইত না; তাদের বিশ্বাস মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাদের যোগ এতে ছিন্ন হবে; কারণ এ গ্রামেই মৃতদের কবর।

সম্ভবতঃ এভাবেই মহাজনদের সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষ নিরুদ্ধ এক আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহ যে ক্রমেই বাড়ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহাজনরাও আশংকা করছিল, স্বভাবত সহিষ্ণু সাঁওতালরা আক্রোশের বশে সহিংস কোন পন্থা বেছে নেবে। এরকম আঁচও তারা সম্ভবতঃ করেছিল। আগেভাগে তারা পুলিশ, আদালতকে তাদের আশংকার কথা জানিয়ে দেয়। সাঁওতালদের একটা আর্জি থেকে এটা অনুমান করা যায়।[১১৪খ] সাঁওতালরা অভিযোগ করে ধারের জন্য মহাজনের বাড়ী যাওয়ার মধ্যে তারা কোন বদ মতলব সন্দেহ করত। এমনও নাকি হয়েছে, মহাজনরা থানায় নালিশ করেছে, সাঁওতালরা তাদের বাড়ীতে হামলা করেছে। এ ধরনের নালিশের একটি মাত্র অর্থ, তারা সাঁওতালদের আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। মিছিমিছি সাঁওতালদের হেনস্তা করে তাদের কীই বা লাভ।

মহাজনদের আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিল না। ১৮৫৪ সালের মে-জুন মাসে ডামিন-ই-কো অঞ্চলে সাঁওতালরা হামলা করে।[১১৫] (সরকারী দলিলের ভাষায় 'ডাকাতি')। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের কাছে খবর ছিল আরো চল্লিশটা এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এ ঘটনাগুলি বিস্ময়কর ঠেকেছিল।[১১৬] কারণ, এ অঞ্চলে এ ধরনের হিংসার কোন নজির নেই; 'শান্ত এবং নির্বিরোধ প্রকৃতির' লোক বলেই সবাই সাঁওতালদের জানত। অথচ মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের ব্যবধানে পর পর এ হামলাগুলি ঘটে গেল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, মহাজনদের কোন সম্পত্তিতে সাঁওতালরা হাত দেয়নি।

লক্ষণীয় ব্যাপার, পুলিশ, আইন-আদালত সম্পর্কে সাঁওতালদের মোহভঙ্গ হলেও এদের বিরুদ্ধে তখন হিংসার কোন ঘটনা ঘটেনি। সম্ভবতঃ সাঁওতালরা ভেবেছিল, এবার হয়ত প্রশাসন মহাজনদের শায়েস্তা করার জন্য কিছু একটা করবে। প্রশাসন যে এ বিষয়ে কিছু ভাবেনি তা নয়।[১১৭] এ হামলাগুলির কারণ যে মহাজনী নিপীড়ন, ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানতে পারে। তার পরামর্শ সাঁওতালদের দেনা বা জমি সংক্রান্ত মামলা বিচারের ভার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর দেওয়া হোক; দেওয়ানী আদালতের বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের বদলে তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধি মত

মামলাগুলির নিষ্পত্তি করবেন। আইন আদালত মারফত মহাজনরা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে নিচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেটের এ পরোক্ষ স্বীকৃতি তার পরামর্শের একটা প্রধান তাৎপর্য।

মহাজন বিরোধী কোন ব্যবস্থাই তখন নেওয়া হল না। বরং 'ডাকাতি'র অপরাধে হামলাকারীদের গুরু সাজা দেওয়া হল।

প্রশাসনের এ সহানুভূতিলেশহীন আচরণ সাঁওতালদের গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ করে। বিদ্রোহের সময় বন্দী সাঁওতালদের অনেকেই বলেছে, সম্মিলিত প্রতিরোধের ভাবনা চিন্তা তখন থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়। কেউ কেউ এমনও বলেছে তাদের 'হুল' এক তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহার ফল; কারণ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে সাঁওতালদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে।[১৮]

তখনকার সাঁওতাল মানসিকতার একটা প্রধান দিক সরকারের ন্যায়-পরায়ণতা সম্পর্কে তাদের এতদিনের সন্দেহ এক গভীর অবিশ্বাসে পরিণত হল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মহাজনদের বাড়ীতে হামলা অন্যায় কিছু নয়; মহাজনী উৎপীড়নের কথা তারা সরকারকে বহুবার জানিয়েছে; কোন ফল হয়নি; কি আর করা যায়, তারা ঠাহর করতে পারেনি; মহাজনদের সতর্ক করে দেবার জন্যই তাদের উপর হামলা; সরকার কিন্তু তাদের এ মনোভাব বুঝতে চায়নি; বরং সব দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কোন প্রতিহিংসা নেবার কথা তখনও ভাবেনি। তাদের পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সুচিন্তিত যৌথ সিদ্ধান্তের ফল। 'হুল' শুরু হয় এর প্রায় এক বছর পর—১৮৫৫ সালের জুলাই মাসে। মধ্যবর্তী এ সময়ের ইতিহাস বহু দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, শত্রুর কবল থেকে মুক্তির নানা বিকল্প উপায়ের অনুপুঙ্খ বিচার, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য তীব্র হতাশার ইতিহাস। এ দ্বিধাদীর্ণ সাঁওতাল মানসিকতার বিস্তারিত বিবরণ মেলে না। তবে এটা আঁচ করা শক্ত নয় যে, এক প্রচণ্ড অস্থিরতা সমগ্র সাঁওতাল সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল। সাঁওতালী সূত্র থেকেও জানা যায় বিচিত্র ধরনের নানা গুজব এ সময় গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। স্পষ্টতঃ, এক অজানিত শঙ্কারভাব তাদের মধ্যে প্রতিফলিত।

সাঁওতালদের এ অশান্ত মনের খানিকটা পরিচয় মেলে ব্রাডলী-বার্টের বিবরণে।[১৯] এর ভিত্তি সম্ভবতঃ বিদ্রোহের সময়কার কোন মূল উপকরণ। "ডামিন-ই-কো'তে

১৮৫৪-এর শীত মরসুম ছিল এক তীব্র অস্থিরতার সময, তা কিন্তু তখনও কর্তৃপক্ষের নজরে আসেনি .. গোটা সাঁওতাল অঞ্চল জুড়ে যেন এক অভূতপূর্ব ভাবের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল—তা গভীর রহস্যময়, বাইরে তাব চিহ্নমাত্র নেই অথচ একান্ত সত্য, এবং তীব্র ... এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এমনকি অরণ্যের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এ অস্থির আবেগ ... দর্শন, স্পর্শ এবং শ্রবণের অতীত এ আশ্চর্য বোধশক্তি সাঁওতালদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায় . . ১৮৫৪-৫৫ সালের সারা শীতকাল ধরে এটা চলল; বিদ্রোহের ধারণা তখনও মোটেই রূপ নেয়নি কিন্তু এক অশান্ত মনোভাব সারা অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল। ... দিনের শেষে প্রতিটি গ্রামে সাঁওতালরা জড়ো হত মাঝিস্থানে; অতি সন্তর্পণে একজনের মুখ থেকে অন্য জনের মুখে তাদের অসন্তোষের কথা ছড়িয়ে পড়ত ...''

সাঁওতাল অঞ্চলে যেসব গুজব এ সময় ছড়িয়েছিল, তার কিছু কিছু মূল সাঁওতালী থেকে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।[২০] কোন কোন গুজব প্রাচীন সাঁওতাল লোক-গাথা বা কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক গভীর শঙ্কাবোধ, এবং সম্ভাব্য সঙ্কটের মুহূর্তে নিজেদের সংহতি রক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে নূতন উপলব্ধি। কয়েকটা উদাহরণ বাস্কের অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি।

একটা গুজব রটল, 'নাগ-নাগিনী আসছে মানুষ গিলবার জন্য। এ বিপদ কাটাবার জন্য পাঁচ গ্রামের লোক জমায়েত হয়ে আর পাঁচ গ্রামে যেত এক রাত ভক্তিভরে দেবতার আরাধনা করত ... দুটি অবিবাহিত ছেলে পৈতা পরে, একটি ডালাতে নিম ও বেল কাঠের দুটি ছোট সিন্দুর মাখানো লাঙ্গল নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাঁচটি গ্রাম ঘুরে শেষ করে তারা শেষের গ্রামের এক ফাঁকা মাঠে আমাদের ডেকে জড় করল, সেখানে বেলপাতা, আতপ চাল ও সিঁদুর দিয়ে নাগ-নাগিণীর নামে পুজো করল। এ সমস্ত করে তাদের গানগুলি আমাদের শিখিয়ে দিল ... আমরাও তাদের মত পাঁচটা গ্রামে ঐভাবে ঘুরে বেড়ালাম'।

আর একটা গুজব ছিল, "একটা মহিষ আসছে; যার বাড়ীতে উঠানে ঘাস দেখতে পাবে, সেখানে চড়ে বসবে। সে বাড়ীর লোক মরে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে উঠবে না। এ ভয়ে সবাই রাস্তাঘাট পরিষ্কার করল"।

সংহতি রক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে নূতন নৈতিক বোধকে ঘিরে কয়েকটা গুজব তৈরী হয়েছিল। যেমন, "এক ছেলের মায়েরা সই পাতায়। কাপড় দেওয়া-

নেওয়া ও খাওয়া-দাওয়া হত ... হয়তো আত্মীয়তার বন্ধনে পড়ে যেন সবাই এক হয়। কোন রকম বিদ্রোহ ঘটলে পরস্পরের নামে যেন কেউ কথা না লাগায়, এবং কোন কথাবার্তা হলেও তা যেন গোপন থাকে"।

এ ধরনের আর একটা গুজব ঃ "কে একজন দেকোদের মারবার জন্য আসছেন। তোমরা রাস্তার মোড়ে একটা গরুর চামড়া ও এক জোড়া বাঁশী টাঙ্গিয়ে রাখবে যেন তিনি বুঝতে পারেন যে তোমরা সাঁওতাল, না হলে তোমাদেরও সে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে। ভয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে তা টাঙ্গিয়ে দিলাম"

সাঁওতালদের সংহতিবোধের একটা প্রধান উৎস, ভিন্‌দেশী নানা সামাজিক গোষ্ঠী থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র সম্পর্কে বোধ। মহাজনদের সম্পর্কে স্বাভাবিক বিদ্বেষ এ বোধ ক্রমেই প্রখর করেছে। কিন্তু একটা গুজব থেকে দেখতে পাই, হিন্দু সমাজের নিম্নতম জাতিগুলির অন্যতম ডোমদের সম্পর্কেও তাদের একই মনোভাব। যেমন, "ডোমদের সম্বন্ধে এক গুজব রটল যে কোন এক ডোমের ছোঁয়া লেগে গঙ্গা নদীতে সোনা বোঝাই নৌকা ডুবে গেছে। সেজন্য সমস্ত ডোমকে হত্যা করে শেষ করা হবে। ডোমরা ভয়ে বনের শিকারী পশুর মত পালাতে লাগল। সাঁওতালদের মত তারা পোষাক পরত, আর সাঁওতাল বাড়ীতে থাকত"।

যে তীব্র অশান্ত অনুভূতির কথা ব্রাড্‌লি বার্ট লিখেছেন, তা এসব গুজবে অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, এ অনুভবের বিপুল বিস্তাবে এ গুজবগুলিরও ভূমিকা ছিল। এ ব্যাপ্তির একটা প্রধান কারণ হিসেবে বার্ট সাঁওতালদের বিশিষ্ট সমাজ বিন্যাসের কথা বলেছেন। কিন্তু সাঁওতালদের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্তগুলিতে গুজবগুলিও এ বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। নানা জনের মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে আদি কোন কথার প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ অর্থ ব্যঞ্জনা, রঙ—সবকিছুই পাল্টে যায়। তাই তাতে অনির্দিষ্টতার সব লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। অনিশ্চিতের, অপ্রত্যাশিতের কুয়াশায় এক পরিমণ্ডল তার চার ধারে গড়ে ওঠে। যে অস্থির মানসিকতার মধ্যে এ গুজবের জন্ম, তা এতে আরো বেড়ে যায়।[১২১]

যে সাঁওতালী আকর উপাদানের কথা বাস্কে উল্লেখ করেছেন, তার থেকে মনে হয় সাঁওতালদের তখনকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত নানা গান এ ব্যাপ্তিতে সাহায্য করে। বিশেষ করে কুখ্যাত মহাজন কেনারাম ভগতকে ব্যাঙ্গ করে লেখা নানা গান সাঁওতালদের মহাজন-বিদ্বেষকে আরো তীব্র করে তোলে।[১২২]

(৯.২)

যে দ্বিধা ও সংশয় দীর্ঘদীন সাঁওতালদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার একটা প্রধান কারণ, আন্দোলনে ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের করণীয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। স্থানীয় পুলিশ, আইন-আদালত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেল; কিন্তু বৃহত্তর রাজশক্তি সম্পর্কে তাদের সঠিক নীতি তারা বুঝে উঠতে পারেনি। কারো কারোর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল তাদের অভাব-অভিযোগ কলকাতার ছোটলাটকে জানালে প্রতিকার মিলবে। এ বিশ্বাস সাঁওতাল মানসিকতার এক বিশিষ্ট দিক। আসলে বিদ্রোহ শুরু হবার পরও তাদের এ বিশ্বাস অটুট ছিল। বিদ্রোহীদের কেউ কেউ কলকাতায় গিয়ে ছোটলাটের কাছে আর্জি পেশ করার দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৮৬১ সালের আন্দোলনেও এ বিশ্বাস দেখা যায়।

সাঁওতালদের দ্বিধার আরো একটা কারণ, তাদের পরিষ্কার কোন ধারনা ছিলনা কিভাবে ব্রিটিশ রাজের পরাক্রমের সংগে তারা পাল্লা দেবে। এ পরাক্রমের কথা তাদের অজানা ছিল না। পুলিশী দাপটের কথাতো তারা জানতোই। ব্রিটিশরাজের সৈন্যসামন্ত, বন্দুক, গোলা, গুলি এগুলি সম্পর্কেও তারা বেশ কিছু জানত।

সব দ্বিধা ও সংশয়ের অবসান ঘটে ১৮৫৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি কোন সময়ে দুই সাঁওতাল মাঝি সিধু ও কানুর প্রকাশ এক ঘোষণায়। তারা বলল— ভগবান প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে নির্দেশ দিয়ে গেছেনঃ শক্রর বিনাশের জন্য সাঁওতালরা বিদ্রোহ করুক; তাদের জয় অনিবার্য; কারণ দিব্য অতিপ্রাকৃত শক্তি তাদের হয়ে লড়বে। এ ঘোষণায় সাঁওতাল চেতনায় আমূল রূপান্তর ঘটল।

(৯.৩)

অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা সম্পর্কে পাগল-পন্থী ঐতিহ্য ও সাঁওতালী ভাষ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। পাগল-পন্থীদের বিশ্বাস, যাদুশক্তি করিম শাহ, মা-সাহেবা এবং টিপুর দেহী অস্তিত্বে মূর্ত। সিধু কানু তা বলেনি; তারা শুধু বলেছে, ঐশী ঘোষণাটি প্রথমে তাদের কাছেই করা হয়েছে। অবশ্য সিধু-কানু ও দিব্যশক্তির ভিন্নতার কথা তাদের অনুগামীরা মনে রাখেনি। সিধু-কানুই ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দেবতার আবির্ভাবের ঘটনাটা আসলে কি, সে সম্পর্কে সাঁওতালদের পরিষ্কার

কোন ধারণা ছিল না। এ ঘটনার 'প্রত্যক্ষদর্শী' সিধু ও কানুর বিববণেওও অনেক গরমিল আছে। বন্দী অবস্থায় রাজপ্রতিনিধিদের কাছে তারা এ বিবরণ দিয়েছিল।

কানুর এক সাক্ষ্য মতে 'বৈশাখ মাসে আমার ঘরে ঠাকুরের আবির্ভাব ... ঈশ্বর গৌরবর্ণ এক মানুষ; পরনে ধুতি ও চাদর; উঁচু এক জায়গায় বসলেন তিনি; কাগজের এক টুকরোর উপর লিখলেন চারটে টুকরো আমাকে দিলেন পরে আরো ষোলটা ... দিনের বেলায় তাকে দেখি না; শুধু রাতেই তাকে দেখা যায়।

কানুর অন্য এক সাক্ষ্য (এ বিবৃতি পরোক্ষ উক্তিতে সাজানো হয়েছে) ঃ 'এক সন্ধ্যাবেলা ... উপর থেকে তাদের (কানু এবং তার দুই ভাই) কাছে ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটল। সে (কানু) জিজ্ঞেস করল দেবতা হয়ে তিনি গরীব মানুষের কাছে এলেন কেন। ঠাকুর বল্লেন, তাদের মঙ্গলের জন্যই। আরো বল্লেন, তিনি তাকে এবং তার ভাই সিধুকে 'ঠাকুর সুবা' হিসেবে মনোনীত করেছেন; ভবিষ্যতে তারাই সাঁওতাল অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করবে; সরাসরি সরকারকে তা দেবে; কোনো দারোগা, বা ইজারাদারের মাধ্যমে নয়, ... সাঁওতালরা সমানভাবে নিজেদের মধ্যে জমি ভাগ করে নেবে; দেশ থেকে মহাজনদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে; জমিদারদের সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে; তাছাড়া বসতবাটীর জমি ছাড়া তাদের সব জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে'।[১২৪]

সিধুর সাক্ষ্য[১২৫] ঃ মহাজনী জোরজুলুম থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে সাঁওতাল নেতাদের সম্মিলিত আলোচনার উল্লেখ করে সিধু বলল—"মাঝি এবং পরগণাইতরা সবাই আমার ঘরে হাজির হল; দু'মাস আমরা আলোচনা করলুম; পণ্টেট সাহেব ও মহেশ দত্ত (দারোগা) আমাদের কোন নালিশ কানে নেয় না; মা'বাপের মত ব্যবহার করার কেউ আমাদের নেই। তারপর এক দেবতার আবির্ভাব; গাড়ীর চাকার মত দেখতে। আমাকে বল্লেন, পন্টেট, দারোগা আর মহাজনদের খুন করো; তাহলে ন্যায়-বিচার পাবে; আর পাবে বাবা-মা ('র মতো কাকেও)। ঠাকুর তখন চলে গেলেন। ... ঠাকুরের আসার আগে এক টুকরো তারপর আরো এক টুকরো কাগজ উপর থেকে পড়ল ... তাতে লেখা আছে, মহাজনদের সংগে লড়াই করো; তাহলে সুবিচার মিলবে।"[১২৬]

দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা সম্পর্কে এ দুই নেতার বিবৃতি সরকারী মহল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। তারা স্পষ্ট বলল, এ ঘোষণা দুই নেতার ভাওতা মাত্র; ধর্মের নামে সাঁওতালদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করাই এ ঘোষণার লক্ষ্য, ধর্মের জিগির

সাঁওতালদের প্রভাবিত করবেই কারণ তারা 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন'। রাজপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ এমনও বলেছে, কড়া মদের নেশায় স্বাভাবিক বিচারশক্তি হারিয়ে দু'ভাই এ মিথ্যা কুহক সৃষ্টি করেছে।[১১]

এ ঘটনার ব্যাখ্যা সত্যিই দুরূহ। এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রশ্ন অবান্তর—কারণ শুধু দু'জন এ ঘটনার সাক্ষী।

এর ব্যাখ্যায় দুটি জিনিষের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। সরকারী প্রতিবেদনেও বার বার তাদের কথা বলা হয়েছে। (ক) এ ঘটনার আগের কয়েকটা মাস গোটা সাঁওতাল সমাজ এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সরকারী রিপোর্টের সাদামাঠা ভাষায় এর নাম 'উত্তেজনা'। এর সঠিক কারণও সেখানে নির্দেশ করা হয়েছে। বছরখানেক আগে মহাজনদের বাড়ী চড়াও হবার জন্য সাঁওতালদের যে কঠোর সাজা দেওয়া হয়েছিল, তা তারা একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। দুঃসহ এক গ্লানি-বোধ তাদের অবিরত পীড়িত করছিল। (খ) দিব্যপুরুষ প্রত্যক্ষভাবে দুই নেতাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আসলে এক দুরূহ প্রশ্নের সমাধান ঃ কীভাবে তারা 'দিখু'দের কর্তৃত্ব ও শোষণ থেকে মুক্তি পাবে। বিশুদ্ধ ধর্মীয় কোন প্রসঙ্গ এতে ছিল না।

এ দুটো বিষয় মনে রাখলে এ ঘটনার ব্যাখ্যা খানিকটা সহজ হয়। এমন অনেক নজির আছে তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন নিবিষ্টচিত্তে কোন দুরূহ সমস্যায় মনোনিবেশ করলে হঠাৎ তার সমাধান পেয়ে যায়। এ আকস্মিক কোন প্রেরণার মত; এ সমাধান তার কাছে এত প্রত্যক্ষ, এত সন্নিকট, এত স্পষ্ট, এত সজীব যে তার মনে হয়, বাইরে থেকে আসা কোন বাণীর মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যা একান্তভাবে তার অন্তর্লীন অনুভব, তা বাইরের অবয়ব নিয়ে আসে। তার মনে হয় বহুদূরস্থিত কোন দেহী জ্যোতির্ময় সত্তা থেকে এ বাণী নিঃসৃত হয়ে এসেছে।

সিধুকানুর কাছে দিব্যপুরুষের আবির্ভাব হয়তো এভাবেই ঘটেছিল। এ উপলব্ধি বিচ্ছিন্ন দুই ব্যক্তির ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের চেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; তা গোটা সাঁওতাল সমাজের মুক্তির উপায় সম্পর্কে সুদীর্ঘ অন্বেষার সঙ্গে যুক্ত। দিব্যপুরুষের নির্দেশ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

(৯.৪)

দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা বা তার ব্যাখ্যা যাই হোক, গোটা সাঁওতাল সমাজ একে তাদের মুক্তির জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলে মেনে নিয়েছিল।

বিদ্রোহের সূচনা ও বিস্তারে এ ঘটনার তাৎপর্য প্রধানতঃ এজন্যই। তাদের দীর্ঘদিনের সংশয় এবং অস্থিরতা এতে দূর হল।

এ নূতন ধর্মচেতনা তাদের মানসিকতায় আনে এক আকস্মিক আমূল রূপান্তর। এ চেতনার প্রসার কীভাবে ঘটল, তা মোটামুটি অনুমান করা যায়। এ ঘটনা সম্পর্কে দুই নেতার ঘোষণা যাতে বহু সাঁওতালদের কাছে পৌঁছাতে পারে, এজন্য তারা গোড়া থেকেই তৎপর ছিল। বিশেষ দূত মারফত তারা দূর-দূরান্তে এ ঘটনার প্রচার করে। সাঁওতালদের ঐ সময়কার বিশেষ মানসিকতায় দূতের এ ভূমিকা দীর্ঘদিন অপরিহার্য থাকল না। তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এ খবর ছড়িয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এ ঘোষণা জনশ্রুতির মাধ্যমে সর্বব্যাপী এক জীবন্ত বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র দূত মারফত প্রচারকেই সিধুকানু যথেষ্ট মনে করেনি। তারা চেয়েছিল, নানা অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা এসে আবির্ভাবের ঘটনাস্থল, নূতন দেবতার পূজামণ্ডপ, পুজোর আয়োজন প্রত্যক্ষ করুক। তাদের ধারণা ছিল তাদের ঘোষণায় সাঁওতালদের বিশ্বাস এতে আরো দৃঢ় হবে।

নেতারা বলে পাঠাল, তারা যেন পুজোর উপকরণ হিসেবে দুধ নিয়ে আসে। পুজোর একটা অঙ্গ ছিল, নূতন বসানো ঠাকুরের মাথায় দুধ ঢালা। ২৫শে জুলাই-এ লেখা মুর্শিদাবাদ ম্যাজিস্ট্রেটের এক চিঠিতে নূতন ঠাকুরের পুজো, তাঁর দর্শনলাভের জন্য সাঁওতালদের কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ অধীর প্রতীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মেলে।[১২৮] ভাগনাদিহির এ অঞ্চল তখন ব্রিটিশ সেনার দখলে। সিধু-কানু, তার অনুগামীরা সব সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট পাশের গ্রামগুলি থেকে ঠাকুর সংক্রান্ত নানা তথ্য যোগাড় করেন।

'ঠাকুর আসলে মাটির তৈরী বৃত্তাকার একটা জিনিষ; দু' ফুট তার ব্যাসার্ধ; মাটি থেকে দু' ইঞ্চির মত উপরে তোলা; পাশের মাটির সঙ্গে তা আঁটা; এর কেন্দ্রে আর একটা ছোট বৃত্তের মত করা হয়েছে; তিন ইঞ্চির মত তার ব্যাসার্ধ। ... পাহাড়ীরা যে ধরনের গরুর গাড়ী ব্যবহার করে, ঠাকুর আসলে তার চাকার মত ... ঠাকুরের পাশে ছড়ানো রয়েছে পাঁঠা আর দু'টো মোষের কাটা মুণ্ডু; আজ সকালেই দেবতার নৈবেদ্য হিসেবে তাদের বলি দেওয়া হয়েছে ... মাস দু'ই আগে সিধু আর চাঁদ গ্রামের মাঝিদের বলে বেড়াল, তাদের ঘরে ঠাকুর দেখা দিয়েছিল; প্রত্যেকে যাতে পুজোর নৈবেদ্যের জন্য এক বাটি দুধ নিয়ে আসে। কিরূপে ঠাকুর দেখা

দিয়েছেন গ্রামবাসীদের এ প্রশ্নের উত্তরে জানানো হল, আগুনের শিখার মত। দুই ভাই আরো বললেন, আগামী শুক্রবার ঠাকুর আবার দেখা দেবেন; সবাই যেন তাদের বাড়ীতে তাই আসে। এ নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামবাসীরা রোজ তাদের বাড়ীতে দুধ নিয়ে যেত; ঠাকুরের সামনে তা রাখা হত; এ দুধ নাকি উপচে পড়ত; তাকেই ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রমাণ বলে বলা হত। কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে বলা হত, তার দুধের রঙ নীলচে; ঠাকুরের প্রতি সে বিশ্বস্ত নয়; তার আনা দুধ নেওয়া হত না। শুক্রবার কানু সিধুর বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখার জন্য সবাই হাজির হল। তাদের কিন্তু বলা হল, সেদিন ঠাকুর দেখা দেননি; পনের দিন পরে পূর্ণিমার রাতে দেখা দেবেন। সিধু তাদের দুটো ছাপা বই দেখাল; আর কয়েক টুকরো কাগজ, এবং একটা ছুরি; বলা হল, ঠাকুরই এসব পাঠিয়েছেন। ঠাকুর বলেছেন সাঁওতালরা এবার রাজা হবে; বলদের হালের জন্য এক আনা, আর মোষের হালের জন্য দু' আনা খাজনা ধার্য হবে; মহাজনদের কিছুই দিতে হবে না, ভবিষ্যতে টাকায় এক পয়সা করে সুদ দিতে হবে; ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে; তাদের বন্দুক থেকে শুধুমাত্র জল বেরুবে। পূর্ণিমার আগেই সিধু সব সাঁওতালদেব তার বাড়ীতে আসতে বললেন।

যে চারটে বই আকাশ থেকে পড়েছিল বলে বলা হয়েছিল, যাতে ঠাকুরের সব নির্দেশ লিখিত ছিল বলে রোজ ঠাকুরবাড়ীতে পড়া হত, আসলে তা সেন্ট জন্ কথিত সমাচারের অনুবাদ। সিধুর বাড়ীর বারান্দায় তাদের পাওয়া গিয়েছিল; সেখানে বসেই সিধু নানা নির্দেশ দিতেন; বারান্দার খুব কাছেই ঠাকুরকে রাখা হয়েছিল। বইগুলো সাদা কাপড়ে বাঁধা সোনালি সুতো দিয়ে মোড়া।"

সাঁওতাল মানসিকতার রূপান্তরে অগণিত সাঁওতালদের এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিশেষ ভূমিকা আছে। দেবতার দর্শন নাই মিলুক, কিন্তু নূতন সুবা ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এক অভিজ্ঞতা। তারা সাক্ষাৎ 'সুবা-ঠাকুরের' মুখ থেকে সব শুনতে পেল। নেতাদের এ ঘোষণায় কোন গোপনীয়তা ছিল না। সাঁওতাল ছাড়াও উৎসুক অন্য সবাইকে একই কথা বলা হত। তবে সুবা-ঠাকুরের কথায় কেউ প্রকাশ্যে অবিশ্বাস প্রকাশ করলে তারা স্বভাবতই রুষ্ট হত। এক সরকারী দলিল থেকে জানতে পারি, এরকম অবিশ্বাসী এক অ-সাঁওতাল দর্শনার্থীকে নেতার নির্দেশে আটক করা হয়েছিল। সরকারী বর্ণনায় এমন কোন ইঙ্গিত মেলে না যে সাঁওতালদের অপূর্ণ প্রত্যাশার জন্য নেতাদের সম্পর্কে তাদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

(৯.৫)

সাঁওতাল মানসিকতার রূপান্তবেব দুটি বিশিষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার ঠিক পরে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের সংশয় কেটে যায় বটে; কিন্তু বিদ্রোহের মানসিকতা তখনও গড়ে উঠেনি। স্পষ্টতঃ সিধু-কানু তখনও দিখু গোষ্ঠী ও ব্রিটিশবাজের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষের কথা ভাবেনি।

নূতন রেলপথ বানানোর কাজে নিযুক্ত সাঁওতালদের তখনকাব মনোভাব সম্পর্কে টেলরের[১২৯] প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই দেখেছেন, ঐ ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে সাঁওতাল অঞ্চলে কী বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

"এর ফলে বহু সাঁওতাল রেল বানানোর কাজ ছেড়ে চলে যায়; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তারা ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাদের বলা হয়েছিল, তারা যাতে যত সম্ভব শীগগির গঙ্গা পার হয়ে চলে যায়। এরপর আবার কিছুদিন সব শান্ত। জুন মাসের (১৮৫৫) শেষ পর্যন্ত নূতন ঠাকুর সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায়নি। তখনই শুনতে পেলুম আবার ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটেছে; আর সহস্র সহস্র সাঁওতাল তাকে দেখার জন্য যাচ্ছে; লুঠতরাজ বা খুনখারাপি সম্পর্কে একটা কথাও শুনিনি।"

কেন সিধু-কানু সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়নি। তার কারণ তাদের এ গভীর বিশ্বাস, যে ভগবৎ-নির্দেশ-সম্বলিত তাদের ঘোষণার কথা জানতে পেরে ব্রিটিশরাজ, মহাজন ইত্যাদি শত্রুরা সতর্ক হবে; তাদের ভুল শুধরে নিয়ে সাঁওতালদের আর হেনস্তা করবে না। নেতাদের ধারণা ছিল, সাঁওতালদের আর্জি, আবেদন নিবেদন তারা হেলায় উপেক্ষা করেছে; কিন্তু ঐশী নির্দেশ তারা অমান্য করবে না। বিদ্রোহের কিছুদিন আগে সিধু-কানু তাদের সবাইকে পরোয়ানা মারফৎ সতর্ক করে দিয়েছিল। সম্ভবতঃ, দেবতার আবির্ভাবের পরে পরেও এসব পরোয়ানার মূল কথা সবাইকে জানানো হয়েছিল।[১৩০]

নেতাদের প্রত্যাশা বিফল হল। শত্রুরা তাদের পরোয়ানা গ্রাহ্যই করল না। সহিংস বিদ্রোহ ছাড়া আর কোন পথ নেতাদের সামনে খোলা রইল না।

(৯.৬)

বিদ্রোহের আগে সাঁওতাল মানসিকতার একটা দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্পর্কে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাঁওতালরা একই রকমভাবে

ভাবছিল। রাজপুরুষদের কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতালরা সাক্ষ্য এবং বীড্‌ওয়েল কমিশনের[১৩১] কাছে নানা জমিদার, নীলকর য়ুরোপীয় লিখিত প্রতিবেদন থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। পুনরাবৃত্তি থাকলেও আমরা বিভিন্ন ধরনের এ সাক্ষ্যের কিছু কিছু উদ্ধৃত করব। বিদ্রোহের মানসিকতা কী অল্প সময়ের মধ্যে সব সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এতে বোঝা যায়।

উদ্ধৃতিগুলি দেবার আগে এ মানসিকতার কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।

(ক) দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা সম্পর্কে সাঁওতালদের বিশ্বাস সর্বব্যাপী। কিন্তু কি ঘটেছিল তা নিয়ে নানাজনের নানা ধারণা।

(খ) নেতাদের ঘোষণায় দিব্যশক্তির অভিপ্রায় সাঁওতালদের সপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। এ শক্তির হস্তক্ষেপে প্রবল শত্রুকুলের পরাভব অনিবার্য; সীমিত শক্তি সত্ত্বেও সাঁওতালরা থাকবে অপরাজেয়।

(গ) বিদ্রোহের ফলে সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা হবে; হবে ন্যায়ধর্মের জয়, আর দিখু-শাসন-শোষণের অবসান।

(ঘ) এরই সঙ্গে ঘটবে ব্রিটিশরাজের বিলোপ। কিন্তু বহুব্যাপ্ত এ ক্ষমতার বিনাশের উপায় সম্পর্কে সাঁওতালদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

(ঙ) বিদ্রোহের ফলে য়ুরোপীয় 'সাহেব' গোষ্ঠীও নির্মূল হবে।

(চ) সাঁওতালরাজের সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল কিছু স্ব-বিরোধী। একদিকে তারা বলছে, দিখুরা নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু নেতাদের নানা ঘোষণা থেকে মনে হয় তারা শুধু চাইত, দিখুদের কাজকর্মের উপর সাঁওতালরাজের নিয়ন্ত্রণ; পুরনো কায়দায় মহাজনী কারবার চলতে দেওয়া হবে না।

সাঁওতালদের নূতন বিশ্বাসের জগৎ সিধু-কানুর ঘোষণা ও নির্দেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বলে আমরা তাদের কিছু পরোয়ানা বা নির্দেশ প্রথমে উদ্ধৃত করব।

বীরভূম ম্যাজিস্ট্রেটের লেখা (২৪শে জুলাই ১৮৫৫) এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, আগের দিন সন্ধ্যাবেলা এক বৃদ্ধা রমণী বিদ্রোহীদের সদর কার্যালয় থেকে এক পরোয়ানা এনে জেলা সদরে দিয়ে যায়।[১৩২] সম্ভবতঃ সেটা কিছুদিন আগের লেখা—বিদ্রোহ সুরু হবার (৭-১০ জুলাই) আগে তো বটেই। সিধু-কানুর স্বাক্ষরিত এ পরোয়ানার মূল ঘোষণা সাঁওতালদের তখনকার চিন্তা-ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

'বাগনাদিহির বাসিন্দা কানু ও সিধু। সিধু, কানু এবং তাদের ভাইদের বাড়ীতেই ঠাকুর দেখা দিয়েছেন। ঠাকুর যাই বলেছেন, সবটুকুই দূর আকাশ থেকে এসেছে; কানুমাঝি ও সিধুমাঝি যা বলছে, তাই ঠাকুর। ঠাকুর বলেছেনঃ "গরীব লোকেরাই যুদ্ধ করুক; কানু মাঝিকে তা করতে হবে না; ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবেন; তোমরা ঠাকুরের কাছে থেকে যুদ্ধ কর ; গঙ্গামা ঠাকুরের কাছে যাকে পাঠাবেন, তিনি অগ্নিবৃষ্টি ঘটাবেন; ঠাকুরের করুণা নিয়ে যারা থাকতে রাজী তারা যেন গঙ্গা পার হয়ে যায় ... ঠাকুরের নির্দেশ, প্রতি বলদের জন্য এক আনা প্রতি মোষের (হালের) জন্য দু আনা খাজনা ধার্য হবে। ধর্ম ও বিচারের যুগ শুরু হবে। বেধর্মী কাজ যারা করবে, পৃথিবীতে তারা আর থাকতে পারবে না। মহাজনরা পাপ করেছে; তারা অন্যায় কাজ করেছে। সব আইন কানুনকে আমলারা অকেজো করে রেখেছে; এটা সাহেবদের পাপ; সাহেবরা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নেন বটে; আসলে তাদের নায়েব সেজওয়ালরাই তদন্তটা করে; আর জোরজুলুম করে ষাট, আশী টাকা আদায় করে নেয়। এটা সাহেবদের পাপ; এজন্যই ঠাকুরের নির্দেশ দেশের শাসনভার আর সাহেবদের উপর থাকবে না। তোমরা যদি এ হুকুম না মানো, পরোয়ানা মারফত তোমাদের যা বলার আছে বলবে; তোমরা সাহেবরা যদি হুকুম মানতে রাজী থাকো তাহলে গঙ্গার অপর পারে থাকবে; না মানলে গঙ্গার এ পারে থাকতে পারবেন না। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ঝরবে; নিজের হাতেই ঠাকুর সাহেবকুলকে খতম করে দেবেন; তোমাদের বন্দুক আর গুলি সাঁওতালদের গায়েই লাগবে না; ঠাকুরই তাদের অস্ত্রের যোগান দেবেন; ... যদি তোমরা সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, দেখবে দু-দিন দু'রাত একদিন, এক রাতের মতই কেটে যাবে'।

১০ই শ্রাবণ ১২৬২ সালে ভাগনাদিহি থেকে রাজমহলের 'সাহেব'দের কাছে পাঠানো[১৩] আর একটা 'ঠাকুরের পরোয়ানা'র উপরে উধৃত পরোয়ানার বেশ কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাকি অংশটা এরকম ঃ

"... সাহেব ও গোরা সৈন্যরা লড়াই করবে; কানু ও সিধু মাঝি করবে না। ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবে। সাহেব আর সৈন্যরা তোমরা ঠাকুরের সঙ্গে লড়বে; ঠাকুরের সাহায্যের জন্য মা গঙ্গা আসবেন ... সত্যযুগ শুরু হয়েছে; সত্যিকারের ন্যায় বিচার এবার প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা সত্যভাষী নয় এই পৃথিবীতে তাদের থাকতে দেওয়া হবে না।"

"পুনঃ আমি অগ্নিবৃষ্টি ঝরাবো; ঠাকুর নিজ হাতে সব সাহেবদের খতম করবে;

তোমরা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করলেও গুলি সাঁওতালদের গায়ে লাগবে না; তোমাদের হাতি, ঘোড়া সব ঠাকুর সাঁওতালদের দিয়ে দেবেন।"

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের এক চিঠি[১৩৪] থেকে জানা যায়, বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচারিত 'ঠাকুরের' বাণী-সম্বলিত একটা চিরকুট পূর্ণিয়াতে ধরা পড়েছে। উপরে উল্লেখিত পরওয়ানার কোন কোন বিষয় এখানেও বলা হয়েছে, বিশেষ করে ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথাঃ

"ভাগনাদিহি থেকে দু'জন ঠাকুর যাবেন; ঠাকুরের নিজের নাম এসেছে আকাশ থেকে। সুবা ঠাকুর স্বেচ্ছায় যাবেন। কেষ্টঠাকুর, আর রামচন্দ্র, যার বাহু উপর দিকে তোলা—এ দুই ঠাকুর যাবেন। ঠাকুরের নিজের নামই যুদ্ধ করবে। ঠাকুরের আদেশেই রায়তেরা মাদল বাজায়; য়ুরোপীয় সৈন্য আর ফিরিঙ্গীদের মুণ্ড তিনিই কাটবেন; ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী। ঠাকুরের যুদ্ধ বার দিনের মধ্যেই শুরু হবে। ঠাকুর নিজেই এ পরওয়ানা পাঠিয়েছেন; দু'রাত একরাতে আর দুদিন একদিনে পরিণত হবে। ঠাকুরের এ নির্দেশ।"

বিদ্রোহ শুরু হবার ঠিক পরেই সাঁওতাল মানসিকতায় যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, তা বীডওয়েলের কাছে টেইলরের লিখিত প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।[১৩৫]

"জুলাই-এর ছয় বা সাত তারিখ নাগাদ আমি শুনতে পেলাম, সাঁওতালরা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করছে; তারা তখন বলতে শুরু করেছে, এবার তাদের রাজত্ব কায়েম হবে; আর বাকী সবাইকে দেশ থেকেতাড়িয়ে দেবে। তারপর খবর এল তারা দারোগা এবং আরো পনেরো-ষোল জনকে খুন করেছে ... দশই জুলাই পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের মত সাঁওতাল আমার সঙ্গে ছিল। সেদিন সবাই একসঙ্গে আমার কাছে এসে বলে, তাদের ঠাকুর খবর পাঠিয়েছে, তারা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে আসে; না হলে তাদের প্রাণ সংশয় ঘটবে; তাই তাদের যেতেই হবে। কারও সম্পর্কে তারা কোন অভিযোগ করেনি; তাদের যেতে হবে, কারণ তা ঠাকুরের হুকুম। ঠাকুরের খবর যে নিয়ে এসেছিল সে তখনও রান্না করছিল। আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু খাবার-দাবার উনুনের উপর রেখেই পালিয়ে গেছে সে। এ সাঁওতালরাই মাত্র দু' একদিন আগে তাদের জন্য ঘর বানিয়ে দিতে কতই না অনুনয়-বিনয় করেছে; বলেছে তারা গ্রাম ছেড়ে এসে শ্রীকুণ্ডে থাকবে, আর আমার জন্য কাজ করবে (রেলপথ বানানোর কাজ) এখন শুনলুম, তারা পরের দিন আমাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল ... তারা ... আরও খবর পাঠিয়েছে,

সুবাব চড়ার জন্য আমার একটি ঘোড়া তাদের চাই; ঠাকুরের নৈবেদ্য হিসেবে আমার মুণ্ডুটাও দরকার।"

তাদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকেই[১৩৬] টেলর সাঁওতালরাজের আসন্নতা সম্পর্কে তাদের ধারণার কথা জানেন।

'এসবের (বিদ্রোহ, হিংসা ইত্যাদি) কারণ, তাদের এক দেবতা নাকি সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন; তাঁর অভিপ্রায়, ভারতবর্ষের এ এলাকায় তিনি রাজত্ব করবেন।'

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নানা আঞ্চলিক অধিনায়ক ও অন্যান্য রাজপুরুষদের কাছে নন্দী সাঁওতালদের সাক্ষ্য থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, সিধু-কানুদের নানা ঘোষণা আর নির্দেশ কী গভীরভাবে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা সবাই বলেছে, সাঁওতালরাজের আসন্নতা সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সব কর্মপ্রয়াসকে উদ্দীপিত করেছে। এ ধরনের কিছু সাক্ষ্য আমরা উদ্ধৃত করছি।

বিদ্রোহ শুরু হবার দু' একদিনের মধ্যেই (৯ জুলাই) ঔরঙ্গাবাদের সাব-ডিভিশানেল অফিসার ইডেন গুপ্তচর সন্দেহে এক সাঁওতালকে আটক করেন। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে লেখা ইডেনের এ প্রতিবেদন ঃ[১৩৭]

'বিদ্রোহীরা উদ্দেশ্য হিসেবে বলছে সব য়ুরোপীয় এবং প্রতিপত্তিশালী দেশীয় লোকদের খতম করবে ... দিনে চার-পাঁচটা গ্রাম লুট করছে। তারা বলছে, এসবই ভগবানের নির্দেশে; এক শিশুর বেশে তার আবির্ভাব; তারা এ শিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়; এ শিশুই ভগবান এবং রাজার মত দেশ শাসন করবে ... প্রধান নেতার নাম সিধু, তারা ফৌজের কথা বলছে; সিপাহী এবং উচ্চপদাসীন সেনানায়ক, ফৌজের এ দুই ভাগ। স্পষ্টতঃ, এটা সুপরিকল্পিত এবং সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ ... আমার নিশ্চিত ধারণা কারো প্ররোচনা না হলে এটা ঘটতে পারত না ...।

এরপরের দিন (১০ জুলাই) ইডেন আরো কিছু জানতে পারেন।[১৩৮]

"তারা বলছে তারা সরকার বা জমিদারের জন্য কোন কাজই করবে না। জমির জন্য তারা নির্দিষ্ট একটা হারে মাত্র খাজনা দেবে ... প্রতিটি পুলিশবরকন্দাজ এবং কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত সবাইকে তারা খুন করবে বলছে।"

তিনজন সাঁওতাল নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে বলে ঃ[১৩৯] "... সিধু ও কানুর নির্দেশে তারা জমায়েৎ হয়েছে ... এ দুই প্রধান নেতা ভগবানের আদিষ্ট প্রতিনিধি ... তাদের উদ্দেশ্যে, সারা মুলুক তারা দখল করে নেবে। তারা ভালই জানত, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠানো হবে; কিন্তু সিধু কানু তাদের বলেছেন বন্দুক থেকে

শুধুমাত্র জল বেরুবে।"

বর্ধমান বিভাগের সিউড়ীর দারোগা পাঁচজন সাঁওতাল মাজিকে গ্রেপ্তার করে কমিশনারের কাছে নিয়ে আসে। তাদের সাক্ষ্য ঃ[১৮০]

"তারা আমাকে বলল, বিদ্রোহের একটা মাত্র কারণ তাদের মনের উপব সুবার (স্বাধী সাঁওতালরাজ) কল্পনার অনন্যসাধারণ প্রভাব। কানু মাঝির নির্দেশেই ভাগলপুব থেকে লোক এসে এসব কথা প্রচার করেছে। ... তারা (পাঁচ মাঝি) সুবাকে (কানু মাঝি) কখনও দেখেনি; তার নামও শোনেনি; (সুবা নামেই অনেকেই কানু/সিধুকে জানত); কিন্তু সাঁওতালরা আবার এক মহান জাতিতে পরিণত হবে এ কল্পনায় তারা পরম উল্লসিত হয়েছিল; তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, (লড়াইয়ের সময়) কেউ কেউ কাছে দাঁড়াতেই পারবে না; তাদের কেউ মরবে না; মরলেও তারা আবার জীবন ফিরে পাবে; (ব্রিটিশ) সৈন্যের বন্দুকের গুলি জল হয়ে যাবে; (তাদের) একটা ছোট ছুরিরও এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে যাতে বিশাল সংখ্যক বিপক্ষদল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

আসলে, বিদ্রোহ শুরু হবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সাঁওতালরা বিশ্বাস করতে শুরু করে সাঁওতালরাজ শুধুমাত্র অস্পষ্ট কোন ধারণা নয়, একান্তই বাস্তব সত্য।

১৯ জুলাই-এ লেখা বীরভূম ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি ঃ[১৪১] "দামিন-ই-কো এবং রাজমহল পাহাড় থেকে বিশেষ দূতেরা এসে বীরভূমের আপামর সাঁওতাল সম্প্রদায়কে রাজদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছে ... সাঁওতালরা ঘোষণা করেছে। তারা এখন সারা দেশের মালিক; য়ুরোপীয়দের তারা নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে; ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে তারা বদ্ধপরিকর। কোন গ্রাম লুঠ করার পর তারা চামড়ার তৈরি দুটো পতাকা উড়িয়ে দেয়; এটা তাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।"

'প্রত্যক্ষদর্শী'দের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা[১৮২] (১৫ জুলাই) ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের চিঠিতেও এ ধরনের ঘোষণার উল্লেখ আছেঃ "কোম্পানীর জমানা শেষ; তাদের সুবার রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে।"

নূতন রাজের সঙ্গে নূতন রাজার ধারণা অনিবার্যভাবে সম্পৃক্ত। রাজকীয়তা সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা মুর্শিদাবাদ ম্যাজিস্ট্রেটের এক চিঠি (১৩ জুলাই) থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ঃ 'জানতে পেরেছি বিদ্রোহীরা এক রাজা নির্বাচিত করেছে; তাকে পাল্কি করে তারা নিয়ে যায়; সঙ্গী পারিষদবর্গের পোষাক ও ভাবভঙ্গী রাজকীয়

মর্য্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।'[১৪৩]

সাঁওতালদের কোন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীতে 'সুবা' সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস প্রতিফলিত। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে লেখা এক চিঠিতে (৩ আগষ্ট) এ সম্পর্কে খানিকটা জানা যায় ঃ অনেক সাঁওতাল মৌর নদীর উত্তরে কোমুরাবাদে জড়ো হয়েছে। নানা জমিদারী এলাকাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে; দারোগাদের নিয়োগ করা হয়ে গেছে; ভূমিজ এবং অন্যান্য রায়তদের চাষবাস সম্পর্কে নির্দেশ জারী করা হয়েছে ... বলদ-টানা হালের উপর চার আনা, আর মোষ-টানা হালের উপর আট আনা রাজস্ব ঠিক হয়েছে।[১৪৪]

বস্তুতঃ বিদ্রোহ চলাকালে 'সুবা' সম্পর্কে প্রচার কখনও থামেনি। (এক অর্থে 'সুবা' সাঁওতালরাজ; অন্য অর্থে সাঁওতালদের রাজা)। পরে পরে সিধুকানুর মত স্থানীয় নেতাদের ও অনুগামীরা 'সুবা' ডাকত। এরকম এক সুবা তিন পাতার শালের ডাল পাঠিয়ে সবাইকে জানায় (সেপ্টেম্বর), শীগগরি সে সিউড়িতে যাবে; রায়তেরা যাতে ভয়ে না পালিয়ে যায়। এ ঘোষণা স্থানীয় সাঁওতালদের মধ্যে নূতন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বীরভূম কালেক্টর লেখেন (২২ সেপ্টেম্বর) ঃ "তারা ঘোষণাটা পেয়েছে; এর ভিত্তিতে রটিয়ে দিয়েছে, ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব শেষ; কাকেও তারা ডরায় না।"[১৪৫]

বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নেতারা খোলাখুলি সবাইকে একই কথা বলেছে; এ বিষয়ে কোন গোপনীয়তা ছিল না। অ-সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকদেরও বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ও কাজকর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। রাজপুরুষদের কাছে তাদের ও সাঁওতালদের সাক্ষ্যে বিশেষ কোন গরমিল নেই।

ঔরঙ্গাবাদের সহ-ম্যাজিস্ট্রেট (৯ জুলাই) শেখ সাম্মু নামক একজনের সাক্ষ্য নেন ঃ[১৪৬]

'ভাগনাদিহিতে মাটি ফুঁড়ে এক ঠাকুরের আবির্ভাবের ঘটনা শুনে আমি দিন তেরো আগে তা দেখতে যাই। সেখানে দেখি প্রায় হাজার সাতেক সাঁওতালের জমায়েত—তাদের হাতে ধনু, তীর আর তলোয়ার। আমি তাদের ঠাকুরের কথা জিজ্ঞেস করাতে কানু সাঁওতাল, এবং তার দুই ভাই বললেন, এ ঘরেই ঠাকুর দেখা দিয়েছেন; আমাকে লেখা এক কাগজের টুকরো দেখিয়ে বললেন, ঠাকুরই এটা তাদের দিয়েছেন; ঠাকুর আরও বলেছেন, এ মুলুক পাপে ভরে গেছে; ঠাকুর তাই তাদের রাজত্ব দিলেন; যারা তাদের শাসন মানবে না, তাদের মেরে ফেলা হবে, এবং

তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে; ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি বললুম, এ কাগজ তো ভগবান থেকে পাওয়া নয়; কোনো য়ুরোপীয়ের লেখা। এ জন্য তারা আমাকে গ্রেপ্তার করলেন..."

বন্দী সাঁওতালদের স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য, এবং অন্যান্য নানা সূত্র থেকে পাওয়া প্রতিবেদন থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় ঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে সাঁওতালদের মানসিকতায় আমূল রূপান্তর ঘটে; এবং বিদ্রোহের প্রেরণা, মূল লক্ষ্য এবং কর্মসূচী সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা মোটামুটি অভিন্ন ছিল।

(৯.৭)

কোন ঘটনা থেকে বিদ্রোহের শুরু তা নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা নেই। মতানৈক্য তার পটভূমিকা নিয়ে।

বিদ্রোহের সুরু দীঘা থানার দারোগা মহেশ দত্ত ও তার চার বরকন্দাজের খুন দিয়ে। দারোগাকে সিধুই খুন করে। গ্রেপ্তারের পর তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করে ঃ "আমি নিজের হাতে তলোয়ার দিয়ে মহেশ দত্তকে খুন করি; স্বেচ্ছায় ভগবানের নির্দেশে আমি তা করেছি।"[১৪৭]

কিন্তু কেন এ খুন, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা নানা রকম। আমরা প্রধানতঃ রাজপুরুষদের কাছে সিধু কানুর এবং কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করব। কি ঘটেছিল, সিধু কানুরই সব চাইতে ভাল জানার কথা।

এ ধরনের সাক্ষ্য থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্রিটিশরাজের 'ন্যায়-পরায়ণতা' সম্পর্কে সাঁওতালদের আস্থা যখন প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে তখন স্থানীয় পুলিশ ও মহাজনের মধ্যে গূঢ় যোগসাজসের প্রমাণ আবার তারা নতুন করে পেল। থানা কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মহাজনের মর্জিমত সব কিছু করছিল তা নয়। তাদের হাবে-ভাবে আচারে আচরণে ছিল আগের মত ক্ষমতার উগ্র আস্ফালন। থানার হুকুম না মানলে তার পরিণাম কত সাংঘাতিক হতে পারে— এ সম্পর্কে সাঁওতালদের শাসানি দেওয়া হল। আবার তারা বুঝল, থানার লোক তাদের কী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। এটাকে তারা শুধু মহাজন কেনারাম ভকত আর দারোগা মহেশ দত্তের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্রের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখল না। অসহায় সাঁওতালদের রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা তাদের মানসিকতায় এক প্রতীকী রূপ পেল ঃ তা হল গোটা ব্রিটিশরাজের ব্যর্থতা।

খুনের কারণ সম্পর্কে সিধু ও কানুর সাক্ষ্যে যথেষ্ট গরমিল কিন্তু মিল আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। তা হল, মহাজনদের কার্যকলাপ নিয়ে দারোগা ও তার বরকন্দাজদের সঙ্গে সিধু কানুদের প্রচণ্ড বচসা। তাদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের নিরুদ্ধ অন্ধ আক্রোশ চকিত খুনের মধ্য দিয়েই মুক্তি পায়। এ খুনের পরিণাম নিয়ে সাঁওতালদের কোন ভয় ছিল না। ছিল না বিন্দুমাত্র অনুশোচনা।

সিধুর সাক্ষ্য মতে[১৪৮] ঃ পাঁচকোঠী বাগান নামক এক জায়গা থেকে ফেরার পথে মহেশ দত্তর সঙ্গে তার দেখা হয়। দারোগাকে সে সরাসরি জিজ্ঞেস করে— পাঁচ বছর ধরে সাঁওতালরা মহাজনদের বিরুদ্ধে নালিশ করে আসছে; তার কাছেও আর্জিও পেশ করা হয়েছে; অথচ কোন তদন্ত তখনো পর্যন্ত হয়নি। দারোগার কাছে এর কৈফিয়ত দাবী করা যায়। দারোগা কোন সদুত্তর তো দিলই না; বরং সিধুকে গালি-গালাজ করে। এর ফলে উত্তেজনা। তারপর খুন।

কানুর ব্যাখ্যা[১৪৯] ভিন্ন ঃ দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর সিধু-কানু নানা জনের কাছে পরোয়ানা পাঠায়। জবাব দেওয়া দূরের কথা প্রাপ্তি স্বীকারও করেনি। এ অবস্থায় তাদের করণীয় সম্পর্কে সাঁওতালরা মাঝে মাঝে একসঙ্গে মিলে আলাপ-আলোচনা করত। পুলিশ এ সব জমায়েতের কথা জানতে পারে। থানার এক সেপাই একদিন এ ধরনের এক জমায়েতে আসে, এবং উপস্থিত সব সাঁওতালদের গুনতে থাকে। তাকে বলা হল, সে যাতে দারোগার হাতে পরোয়ানাগুলো দেয়; আর যাতে দারোগা ঠিক ঠিক জায়গায় সেগুলো পাঠিয়ে দেয়। সে ভয়ানক রেগে যায়। যাবার আগে শাসিয়ে যায় পরের দিন সে ফের আসবে, দারোগা আর একশ সেপাই নিয়ে। সত্যিই সে এল; সঙ্গে দু-গাড়ী ভর্তি দড়ি। সেদিন সাঁওতালদের শিকারে যাবার কথা ছিল। দরকারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। পথে পুলিস-বাহিনীর সঙ্গে দেখা। দারোগা তাদের জিজ্ঞেস করে কেন তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে। শিকারের কথা সে বিশ্বাস করেনি; বলল, তাদের আসল তলব 'ডাকাতি'। সঙ্গে যে মহাজনরা এসেছিল , তারা এ নালিশই করল। এ অভিযোগে সাঁওতালরা তীব্র বিক্ষুব্ধ হয়। যদি মহাজনরা এর যথাযথ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহলে মিথ্যা নালিশের জন্য প্রত্যেক মহাজনকে পাঁচটাকা জরিমানা দিতে হবে। দারোগা এ প্রস্তাব গ্রাহ্যই করল না। গাড়ি ভর্তি দড়ি দেখে কানু দারোগাকে বলে কি করবে সে আগে থেকে ঠিক করেই এসেছে; তাদের বাঁধার জন্যই এত দড়ি আনা হয়েছে। এর থেকেই কথা কাটাকাটি। কানু খুন করল দারোগার সঙ্গে আসা মানিকচাঁদ মহাজনকে।

বরকন্দাজদের কেউ কেউ খুন হল।

সাঁওতালদের ঘন ঘন জমায়েতের ব্যাপারটা যে মহাজনদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর সাঁওতালরা তাদের উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ্যেই বলেছে। বস্তুতঃ, মহাজনদের কাছেও পরোয়ানা পাঠিয়েছে। সম্মিলিত প্রতিরোধের জন্য সাঁওতালদের প্রস্তুতির কথা তাদের অজানা থাকার কথা নয়। তাদের ভয় ছিল, গত বছরের মত আবার তাদের উপর হামলা হবে। সম্ভবতঃ তারাই তৎপর হয়ে সাঁওতালদের উপর নজর রাখার জন্য থানা পুলিশকে বলে। দলবল নিয়ে দারোগা যখন সাঁওতালদের শাসাতে যায়, কয়েকজন মহাজন সঙ্গেই ছিল। দারোগার সঙ্গে সাঁওতালদের বচসার একটা প্রধান কারণ ঃ মহাজনদের বিরুদ্ধে তাদের এতবার নালিশেও কোন ফল হয়নি; অথচ মহাজনদের নালিশে দারোগা গাড়ী ভর্তি দড়ি নিয়ে তাদের হুমকি দিতে আসে।

বিদ্রোহ সুরু হবার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ভাগলপুরের কমিশনারও নানা সূত্র থেকে জানতে পারেন[১৫০], মহাজনদের প্রসঙ্গ নিয়েই দারোগার সঙ্গে সাঁওতালদের বাক-বিতণ্ডা শুরু। সাঁওতাল-জমায়েতের খবর পেয়ে দীঘায় থানাদার সেখানে পৌছলে সাঁওতালরা নাকি তাকে বলে বাঙ্গালী মহাজনরা তাদের উপর ভয়ঙ্কর জোরজুলুম চালাচ্ছে; তাই শাস্তিস্বরূপ মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হোক; আর যারা যারা এ জরিমানা দেবে না, তাদের ধরে এনে সাঁওতালদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক তদন্তের ফলে জানতে পারেন[১৫১], দারোগার সঙ্গে দেখা হলে সিধু তাকে জিজ্ঞেস করে, সে তার পরোয়ানার জবাব দেয়নি কেন। দারোগা নাকি বলে এর কারণ সে থানায় ছিল না। এ নিয়েই বচসা।

দীঘা থানার এক বরকন্দাজ আর এক পেয়াদা ছিল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাদের সাক্ষ্যে[১৫২] তারা খোলাখুলি বলেছে, দলবল নিয়ে দারোগার সাঁওতাল-জমায়েতে যাবার কী অর্থ হতে পারে। সিধু-কানু তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। তারা দারোগাকে সোজাসুজি বলে, তাদের বেঁধে নেবার জন্যই তার আসা। সিধু তাকে ব্যঙ্গের সুরে বলে, সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এলেই বরং ভাল করত। তর্কাতর্কির শুরু এখান থেকেই।

অন্য এক অসাঁওতাল প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে। সাঁওতালরা দারোগাকে জিজ্ঞেস করে—মতু পরেশনাথ বলে তাদের একজনকে দারোগা গ্রেপ্তার করল কেন? দারোগা বলে গত বছর কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে;

এ বছরও সাঁওতালদের নানা বেআইনী জমায়েত হয়েছে; মতুকে আটকে রাখার এই কারণ। সিধু বলে, তার ঘরেই দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে; দারোগা তাকেই বাঁধলে পারে। এভাবেই বচসার শুরু।

(৯.৮)

আমরা দেখেছি ধর্মের প্রভাবে সাঁওতাল প্রতিরোধ আন্দোলন কীভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ বিষয়ে দুটো জিনিস লক্ষণীয়। যে ধর্মীয় ধারণার ফলে এ রূপান্তর ঘটল তা অংশতঃ মাত্র পুরনো। আর অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতি সত্তা সম্পর্কে যে বোধ বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল তাও পুরনো বিশ্বাস মাত্র নয়। ধর্মবোধ ও উপজাতি-সত্তাবোধে নতুন লক্ষণের উন্মেষ ও বিকাশ লক্ষণীয়।

কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে ভগবানের আবির্ভাবের ঘটনা প্রাচীন সাঁওতালী ধর্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাঁওতাল ভগবান অদৃশ্য। এ অদৃশ্য শক্তির মূর্তরূপের কোনো উল্লেখ সাঁওতাল পুরাণে (মীথোলজী) নেই। শুধু তাই নয়, ঠাকুর যার কাছে আবির্ভূত, সাঁওতাল মানসে তিনিই রূপান্তরিত হয়ে গেলেন ঠাকুরে। সাঁওতাল-ভগবানের কোন্ কোন্ বিভূতি তার উপর আরোপিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে সাঁওতাল সমাজে এ বিশ্বাস ক্রমেই ব্যাপক হয়ে যায়, তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী। মূল ঘোষণায় সিধু কানু শুধু বলেছিল, শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের বিদ্রোহে দিব্যশক্তি তাদের সপক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু ক্রমেই এ অলৌকিক শক্তি নেতার উপর আরোপিত হয়। দিব্যশক্তির হস্তক্ষেপ যেভাবেই ঘটুক, সাঁওতাল ধর্মবোধের নূতন একটা লক্ষণ এই ছিল যে এ হস্তক্ষেপ কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ সাঁওতাল গ্রাম বা গ্রাম-সমষ্টির কল্যাণের জন্য মাত্র নয়, বা আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী থেকে পরিত্রাণের জন্য নয়; তা গোটা সাঁওতাল উপজাতির মুক্তির জন্য, এক আদর্শ সাঁওতাল সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য। নেতা কিন্তু তার প্রচারে যে ভাষা যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তা একান্তভাবেই সাঁওতাল পুরাণ, লোকগাথা ও সৃষ্টিতত্ত্বে ব্যবহৃত ভাষা ও প্রতীক। শত্রুদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ বিচ্ছিন্ন, আঞ্চলিক কোন ঘটনা নয়; এটা যেন সারা বিশ্বব্যাপী আসন্ন প্রলয়ের আভাস; কারণ 'পৃথিবী' 'পাপে' ভরে গেছে; প্রলয় আনবে নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর; আকাশ থেকে নিরবচ্ছিন্ন 'অগ্নি-বৃষ্টি'তে সাঁওতাল শত্রুকুলের বিনাশ ঘটবে; আর এ ঘোর দুর্যোগের সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যাবে; 'দু-দিন দু-

রাত্রি একদিন এক রাত্রি হবে'।

অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতিসত্তা সম্পর্কে ধারণাতেও নূতন লক্ষণ সুস্পষ্ট। পুরাণ, লোকগাথা সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা গ্রাম বা 'ক্ল্যান' এর থেকে বৃহত্তর কোন সত্তার ধারণা করতে পারত। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণাও ছিল; কিন্তু সেটা যেন অবচেতন যৌথ স্মৃতি। এ স্মৃতিও নানাভাবে ঝাপসা হয়ে যেতে পারত। পাড়ায় পাড়ায় রেষারেষি, সংঘর্ষ অবিরতই ঘটত। উল্লেখযোগ্য এই আলাদা পাড়ার আলাদা প্রতীক চিহ্ন ছিল। দিখুদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান জটিলতার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা প্রখর হতে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক অভিন্ন সাঁওতালী অস্তিত্ব সম্পর্কে বোধ শুধু এভাবে বিকশিত হয়নি।

এ বোধের বিকাশে সাঁওতাল ধর্মগুরুর সচেতন প্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যতদূর জানা যায় এ প্রচেষ্টার শুরু বিদ্রোহের প্রায় বারো বছর আগে। এ সম্পর্কে যৎসামান্য যা আমরা জানতে পেরেছি, তা এক খ্রীষ্টান মিশনারীর প্রতিবেদন[১৫৩] থেকে ঃ এ চেষ্টা এক 'মাঝি' বা 'পরগণাইত' মোগো রাজার। তার বাস ছিল দামোদরের পাশে। বারো বছরের চেষ্টায় তার শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল নিশা'য়। সংখ্যাটা নগণ্য বটে; কিন্তু তারা এক বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত। নানা অঞ্চলের সাঁওতালদের ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল প্রধান আদর্শ। নানা ধরনের যাদুবিদ্যা, তুক্‌তাকে তারা ছিল কুশলী। সংগঠন ছিল গুপ্ত; এর শক্তির একটা প্রধান উৎস নেতার প্রতি অবিচল আনুগত্য।

বিদ্রোহ পর্যন্ত এ সংগঠনের প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। সম্ভবতঃ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। এ ধরনের চেষ্টা নতুন করে শুরু হয় ১৮৫৪ সালের মে-জুনের কাছাকাছি কোন সময়। 'ডাকাতি'র অভিযোগে কঠোর দণ্ড-বিধানের পর বহু গ্রামের মর্মাহত, বিক্ষুব্ধ মাঝিরা মিলে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ করতে থাকে। কিন্তু বিশাল সাঁওতাল-অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে। তাও সম্ভব হয় সাঁওতালরাজ সৃষ্টির প্রেরণায়, এবং নতুন এক নৈতিক এবং ধর্মীয় চেতন চেতনার প্রভাবে। ধর্মগুরু কীভাবে এ চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করেছি।

(৯.৯)

দিব্যশক্তিব হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস বিদ্রোহের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও সাঁওতালরা কিন্তু সম্পূর্ণ দৈব-নির্ভর ছিল না। সামরিক প্রস্তুতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করেছে।

সংগঠনের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দিক, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ানো সাঁওতালদের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা। সম্ভবতঃ, প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল সিংভূমের সাঁওতালদের সঙ্গে। সরকারী মহল প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল সিংভূম থেকে সাঁওতালরা যাতে না আসতে পারে। কিন্তু দামিন এলাকার সাঁওতাল এবং সিংভূমের সাঁওতালদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের জন্য সরকারের এ চেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি। শেরউইলের বিবরণ থেকে জানতে পারি, দামিন অঞ্চলে যে সব সাঁওতাল সাম্প্রতিককালে বসতি স্থাপনের জন্য এসেছে, তাদের একটা বড়ো অংশ এসেছে সিংভূম থেকে[১৫৪]।

অল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্য সাঁওতাল অঞ্চলেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের এ আকস্মিকতা এবং বিপুল প্রসারে শাসককুল আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হতবুদ্ধি ভাগলপুর ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহ দমনের এক উপায় বাৎলাল। তার মতে দামিন থেকে সব সাঁওতালদের 'উন্মূলন' ছাড়া শান্তি আসবে না। "তারা একজোট হয়ে বিদ্রোহ করেছে"।[১৫৫]

অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্রোহের সপক্ষে প্রচার চালানো হয়ে ছিল। বিদ্রোহে তাদের ভূমিকা ঠিক কি ছিল তা বলা শক্ত। তবে পাহাড়িয়ারা ছাড়া কেউ সাঁওতালদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেনি।

বিদ্রোহ অতি দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এ কথায় উল্লেখের পর বর্ধমান বিভাগের কমিশনার বলেন ঃ "আরো উদ্বেগের কারণ, পাশাপাশি সব জেলাতেই এটা ছড়িয়ে পড়ছে। সাঁওতাল ধল, মানুকদের বড়ো বড়ো দল নলহাটি থেকে নান্‌গুলিয়া পর্যন্ত পাহাড়ের পাদদেশে জমা হয়েছে"।[১৫৬]

আগেই বলেছি, প্রধান ব্যতিক্রম পাহাড়িয়া উপজাতি। বিদ্রোহীদের প্রতি কোন সহানুভূতি তারা তো দেখায়ইনি; সবরকমে তাদের প্রতিকূলতা করেছে। বিদ্রোহের সুরুতেই ঔরঙ্গাবাদের সাব-ডিভিশনাল অফিসার উল্লসিত হয়ে জানায় ঃ "একমাত্র ভাল খবর, পাহাড়িয়ারা বিদ্রোহে যোগ দেয়নি"[১৫৭] রাজমহল ও ভাগলপুরের উত্তরাংশে সাঁওতাল-বিরোধী অভিযানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পাহাড়িয়াদের থেকে বিশেষ সাহায্য

পায়। সাঁওতালদের গোপন আস্তানার খবর তারাই সৈন্যদের দিয়েছিল।[১৫৮]

এটার ব্যাখ্যা সহজ। পাহাড়িয়াদের আস্তে আস্তে উচ্ছেদ করেই সাঁওতালরা নিজেদের চাষাবাদ বাড়ায়। পাহাড়িয়ারা তাই ক্রমেই পিছু হটতে থাকে; সাঁওতালদের সঙ্গে না পেরে উঠে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যায়। সাঁওতালরা তাই তাদের জাতশত্রু।

উপজাতিরা ছাড়া সাঁওতাল সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে দীর্ঘকাল গভীরভাবে সম্পৃক্ত নানা সম্প্রদায়ও বিদ্রোহীদের বিশেষ সাহায্য করেছিল। এক য়ুরোপীয় নীলকরের প্রতিবেদন মতে পাঁচটা জাতের লোকদের বিদ্রোহীরা বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি—কামার, ছুতোর, কুমোর, তেলী আর গোয়ালা।[১৫৯] বিশেষ করে কামার এবং গোয়ালা বহু জায়গায় সক্রিয় অংশ নিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র তৈরি এবং মেরামতিতে কামারের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। গ্রাম 'লুঠ' করার সময় দুটো জিনিসের উপর সাঁওতালদের বিশেষ নজর ছিল—খাদ্যশস্য ও লোহা। লুঠের লোহা তারা সঙ্গে সঙ্গে কামারকে দিত। অস্ত্রশস্ত্রের অব্যাহত যোগান এতেই সম্ভব হয়েছিল। গোয়ালারা পাহাড়ী পথঘাটের অন্ধিসন্ধি জানত; সম্ভবতঃ গোরুর পাল নিয়ে তাদের হামেশা ঘুরতে হত বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সৈন্যদলের আসার খবর তারা সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের জানিয়ে দিত।

সরকারী মহলে তাই এসব সম্প্রদায়ের উপর তীব্র আক্রোশ ছিল। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার জানান ঃ "সব পাওয়া খবর থেকে মনে হচ্ছে, গোয়ালা, তেলী ও অন্যান্য জাতের লোকেরাই সাঁওতালদের হিংসার কাজে প্ররোচিত করেছে; তারা সংবাদ যোগায়; সাঁওতালদের মাদল বাজায়; অন্য সব কাজে তাদের নির্দেশ দেয়; তাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে ... লোহারেরা তাদের তীর আর কুড়োল বানিয়ে দেয়।"[১৬০]

এ বিষয়ে শেরউইল তার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন[১৬১] ঃ "গতকাল আমি নিজে দেখেছি, গোয়ালারা খবর পাচার করছে ; আর সাঁওতালদের কাছে দই আর দুধ নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের সৈন্যদলের আসার খবর তারাই মাদল বাজিয়ে সাঁওতালদের জানিয়ে দেয় ... এ গোয়ালারাই সাঁওতালদের লুঠের জন্য নিয়ে যায়; আর দেখিয়ে দেয় কোথায় লুঠের জন্য সেরা মাল জুটবে"। অন্য এক সরকারী প্রতিবেদন মতে, গণপৎ গোয়ালা ছিল "প্রধান গোয়েন্দা ও পথপ্রদর্শক"[১৬২]। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভাগলপুরের শরিয়াহাট গ্রামের বেচু রাউত গোয়ালাকে বিদ্রোহে বিশিষ্ট অংশ

নেওয়ার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়[১৬৩]। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কানু সাঁওতাল তাকে 'সুবা' বলে মনোনীত করে; পদ-মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কানু নিজেই তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেয়। যেদিন (১৭ নভেম্বর) তাকে ধরা হয়, সেদিন এক সাঁওতাল-জমায়েতে সে সভাপতি হিসেবে কাজ করছিল।

জামতারার এক গ্রামে হানা দিয়ে সৈন্যবা যে ষাটজন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে, তার মধ্যে চল্লিশজন অসাঁওতাল। জাতিতে তারা তেলী, কুমোর, কুলওয়ার। "সর্বপ্রকার তারা বিদ্রোহীদের তাদের তৈরি জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছে। সবাই জানে, এদের সাহায্য ছাড়া সাঁওতালরা কিছুই করতে পারত না।"[১৬৪]

সাঁওতালরা জানত শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি, অন্যান্য উপজাতি বা সম্প্রদায়ের সাময়িক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে প্রবল প্রতাপশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। প্রথম থেকেই তাদের চেষ্টা ছিল কোন কোন স্থানীয় জমিদার বা বাইরের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সমর্থন ও সাহায্য যেন তারা পায়। জমিদার সম্পর্কে তারা জানত; কিন্তু সাঁওতাল-অঞ্চলের বাইরের কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কথা তারা শুনেছে মাত্র; তাদের সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। উল্লেখযোগ্য এই, তবুও নানা ক্ষীণ যোগসূত্র ধরে সাঁওতালরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। সামরিক প্রস্তুতির জন্য চেষ্টার কোন কসুর তারা করেনি।[১৬৫]

অন্যদিকে নেতারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, যাতে বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র অব্যাহত থাকে, এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও সংহতি অটুট থাকে। সব নির্দেশ আসত সিধু-কানুর থেকে। বিভিন্ন অঞ্চলের সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাদের মনোনীত প্রতিনিধির উপর। মৌখিক এবং লিখিত নির্দেশ পাঠানো হত দূত মারফত। লুঠের মাল সম্পর্কে কঠোর নির্দেশ ছিল সব কিছু যেন নেতা বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খাদ্যশস্য সম্ভবতঃ এ নির্দেশের আওতায় ছিল না। স্থানীয় বিদ্রোহীদের প্রয়োজনেই তা ব্যবহার করা হত। নেতারা বিশেষ সতর্ক ছিল, যাতে লুঠের মালের বখরা নিয়ে কোন্দল আন্দোলনের সংহতি নষ্ট না করে। পরিষ্কার বোঝা যায়, পরে পরে এ নির্দেশ সব ক্ষেত্রে মানা হয়নি।

বিদ্রোহীদের সংগঠন যতই মজবুত হোক না কেন, ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। একেবারে গোড়ার দিকে কোন কোন সাফল্যে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তারা ভাবল, অতি-প্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশবাহিনীর পরাক্রম নিষ্ফল হয়ে যাবে, সিধু-কানুর এ ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ হতে চলেছে। কিন্তু অল্প

কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে সাঁওতালদের অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির কথা কোথাও অজানা থাকল না। নেতাদের মন্ত্রপূত শরীর ব্রিটিশদের গোলাগুলিতে অক্ষত থাকবে এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেল। এসব ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সাঁওতালদের সংগঠনও ক্রমেই দুর্বল হয়ে যায়। খুদে ব্যবসায়ীরা সিধু-কানুর কাছে নালিশ জানাল, সাঁওতালরা যথেচ্ছ লুঠতরাজ করছে। নেতাদের থেকে আবার কড়া নির্দেশ এল, এসব যাতে আর না ঘটে। কিন্তু লুঠতরাজ সম্পর্কে বিদ্রোহীদের মনোভাবও তখন পাল্টে গেছে। তা আর সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির উপায় বলে গণ্য হল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল।[১৬৬]

কানু সাঁওতাল কিন্তু দৈববাণীর অমোঘতায় বিশ্বাস হারায়নি। তার ধারণা, তার ভবিষ্যদ্বাণীর নিষ্ফলতার আসল কারণ তার অনুগামীদের তার ভবিষ্যদ্বাণীর নিষ্ফলতার আসল কারণ, তার অণুগামীদের চারিত্রিক অশুদ্ধি। নির্দিষ্ট দিনে দেবতার পুনরাবির্ভাব না ঘটার কারণ হিসেবে কানু বলেছিল, দেবতার পূজার উপাচার হিসেবে সাঁওতালদের আনা দুধ বিশুদ্ধ নয়। রাজপুরুষদের কাছে বন্দী কানু বলে ঃ "অনেক গোলা পড়তে থাকে; সিধু এবং আমি দুজনেই জখম হই। ঠাকুর বলেছিলেন (ব্রিটিশের) বন্দুক থেকে জল বেরুবে ; কিন্তু আমার সৈন্যরা অপরাধ কিছু করেছে। তাই ঠাকুরের কথা ফলল না।"[১৬৭]

বন্দী সব সাঁওতালরা কিন্তু একই ধরনের সাক্ষ্য দেয় ঃ এ নিষ্ফলতা থেকে আসে চরম মোহভঙ্গ, আর তীব্র এক হতাশা বোধ। "এসব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হল। কত সাঁওতাল হতাহত হল; বাকিরা ধরে নিয়েছে, সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক।"[১৬৮] নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে কয়েকজন ধৃত সাঁওতালের স্বীকারোক্তির কথা জানানো হয় ঃ "তারা অবশ্যই জানত, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠানো হবে; কিন্তু সিধু কানু তাদের বলেছে, গাদা বন্দুক থেকে শুধুমাত্র জল বেরুবে। এটা যে কী মারাত্মক ভুল মহেশপুরে তা তারা বুঝল। একটা গোলা সিধুর বাহুতে এসে পড়ে এবং তার বুকের মধ্যে ঢুকে যায়; কানুও বুকের পাশে আঘাত পায়।"[১৬৯]

এ পরাজয়ের মুহূর্তে বিদ্রোহীদের নৈতিক বল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেল। সিধু কানুকে এদিন তারা 'ঠাকুর' বলে মেনেছে; অথচ তাদের নির্দেশ তারা এখন হেলায় উপেক্ষা করল। তাদের স্বার্থ-প্রণোদিত আচরণে সংগঠনের সংহতি প্রায় লোপ পেল। নেতাদের কঠোর শাসানিও বিভ্রান্ত অনুগামীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে পারল না। যে প্রেরণা

এতদিন সব সাঁওতাল-কর্মপ্রয়াসকে উদ্দীপিত করেছে, তার উৎস ক্রমেই শুকিয়ে এল।

(৯.১০)

১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা আবার মাঝে মাঝে সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৮৫৫-এব 'হুলে'র মতো ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেনি।

এর কারণ সাঁওতালরা নিজেরাই অংশতঃ ব্যাখ্যা করেছে। তাদের অনেকেই বলেছে 'হুলে'র নিষ্ফলতাই নতুন আন্দোলন সম্পর্কে তাদের দ্বিধার প্রধান কারণ। এ ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে জড়িত ছিল এক পরম নিশ্চিত প্রত্যয়ের বিলোপ। তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, লড়াইয়ে তারা অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। এ বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল। চোখের সামনে তারা দেখল কত শত সাঁওতাল লড়াইয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ দিয়েছে; কত গ্রাম পুড়ে ধ্বংস হয়েছে; কী বিপুল পরিমাণ শস্য সৈন্যরা নির্বিচারে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাঁওতালরা পরে বলত ঃ দিখু-দুষমণদের হাত থেকে নিস্তার পাবে বলে তারা হুলে নেমেছিল; পরিণামে তাদের ভাগ্যে জুটেছে সীমাহীন দুর্দশা; শক্ত হয়েছে দিখুদের হাত; পিতৃ-পুরুষের ভিটেমাটি তেকে কতো সাঁওতাল এখন উন্মূল; দিখুদের 'গোলামি' করে কোনরকমে তারা দিন গুজরান করছে।[১৭০]

তাছাড়া, ব্রিটিশ সৈন্যের দুর্ধর্ষ শক্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সাঁওতালদের মনের উপর এক স্থায়ী প্রভাব হয়ে রইল। তারা খোলাখুলি বলত, ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই মূঢ়তা বই কিছু নয়। ১৮৭৪ সালের বিদ্রোহের নেতা ভগীরথ মাঝি বলেছিল ঃ 'নির্বোধ আমি মোটেই নই; আমি দুটি মাত্র আঙুল যদি তুলি তারা (ব্রিটিশেরা) পাঠাবে পুরো এক পল্টন।'[১৭১] ভগীরথ-অনুগামীদের বানানো নূতন মন্দির যখন সৈন্যরা এসে ভেঙ্গে দেয়, মন্দিরের সাঁওতাল পাণ্ডা খুবই 'বিষণ্ণ' হয়; 'অবাক' আর 'বিরক্ত' হল গ্রামের মাঝি; কিন্তু সবাই বলল, 'আচ্ছা, সরকারকা হুকুম'।[১৭২] সাঁওতাল পরগণার কমিশনারের কাছে সাঁওতালরা নাকি শপথ করে বলেছে, বিদ্রোহ করার কোন ইচ্ছেই তাদের নেই। ''আমার প্রশ্নের উত্তরে সবজায়গা থেকে মোটামুটি এক ধরনের জবাব পেয়েছি—'গতবারের বিদ্রোহ এবং তার ফলস্বরূপ আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ভুলে যাবার মত বোকা আমরা নই'।''[১৭৩]

শুধু পরাজয়ের গ্লানি, আর মোহভঙ্গজনিত হতাশাই নতুন বিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের দ্বিধা ও সতর্কতার কারণ নয়। বিদ্রোহের উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার মত শক্তিও তাদের ছিল না। এর প্রধান কারণ, 'হুলের' সময় এবং পরে তাদের যৌথ গ্রামীণ সংগঠন প্রায় ভেঙ্গে যায়। অনেক গ্রাম-প্রধান (মাঝি) প্রাণ হারিয়েছে; অনেকে

শাস্তির ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যারা গ্রামে থেকে গেল তাদের অনেকেই পুরনো মর্যাদা এবং অধিকার বজায় রাখতে পারেনি। প্রধানতঃ এটা জমিদারী এলাকায় ঘটেছে। বিদ্রোহের পরে পরেই জমিদারী পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে, প্রথমে য়ুরোপীয়-পরিচালিত জমিদারীতে, পরে অন্য জমিদারীতেও। বিদ্রোহে যেসব মাঝির সক্রিয় ভূমিকা ছিল, জমিদার স্বভাবতই গ্রামের উপর তাদের পুরনো কর্তৃত্ব খর্ব করতে চায়। তাছাড়া, তারা ভাবল, পুরনো মাঝিদের বদলে বাইরের কাউকে এনে বসালে খাজনা-বাড়ানোর কাজটা অনেকটা সহজ হয়। তারা এক নূতন ফন্দি আঁটল। তারা বলতে শুরু করলো, ক্ষমতার দিক থেকে মাঝিরা অন্যান্য অঞ্চলের অস্থায়ী ইজারাদারদের মতই; তাদের একটি মাত্র দায়িত্ব, কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে জমিদারের হাতে তুলে দেওয়া। গ্রামের নানা পালে-পার্বনে, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাদের যে বিশিষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল, জমিদার তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। জমিদার চাইল, তার মর্জি মতো মাঝিরা নতুন হারে খাজনা আদায়করুক; যদি তারা গররাজী হয়, তাহলে তাদের সরিয়ে দিয়ে বাইরের লোককে এ দায়িত্ব দেওয়া হবে। মাঝিরা এ নতুন বিধান মানেনি; তাদের সব স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা হারিয়ে তারা শুধুমাত্র জমিদারের হুকুম-বরদার হতে চায়নি। আদালত কিন্তু তাদের যুক্তি মানল না; রায় দিল, গ্রামে মাঝিদের স্থায়ী কোন অধিকার নেই।[১৭৪] ফলে, পুরনো মাঝিরা টিকে থাকুক বা না থাকুক সাঁওতালদের গ্রামীণ সংগঠনের সঙ্গে তাদের যোগ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এল।

(৯.১১)

১৮৫৫-এর হূলের অভিজ্ঞতা থেকে সাঁওতালরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসে। তা হল—সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ যথাসম্ভব বর্জনীয়। প্রতিরোধের পদ্ধতি পাল্টানো বটে; কিন্তু প্রতিরোধের পথ তারা বর্জন করেনি।

বস্তুতঃ, নানাভাবে সাঁওতালরা আগের থেকেও অনেক বেশি বিপন্ন বোধ করছিল। সংগঠিত বিক্ষোভের মধ্যে তাই তারা পরিত্রাণের উপায় খুঁজেছে— যেমন, ১৮৬১, ১৮৬৫, ১৮৭১/৭২, ১৮৭৪/৭৫ এবং ১৮৮১/৮২ সালে।

এদের কারণ বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। সংক্ষেপে উল্লেখ করব মাত্র।

হূলের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা তাদের পরম শত্রু মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ফল হল উল্টো। আগেই বলেছি, হূল সাঁওতাল সমাজ ও অর্থনীতিতে

কী নিদারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। মহাজনের শরণ তাই অপরিহার্য হল। নূতন চাষবাস তাদের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব ছিল, বিশেষ করে জমিদারী অঞ্চলে। জমিদার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাল না। তাছাড়া বিদ্রোহোত্তর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে সাঁওতাল অঞ্চলের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই দূর হয়ে যায়; ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় মহাজনরা আরো জাঁকিয়ে বসল।[১৭৫] মহাজনী-শোষণের অজস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকার এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

নূতন এক উপদ্রব জমিদারী এলাকায় উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধি। পুরনো দস্তুর সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে জমিদার খাজনা বাড়িয়ে চলল। বহু ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশেই তা করা হয়। খাজনা-বৃদ্ধিতে যাতে কোন বাধা না আসে, সেজন্য জমিদার সাঁওতাল-মাঝিদের কীভাবে অপসারিত করার চেষ্টা করে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। সাঁওতালদের চিরাচরিত অরণ্যের অধিকার নানাভাবে সঙ্কুচিত করা হল। সমগ্র সাঁওতাল সমাজ এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হয়—সঙ্কট শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিকও। যে সমাজ-সংগঠনে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক বোধ প্রতিফলিত হয়েছিল, তা বহু জায়গায় আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছিল।

আগেই বলেছি ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সাঁওতাল বিক্ষোভের একটা বৈশিষ্ট্য এর আঞ্চলিকতা। 'আঞ্চলিকতা' কিন্তু আন্দোলনের সীমাবদ্ধ প্রসার অর্থেই প্রযোজ্য। এর অর্থ এ নয় যে সাঁওতালরা শুধু বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমস্যার কথাই ভাবছিল। আঞ্চলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আন্দোলনের শুরু। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা যাই হোক, সমাধান সম্পর্কিত চিন্তা-ধারণায় ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহী মানসিকতার বিশিষ্ট ভঙ্গীগুলি বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। তাই ভৌগোলিক ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চেতনার দিক থেকে এ আন্দোলনগুলি ১৮৫৫-এর হুলের সমগোত্রীয়।

এ চেতনার দুটি বিশিষ্ট দিক ঃ সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, আর এক বাস্তব রূপায়ণের জন্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোন নেতার উপর নির্ভরশীলতা। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য আন্দোলন নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৬১ সালের বিক্ষোভ দুমকা সাব-ডিভিসনের হেশোয়া জমিদারীতে—য়ুরোপীয় ম্যানেজার বার্নসের খাজনা বাড়ানোর নানা কৌশলের বিরুদ্ধে। আগের মত এবারও সাঁওতালরা ভেবেছিল স্থানীয় প্রশাসন সাঁওতালদের হয়ে হস্তক্ষেপ

করবে। সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনার টেলরের কাছে তারা আর্জিও পেশ করে। টেলরের জবাব থেকে তাদের ধারণা হল, বার্নসকে দস্তুব-বিরোধী খাজনা বাড়ানোর চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করার কোন ইচ্ছা তার নেই। সাঁওতাল পরগণার কমিশনার নিজেই স্বীকার করেছেন ঃ 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সাঁওতালরা তার উপব বিশ্বাস হারিয়েছে ... শুধু সাঁওতাল নয়, অন্য জাতির লোকেরাও একই কথা বলছে ঃ নালিশ করা অর্থহীন ; সাহেব সব সময় বলে আগামীকাল এসো"।[১৬]

এ আশাভঙ্গ থেকেই তাদের বিক্ষোভের শুরু। প্রথমে তারা ভেবেছিল, কলকাতায় ছোটলাটের কাছে আর্জি পেশ করলে হয়ত কিছু সুরাহা হবে। কিন্তু ফল কিছু হল না। তাদের তীব্র অসন্তোষের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনের সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর কয়েকটা দিক উল্লেখযোগ্য। 'হুলের' সময়ের মত সাঁওতালরা নানা জায়গায় বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হল; পাঠানো হল তিন পাতার শালের ডাল। টেলরের ধারণা, তাদের প্রিয় নেতা কানুর এক ভবিষ্যদ্বাণীব কথা সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে ঃ "ছ' বছরের মধ্যে আবার এক বিদ্রোহ শুরু হবে; তাদের নেতা হিসেবে সে আবার ফিরে আসবে"।[১১] আসলে হুলের সময় কানুর এ ধরনের কোন ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শোনা যায়নি। সম্ভবতঃ এটা নতুন প্রচার। কিন্তু সাঁওতালদের কাছে তার আকর্ষণ প্রবল। এ আন্দোলনের নেতা সুন্দর মাঝির উপর কোন অলৌকিক ক্ষমতা আরোপিত হয়নি। সাঁওতালরা কানুর পুনরাবির্ভাবের কথাই বলেছে। হুলের শেষের দিকে কানুর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বন্দী সাঁওতালদের কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু পুরনো বিশ্বাস আবার ফিরে এল।

১৮৬৫ সালের আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব আরো স্পষ্ট। উল্লেখযোগ্য, কোন বিশেষ এলাকার সাঁওতালদের অভাব অভিযোগ থেকে এ আন্দোলন শুরু হয়নি। সরকারী মহলেরও ধারণা এর কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না।

তবে সাঁওতালদের আচার-আচরণ, প্রতিক্রিয়া থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হুলের সময় থেকে সাঁওতাল মানসিকতায় কোন কোন প্রভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। আগেই বলেছি, পরবর্তী যে কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্গে কতকগুলো ধারণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। যেমন, নেতা সাঁওতাল জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র; দৈবীশক্তির অধিকারী। একটা মূল আদিকল্প বার বার ফিরে এসেছে। বস্তুতঃ, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য সাঁওতালদের গভীর আকুতি থেকেই এ বিশেষ নেতার আবির্ভাবে তাদের বিশ্বাসের জন্ম।

১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে সাঁওতাল পরগণাব সহকারী কমিশনার জানতে পাবেন, সাঁওতাল সমাজে আবাব এক অস্থিরতা, চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। এর প্রধান রূপ দলে দলে সাঁওতালরা হাজারিবাগের দিকে যাচ্ছে; কারণ, গুজব রটেছে, হাজারীবাগের শ্রীরামপুর অঞ্চলে এক নুতন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। তার দর্শনলাভের জন্যই সাঁওতালদের এত অধীব আগ্রহ। এ নতুন দেবতা আর কেউ নয়; রামগড় সেনাবাহিনীর এক সৈনিক—কারু মাঝি। তখন অবশ্য সে আর সৈনিক ছিল না।

কানু-সিধুকে যে ধরনের দৈবীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলে বিশ্বাস করা হত এক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং লৌকিক বিশ্বাসের কোন কোন দিক এ সময়কার গুজবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, দুরারোগ্য অসুখ সারানোর ক্ষমতা আছে কারু মাঝির; সে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি, বন্ধ্যা নারী ও গোরুর প্রজনন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ[১৮] থেকে কারু মাঝি সম্পর্কে আরো কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এক কনস্টেবল রাম সহায় রামকে ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছিল কারুর হাবভাব বোঝার জন্য। সে জানতে পারে, কারুকে সবাই 'গোঁসাই' বলে ডাকত। চাঁদ মাঝি বলে এক সাঁওতালও নানা গুজব শুনে কারুকে দেখতে যায়। দু'আনা দিলে তাকে কাগজের চারটে চিরকুট দেওয়া হয়। তাকে বলা হয়, সব চাইতে বড়টি সে যেন ঘরের মধ্যে রেখে দেয়; এবং প্রতি মঙ্গলবার গ্রামে বেরুনোর সময় সঙ্গে রাখে; এতে তার মঙ্গল হবে; আর গ্রামে অসুখ-বিসুখের উপদ্রব হবে না।

কারু মাঝির কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে রাম সহায় একটা ঘটনার উল্লেখ করে। কারুর বাড়ীতে সাঁওতালদের জমায়েতে একজন উত্তেজিত হয়ে "লম্ফঝম্ফ" শুরু করে দিল। এ ধরনের উত্তেজনা ও আচরণ নাকি গতবারের 'হোলির' সময়েই দেখা গিয়েছিল। তাকে সতর্ক করে দিয়ে কারু বলে, সে যদি এরকম করতে থাকে, তাহলে তাকে বেঁধে হাজতে পোরা হবে। কারুর উদ্দেশ্য ঠিক কি ছিল জানা যায় না। তবে এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তার দর্শনার্থীর মধ্যে অন্ততঃ কেউ কেউ শুধুমাত্র আধি-ব্যাধির দাওয়াই-এর জন্য যায়নি; তারা অন্য ধরনের অসন্তোষের কথা জানাতে চেয়েছে; তাদের আচরণের মধ্যে নিরুদ্ধ আক্রোশের স্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে ঠিক্‌রে পড়ছিল।

১৮৭১ সালের বিক্ষোভে এরকম কোন অস্পষ্টতা ছিল না। এ বিক্ষোভের

পটভূমিকা নানা এলাকায় আকস্মিক খাজনা-বৃদ্ধি।[১৭৯] হেণ্ডোয়ার জমিদার উদিতনারায়ণ সিংহ বালাপাতরার নতুন জমিদার গ্রান্ট, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন শঙ্কর জমিদার, গোদার ইজারাদার, এবং আরো কেউ কেউ সাম্প্রতিককালে যথেচ্ছ খাজনা বাড়াচ্ছিল। প্রতিকারের জন্য সাঁওতালরা দুম্‌কার সহকারী কমিশনারের কাছে আর্জি পেশ করে। কোন প্রতিবিধান তো তিনি করলেনই না; নয়জন নেতৃস্থানীয় সাঁওতালকে দশটাকা করে জরিমানা করলেন; কারণ হিসেবে বললেন, সাঁওতালরা 'জোট বেঁধে নালিশ করতে এসেছে'। বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা আদালতেও নালিশ করে; কোন ফল হয়নি। প্রশাসনের এ মনোভাবে সাঁওতাল সমাজে এক তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা রটিয়ে দিল, আশু প্রতিকার না মিললে তারা ১৮৫৫ সালের মত আবার বিদ্রোহ করবে। সরকারী প্রতিবেদন মতে, ঐ সময় থেকে চতুর্দিকে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। তাদের মূল কথা, বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা লুঠতরাজ শুরু করতে চলেছে। আসন্ন বিদ্রোহের সম্ভাবনায় দিখু সমাজে সন্ত্রাসের ভাব অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পরাক্রান্ত মহেশপুরের জমিদার গোপালচন্দ্র সিংহ বরকন্দাজের সতর্ক পাহারায় নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থেকে গেল। লুঠতরাজের ভয়ে অ-সাঁওতাল গ্রামবাসী চারদিকে পালাতে থাকে। সহকারী কমিশনারের জন্য যে পাল্কির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার জন্য কোন বেহারা মিলল না, কারণ সবাই পালিয়ে গেছে।

ওখানকার সাঁওতালদের মানসিকতায় পরিবর্তনও তাৎপর্যপূর্ণ ১৮৫৫ সালে যা ঘটেছিল, এবারও তাই ঘটল। স্থানীয় দুটি নীলকুঠির সাঁওতাল শ্রমিক তাদের নেওয়া দাদন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিল। তাদের স্পষ্ট জবাব—এ মরসুমে তারা কোন কাজ করতে পারবে না; কারণ তাদের হুলে যোগ দিতেই হবে।[১৮০]

(৯.১২)

১৮৭৪ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যেকার আন্দোলন অনেক পরিণত। ১৮৬১, ১৮৬৫ এবং ১৮৭১ সালের বিক্ষোভ থেকে তা স্বতন্ত্র তো বটেই; কয়েকটা দিক থেকে তা ১৮৫৫-এর হুল থেকেও আলাদা। আমাদের পক্ষে প্রধান প্রাসঙ্গিক আলোচনা, এ সময় সাঁওতালদের ধর্ম ও রাজনীতি কীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্যের দিক থেকে আগের আন্দোলনের সঙ্গে এ সময়কার আন্দোলনের কোন পার্থক্য নেই। স্বাধীন সাঁওতালরাজের স্বপ্ন এ আন্দোলনেরও মূল প্রেরণা। ১৮৫৫-এর পর প্রায় দু' দশকের মধ্যে সাঁওতাল অর্থনীতির উপর 'দিখু দুষমণদের' কর্তৃত্ব আরো পাকা হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাপক খাজনা বৃদ্ধি, জমি ও অরণ্যে

সাঁওতালদের ঐতিহ্যসম্মত নানা অধিকারের অবিরত সংকোচন তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে দুঃসহ করে তুলেছে। স্বভাবতই, আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ আগের থেকে আরো স্পষ্ট হয়েছে।

১৮৬১-১৮৭১—এ দশকের আন্দোলনে এ রাজনৈতিক সুর খানিকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। এর একটা প্রধান কারণ আমবা আগে উল্লেখ করেছি। নেতাদের আশঙ্কা ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করবে আর ফলে ১৮৫৫ সালের মত নির্মম নিপীড়ন নীতি গ্রহণ করতে হবে। এ নিপীড়ন নীতির ভয়াবহ ফল নেতারা ভোলেনি।

১৮৭৪ সালের আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র একেবারে গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট। এর নেতা ভগীরথ মাঝি ১৮৬৮ সাল থেকেই সাঁওতালদের নানা বিক্ষোবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঐ বছর তাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়। সে নাকি রটনা করে বেড়াচ্ছিল, ব্যাপক এক সাঁওতাল বিদ্রোহ আসন্ন প্রায়।[১৮১] বাউসীর যে হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের 'অভিষেক' হয়, (২৪ জুলাই, ১৮৭৪) সেখান থেকেই সে নূতন রাজনৈতিক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। সাঁওতাল পরগণার উপ-কমিশনার বক্সওয়েল জানতে পারেন, সে জমায়েত বহু সাঁওতাল বারবার ১৮৫৫ সালের 'হুল, পুরনো সুবা, ঠাকুর, বাজ' সম্পর্কে বলাবলি করেছে।[১৮২] এক খ্রীস্টান মিশনারীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, বাউসীর মন্দিরে ভগীরথকে 'রাজা' বলে ঘোষণা করা হয়; নূতন সাঁওতালরাজের সাফল্য কামনায় প্রার্থনাও করা হয়।[১৮৩] বাউসীর মন্দির থেকে ফেরার পর সাঁওতাল মানসিকতার আমূল রূপান্তর প্রসঙ্গে এ মিশনারীর বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ ঃ তখনই ভগীরথের শিষ্যরা অনবরত বলছিল তাদের সুদিন আবার শীগগির আসছে; তাদের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে; সাহেবদের সব খতম করা হবে, বা এ মুল্লুক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে; এদেশী খ্রীস্টানদের 'অন্যলোকে' নির্বাসন দেওয়া হবে।[১৮৪]

এসব প্রচারের মধ্যে রাজদ্রোহের আভাস পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ভগীরথ এবং তার এক ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনের শক্তি এতে কমলো তো নাই; বরং ভগীরথ-অনুগামীরা নূতন নূতন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। বলা হল, তারা আর কোন খাজনা দেবে না; ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সরকারী অনুদান (প্রধানতঃ খাদ্যশস্য) তারা ফেরৎ দেবে না। খাজনা বন্ধের সিদ্ধান্ত জমিদারী ব্যবস্থার বৈধতাকে অস্বীকার করা। দুর্ভিক্ষের সময়

খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যাপারে সাঁওতালদের অভিযোগ গোড়া থেকেই। বস্তুতঃ, ভগীরথ আন্দোলনের অব্যবহিত উপলক্ষ এ বণ্টন প্রসঙ্গে প্রশাসনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাঁওতালদের প্রতিবাদ। তাদের ক্ষোভের কারণ, মহাজন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সরকারের দেওয়া ধান-চাল সহজেই পেয়ে যাচ্ছে; অথচ তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তখন থেকেই সাঁওতালদের নূতন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে করবো। ভগীরথের গ্রেপ্তারের পর তার শিষ্য জ্ঞান মাঝি এক 'দুঃসাহসিক কাজের' পরিকল্পনা নেয়। সে পরোয়ানা মারফত সবাইকে বলে, খাজনার নূতন হার চালু না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতালরা কোন খাজনাই দেবে না। সে আরো বলে এ পরোয়ানা জারী করার অনুমতি তাকে দিয়েছে 'বড় সাহেব' (অর্থাৎ কমিশনার)। জ্ঞান মাঝিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল। আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকল। নেতা হিসেবে এল ভগীরথের আর এক শিষ্য ধোনা মাঝি। রাজমহলের বড়তলা অঞ্চলে সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, সারা দেশে সাঁওতালরাজ কায়েম হয়েছে। তাকেও হাজতে পোরা হয়। এর পর আন্দোলন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে; তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় চলতে থাকে।

এ সময় থেকেই সাঁওতালরাজের প্রতীক হিসেবে 'খেরওয়ার' নামটির প্রচলন হল। স্বতন্ত্র উপজাতি হিসেবে এটাই ছিল তাদের আদি নাম।

১৮৮০-৮২-র আন্দোলনের রাজনৈতিক সচেতনতা আরো স্পষ্ট। সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার প্রচারে এখন কোন গোপনীয়তা ছিল না। সরকার তাই এ আন্দোলন সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

এক খ্রীস্টান মিশনারীর প্রতিবেদনে[১৮৫] বলা হয়েছে, খেরওয়ার নেতারা সাঁওতালদের প্রকাশ্যে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছিল ঃ "জমি আমাদেরই; আমরাই জঙ্গল কেটেছি; তাই কোন খাজনা আমরা দেব না; একজোট হয়ে আমরা ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবো।" তারা আরো বলেছিল ঃ "সাহেব এবং খ্রীস্টান গুটিকয়েক মাত্র; আমরা সাফা সাঁওতালরা সংখ্যায় কত বেশি; এদেশ আমাদেরই হবে; এ রাজ আমাদের।"[১৮৫ক] সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার এ দুর্বার সংকল্পের সঙ্গে সে সময়কার বিদ্রোহী আইরিশ কৃষক-মানসিকতার সাদৃশ্য খুঁজে পান ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার। আইরিশ কৃষকদের মতো "সাঁওতালদের (ও) স্বপ্ন, এমন দিন আসবে যখন তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ; কোন খাজনা তাদের দিতে হবে না।" কমিশনারের সিদ্ধান্ত[১৮৬] ঃ

"একটা জিনিস আগে আমরা অত ভাল করে খেয়াল করিনি ; বাইরের হাবভাব যাই হোক, ভেতরে ভেতরে সাঁওতালরা তীব্র বিক্ষুব্ধ; বড়ো এক পরিবর্তনের জন্য তারা উন্মুখ। 'খেরওয়ার' এ নাম আসলে সম্পূর্ণ নূতন এক সংগঠনের ইঙ্গিত দেয়; বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ধারণা তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে মিশে গেছে; তাদের কাছে এর আকর্ষণ প্রবল; ফলে ব্রিটিশরাজ-বিরোধী একটা সংগঠন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।"

১৮৮০ সালের অক্টোবর থেকে এ আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উপলক্ষ আদম-সুমারীর জন্য সরকারী ব্যবস্থা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল আন্দোলনের প্রকৃতি জটিল; তার লক্ষ্য অনেক সুদূরপ্রসারী। আদম-সুমারীর বিরোধিতার মধ্য দিয়ে গোটা ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের তিক্ততা, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ক্রমেই ফেনিল হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় প্রশাসন তাদের মনোভাব বোঝার আদৌই চেষ্টা করেনি। এর ধারণা, আদম-সুমারীর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার জন্যই এ আন্দোলন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়। সত্যিই আদম-সুমারী সংক্রান্ত নানা অনুসন্ধানের অর্থ সাঁওতালদের কাছে বোধগম্য ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিকদের বিচার্য বিষয় ঃ আদম-সুমারীর বিরোধিতার কারণ হিসেবে তাদের নিজেদের যুক্তি, আর এ বিরোধিতার বিশিষ্ট রূপ।

এ বিরোধিতা ছিল আসলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও এক্তিয়ারের প্রশ্ন। সাঁওতালরা বহু জায়গায় খোলাখুলি বলেছে তারা সবাই দুবিয়া গোসাঁই-এর শিষ্য; গোসাঁইজীর খাতায় তাদের নাম উঠে গেছে; তাদের নাম আবার নথিভুক্ত করার কোন অধিকার সরকারের নেই। কেউ কেউ স্পষ্ট বলেছে, তাদের গুরুর নির্দেশেই তারা আদম-সুমারীর কাজে বাধা দিচ্ছে।

এ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে দিখুদের সম্পর্কে তাদের অসহিষ্ণুতা ও অবিশ্বাসও প্রতিফলিত হয়েছে। ঐ সময়কার নানা গুজব বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।[১৮৭]

একটা গুজব ছিল, আলাদাভাবে প্রতি সাঁওতালের নামধাম লিখে নেওয়া এবং প্রতি পরিবারের ঘরবাড়িতে চিহ্ন বসানোর একটিমাত্র উদ্দেশ্য সরকার নূতন করে মাথাপিছু কোন ট্যাক্সো বসানোর ফন্দি আঁটছে। আরো একটা ধারণা ছিল, আদম-

সুমারী আসলে সাম্প্রদিক খাজনা বৃদ্ধিকে বৈধ করে নেওয়ার কূট-কৌশলমাত্র। আরেকটা গুবজব ছিল একবার যদি সরকারী খাতায় নাম ওঠে, তাহলে পরে যে কোন উদ্দেশ্যে সরকার এ নথিকে কাজে লাগাতে পারবে। কোথায় কিভাবে তারা গতর খাটবে, তাও নির্ভর করবে সরকারী মর্জির উপর। এরকম একটা ভয় ছিল, জোর করে ধরে নিয়ে তাদের যুদ্ধে পাঠানো হবে। তখনকার এক যুদ্ধক্ষেত্রে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তারা শুধু জানতো এটা তাদের মুল্লুক থেকে অনেক দূরে ; একবার সেখানে গেলে আর ফেরা হবে না। একটা ব্যাপক গুজব ছিল, সমর্থ জোয়ান সাঁওতালদের জোর করে আসামের চা-বাগানে কুলী হিসেবে পাঠানো হবে। আড়কাঠিরা ছোটনাগপুরের যেসব উপজাতীয়দের ভুলিয়ে-ভালিয়ে চা-কুলি হিসেবে পাচার করে দিয়েছিল, তাদের উপর অত্যাচারের নানা কাহিনী লোকমুখে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। চা-কুলির কাজ তাই তাদের কাছে বিভীষিকাময় ছিল। চা-বাগানে গেলে পারিবারিক বন্ধন ও সংহতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, এও তাদের আশঙ্কা ছিল। একটা কথা রটেছিল, পুরুষ সাঁওতালদের একদিকে, এবং নারী ও শিশুদের অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনও গুজব ছড়িয়েছিল, আদম-সুমারীর আসল উদ্দেশ্য তাদের খ্রীস্টান বানানো। তারা প্রকাশ্যেই বলত পাদ্রী সাহেব আসলে হাকিমদের গুরু; তাই পাদ্রী যা বলবে হাকিম তা শুনবে।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, আদম-সুমারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের জায়গাগুলিতে আগে থেকেই সাঁওতালদের নানা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আন্দোলন চলার সময় তাদের অন্যান্য অভিযোগও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কোন কোন জায়গায় অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীও আন্দোলনে যোগ দেয়; তবে সংখ্যায় বেশি নয়।

তাছাড়া এ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে 'খেরওয়ার' ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনেও নূতন উদ্দীপনা আসে। জামতারা সাব-ডিভিসনে সহস্র সহস্র বেনামী চিঠিতে সাঁওতালদের বলা হয়, তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে তাদের শুয়োর আর মুরগী মেরে ফেলে। তখন থেকে দুবিয়া গোসাঁই-এর নামও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। অনেক দূর অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা এসে হাজারিবাগে দুবিয়ার মন্দিরে জমায়েত হত। উল্লেখযোগ্য, যেসব অঞ্চল থেকে তারা আসত তাদের মধ্যে ছিল ১৮৬১ সালের ব্যাপক প্রতিরোধের কেন্দ্র হেণ্ডোয়া পরগণা।

সাঁওতালদেব আচার-আচরণেও তখন বাইরের অনেকেই এক গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করে। এক সরকারী বিবরণ মতে,[১৮৮] তাদের চোখেমুখে 'বিষাদ'ও 'উদ্বেগের' চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট; তারা যেন বিশেষ কিছুর প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ছিল; তাদের পরম আনন্দের উৎসব দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান সে বছর হলই না। জামতারা ডিভিসনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সরকার-বিরোধী মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। তারা প্রতিবাদ জানায়, আদম-সুমারীর সব ভার দেওয়া হয়েছে বাঙ্গালী তালুকদারের বাছাই লোকেদের উপর, এদের থেকে সাঁওতালরা কী নিরপেক্ষতা আশা করতে পারে। আদম-সুমারীর সঙ্গে যুক্ত মিশনারীদেরও তারা শাসায়; একজনকে তারা বলে লোক গণনার জন্য যারা গ্রামে আসবে, তাদের সবাইকে তারা খুন করবে। অন্য এক মিশনারীর ধারণায় ঃ ''কথায় ও কাজে তারা সম্পূর্ণ বিদ্রোহী।''[১৮৯] লোক গণনার সঙ্গে মিশনারীরা আর কোন সংশ্রব রাখেনি। নারায়ণপুরে বহু সাঁওতালের এক সমাবেশে নেতারা ঘোষণা করে, ১৮৫৫-এর হুলে এখানকার ঘাটোয়ালকে সাঁওতালরা যেভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছিল, সেকথা যেন আদম-সুমারীর লোকেরা মনে রাখে। কোন কোন জায়গায় পুরনো নেতারাই এ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়।

'হুলে'র পর থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত সাঁওতাল আন্দোলনে তাই কয়েকটা পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে। সহিংস পন্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে পড়লেও সাঁওতালদের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। তার প্রধান লক্ষণগুলি আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

এ আন্দোলনগুলিতে ধর্ম ও রাজনীতির যোগও প্রত্যক্ষ এবং গভীর। কিন্তু ধর্মবোধ কিভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়কে নির্ধারিত করতে পারে, এ সম্পর্কে সাঁওতালরা তখন সম্পূর্ণ নূতনভাবে ভাবতে শুরু করেছে। এদিক থেকে এ সময়কার আন্দোলনগুলি বিশিষ্ট।

নূতন ধ্যান-ধারণার মূল রূপ এই গভীর বিশ্বাস যে কয়েকটা বিশেষ দিক থেকে তাদের সমাজ ও ধর্মের আমূল রূপান্তর ছাড়া তারা 'মহান এক জাতিতে' পরিণত হতে পারবে না, আর সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও অপূর্ণ থাকবে।

১৮৫৫ সালের আন্দোলনে এ ধরনের কোন ধারণা আমরা দেখি না। আগেই বলেছি, দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর থেকেই সাঁওতালদের ধর্ম-চেতনায় নূতন লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে; যেমন তাদের এ নিশ্চিত প্রত্যয় যে, ব্রিটিশ বাহিনীর গোলাগুলি তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ তাদের জয় ঐশীশক্তি-অভিপ্রেত।

কিন্তু সাঁওতালদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস আচার, নীতিবোধ বা সামাজিক প্রথায় কোন পরিবর্তন সিধু কানু গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি। তারা শুধু বলত, নূতন ঠাকুরের পুজোর উপকরণ যেন অনাবিল হয়; অর্থাৎ তারা আচার-অনুষ্ঠানগত শুদ্ধতার উপর জোর দিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সাঁওতালদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণ হিসেবে তারা শুধু বলেছে, তাদের অনুগামীদের কোন 'অপরাধে'র জন্য এটা ঘটেছে। কী সে 'অপরাধ' তা তারা স্পষ্ট করে বলেনি।

সিধু-কানু হয়তো সাঁওতালদের চারিত্রিক শুদ্ধতার কথা ভেবেছিল। কিন্তু এ শুদ্ধতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে তাদের কোন নির্দেশ ছিল না। এ শুচিতার সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির সংযোগ সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। ১৮৬১-১৮৭১, এ দশকের আন্দোলনেও এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। ভগীরথ পরিচালিত আন্দোলনেই (১৮৭৪/৭৫) সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করা যায়। পরে তা ব্যাপক সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে সাঁওতাল অঞ্চলে বিপুল নূতন উদ্দীপনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্থানীয় জমিদার, মিশনারী এবং অন্যান্য কেউ কেউ তাদের ধারণার কথা বলেছে। একটা বিষয়ে তাদের মতৈক্য লক্ষণীয়। তারা প্রায় সবাই বলেছে, সাঁওতালরা বিশ্বাস করত, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ছাড়া তাদের বৈষয়িক উন্নতি এবং 'রাজনৈতিক অধিকার অর্জন' সম্ভব নয়।[১৯০] নানাজনের সঙ্গে কথা বলে সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনারেরও ধারণা হয়েছে, তাদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী হিন্দু-সম্প্রদায়ের শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য সাঁওতালদের মনে এক তীব্র গ্লানিবোধের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুরা তাদের হামেশাই বলত, 'বংগা' (বন্যা?) সাঁওতাল, 'বোকা' সাঁওতাল। এই হীনমন্যতার ভাব দূর করার জন্যই সাঁওতালরা ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কথা ভেবেছিল।[১৯০ক] এ সংস্কারের আদর্শ হিসেবে তারা হিন্দুদের কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার গ্রহণ করেছিল কেন, এ প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য উত্তর এই যে, একটা মাত্র বিকল্প যে সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তা হল হিন্দু সংস্কৃতি। তাছাড়া তাদের ধারণা ছিল, তাদের উপর হিন্দু-দিখুদের অব্যাহত প্রভুত্বের উৎস উন্নত হিন্দু-সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি ও আচার।

নতুন এই ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যে ব্যাখ্যা উপরে উল্লেখ করেছি, তা অংশতঃ গ্রহণীয় মাত্র। এ আন্দোলনের অন্য এক ব্যাখ্যার বিচার প্রসঙ্গে পরে আমরা এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে এ আলোচনার পদ্ধতি সংক্ষেপে

নির্দেশ করব মাত্র।

সংস্কার আন্দোলনের জটিলতা ও বহুমুখিতা এ ব্যাখ্যায় ধরা পড়েনি। সাঁওতালদের সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়ের অপমানকর উক্তি ও আচরণ সাম্প্রতিক কোন ঘটনা নয়। তাহলে এ আন্দোলন এক বিশেষ সময়ে শুরু এবং বিকাশলাভ করল কেন? হিন্দুদের আচরণ ছাড়া অন্য কিছু কি ঘটেছিল, যা এ সংস্কার-প্রয়াসকে প্রভাবিত করেছিল? এ সংস্কারকে সাঁওতালদের বৈষয়িক উন্নতির প্রধান উপায় বলে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র এর মধ্য দিয়ে বৈষয়িক উন্নতি কীভাবে সম্ভব? এ সংস্কার আন্দোলন কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন কোন ধারা? এর সঙ্গে সাঁওতালদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক কি? যদি দেখা যায় ক্রমবিকাশমান রাজনৈতিক চেতনা এ সংস্কার প্রয়াসকেও প্রবলভাবে উদ্দীপিত করেছে, তাহলে এ সংযোগ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

এ সংস্কার আন্দোলনে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এর স্রষ্টা গোদা সাব ডিভিসনের তালডিহা গ্রামের ভগীরথ মাঝির 'রাজা' হিসেবে 'অভিষেক' হয় ভাগলপুর জেলার বাউসীর প্রসিদ্ধ হিন্দু-মন্দির।[১১১] মাতাদিন বলে এক উত্তর ভারতীয় হিন্দু[১১২] 'অভিষেকে'র অঙ্গ হিসেবে তার কপালে টীকা দেয়। অন্য একটা মতানুযায়ী, টীকা দেয়, বৈষ্ণব গোসাঁই মঙ্গল দাস।[১১২ক]

সমসাময়িক নানা বিবরণ থেকে জানা যায়, সাঁওতাল অঞ্চলে যেসব বৈষ্ণব গোসাঁই প্রচারের জন্য যেতেন তাঁদের প্রভাবেই আন্দোলনের ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছে। 'বাবাজি', 'গোসাঁই' বলে তাদের লোকে ডাকত। ১৮৬৫ সালের আন্দোলনের নেতা কারু মাঝিরও পরিচয় ছিল 'গোসাঁই' বলে। সরকারী প্রতিবেদন মতে, এ বৈষ্ণব প্রচারকেরা সবাই "একেবারে নীচু জাতের হিন্দু।" সম্ভবতঃ এ জন্যই হিন্দু জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে তাদের খানিকটা ঔদার্য ছিল। তাদের প্রচারে প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের আদর্শও সাঁওতালদের আকর্ষণ করে।

সমসাময়িক বিবরণের ভিত্তিতে সাঁওতালদের নূতন ধর্মবিশ্বাস ও আচার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব।[১১৩]

নূতন ধর্মবোধের মূল ভিত্তি সাঁওতালদের উপাস্য নানা বোংগার বদলে এক ভগবানে বিশ্বাস। ১৮৮০ সালের এক সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গ্রামের মধ্যে প্রচারিত সহস্র সহস্র বেনামী চিঠিতে সাঁওতালদের বলা হয়েছে, আসন্ন বিপর্যয় এড়ানোর জন্য তারা যেন প্রতিদিন ভগবানের নাম নেয়। সাঁওতাল মাঝিদের কেউ

কেউ বলত, ভগবানের একত্বে বিশ্বাস তাদের আদি ধর্মীয় ধারণার অঙ্গ; বহু দেবতা ও বোংগার পূজার প্রচলন হয়েছে পরে; এটা তাদের আদি বিশুদ্ধ ধর্ম চেতনার বিকৃতি মাত্র। এ মাঝিদের ধারণা অনুযায়ী, সৎ মানুষদের উপর বোংগার কোন কর্তৃত্বই নেই; অসৎ মানুষদের জন্যই বোংগারা সৃষ্টি করে নানা উপদ্রব, আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশা।

সাঁওতালদের আদি ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, ১৮৫৫ সালের হুলের আগে এ ধরনের চিন্তার ব্যাপক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। সিধু কানু যে ভগবানের কথা বলত, তা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক বোংগা নয়। কিন্তু বোংগা-উপাসনা বর্জনের কথা তারা প্রকাশ্যে বলেছিল কিনা জানা যায় না। এক ভগবানে নূতন বিশ্বাস যদি সাঁওতালদের আদি বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনও হয়, তাও সাঁওতাল নেতাদের সচেতন প্রয়াসের ফল। বৈষ্ণব প্রচারকদের সংস্পর্শ এক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই প্রভাবিত করেছে।

সংস্কার আন্দোলনের অন্য দিকগুলির উপরও হিন্দু ধারণার প্রভাব অনস্বীকার্য— যেমন শুদ্ধ (সাফা) জীবনচর্যা। সাফা সাঁওতালদের কয়েকটা প্রধান করণীয় ছিল। যা কিছু অশুচি, তা বর্জনীয়। নূতন বিশ্বাস মতে, শূয়োর ও মুরগী পোষা শুদ্ধাচার বিরোধী; তাদের আশু সংহার তাই অবশ্য কর্তব্য। সাঁওতালদের নানা প্রথাসম্মত খাদ্যও পরিত্যজ্য, যেমন গরু ও শূয়োরের মাংস; নানা পালে-পার্বণে তাদের অতি প্রিয় পানীয় মদ্যকেও সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। নৈতিক চরিত্রেও সাফারা শুদ্ধ ও নিষ্কলুষ। রোজ স্নান করা ও শুচিবস্ত্র পরিধান শুদ্ধ জীবনযাত্রার অঙ্গ বলে গণ্য হত। সাফাদের কেউ কেউ কপালে ফোঁটা নিত। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক নূতন ধর্মীয় আচার পাকুড় জেলার সাঁওতালদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১৯২] এর প্রচলন করে সাঁওতাল পরগণা সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার বড়তলা অঞ্চলের এক বৃদ্ধ সাঁওতাল— চাঁদ রায়। বহু শিষ্য জড়ো করিয়ে চাঁদ তাদের কপালে 'বেলা টিকা' পরিয়ে দেয়; বৈঁচি জাতীয় এক ধরনের ফলের রসের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে টিকা দেবার জিনিস তৈরি করা হত। 'সাফা'দের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের মত উপবীত ধারণ করত। রবিবারে কোন কাজ না করার অনুশাসন সম্ভবতঃ মিশনারীদের প্রচারের ফল। তাছাড়া সাঁওতাল গুরুরা বলেছিল, যে ডাইনী-প্রথা সাঁওতাল সমাজের ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় সংস্কার আন্দোলনের আরো নানা বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে।[১৯২ক]

উল্লেখযোগ্য এই, যে শুদ্ধাচারের যে ধারণা সংস্কার আন্দোলনকে প্রভাবিত

করেছে, তা প্রধানতঃ হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারণা। শূয়োর-মুরগী পোষা, গরু ও শূয়োরের মাংস খাওয়া, মদ্যপান ইত্যাদিকে সাঁওতাল বা অন্য উপজাতিরা কখনো গর্হিত কাজ মনে করেনি, শুদ্ধাচার-বিরোধী তো নয়ই। শূয়োর ও মুরগী পোষা তাদের জীবিকার একটা প্রধান অবলম্বন। মদ্যপান তাদের যৌথ সমাজ জীবন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। 'পবিত্রতা'র নূতন ধারণা তাই সাঁওতাল সংস্কৃতি, সমাজ এবং অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

নূতন সাফা সাঁওতালদেব কাছে এসব সংস্কার শুধুমাত্র বিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না ; এগুলি ছিল দৈনন্দিন জীবন-চর্যার অপরিহার্য অঙ্গ। শূয়োর ও মুরগী মেরে ফেলার সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অতি দ্রুত বিস্তারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়।[১৯৫] এ ধরনের ঘটনা আগে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটলেও, বাউসীর হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের অভিষেকের (২৪ জুলাই, ১৮৭৪) পর থেকে এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে শুরু হয়। ভগীরথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী সাঁওতাল গুরুর মত তাকেও সাঁওতালরা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। প্রায় বারোশ' সাঁওতালের জমায়েতে ভগীরথ এ শুদ্ধির কথা বলে। এক মিশনারীর প্রতিবেদন মতে, যারা এভাবে 'শুদ্ধ' হয়নি, তাদের বাউসীর মন্দিরে এবং তালদিহার নূতন সাঁওতাল মন্দিরে উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হত না। সাধারণ সাঁওতাল পরিবারের পক্ষে শূয়োর ও মুরগী মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু ভগীরথের নির্দেশ বহু জায়গায় মানা হয়।

এ বিষয়ে গোড়ায় সাঁওতালদের কোন গোপনীয়তা ছিল না।[১৯৬] পরে যখন তারা দেখল, সরকার এটাকে সুনজরে দেখছে না, তারা সতর্ক হয়; লুকিয়ে-চুরিয়ে এসব কাজ চালিয়ে যায়; তবুও থানা-পুলিসের কাছে এ কাজ জানাজানি হয়ে গেলে তারা ওজর-অজুহাত দেখিয়ে নিস্তার পেতে চেষ্টা করে। স্বভাবতই, এ প্রাথমিক উদ্দীপনা পরে খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু নূতন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তা ফিরে আসে।

'সাফা হোর'দের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এ নূতন ধর্ম নীতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

বস্তুতঃ, নূতন বিধি-বিধান ও অনুশাসনের কঠোরতার জন্য সাফারা অন্য সাঁওতালদের থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কারণ সব সাঁওতাল নূতন আদর্শে সমানভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারেনি। দীর্ঘদিনের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার বর্জন করা

অনেকের পক্ষে সহজ ছিল না; কারণ বহুক্ষেত্রে এ বিশ্বাস ও আচার ছিল তাদের সমাজ-সংগঠনের মূল বনিয়াদ। তাছাড়া বহু জায়গায় কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তার জন্য, শূয়োর মুরগী না পুষলে তাদের সংসার চালানোই শক্ত হত, বিশেষ করে যখন জমির খাজনা অনবরত বাড়ছিল; আর তাদের দীর্ঘদিনের 'অরণ্যের অধিকার' ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল।

সাফারা এসব বুঝতে চায়নি। 'ঝুটা' সাঁওতালদের সম্পর্কে তাদের অসহিষ্ণুতা এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দস্তুর এক ব্যবধান সৃষ্টি করে।[১৯৭] সাফারা ঝুটাদের তাদের খাবার, বাসনপত্র এবং জল ছুঁতে দিত না; এক কূয়ো থেকে তারা জল তুলতো না। সমসাময়িক এক বিবরণী থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণরা ডোমদের যে চোখে দেখে, সাফারা ঝুটাদের সেভাবে দেখত। এমনকি, কোন কোন জায়গায় সাফারা 'সাঁওতাল' বা 'মাঝি' বলে তাদের পছন্দ করত না; তারা বলত, তারা 'খেরওয়ার', রামহিন্দু 'খেরওয়ার'। হিন্দুদের তারা সহ্য করতো, কিন্তু ঝুটাদের একেবারেই নয়। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সাফা ও ঝুটাদের মধ্যে কোন মেলামেশা ছিল না। কোনরকম বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল না। লক্ষণীয় এই যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ও ব্যবধানের রূপও হিন্দু বর্ণপ্রথার আদলেই গড়ে উঠেছে।

(৯.১৩)

সাঁওতালদের এ সংস্কার আন্দোলন এবং অন্যান্য উপজাতিদেরও সমধর্মী আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।[১৯৮] বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে সবগুলির বিচার সম্ভব নয়। শুধু দুটি ব্যাখ্যার সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

প্রথম ব্যাখ্যা হার্ডিম্যানের[১৯৯]—গুজরাটের এক আদিবাসী গোষ্ঠী সম্পর্কে। দ্বিতীয়টির প্রবক্তা মার্টিন ওরান্স; বিষয়, সাঁওতালদের বিশিষ্ট আন্দোলনটি, যার বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি।

হার্ডিম্যান মনে করেন : সংস্কারের আদর্শ হিসেবে উপজাতিরা যে মূল্যবোধ অনুকরণ করে, তা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মূল্যবোধ; নিম্নবর্ণের উপর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় এ মূল্যবোধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে; ব্যাপকভাবে এ মূল্যবোধ গ্রহণ করাতে উপজাতিদের একটা সচেতন লক্ষ্য আছে—এতে এ মূল্যবোধের মাধ্যমে ক্ষমতাবান সম্প্রদায় তাদের প্রভুত্ব কায়েম করার সুযোগ হারাবে।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণীয় কিনা, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এ মূল্যবোধ গ্রহণের লক্ষ্য

সম্পর্কে উপজাতিদের নিজস্ব ধারণার উপর। এ সম্পর্কে উপজাতিদের ধারণা সঠিক কি ছিল, অন্ততঃ হার্ডিম্যানের আলোচনা থেকে তা জানা যায় না। সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সাঁওতালরা স্থানীয় জমিদার, মিশনারী বা প্রশাসনের লোকদের নানা কথা বলেছে। কিন্তু তা হার্ডিম্যানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ওরান্সের আলোচনার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র।[২০০] সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ভিন্ন সাঁওতাল ও হিন্দু-সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিকাশের রূপ বিশ্লেষণ তিনি করতে চেয়েছেন, বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের রূপ। এ প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। কেন একটা বিশেষ সময়ে সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দুদের কোন কোন মূল্যবোধ ও আচার অনুকরণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

ওরান্সের মতে ঃ 'হুলে'র আগেই হিন্দু-সংস্কৃতির কোন কোন দিক সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে। সাঁওতালদের ইতিহাসে হুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শুধুমাত্র কয়েকটা অর্থনৈতিক অভিযোগ দূর করার জন্য তারা হুলে নামেনি; তাদের লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আর গোষ্ঠী হিসেবে পদমর্যাদার উন্নয়ন (rank improvement)। হিন্দুদের থেকে নেওয়া কিছু কিছু আচার থেকে এ উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়— যেমন উপবীত ধারণ, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেব 'ritual use' আতপ চাল, তেল, সিঁদুর ও গোবরের ব্যবহার। হুলের সর্বাত্মক ব্যর্থতা এ দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব নানাভাবে তখন বেড়ে যায়। এর একটা প্রধান কারণ, সাঁওতালদের নূতন উপলব্ধি যে সহিংস পথ বা অন্য কোন রাজনৈতিক উপায়ে তাদের মূল লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। রাজনৈতিক পথ পরিহার করে তারা হিন্দুদের মূল্যবোধ এবং আচার অনুসরণের মধ্য দিয়েই তাদের পদ-মর্যাদা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হল। হুলের 'ঠিক পরেই' তাই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু, যার মূল লক্ষ্য এ বিশেষ ধরনের উন্নয়ন সাধন। হিন্দুদের মূল্যবোধ গ্রহণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব, এ ধারণার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর অর্থ, সাঁওতালরা মেনে নিয়েছে, হিন্দু-দিখুরা পদ-মর্যাদায় উন্নততর, আর তারা নিকৃষ্ট। এ মেনে নেওয়াকে ওরান্স্ বলেছেন rank concession syndrome.

এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। ওরান্স সাঁওতাল সংস্কার-আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যই শুধু আলোচনা করেছেন। এর বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা

করেছেন। তিনি এমনও বলেছেন, রাজনৈতিক পন্থার বর্জন অপরিহার্য হল বলেই হিন্দু মূল্যবোধের অনুকরণ সাঁওতালদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ মনে হল।

হুলের ব্যর্থতার পর সহিংস উপায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাঁওতালদের অবিশ্বাসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তারা রাজনৈতিক পথের অন্যতম মাত্র। রাজনৈতিক পথ সর্বতোভাবে পরিহার করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে সময়কার সাঁওতাল মানসিকতার মূল লক্ষণ এ দৃঢ় প্রত্যয় যে, স্বাধীন সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা না হলে দিখুদের প্রভুত্বের অবসান ঘটবে না। অর্থাৎ যে দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতালরা তখন দিখুদের সঙ্গে তাদের জটিল সম্পর্কের কথা ভাবছিল, তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। এটা সম্ভবতঃ অনিবার্য ছিল। কারণ সাঁওতাল সমাজ অর্থনীতিতে সঙ্কটের রূপ তখন তীব্রতর হয়েছে; দিখুদের কর্তৃত্ব আরো গভীরভাবে কায়েম হয়েছে।

হিংসার পথ সাঁওতালরা যথাসম্ভব পরিহার করল, কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক পথ সম্পর্কে তারা অনবরত ভেবেছে। শত্রুর উপর যদি সরাসরি আঘাত হানা সম্ভব না হয়, তাহলে কিভাবে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা যাবে? সাঁওতাল নেতাদের ধারণা ছিল, স্বাধীন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে সংঘবদ্ধ প্রচার করতে হবে; তারা জানুক, এককালে তারা স্বাধীন 'মহান জাতি' ছিল; তাদের হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে; বহু সাঁওতালকে যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়, তাহলে দিখুরা পুরনো কায়দায় চলতে সাহস পাবে না; কারণ সংখ্যার দিক থেকে দিখুরা নগণ্য। সাঁওতালদের অতীত ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত করার একটা উপায় হিসেবে নেতারা সাঁওতালদের পুরনো নাম 'খেরওয়ার' কথাটা চালু করে। শুধু সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে দীক্ষিত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। কিছু গলদ, তা দূর করতে হবে; এক কথায় ব্যক্তির নৈতিক রূপান্তর এবং নানা ধরনের সামাজিক কু-প্রথার বিলোপের মধ্যে দিয়ে একটা নূতন সাঁওতাল সমাজ গড়ে তুলতে হবে। 'সংস্কার-আন্দোলনে'র লক্ষ্য তাই শুধু 'পদ-মর্যাদার উন্নয়ন' নয়; তা বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির একটা বিশেষ অঙ্গ মাত্র।

ঐ সময়কার সাঁওতাল আন্দোলন সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের অনেকেই নূতন সংস্কার আন্দোলন (১৮৭৪-১৮৮২) এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে নিগূঢ় সংযোগের কথা বলেছেন। তাদের এ সম্পর্কিত কিছু মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করছি।

স্থানীয় রাজকর্মচারীদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ছোটলাট টেম্পল এ সিদ্ধান্তে আসেন (৯ মার্চ ১৮৭৫) : "প্রতিটি সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা প্রধান কারণ থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে কারণটা হল খাজনা বিরোধী এক ব্যাপক মানসিকতা।"[২০১]

সাঁওতাল পরগণার কমিশনার বার্লোর[২০২] কাছে, সাঁওতাল আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালের নূতন খাজনার হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য নয়। তাঁর ধারণা (৯ মার্চ ১৮৭৫) : "শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ভগীরথের আন্দোলন শুরু হয়েছে কি হয়নি, তা আসল কথা নয়; গোড়া থেকেই এর সঙ্গে মিশে ছিল এক ধরনের আপত্তিজনক রাজনৈতিক বোধ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আন্দোলনের শুরুতে ভগীরথ নিজে বা তার নিকট অনুগামীরা বলত এমন সুদিন আসবে, যখন 'রাজ' এবং জমি হবে সাঁওতালদের; সব চাইতে বেশি খাজনার হারও হবে লাঙ্গলপিছু আট আনা মাত্র।" কমিশনারের তাই সিদ্ধান্ত ছিল[২০৩] যে নূতন সাঁওতাল মন্দিরকে ঘিরে সাঁওতাল সংগঠন গড়ে উঠেছে তাকে ভেঙ্গে দিতে হবে, এবং তার সাঁওতাল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

এক খ্রীস্টান মিশনারী (Cole) প্রায় ৯ বছর যাবৎ সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের ভিত্তিতে লিখলেন—বাইরের প্রকাশ থাকুক বা না থাকুক, ' খেরওয়ার' মানসিকতা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মত; মাঝে মাঝেই তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের "বিস্ফোরণ ঘটে; অতি সামান্য কারণেই তা ঘটেছে।"[২০৪]

যে উপলক্ষে খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু (১৮৭৪), তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন মহেশপুরের জমিদার গোপালচন্দ্র সিংহ। দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৭৩/৭৪) ধার হিসেবে দেওয়া চালের দাম সরকার যখন আদায় করে নিচ্ছিল তখন "ভগীরথ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে এ চালের দাম তারা ফেরৎ দেবে না; কারণ এ শস্য তাদের পিতৃপুরুষের সম্পত্তি; তাদের আদি নিবাসের অঞ্চল থেকে এ চাল আনা হয়েছে।"[২০৫]

খেরওয়ার আন্দোলনের অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে সাঁওতাল মানসিকতায় এক বিশেষ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন পাকুড়ের জমিদার তরেশনাথ পাণ্ডে[২০৬] : "খেরওয়ার সাঁওতালরা চেষ্টা করে, কীভাবে সব চাইতে বেশি রাজনৈতিক সুবিধাবাদী আদায় করা যায়; তারা বিশেষভাবে চায়, জমিদার বা সরকার কাকেও খাজনা দেবার দায়দায়িত্ব তাদের থাকবে না; এ বিষয়ে তাদের যুক্ত হাস্যকর; তারা বলে, জমিদার বা সরকার কেউ তো জমি সৃষ্টি করেনি; জলসেচের কোন ব্যবস্থা করেনি বা জমিও চাষ করেনি ... খাজনা ইত্যাদি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ব্যবস্থার পর থেকে

হিন্দুদের সমাজ রাজনৈতিক অধিকার পাবার জন্য তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; এমন কি তারা চাইছে, হিন্দুদের তুলনায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার বেশি থাকুক।"

খ্রীস্টান মিশনারী কোলের ধারণা খেরওয়ার আন্দোলন "আসলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের আন্দোলন। (আয়ারল্যাণ্ডের) ফেনিয়ান আন্দোলনের সঙ্গে এর বহু বিষয়ে মিল; ধর্ম এখানে আবরণ মাত্র; খেরওয়ার দল বহির্ভূত সাঁওতাল এবং (স্থানীয়) খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের মতে সাফাহোরেরা বলাবলি করে—"জমি আমাদের; আমরা জঙ্গল সাফ করেছি; তাই কোন খাজনা আমরা দেব না; আমরা একজোট হয়ে ইংরেজদের তাড়াব।"[২০৭]

জামাতারার আর এক মিশনারী কর্নেলিয়সেরও ধারণা, খেরওয়ারদের আসল লক্ষ্য, "সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করা।"[২০৮]

সাঁওতাল পরগণার সরকারী কমিশনার লক্ষ্য করেন,[২০৯] কিভাবে ধীরে ধীরে খেরওয়ার আন্দোলনের রূপান্তর ঘটল ঃ "গোড়ায় খেরওয়ার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ধর্ম সম্পর্কিত।" ভগীরথের আমলে "তা এক রাজনৈতিক রূপ নিল; আন্দোলনের নূতন শক্তি যোগাল খেরওয়ার স্বর্ণযুগের কল্পকাহিনী; যেখানে তারা পাবে তাদের মনোমত নেতা (শাসক) আর পাবে অপর্যাপ্ত জমি, যার জন্য কোন খাজনা দিতে হবে না; হুমকি আর শাসানি দেবার জন্য থাকবে না কোন হাকিম।"

কিভাবে এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খেরওয়ার আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, সাঁওতাল পরগণা-প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কোসেরাট তা ব্যাখ্যা করেন।[২১০] খাজনার হার নিয়ে সাঁওতালরা বরাবর বিক্ষুব্ধ ছিল। ১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় একজোট হয়ে তারা জমিদারের যথেচ্ছ খাজনা বাড়ানোর চেষ্টায় বাধা দেয়। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সরকার ১৮৭২ সালে এক আইন পাস করে খাজনার নূতন হার ঠিক করার ব্যবস্থা নেয়। বহু জায়গায় ফল হল বিপরীত। সাঁওতালদের অসন্তোষ বেড়েই চলে। কোসেরাট লক্ষ্য করেন ঃ "এর ঠিক পরেই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু ... আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ... জমি ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যাপক উত্তেজনা ও অসন্তোষ না থাকলে আন্দোলন এত দ্রুত বাড়তে পারতো না। খেরওয়ার আন্দোলনের গুপ্ত, পবিত্র (ধর্মীয়) লক্ষ্য কি ছিল জানি না; কিন্তু খোলাখুলিভাবে রাজকর্মচারীদের কাছে বার বার তারা যে লক্ষ্যের কথা বলেছে, তা হল এই যে কোন ধরনের ট্যাক্সো বা খাজনা তারা আর দেবে না; রাস্তাঘাট সারানোর জন্য তারা বেগার খাটবে না;

সাঁওতাল পরগণায় এ ধরনের বেগার খাটা চাষীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ... আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে ভগীরথ বলল, খাজনা ব্যাপারটাই থাকবে না; কিন্তু এ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সাঁওতালদের পুবনো ধর্মকে সম্পূর্ণ ছেড়ে হিন্দুধর্মের সমগোত্রীয় কোন ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে।"

এ বিশেষ রাজনৈতিক মেজাজের জন্যই হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও আচারের কিছু কিছু গ্রহণ করলেও সাঁওতালরা মনে প্রাণে সাঁওতাল থেকে গেছে। বস্তুত, তারা হিন্দু হতে চায়নি; তারা শুধু বিশ্বাস করেছিল, হিন্দুমূল্যবোধ গ্রহণের ফলে দিখুদের প্রভুত্বের বদলে সাঁওতাল-রাজপ্রতিষ্ঠা সহজ হবে। সংস্কার-আন্দোলনের ফলে 'সাফা' সাঁওতাল ও 'ঝুটা' সাঁওতালদের মধ্যে নূতন এক ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও ব্যবধানের সৃষ্টি হল। কিন্তু তা হিন্দু জাতিভেদ প্রথা প্রসূত বৈষম্য বা ব্যবধান নয়। এ ব্যবধানের কারণ ঝুটাদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে 'সাফা'দের তীব্র অসহিষ্ণুতা তাদের ধারণা ঝুটাদের সংস্কার-বিরোধিতা নূতন সাঁওতাল সমাজ সৃষ্টির পথে বড়ো এক অন্তরায়। সাফাদের কেউ কেউ উপবীত ধারণ করেছিল; কিন্তু তাও হিন্দু বর্ণবৈষম্যের প্রতীক নয়; খেরওয়ার নেতারা কেউ কখনও বলেনি যে উপবীত ধারণের অধিকার সবার নেই। সাঁওতাল রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবেগ মন্থর হয়ে এলে বহু সাঁওতাল তাই আবার তাদের আদি ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যায়। তাছাড়া, সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছিল বলে হিন্দু দিখুদের সম্পর্কে তাদের প্রকাশ্য বৈরিতা কখনও কমেনি। এ বৈরিতা শুধুমাত্র শ্রেণীবোধের ফল নয়; অর্থাৎ যে দিখু গোষ্ঠীদের তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ বলে ভাবত শুধু তাদের ক্ষেত্রেই এ বৈরিতা সীমাবদ্ধতা ছিল না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। ডাল্টনের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (১৮৭২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১১১] হিন্দু পাচকের রান্না ভাত সাঁওতালরা কোনোরকমে খেতে রাজি হয়নি; এমন কি পাচক ব্রাহ্মণ হলেও নয়। অথচ ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সাঁওতালদের এ মনোবাব দেখা যায়নি। অনশনক্লিষ্টদের মধ্যে সরকার তখন যে খাবার বিলিয়েছে, তার সবটাই ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না।

সাঁওতাল মানসিকতার এ জটিলতা বৈচিত্র্য এবং বহুমুখিতার দিকগুলি উপেক্ষা করলে সাঁওতাল আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণের কাজ অসম্পূর্ণ হবে।

(৯.১৪)

১৮৫৫ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সাঁওতালদের ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগ সম্পর্কে আমাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি আবার সংক্ষেপে নির্দেশ করব।

(ক) ১৮৫৫ সালের হুলের উপর প্রধান প্রভাব ছিল বেতার আবির্ভাবের ঘটনা। হুল দিব্যশক্তি নির্দেশিত; তাই সাঁওতালদের জয় অনিবার্য—এ বিশ্বাস অল্প সময়ের মধ্যে গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের মূল প্রেরণা এবং সংগঠনের প্রাণশক্তি এ বিশ্বাস।

যে ধর্মীয় ধারণা এ বিশ্বাসের উৎস তা আগেকার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আর অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতিসত্তা সম্পর্কে যে বোধ বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তাও পুরনো বিশ্বাস মাত্র নয়।

সাঁওতালদের জয় অনিবার্য, এ নৈতিক বিশ্বাস ব্রিটিশবাহিনীর অবিরত সাফল্যে এবং তাদের অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেল। এক তীব্র হতাশাবোধ এবং বিভ্রান্তি বিদ্রোহীদের সংহতিবোধকে দুর্বল করে দেয়। পাগলপন্থী আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা যা বলেছি[১১২] তা এখানেও খাটে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে বিদ্রোহীদের সচেতনতা থেকে এ বিশিষ্ট ধর্মবোধের জন্ম নয়। জয় অনিবার্য, এ বিশ্বাসের বলেই তারা হুলে নেমেছিল। এবং এ বিশ্বাসের উৎস এক বিশেষ ধর্মচেতনা। পরাজয়ের রূঢ় অভিজ্ঞতা থেকে তারা সঠিক বুঝতে পারে, ব্রিটিশ শক্তির তুলনায় তারা কতো হীনবল।

(খ) ১৮৬১-১৮৭১, দশকে সাঁওতাল মানসিকতায় এক পরিবর্তন আসে। তারা সহিংস পন্থায় বিশ্বাস হারাল। কিন্তু ১৮৫৫ সালের আগের মত প্রধানতঃ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের অভিযোগের প্রতিকার খোঁজেনি। 'হুলে'র নানা প্রতীক অনুসঙ্গ তাদের চেতনায় গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল—যেমন স্বাধীন সাঁওতালরাজের স্বপ্ন; উপজাতি হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে নূতন বোধ; এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ইতিহাস-চেতনা, এবং বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার উপর নির্ভরশীলতা। একান্ত আঞ্চলিক আন্দোলনেও নূতন চেতনার এ লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট ছিল।

(গ) ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২—এ পর্বে ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগে নূতন দিক দেখা যায়। সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্মের ভূমিকা নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা হল। সিধু-কানু নূতন আবির্ভূত দেবতার পুজোয় শুদ্ধ উপকরণের কথা শুধু বলেছিল।

সাঁওতালরাজ সৃষ্টিতে তাদের পুরনো ধর্ম-বিশ্বাস বা আচারে পরিবর্তনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কিছু বলেনি। খেরওয়ার আন্দোলনেই প্রথম ধর্ম ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য যোগের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। বহু পুরনো বিশ্বাস, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচার, রীতি নির্মমভাবে পরিত্যাগ করে নূতন বিশ্বাসে দীক্ষিত সাঁওতালরা। এখানেও দেখতে পাই, প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে তারা অনেক দূর সরে এসেছে। খেরওয়ার আন্দোলনের ভাবাদর্শের ভিত্তি বৈষ্ণব গোঁসাইদের ধর্মীয় (ও সমাজ) দর্শন যার মূল কথা এক ভগবানে বিশ্বাস ও 'শুদ্ধ' জীবন-চর্যা। আসলে 'শুদ্ধতা'র ধারণা মূলতঃ হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারণা।

কিন্তু নূতন ভাবাদর্শের প্রভাবে সাঁওতালরা উপজাতি হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্রবোধ হারায়নি। বরং এ বোধ প্রখরতর হয়েছে; কারণ নূতন ভাবাদর্শ গ্রহণের মূল প্রেরণা রাজনৈতিক। এ রাজনীতির মূল লক্ষ্য সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের রূপায়ণ। এর প্রভাব সাফা সাঁওতালদের সংগঠনেও সুস্পষ্ট। সাফারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মোটেই ছিল না। কিন্তু এক গভীর বিশ্বাসের প্রেরণা ছিল নূতন সংগঠনের প্রাণশক্তি। স্থানীয় প্রশাসনও অকপটে স্বীকার করেছে,[২১৩] স্বভাবে, আচারে, আচরণে, সাফারা অন্য সাঁওতালদের থেকে অনেক উন্নত। "ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা যত্নবান ও নিয়মনিষ্ঠ"; কোন প্রকার শিথিলতা তাদের চরিত্রে দেখা যেত না। "নিঃসন্দেহে তারা অনেক বেশী বুদ্ধিমান।" "তাদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন সুদৃঢ়; যেভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পেরেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে নিপুণভাবে।"

কিন্তু সব সাঁওতাল সাফাদের কঠিন অনুশাসন মানতে পারেনি। এর ফল সাফা ও ঝুটা সাঁওতালদের মধ্যে ক্রমপ্রসারমান সামাজিক ব্যবধান ও দূরত্ব। আন্দোলনের গতিবেগ যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখনও কিন্তু এ ব্যবধান কমেনি; বরং গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা আরো প্রকট হয়েছে।[২১৪]

(১০)

মুণ্ডা আন্দোলনে ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা দেখতে পাই এর একেবারে শেষ পর্যায়ে— আগস্ট ১৮৯৫ থেকে জানুয়ারি ১৯০০ পর্যন্ত। তখনকার আন্দোলনের অবিংবাদিত নেতা বীরসা মুণ্ডা; এর প্রধান প্রেরণা তার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, তার নূতন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। ১৯০০ সালের পর ব্যাপক সংগঠিত মুণ্ডা আন্দোলন আর

দেখা যায়নি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর প্রভাবে আবার নূতন করে সাড়া জাগে; মুণ্ডারাজের স্বপ্ন আবার তাদের উদ্দীপিত করে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া ১৮৯৫-১৯০০, এ সময়কার আন্দোলনের সঙ্গে তা মোটেই তুলনীয় নয়।

বীরসার আন্দোলন কিন্তু মোটেই আকস্মিকভাবে শুরু হয়নি। যে বিশেষ মুণ্ডা মানসিকতার পরিমণ্ডলে এ আন্দোলনের বিশিষ্ট রূপটা বিকাশলাভ করে তার কিছু কিছু উপকরণ আগেই তৈরি হয়েছিল। তাই আগের কয়েক দশকের মুণ্ডা ইতিহাসের মূল প্রবাহ্ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তবে বীরসার নেতৃত্ব ছাড়া মুণ্ডা আন্দোলন এ রূপ নিতে পারতো না। যে ধর্ম মুণ্ডা প্রতিরোধ আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা তাদের প্রাচীন ধর্ম নয়। এর মূল ধারণাগুলির উৎস নানা ধরনের। বীরসাই প্রথম বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলিকে এক সুসংবদ্ধ দর্শন হিসেবে মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচার করে।

বীরসা আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণে ১৮৯৫ এর আগের চারদশকের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক। এর ধারাবাহিক বিবরণ[১১৫] বর্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। এ আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে যে মুণ্ডা মানসিকতার বিকাশের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তার সৃষ্টিতে এ সময়কার ইতিহাসের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এর কয়েকটা প্রধান দিক শুধু নির্দেশ করবো।

চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (ক) নানা ঘটনার সংঘাতে তখন মুণ্ডাদের এ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, জমিতে তাদের দীর্ঘকালের প্রথাসম্মত অধিকারের উপর বহিরাগতদের[১১৬] অবিরত আক্রমণ প্রতিহত করার একটি মাত্র উপায় মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা (খ) এ প্রত্যয়ের মূল ভিত্তি ছিল একটা নূতন ধারণা—তা হল, ব্রিটিশ আইনকানুন, আদালত-কাছারি, প্রশাসনের উপর নির্ভর করা অর্থহীন। এ বোধ এ সময় ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুণ্ডামানসিকতার এ দিক কিন্তু জটিল। স্বাধীন রাজের স্বপ্ন মুণ্ডাদের সব প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু ব্রিটিশরাজের সম্পূর্ণ অপসারণ বা বিনাশের কথা তারা স্পষ্টভাবে তখনো বলেনি। (গ) খ্রীস্টান মুণ্ডাদের থেকে নূতন এক ধরনের নেতৃত্বের আবির্ভাব তখন ঘটে। শুধু নূতন নেতা নয়; মুণ্ডাদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন ধারণা তাদের অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করে। মিশনারীদের প্রভাব যেভাবে কার্যকরী হয়, তাও জটিল। বীরসা আন্দোলনের আগে এ প্রভাবের যা রূপ, পরে তা আমূল পাল্টে যায়। মিশনারী প্রচারের মধ্যেই বীরসা খুঁজে পেয়েছে এ বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দর্শনের বীজ। এ দৃষ্টিকোণ্ থেকে কিন্তু মিশনারীরা কখনো

বাইবেলের বাণী প্রচার করেনি। (ঘ) সাঁওতাল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব মুণ্ডা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বীরসার ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাতে এ প্রভাব সুস্পষ্ট।

আলাদা আলাদাভাবে এ দিকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

(ক) স্বাধীন রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে 'জমিদার'দের মুণ্ডা-পীড়ন কখনও বন্ধ করা যাবে না মুণ্ডাদের এ ধারণার পটভূমিকায় রয়েছে বহিরাগতদের প্রভুত্বের ক্রমাগত প্রসার। অথচ মুণ্ডারা বুঝে উঠতে পারেনি, কোথায় এর শেষ। দৈব উপায়ে এর কোন প্রতিকার মেলেনি। মুণ্ডারা তাই ভাবল, বিক্ষিপ্তভাবে কোন বিশেষ জমিদারকে বাধা দিয়ে স্থায়ী কোন ফল হবে না; স্থায়ী প্রতিকারের উপায় জমিদারগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অপসারণ। মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

'জমিদারী' প্রভুত্বের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল। ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে কোল বিদ্রোহকেও সাঁওতাল হুলের মত আত্মঘাতী প্রয়াস বলা যেতে পারে। এ বিদ্রোহের ফল একটা বড়ো বিপর্যয়ের মত। সরকারী মহলেরও নিশ্চিত ধারণা, বিদ্রোহের পরই মুণ্ডাদের শত্রুরা ব্যাপকভাবে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে নেয়। বস্তুতঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত মুণ্ডাদের কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়নি। বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সাময়িক বিলোপের পূর্ণ সুযোগ নেয় জমিদাররা। কিন্তু মুণ্ডারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। নূতন খ্রীস্টান মুণ্ডাদের নেতৃত্বে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুণ্ডা আন্দোলনে মিশনারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা পরে আবার আলোচনা করব। সিপাহী বিদ্রোহের শেষে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে প্রশাসন মুণ্ডাদের প্রতিরোধ দমনে ব্যবস্থা নেয়। আসলে, জমিদার-বিরোধী পরবর্তী আন্দোলনের ব্যর্থতারও প্রধান কারণ এ ধরনের পুলিসী হস্তক্ষেপ। এর অনিবার্য ফল, জমিদারী কর্তৃত্বের প্রসার।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনে এ প্রসারের প্রধান রূপগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করলেই চলবে। (১) গ্রামপত্তনকারী মুণ্ডা পরিবারের বংশধরদের 'ভুঁইহারী'[২১৮] জমি জমিদার নানা কৌশলে এবং অছিলায় আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিয়ে নিজেদের খাস জমি 'মাঝিহাসে'র অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে মুণ্ডাদের তীব্র সংঘর্ষের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এক তদন্তের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য, গ্রামের কোন্ জমি সত্যিকারের ভুঁইহারী তা ঠিক করা।[২১৯] মুণ্ডাদের অভিযোগ এ তদন্তে তাদের কোন উপকার হয়নি। হারানো জমি সম্পর্কে কোন তদন্তই হয়নি। তাই সেগুলি ফেরৎ পাবার প্রশ্নই ছিল না। তারা আরো বলে, তদন্তকারীদের সঙ্গে

জমিদারের গোপন যোগসাজসের ফলে তাদের দীর্ঘকালের স্বীকৃত ভুঁইহারী জমিও মাঝিহাস বলে নথীভুক্ত হয়ে যায়। প্রায় দু'দশক ধরে 'সর্দারী লড়াই'য়ের এটাই হল পটভূমি। (২) মুণ্ডাদের 'রাজহাস'[২২০] জমিতে খাজনার হার অনবরত বেড়ে যাচ্ছিল। (৩) শুধুমাত্র খাজনা চুকিয়ে দিলেই জমিদারদের কাছে মুণ্ডাদের দায়দায়িত্ব শেষ হত না। জমিদার নানা ধরনের বেগার শ্রম দাবী করতো।[২২১] উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ শ্রমের পরিমাণ নানা কারণে বাড়তে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় জমিদারবিরোধী আন্দোলনের একটা প্রধান কারণ ছিল এটা। তখন অনেক কৃষিপণ্যের মত শ্রমের মূল্যও বেড়ে যায়। শ্রমবাবদ বাড়তি খরচ বাঁচানোর জন্য জমিদার বেগারীর পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে এ ধরনের চেষ্টার কারণ ভিন্ন। আগেই বলেছি মাঝিহাস জমির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছিল। তাছাড়া কৃষিপণ্যে মূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য জমিদার চাইত এসব খাসজমি প্রজাবিলি না করে নিজেদের তত্ত্বাবধানে চাষ করিয়ে নিতে। বেগারীর একটা রূপ ছিল, বিশেষ বিশেষ মরসুমে চাষের কাজের জন্য জমিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম মুণ্ডাদের থেকে আদায় করে নিত। এখন এর পরিমাণ না বাড়ালে তাকে মজুরী দিয়ে প্রয়োজনীয় শ্রম যোগাড় করতে হত। কোন কোন অঞ্চলে অতিরিক্ত শ্রমের দাবী না মিটলে খাস জমির চাষাবাদ কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ জোতজমা হারিয়ে এবং অন্য কারণে অনেক মুণ্ডা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়; ফলে, গ্রামে শ্রমের সামগ্রিক যোগান কমে যায়।

খাজনা, বিশেষ করে বেট-বেগারীর বোঝা, মুণ্ডাদের কাছে ক্রমেই দুর্বহ হয়ে উঠছিল। জোতজমা হারানোর ফল আরো ভয়াবহ। এর অর্থ শুধুমাত্র জীবিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নয়; যে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে হৃতসর্বস্ব মুণ্ডা এতদিন লালিত পালিত হয়েছে, তার সঙ্গে ঘটল পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ। সে একে অধিকতর বিপর্যয় মনে করত।[২২২] মুণ্ডারা বিশ্বাস করত, মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাদের সংযোগ নানাভাবে অব্যাহত রয়েছে। একটা যোগ, যে গ্রামে পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘকাল বাস করেছে, যেখানে তাদের কবর যার মাটিতে তাদের পূতাস্থি প্রোথিত রয়েছে, সেখানেই মৃত্যুর পর সব বংশধরদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। জোতজমা হারিয়ে দূরে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার অর্থ এ আত্মিক যোগের বিনাশ।

জমিদারি ক্ষমতার অব্যাহত বিস্তার প্রতিহত করার কোন উপায় মুণ্ডাদের ছিল না। এ পটভূমিকায় মুণ্ডা মানসিকতায় নূতন এক লক্ষণ প্রকাশ পেল; তাদের নিশ্চিত এ প্রত্যয় জন্মাল যে সরকার এবং তাদের মধ্যে যে বিরাট মধ্যবর্তী গোষ্ঠী

ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে তার সম্পূর্ণ অপসারণ ছাড়া তাদের মুক্তি নেই। সরকারের কাছে নানা আর্জিতে এবং অন্যভাবে তাদের এ বিশ্বাস এবং সংকল্পের কথা তারা বারবার বলেছে। প্রশাসনেরও শেষ সিদ্ধান্ত তাই এই ছিল যে, দুই বিবদ্‌মান গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনরকম আপোষ সম্ভব নয়, যদি না 'আমূল কোন পরিবর্তন' ঘটে।[২২৩]

মুণ্ডারা তাদের অধিকার সম্পর্কে নানা জনের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। এমনকি, কলকাতার এক আইনজীবীর সঙ্গেও তারা যোগাযোগ করেছিল।[২২৪] তার মত তারা সরকারকে সরাসরি জানিয়েছে। তার মত ছিল মুণ্ডারাই জমির আসল মালিক, কারণ তাদের শ্রমের ফলেই জমি চাষযোগ্য হয়েছে। মুণ্ডারা অবশ্যই জানত, তারাই পতিত জমিতে ফসল ফলিয়েছে; তারা নূতন নূতন গ্রামপত্তন করেছে। আইনজীবীর মত তাদের এ ধারণা দৃঢ় করল মাত্র; বিশেষ করে তাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে, শুধুমাত্র মুণ্ডা সমাজের প্রাচীন প্রথার কথা আদালত কানে নেয় না; আদালতকে বোঝাতে হবে, আইন কি বলে।

মুণ্ডারা তাই এখন ভাবল আলাদাভাবে কোন মুণ্ডা বা কোন অঞ্চলের অভিযোগের প্রতিকার খোঁজার চেষ্টা অর্থহীন। স্থানীয় রাজ-প্রতিনিধিদের তারা খোলাখুলি বলেছে,[২২৪] তাদের একমাত্র লক্ষ্য "সত্তর পুরুষ" আগে মুণ্ডাদের যা অধিকার ছিল বলে তাদের বিশ্বাস, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রাজ প্রতিনিধিরা তাদের বোঝাতে চাইল জমিদার, ঠিকাদার ইত্যাদি মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এবং নানা অধিকার সরকারী আইনে স্বীকৃত; এ একান্ত বাস্তব ঘটনাকে সরকার কিভাবে উপেক্ষা করবে? উত্তরে মুণ্ডারা বলেছে[২২৫], তারাই জমির আদি মালিক; জমিদার ইত্যাদি এসেছে পরে; তাদের অধিকারের নৈতিক কোন ভিত্তি নেই। মিশনারীদের এক প্রতিবেদনে[২২৬] বলা হয়েছে, মুণ্ডারা মনে করে তাদের প্রবঞ্চিত করেই জমিদারেরা জমিতে অধিকার কায়েম করেছে; এ সব বহিরাগতদের সঙ্গে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোন যোগ নেই।

মুণ্ডারা তাই প্রশাসনকে বলেছে, এদের সঙ্গে কোন সংশ্রব তারা রাখবে না; যদি খাজনা দিতেই হয়, তাহলে তারা তা সরকারকে দেবে। ১৮৮১ সালে 'চোদ্দ হাজার খ্রীস্টান মুণ্ডা'র এক আর্জিতে[২২৭] বলা হয়, জমিদার এবং ছোটনাগপুরের রাজার সঙ্গে তারা সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায়; যৌথ গ্রামীণ সমাজ ('village community') তারা গড়ে তুলতে চায়; এর মধ্যে তারা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ

রাখবে। খ্রীস্টান মুণ্ডাদের মধ্যে কেউ কেউ আরো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবে 'ব্যাপ্টিষ্ট জন'এর নেতৃত্বে 'মেইলের সন্তান' ('Children of Mael') বলে এক নূতন দলের প্রতিষ্ঠা হয়। ছোটনাগপুর রাজার পূর্বেকার রাজধানী দইসা (Doisa)তে তারা এক নূতন 'রাজে'র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। এটা ছোট 'ধর্মীয় গোষ্ঠী' ছিল বটে; কিন্তু লোহারডাগার মুন্সেফকে তারা শাসানি দিয়ে হুকুমনামা পাঠাত।'[২২৮]

১৮৮৬ সালের এক আর্জিতে[২২৯] খ্রীস্টান মুণ্ডারা আরো স্পষ্টভাবে তাদের লক্ষ্যের কথা বলে। তারা বলে, গোটা ছোটনাগপুর অঞ্চল মুণ্ডা জাতির খাস এলাকা; অলংঘ্য এ মৌলিক অধিকার; সরকারী কোন আইন তাকে খর্ব করতে পারে না; তবে, সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব তারা চুকিয়ে দেবে; তাদের প্রস্তাব, ছোটলাটের চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এ রাজস্ব তারা লোহারডাগার (রাঁচী) সরকারী রাজকোষে জমা দেবে। ছোটনাগপুরের উপ-কমিশনার তাদের এ অনমনীয় মনোভাব দূর করার চেষ্টা করে। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারিতে মুণ্ডাদের সঙ্গে তার বৈঠক হয়। ফল কিছু হল না। এ সম্পর্কে তার মন্তব্য; "তারা কোন যুক্তির ধার ধারে না। প্রথমে তারা বলে ভারত সরকারের এ মর্মে এক 'ডিক্রি' তারা পেয়ে গেছে যে, তারাই (ছোটনাগপুরের) জমির মালিক; সরকার ছাড়া অন্য কাকেও তারা খাজনা বা রাজস্ব দেবে না।"[২৩০]

১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে জার্মান লুথারপন্থী মিশনারীদের কাছে এক আর্জিতে তাদের মনোভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।[২৩১] তারা বলে ঃ "আমরা চাই না, রাজা (ছোটনাগপুরের রাজপরিবার) এবং জমিদার এ দেশে রাজত্ব করুক; আগে তো রাজ-রাজড়া ছিল না; কোত্থেকে তারা এল আমরা জানি না; আমাদের পূর্বপুরুষরা রাজা বা জমিদারকে কোন রাজস্ব দেয়নি; দিত পাড়া প্রধানকে ... এটা কি উচিত যে একশ জন ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাবে; আর হাজার জন থেকে যাবে দুঃস্থ? প্রতিটি জাতির নিজস্ব সরকার আছে, নেই শুধু মুণ্ডা আর ওরাঁওদের ..."

স্থানীয় প্রশাসনকে তারা এমনও বলে, খোদ মহারাণী পর্যন্ত ডিক্রি জারী করে বলেছে[২৩২] তারাই জমির আসল মালিক; অথচ প্রশাসন এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। তারা প্রকাশ্যে তাদের এক সন্দেহের কথা বলে—মিশনারীদের মধ্যে কেউ হয়তো এসব ডিক্রি চেপে দিয়েছে। মিশনারীদের সম্পর্কে তাদের এ সন্দেহ ও অবিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে যায়। ১৮৮৭ সালের মে-জুন মাসে প্রশাসন জানতে পারে নানা জমায়েত তারা তাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করেছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব

তারা নেয়—তাদের কেউ চার্চের কোন অনুষ্ঠানে আর যোগ দেবে না; আর জোর করে 'মাঝিহাস' জমি কেড়ে নিয়ে তারা চাষ করবে। তারা বহুবার আগে বলেছে, এ জমি এককালে তাদেরই ছিল। হিংসার পথে তারা যাবে কিনা, প্রশাসন জানতে পারেনি। তবে একটা জমায়েতে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র—যেমন তীর ধনুক, কুড়োল, বুলওয়া (যুদ্ধে ব্যবহার করার কুড়োল)—নিয়ে হাজির হয়েছিল। তামার পরগণায় একটা জমায়েতে সর্দাররা নাকি বলেছিল,[২৩৩] "দু'শো মাইল বিস্তৃত এলাকার মুণ্ডারা একজোট হয়েছে; তারা মহারানীর কাছে অনুমতি চাইবে তারা যেন দেড় দিন সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে; কোন খাজনা তারা ছোটনাগপুর রাজাকে দেবে না; যদি রাজার লোকজন তাদের জ্বালাতন করে তাহলে তাদের সবাইকে খুন করবে।" মহারানীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা সংক্রান্ত গুজব রাঁচীর পশ্চিমাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

মাঝিহাস জমি কেড়ে নেবার আন্দোলন সুরু হয় ১৮৮৭ সালের মাঝামাঝি কোন সময়; তবে বিক্ষিপ্তভাবে। তিলমা গ্রামে এ ধরনের এক ঘটনা থেকে মুণ্ডাদের তখনকার মেজাজ পরিষ্কার বোঝা যায়।[২৩৪] ছ'জন খ্রীস্টান মুণ্ডা জমিদারের লোকজনকে মাঝিহাস জমি চাষে বাধা দেয়। জমিদার নালিশ করলে আদালত থেকে সমন আসে; তাদের বলা হয়, এ অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার পুরো দায়িত্ব তাদের। মুণ্ডারা সে সমন ফিরিয়ে দেয়। গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ এলে তারা কিন্তু বাধা দেয়নি; বলে নেতার নির্দেশে তারা এ কাজ করেছে। রাঁচীর আদালতে তারা গোটা ব্যাপারটাই অস্বীকার করে। পাল্টা অভিযোগ আনে, সবটাই সাজানো; জমিদারের সঙ্গে যোগসাজসে পুলিশ এসব করেছে। বিচারে তাদেরই কারাদণ্ড হয়। আন্দোলন কিন্তু থামেনি। তামার পরগণার বারোটা গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ে। নেতৃত্ব ছিল "পঁয়ত্রিশ সর্দারের" এক গোষ্ঠীর হাতে। পুলিশী দাপটের জন্য আন্দোলন আর বেশী ছড়াতে পারেনি।

এ আন্দোলন বিক্ষিপ্তভাবে ঘটলেও নির্দেশ এসেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে। আসলে দু'ধরনের আন্দোলন একই সঙ্গে চলছিল। মহারানীর কাছে আর্জি পাঠানোর ব্যবস্থাদি করতে একটা দল তখন কলকাতায় ছিল। গ্রামের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চিঠি বিনিময়ও হত। এ ধরনের দুটো চিঠি পুলিশের হাতে পড়ে।

মুণ্ডাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল, মহারানীর 'ডক্রি' আসবে; তবে তাদের নিশ্চেষ্ট হলে চলবে না; ঠিকঠিক লোক মারফত মহারানীর কাছে আবেদন পাঠাতে

হবে; আবার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্য কলকাতার উচ্চ-আদালতে মামলাও চালাতে হবে। চাঁদা তুলে এ কাজ চালাতে হত বলে প্রশাসন সব আন্দোলনটার নাম দেয় 'চাঁদা আন্দোলন'। অবশ্য সংকীর্ণ দৃষ্টি প্রশাসনের ধারণা ছিল—নেতারা কাজের কাজ কিছুই করছে না; আসলে তারা অর্থলোলুপ; আন্দোলনের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধি করছে মাত্র।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে বীরসা আন্দোলনের সুরু পর্যন্ত মুণ্ডা আন্দোলন তাই প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা তখন গড়ে উঠেছে। তাহল—বহিরাগতদের প্রভুত্ব তারা মোটেই মানবে না; তাদের সঙ্গে কোন আপস বা সমঝোতা সম্ভব নয়; তাদের সম্পূর্ণ অপসারণ ছাড়া মুণ্ডাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

(খ) মূলতঃ এটা স্বাধীন মুণ্ডারাজের ধারণা। মুণ্ডারা ব্রিটিশরাজকে মেনে নিয়েছে; কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে বারবার বলেছে, ব্রিটিশরাজের কাছে তাদের একটি মাত্র দায়-দায়িত্ব তা হল নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেওয়া। ব্রিটিশরাজের অন্য কোন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মানার কথা তারা বলেনি। সম্ভবতঃ তাদের ধারণা ছিল, বহিরাগত গোষ্ঠীর প্রভুত্ব বিলুপ্ত হলে ব্রিটিশরাজের কর্তৃত্বও ক্রমে শিথিল হবে, এবং মুণ্ডা সমাজ ও অর্থনীতিতে তার কোন ভূমিকা থাকবে না। তাদের ধারণা যাই হোক, জমিদার ইত্যাদি শোষকগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অপসারণের দাবি আসলে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ; কারণ এ গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের প্রধানতম ভিত্তি ব্রিটিশ আইন-কানুন, বিচার ও শাসনব্যবস্থা। মুণ্ডাদের আদি অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এর কাঠামোয় সম্ভব নয়। তারা বলেছে, তাদের মৌলিক অধিকার অলঙ্ঘনীয়; তা ব্রিটিশ আইন-কানুনের আওতায় আসে না।

তাদের এ ধারণার ভিত্তি স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তারা দেখেছে, তাদের মূল সব অভিযোগ সরকার বরাবর উপেক্ষা করেছে, অথচ তাদের শত্রুরা নানা কায়দায় নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে নিয়েছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৬ সালে খ্রীস্টান মুণ্ডাদের পক্ষে মিশনারীদের আবেদন ছোটলাট টেম্পল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন।[২৩৫] তাঁর মতে মুণ্ডাদের দাবি "অসঙ্গত, অযৌক্তিক"; তা মানার অর্থ অন্য শ্রেণীদের প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল করে দেওয়া; ঠিকাদারদের 'জুলুম' বলে মুণ্ডারা যা বলছে, আসলে তা 'বৈধ খাজনা আদায়' মাত্র; মুণ্ডাদের যদি

এ বিষয়ে আপত্তি থাকে, তাদের জন্য আদালতের পথ তো খোলা আছে; সেখানেই সব ফয়সালা হবে। টেম্পলের কাছে নাকি প্রশাসনের লোকজন বলেছে, 'কোলরা দিব্যি আরামে আছে'।

ভুঁইহারী জমি সম্পর্কে কতো ঘটা করে সরকারী তদন্ত চলল, প্রায় এক দশক ধরে। ফল কিছুই হল না। তদন্ত শুরু হবার আগে জমিদারেরা যেসব জমি গ্রাস করে নিয়েছে, সরকার তা সম্পূর্ণ মেনে নিল। তাছাড়া, তদন্তকারীরা চেয়েছিল, মুণ্ডারা তাদের দাবীর সমর্থনে কিছু নজির দেখাক। মুণ্ডারা কাগজ কলমে কিছুই দেখাতে পারল না; তারা শুধু তাদের পুরনো 'প্রথা' 'ঐতিহ্যে'র কথা বলল। তদন্তকারীরা এসব মানতে নারাজ। এর পূর্ণ সুযোগ নিল জমিদারেরা।

ভুঁইহারী তদন্তের ফলাফলে এবং অন্যান্য কারণে বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা বারবার সরকারকে বলেছে, সরকার তাদের প্রতি সুবিচার করুক। কিছুই করা হয়নি। আসলে, মুণ্ডারা যে সত্যিই বিক্ষুব্ধ প্রশাসন তা মেনে নেয়নি। মুণ্ডানেতাদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ এনে বলেছে। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তারা 'বিক্ষোভ' জীইয়ে রাখছে।

১৮৮১ সালে চৌদ্দ হাজার খ্রীস্টান মুণ্ডা স্বাক্ষরিত এক আর্জি সম্পর্কে বাংলা সরকার বলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই সাজানো; তা 'দু এক জন কুমতলবী বিক্ষোভকারী'র কীর্ত্তি; আসলে মুণ্ডাদের মধ্যে 'সত্যিকারের অসন্তোষ' বলতে কিছু নেই।[২৩৬] ১৮৮৬ সালের আর একটা আর্জি সম্পর্কে সরকারী প্রতিক্রিয়া ছিল একই ঃ 'মুষ্টিমেয়' কয়েকজন খ্রীস্টান মুণ্ডা এভাবে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে; নানা জায়গা তেকে টাকা পয়সা তুলে তারা কলকাতায় পাঠায়; সেখানকার আইনজীবীদের নিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নেয়, আর মুণ্ডাদের সই যোগাড় করে।[২৩৭] সরকারের ধারণা, নেতারা সৎ নয় ; "গত কয়েক বছরের বিক্ষোভে তাদেরই স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে; তারা একেবারেই চায়না যে আন্দোলন থামুক"।[২৩৮] ফলে আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় প্রশাসন তা দমিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়েছে।

মুণ্ডারা স্বাধীন রাজের কথা বলেছে; কিন্তু তারা তখন বুঝে উঠতে পারেনি, কিভাবে তাদের শত্রুকুলের বিনাশ ঘটবে। সহিংস আন্দোলন প্রায় সবক্ষেত্রেই নিষ্ফল; বরং পুলিশী পীড়নে তাদের মনোবল ভেঙ্গেছে। তাই বারবার তারা নির্ভর করেছে সরকারী 'ডিক্রী'র উপর। যদি বাংলা সরকার তা না জারী করে, তাহলে ভারত সরকার করবে; ভারত সরকারও যদি না করে, তাহলে স্বয়ং মহারানী থেকে 'ডিক্রী' আসবে—এ ছিল তাদের বিশ্বাস।

এ প্রত্যাশা যদি অপূর্ণ থাকে, তাহলে মুণ্ডাদের করণীয় কি হবে? এ বিকল্পের কথা মুণ্ডা নেতারা তখনও পরিষ্কার করে ভাবেনি। এ বিষয়ে বীরসার চিন্তায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তার নিশ্চিত ধারণা ছিল, একমাত্র সংঘবদ্ধ প্রতিরোধেই শত্রুগোষ্ঠী পর্যুদস্ত হবে; শুধু তাই নয়; ব্রিটিশরাজের অবসান না ঘটলে মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না; তাই ব্রিটিশ শক্তির নানা বনিয়াদের উপর আঘাত হানতে হবে। আমরা পরে দেখব, সহিংসপন্থা সম্পর্কে বীরসা সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না। কিন্তু তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

(গ) এ সময়কার নানা আন্দোলনে খ্রীস্টান মুণ্ডাদের ভূমিকার উল্লেখ আগেই করেছি। সরকারী মহল কোন কোন সময় খোলাখুলি বলেছে, মিশনারীদের প্রচার ছাড়া এ আন্দোলন এত ব্যাপক এবং সংগঠিত হতে পারত না। তাহলে, মুণ্ডা আন্দোলনের বিকাশে এবং বিস্তারে মিশনারী প্রচারের আসল ভূমিকা কি?

মিশনারীরা অসত্য কিছু বলেনি। মুণ্ডাদের নানা অভিযোগের যথার্থতা তারা স্বীকার করেছে; বহুবার সরকারের কাছে এর প্রতিকারের জন্যও বলেছে। কিন্তু প্রতিকারের উপায় হিসেবে সংঘবদ্ধ আন্দোলন কখনও অনুমোদন করেনি। তাছাড়া, আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তারা স্পষ্টভাবে বলেছে, তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আন্দোলনে ব্রিটিশরাজ বিরোধী কোন মেজাজ তারা বরদাস্তই করেনি। কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৮৬৭ সালে খ্রীস্টান মুণ্ডারা এক আর্জিতে সরকারকে জানায়, ছোটনাগপুরের রাজা তাদের নানাভাবে নির্যাতন করেছে; আর অবৈধ দাবী আদায়ে 'ঠিকাদারেরা' জোরজুলুম চালাচ্ছে। তাদের প্রস্তাব, তারাই জমির মালিক—কলকাতার এক আইনজীবীর এ মতও তারা সরকারকে জানায়।[২৩৯] এ আর্জির কথা জানাজানি হয়ে গেলে বিব্রত ছোটনাগপুর মিশন সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে জানায়, এ ব্যাপারে তাদের কোন দায়িত্ব নেই; সর্বসাকুল্যে কুড়ি জন খ্রীস্টান মুণ্ডা এ আর্জি পেশের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত; তাদেরও চার্চের সঙ্গে কোন সংস্রব আর নেই; আর্জিতে যেসব অভিযোগের উল্লেখ আছে, সেগুলি সব ভিত্তিহীন। অথচ একই চিঠিতে মিশন লিখছে : "সহস্র সহস্র ভুঁইহার তাদের জমি হারিয়েছে; সর্বস্বান্ত হয়ে তারা কুলি, ভবঘুরেতে পরিণত হয়েছে"।[২৪০]

১৮৭৬ সালে ছোটনাগপুরের জার্মান মিশন মুণ্ডা আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মনোভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে।[২৪১] ছোটনাগপুরের অধিবাসী হিসেবে এখানকার

জমির মালিক মুণ্ডারাই—মুণ্ডা নেতাদের এ দাবী মিশনের মতে 'অলীক স্বপ্ন' বৈ কিছু নয়; গুটিকয়েক "প্রভাবশালী কোল" স্রেফ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ আন্দোলন চালাচ্ছে; এতে সরকার-বিরোধী প্রবণতা আরো অবাঞ্ছিত; পরিণামে তা কোলদের সর্বনাশ ডেকে আনবে; মিশন যে মাঝে মাঝে সরকারের কাছে মুণ্ডাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলে, তা মুণ্ডা আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য নয়; সময় থাকতে সরকার যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করে, তাহলে তা মুণ্ডাদের আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করবে—এটাই মিশনের ধারণা; মিশন আরো বলেছে, সুযোগ পেলেই তারা মুণ্ডাদের ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়।

স্বভাবতই, স্বাধীনরাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহী মুণ্ডা এবং সর্বপ্রকার সংঘবদ্ধ আন্দোলন বিরোধী মিশনারীদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলে। মিশনারীদের সম্পর্কে মুণ্ডাদের অবিশ্বাস, সন্দেহের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ তিক্ততার চরম প্রকাশ দেখা যায় বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনে (ডিসেম্বর ১৮৯৯—জানুয়ারী ১৯০০); যার শুরু বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় (২৪ ডিসেম্বর) চার্চে প্রার্থনারত খ্রীস্টান সমাবেশের উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

মুণ্ডা-আন্দোলন এবং তার লক্ষ্য সম্পর্কে মিশনারীদের মনোভাব যাই হোক্, এ আন্দোলনে চার্চের কিছু কিছু শিক্ষা এবং খ্রীস্টান-মুণ্ডাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মুণ্ডা নেতা হিসেবে বীরসার আবির্ভাব পর্যন্ত মুণ্ডা আন্দোলনের উপর মিশনারীদের ধর্মীয় প্রচারের প্রভাব একান্ত গৌণ। পরে আমরা দেখব, বাইবেলের বাণী বীরসা যেভাবে গ্রহণ করেছে, তার ধ্যান-ধারণাকে তা যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, মিশনারী প্রচারের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই।

মুণ্ডা-আন্দোলনে মিশনারীদের ধর্মীয় ধারণার কোন প্রভাব না থাকার কারণ, মিশনারী প্রচারে মুণ্ডাদের ধর্মবিশ্বাসে কোন পরিবর্তনই আসেনি।[৫৭] যা কিছু পরিবর্তন তা একান্তই বাহ্যিক— যেমন, নির্দিষ্ট সময়ে চার্চে জড়ো হওয়া নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। বিশ্বাস বা চিন্তাগত পরিবর্তন সাধনের জন্য যে নিরন্তর প্রয়াসের দরকার, মিশনের সীমাবদ্ধ জনবল নিয়ে তা দীর্ঘদিন ধরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে করা সম্ভব ছিল না। মুণ্ডারা বলত, খ্রীস্টান হবার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি মাত্র অনুষ্ঠানের কথা তারা জানে; যেমন তাদের চুল কেটে ফেলতে হত; সামান্য জল হাতে নিয়ে পাদ্রীসাহেব বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়াত আর সে জল মুণ্ডাদের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হত। খ্রীস্টান বানানোর এ সহজ সরল ব্যবস্থাকে সবাই বলত "চুল

কেটে ফেলার আন্দোলন।"[২৮৩] মাঝে মাঝে এমনও ঘটেছে, খ্রীস্টান মুণ্ডারাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে অন্য মুণ্ডাদের চুল কাটিয়ে খ্রীস্টান বানাতো; পাদ্রীর কোন ভূমিকাই তাতে ছিল না।[২৮৪]

মিশনারীদের সঙ্গে সংযোগ মুণ্ডা-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে অন্যভাবে। এ প্রভাবের উৎস মিশনারীদের সম্পর্কে মুণ্ডাদের এক গভীর বিশ্বাস। তা হল এই যে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে 'পাদ্রী সাহেবেরা' আন্তরিকভাবে আগ্রহী এবং সচেষ্ট। এ বিশ্বাস মাঝে মাঝে ভেঙ্গেছে; কিন্তু মিশনারী প্রচারে আবার তারা আকৃষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে তাদের কোন সঙ্কটের মুহূর্তে।

খ্রীস্টান মুণ্ডারা অকপটে বলেছে, তারা এ বিশ্বাসে খ্রীস্টান হয়েছে যে এতে তাদের সুদিন আসবে; জমিদারী জুলুম বেট-বেগারীর বোঝা কমবে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৮৭/৮৮ সাল নাগাদ জার্মান মিশন সম্পর্কে মুণ্ডাদের মোহ ঘুচেছে। পরের বছর রোমান ক্যাথলিক মিশন যখন প্রচারে নামে, তখন দলে দলে মুণ্ডারা খ্রীস্টান হতে থাকে; শুধু তাই নয়, মুণ্ডা আন্দোলনে হঠাৎ নূতন এক সাড়া জাগে। এর কারণ সম্পর্কে সরকারী তদন্তের সময় মুণ্ডারা তাদের মনের কথা বলে। একজনের সাক্ষ্য ছোটনাগপুরের কমিশনার নমুনা উল্লেখ করে[২৮৫] : বেশীর ভাগ মুণ্ডাই নাকি একই ধরনের কথা বলেছে। খেদুয়া খেরিয়া'র এ সাক্ষ্যের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি : "... আমি লেভিয়েন্স সাহেবের চার্চের সঙ্গে যুক্ত। আমি খ্রীস্টান হই ... কিন্তু আমার স্ত্রী এবং চার সন্তান হয়নি। আমি খ্রীস্টান হয়েছি কারণ গজধর দেওঘরিয়া (জমিদার) আমাকে বড্ডো জ্বালাতন করত; প্রত্যেকটা দিন আমাকে বেট-বেগারী দিতে হত; যেন আমি এক ধাঙ্গড়। লেভিয়েন্স সাহেব আমাকে বলে খ্রীস্টান হলে আমাকে আগের নিয়মানুযায়ী বেট-বেগারী দিতে হবে না; আমার বেট-বেগারী কিন্তু কমল না; তাই বড়ো অশান্তিতে আছি। আমি শুধু ক্রুশের চিহ্ন দেখাতে শিখেছি; আর কিছু না। ... আমাদের (ধর্ম সম্পর্কে) শেখানোর জন্য কেউ আসেনি। আমার সমাজ আমাকে এখন একঘরে করেনি, কারণ আমি নামমাত্র খ্রীস্টান।"

কমিশনারের মতে, সব মুণ্ডা মোটামুটি এ ধরনের কথা বলেছে। পরিবারের কর্তাই শুধু খ্রীস্টান হয়েছে, স্ত্রী এবং সন্তানাদি হয়নি, এর কারণ হিসেবে কমিশনার বলে, খ্রীস্টান হওয়ার ব্যাপারটা খুবই তড়িঘড়ি করে সারা হয়েছে। এ সম্পর্কে খোঁজ করতে গিয়ে কমিশনার মুণ্ডাদের মধ্যে এক ব্যাপক বিশ্বাসের কথা জানতে পারে : 'জমিদারের অত্যধিক দাবীদাওয়া ... প্রতিরোধ করার সুযোগ অন্যদের

তুলনায় খ্রীস্টান মুণ্ডাদের অনেক বেশী।'[২৪৬]

এ ধারণা এক বিশেষ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বাইরের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মিশনারীরাই তখন নিপীড়িত মুণ্ডাদের সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়েছে। সর্বব্যাপী কলুষ-'জমিদার' গোষ্ঠীর প্রবঞ্চনা, শঠতা, গৃধ্নুতা; পুলিস, আইন আদালতের ভণ্ড চতুরালি; প্রশাসনের উঁচু মহলের নিষ্করুণ ঔদাসীন্য, এমনকি উপজাতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা—এর মধ্যে বিদেশী মিশনারীদের এ সহৃদয়তা মুণ্ডাদের গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। জমিদারী উৎপীড়ন বন্ধ করার উপায় হিসেবে সংঘবদ্ধ মুণ্ডা-আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেনি, কিন্তু জমিদারের কার্যকলাপকে তারা অবৈধ, অন্যায্য এবং নীতিবোধ বিবর্জিত বলে সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছে। সরকারের কাছে মিশনরীরদের বহু আবেদনে তাদের এ কার্যকলাপ, আর মুণ্ডা স্বার্থরক্ষায় পুলিশ, আইন আদালতের ব্যর্থতাকে মুণ্ডাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। মুণ্ডাদের সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিল অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ। মিশনারীদের এ মনোভাবের কথা তারা ভাল জানত। এমন নয় যে মিশনারীরা তাদের বর্তমান অবস্থার কারণ হিসেবে নূতন কিছু বলেছে। কিন্তু দুটো দিক থেকে মিশনারীদের সমালোচনা তাদের নিজস্ব ধারণাকে সুস্পষ্ট করেছে। বৃহত্তর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মুণ্ডা সমাজের উপর বহিরাগত গোষ্ঠীর প্রভুত্ব বিস্তারের রূপই মিশনারীরা বোঝাতে চেয়েছিল; শুধুমাত্র একান্ত প্রত্যক্ষ বর্তমান বিচ্ছিন্ন মুণ্ডা গ্রামের দুর্গতি নয়। সামগ্রিকভাবে মিশনারী প্রভাবিত অঞ্চলের মুণ্ডা সম্প্রদায় এখন অনেক পরিষ্কার করে বুঝল, দীর্ঘদিন ধরে তাদের অধিকার কীভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয়তঃ, জমিদার মুণ্ডা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জটিলতার জন্য নূতন নূতন আইন কানুনের ব্যবস্থা হল। মুণ্ডারা তাদের পুরনো প্রথা, অলিখিত নিয়ম ইত্যাদি বুঝত; কিন্তু আইন-কানুনের ভাষা, তাদের অনড় নির্দিষ্টতা, উকিল, মোক্তার বা আদালতের ব্যাখ্যা তাদের বিভ্রান্ত করত। ধরতে গেলে অলিখিত প্রথার প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। ১৮৮৯ সালে রোমান ক্যাথলিক মিশন মুণ্ডাদের বোঝাল, খাজনা, বেগারী ইত্যাদি বিষয়ে জমিদারের নিত্যনূতন দাবী মানতে তারা বাধ্য নয়, কারণ এসব দাবী ১৮৭৯ সালের আইন বিরোধী।[২৪৭] অবশ্য বিদ্রোহী মুণ্ডাদের মত মিশনারীরা কখনো বলেনি যে জমিদার গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করতে হবে। কিন্তু জমিদার সম্পর্কে মুণ্ডাদের তিক্ততা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, শুধুমাত্র সাম্প্রতিক আইনের লঙ্ঘন রোধ করে তারা নিশ্চিত হতে

পারেনি; জমিদারী প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অবসান না হলে এ অনিশ্চয়তা অনিবার্য।

খ্রীস্টান হলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে মুণ্ডাদের এ ধারণার ভিত্তি আরো ব্যাপকতর। তাদের বিশ্বাস ছিল, তাদের দুর্দশা দূর করার যথোপযুক্ত ক্ষমতা মিশনারীদের আছে। তাদের কাছে মিশনারীরা শুধুমাত্র 'পাদ্রী' নয়, 'পাদ্রী সাহেব'; তারা সাদা চামড়া জাতের লোক; আর সাদা চামড়া জাতের লোক মানেই রাজার জাতের লোক; তাদের রাজার ক্ষমতা আছে; এ ক্ষমতা খাটালে তাদের শত্রুদের ক্ষমতা খর্ব হবে, পঙ্গু হবে। মিশনারীদের যে ক্ষমতা আছে বলে মুণ্ডারা বিশ্বাস করত, ছোটনাগপুর কমিশনার তাকে বলেছে "The great secular powers"।[২৪৮] কমিশনার মুণ্ডাদের সঙ্গে এক কথোপকথনে উল্লেখ করে। হঠাৎ মুণ্ডারা দলে দলে খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে কেন? কমিশনার তাদের এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে ঃ কমিশনারের হুকুমে। বিস্মিত কমিশনার বলে, এরকম কোন হুকুম তার কাছ থেকে যায়নি। মুণ্ডারা তখন বলে, সে হুকুম এক 'হাকিমের'। মিশনারীরা তো 'হাকিম' নয়। কমিশনারের এ কথার জবাবে তারা বলে ঃ "তারা কালো চামড়ার লোক; সাদা চামড়ার লোক মাত্রেই তাদের কাছে হাকিম"।[২৪৯]

মিশনারীদের সংসর্গ ও প্রচারের প্রভাবে ক্ষুদ্র এক মুণ্ডাগোষ্ঠীর আবির্ভাব হল, যারা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। কমিশনারের ভাষায়, তারা অনেক বেশী 'স্বাধীন-চেতা'; নিজেদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন; মুণ্ডাদের বর্তমান অবস্থার কারণ সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট; সাধারণভাবে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল; তারা কলকাতার উচ্চ-আদালত, তার আইনজীবী সম্প্রদায়, ব্যারিস্টার ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক খবরাখবর রাখত; আইনজীবীদের কেউ কেউ হয়তো তাদের ঠকিয়েছে, মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ করেছে; কিন্তু নূতন বিচারব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল; বিশালসংখ্যক মুণ্ডাদের স্বাক্ষর যোগাড় করতে পারলে সরকারের কাছে তাদের আর্জি যে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে, এ বাস্তববোধ তাদের ছিল। মনে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে এ আর্জি পাঠানোর ব্যাপারে মিশনারীদের উদ্যোগ ছিল। কিন্তু মুণ্ডা-আন্দোলনের এ গুরুত্বপূর্ণ দিকের ইতিহাস আমাদের অজানা। আর্জি ইত্যাদি বৈধ উপায়ের ব্যর্থতার ফলে তারা মিশন কর্তৃপক্ষের অননুমোদন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্য ধরনের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করে। জমিদারগোষ্ঠী, মাঝে মাঝে প্রশাসনও বলেছে, এ আন্দোলন প্রধানতঃ খ্রীস্টান মুণ্ডাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে। তা মোটেই ঠিক নয়। ক্ষুদ্র এক খ্রীস্টান মুণ্ডাগোষ্ঠীর নেতৃত্বে খ্রীস্টান এবং

অন্য মুণ্ডাদের এ আন্দোলন।

মুণ্ডা আন্দোলনের উপর অন্যতম বিশিষ্ট প্রভাব সমসাময়িক সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলন। এর 'রাজনৈতিক' প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। এর একটা কারণ, আদম-সুমারীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যাপক সাঁওতাল আন্দোলনও (১৮৮১-৮২) পুলিসী পীড়নের জন্য বেশীদিন চলতে পারেনি। কিন্তু সাঁওতাল 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। বীরসার চিন্তা-ভাবনার কোন কোন দিক সম্ভবতঃ এ আন্দোলন দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। প্রাক্-বীরসা মুণ্ডা আন্দোলনে অনুরূপ কোন চিন্তার নজির মেলে না।

এ দুই ধরনের প্রভাবের উৎস দুবিয়া গোসাঁই-এর প্রচার এবং ব্যক্তিত্ব।[২৪৯ক] তাঁর প্রচারকেন্দ্র ছিল ছোটনাগপুর অঞ্চলে তাঁর নিজের গ্রামে। সাঁওতাল পরগণার যেসব অঞ্চলে খেরওয়ার আন্দোলন ছড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটা ছোটনাগপুর সংলগ্ন ছিল।

মুণ্ডাদের উপর দুবিয়ার ব্যাপক প্রভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ছোটনাগপুর কমিশনার কয়েকটা কারণের উল্লেখ করে।[২৫০] সাঁওতাল পরগণার মতো এখানেও আদম-সুমারীকে ঘিরে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ "নিরক্ষর এবং নির্বোধ" জনসাধারণ আদম-সুমারী ব্যাপারটাই ভুল বুঝেছিল; তবে উত্তেজনার প্রধান কারণ "কুখ্যাত ফকির দুবিয়া"র "নানা ভবিষ্যদ্বাণী এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ"; এ অঞ্চলে তার নামডাক আগে বড়ো একটা ছিল না; "সাধারণ ফকির" বলেই লোকে তাকে জানত; কিন্তু সে পরে বলে বেড়ায়, অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা তার আছে; 'সরল মতি' স্থানীয় লোকদেরই শুধু সে প্রতারিত করেনি; শহুরে বিত্তশালীদের কেউ কেউ তার প্রচারে বিশ্বাস করে; ছাতরার এক মহাজন তাকে বলে, যদি তার অলৌকিক ক্ষমতার বলে মহাজনের পুত্রসন্তান লাভ হয়, তাহলে সে তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে। তারপর দুবিয়া নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে; সে বলে, যারা তার নির্দেশ মতো কাজ করবে, তাদের সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে; তার নাম দিয়ে নানা চিঠি প্রচার করা হয়; সবাইকে বলা হয় শূয়োর, মুরগী ইত্যাদি সব মেরে ফেলতে হবে; তবে সাঁওতাল পরগণার মতো এখানে অত ব্যাপকভাবে তার নির্দেশ মানা হয়নি; 'শুদ্ধি-আন্দোলন' সংক্রান্ত অন্য সব প্রচারও এখানে ব্যাপকভাবে হয়; "অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সাধারণ মানুষের উপর তার বিপুল প্রভাব দেখা গেছে; তার সংস্থানের জন্য ভিক্ষা এবং অন্যান্য দান অবিরত এসেছে"; তার গ্রেপ্তারের পর এ প্রভাব কমতে থাকে।

দুবিয়া সম্পর্কে কমিশনারের অবিশ্বাস এখানে স্পষ্ট। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ যে মুণ্ডা এবং অন্যান্য আদিবাসীদের বিশ্বাসের কথা আমরা এর থেকে জানতে পারি। দুবিয়ার প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে জমিদার এবং সরকার সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা তার কাছে জমি, খাজনা ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শের জন্য অনবরত যেত।[২৫১] হারানো জমি ফিরিয়ে দেবার আশ্বাসও নাকি দুবিয়া দিয়েছিল। "এর ফলে একটা এলাকায় কোলরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়; তারা বলে এ খাজনা কোলরাজের প্রাপ্য"। দুঃসাহসী মুণ্ডাদের গ্রেপ্তারের পর এ "ষড়যন্ত্র" বন্ধ হয়।

খেরওয়ার 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশীদিন স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয়। 'শুদ্ধি' সম্পর্কে দুবিয়ার প্রচার এখানে সাঁওতাল পরগণার মতো অত কার্যকরী হয়নি। কিন্তু সাঁওতাল গুরুদের মতো বীরসাও নূতন মুণ্ডা সমাজ গঠনের উপায় হিসেবে শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। বীরসার উপর অন্য একটা প্রধান প্রভাব খ্রীস্টের বাণীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। দুবিয়া ছাড়া অন্য কোন ধর্মগুরু মুণ্ডাদের এ ধরনের কথা বলেনি। ডাইনী প্রথা সম্পর্কে তীব্র অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে দেখা গেছে। লোহারডাগার (রাঁচী) উপকমিশনার ১৮৯০ সালের এক ঘটনার বিবরণ দেয়।[২৫২] দুজন বিধবাকে ডাইনী বলে ঘোষণা করা হয়; "প্রথমে তাদের জুতোপেটা করা হয়; তারপর তাদের চুল কেটে ফেলা হয়; নীচুজাতের লোকের রান্না ভাত জোর করে খাওয়ানো হয়; পানীয় হিসেবে দেওয়া হয় তাদের নিজেদের মূত্র; সব শেষে তাদের গ্রাম থেকে বার করে দেওয়া হয়। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা; এবং খ্রীস্টান মুণ্ডাদের কাজ। নূতন রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টানরা অন্যদের খ্রীস্টান করার জন্য মাঝে মাঝে জোরও খাটাতো। এ ঘটনা তাদের এ ধরনের অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়। কোনো 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এটা করা হয়নি।

(১০.১)

বীরসা আন্দোলনের পটভূমিকা হিসেবে মুণ্ডা আন্দোলনের (১৮৫৭-১৮৯৫) উপর চারটি বিশিষ্ট প্রভাবের রূপ আমরা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি : স্বাধীন মুণ্ডারাজের ধারণার উন্মেষ ও বিকাশ; ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অপসৃয়মান বিশ্বাস; খ্রীস্টান মুণ্ডাদের মধ্য থেকে এক নূতন নেতৃত্বের আবির্ভাব, এবং সমসাময়িক সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব।

আগেই উল্লেখ করেছি, বীরসার ব্যক্তিগত সম্মোহনী প্রতিভা ছাড়া এসব উপকরণ

থেকে সুসংহত এক বিশাল আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত না। তার ধ্যান-ধারণায় এসব বিভিন্ন প্রভাবের আদি রূপ ও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। মুণ্ডারাজের স্বপ্ন বীরসারও সব উদ্যোগের মর্মমূলে। কিন্তু আগের মুণ্ডা নেতারা ব্রিটিশরাজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি; তারা বলত জমিবাবদ রাজস্ব তারা ব্রিটিশরাজকেই দেবে। বীরসার কাছে ব্রিটিশরাজ 'কলুষময়' পৃথিবীর অংশ বিশেষ; তার সম্পূর্ণ বিলোপ না ঘটলে মুণ্ডারাজের স্বপ্ন অলীক ভ্রান্তি মাত্র। চাইবাসার জার্মান মিশন স্কুলে[২৫৩] বীরসার ছাত্রজীবন কেটেছে; কিন্তু আস্তে আস্তে এ মিশনের সঙ্গে সব সংস্রব ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক মুণ্ডার মত বীরসাও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে এ মিশন ছেড়ে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে যোগও ক্ষণস্থায়ী। খ্রীস্টান বিশ্বাস ছেড়ে সে ফিরে যায় তার, আদি ধর্ম-বিশ্বাসে। নিজের পরিচয় দিত 'মুণ্ডারী কোল' বলে।[২৫৪] বীরসার চিন্তায় খেরওয়ার 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের বনিয়াদ ব্যাপকতর। এ আলোচনা আমরা পরে করছি।

বীরসা আন্দোলনের দুটি পর্যায় ঃ জুলাই-আগস্ট ১৮৯৫ এবং ডিসেম্বর ১৮৯৯—জানুয়ারী ১৯০০। এ দুই পর্যায়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। তাই আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাদের আলোচনা করব।

তবে পূর্ববর্তী আন্দোলন থেকে এ দুই পর্যায়ের আন্দোলনই বিশিষ্ট। বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যে নিগূঢ় যোগ বীরসা আন্দোলনে দেখি, তা আগে প্রায় ছিল না বললেই চলে।

(১০.২)

বীরসা আন্দোলনের শুরু এক ধর্মীয় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে।[২৫৫] মুণ্ডাদের সে বলে, সে ভগবানের প্রেরিত দূত ; বিপুল এক প্রলয়ের পর এ কলুষময় পৃথিবীর আসন্ন বিনাশ ঘোষণার জন্যই তার আবির্ভাব; এ প্রলয়ে সরকারও নিশ্চিহ্ন হবে ('ভেসে যাবে') ; নিষ্ফল হয়ে যাবে বর্তমানের জীবিকা এমনকি কৃষিকাজও। তার এক ঘোষণা থেকে মনে হয়, তার ধারণা ছিল, মুদ্রা-সর্বস্ব অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে ঃ "এ দুনিয়ার সব টাকা পয়সা জল হয়ে যাবে; তাদের হাতে যা কিছু অর্থ আছে, তা যেন অতি শীঘ্র তারা খরচ করে ফেলে, এবং তা দিয়ে বস্ত্রাদি কেনে।" একমাত্র তার অনুগামীদের জন্যই ছিল তার অভয়বাণী। সামগ্রিক এ বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে না; তারা সবাই জড়ো হবে বর্তমান জনপদ থেকে দূরে এক উঁচু ডাঙ্গায়; একটি মাত্র নিরাপদ জায়গা হবে সেটি; অনুগামীদের নিয়ে বীরসা সেখানে

নিষ্কলুস এক পৃথিবী গড়ে তুলবে।

লোহারডাগার পুলিসাধ্যক্ষ জানতে পারে[২৫৬] গ্রাম থেকে প্রায় ষাট গজ দূরে এ নূতন জায়গা; শ'দেড়েক বা দু'শ অনুগামী সেখানে জড়ো হয়েছে; "বহু-সংখ্যক" চালাঘর তাদের জন্য সেখানে বানানো হয়েছে। 'দেওয়ান' হিসেবে নিযুক্ত এক তাঁতী অন্য তিন-চারজন 'পদা'ধিকারীর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এ জায়গায় আসার জন্য সবাইকে বলছে।

জনপদ থেকে দূরে অনুগামীদের এ নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে বীরসার সম্ভবতঃ এ ধারণা ছিল যে বর্তমানের পঙ্কিল সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংস্কার সম্ভব নয়; নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হবে বর্তমান ব্যবস্থার বিনাশের পর। কিন্তু বীরসার পরিষ্কার ধারণা ছিল, ব্রিটিশরাজ থেকে এভাবে দূরে সরে যাওয়া সম্ভব নয়; নূতন পৃথিবীতে উত্তরণের পথে তার সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য, এবং তাতে সফল হলেই নূতন আদর্শ মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সে সংঘর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন সংহত পরিকল্পনা তখন বীরসার ছিল বলে মনে হয় না। তবে এটা বোঝা যায়, সহিংস পন্থার অপরিহার্যতা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

আসলে মুণ্ডা-আন্দোলনে বীরসা আগে থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল অরণ্য-সম্পদের উপর মুণ্ডাদের দীর্ঘদিনের অধিকার সংকোচনের জন্য নূতন সরকারী বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সালে এক বড়ো আন্দোলন সে গড়ে তোলে।[২৫৭] ১৮৯৫ সালের আন্দোলনের শুরু থেকেই তার নানা ঘোষণা এবং কাজে ব্রিটিশরাজবিরোধিতা সুস্পষ্ট। প্রলয়ের কালে 'সরকার ভেসে যাবে'—এ ঘোষণার সময় ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের কথাই সম্ভবতঃ তার মাথায় ছিল। তার নূতন 'দেওয়ান' এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের গ্রামে গ্রামে এ ঘোষণা করার ভার দেওয়া হয়েছিল, যে মুণ্ডারা যেন তাদের কুড়ুল আব বর্শা নিয়ে ২৭শে আগস্ট তার নূতন জায়গায় আসে। সম্ভবতঃ ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারণার সঙ্গে এ নির্দেশ যুক্ত। মুণ্ডাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর বুলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, জলে পরিণত হবে।[২৫৮] এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা লোকের মুখে মুখে এত ছড়িয়ে পড়ে যে, লোহারডাগার পুলিসাধ্যক্ষ ঠিক করে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি দমানোর জন্য সরকারী নির্দেশমত খালি কার্তুজ ব্যবহার করা নির্বুদ্ধিতা হবে; কারণ বিদ্রোহীরা একে বীরসার কথার যথার্থতার প্রমাণ ধরে নিয়ে আরো 'দুঃসাহসী' হবে।[২৫৯] বীরসা ধরেই নিয়েছিল, সরকার তাকে রেহাই দেবে না।

শিষ্যদের তাই সে বলত, সরকার তিনদিনের বেশি তাকে হাজতে রাখতে পারবে না; কয়েদখানায় তার স্থূল দেহ এক কাষ্ঠখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকবে; তার বিদেহী আত্মা অন্যত্র চলে যাবে। থানার হেড-কনস্টেবল তার দলের কার্যকলাপ দেখার জন্য গেলে "তার অনুগামীরা তাকে গ্রাম থেকে বার করে দেয়; তার বিছানাপত্র, বাসনাদি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়; বীরসা বলে 'সাহেব লোকদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে; আর তারা সরকার বা পুলিসকে মানবে না; সেই রাজা হবে।' হেড-কনষ্টেবল... বেশ কিছু লোকজন সঙ্গে করে এনেছিল; কিন্তু বীরসার এ ঘোষণার পর তারা তার দলে চলে গেল ..."।[২৬০]

বীরসার এ প্রকাশ্য রাজবিরোধিতার একটা কারণ, 'সর্দারী লড়াই (১৮৬৯-১৮৮০) এর সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বীরসার দলে যোগ দেয়।[২৬১] বীরসা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আন্দোলন সুরু করে, নাকি, আন্দোলন শুরু হবার পর তারা এতে যোগ দেয়, তা ঠিক জানা যায় না। তবে আন্দোলনে সর্দারদের ভূমিকা সন্দেহাতীত। 'সাও-মুণ্ডারী' বলে বীরসার এক 'দেওয়ান' সর্দারী লড়াই-এ অংশ নেবার জন্য বেশ কিছুদিন হাজতে বাস করে।[২৬২] বীরসার কোন কোন ঘোষণায় এ লড়াই-এর কর্মসূচীর প্রভাব সুস্পষ্ট। একটা ঘোষণায় বলা হয়েছিল, কত খরচ করে তারা সরকারের কাছে আর্জি পাঠিয়েছে; কোন ফল হয়নি; কেবলমাত্র বিদ্রোহ করলেই তারা সরকারের 'ন্যায়-বিচার' পাবে; আর তাদের হারানো জমি (ভুঁইহারী) ফিরে পাবে।[২৬৩]

বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম আন্দোলনের সময় বীরসার এ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার বিশদ বিবরণ মেলে না। পুলিসের কাছে তার এক 'দেওয়ান' দেওকী পাওরের সাক্ষ্য থেকে আমরা সামান্য কিছু জানতে পারি।[২৬৪] তার প্রধান কর্তব্য ছিল বীরসার বাণী প্রচার; তার মধ্যে একটা ছিল মুণ্ডারা 'সৎ জীবনযাপন' করবে; ভূত পূজা করবে না। বোংগা পূজার উপর বীরসার তীব্র আক্রমণের উল্লেখ করেছেন কুমার সুরেশ সিং।[২৬৫] সাদা শূয়োর এবং সাদা মুরগী মেরে ফেলার নির্দেশও নাকি বীরসা দিয়েছিল।[২৬৬] সমসাময়িক সরকারী দলিলে এর কোন উল্লেখ নেই।

স্বল্প সময়ের মধ্যে বীরসার 'ধর্মীয়' আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেল, তার প্রধান কারণ, বীরসার ঘোষিত 'ধর্ম' প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয়। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক বিধান—শুধু এ সব বীরসার প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল না। সিধু-কানুর নূতন ধর্মের মত এও মুণ্ডাদের ধর্ম থেকে

ভিন্ন। বীরসার ধর্মীয় ঘোষণার মূল কথা—এক মহাপ্রলয়েব পব কলুষময় পৃথিবীর আসন্ন বিলুপ্তি ঘোষণার জন্যই ভগবানের দূত হিসেবে তার আবির্ভাব। মুণ্ডা ও সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বে একটা মূল ধারণা 'মহাপ্লাবন' নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি-সম্পর্কে বীরসার চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। খ্রীস্টান বীরসা বাইবেলে বর্ণিত প্লাবনের উপাখ্যানের কথাও জানত। বীরসা প্রলয়, মহাপ্লাবন ইত্যাদির কথা বলেছে। তার ধারণায় এ বিপর্যয় আমূল রূপান্তরের ইঙ্গিত মাত্র। বীরসা তাই সঙ্গে সঙ্গে বলেছে বীরসার স্বপ্নলব্ধ নানা 'সত্য' সম্পর্কে, মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে একটার তাৎপর্য বীরসা নাকি ব্যাখ্যা করে বলেছিল। তাহল ঃ হারানো মুণ্ডারাজ সে আবার তাদের ফিরিয়ে দেবে।[২৬৭]

বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধর্ম ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য যোগের আর একটা রূপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনে রাজনৈতিক মেজাজ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠলেও মুণ্ডাদের কাছে বীরসা পূর্ববর্তী মুণ্ডা নেতাদের মত শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা ছিল না, যার প্রচার এবং ক্ষমতা রাজনৈতিক লক্ষ্য সিদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ। বছরখানেক আগেও মুণ্ডাদের কাছে বীরসার পরিচয় মূলতঃ তাই ছিল—তাদের অরণ্যের অধিকারের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেতারূপে। কিন্তু এখন মুণ্ডাদের চেতনায় তার ভাবমূর্তির আমূল রূপান্তর ঘটে। বীরসা এখন অলৌকিকতার স্তরে উন্নীত; 'ধরতি আবা' (পৃথিবীর পিতা) 'ভগবান' বলেই এখন তার পরিচয়; অনেকেই তাকে মুন্ডাদের পরম উপাস্য দেবতা সিং বোংগা (সূর্য দেবতা) বলে মনে করে, যে দেবতা কোন অমঙ্গল করেন না, অথচ দূর থেকে তাদের সব কাজ লক্ষ্য করেন।

বীরসার অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা মুণ্ডারা তাদের নির্দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিয়েছে, এবং ফলে বীরসার মানবিক অস্তিত্ব দেবত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম এক কাহিনী তখন প্রায় জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। তা লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষের কানেও আসে।[২৬৮] তা হল ঃ প্রচণ্ড এক ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে অন্য এক মুণ্ডার সঙ্গে বীরসা কোথায় যেন যাচ্ছিল। এক তীব্র বিদ্যুতের ঝলকে সহগামী দেখতে পায়, বীরসার মুখের আদলই পাল্টে গেছে; যা ছিল ঘন কালো তা হয়ে গেল লাল এবং সাদা। বীরসাকে সে তা বলে। বীরসা বলে, ভগবান তার কাছে দেখা দিয়েছেন। গ্রামে ফিরে বিস্মিত সহগামী সবাইকে একথা জানায়। চতুর্দিকে তা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এর মধ্যে এ কথাও জানাজানি হয়ে যায় যে দূরারোগ্য রোগ সারানোর ক্ষমতা বীরসার আছে; তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রমাণও নাকি অনেকে পেয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ধরে নিয়েছিল, এসব এক বিকৃত মস্তিষ্ক বা ফন্দিবাজ লোকের কাণ্ড। বীরসা উন্মাদ কিনা, তা জানার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়। ডাক্তার বলে, তার মাথার কোন গণ্ডগোল নেই। রাজপুরুষদের কেউ কেউ তখন ভাবল, লোকটা পাকা ফন্দিবাজ। ছোটনাগপুরের কমিশনার ব্যঙ্গ করে বলে, বীরসার রোগ সারানোর ক্ষমতার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত তার জানা আছে—এক অর্ধোন্মাদ প্রলাপভাষিণী মুণ্ডা রমণীকে কি সব তুক্‌তাক্ করে সে সারিয়েছিল।[২৬৯] গ্রামের লোক কিন্তু বীরসার ক্ষমতার কথা সহজ বিশ্বাসে মেনে নিয়েছে। বস্তুতঃ, তাদের অনেকেই এ ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছে। যারা নিরাশ হয়েছে, তারা বীরসার ক্ষমতায় অবিশ্বাস করেনি। তারা বলতো, দোষ তাদেরই; তারা হয়তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে তার কাছে যায়নি; না হলে অন্যরা সুফল পেয়েছে, তারা পেল না কেন? বীরসার দেবত্ব বা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এভাবে সুদৃঢ় হয়।

তাই চালকাদে () তার নূতন আবাসে তার 'দর্শন'লাভের জন্য কাতারে কাতারে লোক সেখানে যেতে থাকে। কমিশনারের ভাষায় "গ্রামের সব লোক সেখানে জড়ো হয়েছে .. তখন দুজন লোকের দেখা হলে তাদের কুশল বিনিময়ের কথা ছিল—চালকাদ গেছ কি?"[২৭০]

শুধু তাই নয়। মুণ্ডা-চেতনায় বীরসার অনন্যসাধারণ প্রভাবের অন্যান্য দৃষ্টান্ত প্রশাসনকে বিস্মিত করেছিল। ছোটনাগপুরের কমিশনার জানতে পারেঃ "বহু যোজন দূর থেকে অগণিত লোক তার প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে যায়; চাষবাস ছেড়ে, বাড়িঘর, গবাদি পশু বিক্রী করে তারা চলে আসছে।"[২৭১] সব টাকাপয়সা জল হয়ে যাবে তাই কাপড়-চোপড় কিনে তারা সব সঞ্চয় শেষ করে ফেলুক—বীরসার এ ঘোষণার ফল সম্পর্কে লোহারদাগার পুলিসাধ্যক্ষের প্রতিবেদন ঃ "বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কারবার ফেঁপে ফুলে উঠেছে; আসল দামের দ্বিগুণ দিয়ে লোকেরা তাদের পণ্য আকুল আগ্রহে কিনে নিচ্ছে।"[২৭২]

মুণ্ডারা বীরসাকে কি দৃষ্টিতে দেখত, তা আবার বোঝা গেল তার গ্রেপ্তারের পর (২৩-২৪ আগস্ট, ১৮৯৫)। সন্ধ্যায় যখন বীরসা এবং অন্য কয়েকজন মুণ্ডাকে লোহারদাগার উপ-কমিশনারের কাছে আনা হল "এক বিশাল জনতা সঙ্গে আসে; কাছারি ঘর থেকে তাদের জোর করে বার করে দিতে হয়; সব দরজা বন্ধ করা হয়;

বোঝা গেল এ লোকটার খামখেয়ালীপনা কী নিদারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।"[২৭৩] খুণ্টি থানার সাব-ইনসপেক্টর লিখছে, "ভগবান বীরসার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা তারা কেউ বিশ্বাসই করে না ... আরো জানতে পেরেছি, ধাঙড় হিসেবে এদ্দিন কাজ করছিল প্রতি গ্রামের এমন সব কোলরা তাদের কাজ ছেড়ে চলে গেছে; তারা বলছে দু'চারদিনের মত এত অল্প সময়ের জন্য তারা কাজ করবে না।"[২৭৪] তিনদিন পরেও যখন বীরসা ফিরে এল না, সবাই হতাশ, বিমর্ষ হয়ে ফিরে গেল। এক মিশনারীর ভাষায় "... এতে তারা এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মুখ দিয়ে কোন কথা সরেনি।" বিভ্রান্ত তারা হয়েছিল, কিন্তু বীরসার উপর আস্থা হারায়নি। লোহারদাগার পুলিসাধ্যক্ষ খবর পায় ঃ "তবুও শত শত লোক রোজ সেখানে (চালকাদ) আসত; আসলে কী ঘটেছে, তা তারা জানতে চায়; 'ভগবান' ফিরে এসেছেন কিনা, তার খোঁজ নেয়। এরা বীরসার শূন্য ঘরেই তার পুজো সেরে আবার বাড়ি ফিরে যায়।"[২৭৫]

অক্টোবরে বিচার শুরু হলে 'ভগবানের' দর্শনের জন্য তারা যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। লোহারদাগার উপ-কমিশনার প্রথমে ভেবেছিল, খুন্টির কোন জায়গায় বিচার হবে। তার ধারণা ছিল, বীরসার গোটা ব্যাপারটাই বুজরুগি; যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে সে বরাবর মুণ্ডাদের বলে আসছে, আসলে তার তা নেই; মিথ্যা ছলনায় সে মুণ্ডাদের প্রতারিত করেছে; উপ-কমিশনারের উদ্দেশ্য ছিল, খুন্টির মুণ্ডারা নিজের চোখে দেখুক, বীরসার সব কথা কতো ভিত্তিহীন। ফল হল ঠিক উল্টো। বীরসাকে দেখার জন্য সমবেত বিশাল জনতার হাবভাব দেখে উপ-কমিশনার ভয় পেয়ে যায়। ২৪শে অক্টোবর মাঝরাতে কমিশনারকে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে বলে। "জনতা মারমুখী; বহুজনকে তাকে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে; খুন্টিতে বিচারের ব্যবস্থা বাতিল; রাঁচীতেই তা করতে হবে; আর অতি সত্বর যেন এক পুলিসবাহিনী পাঠানো হয়।" উপ-কমিশনার পরে জানতে পারে, খুন্টিতে বিচার হবে বলে গ্রামে গ্রামে রটিয়ে দেওয়া হয়; তাতেই এত লোক জড়ো হয়; "কিন্তু যখন তারা দেখল, ধরতি আবা বীরসাকে তাদের দেখতে দেওয়া হচ্ছে না, তারা চেঁচামেচি সুরু করে দেয়; অশান্তভাবে লাফালাফি আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে।"[২৭৬]

বীরসা ভগবান, তাই ব্রিটিশরাজের থানা, পুলিশ, আদালতের কোন এক্তিয়ার তার উপর নেই—মুণ্ডাদের এ বিশ্বাস পরেও ভাঙেনি। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বরে বীরসাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছুটিয়ার হিন্দু মন্দিরে পুজো ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে মুণ্ডাদের এক বিবাদ উপলক্ষে পুলিশ আবার তাকে

ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারেনি। এ বিষয়ে মুণ্ডাদের বিশ্বাস সম্পর্কে কমিশনার লিখছে ঃ "এ অর্ধোন্মাদ লোকটার (বীরসার) নানা উচ্চাভিলাষের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল, দিব্যশক্তির ইচ্ছায় কিছুদিনের জন্য সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।"[২৭৭]

(১০.৩)

এ আন্দোলনের সঙ্গে বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনের গুণগত পার্থক্যের কথা আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এ বিশিষ্ট পার্থক্যগুলির বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ। দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে মুণ্ডা-চেতনায় নূতন লক্ষণের রূপ বোঝা তাতে সহজ হবে। মুণ্ডা-আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকাও তখন অংশতঃ পরিবর্তিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে গোড়ায় বীরসার রাজনৈতিক দর্শনে যে অনির্দিষ্টতা, অস্পষ্টতা ছিল, পরবর্তী আন্দোলনে তা প্রায় সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। বিধ্বংসী এক মহাপ্লাবনে কলুষিত পৃথিবী বিলুপ্ত হবে, এবং এর একমাত্র ব্যতিক্রম, এক নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত বীরসার অনুগামীরা-এ ভবিষ্যদ্বাণী গোটা মুণ্ডা-মুলুকে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। গুজব রটেছিল, এক নির্দিষ্ট দিনে (২৭ আগষ্ট) তুমুল অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে এ প্রলয় ঘটবে। কিন্তু তা ঘটেনি। অধীর প্রত্যাশায় উন্মুখ মুণ্ডারা সাময়িকভাবে বিভ্রান্তি বোধ করেছিল। 'ধরতি আবা' বীরসার উপর বিশ্বাস কিন্তু অটল থাকল।

মুণ্ডারা সম্ভবতঃ আশা করেছিল, বীরসা তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুণ্ডারাজ ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বীরসার ঘোষণায় এর কোন সঠিক নির্দেশ ছিল না। এক পৃথিবীর বিনাশ হবে; কিন্তু বিকল্পের রূপ কি, মুণ্ডারা তা জানত না। তাদের শত্রু কারা, তা নূতন করে বলার দরকার ছিল না। কিন্তু কীভাবে তাদের প্রভুত্বের অবসান ঘটানো যাবে, সে বিষয়ে কোন কিছু বলা হয়নি। শত্রু-বিরোধী 'রাজনৈতিক কার্যকলাপ' যা কিছু ঘটেছিল, তা পূর্ব-পরিকল্পিত রাজনৈতিক কর্মসূচীর অংশ নয়। তাদের উপলক্ষ ভিন্ন। বীরসার প্রচারে বাধাসৃষ্টিকারীদের কাকে-কাকেও শাসনি দেওয়া হয়েছিল, (যেমন বন্দগাঁওয়ের ক্ষুদে জমিদার জগমোহন সিং)[২৭৮], এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল, (যেমন কোচাং অঞ্চলের এক সর্দার)[২৭৯]। 'ভগবানে'র গ্রেপ্তারে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা বিপুল সংখ্যায় কাছারি আদালতে গিয়ে প্রতিবাদ

জানিয়েছে; কিন্তু থানা বা আদালতের লোকজনের বিরুদ্ধে হিংসার কোন ঘটনা ঘটেনি।

পরবর্তী আন্দোলনে বীরসার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় সব অস্পষ্টতা, কেটে গেছে। নূতন সমাজ গড়ে উঠবে বর্তমান 'কলুষময়' পৃথিবী থেকে দূরে কোথাও নয়; তা গড়ে উঠবে একান্ত প্রত্যক্ষ, সন্নিকট, জীবনের সহস্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে; কোন 'মহাপ্লাবনে'র ফলে এ রূপান্তর ঘটবে না; সহিংস প্রতিরোধেই পরাক্রান্ত শত্রুকুল পর্যুদস্ত নিশ্চিহ্ন হবে। সহিংস সংঘর্ষের অনিবার্যতা সম্পর্কে বীরসার ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরে আমরা দেখব, প্রায় দু'বছর ধরে[২৮৩] যে মুণ্ডা সংগঠন বীরসার নির্দেশে গড়ে উঠেছে, তা এ ধারণায় অনুপ্রাণিত।

সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য যে মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা, এ বোধ প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু কোন্ কোন্ শত্রুগোষ্ঠীর উপর কঠিনতম আঘাত হানতে হবে? বীরসা মুণ্ডাদের চিরাচরিত শত্রুদের কথা অনবরত বলেছে। কিন্তু মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার পথে ব্রিটিশরাজই প্রধান প্রতিবন্ধক, তার এ ধারণা সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

মুণ্ডা চেতনায় ব্রিটিশরাজ শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসন নয়— গোটা য়ুরোপীয় গোষ্ঠী ('সাহেবলোক') এমন কি মিশনারীরাও। মিশনারীদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় এক দশক ধরে ক্রমেই তিক্ত হচ্ছিল। 'সর্দাররা সব প্রতারক'—এক জার্মান মিশনারীর এ মন্তব্যে মুণ্ডারা তীব্র বিক্ষুব্ধ হয়। বীরসা নাকি এ মন্তব্যের উত্তরে বলেছিল— মিশনারীর এ আচরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়; কারণ, "সাহেব সাহেব এক টোপী হ্যায়"। মিশনারী হফ্‌মানও বলেছেন, মুণ্ডাদের জন্য মিশনের এত আন্তরিকতা, সহানুভূতি তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে; এমনকি তাঁকে এবং তার এক সহকর্মীকে মুণ্ডারা খুন করতেও চেয়েছে। এর কারণ হিসেবে হফ্‌মান বলেছেন ঃ "শুধুমাত্র আমরা সাদা চামড়ার লোক; তাদের বিশ্বাস, তাদের সব পরিকল্পনায় আমরা বাদ সাধছি।"[২৮১] স্বভাবতই যেসব খ্রীস্টান মুণ্ডা তখনও য়ুরোপীয় মিশনের প্রতি অনুগত ছিল বীরসার অনুগামীরা তাদেরও এ শত্রুদলভুক্ত বলে মনে করেছে। বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় (২৪ ডিসেম্বর) সমবেত খ্রীস্টানদের আক্রমণ দিয়েই বিদ্রোহ শুরু হয়।

এর তিনদিন পরে এক নূতন ঘোষণায়[২৮২] বিদ্রোহীরা অন্য শত্রুদের চিহ্নিত

করে। তারা বলে—মুণ্ডাদের কোন ক্ষতি তারা আর করবে না; তাদের লড়াই "হিন্দু এবং সরকারে"র বিরুদ্ধে; গ্রামের সবাইকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছে। "সরকারের প্রতি অনুগত মুণ্ডাদের বলছে, এ মুলুক ছেড়ে সাহেবের সঙ্গে তারা বিলেত চলে যাক।"

কিন্তু "হিন্দু" শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিংসা প্রয়োগের ঘটনা বিরল। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিদ্রোহ শুরু হবার পর বিদ্রোহীদের আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা। থানা আক্রমণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব ছিল না। তবুও যেভাবে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাতে ব্রিটিশবাহিনীর লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল। অদম্য তাদের সংকল্প, দুর্জয় তাদের সাহস। গয়া মুণ্ডা পরিচালিত মুণ্ডা প্রতিরোধ (৭ জানুয়ারী ১৯০০) সম্পর্কে রাঁচীর উপকমিশনারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ "যে সাহস এবং মরীয়াভাব নিয়ে গয়া লড়াই করেছে, তা আমার কাছে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।"[২৮৩]

এ দুর্দমনীয় নির্ভীকতার উৎস ছিল তাদের নৈতিক এবং আত্মিক বল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ এলাকার কর্তৃত্ব ন্যায্যতঃ তাদের; ব্রিটিশরাজের কোন এক্তিয়ার এখানে নেই। ছোটনাগপুরের কমিশনার একটা ঘটনার উল্লেখ করে।[২৮৪] ব্রিটিশবাহিনী বুঝতে পারে, লড়াই চালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে আত্মঘাতী মূঢ়তা মাত্র; তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে, তারা লড়াই বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করুক। "প্রতিনিধি হিসেবে তাদের একজন এগিয়ে এল; বেশ খানিকটা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, রাজ তাদের, আমাদের নয়; যুদ্ধ যদি থামাতে হয়, আমরাই তা করব, তারা নয়; শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে তারা প্রস্তুত।" এ প্রতিরোধ বর্ণনা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে এটা বলাই যথেষ্ট হবে, এ প্রতিরোধ সুপরিকল্পিত, কারণ রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে বীরসার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং এ লক্ষ্যসিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়গুলি সম্পর্কে তার কোন সংশয় ছিল না।

বিদ্রোহীদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, অমিত তাদের সাহস, প্রতিরোধের প্রস্তুতিও যথাসম্ভব নিপুণ। কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহটা যেন ক্ষণস্থায়ী তীব্র এক স্ফুলিঙ্গের মত হঠাৎ জ্বলে ওঠা আবার সঙ্গে সঙ্গেই নিভে যাওয়া। কারণ ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব ছিল।

কীভাবে মাত্র দু বছরের মধ্যে এ প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে উঠল, তার

বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক। এখানে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আগের তুলনায় এ ভূমিকার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

(১০.৪)

বীরসা-মন্ত্রে দীক্ষিত দৃঢ়সঙ্কল্প এক ক্ষুদ্র মুণ্ডা সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলেই এ মানসিকতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। এ প্রচেষ্টার প্রধানতম দিক সংঘবদ্ধভাবে বীরসার আদর্শ প্রচার।

প্রচারের রীতি ১৮৯৫ সালের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময়ে মুণ্ডারা যেত চালকাড়ে বীরসার নূতন 'আশ্রমে'। এখন বীরসার আস্থাভাজন শিষ্যরাই যাবে মুণ্ডাদের কাছে এমনকি দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও; বহুসংখ্যক মুণ্ডার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে বারবার বীরসার আদর্শের কথা তাদের বলবে, এভাবেই তার চিন্তার 'বীজ'[২৮৫] বহুদূর ছড়িয়ে যাবে।

প্রধানতঃ মিশনারী হফ্‌মানের প্রতিবেদন[২৮৬] থেকেই। বীরসার এ মন্ত্রশিষ্য গোষ্ঠীর সংগঠন সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছে। এ গোষ্ঠীর তিন ভাগ ঃ প্রচারক, পুরানক এবং নানক। প্রচারকরা বীরসার সব চাইতে কাছের লোক; সপ্তাহে দু'দিন তারা বীরসার সঙ্গে দেখা করত; রাত্রে মাঝে মাঝে মুণ্ডাদের যে গোপন সমাবেশ হত, সেগুলি সম্পর্কে প্রধান দায়িত্ব ছিল তাদের। পুরানকরা সংখ্যায় বেশী; গোটা মুণ্ডা মুলুক থেকে নানা দিক বিচার করে বীরসা তাদের বাছাই করত; তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হফ্‌মান লিখছেন ঃ "প্রকাশ্য সংঘর্ষের সংকল্প থেকে তারা কখনও বিচ্যুত হয়নি"। নানকরা নূতন শিষ্য; হফ্‌মানর মতে বিদ্রোহের "মাস পাঁচেক আগে" তারা বীরসার দলে যোগ দেয়। তারা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল; কিন্তু "গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েতে" তারা যোগ দিতে পারত না।

বীরসার নানা নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য গ্রামে গ্রামে মুণ্ডারা জমায়েত হত; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাত্রে। সম্ভবতঃ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

এভাবে গড়ে উঠল বৃহত্তর 'বীরসা সম্প্রদায়'।[২৮৭] এর সংহতির ভিত্তি বীরসার আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আনুগত্য। স্বভাবতই, যারা বীরসার আদর্শ গ্রহণ করেনি, তাদের সঙ্গে এ সম্প্রদায় ব্যবধান রক্ষা করে চলত। সম্ভবতঃ বীরসা-অনুগামীদের দৃঢ় ধারণা ছিল, শুধুমাত্র নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত মুণ্ডারাই তাদের মুক্তি সংগ্রামের জন্য সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে। এ অনমনীয় মনোভাবের

জন্য এ নূতন সম্প্রদায়কে হফ্‌মান 'হিন্দু জাতি প্রথা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন; বস্তুতঃ তাঁর মতে, এ সম্প্রদায়ের অনুশাসন 'কঠোরতর'। অন্য মুণ্ডাদের সঙ্গে তারা এক সঙ্গে বসে খেত না; তাদের, এমনকি তাদের ছেলেপিলেদেরও তারা ঘরের 'চৌকাঠ মাড়াতে দিত না।'। ছোটনাগপুর কমিশনারের মতে, তারা এক নূতন ধরনের পৈতে পরত, যার নাম 'বীরসা পৈতে'।[১৮৮]

কোন্ আদর্শ বীরসার ক্ষুদ্র মন্ত্রশিষ্য-গোষ্ঠী গ্রামে গ্রামে প্রচার করত? মুক্তির ব্রতে কীভাবে তারা মুণ্ডাদের উদ্বুদ্ধ করত? হফ্‌মান বা প্রশাসক কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কিছু লেখেননি। এক অনন্যসাধারণ গবেষণা-গ্রন্থের উপর আমরা এর জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।[১৮৯]

বীরসার নূতন বাণীর মূল কথা—মুণ্ডাদের জানতে হবে এককালে তারা কতো মহান জাতি ছিল; সে 'সত্যযুগের' অবসান ঘটেছে নানা বহিরাগত গোষ্ঠীর চক্রান্তে এবং শোষণে; যার ফলে বর্তমানের দুঃসহ গ্লানি; সে স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার জন্য শত্রুকুলের উৎসাদন অপরিহার্য, এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

শুধুমাত্র সামরিক প্রস্তুতি এর জন্য যথেষ্ট নয়; দরকার মুণ্ডাদের আমূল আত্মিক এবং নৈতিক রূপান্তর। এর প্রধান উপায় দুটি : (১) বহু পুরনো ধর্মবিশ্বাস, আচার, সামাজিক বিধিবিধান বর্জন করে মুণ্ডাদের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে; (২) সমৃদ্ধতর হতে হবে তাদের ইতিহাস-চেতনা।

ভূত-প্রেত-বোংগায় বিশ্বাস, ডাইনী প্রথা ইত্যাদি বর্জনের কথা বীরসা ১৮৯৫ সালেও বলেছে। কিন্তু সে আন্দোলন মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য টিকেছিল; তারপর বছর দেড়েক বীরসাকে হাজতে কাটাতে হয়েছে। তাই সংগঠিত কোন 'ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন' তখন হতে পারেনি। এবারকার চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতির একটা প্রধান অঙ্গ ছিল এ নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান।[১৮৯ক]

ইতিহাস-চেতনা সৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র প্রচার যথেষ্ট ছিল না। বীরসার পরিকল্পনা ছিল প্রাচীন মুণ্ডাকীর্তির সঙ্গে মুণ্ডারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হোক। এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল তিনটি জায়গা—দুটি মন্দির এবং একটা দুর্গ। মুণ্ডা লোকগাথা মতে, সবগুলি মুণ্ডাদের তৈরি। ছুটিয়া মন্দির থেকে আনা হল পবিত্র তুলসীপাতা; জগন্নাথপুর মন্দির থেকে চন্দন বাটা; আর নও রত্তন (Naw Rattan) দুর্গের সন্নিকটস্থ অঞ্চল থেকে 'পবিত্র মাটি ও জল'। বিদ্রোহী কোলদের শৌর্যময় প্রতিরোধ (১৮৩১-৩২) নিয়ে রচিত হল গান; গ্রামে গ্রামে মুণ্ডাদের রাত্রের জমায়েতে

সমবেতভাবে তা গাওয়া হল; গৌরবময় মুণ্ডা-ইতিহাসের এক পর্বের সঙ্গে তারা নিবিড় সান্নিধ্য অনুবব করতে পারল।

বিদ্রোহের মানসিকতা সৃষ্টিতে রাত্রির জমায়েত গুলির বিশেষ এক ভূমিকা ছিল। শুধু 'প্রচারক' বা 'পুরাণক' নয়, 'ভগবান' বীরসার উপস্থিতি, তার ভাষণ, তার রচিত গান মুণ্ডাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তার ভাষণ, এবং গানের[১৮৫] প্রতীকধর্মী শব্দচয়ন শ্রোতাদের মনে আসন্ন ব্রিটিশরাজ-বিরোধী সংঘর্ষের আবহ সৃষ্টি করে। সেখানকার অন্যান্য কোন কোন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল, রাজ এবং অন্যান্য শত্রু-বিরোধী আক্রোশ যেন উদ্দীপিত হয়। যেমন কলাগাছে ব্রিটিশরাজ (রাবণ) এবং মহারাণীর (মন্দোদরী) কুশপুত্তলিকা বানিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো। মাঝরাত পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলত মাদল বাজনা ও নাচের সঙ্গে।[২৯১]

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ পরাক্রান্ত ব্রিটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের জয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলে বীরসা অভয় দিয়ে বলত, ব্রিটিশ বুলেট তাদের শরীর ভেদ করতে পারবে না; শরীর স্পর্শ করার আগেই তা জল হয়ে যাবে। তাদের আরো বলা হত, নও রত্তন থেকে আনা 'পূত জল' তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিলে তারা অজেয় থাকবে।

মনে হয়, কোনো এক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সম্পর্কে বীরসার খানিকটা দ্বিধা ছিল। তার ধারণা ছিল, এ সংঘর্ষের অনিবার্য ফল হবে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হিংসার তাণ্ডব; তাতে অপরিমেয় ক্ষতি হবে কৃষিকাজের; অনিশ্চিত হবে মুণ্ডাদের জীবিকা; বিধ্বস্ত হবে তাদের বাড়িঘর। তার বিশ্বাস ছিল, নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রচারিত নূতন অনুশাসন পালন করলে মুণ্ডা সমাজে নূতন প্রাণশক্তি সৃষ্টি হবে। কিন্তু অনেকেই রাজবিরোধী সংঘর্ষের সিদ্ধান্তে অটল থাকল—প্রধানতঃ সর্দারী লড়াইয়ের নেতারা। তাছাড়া বিগত চার বছরের নানা বিপর্যয়—১৮৯৬/৯৭ এবং ১৮৯৯ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ১৮৯৮ সালে কলেরা মহামারীর ব্যাপক ধ্বংসলীলা, পরের বছর খরায় আমন শস্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি—মুণ্ডাদের অসহিষ্ণু করে তোলে। ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯ বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গোটা আন্দোলনের মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে বীরসার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। তবে ধর্মের ভূমিকা এবার খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। বীরসার বিশেষ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে ব্যাপক জনশ্রুতি ১৮৯৫-এর আন্দোলনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এবার তার কিছুই ছিল না। অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী

বীরসা করেনি। দুরারোগ্য রোগ বীরসা সারাতে পারে—এরকম কোন প্রচার এবার ছিল না। মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের ঘটনাকে বীরসা প্রকাশ্যেই বুজরুকি, লোক ঠকানোর ফন্দি বলে বলেছে।

কিন্তু বীরসার সম্মোহনী ক্ষমতার প্রধান উৎস তার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলনকে 'ভগবান আন্দোলন' বলেই অভিহিত করেছে। 'মহাপ্রলয়' সম্পর্কে বীরসাব কথা না ফললেও মুণ্ডা-চেতনায় বীরসা তখনও ভগবান। 'ভগবানের দূত' বলেই সে নিজের পরিচয় দেয়। রাত্রে মুণ্ডাদের গোপন জমায়েতে একটা প্রধান অনুষ্ঠান ছিল ভগবান হিসেবে বীরসার স্তবগান। যে বিভিন্ন উপায়ে মুণ্ডাদের মধ্যে বিদ্রোহের মানসিকতা গড়ে তোলা হয়েছিল, তাদের ধর্মীয় অনুসঙ্গ ও আবহ সুস্পষ্ট। মুণ্ডারাজ মুণ্ডা লোকগাথার 'সত্যযুগ'। এক ব্যাপক ধর্ম-সংস্কারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে মুণ্ডাদের নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি। বীরসার এমনও ধারণা ছিল, তার নূতন ধর্মীয় অনুশাসন নিষ্ঠার সঙ্গে মানলে সহিংস সংঘর্ষ ছাড়াই মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ইতিহাস-চেতনা সৃষ্টির উপায়গুলি মুলতঃ ধর্মীয়। সমবেত দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর দুটো মন্দির থেকে যা আনা হল তা প্রধানতঃ পূজার উপচার—তুলসীপাতা ও চন্দন। নও রত্তন থেকে আনা পবিত্র জলের (বীরদ) স্পর্শ মুক্তি-সংগ্রামের যোদ্ধাদের ব্রিটিশ-বুলেটের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য করবে।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে কৃষক-আন্দোলনের সামগ্রিক রূপ বোঝানো যায় না, বিদ্রোহীদের জটিল মানসিকতা বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অপরিহার্য—আমাদের এ সিদ্ধান্তের অর্থ এ নয় যে আমরা অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্ব অস্বীকার করছি। বস্তুতঃ এ অর্থনৈতিক দিকের যথাযথ পর্যালোচনা ছাড়া কৃষকদের মানসিকতার নানা বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট থেকে যায়। এ প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব ছিল না।

আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে কৃষকদের শ্রেণী-সম্পর্কের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশ প্রাসঙ্গিক হবে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ভেদে এ সম্পর্কের ভূমিকার রূপও ভিন্ন। একটা বিষয়ে কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মোটামুটি একমত। তা হল এই যে, যে প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্বের সঙ্গে কৃষকেরা দীর্ঘদিন অভ্যস্ত। শুধুমাত্র তার জন্য সচরাচর কোন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে না। কিন্তু প্রভুশ্রেণীর পীড়ন বা শোষণের আকস্মিক তীব্রতা বৃদ্ধিকে কৃষকেরা সহজে মেনে নেয় না এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে তার প্রতিরোধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।[৩০০]

আমাদের আলোচিত আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অংশতঃ মাত্র খাটে। সবক্ষেত্রে এ আকস্মিকতা ছিল না; যেখানেও বা তা ছিল, সেখানে শুধু, তাই আন্দোলনের আসল কারণ নয়। এখানে সক্রিয় ছিল বিক্ষুব্ধ কৃষকদের এক বিশেষ মানসিকতা। সেটা হল, নানা অভিজ্ঞতাজাত এক দৃঢ় প্রত্যয় যে— দেশের শাসকগোষ্ঠী প্রভুশ্রেণীর স্বৈরাচার বন্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে; শুধু তাই নয়, স্থানীয় প্রশাসনের কোন কোন অংশের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া এ পীড়ন সম্ভবই হত না। তাই বিদ্রোহের প্রধান প্রেরণা ছিল বিকল্প রাজনৈতিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প।

(১২.১)

একটিমাত্র ব্যতিক্রম ফরাজী আন্দোলন। জমিদার নীলকর-বিরোধী আন্দোলনে স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে ফরাজীদের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল; কিন্তু তারা ভাবেনি, এ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য ব্রিটিশরাজের অপসারণ অপরিহার্য।

ওহাবীদের ক্ষেত্রে 'দাড়ির জরিপানা' নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ নূতন এক উৎপীড়ন। কিন্তু তা এমন কোন দুর্বহ বোঝা ছিল না, যে শুধুমাত্র এর জন্যই তাদের এত ব্যাপক আন্দোলন ঘটতে পারত। অনেক প্রচলিত আবহাওয়া সম্পর্কে তারা কিছুই বলেনি, অথচ এ 'জরিপানা'কে তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেছে। এর কারণ জরিমানার অর্থনৈতিক গুরুত্ব মোটেই নয়; আসল কারণ, এ নূতন জমিদারী-পীড়ন তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আঘাত; বিশেষ করে এ বিশ্বাসে দীক্ষা একান্তই সাম্প্রতিক ঘটনা। বস্তুতঃ এ জরিমানার প্রতিরোধ পরবর্তী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। একে কেন্দ্র করে জমিদারের সঙ্গে ওহাবীদের সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। জমিদার নানা কৌশলে 'অবাধ্য প্রজা'-শাসনের চেষ্টা করে জমিদারী-পীড়নের সব কথা ওহাবীরা সরকারকে জানায়। প্রতিকারের কোন চেষ্টাই সরকার করেনি; এমন কি, স্থানীয় পুলিস জমিদারের নানা দুষ্কর্মে প্রশ্রয় দিয়েছে; প্রকাশ্যে তাদের পক্ষ নিয়েছে। নদীয়া বিভাগের কমিশনারের কাছে তিতুমীর "কুখ্যাত এক সর্দার ডাকাত"; আর তার শিষ্যরা 'সর্দারের দুষ্কর্মের' সহযোগী মাত্র। ওহাবী আন্দোলনের পটভূমিকা তাই মূলতঃ রাজনৈতিক। জমিদার—নীলকর-বিরোধী আন্দোলন রাজবিরোধী বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

প্রধানতঃ পাগলপন্থীদের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, জমিদারী পীড়নের আকস্মিক তীব্রতা বৃদ্ধি আঞ্চলিক অর্থনীতিতে এক গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতি

বার্মা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু আগেকার জমিদারী স্বেচ্ছাচার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এর প্রধান রূপ—অনিয়মিতভাবে খাজনা বাড়ানো এবং নূতন নূতন আবওয়াব বসানো। তাছাড়া, নিত্যনিয়ত শরিকী সংঘর্ষের ফলে চাষবাসের অপূরণীয় ক্ষতি হত। যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি আলাদা ধরনের। জমিদার তখন সরকারী নির্দেশ পালনের যন্ত্র মাত্র; কৃষকদের উপর নূতন উৎপীড়ন অপরিহার্য হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই। অন্যদিকে যুদ্ধের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জমিদারের গানা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাগলপন্থীদের আন্দোলন প্রশাসনকে দমন করতেই হবে; কারণ সামরিক প্রস্তুতিতে কোন শৈথিল্য বা বিঘ্ন সরকার বরদাস্ত করবে না। তাই কৃষকদের কাছে এ অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় ছিল শুধুমাত্র জমিদারী প্রভুত্বের অবসান নয়, ব্রিটিশরাজের বদলে পাগলরাজ প্রতিষ্ঠা। তাদের বিশ্বাস ছিল, টিপু পাগলের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সব দুর্দশার অবসান ঘটবে।

এমন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) ঠিক আগে জমিদারী ও মহাজনী শোষণ হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের মানসিকতা বিকাশের প্রথম পর্যায় কুখ্যাত কয়েকজন মহাজনের বাড়ি আক্রমণ। এর কারণ কোন নূতন মহাজনী জুলুম নয়। সরকার থেকে প্রতিকারের সব আশা ব্যর্থ হলে প্রতিহিংসা হিসেবে সাঁওতালরা এ কাজ করে; তারা ভেবেছিল, এবার হয়তো মহাজনেরা সতর্ক হবে। মহাজনের কাজে উত্যক্ত হয়ে তারা তাদের বাড়ি চড়াও হয়; সরকার মহাজনের গায়ে হাত দিল না, অথচ 'ডাকাতি'র মিথ্যা অভিযোগে সাঁওতালদের কঠিন সাজা দিল। গোটা সাঁওতাল জগৎ এতে তীব্রভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। এর পর প্রায় এক বছর ধরে সাঁওতালরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে, যাতে সরকার মহাজনের সম্পর্কে কিছু করে। দিব্যশক্তি-আবির্ভাবের ঘটনার পরও তারা স্থানীয় প্রশাসনকে একই কথা বলে। কোন ফল হয়নি। সহিংস হুলের সিদ্ধান্ত হয়তো আরো বিলম্বিত হত, যদি না মহাজন এবং থানার দারোগার মধ্যে গূঢ় যোগসাজসের নূতন প্রমাণ মিলত। এর পর বিদ্রোহী সাঁওতালদের লক্ষ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। শুধুমাত্র মহাজন এবং জমিদারদের প্রতাপ খর্ব করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; তারা চেয়েছিল স্বতন্ত্র সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা। তাদের পরবর্তী আন্দোলনে রাজবিরোধিতার সুর ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। ভগীরথ নির্দেশিত আন্দোলনের (১৮৭৪/৭৫) পটভূমিকা আগের থেকে বহুলাংশে আলাদা। দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৭৩/৭৪) খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যাপারে তাদের তীব্র বিক্ষোভ ছিল। তাদের অভিযোগ, সরকারের দেওয়া চাল-ডালের মোটা

অংশ মহাজন এবং অন্য ব্যাপারীর হাতে চলে যাচ্ছে; অথচ তাদের চরম দুর্দশা সত্ত্বেও তারা অতি কষ্টে সামান্য কিছু মাত্র যোগাড় করতে পেরেছে। এর জন্য তারা সরকারকেই দায়ী মনে করেছে। সে সময়কার সাঁওতাল বিক্ষোভের আর একটা কারণ বিস্তীর্ণ জমিদারী এলাকায় ব্যাপকভাবে খাজনার হারের পুনর্বিন্যাসে। সাঁওতালরা দেখল সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই এটা ঘটেছে। অথচ বহুক্ষেত্রে এর ফল হয়েছে তাদের পক্ষে মারাত্মক। সরকারের উদ্দেশ্য যাই হোক, সাঁওতালদের অভিযোগ, এর ফলে খাজনার বোঝা বেড়েছে, এবং দীর্ঘদিনের অন্যান্য নানা স্বীকৃত অধিকার খর্ব হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারী অনুমোদনের অর্থ, খাজনা বৃদ্ধির বৈধতা সম্পর্কে তাদের কোন আপত্তি সহজে টিকবে না। অথচ পরবর্তীকালে জমিদারের খাজনা বাড়ানোর নানা অপকৌশল ব্যর্থ করার কোন চেষ্টাই সরকার করেনি। খাজনা বাড়ার তাৎপর্য শুধু অর্থনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিকও। জমিদারের নূতন ব্যবস্থার ফলে সাঁওতালদের পুরনো সমাজ-সংগঠন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সামাজিক সংহতিবোধ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রধান ভিত্তি। আদম-সুমারী-বিরোধী আন্দোলনে (১৮৮১-৮২) সরকার-বিরোধিতা আরো প্রকট।

সাঁওতাল আন্দোলনেও তাই আমরা দেখি, মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

মুণ্ডা-আন্দোলনের কারণ হিসেবেও আমরা মুণ্ডাদের আকস্মিক দুর্দশা বৃদ্ধির বিশেষ কোন ঘটনা দেখতে পাই না। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়কার আন্দোলন প্রধান এক ব্যতিক্রম। এর পরের ইতিহাস বহিরাগতদের হাতে মুণ্ডাদের প্রবঞ্চনার ইতিহাস—বিশেষ করে ভুঁইহার মুণ্ডাদের। তাদের অনেক জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে এটা দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে ঘটেছে; হঠাৎ নয়। কিন্তু এর ফলেই সরকার সম্পর্কে অবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছিল। ভুঁইহারী জমির অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ ফয়সালার ভার ছিল সরকারের নিজের লোকের উপর। অথচ বহু ভুঁইহার পরিবার পুরনো অধিকারের খানিকটা অংশ মাত্র রক্ষা করতে পেরেছে; অনেকে সর্বস্বান্তও হয়েছে। মুণ্ডারা বরাবর অভিযোগ করেছে, সরকারের লোক জমিদারের পক্ষ নিয়েছে বলেই তাদের এ সর্বনাশ ঘটেছে। কিন্তু প্রতিকার কিছু মেলেনি। পরেও তারা সরকারের কাছে অভিযোগ করেছে; নেহাতই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে, বহু মুণ্ডার সই-সম্বলিত আরজি মারফত। সরকার কোন সহানুভূতি দেখায়নি; প্রতিক্ষেত্রেই বলেছে, গুটিকয়েক 'স্বার্থপর' 'ফন্দিবাজ' নেতার প্ররোচনাতেই তারা এ সব করছে। স্বভাবতই,

ব্রিটিশরাজের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তারা আস্থা হারায়। যা কিছু সামান্য মোহ 'সর্দারী-লড়াই'-য়ের সময় ছিল, পরে তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। বীরসার আন্দোলন এ দীর্ঘ ইতিহাসের পরিণতি মাত্র—যদিও তাতে অনেক নূতন লক্ষণ ছিল।

বীরসার দ্বিতীয় বিদ্রোহের আগে মুণ্ডা অর্থনীতিতে পর পর রকমারি বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু বিদ্রোহের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। বস্তুতঃ উপজাতি অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সেখানকার কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে শস্যের ফলন-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা নূতন কোন ঘটনা নয়। তাই শুধু তা দিয়েই বীরসার এ আন্দোলন ব্যাখ্যা করা যায় না। মুণ্ডারাজের প্রতিষ্ঠা না হলে বহিরাগতদের লোলুপ গ্রাস থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই—এ বিশ্বাস আগেই গড়ে উঠেছে। সহিংস পন্থা সম্পর্কে বীরসার কিছু দ্বিধা ছিল; কিন্তু মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তার চিন্তায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না। মুণ্ডাজাতিকে উদ্বুদ্ধ কবার জন্য তার সব পরিকল্পনার মূল প্রেরণা স্বাধীন মুণ্ডারাজের স্বপ্ন।

ওরাঁওদের আর্থিক দুর্দশা সম্পর্কে সমসাময়িক সব প্রতিবেদন একমত। জোতজমার স্বল্পতার জন্য কৃষির আয় থেকে বহু পরিবারের ভরণপোষণ চলত না। জীবিকা হিসেবে দিনমজুরী নির্ভরযোগ্য ছিল না, বিশেষ করে যখন নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বা অন্যান্য কারণে শস্যের ফলন হঠাৎ হ্রাস পেত। ওঁরাও অঞ্চলে এটা আদৌ অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাই রুজি-রোজগারের জন্য দলে দলে তারা চা-কুলি হিসেবে বাংলা এবং আসামে যেত। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পণ্যমূল্যেব উর্ধগতির জন্য তাদের দুর্দশা আরো বাড়ে। মহাযুদ্ধের সময় কাপড়চোপড়, কেরোসিন ইত্যাদি পণ্যের যোগান হঠাৎ হ্রাস পেল বলে তাদের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ে; অথচ খাদ্যশস্যের দাম বড়ো একটা বাড়েনি; কোন কোন সময় তা কমেছেও (যেমন ১৯১৭ সালে), ফলে তাদের দুর্দশা চরমে ওঠে।

স্বভাবতই, সরকার এবং বহিরাগত গোষ্ঠী সম্পর্কে ওরাঁওদের বিদ্বেষ ক্রমেই বেড়েছে। কিন্তু ওরাঁও আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে এ পরিবর্তমান অর্থনীতি এবং শ্রেণী-সম্পর্কের প্রত্যক্ষ যোগ সব সময় দেখা যায় না। প্রথম ওরাঁও আন্দোলন শুরু হয় (এপ্রিল ১৯১৪) মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগে (২৮ জুলাই - ১ আগস্ট, ১৯১৪), যার ফলে কৃষিপণ্য ছাড়া ভোগ্যপণ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে যায়। পরবর্তী আন্দোলনে এ মূল্য-বৃদ্ধির প্রভাব অনস্বীকার্য। তখনকার প্রকট মাড়োয়ারী-বিদ্বেষ কাপড়-চোপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এ সম্প্রদায়ের গৃধ্নুতার ফল। কিন্তু সামগ্রিক

আন্দোলনের এটা প্রধান দিক মোটেই নয়। জলপাইগুড়ির আন্দোলনেও চা-মালিকদের সম্পর্কে ওরাঁওদের তীব্র বিরাগের প্রভাব একান্তই গৌণ। এ আন্দোলনের মূল সুর ব্রিটিশরাজ-বিরোধিতা। ১৯১৮/১৯ এর আন্দোলনে সে সময়কার আকস্মিক পণ্যমূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সন্দেহাতীত; কিন্তু আন্দোলনের মূল লক্ষ্য নয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা অনেক আগেই গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন আন্দোলনের উপলক্ষ মাত্র।

বস্তুতঃ, মূল লক্ষ্যের এ বিশিষ্টতার জন্যই আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলি এ পরিবর্তন সম্পর্কে কৃষকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। এ লক্ষ্য ব্রিটিশরাজের বিকল্প স্বাধীনরাজের প্রতিষ্ঠা। কারণ লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হলেও লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় বিতর্কাতীত নয়; উপায় স্থির করার পর আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলা দুরূহতম কাজ। বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনের সাংগঠনিক প্রস্তুতি শেষ হতে প্রায় দু'বছর লেগেছিল (ডিসেম্বর ১৮৯৭ — ডিসেম্বর ১৮৯৯)। ১৯১৮/১৯ সালের ওরাঁও আন্দোলন এর তুলনায় অনেক কম ব্যাপক; তবুও এর সংগঠন গড়ে তুলতে নেতা শিবু ওরাঁও-র লেগেছিল সাত আট মাস (আগস্ট ১৯১৮ - ফেব্রুয়ারী ১৯১৯)।

(১২.২)

আমূল রাজনৈতিক রূপান্তর সাধনের প্রয়াস যেখানে বিদ্রোহের মূল প্রেরণা, সেখানেই প্রধানতঃ আমরা ধর্মের এক বিশিষ্ট ভূমিকা দেখি। এখানে ধর্মবিশ্বাসের তাৎপর্য শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের সংহতিবোধের একটা প্রধান বনিয়াদ হিসেবে নয়। বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য, লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়, বিদ্রোহের সংগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষকদের নানা ধারণাকেও তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ফরাজী আন্দোলন এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। ধর্মের ভূমিকা এখানে অপেক্ষাকৃত সীমিত। বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের জন্য জমিদারী-পীড়নের কোন কোন দিককে ফরাজীরা স্বতন্ত্র এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিল। যেমন এ বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে তারা জমিদারের কোন কোন আবওয়াব মেনে নেয়নি। একই কারণে ফরাজী বা অন্য মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার ধর্ম-সম্পৃক্ত বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসায় জমিদারের কোন এক্তিয়ারও তারা স্বীকার করেনি। ফরাজী সংগঠনের প্রভাব প্রতিপত্তি তাই শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকল না। ধর্মগুরুর নির্দেশকে ফরাজী কৃষকেরা দীর্ঘদিনের প্রথাসম্মত জমিদারী কর্তৃত্বের বিকল্প হিসেবে স্বীকার করে নিল। এ দুই

বৈবী গোষ্ঠীর ক্ষমতার লড়াই গ্রামাঞ্চলে একটা নূতন ঘটনা। 'ফরাজী আন্দোলন' আসলে এ লড়াইয়ের একটা রূপ।

ওহাবী, পাগলপন্থী এবং উপজাতিদের সব আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা অনেক বেশী ব্যাপক।

ফরাজীদের মত নূতন ধর্মবিশ্বাস দীক্ষিত ওহাবী কৃষকরাও জমিদারী কর্তৃত্বের কোন কোন দিক মেনে নেয়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকার আরো বিশিষ্ট রূপ ছিল।

(ক) ইসলাম-অনুমোদিত 'জিহাদে'র ধারণা ওহাবীদের রাজ-বিরোধী মানসিকতাকে গোড়া থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা বলা শক্ত। বাংলায় ওহাবীদের গোড়াকার প্রচারে এ ধারণা সম্ভবতঃ সুস্পষ্ট ছিল না। কিভাবে আস্তে আস্তে এ মানসিকতা গড়ে ওঠে, তা আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি। তা গড়ে ওঠার পর জিহাদের চেতনা তাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।

(খ) বিধর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হলেও শহীদ হিসেবে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে—জিহাদের এ ধারণা ওহাবীদের প্রভাবিত করেছিল কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিহারীলাল ও আবদুল গফুর সিদ্দিকীর বিবরণ অনুযায়ী, যুদ্ধের সংকট মুহূর্তে তিতু এ বলে অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। এর প্রামাণিকতা বিচার-সাপেক্ষ।

(গ) ওহাবীদের এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ধারণায় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। আন্দোলন শুরু হবার পর ওহাবীদের এক প্রচার ছিল, কোম্পানী-রাজের অবসানের পর মুসলমানরা আবার তাদের হারানো রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে পাবে। তিতু নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে, কিন্তু কোথাও বলেনি যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের ভার থাকবে শুধুমাত্র ওহাবীগোষ্ঠীর উপর।

(ঘ) তিতুর অলৌকিক ক্ষমতায় ব্রিটিশ বাহিনীর প্রবল পরাক্রম সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে—ওহাবীদের উপর এ ধর্মবিশ্বাসের গভীর প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ বিশ্বাসের কথা প্রায় জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। সমসাময়িক তিতুর এক জীবন-কাহিনী ('হরুগীতি') একে ব্যঙ্গভরে উল্লেখ করেছে ঃ 'ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করব কারে,/এ দ্যাখ গোল্লা খাই হজরতের বরে'। তিতুমীরের যুদ্ধ সম্পর্কে একটা প্রচলিত প্রবাদের—'গোলা খা ডালা'—ভিত্তি এ প্রবাদের জনশ্রুতি। যুদ্ধক্ষেত্রে ওহাবীদের বিসদৃশ আচরণ ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষরা এ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল। যেভাবে তারা নির্ভয়ে উন্নততর অস্ত্রসজ্জিত শত্রুসেনার দিকে

এগিয়ে যাচ্ছিল, তা আদৌ কোন রণকৌশলসম্মত নয়।

এ ধর্মবিশ্বাস প্রচারিত ওহাবী-মতবাদের অঙ্গ মোটেই নয়। এর একটা উৎস সুফী ও পীর-ঐতিহ্য। ওহাবীরা সুফীবাদ ও পীরবাদের কঠোর সমালোচক; কিন্তু এক সুফী-সাধক (পীর শাহ্ কামাল) এবং তার শিষ্যের ('ফকির' বলে পরিচিত মিশ্কীন শাহ্) সঙ্গে তিতুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিদ্রোহের সংগঠনে মিশকীনের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল। সম্ভবতঃ তারই প্রভাবে ওহাবীদের মধ্যে এ বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

পাগলপন্থীদের ক্ষেত্রে ধর্মগুরুর এ অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসের প্রভাব আরো গভীর। ওহাবীদের মত তারাও শুধুমাত্র এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে লড়াইয়ে নামেনি। যথাসাধ্য সামরিক প্রস্তুতি তাদের ছিল। কিন্তু তাদের নৈতিক এবং আত্মিক বলের উৎস ছিল এ বিশ্বাস।

(ক) সংঘর্ষ শুরু করার আগে তারা টিপু-পাগল ও তার মার ('মা-সাহেবা') সঙ্গে পরামর্শ করে। ওহাবীদের বিশ্বাস থেকে তাদের বিশ্বাস খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। ওহাবীদের বিশ্বাস ছিল নেতার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার প্রভাবে শত্রুশক্তি নিষ্ফল হয়ে যাবে। কিন্তু ওহাবীদের নিজস্ব প্রতিরোধের উপর এ বিশ্বাস কীভাবে কাজ করবে, তা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পাগলপন্থীদের বিশ্বাস সম্পর্কিত দুটি জনশ্রুতির কথা সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়ঃ মা-সাহেবা ইচ্ছে করলেই শুধুমাত্র কাপড় ঝেড়ে এক বিশাল বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করাতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রপূত এক বিশেষ গাছের কাঠ থেকে বানানো বন্দুক সত্যিকারের বন্দুকের মত কার্যকরী হবে। (তবে পুলিস তল্লাসী থেকে জানা যায়, কাঠের বন্দুকের সঙ্গে অন্যান্য প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়েছিল)।

(খ) বিদ্রোহীদের ধারণা তাদের নেতার মধ্যেই এ অতিপ্রাকৃত শক্তি মূর্ত হয়েছে। বাইরের অদৃশ্য কোন উৎসের কথা তারা ভাবেনি। নেতার এ শক্তির উৎস এক ধরনের যাদুশক্তি। এ শক্তিকে অতিপ্রাকৃত বলা যায় এ কারণে যে, শুধুমাত্র নেতারই এ ক্ষমতা আছে। বিদ্রোহীদের বিশ্বাস, নেতার যাদু বা মন্ত্রশক্তিতে তাদের ব্যবহার্য সব সামরিক উপকরণে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির সঞ্চার হবে। তাছাড়া যাদুশক্তি প্রয়োগ বিমূর্তও হতে পারে; যাদুশক্তি যে শুধু দৃষ্টিগোচর বস্তু মারফত কার্যকরী হবে, তা নয়; তাই নিরবয়ব এ শক্তির প্রভাবে বহুদূরের ব্রিটিশ বাহিনীর স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যর্থ হবে।

(গ) বিকল্প পাগল-রাজের সার্বভৌমত্ব এ অতিপ্রাকৃত শক্তিধর পাগল ধর্মগুরু থেকে অভিন্ন। বিকল্প সরকার তাকে এবং তার অনুগামীদের নিয়েই গড়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যে বলেছে, পাগলরাজা ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ তারা মানবে না। নূতন ফৌজী সড়ক তৈরীতে তারা বেগার খাটবে না, এর একটা কারণ হিসেবে তারা বলেছে, টিপু-পাগল তা বারণ করেছে; জমিদারকে কোন খাজনা তারা আর দেবে না; এবার থেকে তা টিপুর কোষাগারে জমা পড়বে। অর্থাৎ বিদ্রোহের ঘোষণা, তার সংগঠন এবং বিদ্রোহীদের সব কাজ ধর্মগুরুর নির্দেশে পরিকল্পিত।

(ঘ) ধর্মবিশ্বাসে পাগলপন্থী না হলেও বহু কৃষক টিপুর নানা ঘোষণা, নির্দেশ এবং সার্বভৌমত্ব নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে; কারণ, ধর্মবিশ্বাস এখানে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়; জমিদারী শোষণ মুক্ত এক নূতন রাজনৈতিক বিধানে বিশ্বাস। তাই পাগল সম্প্রদায় না হয়েও তারা টিপু ও তার মা'র অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা বিশ্বাস করেছে।

সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং ওরাঁও আন্দোলনে ধর্ম বিশ্বাসের বিশিষ্ট ভূমিকা মূলতঃ এক যদিও তার রূপ ভিন্ন। দীর্ঘস্থায়ী এ আন্দোলনগুলির নানা পর্যায় ছিল; তবুও নানা দিক থেকে তাদের সাদৃশ্য আছে।

(ক) পাগলপন্থার আবির্ভাব কোন সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় ঘটেনি; পরে তা কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়ে য়ায়। কিন্তু ধর্মচেতনা গোড়া থেকেই এ তিন আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। (খ) এ তিনক্ষেত্রেই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের শুরু ধর্ম-গুরুদের এক ঘোষণা থেকে। তা হল, দিব্যশক্তির নির্দেশেই তারা অনুগামীদের শত্রুবিরোধী সংগ্রামে ডাক দিচ্ছে; ভগবান-নির্দেশিত বলেই এতে তাদের জয় অনিবার্য; আর এ জয়ে তাদের সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। জয় সম্পর্কে এ নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল বিদ্রোহীদের নৈতিক বলের প্রধান উৎস। অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি নিষ্ফল হবে, এ বিস্বাসও তাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। (গ) ধর্মগুরুদের প্রাথমিক ভূমিকা ছিল, দিব্যশক্তিপ্রেরিত বার্তাকে অনুগামীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া ; কিন্তু তারাই পরে দিব্যপুরুষের স্তরে উন্নীত হল। (ঘ) অলৌকিক ক্ষমতাবলে ধর্মগুরুরা দুরারোগ্য রোগ ইত্যাদি সারাতে পারে, সাধারণের এ বিশ্বাস কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক প্রভাবের কারণ ছিল—যেমন দুবিয়া গোসাঁই, বীরসা মুণ্ডা। সিধু-কানুর ক্ষেত্রে এ লৌকিক বিশ্বাসের কোন ভূমিকা ছিল কিনা বলা শক্ত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ ভূমিকা

ক্রমেই গৌণ হয়ে যায়। অনুগামীদের ব্যক্তিগত ও পারিবোরিক দৈব-দুর্বিপাককে ছাপিয়ে ওঠে সমগ্র উপজাতির জন্য এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন।[৩০১] ধর্মগুরুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের ভিত্তি ও স্বপ্নসৃষ্টিতে তার ভূমিকা। (ঙ) নূতন নূতন ধর্মগুরুর আবির্ভাব সাঁওতাল এবং ওরাঁও আন্দোলনের একটা বিশেষ দিক। কিন্তু তাদের সম্পর্কে সাধারণের ধারণা আদিগুরুর ব্যক্তিত্বের আদলেই গড়ে উঠেছে। (চ) প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনের ব্যর্থতায় ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে উপজাতিদের ধারণায় এক পরিবর্তন আসে। তা হল এক নূতন বোধ যে তাদের অনেক পুরনো ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক নানা প্রথা বর্জন করে নূতন ধর্ম ও সমাজ গড়ে তুললেই তারা প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে সফল হবে। ধর্ম বিশ্বাসের ভূমিকা এখানে আদৌ হ্রাস পায়নি। বিশ্বাসের রূপ পাল্টেছে মাত্র।

(১২.৩)

পাগলপন্থী এবং এ তিন আন্দোলনে ধর্মের প্রভাবের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তা হল, বিদ্রোহীদের এক বিশ্বাস যে, অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যেখানে থাকবে না কোন অসাম্য বা এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব। এ নূতন ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের কাছে পরিপূর্ণ সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক এবং এ নেতাকে তারা 'পরিত্রাতা' বলে মনে করেছে।[৩০২]

এ আন্দোলনগুলিতে (বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে) নেতার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা বারবার বলেছি। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তরের জন্য কৃষক সমাজের অস্থির আকাঙ্ক্ষা থেকে নেতার আবির্ভাবকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; কিন্তু আন্দোলনের মূল রূপটি এ আবির্ভাবের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত কৃষককুলের সম্মতি-সাপেক্ষ নয়; বিদ্রোহীরা নেতাও নির্বাচন করেনি। এমন অবশ্যই নয় যে নেতা আর কারোর সঙ্গে আন্দোলনের লক্ষ্য বা লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় সম্পর্কে কোন আলোচনা করেনি। (কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন ভগীরথ, বীরসা, শিবু ওরাঁও—নেতারা আগেকার খণ্ড, বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্তও ছিল।) কিন্তু নেতার যে ঘোষণা বিদ্রোহের নূতন রূপ-লক্ষণ বিকাশের আরম্ভ বলা যেতে পারে, যা বিদ্রোহের মূল ধারাকে নির্ধারিত করেছে, তারা ভিত্তি নেতার স্বতন্ত্র বোধ, উপলব্ধি। বিদ্রোহীদের কাছে নেতাও তাই অনন্য সাধারণ, দূরবর্তী, বিশিষ্ট, একক কোন অস্তিত্ব; বিশিষ্টতার যে লক্ষণ তারা তার উপর আরোপ করে, তা তাই ধর্ম-লক্ষণাক্রান্ত।

এ ধরনের আন্দোলনের কোন কোন ইতিহাসকার বলেন, শোষণমুক্ত,

সাম্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনা এবং 'পরিত্রাতা' হিসেবে নেতার ধারণা প্রধানতঃ খ্রীস্টধর্মের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে। Worsley মনে করেন, পৃথিবীময় এ ধারণা—প্রভাবিত আন্দোলনের। বিস্তারে 'প্রধানতম' ভূমিকা খ্রীস্টান মিশনারীর।[৩০৩] তাঁর মতে, ভারতবর্ষে এ ধরনের "একমাত্র উল্লেখযোগ্য" আন্দোলন ঘটেছে মুণ্ডা ও ওরাঁওদের ক্ষেত্রে; এর কারণ, মিশনারীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। Hobsbawm-ও বলেছেন ঃ "ধরতে গেলে এ ধরনের আন্দোলন একমাত্র সে সব অঞ্চলেই দেখা গেছে, যেখানে ইহুদী-খ্রীস্টান ধর্মের বাণী প্রচার হয়েছে।"[৩০৪]

এর কারণ হিসেবে বলা হয়, বাইবেলের কোন কোন বাণী এ আন্দোলনের উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল—যেমন, যিশুর আবির্ভাব ঘটেছে দুঃখ-তাপ-ক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের পরিত্রাণের জন্য; যিশুর 'দ্বিতীয় আবির্ভাবে'র ফলে তাঁর অনুগামীরা পরবর্তী সহস্র বছর (millennium) সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবনযাপন করবে।

ইহুদী-খ্রীস্টীয় ধর্ম-চিন্তার এ প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে Hobsbawm বলেন ঃ "এটা খুবই স্বাভাবিক। যেসব ধর্মে বলা হয়েছে, পৃথিবী অবিরত পরিবর্তনশীল বা এখানে পরিবর্তনের ধারা চক্রবৎ আবর্তিত বা পৃথিবী পরিবর্তনহীন এক বস্তু, সেগুলি এ বিশিষ্ট মানসিকতা ও ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে ধারণা এ ভাবাদর্শ গড়ে তোলে, তা হল এই যে, একদিন এ পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপর ঘটবে তার আমূল পুনর্বিন্যাস। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মে এ ধারণা নেই।"[৩০৫]

পাগলপন্থী এবং উপজাতিদের তিনটি আন্দোলনের আলোচনা থেকে এ সম্পর্কে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়। বাইবেলের বাণীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও এ ধরনের আন্দোলন ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে এ প্রভাব সুস্পষ্ট, সেখানেও তা শুধু এককভাবে কার্যকরী হয়নি; আঞ্চলিক সংস্কৃতির নানা উপাদানের সঙ্গে তা মিশে গিয়েছিল। বস্তুতঃ, এ মিশ্রণের প্রক্রিয়া অতি জটিল।

পাগলপন্থী আন্দোলনে 'পরিত্রাতা' হিসেবে ধর্মগুরুর ধারণার মূলে বাইবেলের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই; তার ভিত্তি আঞ্চলিক পীরবাপের ঐতিহ্য।

সাঁওতাল আন্দোলনের উপর এক সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,— সিধু-কানুর পুজোর বেদীর কাছে নিউ টেষ্টামেণ্টের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল; আকাশ থেকে উড়ে আসা কাগজের যে টুকরোর কথা তারা বলেছিল,

তা আসলে এ পাতাগুলো। এর তাৎপর্য সম্পর্কে এ প্রতিবেদনে কিছুই বলা হয়নি। সিধু-কানুর উপর বাইবেলের কোন প্রভাব আদৌ ছিল কিনা, তা বলা শক্ত। ঐ সময় এ অঞ্চলে মিশনারী প্রচার প্রায় নগণ্য বলা যায়। Society for the Propagation of the Gospel ১৮২৬ সালে টি. ক্রিশ্চিয়ন বলে এক মিশনারীকে সেখানে পাঠায়। প্রচারের কাজ সম্ভবতঃ বিশেষ কিছু হয়নি, কারণ মাত্র এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত অন্য কোন চেষ্টাই হয়নি। সে বছর চার্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে E Drocse-কে সেখানে পাঠানো হয়। এ 'সোসাইটি'র 'সাঁওতাল মিশনে'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬১ সালে।[৩০৬]

'হুলে'র সময় পর্যন্ত সাঁওতাল অঞ্চলে মিশনারী প্রচারের নগণ্যতা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে সিধু-কানুর উপর বাইবেলের কোন প্রভাব পড়েনি। অন্য সূত্র থেকেও তা আসতে পারে। কোলদের মধ্যে Gosner Lutheran Mission-এর কাজ শুরু হয়। ১৮৫৪ সালে। এটা অসম্ভব নয় যে কোল অঞ্চলে এসব প্রচারের কথা সাঁওতালরা জানত। কোলদের সঙ্গে সাঁওতালদের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল,তা হুলের সময় পরিষ্কার বোঝা গেছে।

কিন্তু সিধু-কানুর চিন্তা-ভাবনার বাইবেলের প্রভাব সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলে না। তাদের নিজেদের কোন ঘোষণায় এর উল্লেখ নেই। খ্রীষ্টধর্ম খারওয়ার এবং পরবর্তী সাঁওতাল আন্দোলনকে "নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত" করেছে, Catanach-এর এ সিদ্ধান্তও সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন।[৩০৭]

মুণ্ডা-কোল অঞ্চলে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সংগঠন ছিল অনেক বেশী ব্যাপক; মুণ্ডাদের 'জমিদার'-বিরোধী আন্দোলনে মিশনারীদের অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু বীরসার প্রথম আন্দোলনের আগেপর্যন্ত নেতাকে 'পরিত্রাতা' হিসেবে কখনও ভাবা হয়নি। দুবিয়া গোসাঁইকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মুণ্ডারা মনে করত। কিন্তু মুণ্ডা-অঞ্চলে তার নির্দেশে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

বীরসার ধ্যান-ধারণায় বাইবেলের প্রভাব সুস্পষ্ট। মিশন স্কুলের ছাত্র হিসেবে বাইবেলের বাণীর সঙ্গে খ্রীস্টান বীরসার পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ। তার ভগবানের ধারণা খ্রীস্টানদের প্রেমময়, একান্ত অন্তরঙ্গ, নিবিড় ব্যক্তি সম্পর্কে সম্পৃক্ত ভগবানের ধারণা। বৈরী, অমঙ্গলময়, ভয়াল, দূরবর্তী কোন দেবতার কল্পনার কোন চিহ্নই এখানে নেই। অন্য সব দেবতা তো বটে, এমনকি সিং বোংগারও কোন উল্লেখ বীরসার 'প্রার্থনা-সংগীতে' নেই। 'প্রচারকে'র ভূমিকাও সম্ভবতঃ 'মিশনারী'র আদলেই

পরিকল্পিত। যিশুর মত তারও প্রধান অনুগামীর সংখ্যা বারো। 'পরিত্রাতা' হিসেবে ধর্মগুরুর ধারণা নিঃসন্দেহে বাইবেলের 'সুসমাচার'-প্রভাবিত। বিপুল এক বিপর্যয়ে কোন একদিন পৃথিবীর লয় হবে, আর তারপর হবে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি—বীরসার প্রথম আন্দোলনের সময় এ প্রচারেও খ্রীস্টীয় ধারণার প্রভাব অনস্বীকার্য।

'আদর্শ' পৃথিবী ও 'পরিত্রাতা'র ধারণায় বাইবেলের প্রভাব মেনে নিলেও এ প্রভাব কিভাবে বৃহত্তর মুণ্ডা-জগতে কার্যকরী হতে পেরেছিল, ঐতিহাসিককে তার বিশ্লেষণ করতে হবে। ধর্মগুরুর মনে এ নূতন উন্মেষ যেন হাওয়ায় উড়ে আসা বীজের মত; তার উৎস চিহ্নিত করা হয়তো কঠিন কাজ নয়; কিন্তু কীভাবে এ উপলব্ধি বহুজনের চেতনায় সঞ্চারিত, পল্লবিত হয়ে ওঠে, তার বিশ্লেষণ অনেক বেশী দুরূহ কাজ।

এ সঞ্চার সম্ভব হয়েছিল ধর্মগুরু-নেতার সচেতন প্রয়াসের ফলে। অনুগামীদের কাছে তার বোধের কথা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, এমন ভাষা, ধর্মীয় প্রতীক, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের উপর নেতা নির্ভর করেছে, যা তাদের কাছে সহজবোধ্য, এবং তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। এ সবই তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের—তাদের লোকগাথা, কল্পপুরাণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস-চেতনার অঙ্গ। অর্থাৎ বাইবেলের বাণীর প্রভাব যেভাবে কার্যকরী হতে পেরেছিল, তাকে মুণ্ডা-সংস্কৃতির নানা উপাদানের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ নূতন বাণী মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের সঙ্গে অঙ্গাগীভাবে মিশে গিয়েছিল বলে নেতার প্রচারেও এ দুটি প্রায় অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আসলে এক পরম 'পরিত্রাতা'র আবির্ভাবের ধারণা মুণ্ডাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন ছিল না। সাঁওতাল আন্দোলনে এ ধারণার বিপুল প্রভাবের কথা তারা অবশ্যই জানত। নূতন পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে মহাপ্লাবন, অগ্নিবৃষ্টি ইত্যাদি অদৃষ্টপূর্ব সংঘটনের ধারণাও তাদের একান্তই পরিচিত ভাষা। যে নূতন বিধানের আসন্ন আবির্ভাব সম্পর্কে বীরসা (এবং যাত্রা ভগৎ ও শিবু ওরাঁও) ঘোষণা করেছিল, তার সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক কোন রূপ ছিল না; কিন্তু এ বিধানের যে রূপরেখার কথা বারবার বলা হল, তাতে মুণ্ডারা সহজেই বুঝে নিল, এতে একান্তভাবেই তাদেরই অভীপ্সা প্রতিফলিত।

মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যসিদ্ধির একটা প্রধান উপায় হিসেবে মুণ্ডাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস-চেতনার উপর বীরসা বরাবর জোর দিয়েছে। বিশিষ্ট কোন কোন প্রতীক ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল এ চেতনা সৃষ্টি করা। বিশেষ কোন অঞ্চল মুণ্ডাদের বিশেষ

কোন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে ঐতিহ্যের স্মৃতিকে জাগ্রত করে বীরসা তার অনুগামীদের শত্রু-বিরোধী চূড়ান্ত সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। মুণ্ডা জাতির এরকম এক মহান ঐতিহ্য ১৮৩১/৩২ সালের 'কোল বিদ্রোহ'। মুণ্ডা এবং ওরাঁওরা পরে পরম গর্বের সঙ্গে বারবার তা স্মরণ করেছে। চরম পরাজয়ের গ্লানিবোধ তখন তাদের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মুণ্ডা সমাজও অর্থনীতিতে এ বিদ্রোহ কী চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, তাও তারা ভুলে যায়। তারা শুধু মনে রেখেছে, দীর্ঘদিনের অধিকার রক্ষার জন্য এটা ছিল তাদের গৌরবময় সংগ্রাম। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অমিত শৌর্য, দুর্বার সাহসের নানা কাহিনী তাদের লোকগাথার অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

বীরসা চেয়েছিল, মুণ্ডারা তাদের এ গৌরবময় ইতিহাস আবার স্মরণ করুক। তার সংগঠনের মূল কেন্দ্র কালকাদ থেকে সরিয়ে আনা হল কোল বিদ্রোহের একটা প্রধান কেন্দ্র ডোমবাড়ীতে। এর একটা উদ্দেশ্য, ডোমবাড়ীর ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ মুণ্ডাদের প্রেরণা যোগাবে।

যে প্রক্রিয়ায় বাইবেলের বাণী বিদ্রোহোন্মুখ মুণ্ডাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তা তাই অতি জটিল। তাছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমূলরূপান্তর সাধনের জন্য আসন্ন সংগ্রামের মানসিকতা সৃষ্টিতে এমন কিছু কিছু প্রভাব কার্যকরী ছিল, যার সঙ্গে বাইবেলের বাণীর প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। ব্রিটিশ সামরিক পরাক্রম বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষ্ফল, এ প্রত্যয় যে তাদের প্রতিরোধের সঙ্কল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল উপজাতিদের প্রতিটি আন্দোলনে আমরা দেখেছি। এ প্রত্যয়ের উৎস যাদুশক্তি, মন্ত্রশক্তি। শুধুমাত্র 'পরিত্রাতা' ধর্মগুরুর অলৌকিক ক্ষমতায় এর সৃষ্টি নয়। এ শক্তিতে বিশ্বাস বিদ্রোহীদের প্রাক্তন ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ। এ শক্তি দৃশ্যমান নানা বস্তুতে মূর্ত হতে পারে—যেমন বীরদা (পূত বারি), যা বীরসা বিশেষ একটা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল। তা অদৃশ্য এবং বিমূর্তও থাকতে পারে—যেমন প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ এবং সমবেত সংগীত। মুণ্ডা, বিশেষ করে ওরাঁও আন্দোলনে যাদু-মন্ত্রশক্তির এ প্রয়োগ বারবার দেখা গেছে।[৩০৮] এ যাদুশক্তি কিভাবে শত্রুর পরাক্রমকে ব্যর্থ করে দেবে, তার কোন ব্যাখ্যা আন্দোলনের নেতারা দেয়নি। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, এ পরাক্রমের উৎসও এক ধরনের যাদুশক্তি; তাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে সমধর্মী বিরুদ্ধ অন্য এক যাদুশক্তি।[৩০৯]

আসন্ন সংগ্রামের সামগ্রিক প্রস্তুতিতে 'ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার' আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে উপজাতিদের ক্রমবর্ধমান সচেতনতাও বাইবেলের বাণীর

সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তা অন্য এক সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রধানতঃ ভ্রাম্যমান বৈষ্ণব গুরুদেব প্রচারেব ফল। এ আন্দোলনের ব্যাপকতম সংগঠন দেখতে পাই ওরাঁওদের ক্ষেত্রে।

(১২.৪)

সবশেষে, আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলিতে যে ধর্মচেতনার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আবার সংক্ষেপে নির্দেশ করতে চাই।

(ক) সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর সাধনই যেখানে বিদ্রোহের মূল প্রেরণা, প্রধানতঃ সেখানেই ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয়। এ বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলেই দেখা গেছে। (খ) ধর্ম-চেতনার যে রূপ বিদ্রোহীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, তা বহুলাংশে উপজাতিদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস থেকে গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। পুরনো ধর্মবিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে গড়ে উঠেছে। নূতন বিশ্বাসের প্রসার নূতন ধর্মগুরুর সচেতন প্রয়াসের ফল; এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মীয় গোষ্ঠী, যদিও সাংগঠনিক সংহতির চরিত্র সব ক্ষেত্রে সমান নয়। ধর্মগুরুর এ প্রয়াসের ভূমিকা আদৌ সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয় নয়; তা মূলতঃ রাজনৈতিক। (গ) উপজাতিদের একটা নূতন ধারণা ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। তা হল, পরাক্রান্ত শত্রুর সমকক্ষ হতে হলে তাদের নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতির আমূল পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য; এর জন্য বহু ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আচার, সামাজিক প্রথা নির্মমভাবে বর্জন করতে হবে; বস্তুতঃ এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে নূতন জীবন-চর্যা; নূতন নৈতিক ও অধ্যাত্মজীবন। (ঘ) নূতন এ অনুশাসনের ফলে উপজাতিদের পুরনো সামাজিক সংহতি কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বল হয়েছে, কারণ সবাই এ কঠোর নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়নি; কিন্তু প্রখরতর হয়েছে স্বতন্ত্র উপজাতি-সত্তার চেতনা। যেমন, টানা-ভগৎ-গোষ্ঠী-ভুক্ত ওরাঁওরা তাদের বহু জীর্ণ ঐতিহ্যকে 'টনে' উপড়ে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল, এর ফলে তারা ফিরে পাবে তাদের 'আদ্দি' 'কুরুখ ধরম' (সত্য ধর্ম, আসল ধর্ম)। (ঙ) এ নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াসে অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রায় অনিবার্য ছিল। কিন্তু উপজাতিরা সচেতনভাবে তার বিশেষ বিশেষ অংশ বেছে নিয়েছে। হিন্দু ধর্ম তাদের শুদ্ধির ধারণাকে প্রধানতঃ প্রভাবিত করেছে (এ ধারণা তাদের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়); কিন্তু হিন্দু সমাজ-সংগঠনের বিশিষ্ট কোন কোন দিক (যেমন, বর্ণ-জাতি-প্রথা) তারা মোটেই গ্রহণ করেনি। খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাবে উপজাতিদের ধর্ম-বিশ্বাসে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আসেনি।

মুণ্ডা-ওরাঁও-অঞ্চলে কোন কোন সময়ে খ্রীস্টান হওয়ার হিড়িককে লোকে ব্যঙ্গ করে 'চুল-কাটার আন্দোলন' বলত। চার্চের সঙ্গে তাদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। বীরসার আন্দোলন যখন সুরু হয়, সে নিজেকে খ্রীস্টান হিসেবে পরিচয়ই দিত না। কিন্তু খ্রীস্টের বাণী থেকে মুণ্ডারা সে অংশই বেছে নিয়েছে, যা তাদের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

যে ধর্ম বিদ্রোহী কৃষকদের প্রভাবিত করেছে, তা তাই কোন অনড় কাঠামো নয়; কয়েকটা সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস আর আচারের সমাহার নয়। সন্ধান করেছে তারা নূতন বিশ্বাসের; বেরিয়ে আসতে চেয়েছে জীর্ণ ঐতিহ্যের অচলায়তন থেকে; আবার কোন কোন পুরনো বিশ্বাস, প্রায় বিস্মৃত যৌথ সামাজিক আচার নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ নিরন্তর আত্মানুসন্ধান প্রবল শত্রুকুলের সঙ্গে সম্পর্কের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য তাদের প্রয়াসের একটা বিশিষ্ট দিক। এমন কোন সমাজ-দর্শনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না, যার সাহায্যে তারা এ সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের বিকল্প উপায় ভাবতে পারত।

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১. কোন কোন ঐতিহাসিক এমনও বলেছেন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় রেখে বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ সুরু করে না। ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনদেশে কিভাবে বিপ্লব শুরু হয় তার আলোচনা প্রসঙ্গে Theda Skocpol *(States and Social Revolutions : A Comparative Analysis of France, Russia and China.* Cambridge University Press, 1979) তার যুক্তির সমর্থনে অন্য এক ঐতিহাসিকের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত উধৃত করেন ঃ "In fact, revolutionary movement rarely begin with revolutionary intention ; this only develops in the Course of the Struggle itself" (পৃঃ ১৭)। Eric Hobsbawm-এর একটি মন্তব্যও তিনি উল্লেখ করেন ঃ "The evident importance of the actors in the drama ... does not mean that they are also dramatist, producer and stage-designer ... Consequently theories which overstress the voluntarist or subjective elements in revolution, are to be treated with Caution" (পৃঃ ১৮)

২. (a) Bengal Political (Police) Proceedings ; April 1909, No. 5, 16-34.
(b) India Political Proceedings ; Nov. 1912 ; No. 135-137

৩. Willem Van Schendel, 'Madmen of Mymensingh : Peasant Resistance and the Colonial Process in Eastern India, 1824-1833', *Indian Economic and Social History Review,* April-June, 1985

৪. Stephen Fuchs, *Rebellious Prophats : A Study of Messianic Movements in Indian Religions.* (Asia Publishing House, 1965)

৫. S. C. Roy, *Oraon Religion and Customs* (1928), 1972 Reprint. Edition, Calcutta ; Ch. VI

৬. পাদটীকা নং ৪ দ্রষ্টব্য

৭. সরকারী মহলের প্রধান সিদ্ধান্ত ছিল, নেতারা অনুগামীদের অন্ধ-ধর্মবিশ্বাস ও সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়েছিল। সরকারের এ দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। পাগলপন্থী আন্দোলনের নেতা টিপু সম্পর্কে মন্তব্য ঃ "The superstition of the people enabled him to practise his tricks of necromancy and establish his name as a great Fu Keep, which secured him an ascendancy over the minds and actions of his votaries and and proselytes which he turned to his own advantage" ... [Bengal Judicial Criminal Proceedings ; 5 Jan. 1826, No 39 ; Report by R. Morrison, Offg, Judge of Circuit, Dacca, 12 Nov, 1825, Para 11] বারাসত বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরের আখ্যা ঃ 'Sirdar dacoit.' [Bengal Judi-

cial Criminal Progs : 6 Dec. 1831, No. 49 Letter from the Commissioner of Circuit, 14th Division. 28 Nov. 1831, Para 9 | শিষ্যদের উপর তিতুর অনন্যসাধারণ প্রভাবকে বলা হয়েছে "a striking instance of the influence which a religious teacher can acquire over an utterly rude and uninformed people" [Bengal Judicial Criminal Progs ; 3 April. 1832, No. 5. Letter from Colvin, Offg. Joint Magistrate of barasat to the Commissioner of 18th Division, 8 March, 1832. Para 21]. ফরাজী আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : "Doubtless the object of the leader was pillage, but their instruments were ignorant ryotts with whom their word was a law". [Bengal Judicial Criminal Progs ; 30 April 1839 ; No. 68, Letter from Joint Magistrate, Faridpur, 16 April, 1839, Para 8] ফরাজী নেতা শরিয়াতুল্লার মৃত্যুর পর দলের নূতন নেতা তাঁর পুত্র দুদুমিএগ সম্পর্কে মন্তব্য : "His son Doodoomeah, now the acknowledged chief ... in conjunctions with other Mollahs, doubtless with a view of obtaining plunder, but under the plea of religious zeal, exhorted their followers to use every means to make converts to their creed ..." [Bengal Judicial Criminal Progs; 30 April, 1839, No. 69, Letter from Joint Magistrate of Faridpur, 17 April 1839, Para 3]. খেরওয়ার সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান ধর্মগুরু ভগীরথের লক্ষ্য সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের অভিমত : "In September 1874, one Bhagrut Manjhee ... appeared in the subdivision of Godda, and having gained an ascendancy over the minds of the people by persuading them that they owed the relief afforded them by government during the scarcity (1873-74) to his influence, proceeded to turn his power to account by promoting a religious movement in the direction" of Hindooism [Bengal Judicial Proceedings ; March 1875 ; File 40—88 ; Note by the Bhagalpur Commissioner. 9 March 1875 ; Para 3]

৮. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : উনবিংশ শতাব্দী (কলিকাতা, ১৯৮০, তৃতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৩২১

৯. Ranjit Guha (ed) : Subaltern Studies, II, (Oxford University Press, Delhi, 1983) ; 'The Prose of Counter-Insurgency' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

১০. এ সম্পর্কে প্রবন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে Section ৯.১ দ্রষ্টব্য

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (কলিকাতা, ১৩৪২), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১১-১২। ফরাজীদের কার্যকলাপের উপর 'দর্পণে' প্রকাশিত চিঠি এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'দর্পণে'র সম্পাদকের কাছে 'সরিতুল্লার (শরীয়াতুল্লার) দলভুক্ত

দুষ্ট জবন'দের কার্যকলাপ সম্পর্কে পত্রলেখকের আশঙ্কার কথা এ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ "আমি বোধ করি, সরিতুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে, অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক"।

১২. বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর, (প্রথম প্রকাশ, ১৩০৪)। স্বপন বসু সম্পাদিত 'পুস্তক বিপনি সংস্করণ' (কলিকাতা, ১৯৮১) আমি ব্যবহার করেছি।

১৩. কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী (রাণাঘাট, ১৩১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ)। মল্লিক তিতুকে 'নদীয়ার রাজনৈতিক জীবনে একটি অশুভকর জ্যোতিষ্ক', 'ধর্মোন্মত্ত বলদৃপ্ত মুসলমান' বলে অভিহিত করেছেন।

১৪. Abhijit Dutta, *Muslim Society in Transition : Titu Mir's Revolt (1831),* (Minerva, Calcutta, 1986) দত্ত তিতুর আন্দোলনকে বলেছেন ঃ "Primary an intolerant puritanical movement to propagate true Islam for which they were ready to unleash the Satanic forces of communal violence". [p. 116]

১৫. এ সম্পর্কে নরহরি কবিরাজ তাঁর *'Wahabi and Farazi Rebels of Bengal* (P. P. H, New Delhi, 1982)—বইতেআলোচনা করেছেন ; Ch. 4, পৃঃ ১০৩-১০৬

১৬. একই

১৭. "It was a peasant rising in a religious garb' (পৃঃ ৫২)। 'In form it was a movement for radical religious reform. In content it was indeed a peasant movement bearing a class character" (পৃঃ ৫৯)

১৮. "The Farazi movement was essentially an agrarian movement, though the demands were carefully dressed up in religious Catchwords". (পৃঃ ৯০)

১৯. "It was the only language that the peasants would then comprehend" (পৃঃ ১১০)

২০. "The movement originaled at a time when the social forces were still immature ... It was a time when society was on its feudal legs, when religion played an important part in the moulding of man and society". (পৃঃ ২০)

২১. "The Farazi actions were not the manifestations of a conscious movement against the zamindari system. These were spontancous actions of an infuriated peasantry belonging to a particular sect of the Muslim Community". (পৃঃ ৯৮)

২২. "rough-hewn ideology"

২৩. R. H. Hilton, 'Peasant Society, Peasant Movements and Euadalism in Medieval Europe", in Henry A. Lands-berger (ed) *Rural Protest : Peasant Movements and Social Change* (London, 1974). হিল্টনের সিদ্ধান্ত উধৃতিযোগ্য : "No study heretical movements which are supported by masses of poor people in towns and country will get far if the heresies concerned are treated as changing currents of thought and feeling about the purposes of religion, in isolation from a social context. On the other hand, it is insufficient to treat such heresies as if the beliefs proclaimed were simply a more or less consciously assumed expression of social and political aims thinly disguised in theological terms" (পৃঃ ৮৬)

২৪. Emmanuel Le Roy Laduric, *The Peasants of Lunguedoc* (University of Illinois Press, 1976) "Huguenot concepts which were purely religious in origin and principle became charged in transit – in the process of 'Penetrating the masses' – with an active force, an affective and revolutionary potential". (পৃঃ ১৭২)

২৫. এ বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্কের সূচনা হয় Ernst Troeltsch-এর *The Social Teaching of the Christian Churches* (London, 1931 : 2 vols)-এর প্রকাশ থেকে। এ বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য Kenneth Thompson & Jeremy Tunstall (eds) : *Sociological Perspectives* (Penguins. 1971) : Part Four : 'Belief' : পৃঃ ৩৭৯-৪০৭

২৬. বৃহত্তর অর্থে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে 'Ideology'-র এ দ্বৈতরূপ, পরস্পর-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে অতি সুন্দর এক আলোচনা করেছেন পার্থ চ্যাটার্জী তাঁর 'More on Modes of Powers and the Peasantry' নিবন্ধে। (Ranjit Guha ed. *Subaltern Studies*, II, O.U.P, 1983). পৃঃ ৩৩৮-৩৪০। তাঁর মূল একটা সিদ্ধান্ত উধৃত করছি : ".. the same set of ethical norms or religious practices which justify existing relations of domination also contain, in a single dialectial unity, the justification for legitimate revolt ?" চ্যাটার্জী একে বলেছেন "This inherent contradictoriness of established ideologies in feudal society" (পৃঃ ৩৩৮)

২৭. Reynaldo Clemena Ileto.*Pasyan and Revolution : Popular Movements in the Philippines, 1840-1910* (Atenco de Manila University Press, Quezon City, Metro Manila. 1979) এর একটা কারণ হিসেবে Eleto

ফিলিপাইন সমাজ রোমান ক্যাথলিক মতবাদকে যে বিশিষ্টভাবে গ্রহণ করেছে তার উল্লেখ করেছেন ঃ "... like other regions of South-East Asia which 'domesticated' Hindu, Buddhist, Confucian and Islamic influences, the Philippines, despite the fact that Catholicism was more often than not imposed on it by Spanish missionaries, creatively enolved its own brand of christianity from which was drawn much of the language of anti-colonialism in the late nineteenth century". পৃঃ ১৫ Section : 'The Pasyon and the Masses'. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ পৃঃ ১৫-২৮

২৮. Norman Cohn, *Pursuit of the Millennium* (O. U. P : New York, 1976), 'Foreword' to the Third Edition

২৯. F. Engels, *The Peasant War in Germany*, (Progress Publishers. Moscow, Fourth Printing, 1974). এঙ্গেলসের মন্তব্য ঃ "This domination of theology over the entrie realm of intellectual activity was at the same an inevitable consequence of the fact that the church was the all embrancing synthesis and the most general sanction of the existing feudal domination. It is clear that under the circumstances all the generally voiced attack against the church, and all revolutionary social and political doctrires had mostly and simultaneously to be theological heresies. The existing social relations had to be stripped of their halo of sanctity before they could be attacked". পৃঃ ৪২

৩০. Barbara Daly Met Calf, *Islamic Revival in British India : Deoband, 1860-1900* (Princeton University Press, 1982)

৩১. 'Islam is a religion that takes all of life in the purview". পৃঃ ৫

৩২. যেমন, একেশ্বরবাদ বর্জন করে ভগবানের মহিমা অন্য জনের উপর আরোপ করা; পীরবাদ; পীরের কবরে প্রার্থনা; মৃত মহাত্মার কবরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান; মৃতজনের উদ্দেশে প্রার্থনা ; মৃতজনের আত্মার সন্তুষ্টির জন্য আয়োজন ; বিবাহ, মৃত্যু, মহরম ইত্যাদি উপলক্ষে নানা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান

৩৩. Colvin (যিনি বারাসত বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন) তিতুমীরের গুরু সৈয়দ আহম্মদের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে ভিন্ন এক সিদ্ধান্তে এসেছেন ঃ "It is notorious that in Calcutta and its neighbourhood Syed Ahmed has for his disciples nearly all the most respectable of the mohammedan inhabitants" (Bengal Judicial Criminal Progs; 3 April, 1832, No. 5. Colvin এর রিপোর্টের (তারিখ ৮ মার্চ, ১৮৩২) Para 7.

তিতুর নূতন মতে দীক্ষিত শিষ্যরা প্রধান সমাজের দরিদ্র এবং দুঃস্থ অংশ থেকে এসেছে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। যেমন নারকেলবেড়ের মৈজুদ্দীন বিশ্বাস, যার বাড়ীকে সম্ভবত বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ষাট বিঘা লাখেরাজ জমির মালিক ছিল

৩৪. R. Ahmed, *The Bengal Muslims ; 1871-1906 : A Quest for Identity* (O. U. P., 1981)

৩৫. 'Tax on beard', বারাসত বিদ্রোহের সমসাময়িক অনেক বিবরণে এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তিতুমীরের সহযোদ্ধা সাজন গাজী রচিত (বা সংকলিত) 'তিতুমীরের গান' নামক পুঁথি থেকে গিরীন্দ্রনাথ দাস কয়েকটা গান উধৃত করেছেন। তার থেকে এটা সুস্পষ্ট। একজন সাধারণ নাগরিকের উক্তি ঃ

"নামাজ পড়ে দিবারাতি
কি তোমার করিল খেতি
কেন কল্লে দাড়ির জরিপানা"

কৃষ্ণদেব রায়ের সমর্থক জমিদার কালীপ্রসন্নও নাকি এভাবে বিদ্রোহের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করেন ঃ

"নামাজ রোজা শেখাইত রাখতে বলত দাড়ি
দিনের তারিখ শেখায়ে ফেরে বাড়ি বাড়ি।
পাপগোনা বদকাম তাও করে মানা
বাংলায় জারী করে আরবের কারখানা।
না বুঝে যে কেষ্টদেব করিলে বাহানা
ফি দাড়ি আড়াই টাকা জরিপানা হয়,
সে জন্য সরাঅওলা বড় খাপা হয়।

(গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, বারাসত - চব্বিশ পরগণা, ১৯৭৬), পৃঃ ১৮৮-১৮৯

৩৬. গিরীন্দ্রনাথ দাস, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১৭৭-১৭৮

৩৭. আর্থিক মন্দা মোটামুটিভাবে ১৮২৯ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। লণ্ডনের বাজারে তখন নীলের দাম পড়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য পণ্যের তুলনায় নীলের রপ্তানি তখনও অত কমে নি। ক্ষতি স্বীকার করেও নীলকরেরা নীল রপ্তানি করে যাচ্ছিল। কারণ নীলের বাজার খুব ভাল ছিল বলে ১৮২৩ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত বিশাল পরিমাণ পুঁজি নীল-উৎপাদনে খাটানো হয়েছিল।

৩৮. বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়নি। নীলকরদের সঙ্গে ওহাবীদের সংঘর্ষের নানা ঘটনার বিবরণ আছে Abhijit Dutta-র (পূর্বোল্লেখিত) বইতে।

Ch. VIII

৩৯. Bengal Judicial Criminal Progs : 3 April 1832 : No. 5. Colvin-এর রিপোর্টের Para 9

৪০. একই ; Paras 22-23

৪১. Bengal Judicial Criminal Proceedings ; 3 April, 1832, No. 83. Letter from E. P. Smith, Nadia Magistrate to the Deputy Secretary. Govt. of India, Judicial Dept. (16 Nov ? 1831). Smith লিখছেনঃ "These people ... pretend to a new religion, calling out Deen Mahomed, declaring that the Compay's govt is gone and that they are to receive malguazaree [revenue payment]

৪২. Bengal Judicial Criminal Progs ; 5 Aug. 1833. No. 312 B. 'Proceedings of the Barasat Trial' (June-July 1832)
Para 2 : "They ... openly proclaimed themselves masters of the country, asserting that the period of British rule had expired, and that the Mahomedans from whom the English had usurped it, were the rightful owners of the empire"
Para II : "A standard with a peculiar device and inscription upon it which Mr. Alexander [Joint Magistrate of Barasat] understood to be symbolic of sovereignty was ... found planted in the stockade [bamboo stockade]"

৪৩. বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর (পূর্বোল্লেখিত), পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৪৪. Bengal Judicial Criminal Progs : 3 April 1832, No. 87. Letter from Nadia Magistrate to the Deputy Secretary, Govt. of India, Judicial Dept, 21 Nov, 1831. ম্যাজিষ্ট্রেট এ সম্পর্কে লেখেন ঃ "... a paper written in Bengalee and signed in the Arabic character, was put into my hand, purporting to be an order from *Allah* to the Pal Chowdrys at Ranaghat to supply Russud etc. for the army of the Fu Keers, who were to fight with the Government, in default of which, a promise was made to visit them in seven or eight days, and make *Hidayut Oollahs* [Converts to Titu Meer's doctrines] of them. A similar document was forwarded to me, under the title of *Judge Magistrate* holding out threats in case of resistance", [Para 2] বিহারী লাল সরকার ও (তিতুমীর, পুস্তক বিপণি সংস্করণ, ১৯৮১) গোকনা গ্রামের জমিদার রামনিধি হালদারকে লেখা এক পরোয়ানার উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ৪৭

৪৫. তিতু নাকি তখন বলেছিল ঃ "ভয় পাইও না। যখন মরিতেই হইবে, তখন যুদ্ধে

মরিবার জন্য ভয় কেন? কোরাণে লিখিত আছে, যুদ্ধে মরিলে মানুষ 'ভেস্তে' (বেহেস্তে) যায়"। বিহারীলাল সরকার, পূর্বোল্লেখিত। পৃঃ ৫৪

৪৬. গিরীন্দ্রনাথ দাস সাজন-গাজীর 'তিতুমীরের গান'-এর যে সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন, তাতে এক উল্লেখ আছে ঃ "ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ মৃত্যু পণ করেছে, ধর্মের শক্তিতে মোরসেদ বা নেতার হুকুম তামিল করতে তারা প্রস্তুত। বন্দুককে তারা তুচ্ছ মনে করে। ইসলাম প্রচারক বিরাট ফকির (মসের আলি) নিসার আলিকে মারবে এমন সাধ্য কার? তিনি যে মক্কার হাজি"। গিরীন্দ্রনাথ দাস, পূর্বোল্লেখিত ; পৃঃ ১৮৭

৪৭. বালাকোটের যুদ্ধের (মে ১৮৩১) প্রায় বার বছর (১৮৪৩) পরেও ওহাবীদের এ বিশ্বাস অটুট ছিল। সরকারী দলিলের ভিত্তিতে জানতে পারি, ১৮৪৩ সালে ওহাবীরা আবার শিখ-বিরোধী যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। লোকজন, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ওহাবী প্রচারকরা বারাসত, যশোর, রাজশাহী, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলে যায়। নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে Superintendent of Police, Lower Provinces (Dampier) লেখেন ঃ "I understand that they declare Syed Ahmed, the former leader in the war against the Sikhs, to be still alive, and that he will lead the army to assembled." [Bengal Judicial Criminal Progs : 29 May, 1843, No 21 ; Dampier's letter to the Secretary, Govt. of Bengal, Judicial Department, 29 March, 1843]

৪৮. 'হরুগীতি' নামক তিতুর এক জীবন-কাহিনীতে আছে ঃ

"কামানের শব্দ শুনে ফকির পানে মৌলুবী চায়
বুজরুগী সব ফাঁকি জান পেলোরে হায়।
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে
এ দ্যাখ গোল্লা খাই হজরতের বরে"

(রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব (কলিকাতা, ১৯৮২) পৃঃ ২৭৩। এ ধরনের আরো একটা গানের জন্য পৃঃ ২৬৪ দ্রষ্টব্য)

৪৯. Bengal Judicial Criminal Progs : 6 Dec. 1831, No 50, E. P. Smith, Nadia Magistrate to the Commissioner Nadia Division, 26 Nov. 1831. ম্যাজিস্ট্রেটের ধারণা ঃ "Indeed their total want of method in rushing on their own destruction betokens anything but a deep-laid and extensive conspiracy against the Government of the country" (Para 10)

৫০. Bengal Judicial Criminal Progs ; 6 Dec. 1831, No. 49, Commis-

sioner, Nadia Division to the Secretary, Govt. of India, 28 Nov. 1831

৫১. Bengal Judicial Criminal Progs ; 22 Nov. 1831, No. 72, Nadia Magistrate to the Officer in Command of the Military force at Bongong, 19 Nov. 1831, Para 2

৫২. W. C. Smith, *Modern Islam in India : A Social Analyses* (Lahore 1943) : Smith এর সিদ্ধান্ত ঃ "The movement ... though religious, was not simply communalist, The ... movement ... did not set the lower class muslims against lower class Hindus in open conflict, nor did if divert the lowest class muslims from economic issues to a false solidarity with their communal friends but class enemies." পৃঃ ১৯৩

৫৩. Abhijit Dutta, পূর্বোল্লেখিত। পৃঃ ১৭০-১৭১

৫৪. Bengal Judicial Criminal Progs : 3 April 1832, No 5 ; Colvin Report-এর Para 36. Colvin স্বীকার করেছেন ঃ "The entire root of the mischief which has occurred lies deep. The powers possessed by zamindars enable them to exercise a petty jurisdiction among their ryotts, and to make petty exactions on all kinds of pretences."

৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য Abhijit Dutta, পূর্বোল্লেখিত, দ্রষ্টব্য ; অষ্টম পরিচ্ছেদ। এর একটা কারণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ইউরোপীয় নীলকরদের সামাজিক সম্পর্কের কথা তারা জানত। তাছাড়া কৃষকদের মধ্যে ওহাবী প্রভাব বৃদ্ধিতে নীলকরেরাও শঙ্কিত হয়।

৫৬. জানা যায়, ১৮৩১-এর প্রায় পাঁচ বছর আগে এ অঞ্চলে ওহাবী প্রচার শুরু হয়েছিল।

৫৭. তিতুমীরের গান (পাদটীকা নং ৩৫ দ্রষ্টব্য)—বইতে অন্তর্ভুক্ত কোন কোন গান থেকে এ ধারণার সমর্থন মেলে। ওহাবীদের ধারণা ছিল, তাদের প্রচার এতে কারোর 'খেতি'র (ক্ষতি) বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। (গিরীন্দ্রমোহন বসু, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১৮৮)

৫৮. বিহারীলাল সরকারের বইতে (তিতুমীর) এ ধরনের ঘটনার বিবরণ আছে।

৫৯. Abhijit Dutta-র (পূর্বোল্লেখিত) একটা মন্তব্য এখানে উধৃতি করছি ঃ "Titu Meer called for the total rejection of all traces of Hinduised culture from the body politic of rural Islam. He, moreover, characterised the Hindu accretions creeping into rural Islam as unholy, evil, dissolute ... These baneful characterizations ... issue only from the mouth of a rabid communalist who forcefully propagates his faith not only with the positive intention of purifying Islam, but with the ulterior

motive of fomenting Hindu-Muslim communal tension in the countryside.'' (পৃঃ ১০৫)

৬০. কৃষকদের এ ধরনের জটিল মানসিকতার এক মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য : G. Pandey, 'Rallying Round the Cow : Sectarian Strife in the Bhojpuri region : C 1888-1917', in R. Guha (ed) *Subaltern Studies,* II, (O.U.P. 1983) ; প্রবন্ধের Section VI

৬১. Abhijit Dutta, পূর্বোল্লেখিত, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৬২. মইনুদ্দীন আহমেদ খানের এ মত দত্ত উধৃত করেছেন। পৃঃ ৯৫-৯৬

৬৩. বারাসাত বিদ্রোহের ঠিক আগে এ সম্পর্কে তিতুর কি ধারণা ছিল তা জানা যায় না। আবদুল গফুর সিদ্দিকী (শহীদ তিতুমীর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৬৮) কলকাতায় ওহাবীদের এক সমাবেশে (সন তারিখের কোন নির্দেশ নেই) তিতুর এক ভাষণের উল্লেখ করেছেন। তাতে তিতুর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিতুর ভাষণের কিছু অংশ উধৃত করছি : "বাংলা দেশের মুসলমানদের ঈমান খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে পাকা মুসলমান করিতে না পারা পর্যন্ত বাংলার তরফ হইতে জিহাদ ঘোষণা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। আমি তাহাদের মধ্যে ইসলামের ব্যবস্থা করিতেছি। কেবল তাহাই নহে। আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারে। ... কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির উপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নহে। আমরা যদি মুসলমানদিগকে পাকা মুসলমান করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ করতঃ বিলাতী ও দেশী নীলকর দিগকে শায়েস্তা করিতে পারি, তাহা হইলে কেন্দ্রের (ওহাবীদের পাটনা কেন্দ্র) নির্দেশ মান্য করিয়া, কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া কেন্দ্রকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না" (পৃঃ ৩৬), এ ধরনের অজস্র প্রত্যক্ষ উক্তি সিদ্দিকী নানা জনের উপর আরোপ করেছেন। এদের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। পারিবারিক দিক থেকে সিদ্দিকী ওহাবী ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। তিতুর এক সহযোদ্ধা গোলাম মাসুম ছিলেন সিদ্দিকীর 'বড় চাচা আব্বা ... সুফি খোদদাদ সিদ্দিকী রাজীর শ্যালক পুত্র' (পৃঃ ৭১) কিন্তু এ ধরনের নানা প্রত্যক্ষ উক্তি বিশ্লেষণ করলে তাদের অনৈতিহাসিকতা (এবং অবাস্তবতা) সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। বর্তমান প্রবন্ধে এ আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুত, তিতুর ঘনিষ্ঠ নানা সহযোগীর মুখে লেখক যেসব প্রত্যঙ্গ উক্তি আরোপ করেছেন। তাতে বোঝা যায়, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল "উচ্চবর্ণের হিন্দু", নীলকর। খ্রীষ্টান পাদ্রী ইত্যাদী গোষ্ঠীর সম্মিলিত এক "চক্রান্ত" ব্যর্থ করা; এ চক্রান্ত হল : "মুসলমানদিগকে পথভ্রষ্ট করা

এবং ইংরাজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তথা ইংরাজ সরকারকে শক্তিশালী করা।" আর ওহাবীদের উদ্দেশ্য প্রাক্তন মুসলমান রাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা (পৃঃ ৭৩-৭৪)। বিদ্রোহ চলাকালীন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কোন চেষ্টা তিতুর পক্ষ থেকে হয় নি।

৬৪. Bengal Judicial Criminal Proceedings : 6 Dec. 1831. No. 49. কমিশনারের চিঠিতে (28 Nov. 1831) ওহাবীদের 'fanatics' বলা হয়েছে (Para 4)

৬৫. একই ; কমিশনারের ধারণা ঃ "The insurrection was entirely local" ... probably if the Sirdar dacoit Teetoomeer and other dacoits also, who, it seems, were of the party, had not been there, the insurrection would never had advanced to the atrocious and murderous character it subsequently assumed" [Para 9]

৬৬. Bengal Judicial Criminal Progs ; 6 Dec. 1831, No 51 ; Deputy Secretary, Govt. of India, Judicial Dept. to Nadia Commissioner, 6 Dec. 1831. -এ নির্দেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ "The fact that some of the sects in a cretain part of country were found in arms by no means justifies the seizure of others who profess the same tenets and who may be conducting themselves peaceably." [Para 2-3]

৬৭. স্পষ্টতঃ তিতু-বিরোধী মনোভাব থেকে লেখা তিতু-জীবনী 'হরু গীতি'তে অনেক বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য আছে। যেমন (ফকিরের বুজরুগীতে লোক হল পুঁড়া ছাড়া')। (রণজিৎকুমার সমাদ্দার, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২৬৯)

৬৮. Bengal Judicial Criminal Progs : 29 May, 1843. Nov 25 : Dampier, Superintendent of Police, Lower Promiccs to the Secretary, Govt. of Bengal, 13 may 1843. ড্যাম্পিয়ার জানতে পারেন ঃ They [Farazis] also hold though not openly, that as God made the earth Common to all men, payment of rent is contrary to His law and they frequently resist all demands on this account, especially from Hindu zamindars" (Para 8). ১৮৪৭ সালে লেখা ঢাকা বিভাগের কমিশনারও (J. Dunbar) এর উল্লেখ করেন। আবওয়াব তো বটেই, এমনকি বৈধ খাজনা আদায়েও তারা জমিদারকে বাধা দেয়। "They would withhold it [rent payment] altogether, if they dared ; for it is a favourite maxima with them that the earth is God's who gives it to his people ; the tax is accordingly held in abomination, and they are taught to look forward to the happy time when it will be abolished" [Bengal Judicial Criminal Progs ; 7

April, 1847, No, 99.] Dunbar এর চিঠিতে (১৮ মার্চ ১৮৪৭) Para 7. পরবর্তী একটা চিঠিতে (২০ এপ্রিল ১৮৪৭) Dunbar লিখছেন, এজন্যই জমিদারেরা নানাভাবে চেষ্টা করে, যাতে ফরাজীরা তাদের এলাকায় চাষী হিসেবে না থাকতে পারে : "It is within my knowledge that strennous measures for their expulsion from the estates of landholders who do not approve of their doctrines, have been adopted, and carried out with success". [Bengal Judicial Criminal Progs ; 28 April, 1847, No. 128] Dunbar এর চিঠির Para 2

৬৯. Bengal Judicial Criminal Progs : 3 April, 1832, No. 6 C "One of the followers of the Hajee [Sariatullah] wished to bring his brother over to that sect, and on his not consenting, a large body of persons attacked and plundered the village in which he lived, with the view to bringing about conversion by force'. He repeated the attack the next day."

৭০. Bengal Judicial Criminal Progs, 16 April, 1839, No. 51. ফরিদপুর ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি (৭ এপ্রিল ১৮৩৯)

৭১. ফরাজীদের নানা বিবরণ এবং পুঁথির উপর নির্ভর করে মইনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ জমিদারী পীড়নের এ সব কৌশলের নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। (*History of the Faraidi Movement in Bengal (1818-1906).* Karachi, Pakistan Historical Society, 1965), পৃঃ ২৬-২৭

৭২. Bengal Judicial Progs : 23 Jan, 1850, No. 61. Doodoo Meah's petition to the Government, 1 January, 1850 (Para 4)

৭৩. Bengal Judicial Criminal Progs ; 29 May, 1843, No. 25. Superintendent of Police, Lower Provinces, to the Secretary, Govt. of Bengal, 13 may, 1843, Para 10

৭৪. এ সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা আছে মইনুদ্দীন আহমদ খানের বইতে, পূর্বোল্লেখিত, (পাদটীকা নং ৭১) ; অষ্টম পরিচ্ছেদ।

৭৫. একই ; পৃঃ ২৫

৭৬. একই ; পৃঃ ৮৫-৮৬। মুইনুদ্দীন খাঁর মন্তব্য : "Haji Shariat Allah viewed the existence of social discrimination among the Muslims with grave concern and denounced it as a deadly sin ; because, in his opinion, such practices were contradictory to the spirit of the Quaran. He emphasised on the equality of all muslims and held that the Faraidi ... who have submitted most humbly, to the will of God, repented

for their past sins, and resolved to lead a more godly life in future, could not be subjected to unequal treatment or discrimination either among themselves or in the outside society" [p 85]

৭৭. Beng. Judicial Progs ; 7 April 1847, No. 99 ; Dacca Commissioner & Govt, of Bengal, 18 March 1847 : Para 5

৭৮. এ ধরনের সাহায্যকে ঢাকা কমিশনার আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সংগৃহীত 'O' Connell's Rent'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

৭৯. *"Translation of the Proceeding in two Cases tried in 1847 before the Sessions Judge of Dacca in which Doodoo Miyan and 63 of his followers belonging to the sect of Hadjees or Ferazees were charged with wounding, Plunder, Arson etc,* (Calcutta 1848). Appendix p. I Dunloop বলে : 'From that time I became a marked man amongst them'

৮০. একই

৮১. একই ; ডানলপের সাক্ষ্য (৩ আগস্ট ১৮৪৭)

৮২. একই পৃঃ ৩ [of the 'Proceedings'] Petition of Bharut Chunder Roy, Mohurir of the Faujdaree Court of Furreedpore রায় বলেন ঃ "Should any victim of their [Farazis'] tyranny, with a view to secure his property, seeks refuge with a zemindar or any other influential man, they do not feel any scruple to injure the party who thus opposes them ... Mr. Dunlop and the Baboos, having resisted the introduction of the doctrines of the prisoner [Doodoo Meah] among the ryots, have been brought into collision with the prisoner"

৮৩. একই পৃঃ ৩১১ ; Fatwa of the Law officer.

৮৪. Beng. Judicial Progs : 23 Jan 1850, No 61 Petition of I Jan. 1850

৮৫. মরিসন (যিনি পাগলপন্থী আন্দোলনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন) নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলির উল্লেখ করেছেন; গারো, হাজং, হাত্রি, ডালু, বোনাও (বানাই), বংশী এবং দাই। [Bengal Judicial Criminal Progs ; 5 Jan, 1826, No. 39., মরিসন রিপোর্টের Para II]

৮৬. একই

৮৭. একই ; "Ignorant and unlettered man" ; Para II

৮৮. Q. Ahmed, *The Wahabi Movement in India* (Calcutta, 1966) ; পৃঃ ৫-৯ ; Muin-ud-din Ahmed Khan, পূর্বোল্লেখিত; পৃঃ lxxix-lxxxii

৮৯. '... মুরিদদের কাছে নিঃসীম আনুগত্যের দাবি ... গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার

অন্যতম প্রকাশ মাত্র—গৌতম ভদ্রের এ মত বিচার-সাপেক্ষ (শারদীয়া সংখ্যা অনুষ্টুপ, ১৯৮৬), "পাগলাহ ধূম' ঃ ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ", পৃঃ প্র ৫৩) গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা (বারাসত, ১৯৭৬)

৯০. পৃঃ ২

৯১. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লিখিত (পাদটীকা নং ৮৯ দ্রষ্টব্য), পৃঃ প্র৫৫

৯২. মোহম্মদ জয়েনউদ্দীন, করিম শাহ্ ও টিপু শাহ (জামালপুর, ময়মন সিংহ, ১৩৩২, প্রথম সংস্করণ)

৯৩. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লিখিত ; (পাদটীকা নং ৮৯ দ্রষ্টব্য)

৯৪. ভদ্র নিজেও স্বীকার করেছেন, "সমসাময়িক সাক্ষ্যের মূল্য গ্রন্থটির নেই" (পৃঃ প্র৫৪)। পাগলপন্থী ঐতিহ্যের সামগ্রিক ইতিহাস হিসেবে এ বইয়ের মূল্য অপরিসীম। "পাগলপন্থীদের ধর্মজগৎ ও তাদের অতীত বিদ্রোহের ঐতিহ্যকে তারা কি করে তাদের স্মৃতিতে ধরে রেখেছে", এ প্রসঙ্গেই গ্রন্থটির মূল্য। কিন্তু বহু আগের এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের রূপ বোঝার জন্য এ "স্মৃতি" নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। এ স্মৃতি 'যৌথচেতনার ভাণ্ডার'; কিন্তু, 'যৌথচেতনা' এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ; কোন্ কোন্ নূতন উপাদান এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার নিপুণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৯৫. একই; পৃঃ প্র৫৬-৫৭

৯৬. মরিসনের রিপোর্ট, পূর্বোল্লেখিত, (পাদটীকা নং ৮৫ দ্রষ্টব্য), Para II

৯৭. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ প্র ৬৫

৯৮. মরিসন রিপোর্টের Para II

৯৯. একই

১০০. নানাভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হলেও মরিসনের দীর্ঘ রিপোর্ট এবং তাঁর সংগৃহীত অন্যান্য দলিল এ পরিবর্তন বোঝার জন্য অপরিহার্য। কারণ এ বিদ্রোহের সমসাময়িক অন্য কোন বিবরণ নেই। এ সব উপকরণ পাওয়া যাবে। Bengal Judicial Criminal Progs ; 5 Jan, 1820 ; Nos 39-41. অন্যান্য চিঠিপত্র পরে উল্লেখ করব।

১০১. একই; মরিসন রিপোর্ট, Paras 36-64

১০২. একই Para 54 ঃ ৯ জানুয়ারী, ১৮২৫ এর এক পুলিশ রিপোর্ট মতে ঃ "The people refused to work for the zamindars and say their caste is disgraced by working on the road and cutting grass for the horses"

১০৩. একই; মরিসন রিপোর্ট ; Para 12 ; বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সত্যিকারের কাঠের বন্দুক আদালতে

দেখানো হয়েছিল ; যে সব বিদ্রোহীদের বাড়ী থেকে পুলিশ এ সব বন্দুক উদ্ধার করে, তাদের কিন্তু সবারই বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রও ছিল।

১০৪. একই ; Para 33

১০৫. একই ; Para 54

১০৬. Bengal Judicial Criminal Progs . 1 April 1825, No. 87 ; W. dampier. Mymensingh Magistrate to Dacca Court of Circuit. 31 March 1825 বিদ্রোহীদের মুখে শুধু একটাই কথা—টিপু ছাড়া কারো শাসন তারা মানবে না। মার্চের (১৮২৫) মাঝামাঝি Dampier এসে হুকুমনামা জারী করে বলেন, কৃষকেরা যেন তাদের অভাব অভিযোগ তার কাছে পেশ করে; সাদা কাগজে করলেও চলবে; বিদ্রোহীরা এর কোন তোয়াক্কাই করল না। এক পুলিশ বরকন্দাজ, থানার তিন পেয়াদা, আর জমিদারের ছয় পেয়াদাকে আটকে রেখে দিল। বিদ্রোহীরা গ্রামে গ্রামে নির্দেশ পাঠাল ঃ "none should pay revenue excepting to Tippoo Pagle whom they proclaimed their chief, and where any opposition or unwillingness was shown they proceeded in discriminately to plunder." [Para 2]

১০৬ক. একই ; "I considered that this portion of the district was almost in a state of rebellion." [Para 2]

১০৭. Bengal Board of Revenue Progs ; 20 Aug, 1830 ; No 33 ; Petition of some ryots of Pergunnah Sherpur and Alap Singh (no date)

১০৮. Bengal Judicial Criminal Progs ; 13 May, 1833 ; Nos 15-16

১০৯. একই ; Proceeding No 16 ঃ ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট Dunbar লিখছেন (১ মে ১৮৩৩) ঃ "they have taken possession of the whole country between Sherpur and the Garrow Hills, and compel the ryots to pay contributions, made in the name of Jonakoo Pauter who may be considered as their chief leader." [Para 2]

১০৯ক. একই

১১০. Bengal Judicial Criminal Progs ; 22 Feb 1833, No 34, Dunbar to Dacca Commissioner, 8 Feb 1833, Para 2

১১১. পাগলপন্থী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে ও অলৌকিক শক্তির কোন ভূমিকা নেই, Schendel-এর এ সিদ্ধান্ত বিচারসাপেক্ষ। এটা সত্যি যে এ ধরনের অনেক আন্দোলনে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরতা অনেক বেশী ছিল। কোথাও কোথাও এমনও দেখা গেছে, শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য

বিদ্রোহীরা কোন ব্যবস্থাই করেনি। তাদের বিশ্বাস ছিল, অতি প্রাকৃত শক্তির আবির্ভাব আসন্ন; তাদের প্রধান করণীয়, শুধুমাত্র অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করা; তাকে স্বাগত জানাবার জন্য সমবেত প্রার্থনা, গান বা নৃত্যের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত এক মানসিকতা তৈরী করা। শত্রুর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের একটা মাত্র রূপ, এটা তারা বিশ্বাস করত না।

পাগলপন্থী আন্দোলনে এ ধরনের নিশ্চেষ্ট প্রতীক্ষার ভূমিকা ছিল সীমাবদ্ধ। বিদ্রোহীরা অবশ্যই যাদুশক্তি, মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তাদের ধারণা তাদের নেতার মধ্যেই অতিপ্রাকৃত শক্তি মূর্ত হয়েছে। এর বাইরে কোন শক্তির কথা সম্ভবতঃ তারা কল্পনা করেনি। নেতার এ শক্তির উৎসও এক ধরনের যাদুশক্তি। এ শক্তিকে অতিপ্রাকৃত বলা চলে এ কারণে যে শুধুমাত্র নেতারই এ ক্ষমতা আছে। তাদের বিশ্বাস .... ব্যাহত হবে।

১১২. ভিন্ন এক মত ব্যক্ত করেছেন গৌতম ভদ্র। পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ প্র ৯৪ ঃ 'অনিবার্য পরাজয়ের আশঙ্কা ও সাময়িক সাফল্যের অভিজ্ঞতাই জীইয়ে রাখে ধর্মভাবকে। কৃষক তার তৈরি কর্মকাণ্ডের নেতা খুঁজে বেড়ায় ধর্মীয় পীরে। সাফল্যকে স্থায়ী করে রাখতে চায় পীরের অলৌকিক যাদুবিদ্যায় ..."

১১৩. Bengal Judicial Proceedings : 6 Dec 1855 : No 52. বন্দী সাঁওতাল রঞ্জিৎ মাঝির বিবৃতি। ধার ধানে নিলে 'সুবা' পঁচিশ শতাংশ সুদ অনুমোদন করে।

১১৪. দামিন-ই-কোর সুপারিনটেণ্ডেন্ট পণ্টেট ১৮৪৯এর ২২শে মে'র এক রিপোর্টে সাঁওতালদের এ অভিযোগের উল্লেখ করেন। Bengal Judicial Proceedings : 14 Feb, 1856, No. 157. বিদ্রোহের উপর লেখা বীডওয়েলের রিপোর্টের Para 46

১১৪ক. Bengal Judicial Proceedings ; 4 Oct 1855, No. 16. রাজমহলে 'সাহেবদের' কাছে পাঠানো সিধু/কানুর স্বাক্ষরিত যে পরোয়ানায় মহাজন ও সাহেবের 'পাপ'-এর কথা বলা হয়েছে তার তারিখ দেওয়া আছে ঃ ১০ শ্রাবণ, ১২৬২

১১৪খ. আর্জির তারিখ ২৯ আগস্ট, ১৮৫৪। (বীডওয়েলের রিপোর্টের Para 74-এ উল্লেখ আছে। এ রিপোর্ট (১০ ডিসেম্বর ১৮৫৫)-এর reference এর জন্য পাদটীকা নং ১১৪ দ্রষ্টব্য।

১১৫. Bengal Judicial Proceedings ; 9 Nov 1854 ; No 85 : ভাগলপুর কমিশনারের লেখা চিঠি 29 Aug, 1854.

১১৬ ভাগলপুর বিভাগের কমিশনের মন্তব্য ঃ "The occurrence of so many dacoities in quick succession ... excited surprise and alarm" [Para 3]

১১৭. একই ; Para 5-6

১১৮. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July 1855 ; No 44. ভাগলপুর কমিশনারের লেখা চিঠি—9 July, 1855. Para 5, "The Sontals had collected ... to the number of 6 or 7000, for the purpose (it was rumoured) of avenging the punishment inflicted on their comrades concered in last year's dacoities. These dacoities were committed on the Bengalee Mehajuns who had oppressed them, and they complained that their comrades had been punished, while nothing had been done to the mehajuns whose exactions had compelled them to take the law into their own hands."

১১৯. F. B. Bradley-Birt, *The story of an Indian Upland* (London, 1905) ; পৃঃ ১৮৩-৮৫। এ অনুবাদ সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ নয়। সরকারী দলিলে সাঁওতাল মানসিকতায় এ ধরনের পরিবর্তনের কোন উল্লেখ আমি পাইনি।

১২০. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস। (কলিকাতা, ১৯৭৬); নবম অধ্যায়। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ঃ (Additional Account by Old Jugia', in skrefsurd, Bodding, Konow (tr & ed). *Traditions and Institutions of the Sontals* (Oslo, 1942), পৃঃ ১৮৯-৯১

১২১. বিদ্রোহের মানসিকতার প্রসারে গুজবের ('anonymous speech in its classic form') ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ Ranjit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (O. U. P., 1983) পৃঃ ২৫১-২৭৭

১২২. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৬৩-৬৫

১২৩. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec 1855 ; No. 132 ; 'Examination of Kanoo Santal'.

১২৪. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec 1855 ; No. 83 : 'Statement of Insurgent Sonthals'.

১২৫. Bengal Judicial Proceedings ; 8 Nov 1855 : No 26 ; 'Examination of Sedoo Sonthal late Thacoor'.

১২৬. ব্রাডলি-বার্টের বইতে অন্য ধরনের বর্ণনা আছে। পূর্বোল্লেখিত; পৃঃ ১৮৫-৮৬

১২৭. টেলরের (যিনি নূতন রেলপথ বানানোর কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন) বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "the Sonthals from living such a lazy drunker life for sometime past had got into a very excited inflammable state, and the leader perceiving this ... formed a plan to plunder the Country ... They know that the only way to get the Sonthals to work upon their superstitions, and impose upon them the story of the Thacoor having given them the order to do so" বিদ্রোহের উপর বীডওয়েলের রিপোর্ট (পূর্বোল্লেখিত) : Para 27. বীডওয়েল টেলরের এ সিদ্ধান্ত মোটামুটি মেনে নেন। "a spirit of resistance nursed by the drinking and dancing assemblies"—তিনিও এর উল্লেখ করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত : "At any rate an inflammatory state was produced, which required but a spark to set the whole Damin in a flame. This spark was supplied by the pretended divine revelation to seedoo.' Para 76. ক্যাপ্টেন শেরউইল (Revenue Surveyor on Special Duty) একই কথা বলেছেন : "When his [Santal's] ideas are assisted by the powerful Muhooa spirit or by smoking ganja ... the Sonthal may be driven to acts of violence and desperation" (Bengal Judicial Progs ; 14 Feb, 1856, No 159)

১২৮. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug 1855, No. 306. মুর্শিদাবাদ ম্যাজিস্ট্রেটের এ রিপোর্টের তারিখ ২৫ জুলাই, ১৮৫৫. Paras 6, II

১২৯. Bengal Judicial Proceedings ; 14 Feb, 1856 : No. 166. বীডওয়েলের কাছে W. C. Taylor (East India Railway)-এর চিঠির তারিখ ২ অক্টোবর, ১৮৫৫

১৩০. আগেকার আবেদন ও আর্জির সঙ্গে এ সব পরোয়ানার পার্থক্য মৌলিক। এখানে বিশেষ কোন সাঁওতাল অঞ্চলের অভিযোগ নেই। অভিযোগ আসছে নূতন সাঁওতাল ধর্মগুরু সিধু-কানুর থেকে; অভিযোগ স্থানীয় আদালত বা থানার কাছে নয়; সাঁওতালদের সব শত্রুগোষ্ঠীর কাছে, সরাসরি। সব থেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য—এ পরোয়ানা আসলে এক সতর্কবাণী : সাঁওতালদের সম্পর্কে দিখুরা তাদের অভ্যস্ত হালচাল পাল্টিয়ে ফেলুক ; পরোয়ানা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাতে হবে।

১৩১. A. C. Bidwell কে 'Special Commissioner for the suppression of the Sonthal Insurrection' নিযুক্ত করা হয়। বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখেন তিনি।

১৩২. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug, 1855, No. 221. এ পরোয়ানার নকল ভাগলপুর ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির (২৪ জুলাই ১৮৫৫) সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল।

১৩৩. Bengal Judicial Proceedings ; 4 Oct. 1855 ; No. 20

১৩৪. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 219

১৩৫. এ চিঠির সূত্রের জন্য পাদটীকা নং ১২৯ দ্রষ্টব্য

১৩৬. Bengal Judicial Proceedings, 19 July, 1855, No. 17. 'শ্রীযুক্ত' থেকে টেলরের লেখা চিঠির তারিখ 7 July 1855

১৩৭. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1855, No. 2. A. Eden -এর চিঠির তারিখ ৯ জুলাই ১৮৫৫

১৩৮. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1852, No. 3

১৩৯. Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug, 1855, No. 129. নদীয়া বিভাগের কমিশনারের কাছে এ বিবৃতিসহ লেখা চিঠির তারিখ ২৯ জুলাই ১৮৫৫

১৪০. Bengal Judicial Proceedings ; 6 Sept. 1855, No. 118 বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের চিঠির তারিখ ৯ আগষ্ট ১৮৫৫। Para 5

১৪১. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug 1855, No. 116. বীরভূম ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠির তারিখ ১৯ জুলাই '৫৫

১৪২. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug 1855, No. 57

১৪৩. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1885, No. 46

১৪৪. Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug. 1855, No. 30

১৪৫. Bengal Judicial Proceedings ; 4 Oct 1855, No. 60 ; ২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৫-এ লেখা বীরভূম কালেক্টরের ডায়েরী।

১৪৬. Bengal Judicial Proceeding ; 19 July 1855, No. 21 ; "The Deposition of Sheikh Summoo taken on Oath on 9 July 1855 before the Assistant Magistrate of Aurangabad.

১৪৭. Bengal Judicial Proceedings ; 8 Nov 1855, No. 26, 'Examination of Sedoo Sonthal, late Thacoor'.

১৪৮. একই

১৪৯. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec 1855, No. 83. 'Statement of Kanoo Manjhee of Bangnodee, Tacoor Sobah, aged 34 ...'

১৫০. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug, 1855 No. 205. ভাগলপুর কমিশনারের চিঠির তারিখ ২৯ জুলাই '৫৫, দীঘার থানার

১৫১. Bengal Judicial Proceedings : 23 Aug. 1855, No. 306

১৫২. একই 19 July, 1855, No. 45. ভাগলপুর ডিভিসনের কমিশনারের কাছে তারা সাক্ষ্য দেয়। কমিশনারের চিঠির তারিখ, ১০ জুলাই, ১৮৫৫

১৫৩. একই; 14 Feb. 1856 : No. 161. Droese, Church Mission Society to Bidwell, 8 Oct. 1855. 'মোর্গো রাজা'কে Droese বলেছেন : 'a sonthal chief, a chief of chiefs'.

১৫৪. একই ; 14 Feb, 1856, No. 159. W. S. Sherwill to Bhagalpur Commissioner, 24 July, 1855 ; Para 4

১৫৫. একই ; 23 Aug, 1855 ; No. 47. ভাগলপুর ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন (16 July 1855) : " ... the entire extirpation of the Sontal tribe will be the only way to ensure peace" ; Para 2

১৫৬. Bengal Judicial Progs ; 23 Aug, : 1855, No. 63 কমিশনারের চিঠির তারিখ ১৮ জুলাই, ১৮৫৫

১৫৭. Bengal Judicial Progs ; 19 July 1855, No. 2

১৫৮. Bengal Judicial Progs ; 6 Sept 1855, No. 76 ; Officiating Secretary to the Government of India, Military Department এর চিঠিতে (20 Aug 1855) পাহাড়িয়াদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "the hill men who are the deadly enemies of the Sonthal tribes, and are now aiding us in hunting them out of their jungles"

১৫৯. Bengal Judicial Progs ; 14 Feb, 1856, No. 160. J. H. Barnes to Bidwell, 15 Oct 1855

১৬০. Bengal Judicial Progs ; 23 Aug, 1855, No. 301. কমিশনারের চিঠির তারিখ 28 July 1855। কমিশনারের মতে, এদের এবং বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সাঁওতালদের একই ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত; Para 7

১৬১. Bengal Judicial Progs ; 23 Aug, 1855, No. 303. শেরউইলের চিঠির তারিখ ২৮ জুলাই, ১৮৫৫

১৬২. Bengal Judicial Progs ; 30 Aug, 1855 ; No. 140. ভাগলপুর কমিশনারের চিঠিতে (3 Aug 1855), গণপতকে বলা হয়েছে : "the head spy and guide" ; Para I

১৬৩. Bengal Judicial Progs ; 6 Dec, 1855, No. 170 বেচুর এ কাজকে বলা হয়েছে : "an overt act of rebellion"

১৬৪. Bengal Judicial Progs ; 22 Nov, 1855, No. 60. H.L. Pester নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষের চিঠি (3 Nov. 1855)

১৬৫. হাজারীবাগে "মীরসাহেব" বলে পরিচিত একজনের সঙ্গে সাঁওতালরা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। সরকার পক্ষের অনুমান, মীর সাহেব আসলে সিন্ধু প্রদেশের প্রাক্তন এক আমীর আব্বাস আলি। সাঁওতালরা তাকে 'সুবা' বলে জানত; বলত, সে কোন রাজার ছেলে। মহেশ দত্তের খুন হবার (৬ জুলাই '৫৫) চারদিন আগে সিধু মাঝি ধানু মাঝির হাত দিয়ে তার কাছে চিঠি পাঠায়। নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য ছিল, আসন্ন বিদ্রোহে তার সহযোগিতা চাওয়া। 'মীর সাহেবের' সঙ্গে সাঁওতালদের আগের পরিচয় ছিল খুবই সামান্য। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার খোঁজ নিয়ে জানেন, মীর সাহেবের শিকারে যাওয়ার সময় সাঁওতালদের কেউ কেউ শিকার ধরার কাজে সাহায্য করার জন্য যেত ('Jungle-beaters')। মীর সাহেবের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কিন্তু যোগাযোগ হয়নি। সে সময় সাহেব নাকি হাজারিবাগে ছিল না। চিঠি পড়ে তার এক 'ভৃত্য' নাকি বলে সাঁওতালদের উচিৎ সরকারের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলা। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সরকারী দলিল দ্রষ্টব্য ঃ (ক) Bengal Judicial Progs ; 30 Aug, 1855, No. 146. ভাগলপুর কমিশনারের সহকারীর লেখা চিঠি (২৫ জুলাই, '৫৫) ; (খ) Bengal Judicial Progs; 6 Sept 1855, No. 107, ভাগলপুর কমিশনারের লেখা চিঠি (২০ আগস্ট, ১৮৫৫), (গ) Bengal Judicial Progs ; 6 Dec 1855, No 52 ; "Statement of Ranjeet Manjee" (রণজিৎ এক সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে)।

১৬৬. Bengal Judicial Progs : 30 Aug, 1855, No. 130. সিধু-কানুর কাছে লেখা কিছু চিঠি এবং তাদের কোন কোন উত্তর এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে এ গোপনীয় চিঠিগুলি পড়ে। তাদের একটা মূল কথা হল ঃ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ক্রমেই বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলেছে; ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই শক্ত হয়ে উঠছে; তাই সিধু কানু যাতে যত সত্বর সম্ভব, আরো সামরিক সাহায্য পাঠান। 'Paper No. 6' বলে উল্লেখিত চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে, সাঁওতালরা যে নির্বিচারে গ্রাম 'লুঠ' করেছে, তার জন্য সিধু-কানুর সম্মতি আছে কিনা। "সব শ্রেণীর ব্যবসাদারেরা সিধু-কানুকে লিখছে, তারা যেন সেখানে এসে সব খোঁজ নেয়। এ সব ব্যবসাদারদের ধারণা, এ লুঠে সিধু-কানুর কোন সম্মতি নেই; সাঁওতালরা তাদের নির্দেশ সরাসরি 'অমান্য' করছে।

১৬৭. Bengal Judicial Progs ; 20 Dec 1855, No. 132 ; Examination of Kanoo Sonthal'

১৬৮. Bengal Judicial Progs : 6 Sept 1855. No 118, পাঁচ সাঁওতাল মাঝি বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে এ সব কথা বলে। তাদের নাকি বলা হয়েছিল : "they were assured that no one could stand before them, that none of their people should be killed, that [if killed] they would be restored to life ... that a small knife should have amiraculous power to sweep away a mass of opponents ..." কমিশনারের চিঠির তারিখ ৯ আগস্ট, ১৮৫৫

১৬৯. Bengal Judicial Progs : 30 August 1855. No 129 : কমিশনারের কাছে লেখা চিঠির (২১ জুলাই) Para II

১৭০. *Man in India :* Rebellion Number, December 1945 ; W. J. Culshaw & W. G. Archer, 'The Santhal Rebellion' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Chotrac Deshmanhi-র মন্তব্যের অনুবাদ : "... We Santals came in sorrow and misfortune through the rebellion ... instead of blessing a great curse fell upon us ... after the rebellion we Santals began to sealter because of our hunger. For hunger, we Santals who set out to rule ourselves attached ourselves by hundreds to Deko for our living. Many returned to Sikar as day labourers, and for the most part people went to Bengal to work for Dekos as day labourers ..." p. 222

১৭১. Bengal Judicial Progs : Nov 1874. Nos 1-3 ; Boxwell, offg. Deputy Commissioner, Sonthal Parganas to the Commissioner, Sonthal Parganas, 1 Oct 1874, Para 46

১৭২. একই ; Para 52

১৭৩. Bengal Judicial Progs : June 1861, No, 371, Offg, Commissioner of the Sonthal Parganas to the Govt of Bengal, 24 May 1861, Para 25

১৭৪. Bengal Judicial Progs : July 1871, No. 156., Demi-Official from A. Money, Commissioner, Santal Parganas 21 June, 1971. কমিশনারের মত : "Since 1859 it [Rent Act X] has been the guide in all rent disputes ... The Zamindars and the law recognise the manjee in his capacity of settlement holder, merely as a farmer." ইজারাদার (farmer) হিসেবে মাঝির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর জমিদার যদি খাজনা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে মাঝির করণীয় কি? কমিশনারের মতে, মাঝি এ বিষয়ে আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করবে। আদালতের মামলা ব্যয়সাপেক্ষ

বলে মাঝি মামলার ঝামেলায় যেতে চাইত না। আর মাঝি জমিদারের খাজনা বাড়ানোর দাবী মেনে নিলে গ্রামের সাঁওতালরা স্বেচ্ছায় মাঝিকে দেয় অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। সাঁওতালদের সমাজ সংগঠনে এ সংহতি বোধ কমিশনার বুঝতে চান নি। তাই তাঁর এ উদ্ভট সিদ্ধান্ত ঃ "Unfortunately the Sontals are stupid, and, as a rule, consider their lot and the manjee's lot as bound up together."

১৭৫. Bengal Judicial Progs ; Feb 1867 . No 120. Deputy Commissioner, Santal Parganas to the Commissioner, Santal Parganas; 31 Jan, 1867. সহকারী কমিশনার একটা বিশেষ বাজার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ঃ 'before the Santhal Insurrection ... there were only 10 to 12 mahajuns and petty traders in the Lohundia Bazar whereas now there are nearly 80, principally Bhojpooria Bhukots (bhagats) coming from the district of Arrah''.

১৭৬. Bengal Judicial Progs : June 1861, No. 371 সাঁওতাল পরগণায় অস্থায়ী কমিশনারের চিঠির (২৪ মে, ১৮৬১) Para 17.

১৭৭. Bengal Judicial Progs ; May 1861 : No 524 ; Taylor, Assistant Commissioner, Sontal Parganas to the Govt. of Bengal, 5 May 1861. টেলর লিখেছেন, কানুর ফাঁসির আগের দিন সে নাকি টেলরকে এ কথা বলেছে ; সাঁওতালরা নাকি তার এ কথা শুনেছে। টেলরের বিশ্বাস, কানুর এ ভবিষ্যদ্বাণী সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে।

১৭৮. Bengal Judicial Progs : July 1865 ; No. 72 ; Wilmot, Assistant Commissioner ; Santal Parganas, to Commissioner, Santal Parganas, 17 June 1865.

১৭৯. Bengal Judicial Progs ; July 1871, No 163 ; Raja of Moheshpur to Deputy Commissioner, Santal Parganas, 3 July, 1871.

১৮০. Bengal Judicial Progs : July 1871, No 165 ; Govt. of Bengal to the Govt. of India, 11 July 1871. Para 3

১৮১. Bengal General (Misc) Proceedings ; Sept 1875, File No. 133—1/4. Bhagalpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1874-75 ; Para 76.

১৮২. Bengal Judicial Progs ; Nov 1874 ; Nos 1-3 ; Boxwell, Offg. Dy Commissioner, Santal Parganas to the Commissioner, Santal Parganas, 1 Oct, 1874 ; Para 19

১৮৩. একই ; The Revd. A. Stark, Church Missionary, to Barlow,

Commissioner of the Bhagalpur Division : 2 Sept 1874.

১৮৪. একই

১৮৫. Bengal Judicial Progs ; Aug 1881 : Nos 39-40. Reply From the Revd. F. F. Cole, of Bahawa in Rajmahal, Church Missionery Society to Question No. 7 : 'What is the origin of the Kherwar movement : ... ?'

১৮৫ক. একই ; Reply from the Revd. A. Stark of Taljhari in Rajmahal, church Missionary Society : to Question No 5 : "What do you think was the cause of the opposition to the Census ..."?

১৮৬. একই ; Barlow. Commissioner of the Bhagalpur Division to the Govt. of Bengal, Judicial Dept ; 8 June, 1881 ; Para 12

১৮৭. একই ; Appendix A : 'Note by the Deputy Commissioner of the Sonthal Parganas ; State of Affairs in the Sonthal Parganas" ; 16 March 1881

১৮৮. একই ; সহকারী কমিশনার Oldham-এর ভাষায় : "the Sonthals appeared to be shy, gloomy, and either anxious or expectant ..." ; Para 6

১৮৯. একই ; যে মিশনারীর কথা উধৃত করা হয়েছে, তাঁর নাম Cornelius, Jamtara Outpost ; Para 8

১৯০. একই ; Reply from Baboo Taresh nath Pandey, Zemindar of Pakour to Question No. 7 (পাদটীকা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য) : পাণ্ডের মন্তব্য : "It was some seven or eight years ago that some of the ordinary Sonthals, struck with the disparity between their own status and that of the Hindus about them, who were showing signs of life and improvement in every direction, were fired with a desire of bettering their own social and religious condition as preliminary to gaining political rights'

১৯০ক. একই ; Appendix C ; Reply from Captain Carnac, Assist. Commissioners, S. P. Answer to Question No. 8. Carnac এর মন্তব্য : "Their [Santal's] inferiority to their neighbours must have been felt amongst them ... the term 'Banga Santhal', 'Boka Sonthals', so frequently used towards them by their Hindu neighbours, must have been very galling."

১৯১. পাদটীকা নং ১৮১ দ্রষ্টব্য।

১৯২. একই। এর নাম মাতাদিন। কমিশনার তাকে "ex-mutineer of a cavalry

regiment ? বলে উল্লেখ করেছেন। ভাগলপুর জেলেই নাকি ভগীরথের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হয়। ১৮৬৮ সাল থেকে তাদের এ ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত থাকে। ভগীরথ-আন্দোলনের সময় বিদ্রোহী সিপাহি মাতাদিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কোন ইঙ্গিত সরকারী দলিলে মেলে না।

১৯২ক. আদম-সুমারী-বিরোধী আন্দোলনে মঙ্গল দাসের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

১৯৩. পাদটীকা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার খেরওয়ার আন্দোলন সম্পর্কিত বারোটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য জমিদার, মিশনারী, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রাজকর্মচারীদের কাছে পাঠন।

১৯৪. Bengal Judicial Progs ; March 1875, File 40-88. A Note of G. N. Barlow, Bhagalpur Commissioner, ''upon the course of events occurring in the Santal Pergunnahs subsequent to 1872, which have led to the state of affairs at the present time : date 9 March 1875 : Para 8

১৯৪ক. এ ধরনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। সাফারা ভগবানের একত্বের কথা বলতো ; কিন্তু হিন্দুদের নানা দেবদেবীর পুজোও করত (যেমন দুর্গা, কালী)। পূজানুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ঘি, দুধ এবং চালের ব্যবহার নানা জায়গায় দেখা গেছে। রুদ্রাক্ষের ('sacred beads') মালাও অনেকে পরত। কেউ কেউ মাথায় টিকি রাখত। তবে বৈষ্ণব গোসাঁইদের মত অনেকে লম্বা চুল বা দাড়ি রাখত; তাদের মত বিশিষ্ট কায়দায় কাপর পড়ত। সাফারা সাধারণতঃ হাঁড়িয়া খেত না, কিন্তু তাদের গাঁজায় আসক্তির কথা অনেকেই বলেছে। এও সম্ভবতঃ 'বাবাজী'দের প্রভাবের ফল। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তারা হিন্দুদের মত মাটির বাসনপত্র ভেঙ্গে ফেলে দিত। তারা শুয়োর আর মুরগী মেরে ফেলেছে, কিন্তু পায়রা, ছাগল এবং ভেড়া পোষাটা তাদের কাছে শুদ্ধাচারবিরোধী মনে হয়নি। চাষের জন্য গোরু-টানা হালের ব্যবহারে অনেক সাফার আপত্তি ছিল। পোশাকে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন, স্বল্পবাস ল্যাংগুটির বদলে ধুতির ব্যবহার।

১৯৫(১). Bengal Judicial Progs :Nov 1874, Nos 1-3 ; ভাগলপুর কমিশনার বার্লোর চিঠি (৭ অক্টোবর, ১৮৭৪) ; Paras 6-7 :

(২). তাছাড়া, Bengal Judicial Progs ; March 1875 . File 40-48 ; A Note by the Bhagalpur Commissioner, 9 March 1875 ; Paras 3 & 8

১৯৬. পাদটীকা নং ১৯৫ (১) দ্রষ্টব্য। Letter from Boxwell, Offg. Deputy Commissioner, Santal Parganas, 1 Oct. 1874 ; Para II

১৯৭. শুয়োর-মুরগী মারার ব্যাপারে গুরুর নির্দেশ পালনে কোন শিথিলতা সাফারা বরদাস্ত করেনি। এ সম্পর্কে এক সরকারী রিপোর্টে বিবৃত একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনার Carnac লিখছেন, "I have known a Kherwar in a fit of anger at the uncleanliness of a neighbours Sonthal run amok in his poultry yard and kill three or fowls before he could be stopped". Bengal Judicial Progs : Aug 1881, Nos 39 40 ; Appendix C : ভাগলপুর কমিশনারের ছয় নং প্রশ্নের উত্তর। সাফা ও ঝুটাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে তথ্যের জন্য ভাগলপুর কমিশনার প্রেরিত ৬-৮ নং প্রশ্নের নানা উত্তর দ্রষ্টব্য। মূলসূত্র একই; Appendix B

১৯৮. দক্ষিণ গুজরাটের দেবী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ ধরনের কয়েকটা ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন ঃ David Hardiman, "Adivasi Assertion in South Gujarat : the Devi Movement of 1922-23," in R. Guha [ed] : Subaltern studies, III, (O.U. P, 1984) পৃঃ ২১১-২১৭, বিস্তৃত আলোচনার জন্য, D. Hardiman, *The coming of the Devi : Adivasi Assertion in Western India* (O. U. P, 1987) : ch : 9

১৯৯. David Hardiman, পূর্বোল্লেখিত ; 'Adivasi Assertion in South Gujarat etc', পৃঃ ২১৭-২১৯

২০০. Martin Orans, *The Santal : A Tribe in Search of a Great Tradition,* (Wayne State University, Detriot, 1965), পৃঃ৩০-৩৯

২০১. পাদটীকা নং ১৯৫ (২) দ্রষ্টব্য ; File No : 40-89 ; Minute by the Lieutenant Governor of Bengal, 9 March, 1875 ; Para 3

২০২. একই ; File No 40–88 ; A Note by G. N. Barlow, Commissioner of the Bhagalpur Division, 9 March 1875 ; Para 7. কমিশনারের মতে, খাজনা-বিরোধী আন্দোলন এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে নিগূঢ় সংযোগ এ ক্ষেত্রে 'অনিবার্য'।

২০৩. পাদটীকা নং ১৮১ দ্রষ্টব্য। কমিশনারের নির্দেশ ছিল, মন্দিরটাকে ভেঙ্গে এক পুলিশ ফাঁড়ি বানানো হোক। আসলে সত্যিকারের সম্পূর্ণ মন্দির তা ছিল না। কমিশনার জানাত পারেন ঃ "...the shrine was represented by a mere shed containing a few rough stones"। পাদটীকা নং ২০২ দ্রষ্টব্য; কমিশনারের চিঠির (৯ মার্চ, ১৮৭৫) Para 4

২০৪. Bengal Judicial Progs ; Aug 1881, Nos 39–40 : Appendix B. ভাগলপুর কমিশনারের ৭ নং প্রশ্নের উত্তর। Cole লিখেছেন ঃ "Kherwarism

has periodical outbursts : the least thing causes it to burst forth''

২০৫. একই ; ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

২০৬. একই ; পাণ্ডের সিদ্ধান্ত : ''... now they [Kherwars] are a religious sect no less than a political body bound up by a strong unity, and holding themselves quite aloof from the non-Kherwars in every branch of occupation and in all their social and religious dealings''.

২০৭. একই

২০৮. একই

২০৯. একই ; Appendix C : ভাগলপুর কমিশনারের ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

২১০. একই ; Appendix C.

২১১. *Descriptive Ethnology of Bengal* (Calcutta 1872)-এ উল্লেখিত Dalton-এর এ অভিজ্ঞতার বর্ণনা Marten Orans উধৃত করেছেন। পাদটীকা নং ২০০ দ্রষ্টব্য ; পৃঃ ৩৭

২১২. এ প্রবন্ধেরে (৭.৬) অংশ দ্রষ্টব্য

২১৩. Bengal Judicial Progs ; Aug 1881, Nos 39-40 : Appendixs C; Reply from Captain Carnac, Assistant Commissioner ; Question No. 8

২১৪. খেরওয়ার আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাসের জন্য (বিশেষ করে ১৯০৮ এর পর থেকে) P. O. Bodding, *The* Kharwar Movement Among the Santals', *Man in India* Sept 1921 দ্রষ্টব্য। খেরওয়ারদের তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে— Sapai, Sarma এবং Babaji। দুটি জিনিষ ও আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় : সাঁওতাল সমাজে যে কোন নুতন সংকটের মুহূর্তে খেরওয়ার আন্দোলনও উজ্জীবিত হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ এর সব গোষ্ঠীর উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব বাড়লেও সাঁওতালদের আদি ধর্মীয় ধারণা এবং অনুষ্ঠানের নানা দিক নুতন বিশ্বাস এবং আচারের সঙ্গে মিশে গেছে।

২১৫. K. S. Singh, *Birsha Munda and his Movement, 1874-1901* (O. U. P. 1983) ; প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। S. C. roy, *The Mundas and their Country* (First Edition, Calcutta, 1912), এই দুটি বইয়ের কোনটাতেই এ সময়ের ইতিহাসের আলোচনা পর্যাপ্ত নয়।

২১৬. S. C. Roy. উপরোল্লেখিত : এখানে বিভিন্ন বহিরাগত গোষ্ঠী সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে 'জমিদার' কথাটার প্রয়োগ প্রচলিত অর্থে মোটেই নয়। মুণ্ডা এবং ছোটনাগপুর রাজার মধ্যবর্তী যে গোষ্ঠীরা আস্তে আস্তে

মুণ্ডাদের প্রাচীন অধিকার খর্ব করে নিজেদের কর্তৃত্ব নানাভাবে কায়েম করে, তাদের সবাইকে বোঝানোর জন্য 'জমিদার' কথা ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের রূপও ভিন্ন। ঠিকাদার, জায়গীরদার, ইলাকাদার, জমিদার ইত্যাদি নানা নামে তারা পরিচিত ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে মুণ্ডা অঞ্চলের ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি।

২১৭. 'জমিদার' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা এর আগের পাদটীকায় বলেছি।

২১৮. প্রথম গ্রাম পত্তনকারীর বংশধরদের জমি।

২১৯. ১৮৬৮ সালে এ তদন্তের প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করে। পরের বছর এর জন্য নূতন এক আইন পাস করতে হয় (Chotonagpur Tenures Act, II [Bengal Council] of 1869। ১৮৮০ সালের মার্চ পর্যন্ত তদন্তের কাজ চলে।

২২০. যে সব জমির জন্য নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হত, তাদের রাজহাস বলা হত।

২২১. স্থানীয় ভাষায় এর নাম বেট-বেগারী। শুধুমাত্র চাষের কাজের জন্য জমিদার এ বেগারী দাবী করত না। জমিদারের নানা প্রয়োজনে মুণ্ডাদের বাধ্যতামূলকভাবে খাটতে হত।

২২২. Bengal General Miscellaneous Progs : Oct 1880 , Nos 39-41; Chotonagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1879-80, 12 July, 1880। কমিশনার রাঁচী অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে এক সরকারী রিপোর্টের অংশ বিশেষ উধৃত করেন : "He [a Kol] may have left one village and settled elsewhere, but his lands in that, where his forefather's bones were laid, are held by others in trust for him." [Para 148], নানা তথ্যের ভিত্তিতে কমিশনারের মন্তব্য : "... The Kol has a strong hereditary attachment to the village where his forefathers first settled, and where his ancestral burying place is situated. He thinks that, as he has an undoubled right to buried there ... he has also a right to be get land there ..." [Para 149]

২২৩. একই ; কমিশনার এক অধস্তন রাজকর্মচারীর মন্তব্য উধৃত করেন : "He [Rakhal Das Halder, who has associated with the official enquiry into bhunihari lands] shows clearly how desperate the antagonism between Aryan *elaquader* and aboriginal ryot has been for the last fifty years or more ... The malcontents are described by him as irreconcilables, whom nothing short of an impossible revolution will satisfy" [Para 148] 'ইলাকাদারে'র

আসল অর্থ একটা অঞ্চলের পুলিশী ব্যবস্থার তদারকি যে করত; এখানে বোঝানো হচ্ছে। এক বহিরাগত গোষ্ঠী।

২২৪. India Legislative Dept. Progs ; March 1869. No 18. Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 30 Sept. 1868, Para 2.

২২৫. Bengal General Miscellaneous Progs ; Oct 1894 ; No 21 ; Chotonagpur Divisional commissioner's Annual Report, 1893-94, 29 June, 1894. "The claim of the Munda and Oraon cultivators is that because their forefathers came into the country and cleared the jungle at a time when there were no rajas or zamindars, they are in no way bound to pay rent through any intervener but direct to Government". [Para 133]. ধরতে গেলে (১৮৯৪) এর আগেও প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মুণ্ডারা একই কথা বলেছে।

২২৬. ছোটনাগপুরের জার্মান মিশনের Revd. H. Onasch and আরো পনেরো জন বাংলা সরকারকে লেখে (১৭ মে, ১৮৭৬) : "The Kolh [Kols] cannot but see in these *tikadars [thikadars]* their born and sworn enemies—men who rob them of the lands of their forefathers, men who are opposed to them politically and religiously, whose life and manners have nothing in common with their primitive customs. men who despise them ..." *Papers Relating to the Agrarian Disputes in Chotanagpur* [No date], Vol. I, p. 66

২২৭. একই *(Paper Relating to Agrarian Disputes* etc) : Vol I পৃঃ ১১৩ ; Govt. of Bengal to Govt. of India. Home, Revenue and Agricultural, 22 Feb, 1881. এ চিঠি মূল আর্জি থেকে নানা অংশে উধৃত করা হয়েছে; Paras 1—3.

২২৮. একই ; (*Papers* etc.) Vol. I ; পৃঃ ১২৫ ; Chotonagpur Divisional Commissioner to the Govt. of Bengal ; 19 Nov. 1887 ; Para 11.

২২৯. একই ; Para 10 , তাছাড়া দ্রষ্টব্য : Govt. of Bengal to Govt. of India, Revenue and Agricultural Dept, 17 May, 1886. Paras 3-4. [একই ; *Papers*] Vol I : পৃঃ ১১৯

২৩০. একই ; পৃঃ ১২৬

২৩১. একই ; পৃঃ ১৩০-১৩১ Para 26

২৩২. একই ; (*Papers* etc), Vol I., পৃঃ ১৪১, Chotanagpur Commissioner to Govt of Bengal. 30 Nov, 1889 ; Para 4 : কমিশনারের ধারণা : "Encouraged by advisers in Calcutta they asserted the existence

of a decree from the Viceroy or the Queen-Empress which restored to them their old inheritance''

২৩৩. একই ; (*Papers* etc), Vol I., p 129 . Chotanagpur Commissioner to Govt of Bengal 19 Nov. 1887 : Para 23

২৩৪. একই ; Para 25

২৩৫. একই ; (*Papers* etc), Vol I., পৃঃ ৭৩. Minute by the Lieutenant Governor of Bengal, 5 July, 1876. টেম্পল মুণ্ডাদের দাবীকে ''extravagant and unreasonable claims'' বলেছেন (Para 7)

২৩৬. একই ; পৃঃ ১১৩ ঃ Govt of Bengal to Govt of India, 22 Feb 1881; বাংলা সরকারের মতে নেতারা 'mischievous', এবং ''there is no ... real and genuine discontent'' [Para 3]

২৩৭. একই ; পৃঃ ১১৯, Govt of Bengal to Govt of India, 17 May, 1886 ; Para 4 আর্জির ভাষা পরীক্ষা করে বাংলা সরকারের নাকি মনে হয়েছে, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর দেখিয়ে আর্জি লেখক সরলবিশ্বাসী মুণ্ডাদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছে। (''imposing on a primitive people by a show of learning and argument'')

২৩৮. একই ; পৃঃ ১৩২, ছোটনাগপুরের কমিশনার লেখেন (১৯ নভেম্বর ১৮৮৭)ঃ ''They have for years been deriving profit from the agitation, and are certain to dislike giving it up'' [Para 33]

২৩৯. খগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ভুঁইহারী জমি সম্পর্কে তার মত ঃ ''... the Bhooinharee lands, as in the case of the Jews, are in one sense, inalienable, except to the village or the community in its aggregate capacity. I therefore fail to see the application of the law of limitation to such holdings''. India Legislative Progs ; March 1869 ; No. 18 'Petition of 14,000 Native christians residing in the territory of the Rajah of Chotonagpore,'' 21 Sept, 1867

২৪০. একই ; (India Legislative Progs. etc) : The Senior Missionary of the Chotanagpore Mission to the Deputy Commissioner, Lohardagga, 15 Nov, 1867 ; Para. 6

২৪১. Papers Relating to Agrarian Disputes etc. [পাদটীকা নং ২২৬ দ্রষ্টব্য], Vol I : পৃঃ ৬৮ Revd. H. Onasch and 15 others to the Lt. Governor of Bengal, 17 May. 1876

২৪২. Bengal General Miscellaneous Progs ; Oct, 1890, File 140–1; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1889-

90 : 1 July 1890. একদল মুণ্ডার সঙ্গে কথোপকথনের পর কমিশনারের মন্তব্য : "... While the speakers were avowedly Christians, they still retained their old sentiments in respect to demons ... there is hardly a family that cannot boast a ghost or an ancestral shade in proof of its antiquity. Besides the family apparitions, there is the ghost of those who are drowned ... of the witches and of the dwarfs, as remarked my informant village Pahu [*Pahan,* the village priest] ... when asked if he had ever seen the *bhuts* [ghosts], the pahu replied in the affirmative, and on my enquiry what they were like, he added that they were very small and went about at night with wide Cavernous Jaws and caused all the sickness" [Para 6]

২৪৩. একই ; এ বিষয়ে এক তদন্তের উল্লেখ করে কমিশনার লিখেছে : "The enquiry established the fact that the conversions to christianity were effected by the rough and simple process of depriving the new convert of his topknot" [Para 149]

২৪৪. *Papers relating to Agrarian Disputes* [No date] : Vol I ; পৃঃ ১৩৬ Chotanagpur Divisional commissioner to the Deputy Commissioner of Lohardugga, 13 Nov, 1889. Para I

২৪৫. একই ; [*Papers* etc] ; Vol-I পৃঃ Chotanagpur Divisional Commissioner to Govt. of Bengal, 30 Nov, 1889 ; Paras 8-9

২৪৬. একই ; Para 12 এ সম্পর্কে কমিশনারের সিদ্ধান্ত : এ ছাড়া খ্রীষ্টান হবার অন্য কোন কারণ নেই। "On no other hypothesis can the extensive conversions to the Roman Catholic faith be explained, for on the evidence adduced it is impossible to believe that they have accepted those beliefs from religious convictions"

২৪৭. একই ; *(Papers etc)* : Vol. I . p. 138 ; Chotanagpur Commissioner to the Govt. of Bengal. 23 Nov, 1889 ; Para I মিশন কর্তৃপক্ষ যে মিশনের নীতি হিসেবে এ সব বলত, তা নয়। বিশেষ কোন কোন মিশনারী মুণ্ডাদের এ ধরনের পরামর্শ দিত। প্রশাসন এ ধরনের পরামর্শকে অনধিকার চর্চা বলে মনে করতো। ছোটনাগপুরের কমিশনারের মতে, এটা হল "injudicious meddling with the land question"

২৪৮. একই ; *(Papers* etc) Vol I : কমিশনার বিশ্বাস করেনি যে "... they [missionaries] have ever intentionally given the Kols reason to attribute to them the great secular powers with which they have

been credited ..." (Para 37)

২৪৯. পাদটীকা নং ২৪২ দ্রষ্টব্য ; কমিশনারের রিপোর্টের Para 6. জার্মান মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক যখন প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে, মুণ্ডারা তখন একই কথা বলতো। এক মিশনারী সর্দারদের প্রতারক বলাতে বীরসা নাকি বলে ঃ "সাহেব, সাহেব, এক টোপী হ্যায়" K. S. Singh, *Birsa Munda and His Movement, 1875 1901* (O.U.P. : 1983) পৃঃ ৪০

২৪৯ক. বীরসা মুণ্ডার উপর বৈষ্ণবপ্রভাব সম্পর্কে K. S. Singh, পূর্বোল্লেখিত ; পৃঃ ৪১

২৫০. Bengal General Miscellaneous Progs ; Aug 1881. Nos 5-6 ; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report. 1880-81 ; 12 July, 1881 ; Para 192

২৫১. একই ; Paras 36-37

২৫২. *Papers Relating to Agrarian Disputes* etc ; Vol. 1 ; পৃঃ ১৪৬; Chotanagpur Commissioner to Govt of Bengal. 16 Jan, 1890: Para 5

২৫৩. Bengal Judicial (Police) Progs : Nov 1895, Nos 38-39, Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 28 Aug 1895, Para 4. কুমার সুরেশ সিং-এর মতে, চাইবাসায় বীরসা চার বছর থাকে *Birsa Munda and His Movement 1874-1901* (O.U.P. 1983), p. 40

২৫৪. একই ; Chotanagpur Commissioner -এর চিঠি, Para 4

২৫৫. একই ; Para 2 ;

২৫৬. মূলসূত্র একই ; District Superintendent of Police, Lohardagga to Deputy Commissioner of Lohardagga, 26 Aug, 1895

২৫৭. Bengal Judicial (Police) Progs : Nos 44-45 ; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 6 Sept. 1895, Para 2

২৫৮. Bengal General Misc. Progs : Nov. 1896, Nos 20-21 ; Chotonagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1895-96 ; 29 June 1896 ; Para 4.

২৫৯. পাদটীকা নং ২৫৬ দ্রষ্টব্য; District Superintendent of Police, Lohardagga-র চিঠি

২৬০. মূলসূত্রের জন্য পাদটীকা নং ২৫৭ দ্রষ্টব্য ; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 4 Sept. 1895

২৬১ হারানো জমি ফিরে পাবার জন্য ভুঁইহারদের দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন 'সর্দারী লড়াই' নামে পরিচিত।

২৬২. ২৬০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য

২৬৩. বীরসার বিরুদ্ধে মামলায় সরকারপক্ষের একটা প্রধান অভিযোগ ছিল, তার সঙ্গে সর্দারদের ঘনিষ্ঠ যোগ। এ সম্পর্কে মিশনারী হফমান্ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। তিনি নিজে দেখেছেন, 'বীরসা ভগবান'কে দর্শন করতে যাবার জন্য ঐ অঞ্চলের সর্দাররাই জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছিল; প্রধানতঃ সর্দাব-প্রভাবিত গ্রামগুলি থেকে মুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত হয়ে বীরসার দর্শনে যায়। কুমার সুরেশ সিং মনে করেন, বীরসার 'ধর্মীয়' আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপান্তরিত হল, তার একটা কারণ সর্দারদের "ক্রমবর্ধমান প্রভাব"। *Birsha Munda and His Movement etc* পৃঃ ৫৭) তবে তিনি বলেন, সর্দারদের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে; বীরসা ও সর্দারদের দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই অভিন্ন নয়ঃ 'Birsha, though influenced by the Sardars, was certainly not their mouthpiece' (পৃঃ ৫৮)

২৬৪. পাদটীকা নং ২৬০ দ্রষ্টব্য। "to live good lives and not to do puja to Bhuts."

২৬৫. Kumar Suresh Singh, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৫০। এ বই থেকে জানতে পারি, বীরসা সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ যখন বিশেষ কিছু জানত না, সে সময়কার এক জনশ্রুতি পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়ঃ a sannyasi of the Mundari easte of Chalked had been exhorting the neighbouring Kols to become strict Hindus and abstain from forbidden articles of food" (পৃঃ ৫৯) সম্ভবতঃ "নিষিদ্ধ আহার্যের মধ্যে শূয়োর, মুরগী এবং গোরুর মাংস ছিল।

২৬৬. একই ; পৃঃ ৫৪। এখানে O' Malley'র একটা বিবরণ উধৃত করা হয়েছে।

২৬৭. K. S. Singh. পূর্বোল্লেখিত ; পৃঃ ৪৬

২৬৮. Bengal Judicial (Plice) Progs ; Nov 1895 ; Nos 38-39 ; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardagga, 26 Aug 1895. পুলিশাধ্যক্ষ আরো একটা জনশ্রুতির উল্লেখ করেছেঃ "Another rumour was that he had left his house suddenly at night, and having gone out into the jungle, returned shortly after, going out that god had appeared to him."

২৬৯. Bengal General Miscellaneous Progs ; Nov 1896, Nos 20-21 ;

Chotonagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1895-96 ; 29 June 1896 ; Para 4

২৭০. একই ; এ বিষয়ে মুণ্ডাদের একটা গান কুমার সুরেশ সিংহ উধৃত করেছেন; পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৫৩ গানের কিছু কিছু কলি থেকে মনে হয়, তা বীরসা বিদ্রোহের পরে রচিত। যেমন, "He has risen like the Sun, he has come up like the full moon, / he does no rise everyday, he will Suddenly disappear one day." 'He will Sudenly disappear one day", এর মধ্যে যে শঙ্কার ভাব ফুটেছে, তা প্রথম বিদ্রোহের সময় মুণ্ডাদের মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২৭১. পাদটীকা নং ২৬৮ দ্রষ্টব্য ; Chotonagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 28 Aug 1896, Para 2

২৭২. একই ; District Superintendent of Police, Lohardagga, to Deputy Commissioner of Lohardaga, 26 Aut 1895

২৭৩. একই ; Deputy Commissioner of Lohardaga to Chotonagpur Commissioner, 27 Aug 1895, Para 4

২৭৪. একই ; Sub-Inspector of Khunti to Deputy Commissioner of Lohardaga, 29 Aug, 1895

২৭৫. Bengal Judicial (Police) Progs : Nov. 1895 ; Nos 44-45 ; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 4 Sept, 1895.

২৭৬. পাদটীকা নং ২৬৯ দ্রষ্টব্য ; Para 4

২৭৭. Bengal General Miscellaneous Progs : Dec 1898 ; Nos 16-17 : Chotonagpur Divisional Commissioner's Report, 1897-98 ; 18 July 1898 ; Para 269

২৭৮. সরকারী দলিলে জগমোহনকে 'Tenure-holder' বলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বীরসা-দলের আক্রোশের প্রধান কারণ, সে গোপনে তাদের নানা খবর পুলিশকে যোগাত; অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত খবর

২৭৯. পাদটীকা নং ২৭৫ দ্রষ্টব্য ; Progs No. 38-39 ; District Superintendent of Police, Lohardaga to the Deputy Commissioner of Lohardaga 28 Aug 1895. সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, বীরসা সর্দারকে আসার জন্য খবর পাঠিয়েছিল ; সর্দার এ নির্দেশ মানে নি; তাতেই নাকি বীরসা বলে : "he would have him killed".

২৮০. বীরসা জেল থেকে ছাড়া পায় ডিসেম্বর ১৮৯৭ ; বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮৯৯ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার ঠিক পরেই বীরসা নূতন

উদ্যমে সংগঠনের কাজ শুরু করে দেয়। মিশনারী Hoffman এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা ঃ "No sooner was he back than his name flew from village to village". India Home Dept. Progs: Aug. 1900 ; No 335 : Revd J Hoffman, Catholic Missionary of Sarwada, Thana Khunti, to Chotanagpur Commissioner, 14 Jan, 1900 ; Para V ; [Hoffman'-এর চিঠিটা বাংলা সরকারের কাছে ছোটনাগপুরেই কমিশনারের চিঠির (17 Jan 1900). Enclosure No. 4]

২৮১. একই ; Hoffman-এর চিঠি

২৮২. একই ; Hoffman-এর চিঠি

২৮৩. একই ; Deputy Commissioner of Ranchi to Chotonagpur Commissioner, 7 Jan, 1900. এ চিঠিতে গয়া মুণ্ডার দুঃসাহসী প্রতিরোধের বর্ণনা আছে

২৮৪. একই ; Chotonagpur Commissioner to Govt. Bengal, 10 Jan, 1900 : Para 5 ব্রিটিশ বাহিনী যখন অনন্যোপায় হয়ে গোলা ছোঁড়ে তখন ঃ "the insurgents replied with renewed cries of derision, continuing to brandish their weapons and to dare us to do our worst."

২৮৫. 'Scatterings the seeds'— কথাটা যিশু নানা 'প্যারাবল' (parable)-এ ব্যবহার করেছেন। খ্রীষ্টান মুণ্ডার উপর বাইবেলের প্রভাব অনস্বীকার্য

২৮৬. ২৮০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৭. সরকারী দলিলে 'Birsaites' বলা হয়েছে

২৮৮. সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ "... the followers have lately taken to wearing the Birsaite janew (sacred thread." Home Dept. Progs : Aug. 1900, No, 335 : Chotanagpur Commissioner to Govt of Bengal, 12 Jan 1900 ; Para 3

২৮৯. K. S. Singh ; পূর্বোল্লেখিত ; সবচাইতে মৌলিক অংশ ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ

২৮৯ক. খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে প্রভাবিত বীরসার কাছে ভগবান একান্তভাবেই "Personal God"

২৯০. K. S. Singh— সংকলিত একটা গানের অনুবাদ ঃ

বড়ো নদীতে বান ডেকেছে ; ধুলোর ঝড় উঠছে,
ময়না, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও।
অরণ্য জুড়ে আগুন আর, ধোঁয়া
ময়না, পুড়ছে তোমার মা ;
ভেসে যায় তোমার বাবা,

ময়না ...
পূর্বোল্লেখিত ; পৃঃ ৮৭-৮৮

২৯১. একই ; পৃঃ ৯০

২৯২. H. Risky, *The Tribes and Castes of Bengal* (Calcutta. 1891). Vol. I, pp 91-92

২৯৩. Sarat Chandra Roy, *Oraon Religion and Customs* [Reprint. Editions Indian, Calcutta 1972], Ch. VI

২৯৪. ১৯১৪ এবং ১৯১৫ সালের আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য ; একই, পৃঃ ২৪৬-২৫০

২৯৫. এ আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নলিখিত সরকারী দলিলগুলি দ্রষ্টব্য ঃ
(ক) India Home (Political) Deposit, Sept 1915 : Prog No. 58
(খ) India Home (Political) Deposit, Dec 1915 ; Prog No. 25
(গ) India Home (Political) Deposit, Oct 1915 ; Prog No. 36
(ঘ) India Home (Political) Deposit, April 1916 ; Prog No. 18
(ঙ) India Home (Political) Deposit, June 1916 : Prog No. 2
(চ) India Home (Political) Deposit. June 1916 ; Prog No. 280-281/A

২৯৬. একই ; (চ)

২৯৭. একই

২৯৮. এ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন K. S. Singh : *Tribal Society in India* (Monohar, New Delhi 1985) : pp 159-160

২৯৯. এ আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আমার প্রধান সূত্র ঃ Govt of Bihar and Orissa, Political Dept, (Special) : File No. 86 1919 ; pp 1-45

৩০০. Barrington Moore Jr.— এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ 'Economic deterioration by slow degree can become accepted by its victims as part of the normal situation. Especially where no alternative is clearly visible, more and more privation can gradually find acceptance in the peasants' standard of what is right and proper. What infuriates peasants (and not just peasants) is a new and sudden imposition of demand that strikes many people at once and that is a break with accpeted rules and customs''. *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (Pergrine Books, 1977). Ch : 'The Peasants and Revloution'. p. 474

৩০১. Bryan R. Wilson এ পরিবর্তনকে 'From Magic to Millennium'

বলেছেন, "Such [magical] practices and procedures are predominantly personal in application—rarely extending beyond individuals to families or communities. The revolutionist [millennial] response in contrast is always social—tribal on ethnic—and rarely localized to the merely Communal" *Magic and Millennium* (London, 1973), Ch · 'Conclusions', p. 484 আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে এ পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও 'millennial' মানসিকতা যে যাদুবিদ্যার প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র, Wilson এর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য।

৩০২. এ ধরনের আন্দোলনকে 'millenarian' বলা হয়। 'পরিত্রাতা'-নেতার বিশিষ্ট ভূমিকার জন্য কেউ কেউ একে 'messianic' আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। তবে সব 'millenarian' আন্দোলন মোটেই বিশেষ অর্থে 'messianic' নয়।

৩০৪. খ্রীষ্টান মিশনকে উনি বলেছেন : 'the greatest single agency for the world-wide spreading of millenarianism'. *The Trumpet shall blow · A study of the Cargo Cutts Melanesia* (London, 1957), p. 245

৩০৫. E. J Hobsbawm, *Primitive Rebels* (New York, 1959), pp 57-58

৩০৬. সাঁওতাল অঞ্চলে মিশনারী প্রচার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে : Tripti Chaudhuri, *Some Aspects of English Protestant Missionary Activities in Bengal, 1857-1885*, (unpublished B. Litt thesis, University for Oxford, 1968), Ch. IV, 'Activities of Missionaries among the Santals'

৩০৭. I. J. Catanach, 'Agarian Disturbances in Nineteenth Century India', *Indian Economic & Social History Revies*, Vol. III, Issue No. I : March 1966, p. 77

৩০৮. বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাদু-মন্ত্র-শক্তিতে বিশ্বাসের আদি রূপ বিদ্রোহের সময় আমূল পাল্টে গেছে। জার্মানী-অধিকৃত Tanzania-তে Maji Maji আন্দোলনকে (১৯০৫) দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। আন্দোলনের শুরুতে নেতা শুধুমাত্র বলেছিল, এমন এক ঔষধের কথা সে জেনেছে, যার ব্যবহারে চাষীদের চাষবাস, সম্পর্কিত সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে, ফসল হবে নিশ্চিত; তাই জার্মানরাজ প্রবর্তিত তুলোর চাষে তাদের দিনমজুরী করতে হবেনা। বস্তুতঃ এ ধরনের বিশ্বাস আগেও ছিল। জার্মানরাজ-বিরোধী বিদ্রোহী ব্যাপক আকার ধারণ করলে maji'র প্রয়োগ শুধুমাত্র কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকল না; বিদ্রোহীরা বিশ্বাস করল, এর ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয় থাকবে। G.C.K. Gwassa

and John Iliffe (eds) *Records of the Maji Maji Uprising* (East African Publishing House. Nairobi 1967) পাঁচটি নির্বাচিত আন্দোলনে যাদু ও মন্ত্রশক্তির মূর্ত ও বিমূর্ত রূপের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন, Michael Adas তাঁর *Prophets of Rebellion : Millenarian Protest Movements against European Colonial Order* (The University of North Carolina Press, 1979) . Ch 6 . "Mobilization . Symbol and Ritual, Talisman and Sympathetic Magic"। ফিলিপাইন কৃষক আন্দোলনে বাইবেলের প্রভাব কিভাবে লৌকিক সংস্কৃতির নানা দিকের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে নিয়েছিল, তার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন R. C. Ileto, *Pasyon and Revolution : Popular Movements in the Philippines, 1840-1910* (Ateneo de Manila University Press, Quezon City, Metro Manila, 1979), pp 28-35 Anting-Anting নামক এক বিশেষ ক্ষমতা। (যা এক ধরনের রক্ষাকবচেও মূর্ত হত) অর্জন করার উপায় সম্পর্কে ধারণা এমন এক লোকায়ত্ত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার সঙ্গে বাইবেলের প্রচারের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

৩০৯. M. Adas, পূর্বোল্লেখিথ।

ভারতীয় ইতিহাসের পর্যায়ক্রম ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তাৎপর্য

বরুণ দে

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁরা আমাকে আধুনিক ভারত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে বলেছেন। আজকে আমার বিষয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে পর্যায়ক্রম ভাগ, তার পদ্ধতি, তাতে কতটুকু সঙ্গতি রয়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থান।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্যায়ক্রম নিয়ে আজকাল তেমন চিন্তাচর্চা আর হয় না। আমাদের ছাত্রাবস্থায় খুব আলোচনা চলত পুরানো পর্যায়ক্রমের ভাগ সঙ্গত কিনা। এ বিষয় আমরা অধ্যাপক সুশোভন সরকারের কাছে শিখেছিলাম যে ভারতে ধর্মের আধিপত্য বিবর্তনের ভিত্তিতে বা শুধু সম্রাটদের জাতীয়তার ভিত্তিতে ইতিহাসের পর্যায়ক্রম ভাগ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। যেমন, হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারত এই দুটি ভাগের অর্থ হল একটা যুগে শুধু হিন্দুরা প্রধান ছিলেন আর অন্য যুগে শুধু মুসলমানরা প্রধান হলেন। এই ধরনের ধর্মীয় প্রাধান্যের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের সাথে পূর্ববর্তী যুগগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ।

এই অসঙ্গতি একপাশে সরিয়েও কিন্তু আমরা দেখব যে, 'হিন্দু' যুগে হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মেরও প্রাধান্য ছিল। সম্রাট অশোক পুরোপুরি বৌদ্ধ ছিলেন কি না এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর অনুশাসন লিপিতে যে কথা আছে তাতে একটা সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব রয়েছে। কিন্তু অশোকের ধর্ম ও উপনিষদের ধর্ম এক নয়, পৌরানিক ধর্ম নয় তা তো নিশ্চিত করে বলা যায়। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে 'হিন্দু' যুগে আজকাল যাকে বলা হয় মুলধর্ম তা কিন্তু অশোকের ধর্ম ছিল না।

এটাও লক্ষণীয় যে হিন্দুযুগে সাধারণ মানুষের ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাকে লোকায়ত বলেন এইসব মিলেমিশে

চতুর্থ সম্মেলন, স্কটিশ চার্চ কলেজ, ১৯৮৭

রয়েছে। শাসকশ্রেণীর ধর্মের বিচার ছাড়া অন্য কোন বিচারে এই যুগকে হিন্দু ভারতীয় যুগ বলা যায় না। নানা রকম লোকাচারের মধ্যে দিয়ে নানা ধর্ম সমন্বয় বা ধর্মীয় সংঘর্ষ ঘটত। যাকে মুসলমান যুগ বলা হয় সেখানেও একই অবস্থা। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব এবং অফসব চমর বেগম তাঁদের Political Theory of the Delhi Sultanate-এ প্রথম দেখিয়েছেন যে সুলতানি আমলে এমনকি উত্তর ভারতের সুলতানী অঞ্চলেও সাধারণ ধর্ম শুধুমাত্র ইসলাম ছিল না। কেননা পাঞ্জাবের বা এখনকার উত্তর প্রদেশের জমিদার শ্রেণী যাঁদের মাধ্যমে সুলতানরা রাষ্ট্র শাসন করতেন তাঁরা ছিলেন হিন্দু। Cambridge Economic History of India-র প্রথম খণ্ডে অধ্যাপক ইরফান হাবিব একথা অনুসরণ করেই বলেছেন যে রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু রাজন্যবর্গের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ যেমন ছিল, সহযোগিতাও তেমন ছিল। অন্তর্বর্তী শাসকশ্রেণী ও সাধারণ প্রজাবর্গের ধর্মও অনেক ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল, আলাদা আচারব্যবহার, আলাদা রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে। যে যুগে মুসলিম ধর্মের প্রাধান্য বলে মনে করি, সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে অর্থাৎ কিনা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অঞ্চল বা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর নায়কশাসিত অঞ্চলগুলিতে ইসলামের প্রাধান্য দেখা যায় নি। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যন্তে যদি আমরা মনে করি ধর্ম ভিত্তিক প্রাধান্য ছিল, তবে বলতে হবে যে হিন্দুধর্মের থেকে প্রাধান্য সোজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে চলে গেল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যখন কর্ণাটকের নবাবরা মুসলমান সাম্রাজ্য বা মুসলিম শাসন স্থাপন করতে পারলেন না, মহম্মদ আলী ওয়ালাজাহ্ ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন কোম্পনী বাহাদুরের হাতে। তাই আমরা ইসলামীয় ভারতের কথা বলতেই পারি না যদি আমরা কর্নাটক বা দক্ষিণ অন্ধ্র বা তামিলনাড়ু বা কেরালার কথা ভাবি। তাহলে ভারতবর্ষের পরিকল্পনাই পাল্টে যাবে। এ তো ঠিক হবে না। দক্ষিণ ভারত তো ভারত বটে। কাজেই ধর্মের প্রাধান্য দিয়ে পর্যায়ক্রম ভাগ করা উচিত নয়।

এবার বিদেশীয়তার মাপকাঠিতেই এই আলোচনা করা যাক। প্রাক-ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ত্রয়োদশ শতাব্দী বা চতুর্দশ শতাব্দীর পরের থেকেই একেবারেই বিদেশী হয়ে গেল এ কথা ঠিক নয়। যাঁরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে তাঁরা ভারতবর্ষকে লুঠতরাজ করতে তো এসেছিলেন বটেই, কিন্তু লুঠতরাজ করে ভারতেই বসবাস করলেন এবং তাঁদের নাতিরা, নাতির নাতিরা ভারতীয়ই হয়ে গেছেন। তাঁরা আবার পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য উত্তর এশিয়া থেকে নানাবিধ লোকেদের আনিয়েছেন। সেই

সব ইরানী তুরানীরা, আফগান রোহিল্লারাও ভারতীয় হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সে কথা রয়েই গেছে, "শক, হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন"। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী-আফগানেরা যেমন বিদেশী শাসকই; মোগলরা ঠিক তেমনি ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বিদেশী শাসক; বাবর, হুমায়ুঁ তো বটেই। তবে হুমায়ুঁর জন্মভূমির উপর উজবেগরা এসে দখল বসালে, তিনি ভারতেই ফিরে এলেন। আকবর বিদেশী রইলেন না। এখানেই আকবরের মহত্বের নিদর্শন।

শাজাহান ও আওরঙ্গজেব বহু ইরানী তুরানীদের বিদেশ থেকে বসতি স্থাপন করাবার জন্য এনেছিলেন। মার্কিন অধ্যাপক রিচার্ডস Journal of Asian Studies (1976) এর পত্র "The Imperial Crisis in the Decan"-তে বলেছেন যে এই সপ্তদশ শতাব্দীতেই নতুন আবাসিকেরা মুঘল শাসকবর্গের সামাজিক চরিত্র অনেকখানি পাল্টে দিয়েছিল। বিজাতীয়তার কিছু কিছু রেশ তারা নিয়ে এসেছিল। আওরঙ্গজেবের সেনাপতিরা দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যখন যাচ্ছেন তখন দাক্ষিণাত্যের যে জমিদার-বর্গ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী যথা ওয়াকিনখেড়ার পাম নায়ক, তাঁর বিষয়ে উচ্চবর্গীয় সেনাপতিরা নাকি বলছেন যে ঐ কালোমুখো লোকটার সঙ্গে একপাতে বসা অসহ্য। একথা শুনে নায়ক মর্মাহত হয়েছিলেন। ফলতঃ শাসকশ্রেণী দেশী ছিল বা বিদেশী ছিল এই আলোচনা করতে গেলে বেশ কিছুটা গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। শুধু ইংরেজরাই বিদেশী, মোগলরা যে আদৌ বিদেশীদোষে দুষ্ট ছিল না এটাও ধরে নেওয়া অতিজাতীয়তাদের লক্ষণ। এবং ব্রিটিশদের আগে শাসকশ্রেণী যে ভীষণভাবে স্বজাতীয়ভাবে পুষ্ট ছিল এটা ভাবা অতিজাতীয়তার লক্ষণ। আমরা আগে পঞ্চাশের দশক বা ষাটের দশকে খুব জোর দিতাম যে ব্রিটিশদের আগের শাসকশ্রেণী বিশুদ্ধ ভারতীয় ছিল। শাসকশ্রেণী ভারতীয় না অভারতীয় এই নিয়ে চর্চা না করে তার শাসন-শোষণের মূল চরিত্র কি তার ওপর জোর দেওয়াটা সমীচীন। আজকাল মার্কসীয় ইতিহাসে সেই ধারণাটাই প্রবর্তিত হয়েছে।

তবে কি আমি মনে করি যে প্রাচীন, মধ্যযুগীয়, এবং আধুনিক, ধরনের এই পর্যায়ক্রম সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য? যেমন ইউরোপের বিষয় প্রযোজ্য তেমনি কি ভারতের বা আফ্রিকার বিষয়ে প্রযোজ্য? আমার মনে হয় আমাদের একটু সতর্ক হওয়া উচিত। প্রাচীনের সঙ্গে হিন্দুর সমীকরণ, মধ্যযুগের সাথে মুসলিমের সমীকরণ যে ঠিক নয় তা অধ্যাপক সুশোভন সরকার ভারতের ইতিহাস কংগ্রেসে মজঃফরপুর

অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন। সমীকরণ যদি না করা হয় তবে কিভাবে পর্যায়ক্রম ভাগ করা যাবে। অধ্যাপক কোশাম্বী Introduction to the study of Indian History-তে বলেছেন প্রাচীন যুগের যে চরিত্র তার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে গুপ্ত যুগে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ছোট ছোট প্রদেশে পর্যবসিত হচ্ছে এই প্রদেশগুলোকে প্রথম বলা হচ্ছে সামন্ত অঞ্চল। এবং সাম্রাজ্য যখন এই সামন্তদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে তখন আসছে অধ্যাপক কোশাম্বী যাকে বলেন feudalism বা আমরা বাংলায় যাকে বলি সামন্ততন্ত্র। কোশাম্বীর এই ধরনের সামন্ততন্ত্র ওপর থেকে আরোপিত হবার পর নিচের থেকে অনুসৃত হয়েছে এবং এই ওপর থেকে সামন্ততন্ত্র ও নীচের থেকে সামন্ততন্ত্র (feudalism from above and from below) তালগোল পাকিয়ে একই সঙ্গে সহাবস্থান করছে ভারতবর্ষে ঃ উত্তর গুপ্ত যুগের পর থেকে অন্ততঃ সুলতানি আমল অবধি। অধ্যাপক কোশাম্বীর সাথে বিতণ্ডা করার আমার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই। তবে আমার মনে হয় এ ধরনের পর্যায়ক্রম নিয়ে আর একটু খতিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন। তিনি কাকে সামন্ততান্ত্রিক বলেন সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ম্যারিয়ান গিভসের "Feudal Order"-এ সামন্ততন্ত্রের যে বিশ্লেষণ আছে, তাকে হুবহু না হলেও অনেকটা মেনে নিয়ে বলেছেন এই ধরনের সামন্ততন্ত্র ভারতে চলেছিল। এইভাবে ভারতের ঐতিহাসিক কাঠামোতে ব্রিটেনের অবস্থাকে আরোপ করে বিশ্লেষণ করাটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। আমরা আজও স্থির সিদ্ধান্তে নই যে, ভারতবর্ষে ঠিক ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র ছিল কিনা। সামন্ততন্ত্র কোথায় গিয়ে শেষ হল সে কথা কোশাম্বী সরাসরি কোথাও বলেন নি। তিনি অবশ্য পরবর্তী বই Culture and Civilization of the Indian people-এ বলেছেন যে ব্রিটিশরা এসে এক ধরনের নতুন উৎপাদনমান চালু করল, যাকে আমরা আজকাল বলি Colonialism। এবং এই উৎপাদনমান ধনতন্ত্রের অন্তর্গত। তাহলে, ধরে নিতে হয় যে কোশাম্বীর মতে সামন্ততন্ত্র চলেছে ব্রিটিশরা আসার আগে অবধি। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র Parties and Politics at the Mughal Court 1707-1739—বইতে যদিও সামন্ততন্ত্রের কথা বলেন নি তবে এক ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার কথা বলেছেন যেটা উপরিউক্ত মতের সাথে খানিকটা খাপ খেয়ে যায়। তিনি বলছেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় মুঘল যুগে দু'ধরনের চাপ ছিল ঃ ওপর থেকে সাম্রাজ্য

স্থাপনের ভার আর নিচের থেকে জমিদারদের স্বায়ত্ত স্থাপন করবার প্রচেষ্টা। এরজন্য নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ী করা, দাঙ্গা করা, যাকে মুঘল দলিলে বলতো "ফিতনা-ফিসাদ", একজন আর একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। এই কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ-এর টানা-পোড়েনের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র তাঁর পরবর্তী বই Mediaeval India, Society, the Village and Jagirdari Crisis-এর লেখাগুলিতে বলেছেন যে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত চাপেরই ক্ষমতা অনেক বেশী এবং এই ক্ষমতা সাধারণতঃ শুভ রূপই নিয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর মতে যখন বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক ক্ষমতাগুলির প্রাধান্য চালু হয় তখন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা শক্ত ছিল। কেননা এই বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতার উপরে বাইরের বিদেশীদের চাপ এসে পড়তো। ভারত যখন এক হতে পেরেছে তখনই ভারত স্বাধীন হয়েছে। যখন মুঘল সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীভূত ঐক্য ভেঙ্গে পড়ল তখনই ব্রিটিশরা ভারতে ঔপনিবেশিকতা প্রবর্তন করতে পারল। অবশ্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র, অধ্যাপক নুরুল হাসান প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে মুঘল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের জন্য একটা শুভ রূপ নিয়েই চলছিল প্রায় দেড়শ বছর ধরে। অধ্যাপক ইরফান হাবিব যদিও তার প্রথম গ্রন্থে এই সাম্রাজ্যের অশুভ শোষণনীতির দিকে আলোকপাত করেছেন, তবুও তিনিও সাম্রাজ্যবাদী ঐক্যের সামাজিক বিকল্পের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেন নি।

গত শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন বাঙ্গালীর ইতিহাসের কথা আলোচনা করতে গিয়ে যে এই ধরনের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা প্রাত্যন্তিক অঞ্চলগুলিকে শোষণই করেছিল, ভালো কিছু দিতে পারে নি। বঙ্কিমের মতে, যে যুগের বাংলাদেশের জমিদাররা বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানিকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল সেই যুগেই বাংলাদেশে সার্থক সামাজিক ও ধর্মীয় নবজাগরণ ঘটে। যে নবজাগরণ থেকে এসেছিল শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণব আন্দোলন। যখন মুঘলরা বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা নিল, তখন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ধন আহৃত হয়। সেই ধন তেমন কোন সদুদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হয় নি, বরং আগ্রায় দিল্লীতে কেল্লা বা সমাধি তৈরীতে অপচয় হয়ে গেল। বাংলাদেশে আর কোন অর্থ উৎপাদিত হল না যার ভিত্তিতে নবজাগরণকে জোরে চালিয়ে নেওয়া যায়।

এই টানাপোড়েনকে আমরা যদি সামন্ততন্ত্র বলে অভিহিত করি তা হলে ভারতের সামন্ততন্ত্র শুরু হয় ঐ আদি মধ্যযুগে এবং চলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

কোশাম্বীর মতের সঙ্গে মিল রেখেই আমি একথা বলতে পারি যদিও তিনি এ কথা বলেন নি। এ নিয়ে আমাদের যথেষ্ট চর্চাও কোথাও হয় নি। তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্য যুগের অংশ না আধুনিক যুগের পুরোভাগ। সাধারণত আজকের আধুনিক ঐতিহাসিকরা আধুনিক যুগের সূত্রপাত দেখেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। অবশ্য আচার্য যদুনাথ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal-এর দ্বিতীয় গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে বেশ জোরাল ভাষায় বলেছেন যে পলাশীর প্রান্তরে শুরু হল ভারতের আধুনিক যুগ ঃ আবার তাঁর Fall of the Mughal Empire-এর শেষ চ্যাপ্টারে একই কথা বলছেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে আধুনিকতা আনল, মুঘলরা ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয়তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং মুঘলদের পরাজয়ের সঙ্গে যুক্ত হল ইংরেজদের জয়, ইংরেজদের জয়ের সাথে যুক্ত ভারতের আধুনিকতার প্রথম সূত্রপাত, ঠিক এতটা সরলীকরণ আজকাল আমরা করি না। কিন্তু না ভেবে আমাদের মধ্যে একটা ধাত এসে গেছে। আমরা আধুনিক যুগের সূত্রপাতকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে দিই। NCERT-র পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক ভারতকে শুরু করেছেন অধ্যাপক বিপানচন্দ্র ১৭০৭-এ। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটলেই ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূত্রপাত হবে কেন? প্রশ্ন করলে অবশ্য উত্তর আসবে যে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বসে গেল তার পরেই। সেই ধ্বস নামার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম বিকেন্দ্রীভূত শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তার মধ্য থেকে এল ইংরেজ। ইংরেজদের সঙ্গে এল আধুনিকতার চিন্তা। অনেক সময় ইংরেজদের থেকে কিছুটা আলাদাভাবে চিন্তা করে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ওই আধুনিকতাকে পুষ্ট করেছিল। এইসব সম্ভব হয়েছিল মুঘল কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ক্ষয়ের সূত্রপাত থেকে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, তার মধ্যে থেকে ইংরেজদের উত্থান, ইংরেজদের উত্থানের মধ্য থেকে আধুনিকতার প্রবর্তন এর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে আধুনিক চিন্তার যোগাযোগ এইসব কিন্তু ঘটতে প্রায় ১০০ বছর লেগেছে। সারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে দিয়েই এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এটা চলেছে। তবে ১৭৫৭ থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে না গিয়ে ৫০ বছর এগিয়েই যদি আমরা আসি ১৮০৭এ তাহলে আমরা দেখতে পাব যে ১৮০০ সালের পর আধুনিক যুগ বেশ পরিষ্কারভাবে শুরু হয়ে যাচ্ছে। এবং ১৮০৭ বলার কোন দরকার নেই। ১৮০০ সাল থেকে শুরু করলে হল। ১৮০০ সালের পরে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এবং ১৮০৭-এর পর আরও বোঝা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছে শতদ্রু নদী অবধি সাম্রাজ্যবিস্তার

করতে উদ্যত। রাজস্থান এসে গেছে ব্রিটিশের আওতায়। তার কয়েক বছরের মধ্যেই নেপাল সিকিম-এর উপর ব্রিটিশরা তাদের সার্বভৌম প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। ২০ বছরের মধ্যে আসামের উপর সাম্রাজ্য বিস্তৃত অর্থাৎ আমরা যাকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এণ্ড নেটিভ স্টেটস্ বলে চিনি তাঁর চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে আসতে আরম্ভ করেছে শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুর পরাজয়ের পরেই ওয়েলেসলির গভর্নর জেনারেলরশিপের আমলে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশদের যে দ্বন্দ্বভিত্তিক সমন্বয় ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে, তা প্রথম দশকেই আরম্ভ হয়ে যায়। রাজা রামমোহন রায় তখনও রাজা হন নি, ১৮২৩ সালে তৃতীয় জর্জকে যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন, যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও আরোও কয়েকজন, সেই আবেদনপত্রে এঁরা বলেছিলেন যখন ওয়েলেসলি মারাঠাদের পরাস্ত করলেন তখন কলকাতার লোক ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করেছিলেন ব্রিটিশদের জয়ের আনন্দে। সেই যোগাযোগের ভিত্তিতে বাবু-শ্রেণী আধুনিকতাকে বরণ করেছে। সেই আধুনিকতাকে বরণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আবরণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে অথরেটেরিয়ানিজিম তার এই যুগে সূত্রপাত। এই দ্বন্দ্ব বা Contradiction-এর মধ্যেই ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। এই জাতীয়তাবাদ হল ভারতের আধুনিকতার বড় লক্ষণ। একে কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পুরোধা হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেক অঞ্চলে এর প্রসার ঘটে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সাধারণ মানুষ বলতে আমি ঠিক আজকের দিনের jargon-এ, আজকাল যাকে বলা হয় নিম্নবর্গ তাদের বোঝাচ্ছি না। আমি ভাবছি সাধারণবিত্তের মানুষের কথা। তাঁরা মধ্যবিত্তও হতে পারেন আবার নিম্নবর্গেরিও হতে পারেন। তাঁরা বড়লোক নন, শুধু গ্রামের লোকও নন। এই সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে গেল তাই উনবিংশ শতাব্দী অর্থাৎ নানা দিক থেকে আধুনিকতার আদি যুগ।

মধ্যযুগের এবং সামন্ততন্ত্রের ক্ষয় হতে আরম্ভ করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সামন্ততন্ত্রের অনেক লক্ষণ অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতেও চলে এসেছে। বিশেষ করে আমরা যেটা নিয়ে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা যথেষ্ট চর্চা করি না, বিদেশী ঐতিহাসিকরা এ নিয়ে অনেক বেশী আলোচনা করেছেন যাকে বলা হয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির, অথবা Princely States বিষয়। সামন্ততন্ত্রের

একটি অনুবাদ হতে পারে Prince যেমন আর একটা অনুবাদ হল feudal Princely states—এগুলোতে তো বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব রয়ে গেল। আমরা যদি ওড়িষ্যায় যাই এখনও দেখব যে, যে অঞ্চলটা ছিল মুঘলবন্দী এবং পরে ব্রিটিশদের অধীনে এলো সেখানে আধুনিকতা অনেক আগে প্রবর্তিত হয়েছে। যে অঞ্চলকে মুঘলরা বলত feudatory সেখানে এখনও সামাজিক সামন্ততন্ত্র জোরদার রয়েছে। মধ্যপ্রদেশে যেখানে প্রচুর সামন্ততান্ত্রিক খুদে রাষ্ট্র ছিল সেখানে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চল এখনও প্রচুর আছে। আজকের দিনে নেহেরু বংশজাত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন বিকল্পকে খাড়া করার কথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা কোন ছোটঠাকুরকে রাজাসাহেব বলে অভিহিত করেন। তারপর তাকে বিকল্প বলে ধরে নিতে আহ্বান করেন। এর চেয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? এরই মধ্যে আস্তে আস্তে ধনতন্ত্রের প্রবর্তন আমরা দেখতে পাই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে অষ্টাদশ শতাব্দীকে আমরা নতুনভাবে দেখতে পাব। অষ্টাদশ শতাব্দীকে বলা যায় সন্ধিক্ষণের শতাব্দী—A Century of Transition। তবে শুধু একশ বছর ধরেই সন্ধিক্ষণ চলেছিল কিনা তা নিশ্চিত নয়। ঠিক একশ বছরের হিসাবে ইতিহাস কেটে কেটে রাখা হয় না। যে সন্ধিক্ষণের কথা আমি বলছি তা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে চলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ ছয় দশক ধরে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার এবং রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকরণ ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে এল। সাম্রাজ্য এবং তার নীচে স্তরীভূতভাবে সামন্তরাষ্ট্রের প্রকরণে গভীর সংকট ছিল। কেউ কেউ বলতে পারেন যে ঠিক এই ব্যবস্থাই তো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ চালু করেছিলেন। প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকেরা বিশেষভাবে এই কথাই বলতেন। যেমন আচার্য যদুনাথ, অধ্যাপক পার্সিভাল স্পিয়ার বলতেন যেভাবে মুসলমানরা সাম্রাজ্য চালাতো তার থেকে ইংরেজদের চালাবার ধরনটা বিশেষ আলাদা ছিল না। যেখানে আলাদা, সেটা হচ্ছে তারা আধুনিকতাকে চালু করেছেন। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সমীকরণ করা ঠিক হবে না। মুঘলরা ঐ স্তরভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু রাখা ছাড়া, তাঁদের অধিকৃত, প্রদেশগুলিতে আর বিশেষ কোন ঘাটাঘাঁটি করত না। রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন ছিল যে সুবেদার, ফৌজদারের মাধ্যমে, জমিদারদের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থা চালু রাখতো। ফৌজদারের বিরুদ্ধে যদি জমিদারেরা

গণ্ডগোল করতো তবে ডাণ্ডাপেটা করা হত বা আর একটু বেশী প্রয়োজন হলে হাতী, ঘোড়া, লোকলস্কর দিয়ে তাদের ঘর ধ্বংস করা হত, মন্দির গুড়িয়ে দেওয়া হত, আবার কিছুদিন পর যেমন ভাবে চলছে তেমনভাবে চলতে আরম্ভ করতো। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশী দূর অনুপ্রবেশ করে। ইংরেজদের আদি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমি ও তাঁতশিল্পের থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জন করা। সেই অর্থ বিনিয়োগ করে নানারকম পণ্যসামগ্রী কেনা। ইউরোপ তা বিক্রী করে বা সেই লাভের ভিত্তিতে নতুন ধরনের দ্রব্য তৈরী করে চড়া দরে; সেই নতুন দ্রব্যগুলি আবার ভারত বা এশিয়ার গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ লোকের কাছে বিক্রী করা, মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। এইভাবে বর্ধিত হারে মুনাফা সৃষ্টি করে ইংরাজরা ধনতন্ত্রে বর্ধিত করে। ব্রিটিশরা যেখানে গ্রামের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে অর্থ আহরণ করেছে, মুঘলরা সেখানে খুসী থেকেছে গ্রাম হতে নজরানা স্বরূপ কিছু অর্থ পেয়ে। ইরফান হাবিব আজকাল বারবার একথা বলেছেন। প্রথম বলেছিলেন Colonial-ism-এর বিষয় ১৯৭৫-এর Social Scientist পত্রিকায় যে ব্রিটিশ এবং মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফারাক, মুঘলরা যে উদ্বৃত্ত আহরণ করতেন সেই ধরনের উদ্বৃত্ত অনেক বেশী বর্দ্ধিত হারে ইংরেজরা শোষণ করেছে যাতে অনেক বেশী মুনাফা তাঁরা লাভ করে ব্রিটেনের শিল্প-বিপ্লব গড়তে পারে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা যদিও শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে তার বিস্তৃত রূপটা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

এই সময়ে নানা রকম সংকট দেখা গেল ভারতীয় সাধারণ জনজীবনে ও সামন্তশ্রেণীরও জীবনে, সেই সঙ্কটকে আমি বলতে চাই এক ধরনের সন্ধিক্ষণ। সামন্ততন্ত্রের একটা ধরন থেকে ধনতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সন্ধিক্ষণ। এই ভাবেই যদি আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর চর্চা করি তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীকে নতুনভাবে আলোচনা করা যায়। এই আলোচনার মধ্যে কিন্তু একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ, সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের কথাকে টেনে আনার দরকার নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন একীকৃত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সৃষ্টি হয় তখন ব্রিটিশদের মনে ছিল ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কথা এবং ষোড়শ শতাব্দীতে আইন-ই-আকবরীর চেহারা। আবার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ছিল নতুন ধরনের জাতীয় রাষ্ট্রের চেহারা, যার উদাহরণ ভারতে পাওয়া যেত না, যা ছিল ভবিষ্যতের আদর্শ।

মুঘল সাম্রাজ্যের ঐক্য তখন ভেঙ্গে পড়েছে। নতুন ঐক্য সৃষ্টি হচ্ছে সুবাগুলিতে।

আবার আরেক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি হচ্ছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলিতে। এক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি হচ্ছে মারাঠা অঞ্চলে। আর এক ধরনের ঐক্য যার ভিত্তি হল শুধুমাত্র সুলতানের ক্ষমতা, তা সৃষ্টি হচ্ছে আফগান রাষ্ট্রে, আহমদ শা আবদালীর অধীনে। আবার একেবারে আলাদা ধরনের বিকেন্দ্রীভূত ঐক্য সৃষ্টি হচ্ছে দুটি নতুন ধরনের রাষ্ট্রে। এক হল বুহেনা সর্দারদের জায়গীরে হাফিজ রহমৎ বা নজিবুদ্দৌলার গড়গুলিতে। আর এক হল অমৃতসর এবং তৎপরবর্তীকালে নানা মিসল অধিকৃত অঞ্চলে শিখ রাষ্ট্রে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম লাহোরে, কিন্তু ১৭১৯-এর আগে লাহোর শিখ রাষ্ট্রক্ষমতার স্থাপিত হয় নি। লাহোর তাদের প্রত্যন্ত অঞ্চল। সেখানে ডাঙ্গি সর্দারদের আধিপত্য ছিল। ঠিক তেমনি আধিপত্য অন্য মিসলের সর্দারদের ছিল কর্পূরথালাতে বা পাটিয়ালাতে। আগেকার ঐতিহাসিক অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বা হরিরাম গুপ্ত বলতেন যে মিসলগুলি রাষ্ট্র। অমৃতসরের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, যেমন জগতার সিংহ গ্রেওয়াল, ইন্দু বাংগা, বা সাম্প্রতিক থিসিস লেখিকা বীনা সচদেব বলছেন যে মিসলগুলি রাষ্ট্রের প্রতিভূ নয়। মিসলগুলি ছিল ক্ষমতাসীন স্বজনগোষ্ঠী তবে রাজ্য সবসময়ে এই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ছিল না। শিখ ক্ষমতা ছিল—ক্ষুদে জমিদার সমষ্টির হাতে। মাঝে মাঝে তারা এক জোট হতো খালসা ধর্মের ভিত্তিতে। এবং সেই খালসা ধর্মমতের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে খর্ব করেন মহারাজা রঞ্জিৎ সিং, যখন তিনি একটা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র স্থাপন করেন লাহোরে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে যদি আমরা চর্চা করি দেখতে পাব যে নানা রকমের রাষ্ট্রক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল একটু সরলীকরণ করে বলা হয় যে মুঘল সাম্রাজ্যের পর এল Successor States বা উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র। বন্ধুবর মুজাফর আলম তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় বলেছেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পরে অযোধ্যায় এবং পাঞ্জাবে আলাদা আলাদা রকমের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র স্থাপিত হল। ঠিক জানিনা সারা ভারতের ইতিহাসকে একত্রে দেখলে সব রাষ্ট্রগুলিকে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা। সুবাগুলি এক এক সময়ে হল উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র। কিন্তু সুবা ছাড়াও তো অনেকগুলি রাষ্ট্র ছিল বা সৃষ্টি হল। অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ সম্প্রতি যে গবেষণা করেছেন তাতে দেখিয়েছেন যে আসামে একটা পুরানো রাষ্ট্র আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুংখুংরিয়া অহম রাষ্ট্র। অহমরা ডিব্রুগড় অঞ্চলে রাষ্ট্র স্থাপন করে চতুর্দশ শতাব্দীতে। সপ্তদশ শতাব্দীর অহম রাজ্যকে ভেঙ্গে দেয় আরঙ্গ

জেবের সুবাদার মীরজুমলা। কিন্তু মীরজুমরা গড়গাঁও-এ টিকে থাকতে পারলেন না, হটে আসতে গিয়ে তিনি মারাই গেলেন। মীর্জা রাজা জয় সিংহের পুত্র রামসিং গুয়াহাটি থেকে আর এগোতে পারলেন না অহম রাজ্যের মধ্যে। রামসিংহের কয়েক বছর আগে মুঘলদের রুখে দিয়েছিলেন সেনাপতি লছিৎ বরফুকন। বরফুকনের মত অন্যান্য সেনারা মুঘলদের আটকে রাখছেন গুয়াহাটিতে। ডঃ সূর্য্যকান্ত ভুঁইয়া তাঁর Anglo-Assamese Relations এবং অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ সাম্প্রতিক কালে Comprehensive History of India (যে গ্রন্থ এখনো প্রকাশ হয় নি) একাদশ খণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে তুঙ্গ ঘুঙ্গগিয়া রাষ্ট্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় ৫০/৬০ বছর বেশ শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে ক্ষমতাসীন ছিল। এই রাষ্ট্রের ক্ষয় ঘটে ইংরেজদের আক্রমণে তো নয়, শুধু বর্মীদের চরম আক্রমণেও নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর ক্ষয় ঘটে অভ্যন্তরীণ নানা দ্বন্দ্বের ফলে, যে সংকট ছিল সামন্ততন্ত্রের অন্তিম রাজনৈতিক সংকট। এই দ্বন্দ্বগুলির সবচেয়ে পরিষ্কার চেহারা আমরা দেখতে পাই একটা কৃষক বিদ্রোহে, ধর্মীয় এবং কৃষক বিদ্রোহে যা ধীরে দীরে একটা ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহামারিয়া বা মোয়ামারিয়া কৃষক বিদ্রোহে। বিস্তারিত আলোচনা অধ্যাপক গুহ করেছেন ডঃ অশোক মিত্র সম্পাদিত The Truth Unites Essays in Honour of Samar Sen বইটিতে। অধ্যাপক গুহ্ যেভাবে আসামের অভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রের সঙ্কটের চেহারা দেখিয়েছেন সে ধরনের সংকটে হয়ত অযোধ্যার বা পাঞ্জাবেও দেখতে পেতে পারি, যদি প্রশ্নগুলিকে সেভাবে গুছিয়ে নিই, যদি আমরা মুজফর আলমের তথ্য নতুন করে আবার চর্চা করি। নিশ্চয়ই আমরা মহীশূরের ইতিহাসেও দেখতে পাব, যদি আমরা টিপু সুলতানের উপর শুধু জোর না দিয়ে হায়দারের যুগ থেকে মহীশূরের ইতিহাসটাকে চর্চা করি। এ বিষয়ে নতুন ধরনের গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন অধ্যাপক অশোক সেন তাঁর Pre-capitalist Economic Formation of India : Tipu Sultan's Mysore লেখাটিতে, যেটা আমাদের কেন্দ্রের Perspective in Social Sciences Historical Dimensions V-এ বেরিয়েছিল। এ বিষয়ে আরো তথ্য পাওয়া যায় নিখিলেশ গুহের লেখা সাম্প্রতিক বইতে মহীশূরের উপর।

আমার বিশ্বাস এই ধরনের আভ্যন্তরীণ সামন্ততান্ত্রিক সঙ্কটের চেহারা প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রত্যেকটি অঞ্চলে দেখতে পাবো, যদি এ নিয়ে নতুন করে

গবেষণা করা যায়। আহ্বান করছি ঐতিহাসিকরা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস চিন্তা না করে বা প্রশ্ন না করে বা শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের, আধুনিক শাসকশ্রেণীর সংস্থাপনার ইতিহাস না লিখে, বা এমনকি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অর্ন্তদ্বন্দ্বের কথা কম চিন্তা করে কিছুটা প্রাক-ধনতান্ত্রিক সঙ্কট এবং অর্ন্তদ্বন্দ্বের দিকে নজর দিন। প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে।

সে তথ্যগুলো চর্চা করতে গেলে আমাদের আরও দেশী ভাষা নিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, বাংলা সাহিত্যের তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে, মারাঠী ইতিহাস চর্চা করতে হবে, নেপালী শিখে নেপালী রাষ্ট্রের ইতিহাসের নতুন গবেষণার বিষয় উৎসাহ নিতে হবে, যা কার্সিয়াং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কুমার প্রধান সম্প্রতি করেছেন। অন্তিম মধ্যযুগীয় কাল ও আদি আধুনিক কালের সন্ধিক্ষণ নিয়ে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও গবেষণা করা হোক। এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অনেক প্রান্তে, যার ভিত্তিতে মধ্যযুগের শেষভাগের বিষয় প্রচুর গবেষণা হয়েছিল। এক সময়ে স্পেশাল পেপারের নাম দেওয়া হল Late Medieval India ও Early Modern India। এখনও সেগুলি রয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে গবেষণা কমে গেছে। Late Medieval India-র নাম হবার আগে তিনটে স্পেশাল পেপার ছিল। রাজপুত, মারাঠা ও শিখ। রাজপুত ইতিহাসে গবেষণা করেছিলেন ডঃ সুবিমল দত্ত, ডঃ গোলাপ রায়চৌধুরী, ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মারাঠা ইতিহাসে বিখ্যাত গবেষণা করেছেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, শিখেদের বিষয় ডঃ ইন্দুভূষণ ব্যানার্জী ও ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ। এঁরা সকলে যে গবেষণা করেছেন তা আজকের ভারতেও বিখ্যাত। আমরা যদি আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর আঞ্চলিক ক্ষমতাগুলির বিষয় নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আবার গবেষণা শুরু করি এবং এই সকল গবেষণার জন্য যে সব ভাষা অনুশীলন প্রয়োজন, তার চর্চার প্রবর্তন করি, পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাহলে হয়ত আবার সারা ভারতের ইতিহাস লেখার খ্যাতি সারা দেশে প্রবর্তিত হতে পারে।

* ইতিহাস সংসদের যে সদস্যরা এই প্রবন্ধ গুছিয়ে লেখার বেশীরভাগ শ্রম লাঘব করে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।

কলিযুগের কল্পনা ও ঔপনিবেশিক সমাজ

সুমিত সরকার

ঐতিহাসিক গবেষণার কোনও বিশেষ দিকের সমীক্ষা হয়তো Keynote address-এ আশা করা হয়। তা না করে আমি নিজের ইদানীংকার কিছু এখনো-অসম্পূর্ণ কাজের কথা বলব ভাবছি, আশা করছি এর থেকে সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপকতব আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। 'কলিযুগের কল্পনা ও ঔপনিবেশিক সমাজ' বিষয়টি একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। 'কলিযুগ' কথাটা আমাদের সকলের পরিচিত, একে আমরা সাধারণত একটা কথার মাত্রা বলে ধরে নিই, সময়টা খারাপ, আগে ভালো ছিল, এই রকমের একটা ভাসা-ভাসা রক্ষণশীল বক্তব্যের বাইরে বেশি গুরুত্ব দিই না। কিন্তু কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ—বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলাদেশে কলিযুগ শব্দের ব্যবহার আর-একটু তলিয়ে দেখলে মন্দ হয় না : ঠিক কারা এটি ব্যবহার করছেন, কলিযুগের ঠিক কোন্ কোন্ লক্ষণ তাঁদের নাড়া দিচ্ছে, এই ধরনের প্রশ্ন আলোচনা করলে ঔপনিবেশিক শাসন ও সমাজ সম্পর্কের এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার ধারা আমাদের চোখে পডতে পারে।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কেশব-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ তথাকথিত নবজাগরণের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিনিধিদের লেখায় কলিযুগের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যাবে না। 'রেনেসাঁস-কল্পনায় অন্ধকার থেকে আলোতে আসা, অগ্রগতি, ইত্যাদির প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক ; অন্যদিকে কলিযুগের চশমায় অধঃপতন, ক্ষয় বড় ভাবে ধরা পড়ে। 'High culture'-এর জগতে কলিযুগ শুধুই কথার মাত্রা, বা বড়জোর হাল্কা ঠাট্টা-তামাশার উপাদান—যেমন দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি-অবতার' প্রহসনে (১৮৯৫) : কল্কি এসে বিচার করে দেখলেন, পণ্ডিত, গোঁড়া হিন্দু, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলাতফেরত—"কারু সঙ্গে কারুর বড় মতের তফাৎ নাই/ সকলেই সমান নিজের আহারটি খোঁজেন"[১]। নব্যহিন্দুদের "beautiful muddle. a queer

---

* অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ।

পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন, আশুতোষ কলেজ, ১৯৮৮

amalgam / of শশধর, Huxley and goose''[৩] বা ব্রাহ্মদের বর্ণনা : ''অতি অনুতপ্ত—অতি শুদ্ধ রুচি/ খান কাঁচা গোল্লা, সরপুরি ও লুচি''[৩]—এই ধরনের ব্যঙ্গের পেছনে কোনো তীব্র বেদনা বা ক্রোধ নেই। লক্ষণীয়, যে নাটকের শেষে কল্কির আদেশে এই পাঁচ ধরনের লোক সহজেই পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করছে।

সাংস্কৃতিক জগতের আর একটু নীচের মহলে প্রবেশ করলে দেখা যাবে কলিযুগের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আমি বলছি স্বল্প-পরিচিত অজস্র প্রহসন, যাত্রার পালা, বা তথাকথিত বটতলা সাহিত্যের কথা, যাকে Robert Darnton এর ভাষায় হয়তো বলা চলে 'low life of literature'।[৪] এর সঙ্গে কালীঘাটের পটের কথাও এসে পড়ে। জয়ন্ত গোস্বামী বিরাট সমীক্ষা, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রহসন'' গ্রন্থে ৫০৫টি প্রহসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা নাম আছে, এর মধ্যে শুধু title দিয়ে বিচার করলেও, ৩১টিতে কলিযুগের প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। Mildred Archer বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কালীঘাট পটের একটি প্রধান অনুভূতি হলো, ''The world ... was passing through a dark age. a Kali Yug''[৫]।

এই সংস্কৃতি ঠিক popular বা নিম্নবর্গীয় নয়, তাছাড়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতি-সরল সামাজিক ভেদরেখা না টানাই ভালো। প্রহসনের রচয়িতাদের নাম দেখলে বোঝা যায়, তাঁরা অধিকাংশ সময় উচ্চবর্ণের লোক, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পদবী যথেষ্ট চোখে পড়ে। বরং এ হলো এক ধরনের 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' জগৎ : কলকাতা, মফস্বল শহর বা গ্রামের পড়ন্ত অবস্থার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যাদের হয়তো বলা যায় traditional literati এবং সেইসঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা অল্পস্বল্প পেয়েও যাঁরা বিশেষ লাভ করতে পারেননি, প্রতিষ্ঠিত উকিল-ডাক্তার-অধ্যাপক-সাংবাদিক লেখকদের চাইতে অনেকটা নীচে পড়ে-থাকা ভদ্রলোক চাকুরিজীবী-স্কুলমাস্টার বা, সর্বোপরি, অফিসের কেরানী।

আমার মনে হয় এই নিম্নমধ্যবিত্ত জগতের চেতনা-অনুভূতি আমাদের ইতিহাস-রচনায় কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে, বা বড়জোর দেখা হয়েছে নেহাৎই economistic ভাবে, শিক্ষিত বেকারের সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ইত্যাদি আলোচনায়। 'রেনেসাঁস'-বিতর্ক, আর জাতীয় আন্দোলনের পুরনো-ধাঁচের ইতিহাস, বিখ্যাতদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল, আবার সাম্প্রতিক subaltern বা নিম্নবর্গের ইতিহাস মূলত কৃষক-বিদ্রোহ বা চেতনা বুঝতে চেয়েছে। কিন্তু এই অন্তর্বর্তী স্তরের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল আর আছে,

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বা আজকের দিনেও। কলিযুগ-কল্পনার পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে আমি এই জগতে প্রবেশের একটা পথ খুঁজছি। নিম্নবর্গের মানুষ কিছু শিক্ষার সুযোগ পেলে intelligentsia-র ঠিক এই স্তরেই অপেক্ষাকৃত সহজে প্রবেশ করতে পারেন, তাই পরোক্ষভাবে হলেও, নিম্নবর্গের ইতিহাস-সন্ধানেও এই রকম প্রচেষ্টার কিছু সার্থকতা থাকতে পারে।

কলিযুগ-কল্পনার প্রথম বিশদ বিবরণ, যতদূর জানি, পাওয়া যায় মহাভারতের বনপর্বে। মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের পর হাজার বছরের কলিযুগ আসবে। রাজারা তখন হবে অত্যাচারী, ম্লেচ্ছ; ব্রাহ্মণেরা স্বীয় কর্তব্য, জ্ঞান ও আচার বিস্মৃত হয়ে শূদ্রের সেবা করবে; শূদ্রের আর্থিক ক্ষমতা বাড়বে, তারা ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় অধিকাব কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে; মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের পাত্র বেছে নেবে, স্বামীদের শাসন করবে, নানারকম যৌন-ব্যভিচার দেখা দেবে। "নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইবে, এইরূপে সকলই বিপরীত হইবে।"[৬] অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অবশেষে কলিযুগের ইতি হবে, মহাপ্লাবনে পৃথিবী ডুবে যাবে—তারপর বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপে বালক নারায়ণের শরীরের ভিতর দেখা দেবে নতুন সত্যযুগের সূচনা। আরম্ভ হবে আর একটি চতুর্যুগ—cyclical time-এর মধ্যে আবার অবশ্যম্ভাবী linear অধোগতি। প্রায় একই সঙ্গে কলিযুগের অবসানের অন্য এক ধরনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে বনপর্বে : সম্ভলগ্রামের বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান কল্কি দুই রাজাদের দমন করে কৃত বা সত্যযুগের সূচনা করবেন।"[৭]

পরবর্তী অনেক পুরাণ উপপুরাণে কলিযুগের মূলত একই রকমের চিত্র পাওয়া যায়, তবে নেতিবাচক দিকগুলি আরও পরিষ্কারভাবে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়—যেমন দেখা যাবে বিষ্ণুধর্ম বা বৃহৎনারদীয় উপপুরাণে।[৮] মধ্যযুগের একেবারে শেষপ্রান্তে, হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এবং খুব সম্ভব বাংলাদেশে রচিত কল্কিপুরাণে কলিযুগের প্রতিভূ বিশাসনপুরের রাজা কলি। বিষ্ণু-অবতার কল্কির পরিবারের আর নানা দিগ্বিজয়ের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে এই পুরাণে। কল্কির প্রথম শত্রু কীকটপুরের বৌদ্ধরা ; তাদের মুখে কিছুটা 'যুক্তিবাদী', আধা-বৌদ্ধ, আধা-লোকায়ত, তর্ক দেওয়া হয়েছে—তারা প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু মানে না, তাই দেহ ব্যতীত আত্মা, পরলোক, দেবপূজা, জাতিভেদ, সবই অস্বীকার করে। কলির সৈন্যবাহিনীতে নানা ম্লেচ্ছ জাতি আর চণ্ডাল আছে। কীকটপুরের মেয়েরাও

যুদ্ধ করে, কলির রাজধানীতে "সকলেই রমণীগণেব আজ্ঞাধীন" ; অন্যদিকে আদর্শ মহিলারা সর্বদাই পতিব্রতা, পুরাণের শেষে কলিব দুই স্ত্রী "গতাসু পতিকে আলিঙ্গনপূর্বক বহ্নিপ্রবেশ" করে। কল্কি বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু কল্কিপুরাণে ভক্তিবাদ অল্পই আছে, বরং ব্রাহ্মণদের আচার ও প্রাধান্য ও কঠোর জাতিভেদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই কল্কির উদ্দেশ্য।[৮] প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, কলিযুগ—কল্কির কল্পনা কোথাও কোথাও খৃষ্টীয় world turned upside down এবং millenarianism-এর কথা মনে করিয়ে দিলেও, দু-এর মধ্যে তফাতটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ : আদর্শ এখানে অধিকার-ভেদভিত্তিক চতুর্বর্ণের সত্যযুগ, যা কোনোমতেই সাম্য-স্বাধীনতার আদিম স্বর্ণযুগ নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের ব্যাপক বঙ্গানুবাদ হয় ; রামমোহন, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা, বা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষ, সকলেরই এই কাজে সমান উৎসাহ ছিল। ১৮৭৩-এর পর থেকে কল্কিপুরাণেরও নানা সংস্করণ ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়, মোটামুটি একই সময় থেকে কলিযুগের কল্পনা প্রচুর লেখায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কলিযুগের মূল লক্ষণ— ম্লেচ্ছ রাজা, অধঃপতিত ব্রাহ্মণ, অনম্র শূদ্র, মেয়েদের ক্ষমতা ও ব্যভিচার, যুক্তিবাদের প্রভাবে ধর্মের ক্ষয়—এসব কিছুর সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক-শাসিত বাংলাদেশের নানা পরিবর্তনের মিল খুঁজে পাওয়া এক ধরনের মননের পক্ষে স্পষ্টতই খুব কঠিন ছিল না। তবে ঠিক কোন্ লক্ষণগুলির কথা বেশি বলা হচ্ছে, কিভাবে বলা হচ্ছে, প্রাচীন আধারে নতুন কিছু বক্তব্য বা অনুভূতি এসে যাচ্ছে কিনা, এটাই হলো আলোচনার বিষয়।

প্রহসন-সাহিত্যে বিদেশী-শিক্ষিত ও ভাবাপন্ন, অনেক সময় ব্রাহ্ম, যুবকের ঠাট্টা বা নিন্দা স্বভাবতই রয়েছে; পাশাপাশি, হয়তো একই প্রহসনে, দুর্নীতিগ্রস্ত পুরোহিত বা গোস্বামীরও তীব্র নিন্দা পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাপ্‌রে কলি' (১৮৮৬) নাটকের দুই শয়তান হলো ইংরাজীশিক্ষিত যুবক অম্বিকাচরণ, আর জনৈক ধর্মগুরু মহেশ বিদ্যাচঞ্চু।[১০] এই সাহিত্যে অন্তত সংস্কারক / রক্ষণশীলের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। সব চাইতে প্রাধান্য পেয়েছে উদ্ধত রমণীর মূর্তি : আধুনিকা স্ত্রী, যে নাকি শাশুড়ীকে মানা দূরে থাক্, অত্যাচার করে, বাড়ির কাজ ঠিকমত করে না, সারাক্ষণ সাজগোজ আর নভেল নিয়ে ব্যস্ত, স্বামীকে বশীভূত ক'রে তার খরচ বাড়ায় আর আত্মীয়স্বজন,

বিশেষ করে মা এবং ভাইদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'ভ্যালারে মোর বাপ' প্রহসনে (১৮৭৬) বউ শাশুড়ীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় আর স্বামীকে ভেড়ার কাপড় পরতে বাধ্য করে। মোটামুটি একই সময়ের কালীঘাট পটে দেখা যায়, এই মেয়ে পুরুষের মুখওয়ালা ভেড়াকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আরেকজন পুরুষের ওপর দাঁড়িয়ে উঠেছে।[১১]

উদ্ধত রমণীর বিভীষিকা কি শুধু তথাকথিত 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' আন্দোলনের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া? মনে হয় এর ব্যাপকতর অর্থও কিছু থাকতে পারে। যেমন নেওয়া যাক হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালার বউ' প্রহসনটি (১৮৮০) : স্বামী পুলিন দুঃখ করে বলছে, "আমাদের ঘরে বাইরে সুখ নাই। বাইরে রাজ-কর্মচারীদের দাসত্ব, বাড়িতে স্ত্রীর দাস হয়ে কালযাপন করিতে হচ্ছে।" মাইনে পেয়েই স্ত্রীকে বস্ত্র অলঙ্কার দিয়েও সে রেহাই পায় না। "ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্ররা" ভাল চাকরি সব কুক্ষিগত করে রেখেছে, "বঙ্গমাতা" হয়ে গেছেন "লণ্ডনে-শ্বরীর" দাসী—"ওদিকে অবস্থা তো এমন, আবার এদিকে আমরা শতমুখীর ত্রাসে স্বাধীন হতে পারিনে।"[১২] বিদেশী শাসনের প্রত্যক্ষ উল্লেখ এই ধরনের সাহিত্যে প্রায় নেই, যদিও কলিযুগ-বর্ণনায় ম্লেচ্ছ রাজার স্থান ছিল—পরোক্ষভাবে, উপমার মধ্যে দিয়ে এখানে কিন্তু প্রায় একটি জাতীয়তাবাদী বক্তব্য প্রকাশ পাচ্ছে : সন্তানেরা আধুনিকার মোহাচ্ছন্ন হয়ে মাকে অবহেলা করছে, দুঃখিনী মা যেন দেশমাতারই উপমা। ইঙ্গিতটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'শ্রী কোন ঐতিহাসিক' লিখিত 'মেয়ে পার্লামেন্ট বা ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য গ্রন্থে (১৮৮৫, ১৮৯৩), নারীমুক্তিবিরোধী রসিকতা এখানে দ্রুত রূপান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক বক্তব্যে। মেয়েদের পার্লামেন্টে দেশ শাসন করছে, "গ্যালারীতে পরদা আচ্ছাদনে... মেম্বরীগণের গৃহপতিগণ"—কিন্তু পুরুষদের এই অবস্থার জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী : "পরপদলেহনই ভ্রাতাগণের একমাত্র জীবিকা...দাসত্ব একমাত্র উপজীবিকা...সমস্ত জাতিটাই যেন উমেদারের জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ... যেমন বচনবিলাসী ভারত, তেমনি বচনব্যাপারী গ্ল্যাডস্টোন...।[১৩]

সাবেকী পারিবারিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা ভেঙে যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর কলিযুগ-কল্পনার এটি হলো প্রধান এক উপাদান। উদ্ধত, বিলাসপ্রবণ স্ত্রীর পাশাপাশি, এই ভাঙনের জন্যে দায়ী অর্থলোলুপতা, টাকার মোহে স্বার্থপর ব্যবহার। অর্থের অনর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের বহু নাটকের অন্যতম বিষয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যায় 'শ্রীবৎস-চিন্তা' (১৮৮৪) বা 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯)। গিরিশচন্দ্রের প্রভাবপুষ্ট স্বল্পখ্যাত নাট্যকার

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নতুন বাবু বা কলির অবতার' (১৯০৪) প্রহসনে হঠাৎ বড়লোক বিলাস মা আর দাদাকে অপমান করে : "পাঁচজনের ভাবনা ভাবতে গেলে আর বড়লোক হওয়া যায় না...এ সেকেলে বড়লোক নয় মা!...আজ কাল পয়সা হলে আগে আপনার সুখ... তারপর যদি কিছু বাঁচে, তাহলে আগে মাগের হরেক রকমের গয়না...তারপর যদি কিছু বাঁচে তাহলে মাকে গুদাম ভাড়া হিসাবে কিছু মাসহারা দিতে পারা যায়...আজকাল আপনার সহোদর ভাই না খেতে পেয়ে মরে গেলেও, বড়লোকেরা কখনো ডেকে জিজ্ঞাসা করেনা।"[১৪]

টাকার সন্ধানে লোক চাকরির উমেদার হয়, কিন্তু কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যতিরেকে বেশিরভাগের কপালে আছে নগণ্য অফিস-কেরানীর কাজ, যা নাকি দাসত্বেরই অন্য নাম। রামকৃষ্ণের কথামৃতে কামিনী, কাঞ্চন, আর চাকরির দাসত্ব যেভাবে বারবার একত্র করে দেখানো হয়েছে, তার পূর্ণ অর্থ কলিযুগ—সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিক সমাজের আলোচিত দিক আমাদের চোখে পড়ে। বেদনার কারণ ঠিক চাকরির অভাব বা শিক্ষিত বেকারী নয়, শুধু অল্প বেতনও নয় : নতুন ধরনের চাকরিতে কাজের চাপ, ঘড়ি-মাপা, সময়ের কঠোর শৃঙ্খলে-বাঁধা কাজের ধরন। ধনতান্ত্রিক সমাজের সময়ের অনুশাসন ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রবেশ করে মূলত অফিসের কাজের মধ্যে দিয়ে, কারণ আধুনিক শিল্প তখনো পর্যন্ত অল্পই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর সেখানকার শ্রমিক প্রধানত অবাঙালী—কৃষিতেও উৎপাদন-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। কেরানী-জগতের বেদনা কলিযুগ কল্পনার একটি কেন্দ্রবিন্দু। এই বেদনার ছাপ রামকৃষ্ণকথামৃতের বহুস্থানে অনুভব করা যায়; রামকৃষ্ণের ভক্ত, একদা-কেরানী, গিরিশচন্দ্রের লেখাতেও অনেক নিদর্শন মিলবে। সবচাইতে ভালো উদাহরণ হয়তো দুর্গাচরণ রায়ের 'সচিত্র দেবগণের মর্ত্তে আগমন' (১৮৮১)। জামালপুর-মুঙ্গের থেকে কলকাতা পর্যন্ত বারবার দেবতারা কেরানীদের দেখছেন—"আর কেরাণী না বলিয়া বিস্তর চাকর কাজকর্ম্ম করিতেছে বল। কি আশ্চর্য্য! যাহাকে দেখি, যাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করি, সেই কেরাণী...পরাধীন জাতির পরাধীন থাকিতে সাধ...।"[১৫] সন্ধেবেলা "অধিকাংশই ব্রাহ্মণ...অফিসের কেরাণীরা ঝিমাতে ঝিমাতে আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদের মুখগুলি সমস্ত দিন খেটে শুকিয়ে গিয়াছে...সমস্ত দিন সাহেবের ঝাঁটা লাথি খান, তৎপরে প্রত্যাগমনের মুখ আপনি দেখিলেন...পরিবার সদা সর্ব্বদা কহিলা থাকেন...'এক্ষণে মাসকাবারে ছয়ভরির বালা দেবে কিনা বল?...যার

খাবার সংস্থান নাই, সে বে করে কেন?" [১৬] সব-কিছু দেখে দেবতাদের কলিযুগের কথা মনে হলো, ব্রহ্মা তাঁদের সে-যুগের বর্ণনা শোনালেন—"অনেক রজনী পর্য্যন্ত কলিমাহাত্ম্য শুনিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন...।"[১৭]

বিলাসপ্রবণ, বেহায়া, 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' (বহু প্রহসনের নাম এই ধরনের) —কিন্তু অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এক বিশেষ ধরনের আদর্শ রমণী নৈতিক জগৎ পুনর্নির্মাণের অন্যতম শক্তি হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে স্বার্থপর কুচক্রী রমেশের ষড়যন্ত্রে বড়ভাই যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে আসে, অত্যধিক কাজে শ্রান্ত যোগেশ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাবে মদে ডুবে যায়, একমাত্র প্রতিরোধ আসে রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লর কাছ থেকে : "তুমি কি মনে কর আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে...প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কাজ করতে দেব?...আমি সতী, আমার কথা শোন, যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হয়ো না।" স্বামী তার গলা টিপে মেরে ফেলে, মৃত্যুমুহূর্তে প্রফুল্ল বলে : "দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা কর্ব্বো না—জগদীশ্বর করুন, যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"[১৮] সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীরাম' নাটকে (১৯০১) যোগমায়া স্বামীকে বলে : "আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি সব স্বামীর...স্বামীর যদি কখন কোন বিপরীত-বুদ্ধি হয়, তাহলে বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য তা সংশোধন করে নেওয়া, তা নইলে সহধর্ম্মিণী নামে কলঙ্ক হয়।"[১৯]

সতী-সাবিত্রী-সীতার ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনা করলে এখানে মিল ও অভিনবত্ব দুই-ই দেখা যাবে। আদর্শ রমণী ঠিক বিদ্রোহ করছেন না। তিনি সাবেকী পুরুষ-প্রধান সমাজের মূল্যবোধ পুনর্ঘোষণাই করছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের deferential assertion-এর উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যার মধ্যে পরবর্তী যুগের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বা 'অহিংস অসহযোগ' এর আভাস খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এর পাশাপাশি দেখা উচিত নিম্নবর্গ চরিত্র, বিশেষ করে ভৃত্যদের স্থান। উনবিংশ শতাব্দীর কলিযুগ-কল্পনায় অনত্র শূদ্রের উল্লেখ নেই বললেই হয়, কিন্তু একাধিক প্রহসনে সাবেকী ধাঁচের পুরাতন ভৃত্য মনিবকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে ঠিক একই ভাবে।[২০]

নৈতিক জগৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে তৃতীয় একটি শক্তি হলো, ঘর-ছাড়া, আপন-ভোলা, আপাতদৃষ্টিতে 'পাগল' চরিত্র, যার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার নিজের মূল্যবোধ অনেকটা প্রকাশ করছেন। গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' (১৮৮৯) বা 'কালাপাহাড়' নাটকের

(১৮৯৬) চিন্তামণির কথা ভাবা যায়—এখানে সুস্পষ্টভাবেই রামকৃষ্ণের ছায়া এসে গেছে। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকেও এই ধরনের ধার্মিক ভবঘুরে 'পাগল' চরিত্র একাধিক পাওয়া যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর কলিযুগ কল্পনায় কল্কির স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। মূলত সমসাময়িক জগতে প্রতিষ্ঠিত নাটক-প্রহসনে পৌরাণিক অবতার-চরিত্রের প্রবেশ সহজ নয়, তাছাড়া কল্কি-কাহিনীতে যে আকস্মিক, প্রায়-বৈপ্লবিক, রূপান্তরের ইঙ্গিত আর ক্ষত্রিয়সুলভ যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে deferential assertion-এর ভাবের মিল বিশেষ নেই। এমন-কি "পুরাণের সহিত কল্পনার সামঞ্জস্য রক্ষা" করে রচিত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থের 'কলির অবসান, বা কল্কি-অবতার গীতাভিনয়' (১৯০২) পড়লেও কল্কিপুরাণের সঙ্গে পার্থক্যগুলিই চোখে পড়ে। এই নাটকে কল্কির জন্ম হয় সম্বলপুরের এক অতি-দুঃস্থ ব্রাহ্মণপরিবারে: "তারা সব অন্ন বিনা অস্থি-চর্ম্ম-সার, কোন দিন উপবাসে, কোন দিন বা ফলমূল আহারে তারা কোনরূপে প্রাণ ধারণ করছে...।"[২১] কল্কিপুরাণে বিশুযশা-সুমতির দারিদ্র্যের কোনো ইঙ্গিত নেই, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যে কল্কিকে অবহেলিত ব্রাহ্মণরূপে কল্পনা করা হতো, তার অন্য প্রমাণ পাওয়া যায় রামকৃষ্ণের কথায়। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কর্মচারীর দুর্ব্যবহারের গল্প করতে করতে রামকৃষ্ণ হঠাৎ একদিন বলেছিলেন : "কালের শেষে কল্কি-অবতার হবে, ব্রাহ্মণের ছেলে— সে কিছু জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে....।" [২২] অঘোরচন্দ্র নিজে ছিলেন স্কুলমাস্টার ; ভূমিকায় তিনি "দীন ব্রাহ্মণ" বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

বিষ্ণুযশা-পরিবারের দেখাশোনা করে 'গোবিন পাগলা', যিনি নাকি "ছদ্মবেশী গোবিন্দজী", অর্থাৎ নারায়ণ। নাটকে কলির পরাজয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, কল্কিপুরাণের মতো দীর্ঘ যুদ্ধের বিবরণ একেবারেই নেই। কল্কিপুরাণে নারী হয় বিপথগামিনী, এমন-কি কল্কির সঙ্গে যুদ্ধরতা, নয়তো পতিপরায়ণা সতী— ঘটনার বিবর্তনে সৎরমণীর কোনও প্রত্যক্ষ অবদান নেই। অঘোরচন্দ্রের কল্পনায় কিন্তু সুমতি বিষ্ণুযশাকে বারবার আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দিচ্ছেন : "তোমার কথায় আমার চৈতন্যোদয় হ'ল....পত্নী হতে যে পতির উদ্ধার, তার অনেক উদাহরণ আছে।" কল্কির গুরু ভৃগুরামও বলেন : "পত্নী হতে যে, পতির গতি হয়, তা এই বিষ্ণুযশাকে দিয়েই সপ্রমাণ হচ্ছে, অমন স্বাধ্বী রমণী।" একই সঙ্গে অবশ্য সুমতি বলছেন, "আমি দাসী মাত্র...স্বামী-পদ-সেবাই নারীজাতির প্রধান ধর্ম্ম।" [২৩]

অঘোরচন্দ্রের নাটকের একটি দৃশ্যে বিশাসনপুরের সৈন্যরা একটি ব্রাহ্মণ বিধবাকে কলির দরবারে টেনে নিয়ে আসে। বিধবা নিজের সম্মান রক্ষার্থে আত্মহত্যা করার

আগে বলেন : "আজ সতীত্ব রক্ষার জন্য, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেব, তবুও এই সতীত্ব বিনাশ করতে দেব না....কলি! ধ্বংশ হবি, ধ্বংশ হবি....।"[২৪] কলিকে প্রকাশ্যভাবে নাট্যকার ম্লেচ্ছা, বিদেশী বা সাহেব রাজা বলছেন না, তবু সহজেই বোঝা যায়, আমরা এবার প্রকাশ্য জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের খুব কাছে এসে পড়েছি।

বিংশ শতাব্দীর গান্ধীবাদী জাতীয় আন্দোলন নিম্নবর্গের মানুষ ও নারী-সমাজকে যেভাবে একাধারে অনুপ্রাণিত আর শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, তার সঙ্গে কলিযুগ-সাহিত্যের deferential assertion ভাবের মিল যথেষ্ট। এ নিয়ে কিছু গবেষণা আগেই প্রকাশিত হয়েছে : আমি এখানে বিশেষ করে তনিকা সরকারের *Economic and Political Weekly*-তে প্রকাশিত একটি লেখার উল্লেখ করতে চাই। [২৫] অসহযোগ-আন্দোলনসূত্রের শুধু একটি উদাহরণ দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করছি। বিধুভূষণ বসুর 'কলির নববঙ্গ' পুস্তিকাটিতে (১৯২২) নটি ছোট গল্পের মাধ্যমে গান্ধী-আন্দোলনের প্রচার করা হয়েছে, কলিযুগ কল্পনার সঙ্গে যোগসূত্র-গুলি এখানে বিশেষভাবে স্পষ্ট। 'বিএ পাসের ভাই' গল্পে গণেশ দাদার টাকায় পড়াশোনা করে চাকরি পেয়ে "একটি পয়সাও দাদাকে পাঠায় না," পৈতৃক ভিটে রক্ষার চাইতে "বউ-এর শরীর শোধরান" তার কাছে অনেক বড়। নেপথ্যে "পাগলের" গান শোনা যায় : "আপনা ছাড়া আর কে আছে সংসার আপনা নিয়ে/আপনার বড় একজন আছে শ্বশুরমশার মেয়ে/....বাবার শ্রাদ্ধ নয়কো বড় গিন্নির মানের চেয়ে...পশুতে মানুষ প্রভেদ এইবার গেল ধুয়ে/খ্যাপা তুই বাঁচিয়ে গেলি আপনি পাগল হয়ে।"[২৬] 'কেরানীর মা' শীর্ষক গল্পে অফিসের কর্মচারী বড়বাবুকে খুসি করার জন্যে মাকে তার বাড়িতে রাঁধুনী করে পাঠাতে চায়, মা প্রতিবাদে বাড়ি ছেড়ে চলে যান : "আমি বামনের মেয়ে হয়ে তিলির দাসীগিরি কর্তে পারব না"...."বাংলা ডুবুক রসাতলে/যেথা পরের ঘরে দাসী করে মাকে বিকায় ছেলে....গোলামীর নেশা বইছে দেশে, মনুষ্যত্ব গেছে ভেসে/পশু এরা মানুষ বেশে, হায় কি কর্মফলে....।" [২৭] অনেকগুলি গল্পের শেষে গান্ধীবাদী আন্দোলন সমস্যার সমাধানরূপে দেখা দেয়—স্বামী চরকা-আশ্রমে চলে যাবার পর উকিলের বিলাসপ্রবণ স্ত্রী নিজের ভুল বোঝে, মুসলমান গোয়ালার কণ্ঠে অন্য এক অর্থলোভী উকিলের ধিক্কার প্রকাশ পায় : "মহারাজ গান্ধী ঠিক বলেছে, এরা শনিঠাকুরের বাহন।"[২৮] জাতীয়তাবাদ, নারী ও নিম্নজাতি সম্বন্ধে রক্ষণশীলতা, মূলত রক্ষণশীল কাঠামোর মধ্যে নিম্নবর্গের আর নারীর deferential assertion—সব-কিছু বারবার মিলে মিশে যায় এই ধরনের সাহিত্যে।

কলিযুগ-কল্পনার একমাত্র পরিণাম কিন্তু আত্মসচেতন জাতীয়তাবাদ নয়। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'কলির বামুন' (১৯২৬) প্রহসনের পটভূমিকা হলো জাতি-সংস্কার বা নিম্নজাতির 'Sanskritizing' আন্দোলন। গরীব ব্রাহ্মণ নন্দ ঠাকুর গ্রামের পোদ-জাতির পুরোহিত হয়ে বসেছিল, শিক্ষিত ডোমের ছেলে বাঞ্ছারাম ব্রাহ্মণ সেজে এসে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে পোদদের সংস্কার-আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ লেখকের উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষণশীল : "সংস্কারের কি বিষময় ফল দেখ।......জাতধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে কেউ কখনো জাতির সংস্কারে যেও না। ভগবানের দান মাথা পেতে নিও।" পরোক্ষভাবে কিন্তু নিম্নবর্গের ক্ষমতারও একটি ছবি প্রকাশ পাচ্ছে—পোদেরা নিজেদের ঠাকুর বেছে নিচ্ছে, আবার তাড়াচ্ছে : "কৈ ঠাকুর। বলি—বলবে—না পোদের হাতে মরবে?" [২৯]

হিন্দুসমাজের বাইরেও কখনো কখনো কলিযুগ-সুলভ কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমজাদ আলি ও আস্মাৎ আলি নসীরাবাদী-লিখিত 'মহাপ্রলয়ের পূর্বলক্ষণ' (ঢাকা, ১৯২১) পুস্তিকাটিতে জানা যায়, কিয়ামত অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের আগে "স্বামী স্বীয় ভার্য্যার বেজায় তাঁবেদারী হইবে। সন্তানগণ পিতামাতার অবাধ্য হইবে.... যাহারা দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর ও লোভী তাহারাই সরদার হইবে।" [৩০] সিকান্দর আলি মিঞার উর্দুর মতো পেছন-থেকে-সামনে লেখা প্রচুর বানান-ভুল সমেত 'মুসলমান সমাজ-তত্ত্ব ও বেশরা ফকিরের বৃত্তান্ত' (ঢাকা, ১৯১৭) পুস্তিকাটিতে বাউল-বিরোধী কথাবার্তাব পাশাপাশি আছে প্রচুর বক্তব্য, যা কলিযুগ-কল্পনা মনে করিয়ে দেয়। হঠাৎ বড়লোকের অহঙ্কার, যার ফলে পরিবারের ভাঙন ধরে, লেখককে বিশেষভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। "কাঠের বেপারী" হয়ে ভাই সব টাকা বউকে দিচ্ছে, অন্য ভাই গরীব হয়ে রয়েছে—"রুজগারির বিবি ফের মারে এছা টান/এ দেশেতে কেহু নাই আমার সমান/মান্য গণ্য নাহি করে সশুরীর তরে....।" [৩১]

কলিযুগ-কল্পনা বিচিত্র পথে চলেছিল, কিন্তু তাকে ঠিক সর্বত্রগামী বলা যায় না। অঘোরচন্দ্র 'কলির অবসান' নাটকের মুখবন্ধে বলেছেন, তাঁর পালাটি "মফস্বলের অনেকানেক যাত্রাসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক....অভিনীত হইতেছে।" যাত্রা বা পটের মাধ্যমে অশিক্ষিত নিম্নবর্গের মধ্যেও কলিযুগীয় ভাবনা নিশ্চয়ই প্রবেশ করতে পারত, কিন্তু এই মহলে মূলত ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠতাভিত্তিক চিন্তাধারার যে কখনো কখনো বিচিত্র রূপান্তর হয়, তার এক আশ্চর্য প্রমাণ 'কল্কি-অবতারের মোকদ্দমা'/ বিক্রমপুরে ভীষণ ব্যাভীচার' (ঢাকা, ১৯০৫) শীর্ষক পুস্তিকায় পাওয়া যায়। অন্য এক প্রবন্ধে আমি সম্প্রতি এই

মোকদ্দমার বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।[৩২] বিক্রমপুরের দয়হাটা গ্রামে লালমোহন মজুমদারের বাড়িতে এক দরিদ্র ভবঘুরে ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয়, সে কল্কি-অবতার বলে নিজেকে ঘোষণা করে। তার সঙ্গে আসে এক চণ্ডাল শিষ্য, প্রসন্ন। হঠাৎ একদিন চণ্ডাল শিষ্য কিছুক্ষণের জন্যে মজুমদার পরিবারের জগৎ একেবারে ওলট-পালট করে দেয় : একটি হত্যাকাণ্ড হয়, প্রসন্ন ব্রাহ্মণদের পৈতে ছিঁড়ে নানাভাবে অপমান করে, গৃহবধুকে স্বামীর কপালে লাথি মারতে বাধ্য বা প্ররোচিত করে। বিক্রমপুরের ভদ্রলোক ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাষায়, "দয়হাটার 'কল্কি-অবতারের' কলঙ্ক-কাহিনী বিক্রমপুরের ন্যায় সুসভ্য স্থানের সুনাম ডুবাইয়াছে।"[৩৩]

দয়হাটার কল্কি-অবতার নেহাৎই বিচ্ছিন্ন ঘটনা : কিন্তু একথা আজ সুবিদিত, যে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর উপজাতি-কৃষক-শ্রমিকের বহু আন্দোলন deferential assertion-এর সীমানা ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। গান্ধীবাদ-অনুপ্রাণিত গণজাগরণও বারবার নেতৃত্বের আদেশ অমান্য করে বা নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে। কিন্তু পিছুটানের দিকটাও ভোলা যায় না। কলিযুগ-কল্পনার ভিত্তি হলো সময়ের অবশ্যম্ভাবী cyclical গতি সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাস ; কলিযুগ ধ্বংস হলে সত্যযুগে ফিরে যাওয়া হবে, যে-সত্যযুগ আবার বর্ণাশ্রমধর্মের সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপরে রচিত। অতীতের আদর্শ নিজের মতো ব্যাখ্যা করে, অতীতের নামে আপাতরক্ষণশীল গণবিদ্রোহের নজির প্রায় সব দেশেই দেখা যায়, তবু মনে হয় হিন্দু-ঐতিহ্যে সত্যযুগ-কল্পনা অন্য অনেক সভ্যতার তুলনায় একটু বেশির-মাত্রায় সাম্য-বিরোধী, তার একেবারে কেন্দ্রে আছে মানুষে-মানুষে এবং স্ত্রী-পুরুষে অধিকার-ভেদ। বিদ্রোহী কৃষকের কল্পনাও অনেক সময় সৎরাজা, আদর্শ জমিদার, 'রামরাজ্য' ইত্যাদির সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। ১৯২০-২১-এর উত্তর-প্রদেশের বিদ্রোহী চাষীও তাই স্বপ্ন দেখে, বাবা রামচন্দ্রের রাজ্যে প্রজা মজায় থাকবে।[৩৪] বামপন্থীর শক্ত ঘাঁটি পশ্চিমবাংলায়-ও দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, পুরুষপ্রধান ঐতিহ্যের ছাপ আজও বারবার চোখে পড়ে। কলিযুগ-কল্পনার বিশ্লেষণ তাই হয়তো আজও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েনি।

সূত্র নির্দেশ

১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 'সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি-অবতার' (কলকাতা, ১৩০২/১৮৯৫), পৃ ১০১।

২. ঐ, পৃ ৩০।

৩. ঐ, পৃ ৮৬।

৪. Robert Darnton, *The High Enlightenment and the Low-life of Literature in Pre-Revolutionary France (Past and Present,* 51, May 1971).

৫. Mildred Archer, *Indian Popular Paintings in the India Office Library* (London, 1977), P. 143.

৬. কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত' (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা ১৯৭৪), ২, পৃ ২৫০।

৭. 'বনপর্ব', মার্কণ্ডেয়-সমস্যা অধ্যায়, ১৮৭, ১৮৯-১৯০।

৮. R. C. Hazra, *Studies in the Upapuramas (Calcutta, 1958),* ১, ৩।

৯. আমি ব্যবহার করছি কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের বাংলা অনুবাদ—কল্কিপুরাণ (কলকাতা ১৮৯৯ ; ১০ম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৬২)।

১০. জয়ন্ত গোস্বামী, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রহসন', পৃ ১১৩৪-৩৭।

১১. Mildred Archer, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৪৭।

১২. জয়ন্ত গোস্বামী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১০৩৬।

১৩. 'মেয়ে পার্লামেণ্ট বা ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য' (কলকাতা, ১৩১৫, ১৮৯৩), পৃ ৬, ১৬০, ৪১।

১৪. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'নতুন বাবু বা কলির অবতার' (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ ২৮, ৩১।

১৫. দুর্গাচরণ রায়, 'সচিত্র দেবগণের মর্ত্তে আগমন' (কলকাতা, ১৮৮৯), পৃ ৫৫৯।

১৬. ঐ, পৃ ৪৭৪, ৫২০-২৩।

১৭. ঐ, পৃ ৬৩৯।

১৮. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯ ; 'গিরিশরচনাবলী', কলকাতা ১৯৬৯, ৩, ৫৪৪-৫৪৫)।

১৯. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'চণ্ডীরাম : ধর্ম্মমূলক নাটক' (কলকাতা ১৩০৮/১৯০১), পৃ ৬৩।

২০. শৈলেন্দ্রনাথ হালদার, 'কলির সং' (কলকাতা, ১৮৮০) , যশোদানন্দন চট্টোপাধ্যায়, 'কলির বাপ' কলকাতা, ১৮৯৫)—জয়ন্ত গোস্বামী, পৃ ১৯৩-৮, ২৩৩-৯।

২১. অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, 'কলির অবসান, বা কল্কি-অবতার গীতাভিনয়' (কলকাতা, ১৯০২), পৃ ২২।

২২. 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত', ১৯৮০-৮২ সংস্করণ, ৪, পৃ ১০১।

২৩. অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, পৃ ৩৬, ৭৮।

২৪. ঐ, পৃ ৬৩-৬৬।

২৫. Tanika Sarkar, "Nationalist Iconography : Image of Women in 19th Century Bengali Literature", *Economic and Political Weekly,* 21 November 1987.

২৬. বিধুভূষণ বসু, 'কলির নবরঙ্গ' (কলকাতা, ১৯২২), পৃ ১২-১৩।

২৭. ঐ, পৃ ৬।

২৮. ঐ, পৃ ২, ১৯।

২৯. পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, 'কলির বামুন' (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ ৩৬।

৩০. আমজাদ আলি, আস্মাৎ আলি নসীরাবাদী, 'মহাপ্রলয়ের পূর্বলক্ষণ' (ঢাকা, ১৯২১) , পৃ ৪।

৩১. সিকান্দার আলি মিঞা, 'মুসলমান সমাজতত্ত্ব ও বেশরা ফকিরের বৃত্তান্ত' (ঢাকা, ১৯১৭), পৃ ৭।

৩২. সুমিত সরকার, "The Kalki-avatar of Bikrampur : A Village Scandal in Early 20th Century Bengal", in Ranajit Guha, ed. *Subaltern Studies VI* (Delhi, forthcoming).

৩৩. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (কলকাতা, ১৯০৯), পৃ ৩৭৩।

৩৪. মাজিদ সিদ্দিকী, *Agrarian Unrest in North India : The United Provinces, 1918-1922* (New Delhi, 1978), পৃ ২০০, ১১২।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ঃ ইতিহাসবিদদের প্রধান প্রধান মূল্যায়ণগুলি

বিপান চন্দ্র

১

অধ্যপক চট্টোপাধ্যায় ও সহকর্মীবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের শিক্ষকদের সঙ্গে আমাকে ভাব বিনিময়ের সুযোগ দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই ভাষণের প্রধান বিষয়বস্তু হল 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাসমূহ'।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের চারটি মুখ্য দিক যাদের সঙ্গে অন্যান্য প্রধান-অপ্রধান বিষয়ও সম্পৃক্ত হয়ে আছে সেগুলো হল ঃ

(১) উপনিবেশবাদ ও ভারতীয় জনগণের সঙ্গে তার বিরোধ ;

(২) জাতি হিসাবে ভারতের বিকাশ ;

(৩) জাতীয় আন্দোলনে প্রতিফলিত স্বার্থ আর তার সামাজিক অথবা শ্রেণীচরিত্র ; এবং

(৪) জাতীয় নেতৃত্বের গৃহীত কৌশল বা স্ট্রাটেজি।

ঐতিহাসিকদের বিগত শত বছরের সাধনায় ইতিহাসচর্চায় তিনটি প্রধান বিদগ্ধ গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত চারটি দিক নিয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ রেখেছেন। এঁরা হলেন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ও মার্কসবাদী গোষ্ঠী। এঁদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্পষ্টতই বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকলেও উল্লিখিত চারটি দিকের উপর আলোকসম্পাতে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর সুবাদে ভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে এঁরা স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চায় আর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল গোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ইতিহাসচর্চা এবং ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী, জাতীয়

ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯

আন্দোলন ও সাম্যবাদী দলের যথার্থ চিন্তাধারা ও কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও সমাপতন। প্রায়শঃই, গোষ্ঠীগুলো সম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদীদের বাস্তব রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অনুশীলনের ঐতিহাসিক চর্চা তথা তত্ত্বের প্রতিনিধিত্বকারী বলে অভিহিত হতে পারে।

২

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত হয় Dufferin, Curzon, Hamilton ও Minto-র সরকারী ঘোষণার মধ্যে। সর্বপ্রথম এ বিষয়টি খুব জোর দিয়ে প্রকাশিত হয় V. Chirol, Rowlatt (Sedition) কমিটি রিপোর্ট, Verney Lovett ও Montagu-Chelmsford রিপোর্টে। ১৯৪০ সালে মার্কিন পণ্ডিত Bruce T. Mc Cully শিক্ষাক্ষেত্রে এ বিষয়টির তাত্ত্বিক রূপ দেন। ১৯৪৭ সালে Percival Spear বিষয়টির উদারপন্থী ব্যাখ্যা প্রচার করেন আর পরিবর্তনবিরোধী ব্যাখ্যার প্রয়াসে ১৯৬৮ সালের পর অবদান রয়েছে এ ক্ষেত্রে Anil Seal ও Jack Gallaghar আর তাঁদের ছাত্র ও অনুগামীদের। বিস্ময়ের বিষয় হল অন্যান্য দুটি গোষ্ঠীর মত পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছে কোন ঋণ স্বীকার করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শীলের বইগুলোতে, এমনকি গ্রন্থপঞ্জীতেও Chirol, Lovett ও Rowlatt কমিটির রিপোর্টের কোন উল্লেখ নেই। Mc Cully-র প্রতি কোন বৌদ্ধিক ঋণও স্বীকৃত হয় নি যদিও সীলের নিজের রচনাও Chirol ও Mc Cully-র বক্তব্যের প্রতিফলন মাত্র—অবশ্য শীলের লেখায় সাম্প্রতিক সমাজতাত্ত্বিক অবোধ্য অথচ ঝাঁঝাল ভাষার নিদর্শনও মেলে। রাজ প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে তার বক্তব্যও Dodwell কিংবা Roberts-এর থেকে খুব স্বতন্ত্র নয়।

প্রথমদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদী লেখকরা ও পরের দিকে সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা ভারতবর্ষে আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতে উপনিবেশবাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন অথচ এই উপবিশেবাদই এ দেশের সমাজে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল ও বিদেশী সমাজ ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আত্মসমর্পণ সূচিত হয়েছিল। এঁদের লেখায় দেখা যায় না আর্থিক বিকাশে মৌলিক শোষণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে উপবিবেশবাদ স্থান পায় নি, পায় নি এদেশের অর্ধোন্নয়নের প্রধান কারণ হিসেবে। ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে উপনিবেশবাদের পরিণতিতে সংঘটিত সর্বগ্রাসী পরিবর্তনের কথা এখানে অবস্থিত

কিংবা ঔপনিবেশিকতার প্রক্রিয়ার থেকে সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে উল্লিখিত। উপনিবেশবাদকে দেখানো এখানে একটি সাধারণ বিদেশী শাসন হিসাবে ; ভারতবর্ষ চত্রিত হয়েছে একটি অনগ্রসর ঐতিহ্যশাসিত দেশ বলে—যেমনটি ছিল পশ্চিম ইউরোপ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে, কিংবা জাপান ও রাশিয়া যথাক্রমে ১৮৬৮ ও ১৮৯০-এর আগে। উপনিবেশবাদের অবসানেই যে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশ ও তার পরবর্তী স্তরে উত্তরণ সম্ভব তা দেখানো হয় নি কিংবা প্রবলভাবে তা অস্বীকাব করা হয়েছে।

সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণটাই ভর করে আছে এই অস্বীকৃতির উপর যে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের স্বার্থ মৌলিকভাবে বিপরীতধর্মী। অথচ, সময়ের পথে বৈপরীত্যের ক্রমান্বয়িক বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি ভারতে প্রবল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের রথটি প্রশস্ততর করেছিল। এই ঘটনাটিই এই আন্দোলনটিকে ও তার নেতৃবৃন্দকে করেছিল জাতীয়তাবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদী ; সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ উপনিবশেবাদের বিপরীতে উল্লিখিত ঘটনাটিই পাদপ্রদীপে নিয়ে এসেছিল।

উল্লেখ্য যে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিকরা জাতীয় আন্দোলনের উল্লেখ ও বিকাশের অন্যান্য উপাদানের অনেকগুলোকে স্বীকার করেন ; এমন কি 'উপনিবেশবাদ' শব্দটিকেও তাঁরা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন যদিও তাঁরা উপনিবেশবাদের শোষণমূলক ও আর্থিক বিকাশের পরিপন্থী চরিত্র ও তারই পরিণতিতে উপনিবেশবাদ আর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার মৌল বিরোধ ও বৈরীতার উৎপত্তিকে অস্বীকার করেন (আমার দৃষ্টিতে একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহাসিককে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে এই সদ্যউল্লিখিত বিষয়টি একটি লিটমাস পরীক্ষার সঙ্গে তুলনীয়)। ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইসব সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা অস্বীকার করেন যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন উল্লিখিত বিরোধের ভারতীয় সংস্করণ মাত্র কিংবা এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কেননা তা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিল মাত্র। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই আন্দোলন কিংবা সংগ্রামকে একটা প্রহসনের যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন, বলেছেন এটি একটি—"নকল যুদ্ধ।"[১]

(দৃষ্টান্তস্বরূপ, শীল লিখছেন ঃ "আইন অমান্য আন্দোলন, নয়া সংবিধান,

১৯৪২ সালের সংঘর্ষ—সবই ছিল দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেকার একটি বিস্ময়কর সংগ্রামের অংশস্বরূপ, দুটি ফাঁপা মূর্তির মধ্যে একটি দশেরা প্রতিযোগিতা (বাস্তব নয়, বরং রামলীলা নাটিকা) যা গতিহীন ও নকল যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রতিবিম্বিত।" তাঁর মতে ভারতে সত্যকারের রাজনৈতিক যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে "ভারতীয়দের মধ্যে" সম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যে। লেখকের ভাষায় "সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে আপাত সংঘর্ষ হয়েছিল", বাস্তব ব্যাপারটি ছিল তাদের "আসল অংশদারিত্ব" The Emergence of Indian Nationalism, pp 351 & 342)

এই মৌল বিরোধের অস্বীকৃতি ইতিহাসচর্চার এই গোষ্ঠীর পুরো দৃষ্টিভঙ্গীটাকে বিকৃত করেছে ও এর ব্যাখ্যামলক তাৎপর্য বিনষ্ট করেছে। অবশ্য ভিন্ন একটি কাঠামোতে অন্য পণ্ডিতদের এক্ষেত্রে সাহায্য করেছে বিশদ গবেষণা।

Ripon থেকে Perceival Spear পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর একটি উদারনৈতিক ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। এর ব্রিটিশ প্রতিরূপ ব্রিটেনের শৈল্পিক পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশে 'প্রগতি' ও 'স্বাধীনতা'র ধারণার ভূমিকা স্বীকার করেছে। এরই অনুকরণে উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদী লেখকেরা জাতীয় আন্দোলনকে 'সত্যিকারের' বৈধ আন্দোলন বলেছেন বটে তবে ঔপনিবেশিক বিরোধ কিংবা শোষণ আর পশ্চিমী শিক্ষা ও চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের বিস্তার ও উপলব্ধিকে মানেন নি। জাতীয়তাবাদকে খোঁজা হয়েছে জাতীয়তাবাদের ধারণার কিংবা মতাদর্শের মধ্যে, তার বস্তুগত মূলের অন্বেষণ হয় নি। ভারতীয় স্বাদেশিকতায় এ ধারণার প্রমাণ মেলে নি তাঁদের কাছে—তা এদেশে আমদানী করা হয়েছে ব্রিটিশের দ্বারা—ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক না কেন। প্রচার কিংবা ব্যক্তিগত গুণ বা সৃজনশীল ক্ষমতার মাধ্যমে নেতৃবৃন্দের অধিকতর ক্ষমতা ও শিক্ষার বিস্তারের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলন ও তার ক্রমবর্ধমান উগ্রতার উল্লেখ হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। জনগণের মধ্যে প্রচারের উৎকর্ষ ও তজ্জনিত সাফল্য প্রচার ও প্রচারকারীদের অন্তর্নিহিত গুণেরই দৃষ্টান্ত—সামাজিক প্রেক্ষিতের প্রতিফলনের নয়। সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের ভারতীয়রা জাতি হিসাবে উন্মেষিত হবার যোগ্য নয়। উনবিংশ শতকের শেষ থেকে তারা বলে আসছেন যে ভারতবর্ষ জাতিই নয় ; এ দেশ একটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি মাত্র যাকে সাম্রাজ্যবাদীরা একটি বৃহত্তর ও কৃত্রিম অর্থ দিয়েছে। অধিকন্তু ভারতে জাতিগত প্রক্রিয়াই হয় নি অন্ততঃ ঐতিহাসিক দিক থেকে ; তাই ভারত

জাতিত্বে পরিণত হচ্ছে না। ভারতবর্ষ যাকে বলে তা হল ধর্মীয় ও জাতপাতের দিক থেকে সম্প্রদায় ও স্বার্থের সমন্বিত রূপ। সে কারণে, ভারতীয় জাতি কিংবা ভারতীয় জনগণ অথবা সামাজিক শ্রেণীগুলোকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতির গোষ্ঠীবলয়ের প্রস্তুতি ঠিক নয় কেননা আগে থেকেই এদেশে রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, আর্য, ভদ্রলোক ও অনুরূপভাবে পরিচিত গোষ্ঠী। এই মতটাকে ঘিরে এই অনুমান গড়ে উঠেছে যে যেমন ইউরোপ, এমনটি চীন ও জাপানেও ধর্মীয় ও সমরূপ গোষ্ঠীগুলো আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর আধুনিক জাতি ও শ্রেণীবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল হওয়ায় আর প্রথাগত পরিচিতি পায় না, ভারতে কিন্তু এই ধরনের ধর্ম ও জাত-পাতভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোকে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করে আর্থ-রাজনৈতিক সংগঠনের বনিয়াদ হতে হবে কেননা তারা জাতি ও শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা অতিক্রম হয় না হতেও পারে না। ভারতে ধর্ম ও জাতভিত্তিক সম্প্রদায়গুলো নির্দেশক গোষ্ঠী হিসাবে রয়েছে। সুতরাং, ভারতের জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক সংগঠনের বিষয়গত ভিত্তি হল তারা। অন্য ভাষায়, জাতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি হল প্রাথমিক আর জাতীয়তাবাদ আর একটা আবরণ মাত্র। যেমন শীল বলেছেন, "দূর থেকে প্রতিভাত তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম তাদের নির্দেশক গোষ্ঠীগুলোর সংরক্ষণ অথবা বিকাশের প্রচেষ্টার নামান্তর।" (Emergence. p 342) (শীলের মতে, এটাই ভারতীয় জাতীয়বাদকে চীন, জাপান, মুসলিম দেশগুলো ও আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে।" (উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪২)।

যদি ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম সম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি ভারতীয় জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে উন্মেষিত না হয়ে থাকে, তবে তা কাদের স্বার্থ দেখেছে? আবার, এর যথার্থ উত্তর ও যুক্তিগুলো ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে সরকারী আমলা ও সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্ররা বার করেছেন। এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর লেখকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে জাতীয় আন্দোলন গণ অন্দোলন ছিল না, ছিল বাছাই করা গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ ও প্রয়োজনসিদ্ধির প্রয়াস মাত্র কেননা এ আন্দোলন তাদের নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ অথবা তাদের নির্দেশক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করেছে। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ ও গতি সঞ্চারে ইন্ধন জুগিয়েছে মুষ্টিমেয় বাছাই করা গোষ্ঠীগুলোর প্রয়োজন ও স্বার্থ। এই মুষ্টিমেয় বাছাই করা গোষ্ঠী কখনও কখনও ধর্ম অথবা জাতপাতকে ভিত্তি করে, কখনও বা পৃষ্ঠপোষকতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন,

ব্রিটিশ শাসনের কিংবা পরস্পরের বিরোধিতায় এই গোষ্ঠীর স্বার্থ বেশ সংকীর্ণ। প্রাথমিকভাবে তাই জাতীয়তাবাদকে একটা মতাদর্শভাবে বিবেচিত করা যায় বা এইসব গোষ্ঠী তাদের সংকীর্ণ স্বার্থকে আইনসিদ্ধ করতে অথবা জনগণকে নিজেদের পিছনে সমবেত করতে ব্যবহার করে। এ দিক থেকে জাতীয় আন্দোলন একটা ষড়যন্ত্র বিশেষ অথবা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে এইসব গোষ্ঠীকর্তৃক জনগণের আনুকূল্য লাভের নামান্তর মাত্র।

জাতীয়তাবাদের এই ধরনের ব্যাখ্যাকে সুসংবদ্ধ উপায়ে Dufferin ও Carzon কর্তৃক উপস্থাপিত হয় যখন তাঁরা নিজেদের স্বার্থে জাতীয়তাবাদকে শিক্ষিত অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খুব নগণ্য সংখ্যক লোক ব্যবহার করছে বলে মন্তব্য করেন। সরকারী ও বেসরকারী লেখায় অসংখ্য সরকারী কর্মী সম্পূর্ণভাবে এই তত্ত্বটিকে বাস্তবে ব্যবহার করেছে। পরে বিস্তৃতভাবে B B Misra, Anil Seal প্রমুখের দ্বারা। একই সঙ্গে কিছু লেখক এই যুক্তিও দেখিয়েছেন শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি বাছাই করা গোষ্ঠী পুনার ব্রাহ্মণ, সাধারণ ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক, আর্য প্রভৃতি উচ্চতর জাতগোষ্ঠীরও প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই মতের প্রথম দিককার প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন Chirol, Lovett ও Rowlatt কমিটির রিপোর্টের রচয়িতারা। পরে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিপাটি ও সমাজতাত্ত্বিক দুর্বোধ্যতাসহ তা J. H. Broomfield ও Anil Seal-এর প্রয়াসে গৃহীত ও অভিযোজিত হয় যদিও অবশ্য তার জন্য পূর্বসূরীদের কাছে ঋণ স্বীকার করা হয় নি।

এই সাবেকী সাম্রাজ্যবাদী মতামতের সঙ্গে Gallaghar ও Seal আর ছাত্রদের দ্বারা সম্প্রতি দুটি অতিরিক্ত ঝালর ও মাত্রা যুক্ত হয়েছে। Duflerin, Curzon, Chirol, Lovett, Mc Cully ও B. B. Misra সদাশয় রাজের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদকে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলো ব্যবহার করেছে বলে অভিমত দিয়েছেন আর Seal, Chirol ও Rowlatt কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত এরূপ সমান্তরাল মতের কথা বলেছেন যে ব্রিটিশদের আনুকূল্য লাভের প্রয়াসে জাতীয় আন্দোলনগুলো ভারতীয় মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়। লেখকের নিজের ভাষায়, "এদেশীয় লোকদের স্বদেশী সমাবেশগুলোকে প্রধানতঃ বিদেশী অধিরাজত্বের বিরুদ্ধে নির্দেশিত বলা ভুল। সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের মধ্যেকার আপাত বিরোধগুলোর প্রতি অনেক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে; এদের আসল যোগসূত্রের গবেষণা অন্ততঃ সমভাবে লাভজনক হবে।" তাই, জাতীয়

আন্দোলনের উন্মেষ ও বিস্তৃতির প্রতি ব্রিটিশদের অবদান হল এটাই যে ভারতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন অভিঘাত আর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠান তৈরী করে তা পারস্পরিক ঈর্ষা ও সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল। এখানে দ্বিতীয় মাত্রাটি যুক্ত হয়েছে Seal, Gallaghar ও তাদের ছাত্রদের দ্বারা যখন তাঁরা বলেছেন যে জাতপাত ও ধর্মকে অতিক্রম করে ভারতের বাছাই করা গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। Namier-কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তারা পৃষ্ঠপোষক-মক্কেলের সম্পর্কের মাধ্যমে এই ধরণের গোষ্ঠী গড়তে শুরু করেছে। বলা হয়েছে—স্থানীয় অঞ্চল ও প্রদেশগুলোতে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারিত করলে স্থানীয় ক্ষমতাবান লোকেরা মক্কেলদের স্বার্থসিদ্ধিতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে থাকে আর তাদের উপরের স্তরের পৃষ্ঠপোষকরা পালাক্রমে তাদেরই স্বার্থ দেখাতে থাকে। এইভাবে পৃষ্ঠপোষক-মক্কেলের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে ভারতীয় রাজনীতির সূত্রপাত হতে থাকে। কালক্রমে, বড় দরের নেতারা স্থানীয় ক্ষমতাবানদের রাজনীতিকে সংযুক্ত করতে এগিয়ে আসে। পালাক্রমে, অপরিহার্যভাবেই সারা ভারতে ব্রিটিশরাজ স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতীয় দালালদের যুগ শুরু হয়। কাজে সাফল্য আনতে নিম্নতর স্তরগুলোতে ও জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন মক্কেলদের সমবেত করতে সর্বভারতীয় দালালদের প্রাদেশিক স্তরে মধ্যবর্তী লোক বা দালালের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয় স্তরের নেতারা ছোট ঠিকাদাররূপে অভিহিত হতে পারে। রাজনৈতিকভাবে প্রধান প্রধান মধ্যস্থতাকারী নেতাদের মধ্যে, Seal-এর ভাষায়, উল্লেখ্য গান্ধী, নেহরু ও প্যাটেল। এই অবস্থায় জনগণের অবস্থান কোথায়? ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তাদের ঠিক দেখা মেলে না। এর পরে, যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, রোগ, খরা অথবা মন্দাজনিত অবস্থায় তাদের অস্তিত্বসম্পর্কিত নানা অভিযোগ ও কষ্টকে যাদের সঙ্গে উপনিবেশবাদের যোগ নেই মোটে, খুব চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করে তথা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতাবানদের দলাদলিতে টেনে আনা হয়েছে।

চূড়ান্ত দৃষ্টিতে, এই ধরনের মতবাদ শুধুমাত্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বৈধতা, ঔপনিবেশিক শোষণ ও অর্ধ-উন্নয়নের ঘটনা আর মৌলিক বিরোধের ব্যাপারটিকেই শুধু অস্বীকার করে না, তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত জীবন, জীবিকা ও স্বাধীনতার আদর্শকেও স্বীকার করেনি। যেমন S. Gopal বলেছেন, "রাজনীতিকে অন্তরশূন্য করেছেন বলে Namier-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে ;

কিন্তু এর গোষ্ঠী আরও এগিয়েছে আর শুধু অন্তরটাকেই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নি, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন থেকে নম্রতা, চরিত্র, সততা ও নিঃস্বার্থ দায়বদ্ধতাকেও সরিয়ে দিয়েছে।" (The Indian Economic and Social History Reviw. Vol XIV. No. 3. p 405) অধিকন্তু, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যশ্রেণীসমূহ ও নারীদের বোধশক্তিজ্ঞাপক ও সক্রিয় ভূমিকাকেও অস্বীকার করেছে। এরা নিজেদের প্রয়োজন ও স্বার্থসম্পর্কিত উপলব্ধি-শূন্য একদল বোবা জীব কিংবা শিশু-সুলভ মানুষ বলে চিত্রিত হয়েছে। বিস্ময় লাগে ভারতে কেন ব্রিটিশরা তাদের রাজনীতির পিছনে এদের কিছু লোককে কাজে লাগাতে পারে নি।

৩

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অন্ততঃ শিক্ষাগত দিক থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গবেষণায় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর বিশেষ কিছু অবদান ছিল না। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে কোন অভিব্যক্তিকে পছন্দ করত না কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিত, যেহেতু জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা তাদের জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রকাশকে সীমিত করে রাখতেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সত্যিকারের কিংবা জাল অধিনায়কদের মহিমাকীর্তনে। লাজপৎ রাই, এ. সি. মজুমদার, আর. জি. প্রধান, পট্টভি সীতারামাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের হাতেই জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে রচনার ভার পড়ে, শুধু ব্যতিক্রম দেখা যায় গুরমুখ নিহাল সিংয়ের ক্ষেত্রে যিনি নিজে ১৯১৮ সালের পরে আর এগোন নি। এমনকি ১৯৪৭ সালের পরও জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী বিশ্লেষণাত্মক কিংবা ইতিহাস রচনার দিক থেকে বড় রকমের অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। বোম্বাই, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ ও আসামের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসচর্চায় কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখা রয়েছে ; তবে চরিত্রগতভাবে সে অবদানও মৌলিক অর্থে পরীক্ষামূলক মাত্র ; দুর্বল লেখা আর.সি. মজুমদারের, বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ হতে ; তাছাড়া সম্প্রদায়িক দৃষ্টি ও আধুনিক ভারতীয় উৎসের প্রকৃতির উপলব্ধিতে ব্যর্থতাও ধরা পড়ে। জাতীয়তাবাদী রচনার দিক থেকে তারা তাঁদের লেখার শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলেও তাতে ঔপনিবেশিক ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করার সারগ্রাহী প্রয়াসে দুর্বলতা রয়েছে।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে এটার ভিত্তি ছিল ঔপনিবেশিকতার শোষণমূলক ও অর্ধ-উন্নয়নমূলক চরিত্রের প্রকৃত উপলব্ধি।

প্রথমে অর্থনৈতিক ও কালক্রমে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতা ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার বিরোধটিকে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল। দাদাভাই নওরোজি থেকে তিলক, গান্ধী ও নেহরু পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের ধারায় উপনিবেশবাদের চরিত্র আর ভারতীয় জনগণের স্বার্থের সঙ্গে তার বিরোধ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি উল্লেখ্য। এই দুটির উপর ভিত্তি করেই বিদগ্ধ সমাজ ও সাধারণ মানুষের প্রতি আন্দোলনের আবেদন রাখা হত। অবশ্য একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই বিরোধ সম্পর্কে জ্ঞানের উদয় হয়েছে নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে।

বাস্তব দৃষ্টিতে উল্লেখিত কারণে আন্দোলনের গতিতে জাতীয় ঐতিহাসিক রচনা এগোতে পারে নি। উপনিবেশবাদের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়েও উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী লেখকরা সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনকে প্রথমে বিদেশ থেকে আমদানী করা জাতীয়তাবাদের ধারণার জয়যাত্রা ও পরে ভারতীয় জনগণের কাছে তাকে স্বদেশী ব্যাপার বলে ঘোষণা করবার প্রবণতাই দেখিয়েছেন। তবে উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদীদের থেকে তাদের পার্থক্য ছিল এই যে তাঁদের কাছে জাতীয়তাবাদের ধারণাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার কথাটি ছিল। তিনের দশকে ও পরেও জাতীয়তাবাদী লেখকরা ক্রমবর্ধমানভাবে তাঁদের বিশ্লেষণে উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক সমালোচনার কথাও তুলে ধরেছেন।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ জাতি হিসাবে ভারতের পরিণতিপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ার কথা ভাবলেও এ প্রক্রিয়ার পার্থক্যমূলক ও ঐতিহাসিক চরিত্র যার ফলে সংহতিনাশ হতে পারে তা ক্রমবর্ধমানভাবে অবহেলিত হতে থাকে। এ বিষয়টির প্রতি অবশ্য তারা চাঁদ পুরো দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী অধিকভাবেই জাতীয় আন্দোলনকে জনগণের আন্দোলন বলে দেখেন। তবু এর আসল দিকটিকে অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ ও তাকে জোরদার করতে গিয়ে ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে অথবা লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন। অভ্যন্তরীণ শ্রেণী ও জাতপাতের পার্থক্যকে দেখানো হয় নি কিংবা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তাদের যথার্থ ভূমিকা বিবেচিত হয় নি। সমস্ত ভারতবাসীকে একইভাবে সমান বিস্তারে উপনিবেশবাদের শিকার আর সেই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে জাতীয় আন্দোলন শ্রেণীপার্থক্য ও

শ্রেণীচেতনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে আর উপনিবেশবদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের প্রসারে বিত্তবান শ্রেণীগুলোর স্বার্থের কাছে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর স্বার্থকে বলি দিয়েছে। অনুরূপভাবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা জাতীয় আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও চরিত্রের উপর শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-আচরণের অভিঘাতের গবেষণাকে তুচ্ছ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে একটি 'বিশুদ্ধ' চরিত্রবিশিষ্ট জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর কোন স্থান নেই।

বাস্তব জীবনে, সাম্রাজ্যবাদকে রুখবার প্রাথমিক অথবা প্রধান দায়িত্ব পালন শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীসংগ্রামকে সংহতিসূত্রে গ্রথিত করার দায় নিতে হয়েছে জাতীয় আন্দোলনকে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী এ সংহতির বিরুদ্ধতা করেছে। এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী। শ্রেণীসংগ্রাম শুরু ও কিষাণসভা ও শ্রমিক সংঘগুলোকে সংগঠিত করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তবে তারাও বাস্তবে জাতীয় ও সামাজিক সংগ্রামে সংহতি কেমন করে আনা যায় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত থাকে নি। সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক কংগ্রেসের দক্ষিণভাগের অবস্থানেই থেকে গেছে কেননা ১৯৪৭ সালে ধনতান্ত্রিক দেশে ভারতবর্ষ কেন ও কিভাবে পরিণত হল তা তিনি ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হন নি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সমাজের ধর্মীয়, জাতপাত ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের উপর রাজনৈতিক আচরণ ও আন্দোলনের অভিঘাতের মোকাবিলাতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

৪

পরিশেষে জাতীয় আন্দোলনের মৌল দিকগুলোর উপলব্ধিতে আমি আমার কথা রাখতে পারি। মার্কসবাদী হলেও ঔপনিবেশিক পর্যায়ে পরিলক্ষিত সাম্যবাদী আন্দোলনের বিগত ঘটনাবলীর ব্যাপারে আর তৎকালীন মার্কসবাদী লেখকদের সঙ্গে আমার কিছু ভিন্ন মত রয়েছে, যেমনটি রয়েছে তার পরবর্তীকালেও আর. পাম দত্ত, এ. আর. দেশাই, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদপ্রমুখের সঙ্গে।

(১) আমার মনে হয় ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপলব্ধি দিয়েই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গবেষণা কাজ শুরু করা উচিত। একটি দিক হল উপনিবেশবাদ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার বিকাশমান বিরোধ ; অন্যটি হল জাতি হিসাবে ভারতীয়দের পরিণতি-প্রক্রিয়া।

বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় আন্দোলন মৌলিক অর্থে ছিল ভারতীয় জনগণের স্বার্থ

ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের স্বার্থের মধ্যস্থিত বিরোধের প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয় যা ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজকে বিদেশী, মেট্রোপলিটান সমাজভিত্তিক শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের অধীনস্ত করেছিল। জীবন ও সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ শাসন উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা করেছে। উপনিবেশবাদের উৎখাত ছাড়া আর্থ-সামাজিক বিকাশ শুরু করাই যায় না। ফলে, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন হিসাবেই প্রধানতঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রাথমিক বা মৌলিক বিরোধ ও তাব অনুবর্তী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রকৃতি বুঝতে প্রয়োজন হল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের মৌল চরিত্র, জাতীয় জীবন, তার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীর ভূমিকা ও অভিঘাতকে জানা। অধিকন্তু, বিদেশী শাসনের শর্তগুলো ভারতবর্ষকে একটি জাতিতে সংঘবদ্ধ করেছে, জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার করছে আর একটি শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য অনুকূল বস্তুগত, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মনে রাখা দরকার যে ভারতসহ ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে পরিদৃষ্ট মৌলিক বা প্রাথমিক বিরোধের প্রকৃতি ইউরোপের জাতীয়তাবাদের জনক প্রাথমিক বিরোধের থেকে পৃথক। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উল্লেখ হয়েছিল সামন্তশ্রেণী ও সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা আর উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া উৎপাদন রীতির মধ্যে বিরোধের পরিণতিতে। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে, সমস্ত মানুষের, প্রধান প্রধান সমস্ত শ্রেণীর বিরোধ ছিল উপনিবেশবাদের সঙ্গে। উপনিবেশবাদ সমস্ত জনগণকে অত্যাচারিত করেছে ও সমস্ত সমাজের বিকাশকে বাধা দিয়েছে। এর অর্থ হল এই যে যেখানে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব একই সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সামন্তপ্রথার মধ্যেকার শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেছে, সামন্তশ্রেণীগুলোর সঙ্গে বিরোধে কৃষকদের ভূমিকাকে উৎসাহ দিয়েছে, এমনকি পুঁজিবাদীদের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধে রসদ জুগিয়েছে, সেখানে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে, উপনিবেশবাদের মুখোমুখি সমগ্র মানুষের বিরোধ অন্যসব বিরোধকে ছাপিয়ে গিয়েছে। অন্য ভাষায়, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধ পেয়েছে প্রাথমিক ভূমিকা আর অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিরোধগুলো ছিল গৌণ। সামাজিক সংগ্রামগুলোর উপর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ভূমিকা ছিল মুখ্য। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যকে উন্নীত করতে হয়েছে ; পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছে জনগণের মধ্যে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক, জাতপাত, আঞ্চলিকতা ও ভাষার ভিত্তিতে

বিভাজন সৃষ্টি নয়, চেয়েছে শ্রেণীগতভাবেও বিভক্ত করতে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমি বিশ্বাস করি ঔপনিবেশিক যুগের ভারতবর্ষকে জাতিতে পরিণত হবার ব্যাপারটিকে বিষয়গত প্রক্রিয়া ও তার বিষয়ীগত চেতনা হিসাবে দেখা দরকার। উপরন্তু, জাতীয় আন্দোলন ছিল ক্রমেই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ একটি জনসমাজ তথা জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি সাধারণ অর্থনীতি ও অনুরূপ বিষয়ের বিকাশ ছাড়াও, যেমন অতি উত্তমরূপে দৃষ্টান্তকারী গ্রন্থ The Social Background of Indian Nationalism-এ এ. আর. দেশাই দেখিয়েছেন, একটি পরিচিত শত্রু কর্তৃক সাধারণভাবে দৃষ্ট উৎপীড়ন ও তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভারতীয় জনগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করেছে। সম্ভবতঃ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ছাড়া কোন জাতি বা জনসমাজ গড়ে উঠতে পারে না, যদিও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি ও তার অভিঘাতের মধ্যে এ সংগ্রাম অন্তর্নিহিত ছিল। এই অর্থে অথবা এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাতীয় আন্দোলনের পূর্ববর্তী কোন উপাত্ত অথবা বিচারবুদ্ধিমূলক কোন ঘটনা হিসাবে জাতির ধারণা করা যায় না। ঔপনিবেশিক অবস্থায় কোন জাতি হল রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অনুশীলনের পরিণতি। তার শক্তি ও দুর্বলতা অংশতঃ জাতীয় আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতারই প্রতিবিম্ববিশেষ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম জাতিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া আর তার সক্রিয় অংশেরই ফল। জাতীয় চেতনা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে আর এই সংগ্রাম চেতনাকেও প্রেরণা দেয়।

একই সঙ্গে একথাও বলা যায় যে ভারতীয় জাতীত্বের সব প্রক্রিয়াই ছিল শ্লথগতি, আংশিক ও পার্থক্যমূলক। এই আংশিক ও পার্থক্যমূলক চরিত্র সৃষ্টি করেছিল নানা বাঁক, বিভাজন ও পথভ্রষ্টতা যেগুলোকে জাতিতে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে দেখা যাবে, উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির অস্বীকৃতি কিংবা পৃথক জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন দিকের পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

এ প্রসঙ্গে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীগুলোর উপর ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত আর উপনিবেশবাদের সম্পর্কে তাদের হতাশাও বিভিন্নভাবে ধরা পড়েছে। এ কথার অর্থ এই নয় যে ভারতে পৃথক পৃথকভাবে জাতীয় আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদকে দেখে গেছে, যেমন, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, কৃষকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ, গৌণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, সামন্তযুগীয় জাতীয়তাবাদ। কিংবা এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় আন্দোলন ও

জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ শ্রেণী অথবা শাখার বিশেষাধিকারের পর্যায়ভুক্ত ছিল—হয় মধ্যশ্রেণী কিংবা বুর্জোয়াশ্রেণী কিংবা হিন্দুদের। আসলে, কোন বিশেষ পর্যায়ে বাস্তব আন্দোলনে অংশগ্রহণ কিংবা হতাশার বিস্তার যাই হোক না কেন, উক্ত আন্দোলন উপনিবেশবাদের মুখোমুখি ভারতীয় জনগণের স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে।

এই দুটি বিষয়ের আলোচনার শেষে বলা যায় ঃ বিষয়গত বাস্তবতার বৈধ অথবা আইনসিদ্ধ চেতনার প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে দেখতে হবে। এই বিষয়গত বাস্তবতা হল আধুনিক আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বাস্তব জীবনে সাধারণ স্বার্থের বিকাশমান অভিন্নতা, বিশেষ করে পরিচিত শত্রু, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর যৌথ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা।

(৩) আমি বিশ্বাস করি যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন জনগণেরই আন্দোলন ছিল, বিশ্বাস করি যে এই আন্দোলন সামগ্রিকভাবে জনগণ কিংবা জাতির অথবা সব শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছে। একই সঙ্গে এই আন্দোলন শ্রেণীদৃষ্টিকোণ হতেও পরিচালিত হয়েছে ; জনগণের আন্দোলন হিসাবে এর শ্রেণীচরিত্রও উদ্ভাসিত। বুর্জোয়া আন্দোলন হিসাবে তা গণ্য হতে পারে না ; এ আন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান ভূমিকা ছিল না কিংবা বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেনি। সংগ্রামের বিন্যাসে এর শ্রেণীচরিত্র ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না তার কৌশলগত পশ্চাদপসরণ ও আপোষের ঘটনায়। এ আন্দোলনকে বুর্জোয়া আন্দোলন বলা চলে এই অর্থে যে তাঁর প্রধান মতাদর্শ কিংবা সামাজিক দর্শনুনুপাত অথবা স্বাধীন ভারতের সামাজিক ছবি একটা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে বিস্তীর্ণভাবে সীমিত ছিল। অন্য ভাষায়, এর শ্রেণীচরিত্রকে দেখতে হবে তার বাস্তব রাজনীতি, মতাদর্শ, পরিকল্পনা ও নীতিসমূহের মধ্যে। বুর্জোয়া মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ছিল তা। এই ধরনের বর্ণনার আর একটি সুবিধা আছে। প্রতিটি পর্যায়ে, বিশেষ করে দুইয়ের দশকের শেষভাগ থেকে চারের দশকের মাঝামাঝি সমাজতান্ত্রিক ধারণার বিকল্প প্রভাবের প্রতি তা উন্মুক্ত ছিল। সদ্য উল্লিখিত দর্শানুনুপাতের বাস্তবায়ন হয় নি অথচ আমার মতে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর এখনও পর্যন্ত মার্কসবাদী লেখকরা আলোকপাত করেন নি ; হয়ত এই অনুমানে যে আসল আন্দোলনটি ও তার নেতৃত্ব ছিল পুঁজিবাদভিত্তিক। আর যদি সেটা বুর্জোয়া আন্দোলনই হয়ে থাকে তবে বিকল্প সমাজতান্ত্রিক আধিপত্য তার

আসাব কোন প্রশ্ন ওঠে না। তখন এর রূপান্তরের প্রশ্নও ওঠে না। তখন হয তাকে মিশে যেতে হবে একটি সমান্তরাল বিকল্প সমাজতান্ত্রিক স্রোতে অথবা তারই দ্বাবা ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা উৎপাটিত হতে হবে আর এ প্রক্রিয়া ঘটবে কোন সংকট-মুহূর্তে।

বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী আসল জাতীয় আন্দোলনের মুক্ত ব্যাপারটি দেখেছিল ও সে বিষয়ে ভয়ও ছিল তাদের। এই মুক্ততার অন্তর্নিহিত দুটি সম্ভাবনা যেগুলি তাদের দিক থেকে ছিল সমানভাবে বিপজ্জনক। তারা দেখেছিল ঃ

(ক) একটি হল বৃহত্তর বামপন্থী ও শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর যোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণশক্তিসম্পন্ন আরও মানুষের অংশগ্রহণ ও সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রাম।

(খ) বাম কর্তৃত্বে সমস্ত আন্দোলনের মোড় ফেরানো। সুতরাং, ১৯৩৪ সালের পর থেকেই তারা সর্বদা চেষ্টা করেছে জাতীয় কংগ্রেসকে বাম ও দক্ষিণপন্থায বিভাজিত করে রাখতে।

দুটি অর্থেই জাতীয় আন্দোলন গণ আন্দোলন ছিল ঃ

(১) সকলেই উপনিবেশবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লেশ ভোগ করেছে আর তারা সকলেই চেয়েছে তাকে উৎপাটিত করতে ;

(২) জনগণই এই আন্দোলনকে সংগঠিত করেছে ও তা শুরু করেছে। আন্দোলনের শুরু ও সংগঠনে বুর্জোয়াশ্রেণীর কোন ভূমিকা ছিল না। এ আন্দোলনের শুরু শিক্ষিত সমাজের হাতে যাঁরা সর্বপ্রথমে ঔপনিবেশিকতা ও তার চরিত্র, তার বিরোধকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঔপনিবেশিকতার এই চরিত্র ও বিরোধ সরাসরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না, বিশ্লেষণ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে তাদের বুঝা যায় না কেননা ইতিহাস, রাজনীতি, মতাদর্শ ও জ্ঞানের সাহায্যে তার উপলব্ধি সম্ভব। বিগদ্ধ সমাজের নেতৃত্বই আন্দোলনে সাধারণ মানুষই গতি সঞ্চার করেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী বা তার নেতারা এক্ষেত্রে কিছু করে নি। তবে সামাজিক অবস্থা ও তার সমাধানের উপলব্ধি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকেই শিক্ষিত সমাজই করতে পারে। বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর নিজের কোন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নেই। ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী পুঁজিবাদী সামাজিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতটিকে গ্রহণ করেছিল। এই ধরনের বুর্জোয়া পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে পুঁজিবাদবিরোধী কৃষক-কারিগরদের কাল্পনিক রাষ্ট্রকে সমভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দুই, তিন ও চারের দশকে বামপন্থীরা কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনে একটি সমাজতান্ত্রিক

দর্শন দিতে সংগ্রাম করেছিলেন। তবে আংশিকভাবেই বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরনের প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে কেননা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের হাতেই কর্তৃত্ব ছিল আর বিকল্প আধিপত্যের সুযোগ এতে বেশী থাকে।

তাই জাতীয় আন্দোলনকে ভারতীয় জনগণের জনপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন বলে পরিগণিত হতে পারে। গণ-আন্দোলনগুলোকে পদাধিকারীদের বাইরে নয়, ভিতর থেকে খুঁজে নিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চীন, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া অথবা স্পেনের মত আমাদের আন্দোলনও ছিল গণ-আন্দোলন, যদিও একথা ঠিক যে এ আন্দোলনে বুর্জোয়া-কর্তৃত্ব ছিল। তাছাড়া, পৃথিবীর ইতিহাসে এ অন্দোলন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণ-আন্দোলনের মর্যাদা পেতে পারে। কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে এ অন্দোলন রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে এসেছে আর গণ রাজনৈতিক সংগ্রামে তাদের টেনে এনেছে। অধিকন্তু, অন্যান্য গণ-আন্দোলনের পথও প্রশস্ত করেছে এ আন্দোলন যেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হল শ্রেণী-আন্দোলন ও জাতপাতভিত্তিক অত্যাচার ও পুরুষজাতির আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

পূর্বে যা বলেছি, বাস্তব জীবনে যে মৌলিক দায়িত্বের সম্মুখীন হয়েছে উক্ত আন্দোলনে আর বলতে কি আমরা ঐতিহাসকরাও আমাদের গবেষণা ও বিশ্লেষণ কাজে যার মুখোমুখি হই সেটি হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম আর শ্রেণীগত অথবা সামাজিক সংগ্রাম সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ মত নেওয়া। সমস্যাটি একটির সঙ্গে অন্য আর একটিকে সমভাবে স্থাপন করার নয়। ধ্রুপদী মার্কসীয় মতটি আমি গ্রহণ করতে রাজী। সেটি হল ঔপনিবেশিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামটি ছিল মুখ্য আর সামাজিক সংগ্রাম ছিল গৌণ। এর অর্থ, সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি ভারতীয় সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে শ্রেণীসংগ্রামকে খুব উচ্চমার্গে নিয়ে যাওয়া যায় নি; বরং তাকে বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণীগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সুযোগসুবিধা দিয়ে সংগতিস্থাপন করতে হয়েছে। যেমন মাও জে-দঙ বারংবার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, চীনা জনগণের জাপানবিরোধী সংগ্রামের সময় "জাপান প্রতিহত করতে বর্তমান জাতীয় সংগ্রামের কাছে শ্রেণীসংগ্রামকে অধীনস্ত করার নীতি হবে মুক্ত মোর্চার কাছে মৌলিক নীতি। যে জাতি বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত, শ্রেণীসংগ্রাম জাতীয় সংগ্রামেরই রূপ নিয়ে থাকে —এতে উভয়েরই সঙ্গতি থাকে। একদিকে জাতীয় সংগ্রামের অন্তবর্তী সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাহিদা তাদের সহযোগিতা বিনষ্ট না করার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে; অন্যদিকে,

শ্রেণীসংগ্রামের সব দাবী জাতীয় সংগ্রামের আবশ্যকতা থেকে উৎসারিত হবে।" (Colected Works, Vol Two, p 294) আবার বলা যায়, "এটা স্বীকৃত নীতি যে জাপানবিরোধী যুদ্ধে জাপানকে প্রতিহত করার স্বার্থের অধীনস্থ হবে অন্য সব কিছু। তাই শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থ বিরোধিতার যুদ্ধের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে তার অনুপন্থী হবে। তবু শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম অস্তিত্ববিহীন নয়.... আমরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করি না, তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করি.....জাপানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াসে শ্রেণীসম্পর্কে সঙ্গতিস্থাপন করে উপযুক্ত নীতি আমাদের নিতে হবে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৫০)। মাও জে-দঙ্ শ্রেণীসমন্বয় সম্পর্কে আরও বলেছেন, "শ্রমিকরা অবশ্যই দাবী করতে পারে যে কলকারখানার মালিকরা বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটাবে কিন্তু একই সঙ্গে জাপানের বিরোধিতায় তাদেরও আরও কঠোরভাবে কাজ করতে হবে। ভূম্যধিকারীরা খাজনা ও সুদ কমাবে কিন্তু একই সঙ্গে কৃষকরাও তাদের খাজনা ও সুদ পরিশোধ করবে আর বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৩)।" সেই কারণে জাতীয় অথবা সামাজিক সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শুধু সেটাই দেখা নয়, তিনি দেখাবেন কতটা আর কিভাবে সামাজিক, শ্রেণীসংগ্রামে সঙ্গতি ও শ্রেণীসমন্বয় সম্ভব হয়েছে। আজ পর্যন্ত মার্কসবাদী লেখকরা শ্রেণীসমন্বয় ও শ্রেণী সমঝোতার প্রয়াসটিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করেছেন ; কিংবা তাকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক বা তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে সাজাতে পারলে এ বিষয়ে প্রকৃত কি ঘটেছিল তা ঐতিহাসিক দেখতে পারবেন। মুখ্য, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের গৌণ সামাজিক বিরোধের প্রকৃতির ভিত্তিতে ঐ সংগ্রামের শ্রেণীচরিত্রের আংশিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়—সম্ভব হবে তা বাস্তব অথবা প্রস্তাবিত শ্রেণীসমন্বয়ের প্রকৃতির ভিত্তিতে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চীনের সাম্যবাদী দলের ভূমিকা, ১৯৪৫ সালের পর ভিয়েতনামীদের কার্যকলাপ আর আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর ঘটনাগুলোর সঙ্গে তুলনা তাহলে বেশ শিক্ষণীয় হয়ে উঠবে।

মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন শান্তিপুর কলেজের
অধ্যাপক সুনীলবরণ বিশ্বাস

পাদটীকা

১. সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে বিদ্রুপ করে যে চরিত্র সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা এঁকেছেন, তাতে ঘোড় দৌড়, কুকুরের দৌড়, ফুটবল ফলাফল নিয়ে বাজি খেলা, ক্রিকেট ও জুয়াড়ীদের আড্ডার আলোচনাকেই জাতীয় আন্দোলনের আলোচনার সময় প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. উল্লেখ করা উচিত যে এই দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগীয় অথবা প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী—বিশেষ করে যখন অনুমান করা হয়েছে সেগুলির ভিত্তি ছিল ধর্ম অথবা জাতপাত। বাস্তবে ধর্মীয় ও জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের সৃষ্টি নয়—সেগুলি ঔপনিবেশিক যুগেরই পরিণতি।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ঃ কিছু বিক্ষিপ্ত চিন্তা

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ

সভাপতি, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ

মাননীয় সভাপতি ও সুধীমণ্ডলী,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদেব সভাপতি আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় আমার মত একজন নগন্য ইতিহাস-সেবীর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে এবং ইতিহাস সংসদের সকল সদস্যদেরকে জানাই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ। সুধীমণ্ডলী, আপনারা সকলে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের পক্ষ থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বহন করে এনেছি। যেহেতু উভয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইতিহাস চর্চা ও গবেষণা—আমি আশা করব আগামী দিনগুলিতে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করতে সক্ষম হব।

বন্ধুগণ, আমি আজ আপনাদের সামনে কোন সারগর্ভ গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়ে উপস্থিত হই নাই। তবে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে চাই। সে বিষয়টি হল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। মাত্র কয়েক মাস আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা চক্রে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল উনিশ শ একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মানুষ ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণের নিকট থেকে যে অভূতপূর্ব সহানুভূতি এবং অসামান্য

সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, ১৯৯০

সাহায্য লাভ করেছিল, সে কথা কি আজ বাংলাদেশের মানুষ ভুলে গেছে? বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে এ প্রশ্নটার পেছনে একটা ক্ষোভ ছিল, একটা দুঃখ ছিল, একটা বেদনার অভিব্যক্তি ছিল। প্রশ্নটা শুনে আমিও অত্যন্ত বিব্রতবোধ করেছিলাম, বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম এই কারণে যে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর পরবর্তীকালে যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করল তারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জনগণের মধ্যে এমনভাবে ভারত-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দুর্বলতা, অক্ষমতা, হীনমন্যতা ও দুর্নীতিকে ঢাকবার জন্য দেশের সব দুর্গতির জন্য ভারতকে ঢালাওভাবে দায়ী করে যাচ্ছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম এবং কিছুসংখ্যক পত্র-পত্রিকা যাদের মালিকদের এক সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাদের অপপ্রচার আমার প্রশ্নকর্তার মত অনেক ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

আমি ঐ প্রশ্নকর্তাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলাম যে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ কখনই ভারতবিরোধী ছিল না এবং এখনও নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর নিছক অস্ত্রের জোরে জনমতের তোয়াক্কা না করে বেআইনীভাবে যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে তারা জনগণের কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করতে দেয় না ; তাই তাদের প্রকৃত মনোভাব জনগণের কাছে পৌঁছায় না। সেজন্যই এই ভুল বোঝাবুঝি।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের জনগণ ভুলে যায় নি যে একাত্তরের সেই ভয়াল দিনগুলিতে যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ ও গণহত্যা চালিয়েছিল, এইসব নরপশুদের হাতে অসংখ্য মা-বোন পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিল, তখন ভারত সরকার ও ভারতের জনগণই তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এ দেশের কমপক্ষে এক কোটি মানুষকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে ; তাদের অন্নবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে ; স্বাধীনতা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে ; এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান যখন ভারতের উপর সরাসরি আক্রমণ চালাল, তখন বাঙালী মুক্তিফৌজের সঙ্গে ভারতীয় জোয়ানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে ; বাংলার মাটি উভয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ ভারতের এই অবদান, এই আত্মত্যাগ, এই ঋণ চিরদিন শ্রদ্ধার

সঙ্গে স্মরণ করবে।

তবে এখানে একটা কথা পরিস্কারভাবে বলার প্রয়োজন বোধ করছি। পাকিস্তানের সমর্থকরা এবং পাকিস্তানী ভাবাপন্ন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যারা ফরাসী বিপ্লবের যুগের বুরবোঁ রাজাদের মত "কিছুই শেখেন না, কিছু ভোলেন না", তাঁরা সব সময় বলে থাকেন যে ভারত তার সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নাকি পাকিস্তান ভাঙ্গার সুযোগ খুঁজছিল এবং একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়ে ভারতীয়েরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। এ যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। একথা স্বীকার করলে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের লাখো শহীদদের স্মৃতির প্রতি অবমাননা করা হবে। বস্তুতঃ একথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সক্রিয় সমর্থন যুগিয়েছিলেন কেবলমাত্র ভারতের সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রীয়-স্বার্থের জন্য। শ্রীমতি গান্ধী বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মুক্তি সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্র যদি বাংলাদেশে নির্মম নিষ্পেষণ ও গণহত্যা চালিয়ে বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়, তাহলে সেটা হবে কেবল সারা ভারতের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মানুষের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রতি বিরাট হুমকি। তাই এই নয়া ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এই মহিয়সী মহিলা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

কিন্তু এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকারের সাহায্য না পেলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কেউ কোন শক্তি এটা ঠেকাতে পারত না। ভারতীয় সাহায্য না পেলে হয়ত স্বাধীনতা অর্জন করতে আরও কিছুকাল সময় লাগত, আরও অনেক রক্ত দিতে হত।

আমার এই বক্তব্যকে ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন কিংবদন্তী বা কোন কল্পিত বিষয়কে সত্য বলে মনে করা যেটাকে ইংরেজিতে myth বলা যেতে পারে, যেটা ইতিহাস না হলেও অনেক সময় সেই myth ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সময়কালে পাকিস্তান নামক এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটার পেছনে এমনি একটা myth কাজ করেছিল

বলে আমার মনে হয়। এই myth টা ছিল এই যে ভারতের অর্থাৎ সমগ্র ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা যেহেতু তারা এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তারা এক স্বতন্ত্র এবং অখণ্ড জাতি, এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী—সুতরাং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই পূরণ হওয়া সম্ভব। এই মীথ্ পাকিস্তান সৃষ্টি করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যে অধিবেশনে তথাকথিত পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান যে দুই স্বতন্ত্র জাতি সে কথার উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন ঃ

> "....It is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality.....the Hindus and Muslims, belong to different religions philosophies, social customs, literatures. They neither inter-marry more interdine together and, indeed, they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions their outlook on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history....to youth together two such nations under a simple state must very to givining discontent and final destination of any fabric that may be so builts up for the government of such a state." ’

এটা অনস্বীকার্য যে জিন্নাহ্‌র এই ভাষণে তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশের মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু যে কারণে এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিকাশ ঘটেছিল সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের একজন ঐতিহাসিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ

> "১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো। বহু বাচনিক সমাজে গণতন্ত্রের সফলতার জন্য জনবন্ধনে যে আদানপ্রদান এবং পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়োজন তা ভারতবর্ষে কোনদিন গড়ে ওঠে নি। গণতন্ত্রের মৌল নীতি—এক মানুষ এক ভোট ও ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই সমান এবং আইনের সমক্ষে সমান আশ্রয়ের অধিকারী—হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ই সেই সহজ পাঠ গ্রহণ

করতে পারে নি। ভারতের অগ্রণী সম্প্রদায়ের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কে যে দর্শন উপস্থিত করেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

'লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য, তোমারও তদ্রুপ, রামেরও তদ্রুপ, যদুরও তদ্রুপ, সকল হিন্দুরই তদ্রুপ। সকল হিন্দুরই যদি এইরূপ কার্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে এক পরামর্শী, এক মতাবলন্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য করে, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ ; অর্ধাংশ মাত্র। হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে তেমনি আমাদের মঙ্গল তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সেজন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না ; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।'

বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বা বলেছিলেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কেউ না কেউ অনুরূপভাবে চিন্তা করতেন। তবে অধিকতর শিক্ষিত শ্রেণীর লেখায়, সাহিত্যে, গানে ও নাটকে যে যবনবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে অনগ্রসর মুসলমানদের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল যে, একদিন যখন বৃটিশরা ভারত ছেড়ে যাবে তখন সুলতান মামুদের থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সব মুসলমান রাজা-বাদশাহ'র কর্ম-দুষ্কর্মের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে দায়ী করা হবে। সেই সম্ভাব্য প্রতিহিংসাপরায়ণতার বিরুদ্ধে মুসলমান মন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। এ দেশের হিন্দুরা ভেবেছে মুসলমানরা ৯১৬ শকাব্দ থেকে তাদের উপর অত্যাচার করেছে। মুসলমানরা ভোলেনি, তাদের স্বধর্মাবলম্বীরা এ দেশে এক সময় রাজত্ব করতো। আর সীমিত স্বায়ত্তশাসনে গণতন্ত্রের

পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরেই মুসলমানরা ভেবেছে আর কোনেদিন তারা দেশে কোন অর্থপূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারবে না। হিন্দু ও মুসলমান শুধু দুই পাড়ায় বাস করতো না, তাদের মন ও মানস স্বতন্ত্র খাতে বইতো। আধুনিক চিন্তাধারা যে সেতুবন্ধের কাজ করতে পারতো তা সম্ভব হয় নি ঃ কারণ সে চিন্তাধারা না মনে, না হেঁশেলে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। গণতন্ত্রের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা-সংখ্যালঘিষ্ঠতা যে-দুই নির্বাচনের মধ্যে একটা ক্রান্তিকালীন সাময়িক ব্যাপার তা কেউ বুঝতে চায় নি। চিরস্থায়ী সংখ্যাগুরু ও চিরস্থায়ী সংখ্যালঘু হিসেবে প্রতিটি সম্প্রদায় চিন্তা করেছে ও শঙ্কিত হয়েছে।" [২]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হল এই যে লেখকের ঐ বক্তব্য উনিশ ও বিশ শতকে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করতে কিছুটা সহায়ক হতে পারে। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর একাধিক রচনায় মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের উন্নাসিক আচরণের জন্য যে মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল তার ইংগিত দিয়েছেন। [৩] ১৯০৬ সালে যখন মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়, তখন থেকেই এর প্রধান দাবী ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই দাবী মুসলিম লীগ কখনও ছাড়ে নি ; বরং ১৯১৬ সালে লখ্নৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-লীগ চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেসই মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিকে শর্তশাপেক্ষে মেনে নিয়েছিল। ১৯০৬ সালের এই স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী থেকে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির অর্থাৎ পাকিস্তান দাবী উত্থাপনের মধ্যে একটি পরম্পরা যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যায়।

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়ে পাকিস্তান দাবী উত্থাপিত করেছিল। কিন্তু এই দাবির পেছনে যতটা আবেগ ছিল ততটা যুক্তি ছিল না। বস্তুতঃ পাকিস্তান দাবি ইতিহাসের দিক দিয়ে অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী। তার চেয়ে বড় কথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এই নতুন রাষ্ট্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসল-মানদের সকলের আবাসভূমি হবে এবং এর ফলে ভারতের সাম্প্রদায়িক বা সংখ্যালঘু সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যাবে—

এটাও ছিল অসম্ভব। কিন্তু মাত্র কতিপয় দুরদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলিম নেতা যেমন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গাফফার খান, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর—যারা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন—তাঁরা ছাড়া এ প্রশ্ন নিয়ে অন্য মুসলিম নেতারা মাথা ঘামাতে চান নি।

পাকিস্তান আন্দোলনটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হলেও ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। কিন্তু মুসলিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পাকিস্তান সৃষ্টির অনতিপর্বে মনে হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মকে রাজনীতি বা রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত করলে সেটা নতুন রাষ্ট্রের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র কয়েক দিন আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাংবিধানিক পরিষদে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জিন্নাহ্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে পাকিস্তান হবে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পাকিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন ঃ

> "You are free ; you are free to go to your temples, you are free to go to you mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. We are starting with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state ....
>
> Now I think we should keep that in front of us as are ideal and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to bc Muslims. not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state."

কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তার সামনে কোনপ্রকার যুক্তি বা সহজ-বুদ্ধি বা যেটাকে commonsense বলা হয়—টিকতে পারে নি। যে সম্প্রদায়িক তরঙ্গকে পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সেই উত্তাল তরঙ্গকে তিনি রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি।

এমনিতে তিনি এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুকালের মধ্যেই পাকিস্তানকে সমস্যা- জর্জরিত অবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

বাঙালী মুসলমান—যাদের পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী,—পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুদিনের মধ্যেই এই নতুন রাষ্ট্রের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করল। তারা উপলব্ধি করতে লাগল যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যারা ছিল অধিকাংশই অবাঙালী—তারা ধর্মের জিগির তুলে বাংলাদেশকে তাদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বাঙালীদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার চক্রান্তকে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। বলা যেতে পারে, ১৯৪৮-৫২ সময়কালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ অঞ্চলের জনসাধারণ বিশেষ করে মুসলমানরা নিজেদের স্বতন্ত্র বাঙালী জাতিসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করল। ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে মনীষী ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

> "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার যো টি নেই।" [৫]

আমাদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে এই যে নতুন সচেতনতা—এর মধ্য দিয়ে কালক্রমে জন্মলাভ করল এক নতুন স্বতন্ত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ নতুন এই অর্থে যে প্রাক-১৯৪৭ সময়কালে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে ভারত উপমহাদেশে এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে যে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল, আমাদের এখনকার বাঙালী জাতীয়তাবাদ তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলের জনগণের সম্মিলিত চেতনা—যে চেতনা ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের পরবর্তীকালে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে—সেই ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাই হল আজকের বাংলাদেশের নয়া জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাংলাদেশের মানুষ তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য কোন

বিশেষ ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সেই সমন্বয়ধর্মী, মানবতাবাদী ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে শুরু করল এবং এই সচেতনতাই ছিল ১৯৭১ সালের বাঙালীর মক্তিযুদ্ধের প্রধান চালিকাশক্তি। এর মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

বর্তমানকালে উত্তর উপমহাদেশ যেটাকে এখন দক্ষিণ এশিয়া বলে অভিহিত করা হয়—এই অঞ্চলটি বেশ কয়েকটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এই সমগ্র ভূখণ্ডটি একটি অভিন্ন সভ্যতার জন্মভূমি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নরগোষ্ঠী এই ভূখণ্ডে এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং কালক্রমে এই ভূখণ্ডের প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অনন্য সমন্বয়ধর্মী সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন এই ভারতভূমি মহামানবের মিলনক্ষেত্র। এখানে এসে "শক হূন দল পাঠান মোগল, এক দেহে হল লীন।" বস্তুতঃ এই উপমহাদেশের সভ্যতা যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে বহিরাগত ও দেশজ উপাদানের সংমিশ্রণে। এই সভ্যতার মধ্যে যেমন রয়েছে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য—বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন আহার ও রুচি। আবার এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখতে পাই একটি আশ্চর্য ঐক্য যেটাকে unity in diversity বলা হয় ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসঙ্গতি বা harmony।" ৬

বর্তমান সময়ে ধর্ম এবং ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিয়ে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের মধ্যে যে বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা কখনো কখনো জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে—যেমন পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চলে; ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মীরে ও অন্যান্য স্থানে ; এবং শ্রীলঙ্কায়—এ ধরনের হিংসাত্মক সংঘাত কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের আগে এই উপমহাদেশে দেখা যায় নি। বিদেশী শাসনের আমলে নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে যে সম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব হয়েছিল সেটা এখনও নির্মূল করা সম্ভব হয় নি, বরং নানা কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই উপমহাদশের জনজীবনে আবহমানকাল থেকে যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সেটি সংঘাতের ধারা নয়, সেটি সমঝোতা ও সমন্বয়ের ধারা। এই সমন্বয় আমরা দেখতে পাই আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেমন সঙ্গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে, পোষাক-পরিচ্ছদে এবং আচার-বিচারে। তেমনি আবার

এই সমন্বয় দেখা যায় আমাদের ধর্ম ও সমাজ-চিন্তায়, আমাদের সামগ্রিক জীবনবোধ ও জীবনযাত্রার মধ্যে। বস্তুতঃ এই উপমহাদেশের মানুষ আমরা যৌথভাবে এক সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই ঐতিহ্য এই উপমহাদশের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে মহামতি অশোক ও আকবরের মত রাষ্ট্রনায়ক ; অতীশ দীপঙ্কর, আমীর খসরু, আবুল ফজল, দারা শিকোহ, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত মনীষী ; কবীর, নানক, চৈতন্য ও ফকির লালন শাহ্‌র মত মরমী সাধক ; এবং সর্বোপরি গালিব, ইকবাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল-এর মতো মহান কবির অনবদ্য অবদানের ফলে গড়ে উঠেছে—সেই সমন্বয়র্ধী, মানবতাবাদী ঐতিহ্যকে নতুন-ভাবে আবিষ্কার করার, নতুনভাবে মূল্যায়ন করার এবং সংরক্ষণ ও লালন করার এবং সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব এই উপমহাদেশের সকল জনগণের। এই মনোভাব যদি আমরা জাগ্রত করতে পারি তাহলে কেবল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হবে তাই নয়—বাংলাদেশ ও ভারতের সঙ্গে এই উপমহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের যেমন পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্কের উন্নতি হবে—পরস্পরের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে গঠনমূলক সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ সহ-অবস্থান ও শান্তির পথ সুগম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে, ভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বাংলাদেশের উদ্যোগে সম্প্রতি SAARC নামে যে সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। SAARC-এর উদ্দেশ্য ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এই যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন চরিত্রের সরকার নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয়েছে। ঐকমত্যের অভাবে এখনও SAARC এই উপমহাদেশের কোন প্রধান সমস্যা বা বিরোধের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি ঘটাতে পারেনি। এমত অবস্থায় বেসরকারী পর্যায়ে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের জনগণ যদি সরাসরি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তাহলে স্থায়ী শান্তির পথে একটা বিরাট ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের ইতিহাসবিদরাই এ বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁরা যদি সম্মিলিতভাবে এই উপমহাদেশের সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করায় প্রয়াসী হন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে এ বিষয়ে বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা অবহিত করেন, তাহলে আমার মনে হয় রামজন্মভূমি-

বাবরি মসজিদ বিতর্ক নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে সেটা প্রশমিত হবে এবং এই ধরনের আরও অনেক বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটবে। আমি বিশ্বাস করি এবং আমার এ বিশ্বাস ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে আবহমানকাল থেকে এই উপমহাদেশের জনজীবনে যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সেটি হল পরমত সহিষ্ণুতার ধারা। এই ধারা থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি বলেই আজ আমাদের উপর বিপর্যয় নেমে এসেছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই ধারাকে আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি।

বন্ধুগণ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের পক্ষ থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সকল সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা বহন করে এনেছি। আপনাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

সুধীমণ্ডলী, আপনারা যে এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার বিক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনলেন সেজন্য আপনাদের জানাই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সূত্র নির্দেশ

১. Jamil-ud-din Ahmed (ed.), Speeches and Writings of M.A. Jinnah, Vol. I (Lahore, Sheikh Muhammad Ashraf 1942), pp. 160-161.

২. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃঃ ৮৭-৮৯। বঙ্কিমের উদ্ধৃতির জন্য দেখুন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভারত কলঙ্ক', বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, আরও দেখুন বদরুদ্দীন উমর, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশনী, ১৯৬৪, খণ্ড ২৩৯, পৃঃ ৩১।

৩. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৯৬১।

৪. Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, Speeches as Governor-General of Pakistan, 1947-48, Karachi, Pakistan Publications, p. 9.

৫. উদ্ধৃতি, বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, পৃঃ ১৮৩।

৬. উদ্ধৃতি ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার সাধনা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৫।

সাম্রাজ্যবাদ ও ইতিহাসের ভ্যাংচানি

অমিয় কুমার বাগচি

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘকালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।
ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।
... ...
হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা,
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় আঘাতে আঘাতে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৪০)

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস একদিকে অবাধ নিপীড়ন ও শোষণের ইতিহাস। অন্যদিকে সেই ইতিহাস অট্টহাস্যে অনুরণিত। কার্ল মার্কস, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পরশুরাম পর্যন্ত ইতিহাসের বদ্‌রসিকতার উপর নিজ নিজ মন্তব্য রেখে গিয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে অট্টহাসির খোরাক জোগায়, কারণ থেকে থেকেই সেই ব্যবস্থার আওতায় সং বেরোয় যে সংকে চিনতে সময় লাগে। শুধু যে মানুষ যে অদ্ভুতরূপী imitation foreign devil (যার চরিত্র লু সুনের অনেক গল্পে উপহসিত হয়েছে) হিসেবে দেখা দেয়, তাই নয়, সমাজ ও আইনব্যবস্থাও দেখা দেয়

অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১

যা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সমাজকে, আইনব্যবস্থাকে ভেংচিয়ে চলে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কার্ল মার্কস উভয়েই এই সং সাজার নানা ঢং সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। 'লোকরহস্য' বা কমলাকান্তের দপ্তর, পত্র বা জবানবন্দী অথবা বাবু মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতের প্রায় যে কোন আলেখ্য বা জবানি পড়লেই সেই হাড়কাঁপানো অট্টহাস্যের নিদর্শন মিলবে। মেকলের অভিলাষিত যে শিক্ষাকে সমর সেন বিষবৃক্ষ হিসেবে দেখেছেন, বঙ্কিম তাকে দেখেছেন বল্লালসেনের বংশধবদের নতুন উপসর্গ হিসেবে, এবং সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তির নতুন উপায় হিসেবে ঃ

> 'এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নিরদুর-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি. এ. না হলে বিয়ে হয় না। .... হরি হরি বল, ভাই ঃ তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি. এ. উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খটাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল ..... প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার পরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে।'
>
> (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৫, পৃঃ ৬৩)

শুধু যে আধুনিক জ্ঞানপিপাসার খাতিরে নব্যশিক্ষিত বাঙালী কায়মনোবাক্যে বিলাতি সং সেজে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে নি, সে বিষয়ে বঙ্কিম সম্যক অবহিত ছিলেন।

যে সময়ে বঙ্কিম এই ধরনের তীব্র ব্যঙ্গে স্বশ্রেণীর বাঙালীকে কষাঘাত করতে ব্যাপৃত, ঠিক প্রায় একই সময়ে ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিভোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কার্ল মার্কস লিখছেন ঃ

> If any nation's history, then the history of the English in India is a string of futile and really absurd (in practice infamous) economic experiments. In Bengal they created a caricature of large-scale English landed estates; in south-eastern India a caricature of small purcelled property; in the north-west they did all they could to transform the Indian economic community with common ownership of the soil into a caricature of itself.
>
> (মার্কস, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪ পাদটীকা)

মানুষ কতরকমভাবে সং সাজতে পারে এবং ইতিহাসের বিবর্তনে নকল বিলাতি সাহেব কিভাবে নকল মার্কিনি সাহেবে রূপান্তরিত হয়, সময় ও ক্ষেত্রেবিশেষে কীভাবেই বা অহিংস বাঙালী বৈষ্ণব সহিংস বজরঙবলীর অনুচরদের ভেক নিতে চেষ্টা করতে পারে, তা নিয়ে প্রভূত আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সমাজ, উৎপাদন ও আইনব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের ভেক ধারণ, সেই সংকে আসল বলে হাজির করার চেষ্টা, এবং সবসুদ্ধ সমাজকে সৎ বানানোর চেষ্টার পেছনে যে ক্রুর শোষণবৃত্তি কাজ করছে তাকে সভ্যতা, ধনতন্ত্র ইত্যাদি বিস্তারের নাম করে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা বর্তমান নিবন্ধে এই হল আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

যারা সং সাজে, বা সং সাজানোর পিছনে মেক-আপ ঘরের কর্তৃত্বে যারা থাকে তাহা বহু সময়েই কোন্ আসলকে নকল করছে সে ব্যাপারেই অনেক সময়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে অথবা অন্যের মনে ভ্রান্ত ধারণা জাগিয়ে দেয়। এই ভ্রান্ত ধারণা এমনভাবে গেড়ে বসে যে বাঘা বাঘা ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী আসল-নকলের মধ্যেকার প্রকৃত পার্থক্য ভুলে যান। এই দ্বিগুণিত্ত ভ্রান্তধারণা পোষণের খুব বড় রকমের উদাহরণ হল ভারতে ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার চিত্রণ।

ঔপনিবেশিক ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার স্বরূপ বোঝার চাবিকাঠি হল বা এই ব্যবস্থাকে প্রায় সর্বদাই ভূমিরাজস্বব্যবস্থা (land revenue system) অথবা জমির দখলী স্বত্ব (land tenure system) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে ভূমিরাজস্ব দেওয়া হবে অথবা যে যে শর্তে কেউ জমির কোনও অংশের হকের দাবিদার হবে, তাই দিয়েই তার জমিতে স্বত্বাধিকার নির্ধারিত হবে। এই ব্যবস্থায় স্বত্বাধিকারের দায়ে জমির কোনও রাজস্ব দেয় না বা লভ্যাংশের অংশীদার বা স্বত্বাধিকারের গৌরবে সে হকের দাবিদার হয় না। সে রাজস্ব দেওয়ার অধিকারী বলেই, এবং শর্তাধীন হকদার বলেই তাকে শর্তাধীন স্বত্বাধিকারী বলে গণ্য করা হয়।

কতগুলো পরতে ভুল ধারণা ইতিহাসের পাতায় গেড়ে বসে, তা বুঝতে গেলে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর যাচাই করা যেতে পারে। প্রথম প্রশ্ন, ইংরেজ শাসকরা কি এদেশে তাদের নিজের দেশের আদলে ভূস্বামিব্যবস্থা তৈরি করতে চেয়েছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইংরেজ শাসকরা কি এদেশে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়িত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল? তৃতীয় প্রশ্ন, ইংরেজ শাসনকালে কি এদেশে জমির অবাধ মুক্ত বাজার তৈরি হয়েছিল? ইতিহাসের বহু বইতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে, 'হ্যাঁ'। কিন্তু এই সবকটি প্রশ্নের উত্তর হবে 'না'। কেন উত্তরগুলো 'না' হবে তা বুঝলে

ভূস্বত্বব্যবস্থার নকলিয়ানার স্বরূপ খানিকটা উদঘাটিত হবে। (তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলার যুক্তি আমি অনেক আগেই দিয়েছিলাম যেমন বাগচি, ১৯৮২, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, কিন্তু ঐতিহাসিকরা সে যুক্তি হৃদয়গত করেছেন বলে মনে হয় না)।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে জানতে হয় ইংল্যাণ্ডে ভূমিব্যবস্থা তখন কী ছিল। আশ্চর্যের কথা এই প্রশ্নের আলোচনা খুব কম লোকেই করেছেন। ইংল্যাণ্ডে তখন সর্বোচ্চ শ্রেণী ভূস্বামী যারা ছিল, তারা ছিল আইনের ভাষায় রাজার tenants in chief কিন্তু ১৬৬০ সালের পর এদের ভূস্বত্ব আর রাজাকে খাজনা দেওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। তারা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে রাজাকে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে নিরঙ্কুশ স্বত্ব (যাকে fee simple বা fee hold স্বত্ব বলা হত) ভোগ করত। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে জমির পরিমাণ বা দাম অনুসারে তাদের ওপরে মাঝে মাঝে কর বসাত, কিন্তু সেই কর দিতে বলেই তারা ভূস্বত্ব ভোগ করত তা নয়। বাঙলা বিহারে ব্রিটিশ শাসকদের এই ধরনের ভূস্বত্ব প্রবর্তন করার উপায় ছিল না, কারণ তাহলে তাদের শাসন ও শোষণের রেস্ত আসবে কোথায় থেকে? তাদের তো শুধু দেশ শাসনের জন্যে টাকা তুলতে হত না নয়, সারাক্ষণ এদেশে তারা যুদ্ধ করে যে নতুন এলাকা জয় করেছিল সেই যুদ্ধের খরচ তুলতে হত এবং তদুপরি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তথাকথিত investment অর্থাৎ ব্যবসার নামে লুঠের সামগ্রী তুলে ইংল্যাণ্ডে চালান করার টাকাও যোগাতে হত। এত সব করতে হত বিদেশী বণিকদের আয়ের ওপর যা তাদের লেনদেনের ওপর একটা পয়সা কর না চাপিয়ে। সুতরাং প্রধানত জমি থেকে তোলা রাজস্বও তাদের সম্বল। এই কথাটা অন্তত ব্রিটিশ শাসনের যারা মূল কর্তা পার্লামেণ্ট এবং কোম্পানির ডিরেকটরদের কাছে পরিষ্কার ছিল। কর্ণওয়ালিসকে যখন ১৭৮৬ সালে কোম্পানির রাজত্বের গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয় তখন কোম্পানির Court of Director তাঁকে পরিষ্কার কতকগুলি নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশের মূল সূত্র ছিল যে, যে কোনও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা কোম্পানির রাজত্বে প্রবর্তিত হোক না কেন, তা যেন চিরস্থায়ী হয়, নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেরামতিতে যেন খাজনা মার না খায়।

> The disapprobation of the Court had been excited by the frequent changes which had marked the financial system in Bengal, and they expressed their preference of a steady adherence to almost any system, attended with watchful superintendence. (ফার্মিঙ্গার, ১৯১৭, পৃঃ ১৯)

ততদিন পর্যন্ত যেভাবে রাজস্বব্যবস্থা চলছিল তাতে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কোম্পানির বিরক্তির কারণ ছিল দুটো : অনাদায়ী খাজনা এবং রায়তের অযথা হয়রানি।

> [they] noticed the heavy arrears outstanding on the settlement of the last four years. which had been formed under the immediate direction of the committee of revenue and expressed their opinion, that the most likely means of avoiding such defalcation in future. would be. by introducing a premanent settlement of a revenue. estimated in its amount on reasonable principles. for the payment of which, the hereditary tenure of the possessor would be best, and in general, the only necessary security.
>
> (ফার্মিঙ্গার, ১৯১৭, পৃঃ ২০)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সরকারি নীতি তাহলে ১৭৮৬ সালেই প্রায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনকার মতো ডিরেক্টররা একথাও যোগ করেছিলেন যে বিশেষ কারণে (সম্ভাব্য কারণ প্রধানতঃ এই যে ঠিক কতটা রাজস্ব চিরকালের জন্যে তোলা যাবে, তাতো নির্ণয় করতে হবে) তখনকার মতো বন্দোবস্ত দশ বৎসরের জন্যে করা হবে।

এসবই জানা ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের মোদ্দা কথা এই যে ভূমি রাজস্ব ছাড়া কোম্পানি শাসন চলবে না—জমির মালিকানা স্বত্ব, উত্তরাধিকার স্বত্ব, জমি কেনাবেচার অধিকার সব কিন্তু সেই সুতো থেকে ঝুলছে, সুতোর গিঁট কোনমতে আলগা হলেই এই সব বড় নীতি সাতবাঁও জলের তলে ডুবে যাবে।

কর্ণওয়ালিস এদেশে এসেই দেখলেন যে যা তথ্য আছে তার ভিত্তিতে তখন তখনই কোনও রাজস্বব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা যাবে না। এই ব্যাপারে এত বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন কারণ ভূমিরাজস্বই হল the principal financial resource of government.

(ফার্মিঙ্গার, ১৯১৭, পৃঃ ২১)

[ফার্মিঙ্গার থেকে উদ্ধৃত এই কথাগুলি সবই ১৮১২ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের Fifth Report থেকে নেওয়া]

ব্রিটেনের অবস্থা থেকে কোম্পানির রাজত্বের অবস্থার কত তফাৎ তা ব্রিটেনের

রাজকোষের আয় এবং কোম্পানির সরকারের আয়ের তফাৎ দেখলেই বোঝা যাবে। ১৭৭৫ সালে যখন ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে লেখালেখি করছেন তখন এ দেশে কোম্পানির আয়ের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ আসছে ভূমিরাজস্ব থেকে। সেই বৎসরই গ্রেট ব্রিটেনের সরকারের নীট আয় ছিল ১১,১১২,০০০ পাউণ্ড। সেই আয়ের মধ্যে ১,৭৫৬,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১/৬ অংশের কম আদায় হত জমির ট্যাক্স থেকে (মিচেল এবং ডীন, ১৯৬২, পৃঃ ৩৮৮)। ব্রিটিশ রাজস্বের সিংহভাগ আসত বহিঃশুল্ক ও অন্তশুল্ক থেকে। আর এদেশে মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানির ঝগড়ার একটা মূল কারণ ছিল এই যে কোম্পানি, তার কর্মচারী বা এমনকি অন্য যে কোনও ইংরেজ ব্যবসায়ী নবাবের অন্য প্রজাদের মতো শুল্ক দিতে অস্বীকার করেছিল।

ভূমিরাজস্ব থেকেই কোম্পানির ব্যয়নির্বাহ হবে বোঝা গেল। এখন কর্ণওয়ালিসের প্রতি ১৭৮৬ সালের নির্দেশে যে উত্তরাধিকারি বলে ভূমিরাজস্ব দেওয়ার কথা আছে তার কী হল? উত্তরাধিকার শুধু এল খাজনা দেওয়ার দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু কোম্পানি প্রবর্তিত সূর্যাস্ত আইনে উত্তরাধিকারের দাবিকে কার্যত নস্যাৎ করা হল। তুমি আকবর বাদশার সনদই দেখাও আর মুর্শিদকুলির আমলের দলিলই দেখাও নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট ট্রেজারিতে খাজনা জমা না পড়েছে তো তোমার জমিদারি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। এ ব্যাপারেও ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন ভূস্বত্ব আইনের সঙ্গে কোম্পানি প্রবর্তিত আইনের যেটুকু সাদৃশ্য আছে, সে শুধু ভ্যাংচানির সাদৃশ্য (ব্রিটেনের ভূস্বত্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল আলোচনার জন্য সিমসন ১৯৬১ দ্রষ্টব্য)। যে জমিদারী ব্যবস্থার এখানে পত্তন হল তা যে এদেশের পুরোনো ভূস্বত্ব ব্যবস্থাকেও ভেংচিয়ে গেল তা ইতিহাসবেত্তাদের বলে দেওয়ার দরকার নেই।

দ্বিতীয় কথা ইংরেজরা কি এদেশে ধনতন্ত্র প্রবর্তিত হোক, শিল্পবিপ্লব হোক তা চেয়েছিল? এরকম উদ্দেশ্য যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পিছনে (বা রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের পিছনে) কাজ করেছিল তার সাক্ষ্যে মেলে না। সাক্ষ্য মেলে এই কথার যে ইংরেজরা যে শর্তাধীন আংশিক ভূস্বত্ব জমিদার (অথবা রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রায়তদের) অর্পণ করেছিলেন, তা যেন সেই আধাভূস্বামীর হস্তান্তর করার অধিকার থাকে সেই ব্যবস্থা চেয়েছিল। আশা ছিল যে তার ফলে নিষ্কর্মা জমিদারের হাত থেকে কর্মঠ জমিদারের হাতে জমি যাবে এবং তার ফলে জমির উৎপাদন আরও বাড়বে, এবং তারচেয়ে বড় কথা কোম্পানির ভূমিরাজস্ব আদায় নিশ্চিততর হবে।

১৭৯৩ থেকে ১৭৯৮-এর মধ্যে অনেক জমিদার যখন নীলামে চড়ল, তখন বকেয়া খাজনা উশুল হল না, তখন ব্রিটিশ শাসকরা জমিদারদের পুরোনো প্রতাপের যে ভ্যাংচানি সংস্করণের পুনঃপ্রবর্তন করল তাতে সাধারণ চাষী গৃহস্থর নাভিশ্বাস উঠল। এই নিষ্ঠুর কানুন হল ১৭৯৯ সালের সপ্তম রেগুলেশন যা হপ্তম নামে কুখ্যাত। প্রাকব্রিটিশ আমলের বড় বড় জমিদারদের স্থানীয় বিচার ইত্যাদির অনেক ক্ষমতা ছিল (কিন্তু বহুক্ষেত্রে সেই বিচারের উপর আপীল চলত কাজী বা ফৌজদারের কাছে)। জমিদারের বিচার ও স্থানীয় শান্তিরক্ষার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দায়দায়িত্ব ছিল—যেমন সেচব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, বাজারহাটের তদারকি, রাস্তাঘাটের তদারকি। আর চাষীকে বা জোতদারকে জমি থেকে উৎখাত করা জমিদারের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল না। এক্তিয়ার-বহির্ভূত অত্যাচার নিশ্চয়ই চলত। কিন্তু লোকে তাকে বে-আইনী কাজ বলে জানত। হপ্তম আইনে আদালতের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই জমিদারকে রায়তের ঘটি বাটি ফসল ক্রোকের এবং রায়তকে কয়েদ করার অনুমতি দেওয়া হল। এসব কি করা হল চাষী যাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ায় তার স্বার্থে? এর একমাত্র যুক্তি ছিল কোম্পানির রাজস্ব রক্ষা। জমিদার যেন তেন প্রকারেণ রায়তের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালতে জমা দেবে তাই ছিল এই রেগুলেশনের উদ্দেশ্য। জমিদারকে নিজের মামলায় নিজেই বিচারক হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল। জমিদার প্রায় অবিমিশ্রভাবে ভক্ষকের অবতারে আবির্ভূত হল। জমিদার যদি কোম্পানি বাহাদুরের প্রাপ্য মিটিয়ে দেয় এবং তার তকমাকে খাতির করে তাহলে গ্রামে গঞ্জে সে লাইসেন্সধারী তস্করের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে পারে, এই জমানা কায়েম হল।

ব্রিটিশ ভূস্বত্বব্যবস্থা বা দেশী নবাবী জমিদারী ব্যবস্থার কোন্ কোন্ ভঙ্গী ব্রিটিশ শাসকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক ভঙ্গী নকল করেছে সে কথা বাদ দিলাম। ব্রিটিশ শাসকরা হঠাৎ করে ভারতে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের স্থাপনের কথা ভাবতে যাবে কেন? এই ধারণার পিছনে আছে আঠার শতকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় শিল্পনির্ভর ধনতন্ত্রের অবস্থান সম্বন্ধে কিছু মনগড়া ধারণা। উদারপন্থী (liberal) ও মার্কসীয় ইতিহাস কথনের ধারায় ধরে নেওয়া হয় যে ইংল্যাণ্ডে অবিসংবাদিতভাবে পৃথিবীর প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল। অতঃপর ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবকে যোগ করে বলা হয় যে এই দুই বিপ্লব সারা পৃথিবীতে মানবমুক্তির পথ খুলে দিল। পরিহাসের কথা এই যে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটাল এক নতুন ধরনের ভূস্বামী

শাসনের অওতায়। আর ফরাসী বিপ্লব হয়ত ফ্রান্সের শিল্পবিপ্লবকে কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছিল যদিও ফ্রান্সে ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে সেই বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু এই দুই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যে মুক্তির অলোয় অলোকিত হয়ে ওঠে নি তা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

বানিয়া ভূস্বামীশাসিত ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে গেল ঠিকই কিন্তু আঠার বা উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত শিল্পপতিগোষ্ঠী কোনদিনই সে দেশের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যমণি হয়ে উঠতে পারল না। সুতরাং শিল্পপতির ভাবাদর্শ (যা হয়ত কিছুটা জন ব্রাইটের মধ্যে দেখা যায়) তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্তা হবে একথা ভাবা অবাস্তব কল্পনা।

পুরোনো অনেক তথ্য নতুনভাবে সাজিয়ে এবং নতুন অনেক তথ্য সংযোজন করে এখন ইংরেজ ধনতন্ত্রের যে চেহারা পাওয়া যাচ্ছে তাকে কেইন এবং হপকিন্স (১৯৮৬) সংগতভাবে (gentlemanly capitalism) সম্ভ্রান্ত লোকের ধনতন্ত্র বা রইস আদমির ধনতন্ত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। ষোড়শ শতকের টিউডর শাসনের সময় থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী বলে চিহ্নিত করা যায় এক অতি ক্ষমতাশালী ভূস্বামীশ্রেণীকে। এই ভূস্বামীশ্রেণী সতের থেকে আঠার শতকের মধ্যে জমির ওপর দখল আরও বাড়িয়েছিল। একথা মার্কস অনেক আগেই লক্ষ্য করে গেছেন। তবে ১৯৪০ সালের হাবাক্কাকের প্রবন্ধ থেকে আধুনিককালে টমসন (১৯৯১), স্টোন (১৯৮৪), রুবিনস্টাইন (১৯৮৭) ও বেকেটের (১৯৮৬) লেখায় ইংরেজ ভূস্বামীশ্রেণীর সামাজিক সংস্থান ও বৈষয়িক প্রতাপের পরিচয় আরও পরিষ্কার হয়েছে। এই ভূস্বামীশ্রেণী কিন্তু সামন্তশ্রেণী নয়। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসীভূত প্রাসাদ দিয়ে তারা নতুন ইমারত গড়েছে। এরা গোড়া থেকেই টাকার মর্ম বুঝেছে। সাধারণ মানুষকে তারা বেঁধেছে লাঠিয়ালের দাপটে নয়, টাকার এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের দাপটে, এবং সেই বন্ধনকে তারা বরাবর একটা আইনী রূপ দিয়েছে। আর একটা কারণ তারা দ্বিতীয় চার্লসের নিধন করেছে আইনের দোহাই দিয়ে, দ্বিতীয় জেমসকে তাড়িয়েছে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে। তারা, তাদের ধনী পুঁজির অধিকারী tenant অর্থাৎ জমির লীজ নেওয়া চাষীর সঙ্গে তাল রেখে অর্থমুখী চাষের সাধনা করেছে। কিন্তু নিজেদের ক্ষমতা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তা দেখার জন্যে primo-geniture অর্থাৎ বড় ছেলেই সমস্ত সম্পত্তি পাবে এই আইন

বজায় রেখে এবং strict settlement অর্থাৎ বিবাহ-সংক্রান্ত চুক্তিতে সম্পত্তির হস্তান্তরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রেখে জমির ওপরে মালিকানা বহুভাগে বিভক্ত হতে দেয় নি (স্টোন এবং স্টোন ১৯৮৪ ; বেকেট, ১৯৮৬)। এই শাসককূলেব পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বড় বড় বণিক, সম্ভ্রান্ত মহাজন। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে ঠিকই কিন্তু বিশ শতকের আগে শিল্পপতিরা না কাঞ্চনকৌলীন্যে না জন্মকৌলীন্যে এই ভূস্বামীশ্রেণী বা তার সহযোগী বণিক মহাজন গোষ্ঠীর কাছাকাছি যেতে পেরেছে।

এই শাসককূল ভাবাদর্শের দিক থেকে মোটেই অ্যাডাম স্মিথ বা বেন্থামের চেলা ছিল না। মেকলে বা বেণ্টিঙ্ক ছিলেন হুইগদলের মতাদর্শে বিশ্বাসী : রাজা, রাণী, ভূস্বামী, ইংল্যাণ্ডের পুরোনো আইন ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের আনুগত্য টনটনে ছিল। সেই আনুগত্যের সঙ্গে বণিক-ব্যাঙ্কার সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের সখ্যও স্বভাবসিদ্ধ ছিল। Utilitarianism-এর অলঙ্কার বহু লোকেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই অলঙ্কার ব্যবহারের সঙ্গে সত্যিকারের নীতির সম্পর্ক ছিল খুবই শিথিল। মেকলের Minute-এর ওপরে রেনেসাঁস চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়, ইংল্যাণ্ডের Public School শিক্ষার আদল পাওয়া যায়। কিন্তু উনিশ শতকে ফ্রান্স ও জার্মানীতে যেরকম নতুন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়াস চলেছিল তার প্রায় কোনও ছাপ তার মধ্যে পড়ে নি বললেই চলে। শাসকশ্রেণীর ইংরিজিশিক্ষিত কেরানীকূল সন্ধানের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ভূস্বামীশ্রেণীর শিক্ষার ধারণা আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল। শুধু কর্ণওয়ালিস ভূস্বামীকূলের প্রতিভূ বলে যে এখানে জমিদারশ্রেণী তৈরি করেছিলেন তা নয়; কর্ণওয়ালিসের কৌলিন্যের চেয়ে ছোট সম্ভ্রান্তবংশে যাদের জন্ম হয়েছিল সেইসব গরীব পাদ্রী-তনয়, সৈন্য ও নৌসেনাবাহিনীর অফিসার সন্তান, নিদেনপক্ষে মাঝারি বড় বণিকনন্দনের সামনে ভদ্রলোকের যে আদর্শ ছিল তার সঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগী বাঙালী ভদ্রলোকের মুখ তাদের ধারণায় মিলে গিয়েছিল। যখন বাঙালী ভদ্রলোক ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াল তখন স্বভাবতই কিপলিঙের মতো লোকের প্রবণতা হল তাকে 'বান্দরলোক' বলে চিত্রিত করা।

জমিদারি বা রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমির বাজার তৈরি হয় নি, তৈরি হয়েছিল জমির ফলসের ওপর দাবির বাজার। সেই বাজার ছিল জমিদারির, সেই বাজার ছিল পত্তনির, সেই বাজার ছিল রায়তি স্বত্বের, সেই বাজার ছিল এমনকি কোর্ফা রায়তি স্বত্বের। কিন্তু সেই বাজার কখনও পুরো মুক্ত হতে পারে নি। সরকারের দাবিদাওয়া, জমিদারের লাঠির জোর, গরীব চাষীর জমি আঁকড়ে ধরে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা,

মহাজনের সুদের ও আসলের দাবি এবং বহুক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ঋণ ও ভূমিদাসত্ব— এই সতের বেড়াজালের মধ্যে ঘুরত ফিরত এই সতীদেহের মতো খণ্ডিত ভূস্বত্ব ও উপস্বত্ব। বহু ক্ষেত্রে জমির কোনও বাজার ছিল না বললেই চলে ঃ সরকার জমিদারি বা রায়তের স্বত্বকে লাটে উঠিয়ে তা বিক্রি করতে পারে নি এমন বহুবার ঘটেছে অথবা সেই স্বত্ব উপস্বত্ব বিক্রি হয়েছে নামমাত্র দামে। একথা জমিদারি স্বত্বের চেয়ে আরও অনেক বেশী খাটে রায়তওয়ারি এলাকায় রায়তি স্বত্বের ক্ষেত্রে।

জমিদারি প্রথা বাঙলা বিহার উড়িষ্যায় চালু হলেও কোম্পানির অধিকারভুক্ত অন্য অঞ্চলে তাকে প্রসারিত করার ব্যাপারে বড়কর্তাদের একটা বড় অংশ বাধা ছিল। ইতিমধ্যে মাদ্রাজের বড়মহলে আলেকজাণ্ডার রীড এবং টমাস মানরো সোজাসুজি রায়তের সঙ্গে সরকারের রাজস্ব-সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছিল (স্টাইন, ১৯৮৯ দ্রষ্টব্য)। ১৮১২ সালের বিখ্যাত ফিফথ্ রিপোর্টকে বলা যায় রায়তওয়ারি ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি। আর সেই ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল বিশদভাবে করা হল জেমস মিলের History of British India বইতে (মিল, ১৮১৮)। মিলের ওকালতি অবশ্য শুধু রায়তওয়ারি ব্যবস্থার পক্ষে নয়। তাঁর বই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বিশালাকার সাফাইনামা। মিলের প্রধান যুক্তি এই হল যে ব্রিটিশরা আসার আগে গোটা ভারতবর্ষ কুসংস্কার এবং অসভ্যতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ব্রিটিশদের কাজ হবে ভারতীয়দের মধ্যে সভ্যতার আলোর বিচ্ছুরণ।

জেমস মিল 'হিন্দু সমাজের অসভ্যতা' থেকে মুক্তির জন্যে ব্রিটিশ শাসনকে যে যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি বারবার অস্বীকার করেছেন যে ব্রিটিশরা কোনওভাবে এই দেশকে শোষণ করেছে (মিল, ১৮১৮)। মিল এই সৎকর্মের জন্যে অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি যে ১৮১৯ সালেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে বড় চাকরি পেয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর ছেলে জন স্টুয়ার্ট মিল খুব অল্প বয়সে (১৭ বৎসর বয়সে) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সপক্ষে সাফাই গাওয়া যে স্মরণিকা (Memorandum) লিপিবদ্ধ হয় তা জন স্টুয়ার্টের লেখনীপ্রসূত (মিল, ১৮৮৫)। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে এই দেশ থেকে মুনাফা বা রাজপ্রাপ্য তুলে নিয়ে যায় নি তার প্রমাণ হিসাবে জেমস মিল বলেছেন যে এদেশ শাসনের ভার নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া ঋণে জর্জরিত হয়েছে এবং তার ওপর সুদ গুণতেই তাকে হিমসিম খেতে হয়েছে। একথা একবারও তিনি কবুল করেন নি যতই ঋণ বেড়েছে

সেই ঋণ শোধ করার জন্যে টাকা এদেশের রাজত্ব থেকেই উসুল করেছে (বার্বার, ১৯৭৫)। অন্যদিকে হরেস হেম্যান উইলসন জেমস মিলের বইয়ের নতুন সংস্করণ বের করতে গিয়ে তাঁর একদেশদর্শিতার, তাঁর দাম্ভিক অজ্ঞতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তদুপরি তিনি তখনকার বঙ্গদেশের অর্থাৎ বাঙলা বিহার উড়িষ্যার বাণিজ্যের ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন। সেই তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় কতরকমভাবে এদেশ থেকে সম্পদ গিয়ে ব্রিটেনের ভাণ্ডারে জমায়েত হয়েছে (উইলসন, ১৮৩০)।

জেমস মিল রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন এই বলে যে জমি থেকে পাওয়া যে উপস্বত্ব তা কোনও ব্যক্তি জমিদারকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। শাসকের রাজস্ব দরকার সেই রাজস্ব সংগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় জমির উপস্বত্ব অংশ—যে অংশটা চাষীর শ্রম এবং মূলধনের ন্যায্য দাম দেওয়ার পরে থাকে—সেই অংশ কর হিসেবে আদায় করা। এই উপস্বত্ব নিলে রায়তের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, সে তো তার মজুরি ও মূলধনের উপর লাভ পেয়েই যাচ্ছে, আর মধ্যে থেকে সরকার তার রাজস্ব পেয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এরকম ব্যথাহীন রাজস্ব আদায়ের উপায় আর ভাবা যায় না। (এ প্রসঙ্গে বার্বার, ১৯৭৫, অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

তাজ্জবের কথা হল জেমস মিল একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি যে স্বাধীন মজুর এবং চাষে মূলধন নিয়োগকারী স্বাধীন ধনতন্ত্রী চাষী ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে বিরাজ করছিল কিনা। একথাও জিজ্ঞেস করলেন না, সরকার সেই রাজস্ব দিয়ে কী করবে। যদিও জেমস মিল তমসাচ্ছন্ন ভারতীয়দের আলো দেখাতে চেয়েছিলেন, শিক্ষার খাতে সরকার এই টাকা ব্যয় করবে সে কথা তাঁর বক্তব্যে বিশেষ স্থান পায় নি। সভ্যতার লুচির জন্য প্রয়োজনীয় তেল ময়দা সাগরপারে চলে যাবে, কিন্তু ভারতীয় চাষী সেই লুচির স্বপ্ন দেখেই পেট ভরাবে আর আলোকপ্রাপ্ত হবে। জেমস মিলের ক্রোধ ও ঘৃণায় বল-পাওয়া গদ্যে সমাজের স্বার্থ আর ঔপনিবেশিক শাসকের স্বার্থ অভিন্ন। সরকারের স্বার্থকে জন-সমাজের স্বার্থ বলে চালানোর এই বাকচাতুরী তারপর থেকে কায়েমী স্বার্থের সব ধ্বজাধররাই চালিয়ে গেছেন। জন আর রিচার্ড স্টেচী ব্রিটিশ সরকারের বানানো অতি লাভজনক সেচ ব্যবস্থায় দেখেছেন সমাজতন্ত্রের ছায়া, জন মেনাড কেইন্স ব্রিটেনের স্বার্থে বানানো স্টার্লিঙের গাঁট ছড়ায় বাঁধা মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে দেখেছেন বিরাট সামাজিক স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা। আজও কিছু পণ্ডিত বলে বলে বেড়াচ্ছেন ইউরোপীয় শাসকরা এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকা থেকে সম্পদ পাচার করেছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের বক্তব্য তাঁরা

দু'তিন ধরনের যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেন।

প্রথমত সম্পদ নিয়ে গেলে বৈদেশিক বাণিজ্যের জমাবন্দীর হিসেবে পাওনা এবং উসুলের মধ্যে ফাঁক যদি না থাকে তাহলে ধনসম্পদ কোন্ পথে গলে যেতে পারে? খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভারতবর্ষ আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকা থেকে যে টাকা ইউরোপে—উত্তর আমেরিকার দেশগুলোকে দেওয়া হয়েছে তার একটা বড় অংশ রেলপথ, বন্দর, রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা বানাতে খরচ হয়েছে। এর ফলে ঐ দেশগুলোর উন্নতি তো নিশ্চয়ই হয়েছে। যদি বলা হয় রেলপথ ইত্যাদি বানানোর জন্যে যত টাকা লেগেছে অত লাগার কথা ছিল না, তখন একটা উত্তর দেওয়া হয় যে এই কোম্পানিগুলো তো বেশি লাভ করে নি? ল্যান্স ডেভিস ও রবার্ট হাটেনব্যাক (১৯৮৬) তাঁদের এক সাম্প্রতিক বইতে একথাই প্রমাণ করছে চেষ্টা করছেন যে ইউরোপীয় দেশগুলো উপনিবেশের ভূখণ্ডগুলিতে যে টাকা লগ্নী করেছিলেন তাতে তাঁরা অন্য জায়গায় লগ্নীর তুলনায় বেশি লাভ তো করেনি বরং অনেক জায়গায় লাভের হার বা সুদের হার কম হয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তাঁদের এই বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে সত্য, তাহলেও উপনিবেশের দেশগুলি থেকে বেশি লাভ হয় নি একথা যথার্থ নয়। বহু জায়গাতেই রেলপথ ইত্যাদি বানাতে খরচ দেখানো হয়েছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ; কোম্পানির লাভ তো হবেই সেই খরচ মিটিয়ে সুতরাং বছরের শেষে তার ব্যালান্স শীটে লাভের অঙ্ক বেশি দাঁড়ায় না। আসলে বেশি টাকাটা গেছে শাসক দেশের রেল ইঞ্জিন, রেলের ওয়াগন বানানোর কোম্পানিগুলোর বড় সায়েবদের বিশাল মাইনে এবং ততধিক বিশাল আনুসঙ্গিক খরচ যোগাতে, ডিরেক্টরদের অন্য কোম্পানি থেকে বেশি টাকায় মাল কিনতে।

দ্বিতীয় বড় কথা হল এই যে, যে দামগুলো ধরে এই হিসেবে কষা হয়েছে সেই দামের সর্বের মধ্যেও ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের ভূত ঢুকে আছে। ইদানিং কালে ভালো করে হিসেব করে দেখা গেছে যে ভারত থেকে জাপানে যে তুলো রপ্তানী হত সেই একই রকম তুলো ব্রিটেনে রপ্তানী করে ভারত অনেক কম টাকা পেত। অন্যদিকে ব্রিটিশ বণিক চালিত মরিশাসের চিনি কোম্পানিগুলো থেকে আমদানির চিনির দাম পড়ত জাভা বা অন্য কোনও ব্রিটিশ উপনিবেশের আওতার বাইরের দেশের চিনির থেকে বেশি। সমুদ্রগামী জাহাজের মাশুলের তুলনা করলেও একই রকমের ফল পাওয়া যায়।

তাছাড়া একথা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে লাতিন অমেরিকা বাদ দিয়ে

ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান অংশটা এসেছে রাজকর থেকে, বিদেশী লগ্নী পুঁজির লাভ থেকে নয়। ডেভিড ওয়াশব্রুক (১৯৮১) এবং তার মতো অনেকে মনে করেন যে ১৮৫৮ সালের পর ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার চরিত্র বদলে গিয়েছে। কিন্তু না ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিতে, না আদায়ের খাতের প্রকৃতিতে এই 'চরিত্র' বদলানোর প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। বড়জোর বলা যেতে পারে যে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় তেমন বাড়ে নি, সে তুলনায় চা কয়লা পাটকল এইসব বিদেশী অধিকৃত শিল্পে লাভের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। শুধু ব্রিটিশ শাসনের এই গোড়াপত্তনের জমির দিকে নজর দিলে মনে হবে, হ্যাঁ সত্যিই তো শোষণের রকমফের হয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণব্যবস্থা অনেক বেশি ধনতন্ত্রী শোষণের রূপ নিয়েছে।

কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটা বড় উল্টো যুক্তি দাঁড় করানো যায়। প্রথমতঃ এদেশ থেকে বিদেশে যে সম্পদ পাচার হয়েছে তার প্রধান অংশ কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানির লাভ হিসেবে যায় নি। অধিকাংশই গেছে ভারত সরকারের তোলা ঋণের সুদ মেটাতে এবং তথাকথিত Home Charges মেটাতে। (প্রধানত ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য যে শাসন ও নিপীড়ন কাঠামো রাখার জন্যে ব্রিটেনে যে টাকা খরচ হত Home Charges ছিল তারই নাম)। মাঝে মাঝে অন্য দেশে—যেমন ইথিওপিয়া, চীন—এইসব ভূখণ্ডে ব্রিটিশ হামলার খরচও Home Charges-এর খাতে দেখিয়ে দেওয়া হত। এই করজনিত শোষণ ১৮৫৮ সালের পরে কিছু কম হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৮ সালের পর ব্রিটিশ শাসকরা আবার নতুন করে মেনে নিয়েছেন অযোধ্যার তালুকদারদের আবদার, অন্যদিকে রায়তওয়ারি এলাকায় রায়তের সঙ্গে খাজনার বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করার প্রস্তাব করা মাত্র শিকেয় তোলা হয়েছে। পাঞ্জাবে সেচব্যবস্থা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ, জলকরের পরিমাণ দ্রুতহারে বাড়ানো হয়েছে। (ডাঙ্গেন, ১৯৭২ আলি, ১৯৮৩, দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভূমিরাজস্বের ওপরে আর্থিক নির্ভরতা আর জমিদারের ওপর রাজনৈতিক নির্ভরতা দুই দিকই ব্রিটিশ সরকার সামাল দিয়ে চলেছে। ডাঙ্গেন দেখিয়েছেন কীভাবে ব্রিটিশ শাসকরা খুব ভেবেচিন্তে এক নতুন জমিদারশ্রেণী পাঞ্জাবে গড়ে তুলছে।

তৃতীয়তঃ আসাম, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ারের চা বাগানে, রাণীগঞ্জ ঝরিয়ার কয়লা বা অভ্রের খনিতে ইউরোপীয় মালিক ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক

মোটেই পুঁজিপতির সঙ্গে স্বাধীন শ্রমিকের সম্পর্কের কাছাকাছি ছিল না। পুলিশ, গুণ্ডা, লাঠিয়ালের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের গড়া আইনে শ্রমিককে প্রায় দাসত্বে পর্যবসিত করা হয়েছিল (বাগচি, ১৯৯০ দ্রষ্টব্য)। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীকান্ত দাস, মায় শ্রমিকের ওপরে রাজকীয় কমিশনের রিপোর্ট থেকে আরম্ভ করে অমলেন্দু গুহ এবং সাম্প্রতিক আরও অনেক গবেষকের লেখায় চা বাগানের শ্রমজীবী নারী-পুরুষের ওপরে চা কর সাহেব ম্যানেজারের অত্যাচারের যে কাহিনী পাই, তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

Fifth Report এবং জেমস মিলের প্রোপাগাণ্ডায় বিশ্বাস করে পরবর্তীকালের বহু ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক জমিদারীর তুলনায় রায়তওয়ারী ব্যবস্থাকে শতগুণে ভালো মনে করেছেন। সত্যিই তো একদিকে কতকগুলি পরগাছা জমিদার, তালুকদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার চাষীর ওপর জগদ্দল পাথরের ওপর বসে আছে আর অন্যদিকে স্বাধীন রায়ত সরকারের ঘরে খাজনা জমা দিচ্ছে। এই দুই চরিত্রের মধ্যেকার তফাৎ কার না চোখে পড়ে এবং রায়তওয়ারী ব্যবস্থা কার না ভালো লাগে? কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কি রায়তওয়ারী এলাকায় সত্যিই স্বাধীন চাষী ভূস্বামী তৈরি করেছিল? সেই ব্যবস্তাতেও ঠিক ঠিক সময়ে কিস্তু জমা না দিলে রায়তের স্বত্বাধিকার বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। তার স্বত্বাধিকার ফিরে পেতে হলে তাকে পুরো কড়ি গুণতে হত, অথবা অন্য যে কোনও ক্রেতার সমান দাম দিতে হত। মাউন্টস্টুয়ার্ট, এলফিনস্টোন, চ্যাপলিন ইত্যাদি যেসব ব্রিটিশ আমলা নববিজিত পেশোয়া রাজ্যের ভূমিব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে মারাঠা আমলে মিরাসদার বা থলকরী স্বত্বের অধিকারীরা নিরঙ্কুশভাবে জমির ভোগদখল করত। বছরের পর বছর খাজনা দিতে না পারলেও মিরাসদারের জমির স্বত্ব চলে যেত না—অন্য যে কোনও দণ্ডই সেই নালায়েকের কপালে থাকুক না কেন। ব্রিটিশ আমলারা একথাও বলেছেন যে এই স্বত্ব ইংল্যাণ্ডের freehold স্বত্বের মতো। তার জায়গায় যে রায়তওয়ারি প্রথা তাঁর প্রবর্তন করলেন তা মার্কসের পূর্বকথিত ভাষায় টুকরো সম্পত্তি প্রভার ভ্যাংচানি। চাষীর ফলসের অনিশ্চয়তা ও তার দামের অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়ে তার দেয় করকে শুধু নিশ্চিত করা হল আর নিশ্চিত করা হল নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমির খাজনা না দিতে পারলে জমি হারানোর সম্ভাবনাকে। সম্পত্তির নিরাপত্তা এইভাবে ব্রিটিশ প্রভুরা রায়তওয়ারী চাষীদের কাছে হাজির করলেন। (রায়তওয়ারী বা জমিদারী কোনও ব্যবস্থায় যে চাষীকে সত্যিকারের ভূস্বত্ব দেওয়া

হয় নি, তা রিচার্ড জোন্স (১৮৩১)—যিনি মলথাসের জায়গায় এসেছিলেন হেইলিবেরি কলেজে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে—তিনি জানতেন। কিন্তু রিচার্ড জোনসের এই পরিষ্কার বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল বা হেনরি মেইনের লেখায় হারিয়ে গেছে। তাঁরা জমিদারী ব্যবস্থায় সঙ্গতভাবেই আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু রায়তওয়ারীর কোনও খুঁত ধরেন নি)। আমেদরগর, নাসিক, বিজাপুর ইত্যাদি জেলায়, বর্তমান তামিলনাড়ুর বহু জেলায় খাজনার দায়ে যখন রায়তের জমি ব্রিটিশ জমানায় নীলামে উঠেছে তখন প্রায়ই সে জমির খরিদ্দার মেলে নি (বেকার ১৯৮৪ ; গুহ, ১৯৮৫)। পরে যখন ফসলের দাম বাড়ার ফলে সেই খণ্ডিত ভূস্বত্বেরও বাজার মিলেছে, তখন মহাজন সাউকারের কাছে চাষীর সর্বস্ব বাঁধা পড়তে আরম্ভ করেছে। জমির মুক্ত বাজার আর যারই চোখে পড়ে থাকুক ঋণ-জর্জরিত মারাঠী বা তামিল চাষীর চোখ পড়ে নি। (এই প্রসঙ্গে আমার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ (বাগচি, ১৯৯২ দ্রষ্টব্য)।

জেমস মিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার জয়গানে বহুদিক থেকেই অগ্রপথিক। তাঁর আগে অ্যান্টনি ল্যাম্বার্ট, লর্ড লডারডেল প্রমুখ বিশ্লেষকরা স্পষ্টই দেখিয়ে গিয়েছেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কতভাবে ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে নিজের দেশে পাচার করেছেন। এই পাচার যে ভারতীয় চাষী পরিবারের শ্রমের ফসল তাও ল্যাম্বার্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

> The English Company has drawn from Bengal a greater tribute than was remitted to Delhi, and, for the purchase of production required by Europe, Bengal has ceased to receive what formerly replaced the tribute it paid. It is immaterial wheather the tribute has been drawn from the money of circulation, or its manufactures ; either, ultimately becomes a tribute of labour.
>
> (কোলব্রুক এবং ল্যাম্বার্ট, ১৭৯৫, পৃঃ ২২১-২)

জেমস মিল এসে বললেন (বার্বার, ১৯৭৫, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত যুক্তি ভ্রান্ত, প্রমাদগ্রস্ত। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তাঁর যুক্তি হল যে যদি কোম্পানি এতই লাভ করে থাকবে তার এত ঋণ করতে হবে কেন? স্পষ্ট উত্তর হল যে যখন বোঝা গেল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দরকার হলে লুঠের পরিমাণ বাড়াতে পারে, তখন তার ঘাড়ে শাসন ও নিপীড়নের খরচ আরও বেশি করে চাপানো হল, সেই খরচ যখন তখনকার আয়ে কুলিয়ে উঠল না, তখন কোম্পানি ধার করল, ধার শোধ

করার জন্যে হয় আরও করের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল, নয় আরেকটি রাজ্য জয় করল, নয় আরেক করদ রাজ্যকে বাধ্য করল আরও protection money বা নজরানা বা তোলা দিতে। লুঠ হল লাভ, আর ধার হল লুঠ বাড়াবার নতুন অজুহাত।

জেমস মিল তাঁর শাসন প্রশস্তির সমর্থনে ইউরোপীয় এবং (ইংরেজী অনুবাদে) এদেশের অনেক শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছেন। বেব্রস জেমস উইলসন তাঁর সম্পাদকের মন্তব্যে মিলের পাণ্ডিত্যের আলখাল্লায় অসংখ্য ছিদ্র দেখিয়ে দিয়েছেন। তার আগে জেমস গ্র্যান্ট যে রাজস্বপ্রথা ও যে কর হার প্রাক-ব্রিটিশ ছিল বলে দাবি করেছিলেন তার সমর্থনে প্রধানত মুঘল ও নবাবী আমলের ফতোয়া দলিল ইত্যাদির সাক্ষ্য হাজির করেছিলেন (ফার্মিঙ্গার, ১৯১৭খ, ৪নং পরিশিষ্ট)। জন শোর গ্রান্টের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে প্রধানত নির্ভর করেছেন কোম্পানির দেওয়ানি লাভের আগে বাঙলা বিহার সুবায় আসলে কত আদায় হয়েছিল সেই হিসেবের উপর। অর্থাৎ এখানে শাস্ত্রের অনুশাসনের সঙ্গে তর্ক হচ্ছে সরকারি তহবিলে যে টাকা উসুল হচ্ছে তার। এক অর্থে এই হিসাবও শাস্ত্র বা text ; কিন্তু সেই শাস্ত্রের কোনও উর্ধ্বস্তরের অনুশাসন নেই—এক জমা বকেয়ার যোগ বিয়োগের নিয়ম ছাড়া।

ইদানীং কিছু লেখায় জোর দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রের বিশ্লেষণে। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বে শাস্ত্রকে কখনই তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে বোঝা যায় না। প্রতিটি শব্দ, শব্দগুচ্ছ বাক্যের অর্থ শুধু শাস্ত্রের অন্তর্লীন যুক্তিতে চলে না, তার অর্থ নির্ণীত হয় তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবহারে সেই শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্য গঠন কী ওজন পায় তার ওপর। তাছাড়া শাস্ত্র দিয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি পুরোপুরি নির্ধারিত হয় না।

Political Economy ? নানা শাস্ত্রের সূত্রে ঔপনিবেশিক শোষণের যৌক্তিকতা বারবার খোঁজা হয়েছে। ডেভিস ও হাটেনব্যাক, ডেভিড ফিল্ডহাউস গোছের লোকসভ্যতা, দড় অর্থনীতির দাবি ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে শোষণের সারবত্তাই অস্বীকার করেছেন। সেই একই সাফাই গাওয়ার দলের পরম্পরায় বর্তমান পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এবং ভারতবর্ষে নব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জয়গান চলছে। ধুয়ো উঠেছে, ঠিকমতোভাবে বিষয়ব্যবস্থা চালাতে গেলে বিদেশী পুঁজি, দেশী একচেটিয়া পুঁজি ইত্যাদির ওপর সবরকম নিয়ন্ত্রণ তুলে নিতে হবে। বিদেশীদের কাছে ভারত সরকার যে ঋণ নিয়েছে তা তো শোধ দিতে হবেই। আর যতদিন শোধ না দেওয়া যাচ্ছে বিদেশী মহাজনের শর্তাবলী মানতে হবে। সেই শর্তাবলী মানতে গেলে যে আরও

লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হবে, আর কয়েক কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগে অকালে মারা যাবে, তার কী হবে? স্তোকবাক্য হচ্ছে এইসব মহামারী পেরিয়ে তিন, চার, পাঁচ অথবা পঁচিশ বছর পরে নতুন প্রজন্ম সুখের মুখ দেখবে। এই ধরনের বেশির ভাগ যুক্তি যে ছলনার যুক্তি, নিষ্ঠুর তামাসার যুক্তি তা বোঝার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাধারী অর্থশাস্ত্রী হওয়ার দরকার করে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গাব্দ ১৩৪০ সন (ইংরেজি ১৯৩৩ সাল?) তৎকালীন জাপানের সঙ্গে তুলনা করে এদেশ সম্বন্ধে যা লিখে গিয়েছিলেন তা আবার বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

> 'অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক পথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব 'ল' এবং 'অর্ডর', বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই। অদুর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল 'ল' এবং 'অর্ডরের' প্রকাণ্ড কবলের মতো। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠ দানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।
> আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনাদার দেশে যদি কেবলমাত্র 'ল' এবং 'অর্ডর' বজায় রেখে তাকে আর সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজন্মানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্য বিধান। কিন্তু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এই সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এই জন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলাম যে আমরা দেনাশোধ করব

না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে, বর্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে।'

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গাব্দ ১৩৪০, পৃঃ ২৪৯-৫০)

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ ঠিক ১৯৯১ সালেও প্রযোজ্য। বদলের মধ্যে ঘটেছে যে 'ল' এবং 'অর্ডারের' জায়গায় এসেছে goverance কথাটা; বড় বড় কনট্রাক্টর, কমিশন এজেন্ট, রাজনীতিক, বহুজাতিক সংস্থা লুটেপুটে খাক, অরণ্যানী উবে যাকে ধনীর লোভের শিকার হয়ে আরও অনেক বেশি মানুষ আরও বেশি করে পশুর অধম জীবনযাপন করুক, কিন্তু সব কিছু যেন সুনিয়ন্ত্রণের আইনের আওতায় আসে! আরও বদলেছে পেয়াদার চরিত্র। পেয়াদা এখন ব্রিটিশ সরকারের দারোগা, আমিন, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট নয়, পেয়াদা দেশের নির্বাচিত সরকার। তারা স্বেচ্ছায় পশ্চিমী মহাজনের দেনা শোধ দেওয়াবার জন্যে দেশের লোকের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছে। ইতিহাসের পরিহাসের চূড়ান্ত নিদর্শন এই যে সাউকার যেমন চায় নি, চায় না ঋণ-জর্জরিত চাষী তার ঋণ শোধ দিক, নব্য পশ্চিমী মহাজনও চায় না ভারত, বাঙলাদেশ, ব্রেজিল, সেনেগাল, নাইজিরিয়ার মতো দেশ ঋণমুক্ত হোক। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং দেশীয় শোষকশ্রেণীর নিপীড়নের ছককে আবার সভ্যতার এক পরিহসিত ছকের ঢঙে সাধারণের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। অর্থশাস্ত্র এবং তার নকলিয়ানা, রাষ্ট্রশাস্ত্র এবং তার নকলিয়ানা, সুসমঞ্জস্য সমাজব্যবস্থা এবং তার ব্যঙ্গচিত্র আবার শাসককূলের এবং তাদের স্তাবককূলের ভেল্কিবাজিতে সমস্ত বাস্তববোধ বিলোপ করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিমুহূর্তে হাজির হচ্ছে।

এই আলোচনা বহুবিস্তৃত হতে পারে। এখনকার মতো ইতিহাসের ভ্যাংচানির নাট্য পরম্পরার প্রধান অধিকারী হল শাসক ও শোষক দলের প্রবক্তারা। তারা বাস্তবকে ভ্যাঙায়, শাস্ত্রকে ভ্যাঙায়, অন্য শাসকের চরিত্রকে ভ্যাঙায়, বিশে, করে ভ্যাঙায় শোষিত মানুষের চেতনাকে। তারাই প্রধানত শাস্ত্র বানায় এবং বিরোধী শাস্ত্রকে, সংগ্রামী মানুষের অট্টহাস্যের ইতিহাসকে বিলুপ্ত করে। শাসক ও স্তাবকদের অবমাননাকর বিদ্রূপের যারা শিকার তাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে জমে ওঠে অক্ষমা। সেই অক্ষমায় যুগান্ত ঘটে। সেই যুগান্তের আবাহনে শান্তির কাঁটা বিঘ্নিত হয়। সেই বিঘ্নকে শুধু ভ্যাংচানি দিয়ে শাসককূল চিরকাল ঠেকিয়ে রাখতে আগেও পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

সূত্রনির্দেশ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৫) ; কমলাকান্তের দপ্তর, ষষ্ঠ সংখ্যা, চন্দ্রালোকে, কলকাতা ; সাহিত্য সংসদ, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গাব্দ ১৩৬১, পৃঃ ৬২-৬৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বঙ্গাব্দ ১৩৪০) ঃ 'কালান্তর', রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, বঙ্গাব্দ ১৩৫৪, পৃঃ ২৪৩-২৫২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪০) ঃ রোগশয্যায়, ১১ (জোড়াসাঁকো, ১৩ নভেম্বর) ঃ রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পঞ্চবিংশ খণ্ড, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫, পৃঃ ১৪-১৫।

Ali, Imran, 1989 : Punjab Under Imperialism 1885-1947, Delhi, Oxford University Press.

Bagchi, A. K. 1982 : The Political Economy of Under-development, Cambridge, Cambridge University Press.

Bagchi, A. K. 1990 : 'Colonialism and the nature of "capitalist"enterprise in India', in G Shah (ed.) : Capitalist Development : Critical Essays, Bombay, Popular Prakashan, pp. 45-76.

Bagchi, A. K. 1992 : Land Tax, Property Rights and Peasant Insecurity in Colonial India, Occasional Paper, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta.

Baker, C. J. 1984 : An Indian Rural Economy : Tamilnad countryside 1880-1955, Oxford, Clarendon Press.

Barber, W. J. 1975 : British Economic Thought and India 1600-1858, Oxford, Clarendon Press.

Beckett, J. V. 1986 : The Aristocracy in England 1660-1914, Oxford, Blackwell.

Cain, P. J. and A. G. Hopkins. 1986 : Gentlemanly capitalism and British expansion overseas. I. The old colonial system 1688-1950, Economic History Review, Second Series, XXXIX (4), November, pp. 501-525.

Colebrooke, H. T. and A. Lambert. 1795 : Remarks on the Present State of Husbandry and Commerce in Bengal. Calcutta.

Davis, L. E. and R. A. Huttenback, 1986 : Mammon and the Pursuit of Empire . The Political Economy of British Imperialism 1860-1812, Cambridge, Cambridge University Press.

Dunger, P H. M. van den. 1972 : The Punjab Tradition : Influence and Authority in Nineteenth Century India. London, Allen and Unwin.

Firminger, W. K. 1917a : Historical Introduction to the Bengal Portion of 'The Fifth Report', Calcutta, R. Cambray & Co.

Firminger, W. K. 1917b : The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affirs of the East India Company dated 28th July 1812, Vol. II, Introduction and Bengal Appendices, Calcutta, R. Cambray & Co.

Guha, S. 1985 : The Agrarian Economy of the Bombay Decan 1818-1941, Delhi, Oxford University Press.

Jones, R. 1831 : An Essay on the Distribution of Wealth and on the Sources of Taxation, Part I—Rent, London John Murray.

Majumdar, R. C. H. C. Raychaudhuri and K. K. Datta 1961 : An Advanced History of India, Calcutta, Mcmillan.

Marx, K. 1894 : Capital, Vol. III, edited by F. Engels, translated from the German and published by Progress Publishers, Moscow, 1966.

Mill, James 1818 : The History of British India, 6 vols, first edition, London, Fifth edition, edited by H. H. Wilson, London, James Madden Piper, Stephenson and Spence, 1858.

Mill, J. S. 1858 : Memorandum of the Improvement in the Administration of India during the last thirty years, published anonymously, India Office Library Tract.

Mitchell, B. R. and Phyllis Deane. 1962 : Abstract of British Historical Statistics, Cambridge, Cambridge University Press.

Rubinstein, W.D. 1987 : Elites and the Wealthy in Modern

British History. Brighton, Sussex, The Harvester Press.

Simpson, A. W. B. 1961 : An Introduction to the History of the Land Law, Oxford University Press.

Stein, B. 1989 Thomas Munro : The Origins of the Colonial State and His Vision of Empire, Delhi, Oxford University Press.

Stone, L. and J. C. F. Stone, 1984 : An Open Elite ? England 1540-1880, Oxford, Clarendon Press.

Thompson, E. P. 1991 : Customs in Common, London, Merlin Press.

Warren, B. 1973 : Imperialism and capitalist industralisation, New Left Review, No. 81, September/October.

Washbrook, D. A. 1981 : Law, state and agrarian society in colonial India, Modern Asian Studies, 15(3), pp. 649-721.

Wilson, H. H. 1830 : Review of the External Commerce of Bengal 1813-14 to 1827-28, Calcutta.

উপনিবেশবাদ ও লোকাচার ঃ প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের এই বার্ষিক সম্মিলনীতে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দিত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস এষণার এই ক্ষেত্র উত্তরোত্তর উৎকর্ষতর ও নতুনতর পথে এগোবে এই আশা বোধহয় আমাদের সকলেরই। কিন্তু এই উদ্যম সকলের হয় নি। আমাদের অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক ইংরাজি ভাষার বাইরে এখনও কলম বাড়ান না এটা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। এই স্বেচ্ছাকৃত অপারগতা আশাকরি ইতিহাস সংসদের সদস্যদের উজ্জ্বল উদাহরণের প্রভাবে দূরীভূত হবে। অনুরূপ আশা করবো যে যারা, ধরা যাক উচ্চতব গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তাঁরা তাঁদের থেকে দূরের সকল সহকর্মী ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সরিক করতে চেষ্টা করবেন। তা না হলে এই জাতীয় সংস্থা একটা গোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকবে, কিন্তু উদ্দিষ্ট আদর্শের দিকে এগোতে পারবে না। এই আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুদিন আগে 'শিক্ষার সমবায়' শব্দে প্রকাশ করেছিলেন। এই সমবায়ের ধারণা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিষ্ঠিত নাও হয়ে থাকে—নিঃসন্দেহে হয় নি—এখনও আশা আছে যে ইতিহাস সংসদের মতন সংস্থা বিদ্যা সমবায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। আমাদের দেশে গুরুকুলের যে ঐতিহ্য ছিল, ছাত্র-অধ্যাপক যে সম্পর্ক ছিল তা বিগত। এখন সামনে আছে যে ছকটা তাকে বিদ্যাবিপণনের মডেল বলা চলে—যার সঙ্গে বর্তমানে প্রভাবশালী বাজারকেন্দ্রিক চিন্তার সাযুয্য আছে। এই বিদ্যাবিপণন আমাদের মধ্যে যাদের মূল্যবোধের বিপরীত, আমরা বিদ্যা সমবায়ের এই ভিন্নতর আদর্শ মনে রাখতে পারি হয়তো।

আজকে আমি এমন বিষয়ে বলতে চাই যা আপাততঃ খুব তুচ্ছ। হয়তো সত্যই তুচ্ছ—সেটা যাচাই করতে হবে তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত করলে পরে। আমার

নবম বার্ষিক সম্মেলন, উলুবেড়িয়া কলেজ, ১৯৯২

জিজ্ঞাস্য এই যে ঔপনিবেশিক শক্তি এই দেশের সাধারণ মানুষের মনের ওপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল? কেবল 'মহারাণী' খেতাব, বা দিল্লীর ১৮৭৭ সালের দরবার, বা আইনগতভাবে সার্বভৌমত্ব কবজা করা বা ব্যবহার করা, ইত্যাদি যথেষ্ট নয় জনমানসে ইংরেজপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে, কেননা এইসব প্রক্রিয়া থেকে সাধারণ মানুষ অনেক দূরে। এই প্রভুত্ব কায়েম হয় দরবার থেকে, লাটভবন থেকে, রাইটার্স বিলডিং থেকে অনেক দূরের মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনে, আচার-আচরণে, আদান-প্রদানের মধ্যে ইংরেজ প্রভুত্বের ধারণাকে প্রাক-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ধারাবাহিত কিছু ক্ষমতা চিহ্নের দ্বারা স্বীকৃত করিয়ে নিয়ে। ব্যাপারটা খুব ধোঁয়াটে শোনায়, কিন্তু পরে উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। তার আগে তর্কটা স্পষ্ট করা যাক।

Macro এবং Micro এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সকলেরই জানা। এইগুলিকে 'আয়ত' ও 'অনায়ত' বা 'কণিক' নাম দেওয়া যাক। এখন কণিক সামাজিক বলতে আমরা বুঝবো এই প্রাত্যহিক আদান-প্রদান, আচার-আচরণ, লোকব্যবহার। আয়ত স্তরে রয়েছে বড়ো প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক সমাবেশ— বড়লাটের ছোটলাটের, হোম মেম্বার, রেভিনিউ মেম্বার, সিনিয়র আমলা বা সৈন্যাধিপতি, ইত্যাদিদের বিচরণভূমি—বিমূর্তরূপে সংবিধান, প্রশাসন, দমন, আইন প্রণয়ন ইত্যাদির কেন্দ্রগত উৎসস্থল। এখন আমাদের ইতিহাস গবেষণা এই আয়ত স্তরেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে, কণিক সামাজিক স্তরে পৌঁছয় না।

এই কণিক সামাজিক ও আয়ত স্তরের সম্পর্কটা ভাববার মতন। অর্থাৎ কিনা Micro এবং Macro-structure-এর সম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে সামগ্রিক অবয়ব বা সংস্থিতি (structure) এবং দূরপাল্লার ইতিহাস (Long-term বা duration), এবং মৌহূর্তিক ঘটনা সমাবেশ (conjuncture) সম্বন্ধে বহুল আলোচিত তত্ত্বটি স্মরণযোগ্য। আরও স্মরণযোগ্য ব্রোদেল (Fernand Braudel)-কৃত আদর্শস্বরূপ উদাহরণ— ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভবের ইতিহাস। এই ইতিহাসে ব্রোদেল একেবারে তৃণমূলে বাজারের নীচুতলায়, মানুষের বাজারের থলে আর রান্নাঘরে, ফড়ে আর পাইকারদের হিসেবের খাতায়, চাষা আর কারিগরদের কাজেকর্মে বিক্রিবাটায় ধনতন্ত্রের শিকড় খুঁজেছেন। অপরদিকে অন্য কোনও কোনও অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক পুঁজির প্রকৃতির বিশ্লেষণ করেছেন অথবা ধনতন্ত্রের কেন্দ্রগত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরেই জোর দিয়েছেন—জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, শেয়ার মার্কেট, অর্থ ব্যবস্থা, সরকারী নীতি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এই আয়ত স্তর এবং নীচের কণিক স্তর, এদের মধ্যে সেই

দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে যা রয়েছে structure এবং conjuncture-এর মধ্যে।

এখন, যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় কণিক সামাজিক স্তরে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রকাশ তবে কি ধরনের প্রশ্ন ওঠে? আমরা সকলেই জানি যে উচ্চতর স্তরে পুরোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বৈধীকরণ (delegitimation) ঔপনিবেশিক শক্তির প্রথম উদ্দিষ্ট। এইজন্য কেবল আইন প্রণয়ন বা প্রশাসনিক ঘোষণা যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ক্ষমতাকে রীতিমত চাক্ষুষ করবার জন্য চোখ ধাঁধানো দিল্লীর দরবার, মোগল বাদশাহকে সর্বসমক্ষে অপমান করতে রাজদ্রোহীতার অভিযোগে লালকিল্লাতেই তার বিচার, বড়লাটের দরবারে বাদশাহের অনুরূপ দরবার পুনঃসৃজন, আদালতে ইংরেজ বিচার ব্যবস্থার কিংবা প্যারেড গ্রাউণ্ডে ইংরেজ সৈন্যদের উৎকর্ষের বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ কিনা নতুন প্রভুত্বটিকে বৈধীকরণ এবং দৃষ্টিগোচর করার জন্য নানা নাটক। এগুলিকে নাটক না বলে ক্রিয়াকর্ম (rituals) বলাও চলতে পারে। এমিল ডুর্কহাইম (Emil Durkheim) রাজনৈতিক এরকম ক্রিয়াকর্ম ধার্মিক ক্রিয়াকর্মের অনুরূপ বলে দেখেছিলেন।

লোকে যখন ক্রিয়াকর্ম দেখে তখন কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। চিহ্ন দেখে আমরা বুঝি—যেমন অমুকের শোকচিহ্নাদি দেখে তার কেউ মারা গেছে, অমুকের গায়ে হলুদ মানে বিয়ে আসন্ন। অথবা ধার্মিক ক্রিয়াকর্ম বিনাও অন্য চিহ্ন আমরা পড়তে পারি—মাথার মুকুট মানে সে রাজা, কিংবা সেলাম করতেই ব্যস্ত মানে সে মোসাহেব। এরকম নানা দ্যোতক চিহ্ন (signifier) থাকে, প্রতীকী নিশানা। এইভাবেই লাটসাহেবের লাটত্ব, মহারাণী সার্বভৌমত্ব, জজ্ সাহেবের গুরুত্ব জাহির করা যেত কিছু ক্ষমতা চিহ্নের দ্বারা।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে উপনিবেশিত দেশে একই সংস্কৃতির সরিক নয় শাসক ও শাসিত জাতি, সুতরাং চিহ্নগুলি সকলের কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে। উপনিবেশিত নয় এমন সমাজে, যেখানে ক্ষমতার তারতম্যের সঙ্গে কে 'নেটিভ' কে 'সাহেব' এই পার্থক্যটা জড়িত নয়, সেখানে প্রাত্যহিক আচার-আচরণের তাৎপর্য সকলের জানা ; সেখানে উঁচুনীচু সব স্তরের মানুষ, ক্ষমতা যে জাহির করে এবং যে মেনে নেয়, তারা একই সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার অংশীদার। বিদেশী শাসিত ঔপনিবেশিক দেশে অবস্থা অন্যরকম—কেননা ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীন (এই বিরুদ্ধযুগ্ম বলাবাহুল্য আলোচনার্থে সরলীকরণ, এই দুইয়ের মধ্যে আচার-আচরণ ও ক্ষমতার দ্যোতক (signifier) একই সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত নয়। সুতরাং উপনিবেশে

আধিপত্য স্থাপনা করতে এমনসব দ্যোতক বা নিশানা বা ক্রিয়াকাণ্ড সৃষ্টি করতে হয় যার দ্বারা ক্ষমতা বা প্রভুত্ব স্পষ্টীকৃত হয়, জাতিগত ও সংস্কৃতিগত দূরত্বের বেড়া ডিঙিয়ে। কেমন করে ইংরেজরা ভারতে এই কাজটা সম্পন্ন করেছিল?

কল্পনা করা যাক দুইটি বৃত্ত। একটি বৃত্তের মধ্যে আছে এক গোছা চিহ্ন বা দ্যোতক, আর এক বৃত্তের মধ্যে আছে অপর এক গোছা। দুই বৃত্তের পরিধি জাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট। এক সময় ছিল যখন ইংরেজ-ভারত আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এই ছবির মতন—তখন একে অপরের আচার-আচরণ বিশেষ অবস্থায় মেনে নিত (যথা স্যার টমাস রোও যখন মোগল দরবারে, অথবা আকবর বাদশা যখন জেসুইট পাদ্রীদের সঙ্গে সামাজিকতা করেছেন)। ঔপনিবেশিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর উনিশ শতকীয় ভারতে এই দুই বৃত্ত পরস্পরচ্ছেদী দুই বৃত্তে পবিণত হলো। অর্থাৎ এই অবস্থায় দুই সংস্কৃতির অন্তর্গত দ্যোতক চিহ্নগুলি আলাদা রয়েছে দুই বৃত্তে, কিন্তু দুই বৃত্তেরই অন্তর্গত একটা সাধারণ এলাকার সাধারণ দ্যোতকগুলির তাৎপর্য নির্ণয় দুই বৃত্তের মানুষই একইভাবে করে থাকে—এই এলাকাকে সম-তাৎপর্যের প্রতিচ্ছেদ (hermeneutic intersection) বলা চলে। এই এলাকায় উপনিবেশিত দেশের শাসক ও শাসিত উভয়েই একই দ্যোতক চিহ্ন ব্যবহার করে। ইংরেজ-ভারতীয় আদান-প্রদানের, আচার-ব্যবহারের ইতিহাসে প্রথমদিকে চিহ্নগুলি সকলে ঠিক মতন পড়তে হয়ত পারতো না; যথা, সতেরো শতকের মোগল অভিজাতের চোখে যা ছিল উচ্চতর ক্ষমতার স্বীকৃতিস্বরূপ উপঢৌকন, ইংরেজদের চোখে সেটা আনুকূল্য পাওয়ার জন্য উৎকোচ প্রদান বা সাদা বাংলায় ঘুষ। কিন্তু এই তাৎপর্য বিভ্রাট কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে নানা দ্যোতক বা চিহ্ন দুই সংস্কৃতির মানুষের কাছেই স্পষ্ট হতে থাকলো, বিশেষ করে ক্ষমতার তারতম্যসূচক চিহ্নগুলি উনিশ শতকে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক শক্তির অপনয়ন (displacement) এবং নির্বৈধীকরণ (delegitimation) প্রক্রিয়ার সঙ্গে চলেছিল ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে এই ক্ষমতা চিহ্ন সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এই চেষ্টার একটা দিক হলো নতুন চিহ্ন সৃষ্টি (যথা, মহারাণীর ছবি-টবি আঁকা মেডাল, ইংলণ্ডীয় উপাধি ইত্যাদি), অপর দিকে অপর বৃত্তের পুরোন চিহ্ন অধিগ্রহণ (appropriation) করে সেইগুলিকেই কাজে লাগানো। অনেক সময়ে পুরোন চিহ্নের তাৎপর্য পাল্টে গিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে নতুন তাৎপর্য জন্ম নিলো, বিশেষ করে উপরোক্ত দুই বৃত্তের মধ্যস্থ সমতাৎপর্যের প্রতিচ্ছেদ (herme-

neutic intersection)। পুরোন দ্যোতক চিহ্নগুলিতে নতুন অর্থ যোগ করার ব্যাপারটা ঘটলো যেমন উঁচুমহলের ক্রিয়াকাণ্ডে, তেমনই সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে।

যা বলা গেল সেটা যাতে নিতান্ত বিমূর্ত তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার, মানে বিলকুল ধোঁয়াটে না মনে হয় সেজন্য ঐতিহাসিক তথ্য দরকার তর্কটাকে মাটিতে দাঁড় করাতে। এই কাজটা সহজ নয় কেননা আমরা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ যে প্রাত্যহিকতার মধ্যে তাৎপর্য খুঁজছি সেটা ইতিহাসের পাঠ্য নয় (বরং সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকেরা এই দিকে সচেতন দেখা যায়)। তবু ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করা অসম্ভব নয়। আমাদের তর্কটাকে মাটিতে দাঁড় করাতে আমরা মাটির খুব কাছেই যাবো, কেননা আমাদের উদাহরণ হবে ঔপনিবেশিক ভারতে জুতো বৃত্তান্ত।

আমার প্রথম উদাহরণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জুতো। এ নিয়ে নানা গল্প আছে। একটা হলো কিভাবে তিনি উচ্চপদস্থ সাহেবের দপ্তরে গিয়ে দেখেন যে পাদুকাশোভিত পদযুগল টেবিলের উপর স্থাপিত এবং কেমন করে বিদ্যাসাগর প্রতিশোধ নিলেন চটিজুতোশুদ্ধ পা টেবিলের উপর তুলে যখন ঐ সাহেব দর্শনপ্রার্থী। আর একটা গল্প হলো ছোট লাটসাহেব বা বাংলার গভর্ণর হ্যালিডে এবং বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে। বিদ্যাসাগর জীবনচরিত লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে দুইটি গল্প।

"হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধ-মতো তিনি বৃহস্পতিবারে নানা বিষয়ে কথোপকথনের জন্য ছোটলাট ভবনে যাইতেন। কিন্তু সেই দরিদ্রের চিরপ্রিয় বিদ্যাসাগরী চাদর গায়ে দিয়া, আর তালতলার চটি পায়ে দিয়া যাইতেন। ছোটলাট বহু অনুনয়বিনয় করিয়া অনুরোধ করায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকবার পেন্টুলন, চোগা, চাপকান ও পাগড়ী পরিশোভিত হইয়া অতি গোপনে শহর অতিক্রম করিয়া আলিপুরে বেলভেডিয়ারে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কার্যটা তাঁহার নিকট একটা অপকর্ম বলিয়া মনে হইত। এই সভ্যতাসঙ্গত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তিনি মনে করিতেন যেন সঙ সাজিয়াছেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ ও অসুবিধা হইত। দুই-তিনবার এইরূপ অপ্রীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া ছোটলাট-ভবনে যাতায়াত করার পর, বোধহয় চতুর্থ দিবসে, তিনি সাহেবকে বলিলেন 'এই আপনার সহিত আমার শেষ দেখা।' সাহেব চমকিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'কেন পণ্ডিত, কি হইয়াছে যে আর দেখা হইবে না?' স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিতে হাসিতে ছোটলাটের মুখের উপর বলিলেন ঃ 'কয়েদীর মতো যমযন্ত্রণাদায়ক পোশাক পরিয়া সঙ সাজিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কার্য আমার দ্বারা

হইবে না।' সাহেব ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত, যে পোশাকে আসিলে, আপনার সুখ ও সুবিধা হয় তাহাই করিবেন, এ বিষয়ে আমার পছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই।' (২৮) এই ঘটনার পর আর কখনও চটি জুতা, থান ধুতি, আর তাঁহার প্রবর্তিত বিদ্যাসাগরী চাদর পরিত্যাগ করেন নাই।" (পৃঃ ১০৪-৫)

"বোম্বাইয়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক কলিকাতা পরিদর্শনমানসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা যাদুঘর দেখাইতে যান। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে বহুবার ঐ বাটীতে গিয়াছেন, কিন্তু কখনও কেহ তাঁহার পাদুকা ত্যাগ করিতে বলে নাই। এবার কি কারণে বলা যায় না, সেখানকার দ্বারবানেরা তাঁহাকে পাদুকা ত্যাগ করিয়া যাদুঘরে যাইতে বলে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, যাদুঘরে চটি জুতা লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সেই বিদেশী ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন ; তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনাকে অন্য কোনো বন্ধুর সহিত পাঠাইয়া দিব। আমি আর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব না।' এই বলিয়া যখন চলিয়া আসেন তখন যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ সাহেব (কিউরেটার) এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বহুসাধ্যসাধনাতেও আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি তখন আর ঐ গৃহে প্রবেশ করিবেন না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। কর্তৃপক্ষদিগের নিকট এই ব্যাপার অবগত করায় তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহারা বিদ্যসাগর মহাশয়কে জানাইলেন যে, তিনি যখন যে পরিচ্ছদে ইচ্ছা যাদুঘর ও সোসাইটির আফিসে আসিতে পারিবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া লিখিয়া পাঠান যে, আমার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণের জন্য এক নিয়ম এবং আমার জন্য আর এক নিয়ম, এইরূপ নিয়ম বিপর্যয়ের প্রশ্রয় দিতে আমি কোন মতেই সম্মত নহি। যদি সাধারণের জন্য এরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় তবেই কেবল আমি সেই সাধারণ নিয়মের অধীন হইয়া যাতায়াত করিতে পারি, নতুবা বিশেষ নিয়মের সুযোগ লইয়া অপরের সঙ্গে নিজের এরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে সম্মত নহি। এই কলহে যাদুঘর ও সোসাইটির কর্তৃপক্ষ, তৎপরে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট, ক্রমে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট পর্যন্ত পত্র লেখালেখি হইয়া শেষে সরকারী জেদ বজায় রহিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণের পক্ষ সমর্থনে প্রয়াসী হইয়া যখন বিফলচেষ্ট হইলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও যাদুঘরের

দ্বার অতিক্রম করিবেন না।" (পৃঃ ৪৫১)

এই সময়ে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্র (৫. ২. ৭৪) ঃ—

To
H. F. Blandford Esqr.
Honry. Secry. to the
Trustees, Indian Museum
Sir,

Having had occasion to visit the library of the Asiatic Society of Bengal, I called on the 28th January last, and as I wore native shoes, I was not admitted, unless I would leave my shoes behind. I felt so much affronted that I came back without an expostulation.

Whilst I was in the compound, I saw the native visitors. wearing native shoes. were made not only to uncover their feet, but also to carry their shoes with their own hands. though there were some up-country people moving about in the museum room with their shoes on.

*

Besides, if persons so wearing shoes of the English pattern though coming on foot, could be admitted with shoes on, I could not make out why persons of the same status in life and under similar circumstances should not be admitted, simply because they happened to wear native shoes. &c.

*

এইসব গল্প আমরা শিশুপাঠ্য বইতে পড়ে থাকি। কি এর মানে? এই ঘটনাগুলির পাশাপাশি দেখা যাক আরও কয়েকটি ঘটনা যার দ্বারা পারিপার্শ্বিক ও লোকাচারের পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝতে সুবিধা হবে। উপরোক্ত চিঠির ঠিক পাঁচ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে সর্বপ্রথম ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি বা Resident জুতো না খুলে নিজামের সামনে উপস্থিত হলেন। এর আগে জুতো পরে কখনই ইংরেজরা ঢুকতেন না, রিচার্ড টেম্পল (R. Temple) তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন একথা ১৮৬৭ সালে তার নিজাম দরবারের অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু ১৮৬৯ সালে সণ্ডারস (Saunders) সাহেব অস্বীকার করলেন জুতো খুলে ঢুকতে, কেননা এটা 'প্যারামাউন্ট পাওয়ার' বা সার্ব-ভৌমত্বের পক্ষে অপমানজনক। ফলতঃ

সণ্ডরস এবং অপর ইংরেজরা জুতো পরেই নিজামের অভিষেক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করলেন। নতুন নিজাম আপত্তি করলেন না, তার বয়স তখন দু বৎসর আট মাস। হায়দ্রাবাদের ওমরাহরা আপত্তি করলেন, তা অগ্রাহ্য হলো। এই ব্যাপারটা এখন সামান্য মনে হয়, কিন্তু তখন বিরাট গুরুত্ব ছিল এর। গভর্ণর জেনরল লর্ড মেয়ো নিজে ইংলণ্ডে ভারত সচিব আর্গাইলকে লিখলেন যে আনন্দের কথা যে তাদের রেসিডেন্ট বন্ধ করেছেন একটা 'humilitating ceremony' ; এই বিষয় আরও বিবরণ ভারতী রায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত ইঙ্গ-হায়দ্রাবাদ সম্পর্কের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

আর একটা গল্প দেখা যাক। বিদ্যাসাগরের চিঠির সতের বৎসর আগে যখন তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ চলছে তখন পঞ্জাবে এই ঘটনা। কপূরতলা রাজ্যের শিখ সেনানী ও সর্দারেরা ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করছে ; তাদের খুশী করার জন্য জলন্ধরের কমিশনার এডওয়ার্ড জন লেইক (E. J. Lake) এবং বিখ্যাত সেনানায়ক জন নিকলসন সর্দারদের নিমন্ত্রণ করলেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন একজন সাবঅলটর্ণ যিনি পরে লর্ড রবার্টস ফিল্ড মার্শাল রূপে পরিচিত হন। রবার্টসের বয়ানে এই ঘটনা ঃ

''At the close of the ceremony Mehtab Singh, a general officer in the Kapurthala Army, took his leave, and, as the senior in rank at the durbar, was walking out of the room first when I observed Nicholson stalk to the door. put himself in front of Mehtab Singh and, waving him back with an authoritative air, prevent him from leaving the room. The rest of the company then passed out. and when they had gone. Nicholson said to Lake : 'Do you see that General Mehtab Singh has his shoes on ?'

Lake replied that he had noticed the fact, but tried to excuseit. Nicholson. however. speaking in Hindustani, said : 'There is no possible excuse for such an act of gross impertinece, Mehtab Singh knows perfectly well that he would not venture to step on his own father's carpet save barefooted. and he has only committed this breach of etiquette today because he thinks we are not in a position to resent the insult, and that he can treat us as he would not have dared to do a month ago.'' (Lord Roberts : Fortyone Years in India, London, 1898. p. 75)

শেষ পর্যন্ত মহতাপ সিংহকে বাধ্য করা হলো তার জুতো খুলে নিজ হাতে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে যেতে। লক্ষ্য করার বিষয় যে নিকলসন সাহেব হিন্দী ভাষায় কথা বলেছিলেন লেইক সাহেবের সঙ্গে, উপস্থিত ভারতীয়দের সমঝিয়ে দিতে যে জুতো পায়ে ইংরেজদের সমক্ষে আসাটা কতটা অপরাধ।

এখন এইসব গল্পগুলি থেকে কি শেখা যায়? প্রথমতঃ লোকাচার বা লোকব্যবহার—এমনকি জুতো পরা বা খোলার মতন আপতঃ তুচ্ছ ব্যাপার—এইগুলির রাজনৈতিক অর্থ রয়েছে। অনেক আপতঃ দৃষ্টিতে সামান্য দৈনন্দিন ক্রিয়াগুলির মধ্যে রাজশক্তি বা ক্ষমতাবানদের প্রতি কৃত্য সাংকেতিক রূপে রয়েছে—এগুলি আগে যাকে দ্যোতক চিহ্ন বা signifier বলেছি তার উদাহরণ। এর ফলে, দৈনন্দিন জীবনে যেসব দ্যোতকগুলি রয়েছে তার ব্যবহারের দ্বারা, একটা রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। এই ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার আর একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যখন ইংরেজ সরকার প্রাক্তন মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বিচারালয়ে আনে ১৮৫৮ সালে তখন তার আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেন ঃ "বিদ্রোহী সিপাহীরা আমাকে সেলাম অবধি করতো না। তারা জুতো না খুলে দেওয়ান-ই-খাস বা খাস দরবারে ইত্যাদি জায়গায় আসতো।" এই বিবৃতি পাওয়া যাবে বাহাদুর সাহের বিচারের সরকার প্রকাশিত বিবরণে। অর্থ পরিষ্কার ঃ যদি সিপাহীরা বাদশাহর সামনে জুতো পরে আসে তবে তাদের আজ্ঞাবহ প্রজারূপে মানা চলে না, সুতরাং তাদের বিদ্রোহের দায়িত্ব বাদশাহর ওপর বর্তায় না। পঞ্জাবে জন নিকলসন যে কাণ্ডটা করলেন দেখলাম সেখানে জুতো খোলা ব্যাপারটা একটা নাটকের মতন সাজানো হলো। উদ্দেশ্য হলো ঐ লোকব্যবহারের মধ্যে শাসক-শাসিত, ইংরেজ-নেটিভ সম্পর্কটিকে সর্বসমক্ষে দৃষ্টিগোচর করা।

গল্পগুলিতে দ্বিতীয় যে বিষয় লক্ষণীয় তা হলো যে সম্পূর্ণ ভারতীয় লোকাচারকে ইংরেজ শাসক দখল করে বা অধিগ্রহণ করে (appropriation) নিজেদের ক্ষমতা জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজে লাগিয়েছে। এই বিষয়ে আমি 'ইকনমিক এণ্ড পলিটিকাল উইকলি' (১৯৯১, সংখ্যা ২২-২৩) কাগজে একটা প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখেছি, তাই অলমতিবিস্তরেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক শক্তি জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন হয় সমতাৎপর্যের প্রতিচ্ছেদ (hermencutic intersection) এলাকায় কতকগুলি দ্যোতক চিহ্নের অধিগ্রহণ। দেশীয়দের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করাটা প্রয়োজন, কেবল শাসন ও দমনযন্ত্র যথেষ্ট নয়। সুতরাং

লোকব্যবহারের প্রতীকী অর্থ জেনে তাকে নিয়োগ করা ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আধিপত্য জাহির করার একটা প্রধান উপায়। এই প্রক্রিয়ার একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া গেলো জুতো বৃত্তান্তের মাধ্যমে। মৌহূর্তিক তুচ্ছতার মধ্যে, প্রাত্যহিক আচরণের মধ্যে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এইভাবে ক্ষমতা জাহির হয় এবং মেনে নেওয়া হয়। এই খেলাটার নিয়মগুলি বোধহয় ঐতিহাসিকদের খতিয়ে দেখা দরকার, কেননা কেবল ওপরতলার দিকে চোখ রেখে বড় বহরের ইতিহাসের জাল পাতলে পরে এই প্রাত্যহিক, আপাতঃদৃষ্টিতে তুচ্ছ ব্যাপারগুলোর অর্থ ও গুরুত্ব আমাদের এড়িয়ে যাবে।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে

"কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ ও বন্ধুগণ—

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ১০ম বার্ষিক সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দিতে পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত, কারণ এই সংগঠনটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করে প্রচার করতে দায়বদ্ধ।

আমি আজ ভারতের ঐক্যের সমস্যা নিয়ে বলতে চাই। ভারতের রাজনৈতিক একতার ও জাতীয় সত্তার সম্বন্ধে বোধ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। ব্রিটিশ দাসত্বশৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে এ বোধের জন্ম এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তা শীর্ষে পৌঁছেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর, একটি গণতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনার পর প্রয়োজন হয়ে পড়ল প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার এবং নিজ নিজ কর্মদক্ষতাকে ব্যবহার করে জীবনধারণের উপযোগী একটি ন্যূনতম মানে পৌঁছানর।

বৈষম্য দূরীকরণ

প্রথম প্রয়োজন শুধু আইন রচনা করে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই নয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যর মধ্যে জনসংখ্যার বড় অংশর জীবনে যে অপমান ও অধিকারহীনতা থেকে গিয়েছিল তা অপসারিত করার জন্য এগিয়ে যাবার উপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করা, যাতে তারা দেশবাসীর অপেক্ষাকৃত উন্নত অংশের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। অর্থনৈতিক অসাম্য সত্ত্বেও সব নাগরিকই মানুষের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন, যদি মানুষের সমানাধিকার নৈতিকভাবেও প্রাত্যহিক ব্যবহারে মানসিকভাবে স্বীকৃত হয়। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীব এবং অন্য বহু গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুতাপূর্ণ ব্যবহারের চেয়ে বেশী আত্মীয়তাবোধ মানুষের নিজ গোষ্ঠীতে থাকতেই পারে। কিন্তু সব গোষ্ঠীর প্রতিই পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ থাকা উচিত। প্রত্যেক মানুষের মর্যাদাকে সম্মান দিতে হবে সমস্ত গোষ্ঠীর সংকীর্ণতাকে

দশম বার্ষিক সম্মেলন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

অতিক্রম করে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সব ধরনের গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে, দেশের ও সারা বিশ্বের সাহিত্যকে ব্যবহার করতে হবে মানুষের মর্যাদার আদর্শের জয়গান করার জন্য। বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে যে কেন ও কিভাবে মানুষের মর্যাদা পদদলিত হয়, তার পিছনে কি মনোভাব কাজ করে এবং এই ধরনের অন্যায় রোধ করতে হলে কি ধরনের সংযম অভ্যাস করা উচিত, জ্ঞানার্জন করা উচিত। তারই পাশাপাশি মানুষের মর্যাদা লঙ্ঘিত হলেই তার খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত। সেইসব অন্যায় যেখানেই প্রতিরোধ করা হচ্ছে, সে খবরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত।

মানবিক মর্যাদা রক্ষায় শুধু আইনী ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়াও, গান্ধীবাদী পদ্ধতিতে সমস্যার মোকাবিলার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও উচিত। যে সব প্রচলিত রীতিনীতি ও অভ্যাস আমাদের সমাজে পুঞ্জীভূত হয়ে এইসব মানবিক অমর্যাদা ঘটায়, যথাযথভাবে সংগঠিত গান্ধীবাদী পথে তার অনেক কিছুই দূরীভূত করা যায়। তাছাড়া, এখন আমাদের দেশের অনেক ছাত্র আন্দোলনই যে পথে যাচ্ছে, এইসব পদ্ধতি গ্রহণ করলে আমাদের সেই যুবশক্তির কার্যোদ্যমকে অনেক উন্নত, মহনীয় ও সামাজিকভাবে অর্থবহ খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে।

শিক্ষার সুযোগ

দ্বিতীয় প্রয়োজন ব্যাপকভাবে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নিরপেক্ষ সকলের মধ্যেই প্রতিভার জন্য বিশেষ সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রতিভার বিকাশের সমস্যাকে ব্যক্তি-প্রতিভার সুযোগের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক হবে না। ভারতে এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পেরেছি, এমন দাবি করা সঙ্গত হবে না। আমি একথা বলছি না যে ভারতে প্রতিভাবান গরীবদের কোনও সুযোগই নেই। স্বাধীনতার পর, বেশ কিছু গরীব পরিবারের ছেলেমেয়ে সমাজে উঁচুতে স্থান করে নিতে পেরেছেন।

ভারতে যে সব সম্পদের এখনও সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমার মতে, মানবসম্পদ। ভারতে আজ আমাদের প্রয়োজন মানব সম্পদের বিকাশের জন্য একটি গতিশীল নীতি। তার জন্য চাই শুধু শিক্ষাব্যবস্থার, পঠন-পাঠনের পদ্ধতির, শিক্ষার মাধ্যমের, পাঠ্যসূচীর ও পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনই নয়, প্রয়োজন অজস্র বৃত্তির, প্রতিভা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার, যাতে দেশের অর্থনৈতিক

ও সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ অংশ তাদের প্রতিভার বিকাশের সুযোগ পায়। আমাদের দেশকে, চেতনার গভীরে বুঝতে হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য মানব সম্পদকে বিকশিত করা কত জরুরী প্রয়োজন।

আমার মতে চতুর্থ ও সর্বশেষ প্রয়োজন অর্থনৈতিক বিকাশের। সমাজতন্ত্রের মানে নয় দারিদ্র্যকে সমভাবে বন্টন করা। সমাজতন্ত্রর মূল কথা হচ্ছে যে সমাজের রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানুষের চেতনার পরিবর্তন এনে বিকল্প সামন্ততান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

সমাজতন্ত্র এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে সর্বসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা হবে ও সব মানুষের জন্য ন্যূনতম মর্যাদাময় জীবনযাত্রার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সমাজতন্ত্রে তাই যেমন সমভাবে সম্পদ বণ্টনের দিক আছে, তেমনই উৎপাদনের দিকও আছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির, বিশেষতঃ পশ্চাৎপদ দেশের অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে গেলে শুধু সাম্যের উপর জোর দিলেই চলবে না, কর্মদক্ষতার উপরও জোর দিতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়তে গিয়ে উৎপাদনের দিকটা অবহেলা করেছি।

অর্থনৈতিক বিকাশ

ধনতান্ত্রিক মনস্তত্ব থেকে আদর্শ ও কর্মোদ্যোগের প্রেরণা ধার করে কখনও একটা পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা যাবে না। ভারতে বর্তমানে রয়েছে একটি সজীব সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সচেতনতা। কিন্তু শুধু এর দ্বারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া যাবে না, যদি দেশের সমস্ত শ্রেণী ও রাজনৈতিক দল ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধকে বর্জন করে সম্পূর্ণ ভিন্নতর আদর্শ গ্রহণ না করেন। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের জন্য সামাজিক আদর্শবোধ ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ অনেক বেশী জরুরী।

এখন আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির যে হার রয়েছে, তা অদূর ভবিষ্যতে গণদারিদ্র্য দূর করার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়তে যে জাতীয় সঞ্চয় প্রয়োজন, তার অর্ধেকও এখন হয় না। উৎপাদন বন্ধ থাকা বা কর্মে অসঙ্গতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের অনীহা, একটা ব্যাপক হতাশা এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ দাবীর উপর জোর পড়া, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য উপযোগী উদ্দীপনা সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে

রয়েছে। আমার আশঙ্কা এর ফলে ভারতে অদূর ভবিষ্যতে একটি সমানাধিকারবাদী, ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার বদলে, শ্রেণীগত, অঞ্চলগত, ও অন্যান্য ভেদপন্থী সংঘাত জাতীয় চেতনাকে আচ্ছন্ন করে জাতীয় ঐক্য ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে বিপন্ন করবে।

তাই, সম্পদ সংগ্রহের ও বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের চিরাচরিত পথ ছেড়ে নতুনতর পথ গ্রহণ করতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং বাস্তবতার নেতৃত্ব দিতে হবে সমাজের উন্নততর অংশদেরই। এক অর্থে সমাজতন্ত্র একটা নতুন ধর্মের মত যা মানুষের চেতনায় ও ব্যবহারে রূপান্তর ঘটাতে চায়। তাই চাই আদর্শবাদী সন্ন্যাসীদের মতই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী আদর্শবাদী স্বার্থত্যাগী মানুষদের। আমি জানি এ কাজ সহজ নয়, কিন্তু এর চেয়ে কোনও সহজতর বিকল্প ভারতের মত দরিদ্র ও বিশাল দেশে কাজ হাসিল করতে পারবে না। তাই এই পথকে পরীক্ষা করারই আমি সপক্ষে। কিন্তু আমি আদৌ মনে করি না যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধ কোনদিনই ভারতে গণ-দারিদ্র্য দূর করে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুদিন আনতে সক্ষম হবে।

এই প্রেক্ষাপটে, ভারতের প্রয়োজন এমন একটা আদর্শের যা দেশের গরীব ও স্বচ্ছল সব মানুষকেই এক মিলিত কর্মোদ্যমে উদ্দীপিত করতে পারে— গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অহিংসা ও সমাজতন্ত্রর ভিত্তিতে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য। এটাকে একটা উম্মাদনায় পরিণত করাও দরকার—যার ধারক ও বাহক হবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতই আদর্শবাদী সমাজ-রূপান্তরের কাহিনী।

একথা জেনে আমি উৎসাহিত যে ১৯৭৮-এ তার জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্যর বাজী নিয়ে, ইতিহাসের ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা করে, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে কাজ করে চলেছেন। আমি তাঁদের এই আদর্শবাদী কাজে উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

গত দু বছর ধরে ভারতে সাম্প্রদায়িক ভেদপন্থার তাণ্ডব চলেছে। পশ্চিম-বঙ্গে র ছাত্র, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীরা প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছেন। আমি এ বক্তৃতা শেষ করব, ১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক মহাপ্রলয়ের যুগে মহাত্মা গান্ধী যা বলেছিলেন, সেই কথা দিয়েই—

"এই দাবানল গুণ্ডারা জ্বালায়নি, যারা গুণ্ডাতে পরিণত হয়েছে তারাই জ্বালিয়েছে। আমাদের সহানুভূতি ও পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া, গুণ্ডাদের কোনও দাঁড়াবার জমিই

থাকত না।.....ন্যায় আপনা থেকেই গড়ে ওঠে, অন্যায় তা নয়। ন্যায়ের চারিপাশে পরগাছার মত বাঁচতে চায় অন্যায়। যদি শুভশক্তিরা সমর্থন সরিয়ে নেয়, অন্যায় ও অশুভ শক্তির তখনই মৃত্যু হবে।" (হরিজন ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর ঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়)

ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

।। ১ ।।

আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা বেছে নেবার কারণ, সমস্যাটা আজকের দিনেও আমাদের ভাবাচ্ছে, যতটা রাজনৈতিক কারণে ততটা পড়াশুনার কারণে নয়। অবশ্য ব্যাপারটার সঙ্গে ইতিহাসের পঠন পাঠন ও পাঠ্য বই লেখার সমস্যাও জড়িত। এই জন্য আমার বক্তৃতায় তিনটে অংশ থাকবে—প্রথম অংশ একটু বড় করেই বলব—আর্য সমস্যার সৃষ্টি হল কিভাবে। দ্বিতীয় অংশে আসবে যেটা সত্যিকারের সমস্যা, একেবারেই এ্যাকাডেমিক সমস্যা; প্রথম অংশের বক্তব্য একটু বিশদ করে না বললে বোঝান যাবে না যে, এ সমস্যাটা কেন আজকের রাজনৈতিক আওতার মধ্যে এসে দাঁড়াল। এমন অবস্থায় এসে পৌছবার কিন্তু কথা ছিল না, বা প্রয়োজন ছিল না।

।। ২ ।।

প্রথমে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আমরা আর্য কথাটা ভুলে যাই। এখন থেকে চারশ বছরের মত সময় পিছিয়ে যাওয়া যাক। গোয়াতে ফ্লোরেন্সের বণিক ফিলিপ্পো সাস্‌সেত্তি ব্যবসা উপলক্ষ্যে এসেছিলেন ১৫৮৩ নাগাদ। সেই সময় ইউরোপ রেনেসাঁসের যুগ চলছে (ভারতবর্ষে তখন অনুরূপ কিছু হয় নি)। ইউরোপীয়রা প্রশ্ন করছেন কেন, কি, কোথায়, কি জন্য ঘটছে; ধর্মের গোঁড়ামি মানছেন না, মানুষের সার্বিক ক্ষমতা ও মনের অনুশীলনের উপরে জোর দিচ্ছেন; প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতি জানবার চেষ্টা করছেন। এই যুগের ও পরিবেশের মানুষ সাসেসত্তি নিজে কোনও উচ্চমানের বিদ্বান নন, কিন্তু তাঁর প্রথমেই মনে হল আমি যে ভাষায় কথা বলছি অর্থাৎ ইতালীয় (বা এর জননী লাতিন) ভাষার সঙ্গে ভারতের ভাষা সংস্কৃতির অদ্ভুত মিল দেখতে পাচ্ছি। কেন? তিনি অধ্যাপক ছিলেন না, তাঁর জিজ্ঞাসা কিছু চিঠিপত্রে এই সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রকাশের পরে থেকে গিয়েছিল। অন্তত তিনি আরও কি করেছিলেন তা আমি জানি না। কিন্তু তিনি একটা বড় প্রশ্ন মানব সমাজের সমানে তুলে ধরলেন ঃ- এক ভাষার সঙ্গে আর এক ভাষার এমন যোগাযোগ থাকে কেন? রেনেসাঁস কালীন ইউরোপে জোসেফ স্কালিগার (১৫৪০-১৬০৯) এ বিষয় একটা বই লিখলেন। তিনি

একাদশ বার্ষিক সম্মেলন (১৯৯৪), ইতিহাস সংসদ বার্তায় প্রকাশিত

ইউরোপের ভাষা গুলিকে চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করলেন। একই গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যোগাযোগের সন্ধান পেলেন। কিন্তু তিনি এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্পর্কের সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করলেন। এর অনেক বছর পরে জেমস পারসনস লিখলেন *The Remains of Japhet (being historical enquiries into the affinity and origins of European Languages)* (১৭৬৭)। বাইবেলে বলা আছে পৃথিবী বন্যায় ভেসে যাওয়ার পরে নোয়ার তিন ছেলে শেম, হ্যাম ও জাফেত এবং তাদের পরিবারদের নিয়ে পৃথিবীতে আবার বসতি শুরু হয়েছিল। পারসনসের বক্তব্য শেম বা হেম থেকে হেমাইট (ইহুদী, আরব ইত্যাদি), হ্যাম থেকে হ্যামাইট (মিশরীয়, কুশীয় ইত্যাদি) এবং জাফেত থেকে জাফেটিক জাতি ও সংশ্লিষ্ট ভাষারাজির সৃষ্টি হয়েছিল। পারসনস ভেবেছিলেন যে কেল্টিক, গ্রীক, ইতালিক (লাতিন, ইতালীয় ইত্যাদি) জার্মানিক (জার্মান,ডাচ ইত্যাদি), স্লাভিক (রুশীয়, পোলিশ ইত্যাদি) প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর মত ইন্দিক বা ইন্ডিক (যার মধ্যে ধরা হয়েছিল শুধু বাংলাকে) এবং ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠীগুলিরও পূর্ব-পুরুষ জাফেত ও তার পরিবারের ভাষা। পারসনস বাইবেলের কাহিনীকে সঠিক বলে মেনে নিয়ে এই ধরনের চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু এই চিন্তা তাঁকে পৌঁছে দিল এক ঐতিহাসিক সত্যে। তৎকালীন ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেকগুলি ভাষার মূলসূত্র রয়েছে এক আদিম ভাষার মধ্যে এটা মনে করা সম্ভবপর হল। এর প্রায় দুই দশক পরে ১৭৮৪ তে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির বার্ষিক অধবেশনে অভিভাষণ দিতে গিয়ে উইলিয়ম জোনস বললেন, সংস্কৃতের উৎপত্তির প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন, এই ভাষা গ্রীকের চেয়ে অনেক বেশী নিখুঁত, লাতিনের চেয়ে শব্দ সম্ভারে অনেক বেশী ধনী এবং উভয়ের চেয়ে অনেক বেশী পরিশীলিত। ধাতুরূপে ও ব্যাকরণের অন্যান্য ক্ষেত্রে গভীর মিল তাদের উৎপত্তির একই উৎসের ইঙ্গিত করে। এদের সাথে গথিক ও কেল্টিক আর প্রাচীন পারসীক জুড়ে দিলে মনে হবে সবই একটি ভাষাগত পরিবারের সদস্য। এইভাবে আধুনিক জগতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার গোড়াপত্তন হল। এর আগে ইউরোপে ভাষাতত্ত্ব শুরু হয়েছে। এবার এশিয়া ও ইউরোপের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের গবেষণার সূত্রপাত হল। এই সূচনাটুকুর বেশী জোনস এগোতে না পারলেও তিনি এক বিশাল সম্ভাবনা জাগিয়ে দিয়ে যান।

ইতিমধ্যে জার্মান পণ্ডিত মহলে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে এক বিরাট কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যে এক মননশীল জাতি যুক্ত ছিল, তাও স্বীকৃত হয়েছে। ইরানীয় অবেস্তর প্রাচীনতম গাথাগুলির সঙ্গে বৈদিক ভাষার এক বিরাট সম্পর্কের কথা আলোচিত হয়েছে। এই দুই-এর সঙ্গে যখন জার্মানের

মিল পাওয়া গেল তখন জার্মান পণ্ডিত মহল যথেষ্ট উদ্দীপিত হলেন। তখনও পর্যন্ত সমগ্র বিষয়টি পড়াশুনা বা এ্যাকাডেমিক স্তরে সীমাবদ্ধ, রাজনীতি তখনও আসে নি।

উনবিংশ শতকের গোড়ায় ইউরোপে এবং এশিয়ায় আলোচ্য ভাষাগুলির মূল উৎসের বা আদিম ভাষার ("Stammsprache") নাম দেওয়া হল ইন্দো-ইউপোরীয়। ১৮১৩ তে এই নাম দিলেন টমাস ইয়ং। ঐ শতকেরই প্রথম ভাগে এই আদিম ভাষা সম্পর্কে যথার্থ প্রাথমিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করলেন চার পণ্ডিত-ফ্রিড্রিক শ্লেগেল, জেকব গ্রীম, রামুজ রাসব, এবং ফ্রাঞ্জ্ বপ্প্ । এঁরা সম্মিলিতভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের প্রকৃত প্রতিষ্টাতা। ১৮০৮-এ শ্লেগেল তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার গোড়াপত্তন করলেন। অন্য তিনজন শব্দসম্ভার ও রূপতত্ত্বের মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বের গভীরে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অগাস্ট স্কলাইখার (August Schlicher)। তিনি আলোচ্য ভাষাগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে প্রাথমিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দ সম্ভার পুনর্গঠনের কাজে হাত দিলেন। যেমন, সংস্কৃতের "সজ্রস" গ্রাকের "এ্যাগ্রোস", লাতিন গ্র্যাগোব" গথিক "অগ্রস" ইত্যাদির মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলির নিয়ম মাফিক শব্দের রূপ ও অর্থের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে স্কলাইখার অনুমান করতে পারলেন যে, শব্দগুলির ইন্দো-ইউরোপীয় রূপ ছিল "অগ্রস", যার মানে "জমি"।

এই গবেষণা ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বিজ্ঞানের প্রায় পূর্ণ বিকাশ ঘটানেল কার্ল ব্রুগম্যান ও বার্থোল্ড ডেলব্রুক। তাঁদের গবেষণার ফল প্রকাশিত হল উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে।

এর অনেক আগেই অবশ্য এই বিদ্যাচর্চাকে জ্ঞানান্বেষণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়েছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণার ক্ষেত্রে রাজনীতি বা জাতি বিচারের প্রবণতার প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটল ১৮২৩ এ। জুলিয়াস ক্ল্যাপরথ বললেন যে এই ভাষা গোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয় নয়, এর নাম হওয়া উচিত ইন্দো-জার্মানিক, কারণ এর সঙ্গে প্রাচীন উচ্চ মার্গীয় জার্মান ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। তাই এর নাম দেওয়া হল ইন্দো-জার্মানিক। ক্ল্যাপরথ নরগোষ্ঠী বা রেসের কথা সরাসরি বলেন নি। কিন্তু জাতিতত্ত্বের বীজ এখানেই পোঁতা হল। এরপর দেখা গেল বুর্ণুফ, ল্যাসেন প্রভৃতি পণ্ডিতরা ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন। ইন্দো-জার্মানিক ভাষা ব্যবহারকারী ইন্দো-জার্মানরা নর্ডিক জনগোষ্ঠীভুক্ত। তারা কি রকম দেখতে? লম্বা মাথা, টিকাল নাক, ফর্সা, স্বর্ণকেশী এবং দশাসই চেহারার। তাঁরা কল্পনা করলেন এই রোমান্টিক অবয়বধারীরাই ইন্দো-জার্মানিক (ইন্দো-ইউরোপীয়) মানুষ হবার উপযুক্ত। ভাষার সাক্ষ্যের মধ্যে দিয়ে কোন জাতিকে খুঁজে পাবার এই চেষ্টার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় পেন্‌কার বিখ্যাত উক্তিটির—"Language is an organic product of an organism subject to organic laws"।

১৮৪৭ নাগাদ সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার পুরোধা জার্মান পন্ডিত ম্যাক্স ম্যূলার ভাষাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে "আর্য" কথাটির সমধিক ব্যবহার করলেন। অবশ্য তিনি কখনও নরগোষ্ঠী বা রেস (Race) অর্থে কথাটিকে ব্যবহার করননি। তাঁর প্রয়োজন ছিল সংস্কৃত ও সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলিকে আর্য নাম দিয়ে ভারতের আদিবাসীদের ভাষাগুলিকে এর থেকে পৃথক করা। অন্যদিকে ১৮৪৫ এ. জে.সি. পিচার্ড আলোচ্য ভাষাভাষী জাতিগুলির আদিম পূর্বপুরুষ হিসাবে এক নরগোষ্ঠীর কথা ভাবলেন, যার সদস্যরা কালক্রমে স্কান্ডিনেভিয়া থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সি. ল্যাসেন বললেন আর্যরা " সব চাইতে সংগঠিত, উদ্যমী ও সৃজনশীল জাতি"। এই জাতির আদিম পুরুষ গৌরবর্ণের বলে অনুমান করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভারতের আর্য গোষ্ঠী ভুক্ত (caste- এর) লোকেরা এই দেশের সবচাইতে গৌরবর্ণের মানুষ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য!

এই সব আলোচনায় নির্গলিত অর্থ সহজেই বোঝা যায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই প্রমাণ করা যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি আসলে ইউরোপকেন্দ্রিক। ইউরোপ থেকে এই ভাষা ও ভাষা ব্যবহারকারীরা ভারতে গেছে; এই উন্নততর বহিরাগতরাই ভারতবর্ষকে মহিমান্বিত করেছে। (তখনো পর্যন্ত সিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না।) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের সমর্থনে এর আগেই জে.মিল যে ইতিহাস লিখেছেন, তার মোদ্দা কথা ভারতে কিছুই ছিল না, যা কিছু ভাল ব্রিটিশ আমলেই হয়েছে। আর যদি উল্লেখযোগ্য কিছু থেকে থাকে তা বাইরে থেকে আমদানী করা। ১৮৫৮-তে জন উইলসন অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বহুপূর্বে যেমন আর্যদের এক শাখা ভারতে এসে দস্যুদের দমন করেছিল তেমনি ঐ জাতির আর এক শাখাভুক্ত লোকেরা অর্থাৎ ইংরেজরা ভারতের পূর্বের আর্যদের এবং দস্যুদের বংশধরদের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে। অতত্রব ব্রিটিশরা ভারতে আর্য শাসনের ন্যায্য ও সঙ্গত উত্তরাধিকারী।

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়দের (আর্যদের) জার্মানির উৎসের সন্ধান, ইংরাজ আর্যদের ভারত শাসনের ন্যায্য অধিকার এবং ভারতীয়দের আর্য ও অনার্য জাতিগোষ্ঠীতে বিভাজন ইত্যাদি প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সত্যিকারের গবেষণাও, অগাস্ট স্কলাইখার এবং জোহান্থের্স স্মিড্‌ট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উৎস ও ক্রমবিকাশের গতি ও প্রকৃতি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করলেন। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক কারণে আদি (early) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাঁষা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ভাষাকে দুটো বড়ো মাপের ভাগে ভাঁগ করা হল, একটি নাম কেন্তুম (Centum) এবং অন্যটির নাম সাতেম (Satem) এই বিভাজনের ভিত্তি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে শুধু এটুকু বললেই হবে যে এই বিভাজনের একটি ভৌগোলিক ভিত্তি বার করার চেষ্টা এক সময় হয়েছিল। একজন জার্মান পণ্ডিত ভেবেছিলেন যে পোল্যান্ডের ভিশ্চুলা নদীর পশ্চিমে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি কেন্তুম গোষ্ঠীভুক্ত, আর ঐ নদীর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি সাতেম গোষ্ঠীভুক্ত। তখন অবশ্য হিট্টাইট বা তোখারীয় (Tokharian)

কোনোটারই আবিষ্কার হয়নি। ভিশ্চুলা নদীর কাছেই বল্টিক সাগর, যার তীরভূমি প্রধানত জার্মানিক অঞ্চল। এই অনুমান ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের আদি বাসভূমি ঐ নদীর দুপাশে বলে চিহ্নিত করল। যদিও এই অনুমান পরে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে আমরা আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষীদের জার্মানিক বা তার কাছাকাছি অঞ্চলের একটি "জাতি" হিসাবে দেখানোর ইঙ্গিত পাই।

এইবার দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা বলতে হয়। একটি ঘটেছিল ১৮৮৭তেআর একটি ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, প্রথমটি মিশরের তেল-এল-অমরনা-তে আর দ্বিতীয়টি এখানকার তুর্কীর অন্তর্গত বোঘাজ-কোই অঞ্চলে। এই দুই জায়গায় যুগান্তকারী পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার ঘটে। তেল-এল অমরনা এর পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা গেল যে ১৩৮৫ থেকে ১৩৬০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে মাটির ফলকের উপরে লেখা চিঠি আসছে মর্যান্নি নামের এক গোষ্ঠী শাসিত মিতান্নিদের রাজ্য থেকে (যা ছিল উত্তর মেসোপটেমিয়া বা এখানকার সিরিয়া ও ইরাকের উত্তরাংশ)। পশ্চিম এশিয়া ও আরও অন্যান্য অঞ্চলে থেকে আসা নানা চিঠিতে হট্টি রাজার উল্লেখ আছে; একটি চিঠি হট্টি রাজ্যের অধিপতি সুপ্পিলুলিউমাসের (বা সুব্বিলুলিউমার) লেখা মিশরের রাজা অখেন-অটেনকে উদ্দেশ্য করে। মিশরের এই নৃপতির ও তাঁর বাবার রাজত্বের শেষ কয়েক বছরের পাওয়া (আঃ ১৩৮৫-১৩৬০ খ্রীঃ পূঃ চিঠিগুলির অধিকাংশ কীলকাকাকৃতি লিপি ও অক্কডীয় ভাষার লেখা। কিন্তু দুটি চিঠির ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখানে যেসব নামের উল্লেখ আছে তাদের অনেকগুলির চরিত্র ইন্দো-ইরানীস্ত (যেমন 'অর্তমন্য', 'অজবিয়', "যশ্দত" "শুত্তর্ন" 'স্বর্দুত' 'অর্তদস', 'বিরিদস্ব' প্রভৃতি)। এই নামগুলি ও উপরের দুটি অনাক্কডীয় চিঠির ভাষা প্রাচীন হট্টি রাজ্যের রাজধানী বোঘাজ-কোইতে (প্রাচীন হট্টুসস) আবিষ্কৃত মাটির ফলকের উপর লেখা চিঠিপত্র ও দলিলের অধিকাংশের ভাষার অনুরূপ। ফলকগুলি থেকে যেসব হট্টি রাজার নাম জানা গেছে তাদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতকের শেষ অবধি। অর্থাৎ এই সময়ে তুর্কীর একাংশে ইন্দো-ইউরোপীয়দের ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত একটি ভাষা প্রচলিত ছিল। এখানে আবিষ্কৃত চুক্তিপত্রে নাসত্য (ন-স-অত্-তি-ইঅ) , মিত্র (মি-ইত-ত্র), বরুণ (উ-রু-বন) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। আমরা যেমন বৈদিক ভাষায় দেখি 'সেরকম দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যবহার এখানে লক্ষ্য করা যায়। কিক্কুলি নামের এক মিতান্নি রচিত ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকাতে 'ঐক', 'তের', "পঞ্জ", "সত্ত" প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উল্লেখ আছে। এইগুলির সঙ্গে ইন্দো-ইরানীয়, বিশেষত প্রাচীন বৈদিক, ভাষার সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন "এক" বোঝাতে ঐক শব্দটির ব্যবহার,—যার সঙ্গে ইরানীর "ঐব" শব্দটির চাইতে ভারতীয় "এক" শব্দটির সম্পর্ক গভীরতর। অবশ্য ভাষাটি পুরোপুরি প্রাচীন ভারতীয় বা ইরানী নয়; তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতকে ইরাক ও সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে

ও তুর্কীর এক অঞ্চলে ইন্দো-ইউরোপীয় লক্ষণযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট একটা ভাষা ব্যবহৃত হত। হট্টি রাজ্যের এই ভাষাকে আধুনিক কালে নাম দেওয়া হয়েছে হিট্টাইট (যদিও এটা হট্টির আদি ভাষা নয়। তাই কোন কোন পণ্ডিত এই ভাষা-ভাষীদের শহর "নেসা-র" নাম অনুযায়ী একে নেসাইটি বা নেসীয় বলতে আগ্রহী)। এই ভাষাভাষীরা (যাদের হিট্টাইট নামে ডাকা যেতে পারে) তুর্কীর আদি বাসিন্দা নন, এরা বহিরাগত। নানা 'লেখর' ভিত্তিতে আনুমানিক ১৯৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তুর্কীতে তাদের আগমন আন্দাজ করা যায়। খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতকে ব্যাবিলোনীয়া অঞ্চলে যে কস্সাইট জাতি দখল করেছিল, তার ভাষাতে ইন্দো-ইউরোপীয় উপাদন সুস্পষ্ট ("সুরিয়স" = সংস্কৃত সূর্য, "বুগশ" = সংস্কৃত "ভগ", স্লাভিক "বগু'; বিভক্তি চিহ্ন "অশ" (ash) = গ্রীক-"ওস" (os))। সুতরাং দেখ্য যাচ্ছে যে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পাদে পশ্চিম এশিয়ার কোন কোন অংশে ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীরা বা তাদের কোন শাখা বসবাস শুরু করেছিল। এটা আমাদের হাতে একটা বড় প্রমাণ।

খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতকে উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় বা তৎ-সংশ্লিষ্ট এক ভাষা-ভাষীদের (অর্থাৎ হিট্টাইট বা নেসীয়দের) উপস্থিতির কথা মনে রেখে আমরা এখন তাদের আদি বাসস্থানের সন্ধানের চেষ্টা করতে পারি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষীদের উপরে একটি জাতির চরিত্র আরোপ করে তার সঙ্গে "আর্য" নামের যোগ এবং এদের এক জার্মানিক জাতি গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করার প্রয়াসের কথা আগেই বলা হয়েছে। আমরা ভাষার সঙ্গে জাতির অঙ্গাঙ্গী যোগ সম্পর্কে কার্ল পেন্‌কার মতও উল্লেখ করেছি। ১৮৮৩-তে পেন্‌কা তাঁর ইচ্ছামত ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও উপাখ্যানগত বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে আর্য জাতির উ ৎপত্তি দক্ষিণ স্কান্ডিনেভিয়াতে অর্থাৎ ইউরোপের উত্তরাংশে। "শক্তিশালী, পরিশ্রমী, স্বর্ণকেশী ও লম্বা মাথাবিশিষ্ট" আর্যজাতি সম্পর্কে এই মতের সমর্থনে এগিয়ে আসলেন রুডলক্ ভিরচো, টমাস হাক্সলি ইত্যাদির মত কিছু বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ। মজা হচ্ছে যিনি ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় "আর্য" কথাটির ব্যবহার করেছিলেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও "আর্য জাতি" সম্বন্ধে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিলেন, সেই ম্যাক্স ম্যুলার স্বয়ং এই "আর্যজাতি, আর্য রক্ত, আর্য চোখ ও চুল" সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বলে অভিমত দিলেন। তৎসত্ত্বেও "নর্ডিক আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব" সম্পর্কে ভাবনা চিন্তাবিদদের মহলে আলোড়ন তুলে রাজনৈতিক মহলে ঢুকে পড়ল। এই মতবাদ পরবর্তীকালে নানাকারণে সেমিটিক জাতি বিরোধী নাৎসীরা কাজে লাগিয়েছিল।

অনেক পন্ডিত অবশ্য ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান ইউরোপের উত্তরে বলে বিশ্বাস করেননি। তাঁরা বিভিন্নভাবে ও ভিত্তিতে ইউরোপ বা এশিয়ার তৃণভূমির নানা অংশে, বা অন্যান্য কিছু অঞ্চলে (এমনকি উত্তর মেরুতেও) আর্যদের উৎপত্তি খুঁজবার চেষ্টা করেছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইন্দো-ইউরোপীয় ধারণা ও সমস্যার উৎস

এশিয়া ও ইউরোপের কিছু প্রাচীন ভাষায় (যাদের অনেকের বর্তমান বংশধর বা উত্তরাধিকারীও আছে)। এইগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে-এদের মধ্যে প্রায় সমোচ্চারিত ও সমার্থক অনেক শব্দ আছে, এবং আরও আছে ধাতুরূপ, শব্দরূপ, ও বাক্যগঠনের নিয়মে যথেষ্ট মিল। প্রাচীন কালে যোগাযোগের রীতিমত সুযোগের অভাবের যুগে, এই পরিকাঠামোগত মিল পরস্পর থেকে অনেক দূরে উদ্ভূত বা ব্যবহৃত ভাষাগুলির মধ্যে সম্ভবপর ছিল না। কাজেই কোনও একসময়ে এইগুলি বা এদের পূর্ববর্তী ভাষারূপগুলি কোনও একটি অঞ্চলে বা পরস্পরের সন্নিকটবর্তী কিছু অঞ্চলে আবির্ভূত এবং ব্যবহৃত হয়েছিল। এইগুলির মূলে একটি আদিমভাষাও থাকা সম্ভবপর। এই আদিম ভাষা বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কয়েকটি ভাষা একটি নরগোষ্ঠী বা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি নরগোষ্ঠীর পক্ষে ব্যবহার করাও অসম্ভব ছিল না। সুতরাং আদিতে ভাষার সঙ্গে জাতির কোন গভীর সম্পর্ক না থাকলেও, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির অভিপ্রয়াণ ও বিবর্তনের কালে নানা দেশ ও জাতির সঙ্গে তাদের নিঃসন্দেহে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ফলে আজকে কোনও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে বা জাতিকে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য বলে চিহ্নিত কার অসম্ভব।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের পুরাতন বাসভূমির সন্ধানে কাজে লাগান যেতে পারে আলোচ্য প্রাচীন ভাষাগুলির সমোচ্চারিত ও সমার্থক শব্দগুলিকে (যাদের মধ্যে রূপের আপাত প্রভেদ ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী ব্যাখ্যার যোগ্য) [যেমন সংস্কৃত "পিতা" (<* পিতর), গ্রীক "প (T) তের", লাতিন "পাতের',, টিউটনিক "ফাদার" = পিতা; সংস্কৃত "রথ", লাতিন "রোত", কেল্টিক "রথ্", লিথুয়ানীর "রাতস্" = রথ; সংস্কৃত "অশ্ব", প্রাচীন ইরানীর "অস্প", গ্রীক "ইপ্পোস" (হিপ্পোস), প্রাচীন উচ্চমার্গীয় জার্মান "হ্রোস" = ঘোড়া ; ইত্যাদি]। এই শব্দরাজির সাহায্যে আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার তৈরী কার যেতে পারে এবং তার সাহায্যে তাদের বাসস্থানের ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। এই জাতীয় পদ্ধতিকে বলা যায় linguistic palaeontology বা ভাষাতাত্ত্বিক ফসিলবিদ্যা। ও. স্রডার গত শতকের শেষের দশকে ও এই শতকের গোড়ার দিকে এই পদ্ধতির সাহায্যে আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় (আর্য) সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা করবার চেষ্টা করেন। আবার প্রাচীন ইরানীয় ও বৈদিকভাষার শব্দরাজির আদি কালেই অর্থের বিবর্তনের (Semasiological evolution)-এর আলোচনা করে ডব্লু. ব্রাণ্ডেনস্টাইন একটু অন্য রকম সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তিনি দেখেছেন যে প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় ভাষা, অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রর তুলনায় একটি প্রাচীনতর অবস্থার ইঙ্গিত করে। এইসব বিতর্কে বা সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে না গিয়েও বলতে পারা যায় যে উপরোক্ত প্রথম পদ্ধতিটি সাধারণভাবে আমাদের কাজে আসতে পারে।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী মনে করা যায় যে আলোচ্য অঞ্চলটি ছিল একটি মহাদেশীয় ভূখন্ড (ব্রান্ডেনস্টাইননের মতে খুব সম্ভবত কোনও পাহাড়ের নিকটবর্তী তৃণভূমি) যেখানে দ্রুতগামী ঘোড়ার লালনপালনের যেমন সুবিধা ছিল, তেমনি আবার ভালুক, বীরব ইত্যাদির বাসের উপযুক্ত কিছু ঝোপ ঝাড়ও ছিল। এখানে সম্ভবত কোন এক জাতীয় শস্য উৎপন্ন হত। এই দেশের মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে যেত। এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই তিন ঋতুর প্রাধান্য ছিল। এইরকম দেশে ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রিয় ঘোড়া ও রথের ব্যবহারে কোনও অসুবিধা ছিল না। স্রডারের মতে এই ভুখন্ড ছিল (পূর্বতন) সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণাংশের তৃণভূমি অঞ্চলে।

সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড এর মতের সমর্থনে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন যে, আলোচ্য অঞ্চলের বিভিন্ন মাটির ঢিবি যুক্ত কবর (কুরগান) খুঁড়ে এক ধরেণের মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে যারা ছিল লম্বা এবং সুগঠিত চোয়াল, সরু নাকও লম্বা মাথাওয়ালা—এক কথায় নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত। এদের সঙ্গে পাওয়া গেছে ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রিয় পশু ঘোড়ার হাড় ও অন্যান্য নিদর্শন, যেগুলি চাইল্ডের মতে আর্যদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাম্প্রর্তিকালে মারিয়া গিনিবুটাস আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ থেকে ৩৫০০ মধ্যে দক্ষিণ ইউক্রেনের ডন ও নীপার নদীর অন্তবর্তী অঞ্চলে এবং খৃঃ পূঃ ৩৫০০ থেকে ২৫০০ এর মধ্যে ভল্‌গা নদীর কাছে ঘোড়ার ব্যবহারকারী ইন্দো-ইউরোপীয়দের উপস্থিতির পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন।

মুস্কিল হচ্ছে যে চাইল্ড স্রডারের দেওয়া যে ভৌগোলিক তথ্যগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি কি ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসভূমির সম্পূর্ণ চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে? অন্তত ব্রান্ডেনস্টাইন তা মনে করতেন না। তিনি এই আদি বাসভূমি উরাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণস্থ তৃণভূমিতে নির্দিষ্ট করেছিলেন। পি. গাইলস ভাষাতাত্ত্বিক ফসিলবিদ্যা মেনে নিয়েও আলোচ্য আদি বাসভূমি নির্দিষ্ট করেছেন পাহাড় ঘেরা হাঙ্গেরীর সুজলা ও শষ্যশালী নীচু সমতলভূমি এবং তৎসংলগ্ন ঘোড়া পালনের উপযুক্ত তৃণভূমি মত অঞ্চলে (অবশ্য এখানে যে বীচ গাছ পাওয়া যায় তাকে তিনি ভুলবশত আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষীদের পরিচিত বলে মনে করেছেন)। এই সব মতের চাইতেও বড় কথা হল ঘোড়ার সঙ্গে শুধুমাত্র ইন্দো-ইউরোপীয়দেরই গভীর সম্পর্কের প্রমাণ করার চেষ্টা। কিন্তু এই সম্পর্কের উপর এত জোর দেওয়া হবে কেন? প্রাচীন কালের অনেক যাযাবর জাতির কাছেই ঘোড়া ছিল নিত্য সঙ্গী। খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দেও এইরকম যাযাবর জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব নয়।

গর্ডন চাইল্ড তাঁর মত প্রমাণ করতে পারেন নি। কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয়দের নর্ডিক জাতি-গোষ্ঠী-ভুক্তি সম্পর্কিত তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে আদি ইন্দো-ইউরোপীয়দের তদানীন্তন জগতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ খোঁজার চেষ্টা করে আধুনিককালের এক মিথ্যা জাত্যাভিমানকে (অজ্ঞাতে?) সমর্থন করেছিলেন। ১৯২৬-এ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত

The Aryans গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন যে 'the fact that the first Aryans were Nordics was not without importance. The physical qualities of that stock did enable them by the bare fact of superior strength to conquer even more advanced peoples and so to impose their language on areas form where their bodily type has almost completely vanished. This is the truth underlying the panegyrics of the Germanisis, the Nordic superiority in physique fitted them to be the vehicles of a superior language"। এই মতবাদ নিঃসন্দেহে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের নাৎসীদের পছন্দের যোগ্য ও তাদের উৎসাহবর্ধক।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদিবাসভূমির জন্য নানা দেশে বৃথা অনুসন্ধানের পর আসা যাক ভারতীয় উপমহাদেশে, যেখানে প্রাচীন কালে এক সময়ে তাদের ও তাদের ভাষার উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ইন্দো-ইউরোপীয় (বা তথাকথিত আর্যরা) এখানকার আদিবাসী না বহিরাগত। পণ্ডিতদের মধ্যে অধিকাংশই (পশ্চিমী পণ্ডিতদের প্রায় সবাই) আর্যদের বহিরাগত বলে দাবী করেন।

এই দাবীর সমর্থনে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ হাজির করেছিলেন মর্টিমার হুইলার। মহেঞ্জোদারোর শেষ পর্বের অনেকগুলি নরকঙ্কাল অস্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া গেছে। কতগুলি ক্ষেত্রে মনে হয় যেন এই কঙ্কালধারী মানুষদের মৃত্যু একই সঙ্গে হয়েছিল। কঙ্কালগুলির কয়েকটির ওপর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। হুইলারের মতে এগুলি হঠাৎ কোন বহিরাক্রমণের ফল। তিনি রায় দিলেন যে মহেঞ্জোদারোতে অন্তিম পর্বের এই তাণ্ডব ("ইন্দ্রের নেতৃত্বে") আর্যদের আক্রমণের সাক্ষ্য বহন করে। ঋগ্বেদে তো ইন্দ্র নগর সংহারক "পুরন্দর" অভিধানে চিহ্নিত। অতত্রব হুইলারের সিদ্ধান্ত হরপ্পীয় সভ্যতার উপরে শেষ আঘাত হেনেছিলেন বহিরাগত আর্যরা। আর্যরা যে বাইরে থেকে এসেছিলেন এটা যেন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কখন এই আক্রমণ ঘটেছিল, কাকে উৎখাত করা হল এটাই যেন একমাত্র সমস্যা।

সুখের কথা এই যে, হুইলারের এই ব্যাখ্যা বহু ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ এবং পশ্চিমের অনেক পণ্ডিত মানেন নি। হুইলার নিজেও পরে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ শুধুমাত্র একটা বহিরাক্রমণ হতে পারে না। হরপ্পা সভ্যতার মত বৃহদায়তন ও দীর্ঘস্থায়ী পতনের এবং এর অবলুপ্তির পিছনে নানা কারণের সমাহার থাকতে পারে এবং বিভিন্ন এলাকায় পতনের কারণগুলিও আলাদা আলাদা হতে পারে।

এছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমে আর্যদের উপস্থিতির যে সব পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, তাও কিছু সন্দেহাতীত নয়। যে প্রধান সূত্রগুলির সঙ্গে আর্যদের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে ঘোড়ার উপস্থিতির

সাক্ষ্য। আর্যদের সঙ্গে ঘোড়ার যোগ অনস্বীকার্য; কাজেই ঘোড়ার ব্যবহার নিঃসন্দেহে একটা বড় সূত্র। যাযাবর গোষ্ঠীর কাছে ঘোড়া একান্ত অপরিহার্য। স্কুথদের বা শকসমেত Scythian দের কাছেও ঘোড়া ছিল অপরিহার্য। ঘোড়ার ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতার যুগে ভারতীয়রা কি একেবারেই জানত না? এখন তো প্রত্নতাত্ত্বিকরা দাবী করছেন যে ঘোড়ার ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতার আমলেও ছিল, তার নমুনাও তারা হাজির করেছেন।

মহেঞ্জোদারো র প্রথম দিকের এক অংশ উৎখননের ফলে একটি ঘোড়ার ছোট অনুকৃতি পাওয়া গিয়েছিল। ঐ জাতীয় প্রাণীর আরও একটি পোড়া মাটির তৈরী প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল লোথালে। কচ্ছের সুরকোটাদাতে ঘোড়ার শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড় পাওয়া গেছে। এগুলি প্রমাণ করে হরপ্পা সভ্যতার এই সব শহরগুলিতে ঘোড়ার ব্যবহার জানা ছিল। যদিও এই সভ্যতার সঙ্গে এই প্রাণীর সম্পর্ক আর্যদের সঙ্গে এর সম্পর্কের মত এত গভীর নাও হতে পারে (যদি আমরা মনে করি আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার জনক নয়। সে সমস্যা আমাদের আজকের বিচার্য বিষয় নয়)। এখানে এই প্রসঙ্গে Gandhara Grave Culture-এর অন্তর্গত তিমর্‌গরহ নামক প্রত্নস্থলের সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বিভিন্ন যুগের সমাধিগুলির তৃতীয় পর্বের (আনু খ্রীঃ পূঃ নবম—ষষ্ঠ শতকে) ঘোড়ার দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সাক্ষ্যের তারিখ আর্যদের উপ-মহাদেশে সম্ভাব্য তারিখের অনেক পরের। সুতরাং এখানকার ঘোড়া আর্যদের ঘোড়া নাও হতে পারে। তেমনি চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের (painted grey ware) ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতার কয়েকটি বসতিতে একেবারে শেষের দিকে শুরু হয়ে থাকলেও (যার ইঙ্গিত এখন পাওয়া গেছে হরিয়ানার ভগবানপুরা, পাঞ্জাবের কাটপালান, জম্মুর মাঞ্জা প্রভৃতি স্থানে) এটা আর্যদের উপস্থিতির একটা প্রমাণ বলে ধরা যায় না। প্রকৃতপক্ষে P.G.W-এর নিয়মিত ব্যবহারের যুগ এবং উত্তর ভারতে লোহার আবির্ভাবের প্রত্নতত্ত্বগত তারিখ আর্যদের প্রথম উপস্থিতির সম্ভাব্য তারিখের অনেক পরে। (নীচে দ্রষ্টব্য)। প্রত্নতত্ত্ব P.G.W বা লোহার সঙ্গে আর্যদের অবিচ্ছেদ্য যোগ প্রমাণ করতে পারে না। তাই অনেকেই এখন বলেছেন আর্য সমস্যা এক "প্রত্নতাত্ত্বিক মরীচিকা" বিশেষ। এই সমস্যা ভাষাতাত্ত্বিকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভালো।

আমরা এখন সংশ্লিষ্ট ভাষাতত্ত্বের একটা দিক অর্থাৎ "আর্য" কথাটির অর্থগত বিবর্তনের আলোচনা করতে পারি। কথাটি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে নিশ্চয়ই আছে। ঋগ্বেদেই আর্যদের দস্যুদের থেকে পৃথক এবং দস্যু (বা দাস)-দের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে (১, ৫১, ৮; ১, ১৩, ৮; ১, ১৫৬, ৫; ৬, ২৫, ২ ইত্যাদি)। এখানে বৈদিক ভাষাভাষীদের থেকে অবৈদিক লোকদের আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ অবৈদিক দস্যুরা কালো চামড়ার মানুষ (১, ১৩০, ৮)। মনে হয় যে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদেরই প্রথমে আর্য নামে ডাকা হত। এটা মোটামুটি ভাবে একটা ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। এর বিরোধীরা

কালো রঙের হবার দরুন খানিকটা বর্ণের ইঙ্গিতও আছে, তবে সেটা গৌণ। পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভূত বিস্তারের কালে তিনটি উচ্চবর্ণকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে) আর্য অভিধা দেওয়া হয়েছিল (শত পথ ব্রাহ্মণ, ৪,১,৫)। আরও পরে আর্য-অনার্য জাতিবাচক বিভাজন হয়েছিল। আর্যাবর্তের অধিবাসীকেও "আর্য" বলা হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন ভারতে আর্য বলতে সাধারণত ভাবে "অভিজাত" "সম্মানীয়" "শ্রদ্ধেয়" ইত্যাদি বোঝাত। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে ভারতীয় উপমহাদেশে "আর্য" শব্দটি আদিতে একটি ভাষা ও সংস্কৃতি এবং তাদের অনুগামীদের বোঝাত।

পুরাতন (old) ইরানীয়র (অবেস্তীয় ও পুরাতন পারসীক) সঙ্গে বৈদিক ভাষার বিশেষ সম্পর্ক আছে। পুরাতন পারসীকে রচিত হখামনিশীয় (Achaemenid) বংশের নৃপতি দারয়বৌষ (বা Darius) তাঁর নাক্‌শ-ই-রুস্তম লেখতে নিজেকে যেমন একজন "পার্সর পুত্র পার্স" (অর্থাৎ পারসীকদের ছেলে পারসীক) বলেছেন, তেমনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি "অরিয়" (= আর্য)। এই সম্রাটের (৫২২-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ) বেহিস্তান লেখতে দাবী করা হয়েছে যে এটি "আর্যভাষায়" (অরিয়া) লেখা এবং এটি বেহিস্তানের স্তম্ভগাত্রে রাজার আদেশে উৎকীর্ণ হবার আগে মাটির ফলকের ও (তারও আগে?) পার্চমেন্টের উপরে লিখিত হয়েছিল। কাজেই প্রাচীন ইরানে আর্যবংশ ও আর্যজাতি এবং আর্যভাষার ধারণা গড়ে উঠেছিল। আরও পরবর্তীকালে সসনীয় রাজাদের আমলে বিভিন্ন লেখতে নৃপতিদের অইরানিন (ঐরানিন)ও অনইরান (অনৈরান) এলাকার শাসক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। অইর বা ঐরদের দেশ (অর্থাৎ আর্যবসতি) অর্থে এরান (< ঐরান) তথা ইরান নামটির উদ্ভব। অতত্রব যা অইরদের এলাকা নয় তাই অনইরান। এখানে নামটির একটি এলাকাগত ব্যঞ্জনাও আছে। কাজেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না যে প্রাচীন আমলে আর্য কথাটি শুধুই ভাষা বোঝাতে ব্যবহৃত হত এবং জাতি, গোষ্ঠী বা এলাকা বোঝাত না। অন্তত প্রাচীন পারস্যে আর্য শব্দটি ভাষা এলাকা, নরগোষ্ঠী এই তিন অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য এখানে কথাটি প্রথমে একটি ভাষা, এবং পরে ঐ ভাষাভাষীদের ও তাদের পালিত অঞ্চলকে বোঝাতে পারে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যে নামটি তিন অর্থেই প্রচলিত হয়েছিল ইরান দেশে। বৈদিক যুগের অন্তত প্রথম দিকে ভারতে হয়তো আর্য কথাটির জাতিবাচক ব্যঞ্জনা দেখা দেয়নি।

পূর্ব মধ্য এশিয়াতে (বর্তমান চীনের সিন-কিয়াং বা খিন-জিয়াং প্রদেশে) আবিষ্কৃত কয়েকটি তোখারীয় বা তুখারীয় (Tokharian) রচনায় "আর্শি-কান্তুবা" বা আর্যভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে যে তোখারীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে বলব, আর্য বলতে প্রধানত ভাষাগোষ্ঠীকেই বোঝান হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কালেই নরগোষ্ঠীকেও চিহ্নিত করতে আর্য কথাটি প্রযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য দ্বিতীয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন কালে অনিয়মিত।

এই আর্য ভাষাভাষী বা জাতির আদি বাসভূমি নির্ধারণের ব্যাপারে সনাতন পন্থী ভারতীয় পণ্ডিতরা গত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ক্রমশ সরব হয়ে উঠেছেন। এর আগে বাল গঙ্গাধর তিলক শাস্ত্রানুসারী গোঁড়া পণ্ডিতই ছিলেন, কিন্তু তিনিও আর্যদের আদি বাসভূমি ভারতে নির্দেশ কবেননি। আদিমতম আর্য বসতি যে ভারতবর্ষই ছিল, এই মত প্রচারের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলেন মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, ডি. এস.ত্রিবেদী প্রভৃতি। তাঁরা জোর দিয়ে বললেন, কেন ধরে নিতে হবে যে আর্যরা ভারতে বহিরাগত? আর্যদের জ্ঞাত সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল বৈদিক সাহিত্য, বিশেষত ঋগ্বেদ। এতে বাইরে থেকে আর্যদের আগমনের কোন স্মৃতিরই ইঙ্গিত নেই। সুতরাং আর্যরা আদিকাল থেকে ভাবতবর্ষেরই (বা তার উত্তর-পশ্চিম অংশের) বাসিন্দা ছিলেন। বহির্ভারিতে অভিপ্রয়াণের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় লোকদের ভাষার সংস্পর্শে এসে অন্যান্য আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়) ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। গঙ্গানাথ ঝা আর্যদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন উত্তর-পশ্চিম অংশের ব্রহ্মর্ষি দেশে। ভারতে আদিমতম আর্য বসতি প্রমাণের এই হল সূচনা। এরপর আরও কয়েকজন পন্ডিত এই ব্যাখ্যার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁদের কারো মতে আর্যদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাব আবার কারো মতে তা উত্তর-পশ্চিমের কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থিত। শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রী ঋগ্বেদের চুলচেরা বিচার করে রায় দিলেন, আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের ভৌগোলিক ধারণা অবিভক্ত পাঞ্জাবের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে সীমিত। তার বাইরের জগৎ ঋগ্বেদে যদি প্রতিফলিত না-ই হয়ে থাকে, তবে কেন মানতে হবে আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন?

এই বক্তব্যগুলির মধ্যে কিছু যুক্তি ছিল, হয়ত জাত্যাভিমানও ছিল—কিন্তু সরাসরি রাজনীতি ছিল না। রাজনীতির স্পর্শ লেগেছে গত দুই দশক ধরে। পণ্ডিত মহলে রাজনীতির আঁচ লাগার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল ১৯৯১ সালে। বাঙ্গালোরে মিথিক সোসাইটি 'এরিয়ান প্রব্লেম' শীর্ষক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এখানে জোরালো ভাবে সওয়াল করা হল যে হরপ্পা সভ্যতা আসলে আর্য সভ্যতারই অংশ বিশেষ; আর্যরা ভারতে বহিরাগত নন; ভারতই আর্যদের আদিবাসভূমি। সেই আলোচনা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আর্যরা বাইরে থেকে এসেছেন এমন দাবী বা মত প্রকাশ করার মত প্রবন্ধও ছিল। কিন্তু সভায় যে সব লেখা ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছিল সেগুলি থেকে, এবং আলোচকদের অনেকের বক্তব্য শুনে বা সংগঠকদের কারও কারও সঙ্গে কথা বলে এটি আহ্বানের পিছনে যেন কিছু রাজনীতি ছিল বলে আমার মনে হয়েছিল। উদ্যোক্তরা স্পষ্ট করে না বললেও উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। যদি দেখানো যায় যে মহেঞ্জোদারো, ঋগ্বেদ ও পরবর্তী সংস্কৃতি এক ও অবিচ্ছিন্ন একটি ধারা, এবং খ্রিঃ অষ্টম শতক অবধি সেই ধারা প্রবাহমান, তাহলে বলা যাবে ভারত ইতিহাসে বহিরাগত উপাদান আর্যরা বা আর্যধর্ম নয় বরং ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামকে

ভারতে থাকতে হলে সনাতন সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে বা মিশে যেতে হবে। এটাও ইঙ্গিত দেওয়া হল যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একশৈলিক (monolithic)। এই কথা কিন্তু একেবারেই সত্য নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়—তার যেমন কতকগুলি সর্বভারতীয় চরিত্র আছে, তেমন অনেকগুলি স্থানীয় ও পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যও আছে। তবে এই বিষয় আমার আজকের বিচার্য নয়।

সনাতনপন্থীদের যুক্তি ও উদ্দেশ্যর মধ্যে আপত্তিকর অনেক কিছু আছে। কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করা যাবে না যে আমাদের হাতে এখন পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ নেই যা দিয়ে অকাট্যভাবে দেখান যাবে যে আর্যরা বহিরাগত হিসাবে ভারতে ছিলেন। ঘটনা হল ভারতকে যাঁরা আর্যদের আদি বাসস্থান বলে দেখাতে ইচ্ছুক, তাঁদের হাতে তর্কাতীত তথ্য নেই; আবার আর্যদের আদি বাসভূমি যারা ভারতের বাইরে প্রমাণ করতে চান, তাঁদের কাছেও অকাট্য সাক্ষ্য নেই। ফলে পণ্ডিত মহলে এ নিয়ে বিতণ্ডা অব্যাহত আছে।

এই অবস্থার সুযোগ একদল রাজনীতিবিদ নিচ্ছেন এবং তাঁদের মতের সমর্থক কিছু বিদ্বান ব্যক্তিও তাঁদের ধারণাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রচার করছেন। এক সময়ে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাভাষীদের রাজনীতি ও জাত্যাভিমানের খাতিরে উত্তর ইউরোপের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল। আবার এদের কাজে লাগান হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায্য অধিকার প্রমাণের ও শাসনের সুবিধার জন্য। আজকে আর্যবাদ ব্যবহৃত হচ্ছে দেশীয় রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে। রাজনীতি ও এ্যাকাডেমিক সমস্যা একাকার হয়ে যাচ্ছে। ভয়টা এখানেই।

।। ৩।।

তাহলে আমরা এখন আর্য ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? গত দুশ বছরের গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইন্দো-ইউরোপীয় তথা আর্য ভাষা গোষ্ঠীর ব্যাপ্তি বিশাল—আজকের ভূগোল অনুযায়ী ইউরোপের প্রায় সর্বত্র এবং এশিয়ার অনেকাংশে। এই ভাষাগুলির প্রাচীনতম স্তরে যে মিল আছে, তা শুধু আপাত দৃষ্টির মিল নয়। এই মিল উচ্চারণগত, অর্থগত, রূপগত ও কাঠামোগত। এই সাযুজ্য একদিনের হতে পারে না। অতি প্রাচীনকালে এই প্রাচীনতম স্তরের ভাষাগুলির অবস্থান নিশ্চয় ছিল পরস্পর সন্নিহিত এলাকায়। অথবা এদের জননীস্বরূপ কোনও ভাষার ব্যবহারকারীরা একটি অঞ্চলে বাস করত। পরে নানা কারণে এবং এক বা বিভিন্ন সময়ে এই আধিবাসীদের ভিন্ন অংশ অন্যান্য দেশাভিমুখে অভিপ্রয়াণ করেছে এবং কালক্রমে বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিবর্তন হয়েছে।

প্রাচীন স্তরে উচ্চারণের সময়ই এই ভাষাগুলির মধ্যে তালব্য 'ক' (palatal sound 'k') এর ব্যবহার ছিল। পরে কোনও কোনও ভাষার মধ্যে তালব্য "ক" রয়ে গেল,

কোনও কোনওটিতে তালব্য 'ক' এর বদলে তালব্য 'শ' এল [যেমন গ্রীক "হে-কাতোন (এক+কাতোন)", লাতিন "কেন্তুম", অবেস্তীয় "সত" প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo Aryan) "শতম"= শত]। ভাষাবিদরা এই দুই গোষ্ঠীর নাম দিলেন যথাক্রমে "কেন্তুম"(Centum) ও "সাতেম"(Satem)। Indo-Aryan বা ভারতীয় আর্যভাষা (যার মধ্যে সংস্কৃতও আছে) 'সাতেম' গোষ্ঠীভূক্ত।

কেন্তুম গোষ্ঠীর মধ্যে আছে গ্রীক, লাতিন, জার্মানিক বা টিউটোনিক (গথিক), কেল্টিক এবং তোখারীয় বা তুখারীয় (Tokharian) ভাষাগুলি। সাতেম গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য (সংস্কৃত =বৈদিক ও লৌকিক), প্রাচীন ইরানীয় (অবেস্তীয় এবং প্রাচীন পারসীক লেখমালার ভাষা), আর্মেনীয়, আলবেনীয় এবং বাল্টো-স্লাভিক। এই দুই গোষ্ঠীর ভাষাগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি ভাষা শ্রেণী বলে ধরলে তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষা খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন ভাষা শ্রেণীর যে ভাষাগুলি প্রাচীন চরিত্রের, তারা হচ্ছে প্রথম স্তরের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। অবশ্য এগুলির সব কয়টির এখনও পর্যন্ত জানা সবচাইতে পুরাতন রচনাগুলি একই কালের নয়। এদের মধ্যে যেমন প্রাচীন যুগের রচনা সমেত বৈদিক ভাষা গ্রীক, প্রাচীন ইরানীয়, লাতিন ইত্যাদি আছে, তেমনি আছে তোখারীয় বা তুখারীয়, যে ভাষায় লেখা কোনও সম্পূর্ণ রচনার তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বের নয়। আবার তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের বিচার অনুযায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বাল্টো-স্লাভিক শ্রেণীর বাল্টিক শাখার লিথুয়ানীয় ভাষা খুবই আদিম। অনেকের মতে জ্ঞাত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে আদিমতম, কিন্তু এই ভাষায় রচিত ও আমাদের পরিচিত প্রাচীনতম রচনাবলীর তারিখ খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ভাগের আগে নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানত ভাষাগত চরিত্রের ভিত্তিতে প্রথম স্তর নির্ধারণ করা যায়। প্রথম স্তরের অন্তর্গত প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ও প্রাচীন ইরানীয় (বিশেষত অবেস্তীয়) ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে নানা গরমিল থাকলেও অনেক মিল আছে; এমন কি একটা গভীর সম্পর্কের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। মনে হয় যে এই দুটি ভাষাভাষীরা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা কোনও সময়ে এক অঞ্চলে বাস করেছিল, পরে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদ প্রাক-বৈদিক যুগেই হওয়া উচিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা শ্রেণীর বিবর্তন প্রথম স্তরেই থেমে যায় নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কথাও জানা আছে। যেমন ইরানীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় স্তরে ছিল কয়েকটি মধ্য ইরানীয় বা পারসীক ভাষা (সুগদীয় বা সোগডিয়ান, বাহ্লীক বা বাকট্রিয়ান, পার্থব (পার্থিয়ান), শক, পহ্লবী, ইত্যাদী) এবং তৃতীয় স্তরে উদ্ভব হয়েছিল নূতন

(নব্য) পারসীকের (ফার্সীর)। ভারতীয় আর্য ভাষার বিবর্তনেরও দ্বিতীয় (মধ্য) ও তৃতীয় স্তরের অস্তিত্বের কথা বহুজন স্বীকৃত। নব্য স্তরের (New Indo-Aryan) বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আমাদের বাংলাও আছে। সেইরকম গ্রীক শ্রেণীতে আছে আধুনিক গ্রীক, লাতিন শ্রেণীতে আধুনিক ইতালীক ভাষারাজি (ইতালীয়, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ বা ফরাসী ও রোমানীয়) এবং জার্মানিক শ্রেণীতে আছে জার্মান, ডাচ্, ড্যানিশ, সুইডিশ্, নওরেজীয়, ইংরাজী ও আইসল্যান্ডীয়। আমরা বাল্টো-স্লাভিক শ্রেণীর নব্য-স্তরের বল্টিক ভাষাগুলির মধ্যে আধুনিক লিথুয়ানীয় ও লাটভীয় এবং স্লাভিক ভাষাগুলির মধ্যে রুশীয় ও পোলিশের কথা বলতে পারি।

নানা কারণে মধ্য ও নব্য স্তরের ভাষাগুলির বিবর্তনের সময় পুরাতন বৈশিষ্ট্যের লোপ ও পরিবর্তন হয়েছে এবং নূতন বৈশিষ্ট্য এসেছে। সুতরাং আর্যসমস্যার ক্ষেত্রে ভাষার সাক্ষ্য আমাদের প্রথম স্তর থেকে নিতে হবে।

প্রথম স্তরে ভাষাগুলির ভিতরে পরিকাঠামোগত মিল একটি আদি জননীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত করে। একে আমরা আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বলতে পারি। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হিট্টাইট (বা নেসীয়) প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সংশিষ্ট হলেও একটি সহোদরা ভগ্নী না বলে জ্ঞাতি ভগ্নী বলা উচিত। এই জ্ঞাতি ভগ্নীটির সঙ্গে কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার (Old-Indo-Aryarn-এর) বিশেষ মিল আছে, শব্দরূপে (হিট্টাইট "ঐক্য-বর্তন", প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার "এক বর্তন", ইত্যাদি) ও ভাষার প্রতিফলিত সাংস্কৃতিক চিত্রে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে হিট্টাইট ও মিতান্নিদের পূজনীয় দেব ইন-দ-র=ইন্দ্র ঋগ্বেদে মহাপ্রতাপশালী দেবতা (ইরানীয় অবেস্ততে নন)। এদের যুক্তিপত্রে উক্ত বরুণের নাম বেদে নিশ্চয় আছে, কিন্তু অবেস্ততে নেই। এছাড়া চুক্তিপত্রে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদের (অশ্বিনীদ্বয়কে) যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় অনুরূপ ক্রম ঋগ্বেদের এক সূত্রে পাওয়া যায় (অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা - ১০, ১২৫, ১)। হিট্টাইটের সঙ্গে জ্ঞাতি ভগ্নী প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিশেষ সম্পর্কের কথা বিশ্বাস করলে, এই দ্বিতীয় ভাষাটির একটি মাসীমার এবং আদি ইন্দো-ইউরোপীয়র একটি নিজের বোনের প্রয়োজন। এই বোনের নাম দেওয়া যেতে পারে আদি হিট্টাইট এবং এই দুই বোনের মার নাম হবে প্রাক-বা প্রায় (Proto) ইন্দো-ইউরোপীয়। কোনও কোনও পন্ডিত এদেরও এক উৎসর কথা ভেবেছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দো-হিট্টাইট (হিট্টাইটের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিশেষ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে)। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না।

এই বিশাল ভাষা মন্ডলের অন্তর্গত আদি ইন্দো-ইউরোপীয় (তুলনামূলক ভাষা

বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনর্গঠিত), ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর প্রাথমিক স্তর এবং ঐ স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত হিট্টাইট ভাষা আমাদের বিবেচ্য। (এই বিবেচ্য ভাষাশ্রেণী ও প্রাথমিক স্তরগুলির একটি তালিকা এই বক্তৃতার অনুলেখনের সঙ্গে ছাপা হয়েছে)।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ করার আগে তোখারীয় ভাষা (টোখারীয়ান) সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। চীনের সিন্-কিয়াং (বা খিন-জিয়াং) প্রদেশের কয়েকটি স্থানে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে উৎখননের ফলে যেসব মধ্য এশীয় ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি কেন্তুম গোষ্ঠীর একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় লেখা, যা সংস্কৃত বা কোন শ্রেণীর প্রাকৃত নয়। কয়েকটি পুঁথির পুষ্পিকার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই ভাষাকে "তোখারী টোখারীয়ান নামে চিহ্নতি করা হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদেই। এই ভাষায় পুঁথিগুলির কোনটি প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয় ভাগের আগের তারিখের নয়। কিন্তু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তোখারী বা তুখারী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাশ্রেণীর প্রথম স্তরের। এই ভাষার দুটি ভাগ বা উপভাগের কথা জানা গেছে—একটিকে বলা হয় "তোখারীয় ক" (টোখারীয়ান-এ) এবং অন্যটি "তোখারীয় খ" (টোখারীয়ান-বি)। প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয় ভাগে প্রথমটি চলত প্রাচীন অগ্নিদেশে (বর্তমানে সিন্-কিয়াং-এর কারাশহর অঞ্চলে) এবং দ্বিতীয়টি ব্যবহৃত হত প্রাচীন কুৎসী বা কুচিতে (ঐ প্রদেশের কুচা অঞ্চলে)। আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি সংস্কৃত-তোখারীয় শব্দ তালিকায় (বা প্রাথমিক অভিধানে) লেখা হয়েছে যে "তোখারিকা মানে কুচীর স্ত্রীলোক" (তোখারিকা কুচঞ্ঞে ইঞ্চকে)।

এটা ঠিক যে এই ভাষায় লেখা কোন বই প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয় ভাগের আগে পাওয়া যায়নি। কিন্তু খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয়-প্রথম শতকে সিন-কিয়াং ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চলে এই ভাষার অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে চীনা গ্রন্থ শি-চি তে (খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ও প্রথম শতকের গোড়ার দিকে লেখা)। এই তোখারী বা তুখারী ছিল ইউ-এচ-চি উপজাতির মাতৃভাষা অথবা (আমাদের বর্তমান ধারণা অনুযায়ী) তাদের ব্যবহৃত ভাষা গুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এদের সঙ্গে জাতিগত ভাবে চীনাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না, এরা ছিল বহিরাগত। চীনা গ্রন্থ ই-চৌ-শুর সাক্ষ্য অনুযায়ী চৌ বংশের শাসকদের রাজসভায় এদের (বা এদের প্রতিনিধিদের) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় খুব প্রাচীন কালেই। ঐ বইতে দেওয়া ইঙ্গিত অনুসারে এই তারিখ নির্দিষ্ট করা যায় আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০০ অব্দে। সুতরাং কেন্তুম ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত তোখারী বা তুখারী ভাষাভাষীর খ্রিঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দের গোড়াতেই বা তারও আগেই বর্তমান চীনের পশ্চিমাংশে হাজির হয়েছিলেন কোন এক পশ্চিমের অঞ্চল থেকে -মধ্য এশিয়ার পশ্চিম বা উত্তর পশ্চিম ভাগ বা আরও পশ্চিম থেকে। চীন অঞ্চলে এদের দীর্ঘকাল উপস্থিতির এবং চীনাদের সঙ্গে যোগাযোগের একটা

ইঙ্গিত পাওয়া যায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী এবং চীনা ভাষার মধ্যে কিছু ব্যাকরণগত ও কয়েকটি প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের অর্থগত মিলের মধ্যে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির প্রথম স্তর এবং তার জ্ঞাত প্রাচীনতম নমুনাগুলির ভিত্তিতে আমরা ইন্দো-ইউরোপীয়দের উপস্থিতি সম্পর্কিত কয়েকটি অঞ্চল ও তারিখের কথা ভাবতে পারি। খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়াতে হিট্টাইট (নেসীয়) ভাষীরা উত্তর-পশ্চিম এশিয়াতে (তুর্কী অঞ্চলে) এবং খ্রিঃ পূঃ চতুর্দশ শতকে এখনকার সিরিয়া ও ইরাকের উত্তর অঞ্চলে উপস্থিত ছিল। এদের সঙ্গে ভারতীয় আর্য ভাষাভাষীদের সাংস্কৃতিক যোগ থাকতে পারে। ভারতে আর্য-ভাষীদের উপস্থিতি নিশ্চয় ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলি রচনার আগেই। এই রচয়িতাদের লীলাভূমি প্রধানত সপ্তসিন্ধু অঞ্চল। এরা গ্রামীণ সভ্যতার লোক। নগরকেও জানে কিন্তু পছন্দ করে না। তাদের দেবতা ইন্দ্রকে সুরক্ষিত নগর ধ্বংস করার জন্য আহ্বান জানায়, প্রার্থনা করে। নগর বিরোধী এই সমাজের সপ্ত সিন্ধু অঞ্চলে উপস্থিতির একটা সম্ভাব্য কাল হচ্ছে হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার যুগ, যে সময় উত্তর-পশ্চিমে সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। সুতরাং এই সভ্যতার অবনতির আগেই অর্থাৎ আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিঃ পূঃ-র পূর্বেই আর্যভাষীরা ভারতীয় উপমহাদেশে উপস্থিত—আরও অনেক প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসী হিসাবেই হোক, অথবা তার কিছুকাল আগে বহিরাগত হিসাবেই হোক। এই নগর বিরোধীরা নগর সমৃদ্ধ হরপ্পা সভ্যতার জনক হতে পারে না। এরা এই সভ্যতার কয়েকটি কেন্দ্রকে আক্রমণ করে থাকতে পারে, কিন্তু ঐ সভ্যতার পতনের জন্য আর্য ভাষীরা একমাত্র বা প্রধান কারণ ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বৈদিক ও প্রাচীন ইরানীয় ভাষাভাষীদের বিশেষ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করলে আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে কোনও এক সময়ে এদের পূর্বপুরুষেরা এক অঞ্চলে বসবাস করত। এটি উত্তর পশ্চিম ভারত বা ইরানীয় ভূখণ্ডের বাইরে হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এখনকার তুর্কমেনিস্তানের তোগোলোক অঞ্চলে একটি আনুমানিক ১৮০০-১৫০০ খ্রিঃ পূঃ-র ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত নানা পান-পাত্রের তলানি হিসাবে আফিংয়ের বীজ এবং এফিড্রা গাছের নির্যাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। অগ্নিকুণ্ডেও এফিড্রার নির্যাসের দাগ পাওয়া গেছে। বোধ হয় এফিড্রার নির্যাস আহুতি দেওয়া হয়েছিল। এই নির্যাস সোমরস থেকে অভিন্ন বলে কয়েকজন পণ্ডিতের ধারণার। যদি তা ঠিক হয় তা হলে মধ্য এশিয়ার তুর্কমেনিস্তান অঞ্চলে ১৮০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ সোমরস ভক্ত (সংস্কৃত) "সোম" (<*সউম)=ইরানীয় ("হউম") ইন্দো-ইরানীয়রা উপস্থিত ছিল।

ঘোড়া যদি প্রথম থেকেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষীদের একান্ত প্রয়োজনীয় পশু

হয়ে থাকে, তা হলে তা লালন পালনের জন্য সুবিধাজনক তৃণভূমিতেই বা তৎসংলগ্ন কোন অঞ্চলে তাদের আদি বাসস্থান হওয়া স্বাভাবিক। সেই বাসভূমি ইউরেশিয়াতে হওয়া উচিত। কারণ কেবল এই ভূখণ্ডেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা শ্রেণীর প্রাথমিক স্তরের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। তবে ঠিক কোন তৃণভূমি তা সঠিকভাবে বলা সম্ভবপর নয়। এই প্রথম স্তরের ভাষাগুলিতে "ট" বর্গের অক্ষরের বা মূর্ধণ্য "ষ"-এর কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষারাজিতে এদের বহুল উপস্থিতি লক্ষণীয়। ভারত থেকে ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীরা বাইরে গিয়ে থাকলে অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রথম স্তরে এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ছিল। অন্যদিকে ভারতীয় আর্যভাষা বাইরে থেকে এসে থাকলে এই বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় ভাষা ভাষীদের সংস্পর্শে আসার ফলে সংস্কৃতে এসে থাকতে পারে। কিন্তু এখন আবার দুই-একজন পন্ডিত এই বৈশিষ্ট্যের অন্য উৎস খুঁজবার চেষ্টা করেছেন।

সুতরাং আজ যা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তা হচ্ছে বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যে সম্পর্কের কথা। এই সম্পর্ক নিশ্চয় ইঙ্গিত করে যে কোনও এক সময় এই ভাষাগুলির জননী আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ইউরেশিয়ার কোন এক ভুখণ্ডে ব্যবহৃত হত। এই ভাষাভাষীরা শস্য উৎপাদন করত বলে ঐ অঞ্চলে তারা অন্তত কিছু কালের জন্য মোটামুটি স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। সেখান থেকে এক বা একাধিক কারণে এবং এক বা (বোধহয়) বিভিন্ন সময়ে এই ভাষাভাষীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ধরণের অভিপ্রয়াণের শুরু খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়াতেই বা তার আগে। খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম তিন পাদে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং বা সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীরা বাস করেছিল পশ্চিম এশিয়াতে। এই সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে তারা মধ্য এশিয়ার এক অংশেও উপস্থিত ছিল বলে মনে হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এরা খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগ থেকেই বা তারও আগে থেকেই বসবাস করেছিল।

।। ৪ ।।

এর বেশী, নতুন তথ্য আবিষ্কার না হওয়া অবধি বলা যাবে না। তবে আমরা যদি "আর্য" কথাটি ভুলে গিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীদের চিন্তা করি, তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশে বহিরাগত এই ইরানীয় ভাষাভাষী শকদের এবং তোখারী বা তুখারীভাষী ইউ-এচ-চিদের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। ইউ এচ-চি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কুষাণ রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে এদের তুখার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে ইউ-এচ-চিদের আদি ভাষা ছিল তুখারীয়, যদিও বক্ষু বা আমু দরিয়ার দুইদিকে রাজ্য স্থাপনের পরে তারা বাহ্লীক দেশে বাহ্লীক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তুখারীয়র মত বাহ্লীকও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা, যদিও দ্বিতীয় বা মধ্যম স্তরের। যাই হোক প্রাচীন ভারতে

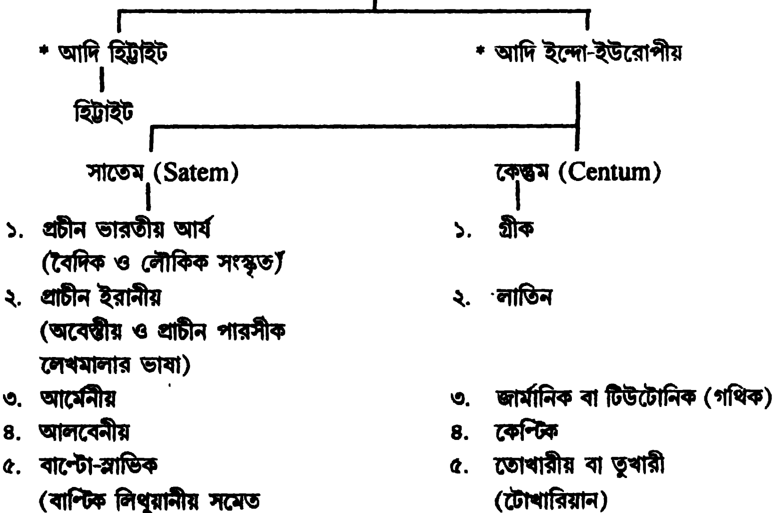
দুই প্রবল বহিরাগত শক্তি শক ও কুষাণ ভাষা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়। সুতরাং ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীদের সঙ্গে এই উপমহাদেশের যোগ বিভিন্ন ভাবে ও সূত্রে।

অনেক দিন ধরে একটি ভাষা কোনও জনগোষ্ঠী ব্যবহার করলে তাদের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধ্য। সুতরাং মনে রাখতে বাধা নেই যে প্রাথমিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি এবং তাদের ব্যবহারকারী নরগোষ্ঠীরা পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি যে প্রাচীন ইরানে ছিল "আর্যবংশ" এবং "আর্য" ভাষা। কিন্তু উৎস হচ্ছে ভাষা নরগোষ্ঠী নয়। এখানে ভাষার সঙ্গে জনগোষ্ঠীর যোগ সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক নয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় সমস্যা মূলত ভাষাতত্ত্বের সমস্যা। কিন্তু ভারতের তথা বিশ্বের ইতিহাসে ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষীদের গুরুত্ব অসাধারণ। আজও পৃথিবীর জনসাধারণের এক বিশাল অংশ এই জাতীয় বা এই বংশীয় ভাষারাজিতে কথা বলে।

সুতরাং সমস্যাটা এড়ানো যাবে না, উচিতও নয়। বরং প্রতিটি ইতিহাসের ছাত্রকে খোলা মনে খোলা চোখে বিষয়টির চর্চা করতে হবে। কিন্তু এই চর্চার ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব পড়বে না বা রাজনীতিতে এই চর্চাকে টেনে আনা চলবে না। এই অপচেষ্টা বাদ দিয়ে নূতন তথ্যের অনুসন্ধান হোক, বিতর্ক চলুক। "বাদে বাদে জায়তে সত্যম্"। বিতর্কের মধ্য দিয়ে সত্য একদিন প্রকাশিত হবে—যা গোষ্ঠীবদ্ধ নয়, তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারাজির উৎস ও প্রাথমিক বিস্তারের সারণি



সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি
(SELECT BIBLIOGRAPHY)

Allchin, B. and R.	*The Rise of Civilization in India and Pakistan*, Cambridge, 1983.
Baldi, P.	*An Introduction to the Indo-European Languages*, Carbondale, 1983.
Banerjee, S. R	*A Handbook of Sanskrit Philology*, Calcutta, 1987.
ibid (editor)	*Essays on Indo-Europeans Linguistics* Calcutta, 1990.
Bopp. F.	*Vergleichende Grammatik der Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Lituanischen, Gottischein and Deutschen*, 3 vols, Berlin, 1832-33, 3rd edition, 1868-70.
Brandenstein, W.	*Die erste Indogermanische Wanderung*, Vienna, 1936.
Brugmann, K. and Delbruck. B.	*Grundriss der vergleichenden Grammatiki der Indogermanischen Sprachen* (translated into English by Wright J., Conway, R. S., and Rouse, W.H.D.), 5 vols, London. 1888-1895.
Buck, C. D.	*A Comparative Dictionary of the Indo-European Languages*, Chicago, 1949.
Childe, V. Gordon	*The Aryans,-A Study of the Indo-European Origins,* London, 1926.
	New Light on the Most Ancient East, London, 1954.
Deo, S. B. and Kamath, S. (Editor)	*The Aryan Problem, Pune*, 1993.
Ghosh, B. K.	"The Aryan Problem", *The Vedic Age* (edited by Majumdar, R. C.), London, 1951, pp. 201p.
	"The Origin of the Indo-Aryans", The Cultural Heritage of India, Vol. I, 2nd edition, Calcutta, 1958, pp. 129f.
Giles, P.	*"The Aryans", The Cambridge History of India,* Vol. I, Edited by Rapson, E. J., Cambridge, 1922, pp. 58f.
Grimm, J.	*Deutsche Grammatik,* Vol. I, 2nd Edition 1922; vol. III, 1831, Vol IV, 1837.

Gurney. O. R.	*The Hittites,* 2nd edition, Harmondswarth, 1944.
Hermann, H.	*Die Indogermanen,* vols, I and II, Strassbourg, 1905-7.
Jones, W.	"Thr Third Anniversary Discourse" *Asiatik Researches,* vol. I, reprint, Varanasi, 1972.
Krause, W.	*Handbuch der Orientalistik, Iranistik,* IV. pt. III. Tocharisch, Leiden, 1955.
Lassen, C.	*Indische Alterthumskunde*, 3 vols.
Lockwood, W. B.	*Indo-European Philology*, London, 1969.
Mallory, J. P.	*In Search for the Indo-Europeans — Language, Archaeology and Myth*, London, 1989.
Meyer, E.	*Reich and Kultur der Chetiter*, Berlin, 1914.
Mukherjee, B. N.	"The Indo-European Question in Central Asia", *The Aryan Problem* (edited by Deo S. B. and Kamath. S) Pune, 1993, pp. 58f.
Muller, F. Max	"On the Relation of Bengali to the Aryan and Aboriginal Languages", *Transaction of the British Association for the Advancement of Science*, London, 1841.
Muller, F. Max	*Lectures on the Science of Languages*, London, 1861.
Muller, f. Max	*Bibliographies of Words and the Home of the Aryans*, London 1988.
Parsons, J.	*The Remains of Japhet being historical enquiries into the affinity and origins of the European languages*, 1767.
Penka, C.	*Origines Ariacae*, Vienna, 1883.
	Die Herkunft der Arier, Vienna, 1887.
Pigott, S.	*Prehistoric India*, Harmondsworth, 1950.
Pulleyblank, E. G.	"Chinese and Indo-Europeans", *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,* 1966, pp. 9f.
Rapson, E. J. (Editor)	*The Cambridge History of India* vol. I, Cambridge, 1922.
Rask, R. K.	*Undersögeles om der gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse.* 1818.
Sharma, R. S.,	Looking for the Aryans, Madras. 1995.
Sastri, S. Srikanta	"Appendix" to the Chapter on "The Aryan

Problem", *The Vedic Age* (edited by R. C. Majumder,) London, 1951, pp. 215f.

Schlegel, F. : *Uber die Sprache and Weisheit der Inder*, 1808.

Schleicher, A. . *Compendium der vergleichendern Grammatik der Indogermanischen Sprachen*, 1861.

Schroder, O. : *The Prehistoric Antiquities of the Aryan People* (Translated into English by Jevons), London, 1998.

. *Reallexikon der Indogermanischem Alterthumskunde,* 1902; 2nd edition edited by Nehring, A., 2 Vols, Berlin and Leipzig, 1917 ann 1929.

Sethna, K. D. . *The Problem of Aryan Origins* (*From An Indian Point of View*), Calcutta, 1980.

Swarup, D. . "Genesis of the Aryan Race Theory" The Aryan Problem, (edited by Deo, S. B. and Kamath, S.), Pune, 1933, pp. 30f

Tayler, I. *The Origins of the Aryans*, London, 1889.

Tilak, B. G. *The Arctic Home in the Vedas*, Poona, 1925.

Warapdpande, N R. *Aryan Invasion - A Myth*, Nagpur, 1989.

Wheeler, M. *The Cambridge History of India - The Indus Civilization*, Cambridge, 1960.

Wilson, H. H. *India Three Thousand Years Ago*, 1858.

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চ্চা : কয়েকটি সমস্যা

জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আমাকে এই একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের মূল নিবন্ধ পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যদিও সংসদের এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কোনও অধিবেশনে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি, তবু এ সমাবেশে আমি অর্বাচীন নই। এর কারণ দুটি—(১) সংসদের প্রায় শুরুতেই আমি এর সদস্য হয়েছিলাম। (২) পূর্বোত্তর ভারত ইতিহাস সংস্থা বা North-East India History Association ১৯৭৯ সালে সংগঠিত হবার সময় থেকেই এর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে আমি দেশের অন্যান্য ইতিহাস সংস্থাগুলোর কাজকর্মগুলো সম্পর্কে অবগত থাকার চেষ্টা করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি বিগত দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন—প্রতি বছর অধিবেশন হচ্ছে, গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও সংসদের সদস্যদের গবেষণা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। এর মূল কারণ, এই সংস্থার সঙ্গে নবীন ও প্রবীন উভয় স্তরেই গবেষকরাই জড়িত রয়েছেন। এদের মধ্যেই অনেকেই আঞ্চলিক ইতিহাসে উৎসাহী, আবার অনেক বিদগ্ধ গবেষকও রয়েছেন যারা সর্বভারতীয় ইতিহাস চর্চায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাস চর্চার ঐতিহ্য অনেকদিনের, এমন কি কলকাতার ঐতিহাসিকেরা এক সময়ে ছিলেন ভারতের ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ। আমার ধারণা, দীর্ঘ দিনের এই ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সংসদকে ইতিহাস চর্চার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছে।

আমার আজকের এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমি উপস্থিত গবেষকদের কাছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরবার চেষ্টা করব এবং অনুরোধ করব যদি এর মধ্যে আদৌ কোনো গুরুত্ব থাকে তবে এ নিয়ে আপনারা ভাবনা চিন্তা করুন :-

এক : ভারতের জাতীয় ইতিহাস বনাম আঞ্চলিক ইতিহাস ;

দুই : আঞ্চলিক ইতিহাসের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো;

তিন : বাংলার ইতিহাস বনাম পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস।

একাদশ বার্ষিক সম্মেলন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

"Unity in Diversity" কথাটা বোধহয় প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Fundamental of India' বইয়ে। তবে আমরা বারবার কথাটা ব্যবহার করে আসছি। এর কারণ, কথাটা খুবই সত্যি। ভারতীয় সংস্কৃতি বা ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে 'Unity' ও 'Diversity' দুটোই রয়েছে। এটা প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এর কারণ যদি জানতে হয় (অর্থাৎ কেন এই Unity এবং কেন এই Diversity) তাহলে খুঁজতে হবে ভারতের ইতিহাস, যে ইতিহাস মূলতঃ আঞ্চলিক ইতিহাস। আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের সমষ্টিগত ইতিহাসই হচ্ছে ভারতের জাতীয় ইতিহাস। ভারত রাষ্ট্রটিতে যেমন বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী রয়েছে, তেমনি প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। সময়ে সময়ে কিছু অঞ্চল আর্থ-সামাজিকভাবে স্বয়ং নির্ভর ও রাজনৈতিক ভাবে খণ্ডরাজ্য বা সার্বভৌম মর্যাদার অধিকারী ছিল। ঐতিহাসিক কারণে ঐসব অঞ্চলের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অতএব ভারতবর্ষের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি রচনা করতে হয়, তবে গবেষণার ভিত্তি হবে আঞ্চলিক ইতিহাস। তাছাড়া এমন কিছু অঞ্চলও রয়েছে যা আজ ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু কোন না কোন সময় এগুলো ভারতের কোন না কোন অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এবং এই দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল। এসব অঞ্চলকে বাদ দিয়ে ভারতে ইতিহাসের প্রকৃত গতি ও প্রকৃতি কখনও পরিস্ফুট হবে না। অতএব ভারতবর্ষের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ভিত্তি হচ্ছে আঞ্চলিক ইতিহাস। এই ইতিহাসে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের ইতিহাসের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে এবং জাতীয় ইতিহাসে প্রতিটি অঞ্চলের অবদান স্বীকৃত হতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা আসছে দুদিক থেকে। একটি হচ্ছে, জাতীয় মূলধারা বা National Mainstream-এর দৃষ্টিকোণ থেকে যারা ভারতের ইতিহাসকে দেখছেন তাদের গবেষণার কিছু অঞ্চলের প্রতি অবিচার হচ্ছে। আমরা যখন ভারতের ইতিহাস পড়ি তখন কিছু অঞ্চল বা রাজ্যের আদৌ কোন ইতিহাস বলেই মনে হয় না। অথচ একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, এর কোন ইতিহাস নেই সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে কোনো কোনো আঞ্চলিক গবেষক নিজেদের অঞ্চলের ইতিহাস এমন ভাবে লিখছেন যা পড়ে মনে হয় সেই অঞ্চল এতই স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল যে প্রতিবেশী অঞ্চল সমূহের সঙ্গে সেখানকার মানুষের যোগাযোগ বা আদান-প্রদান মোটেই ছিল

না। আমার ধারণা এই দুই গোষ্ঠীর উভয়েই চরমপন্থী এবং জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির পরিপন্থী। কেননা, প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক সত্য। আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই সত্য যুগযুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় ইতিহাসে যদি দেশের প্রতিটি অঞ্চল বা প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের খুঁজে না পান তাহলে সেই ইতিহাস জাতীয় সংহতির সহায়ক হবে না।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে, আমরা অঞ্চল কাকে বলব? অথবা, একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট কি হবে? সমস্যাটি আসছে এই জন্য যে, ভারতবর্ষে পঁচিশটি রাজ্য ও সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিষদ রয়েছে পাঁচটি, রেলসংগঠন রয়েছে নটি, ক্রিকেট খেলা হয় চারটি বা পাঁচটি অঞ্চলের ভিত্তিতে। আমার ধারণা, ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে যারা কাজ করছেন তারাও এই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করেননি। বর্তমানে যে ক'টি আঞ্চলিক ইতিহাস সংস্থা রয়েছে সেগুলো মূলত এক একটি অঞ্চলের ঐতিহাসিকদের সংস্থা। সাংগঠনিক সুবিধার জন্যই এগুলো এক বা একাধিক রাজ্য নিয়ে তৈরী হয়েছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, বিহারে বিহার ইতিহাস পরিসদ, দক্ষিণ ভারতে একদিকে রয়েছে Andhra Pradesh History Congress, Kerala History Congress ইত্যাদি আবার অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের সব ক'টি রাজ্য নিয়ে রয়েছে South Indian History Congress, পূর্বোত্তর অঞ্চলের সাতটি রাজ্য নিয়ে রয়েছে North East India History Association। কিন্তু এ সব রাজ্য বা প্রতিবেশী কয়েকটি রাজ্য নিয়ে যে ভৌগোলিক অঞ্চল সেই অঞ্চল একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল নাও হতে পারে।

ভারতের বর্তমান রাজ্যগুলো মূলতঃ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বৃটিশ শাসন কালে তৈরী হয়েছিল। এতে কোন অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি বা ইতিহাসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একই ভাষাভাষী বিভক্ত হয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যে। শুধু তাই নয়, সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর কোনো কোনো জনগোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে পড়েছেন দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রে। যেমন, পাঞ্জাবী ও কাশ্মিরী ভাষী অঞ্চল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এবং বাংলাভাষী অঞ্চল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। নেপালী ভাষীরা রয়েছেন ভারতে ও নেপালে। শুধু ভৌগোলিক প্রতিবেশী হিসাবে নয়, বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল বা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও আর্থ সামাজিক বিবর্তন একই সূত্রে গাথা ছিল।

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে ভাষা-বিভক্ত রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি রাজ্যকে পুনর্গঠন করে নতুন নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখনো দেশের বিভিন্ন ভাগে অস্থিরতা ও সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যে সীমানা বিরোধ রয়েছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবী শোনা যাচ্ছে। আসামকে ভেঙ্গে কয়েকটি নতুন রাজ্য হয়েছে, কিন্তু বাংলাভাষী বরাক উপত্যকা আসামেই রয়েছে। আসামের অবশিষ্ট দু'টি পার্বত্য জেলা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বায়ত্ব-শাসনের দাবীতে আন্দোলন চলছে। ওর মূল কারণ তদানিন্তন বৃটিশ সরকার ঔপনিবেশিক স্বার্থে কয়েকটি কৃত্রিম প্রশাসনিক অঞ্চল তৈরী করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অঞ্চলের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই।

অতএব প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে— ঐতিহাসিক অঞ্চল আমরা কাকে বলবো। আমার ধারণা, দীর্ঘকালীন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠা আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভর একটি ভূখণ্ডকেই আমরা ঐতিহাসিক অঞ্চল বলবো। কেন না, মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনা পর্বে দেখা গেছে ভ্রাম্যমান এক একটি জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ধারনের উপযোগী এক একটি ভূখণ্ডকে বেছে নিয়েছেন এবং কালক্রমে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছেন। সেই অঞ্চলের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতি রেখে মানুষের জীবিকা, অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে। স্থায়ী বসতির জন্য গ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং কালক্রমে সমগ্র অঞ্চলটিকে নিয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন বা রাজ্য গড়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতার সুবাদে ও এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সাংগঠনিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে এইসব প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে এবং সেই অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে একটি জাতি সত্ত্বাও গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালেও আগন্তুকেরা যেসব অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করেছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল সহাবস্থান ও সংমিশ্রণের ফলে তারাও আঞ্চলিক মূলধারায় সামিল হয়ে গেছেন। এরকম পরম্পরাগত ভাবে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুসংহত ও স্বনির্ভর একটি ভূখণ্ডকেই ঐতিহাসিক অঞ্চল বলা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক অঞ্চলের এই পরিকাঠামো থেকেই আসছে আমার তৃতীয় সমস্যা— আমি যাকে বলছি বঙ্গদেশ বনাম পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসের সমস্যা। স্বাধীনতা-

উত্তর যুগে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব আঞ্চলিক ইতিহাস অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ থেকে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের সময় পর্য্যন্ত যদি এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয় তাহলে অবশিষ্ট বঙ্গদেশ বা বাংলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কতটুকু পূর্ণাঙ্গ বা প্রকৃত হবে সেই সংশয় নিশ্চয়ই অহেতুক নয়। আমরা অবিভক্ত সেই বঙ্গদেশকে দেখতে পেয়েছি দীনেশচন্দ্র সেনের "বৃহৎ বঙ্গ", নগেন্দ্রনাথ বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস", রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস", রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাংলাদেশের ইতিহাস" ইত্যাদি পুস্তকে।

বৃটিশ রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার তিনটি জেলা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে ফেলে দেওয়া হল আসামে। ১৯০৫ সালে অবশিষ্ট বঙ্গদেশকে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত করা হল। আসামকে পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে নতুন রাজ্যটি তৈরী হল তার নাম দেওয়া হল "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ"। জাতিসত্তার ভিত্তিতে এর প্রতিবাদ হল, স্বদেশী আন্দোলন হল, প্রতিরোধ তখনকার মত সফলও হল। কিন্তু তারপরই ছোটনাগপুর গেল বিহারে এবং শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আবার আসামে। এখানেই শেষ নয়। সাতচল্লিশের বিভাজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশ দুটি ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হল, এবং শ্রীহট্টের অধিকাংশ অঞ্চল চলে গেল পূর্ব-পাকিস্তানে। এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে সূচনা হল বাংলার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সমস্যা। ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব গতিতে গড়ে ওঠা সেই ঐতিহাসিক অঞ্চলটিকে আমরা যদি আজকের পরিকাঠামোয় খণ্ড বিখণ্ড করে এর অতীত ইতিহাস নিয়ে গবেষণার চেষ্টা করি তাহলে সেই গবেষণা অনৈতিহাসিক, কৃত্রিম ও বিকলাঙ্গ ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

আমি এই তিনটি সমস্যাই শুধু তুলে ধরলাম, এর পদ্ধতিগত কোন সমাধান আমি এখনও খুঁজে পাইনি। এই অধিবেশনে সমস্যা কটি বিশেষভাবে তুলে ধরলাম এই কারণে যে আমার নিজের অঞ্চল, অর্থাৎ বর্তমান আসামের বরাক উপত্যকায় চলিত ১৪০১ বঙ্গাব্দ 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষে বরাকের গবেষকেরা সেই অঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান চলছে, স্কুলে কলেজে আলোচনাচক্র, সেমিনার ইত্যাদি হচ্ছে, গ্রন্থ-প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া

হয়েছে, স্থানীয় পত্র-পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছেন, আকাশবাণীর স্থানীয় কেন্দ্র বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জাতীয় সেমিনারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এর কারণ, বরাকের গবেষকেরা মনে করেন সেখানকার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আজকের বরাক উপত্যকা কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিনটি জেলায় বিভক্ত। 'এপার বাংলা' ও 'ওপার বাংলা'র পরিপ্রেক্ষিতে আসামের এই অঞ্চলটিকে 'বাংলার তৃতীয় ভুবন' বলা হয়ে থাকে। বৃটিশ শাসনকালে সুরমা উপত্যকা নামে খ্যাত ও অবিভক্ত শ্রীহট্ট-কাছাড় নিয়ে গঠিত বাংলাভাষী এই অঞ্চলটিকে ১৮৭৪ সালে ঢাকা ডিভিশন থেকে সরিয়ে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অনিবার্য কারণে তারপর যারা বাংলার প্রাদেশিক ইতিহাস রচনা করেছেন তারা এই অঞ্চলকে তাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেননি। অন্য দিকে আসামের ইতিহাস বলে যা লেখা হয়েছে তা মূলত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ইতিহাস। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো লেখায় কিছু বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে যার ফলে বরাকের মানুষের অস্তিত্ব নিয়েও অনেকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে, অবিভক্ত সেই উপত্যকার বৃহত্তর অংশ বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল সেই সুবাদে পলাশীর যুদ্ধের পর অবশিষ্ট বঙ্গ দেশের সঙ্গে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল। অন্য একটি খণ্ড আমরা যাকে বলি সমতল কাছাড়-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ডিমাসা রাজাদের শাসনাধীন ছিল এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অধিকারে আসে। ভৌগোলিক অবস্থান ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমতল কাছাড়কেও শ্রীহট্টের মত ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পেম্বারটন সাহেব এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, শ্রীহট্ট শহর থেকে মনিপুর সীমান্তে অবস্থিত জিরিঘাট পর্যন্ত এই অঞ্চলের ভুগোল এক, এখানকার মানুষ এক, তাদের ভাষা ও চেহারা-ছবিও এক। ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসন সাহেব বলেছেন, এই অঞ্চলের কথ্য ভাষা পূর্ব-বঙ্গীয় উপভাষা। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, শ্রীহট্ট-কাছাড় বা বরাক-সুরমা যেমন উপত্যকারই এক অংশ এবং সেখানকার মানুষের ভাষা সংস্কৃতিও পূর্ববঙ্গ থেকে অভিন্ন।

খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে এই শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে শ্রীহট্ট রাজ্য নামে

একটি আঞ্চলিক রাজ্যের অবস্থিতির প্রমাণ রয়েছে ভাটেরা তাম্র শাসনে। পূর্ববঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্র শাসনে শ্রীহট্ট মণ্ডলের কথা রয়েছে। বলা হয়েছে, শ্রীহট্ট ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত একটি মণ্ডল এবং সেই মণ্ডলে চন্দ্রপুর, গয়না ও পোগার নামে তিনটি বিষয় ছিল। শ্রীচন্দ্রের দশম শতাব্দীর এই তাম্র আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীহট্টের পশ্চিমভাগ গ্রামে। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীতে এই অঞ্চল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেরকম তথ্যও পাওয়া গেছে। কামরূপের রাজা কুমার ভাস্কর বর্ম্মনের সপ্তম শতাব্দীর একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীহট্টের নিধনপুর গ্রামে। এতেও সেই চন্দ্রপুর বিষয়ের কথা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের রংপুর ও ময়মনসিংহ হয়ে কামরূপ রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে। আবার সমতটের রাজা লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনে সুবঙ্গ অঞ্চলে একটি মন্দির নির্মাণ ও ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের কথা রয়েছে। লোকনাথের পরবর্তী রাজা মারুণ্ডনাথের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে শ্রীহট্টর কালাপুর গ্রামে। এতেও মন্দির নির্মাণের কথা রয়েছে।

এসব প্রাচীন তাম্রশাসন থেকে ঐ অঞ্চলে নানা বর্ণ ও নানা পেশার লোকেদের বসবাসের কথা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আসামের কোনো ইতিহাস বা সরকারী গেজেটিয়ারে এসবের উল্লেখও নেই। সমতল কাছাড়ের কথা বলা হয়েছে শুধু ডিমাসা রাজত্বের সময় থেকে এবং অবশিষ্ট বরাক উপত্যকার ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। বিলম্বে হলেও বরাক উপত্যকার বর্তমান গবেষকেরা আঞ্চলিক ইতিহাসের এই অপূর্ণতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ পালিত হচ্ছে এই পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু প্রাথমিক পরিক্রমায় যে সমস্যাগুলো দেখা গেছে আমি সেগুলো এখানে তুলে ধরেছি।

আমার ধারণা অন্যান্য অঞ্চলের গবেষকদেরও এসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমি ইতিমধ্যে বলেছি, আঞ্চলিক ইতিহাসের একজন গবেষক হিসেবে আমি শুধু সমস্যাগুলোই প্রত্যক্ষ করেছি, এর কোনো সমাধান খোঁজে যাইনি। অতএব সমবেত গবেষকদের কাছে আমার আবেদন— আপনার আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার এই পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ করুন এবং অন্য গবেষকদের সুবিধার জন্য আপনারা সুচিন্তিত সমাধান তুলে ধরুন।

ইতিহাসে ধনতন্ত্র

ইরফান হাবিব

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়।

যে মহানুভবতা থেকে আপনারা আমাকে আজ এই সম্মান প্রদর্শন করেছেন সে সম্পর্কে আমি গভীরভাবে সচেতন। আমাদের দেশের প্রত্যেকে বাংলার ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে কতখানি পেয়েছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতীয় ইতিহাসের যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দিক যখনই বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় তখন আর.সি.দত্ত, যদুনাথ সরকার, সুশোভন সরকার এবং আরও অনেকের নাম এসে যায়। স্বভাবতঃ তাই, তাঁদের প্রধান সম্মেলনে আমাকে কিছু বলতে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সহকর্মীদের আগ্রহের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাবোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানকার ভাষণের জন্য আমি খুব বড় এক বিষয় বেছে নিয়েছি, যাকে বলা হয় 'ইতিহাসে ধনতন্ত্র'। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোনও বিশেষজ্ঞতার দাবী করি না বলে আপনাদের বিশেষ আনুকূল্য প্রার্থনা করি। যে কারণে আমি তৎপরতার সাথে বিষয়টি মনোনীত করেছি তা হলো আমি মনে করি এটি এমন এক বিষয় এখন যার প্রতি সমস্ত সৎ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বিংশ শতাব্দী যখন শেষ হয়ে আসছে, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই, তখন এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে যে ধনতন্ত্রই হলো বর্তমান এবং ভবিষ্যতের একমাত্র সম্ভাব্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা। এমনকি সেদিন পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বে 'মিশ্র' বা 'জনকল্যাণকর' অর্থনীতির বা রাষ্ট্র নির্দেশিত, রাষ্ট্র সুরক্ষিত উন্নয়নের যে সব তত্ত্বের রমরমা ছিল আজ সেগুলিও প্রভাবশালী মহলে বাতিল বলে গণ্য হচ্ছে। 'স্বাধীনতা'র বদলে 'বিশ্বায়ন'-এর স্লোগানই আজ রাষ্ট্রনেতাদের মুখে বেশি শোনা যাচ্ছে। দৃঢ় বিপ্লবীও দেশীয় ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে আপসে যাচ্ছে এই আশা করে যে, তা হবে সাময়িক। ফলে বিপদ থেকে যাচ্ছে

দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৯৯৫

ঐতিহাসিকদের কাছেও ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক জীবনের এত স্বাভাবিক ঘটনা বলে প্রতীয়মান হতে থাকবে যে অন্তত সেই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হবে যে ইতিহাসেরই অবসান হচ্ছে। বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই প্রলুব্ধ হয়েছেন পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের অস্ত্রগুলোর থেকে রসদ সংগ্রহ করতে—প্রান্তিক থেকে আধুনিক উত্তর পর্যন্ত।

শুধু এই কারণেই আমার মনে হয় ধনতন্ত্রের এই আপাতদৃশ্য চূড়ান্ত বিজয়ের মুহূর্ত হচ্ছে ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিচিতিকে নতুন করে পরীক্ষা করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আমাদের হাতে যে ক্রমবর্ধমান তথ্যসম্ভার এসেছে এবং পিছনে ফিরে তাকানোর যে সমৃদ্ধ সুযোগ আমরা পাচ্ছি, তার আলোকে বহুবার উচ্চারিত প্রশ্নগুলিকে আবার তুলে ধরা প্রয়োজন।

প্রথম প্রশ্ন হলো, ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং আধিপত্য বিস্তার সংক্রান্ত, বিশেষ করে প্রথম শিল্পোন্নত দেশ ইংল্যাণ্ড। *ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি* (১৮৫৯) গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতির পরম্পরা সম্পর্কে যে তালিকা করেছিলেন, তা থেকে এটা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে অনিবার্যভাবেই সামন্ততন্ত্রের মধ্যে ধনতন্ত্রের শিকড় ছিল। ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার[১]। *ক্যাপিটাল* (১৮৬৭)-এ মার্কস-এর নিজের উল্লেখ "সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তর"-এই ধারণাকে আরো পুষ্ট করেছে[২]। আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো যার কোন অনুমোদনই মার্কস-এ মিলবে না। ১৯৩১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনগ্রাদ আলোচনা থেকে এর সূত্রপাত। এই ধারণা মতো "সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা" বলতে পুরনো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কৃষিভিত্তিক এলাকাকে বোঝানো হতো[৩]। মরিস ডবে'র ধনতন্ত্রের উত্থান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রচনায় একটি ধারণা খুবই প্রবল ছিল। তা হলো প্রত্যেক এলাকায় উৎপাদন পদ্ধতিতে সমস্ত বড়ো পরিবর্তন "আভ্যন্তরীণ" উপাদান বা দ্বন্দ্বের ফলে ঘটেছে[৪]। এখান থেকে ধরে নেওয়া যায় যে সমস্ত দেশে কৃষক ভিত্তিক অর্থনীতি ও কোন এক ধরনের পণ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারা সকলেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং আরো কিছু সময় পেলে তারা নিজস্ব ধনতন্ত্র তৈরী করে নিতে পারবে। যেমন মাও-জে-দঙ্ (১৯৩৯) বলেছিলেন যে, প্রাক উপনিবেশ চীন "ধনতান্ত্রিক সমাজে নিজে থেকেই উন্নীত হতো, এমনকি বিদেশী ধনতন্ত্রের প্রভাব ছাড়াই[৫]"। রজনীপাম দত্ত (১৯৪০) ধারণা করেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ দখলদারির আগে "বিকাশের স্বাভাবিক পথে

(দেশীয়) বুর্জোয়াশক্তি" গড়ে ওঠার সম্ভাব্যতা ছিলো[৮]।

আমার মনে হয় প্রাক ধনতান্ত্রিক অথবা 'সামন্ততান্ত্রিক' সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক উদ্গত অঙ্কুর থেকে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক অভ্যন্তবীণ বিকাশের এই তথাকথিত সর্বজনীন ধারণা ধনতন্ত্রের জন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিয়ে যায়। এই বেশিষ্ট্যগুলি হলো শক্তির ভূমিকা এবং বিশ্বজুড়ে বহির্দেশীয় অর্থনীতিগুলিকে দখল করার কথা। এই দুই যমজ উপাদান ছাড়া সোজা কথায় ধনতন্ত্র ইংল্যাণ্ডে বা পশ্চিম ইউরোপে আধিপত্যকারী উৎপাদন ব্যবস্থা হয়েই উঠতে পারত না। *ক্যাপিটাল* প্রথম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অসাধারণ পরিচ্ছেদে এই জায়গাতেই জোর দেওয়া হয়েছে।[৯] এখন তত্ত্ব এবং ইতিহাসের ঘটনার আলোকে এই যুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

ডবে'র *স্টাডিজ ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম* প্রকাশিত হওয়ার পরে একটি আলোচনাচক্রে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্ব নির্ধারিত তত্ত্বে বিশ্বাসীদের একটি গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। দাস ব্যবস্থার অবসান (যা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দেই যথেষ্ট পরিণত) এবং 'পুঁজির যুগ' যা অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর আগে শুরু হতে পারেনা, এর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কী হবে? বস্তুত এই সময়ের পার্থক্য ছিলো আরো অনেক দীর্ঘ। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে যদি দাস ব্যবস্থা পিছোতে শুরু করে থাকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের আগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধিপত্য বিস্তার করেনি। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যা দেখা গেছে তা হলো বাজারের জন্য উৎপাদন করতে মজুরিশ্রম নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এই সব 'ধনতান্ত্রিক' প্রতিষ্ঠানগুলি মোট উৎপাদনের অত্যন্ত অল্পভাগ উৎপাদন করতো। ডব নিজেই স্বীকার করেছেন, "তথ্য বলছে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে গৃহভিত্তিক শিল্প উৎপাদনের সবচেয়ে পরিচিত পদ্ধতি ছিলো[১০]"। অন্যভাবে বলতে গেলে কৃষক ও ক্ষুদ্র কারিগরদের উৎপাদনই ছিলো প্রধান, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন নয়।

ইতিহাসের তথ্যে বা মার্কসের রচনায় এই জাতীয় উৎপাদনকে 'সামন্ততান্ত্রিক' বলে শ্রেণীবদ্ধ করার কোন অনুমোদন পাওয়া যাবে না। ফলে কেবলমাত্র তুড়ি মেরে ১৪৫০ থেকে ১৭৫০—এই তিনশো বছরের শূন্যস্থানও পূরণ করা যাবে না। শিল্পবিপ্লব তার পরে শুরু হয়েছিল। সামন্ততন্ত্রকে এভাবে টেনে বাড়ানোর কাজটা করা হয় মূলত ভূমিদাসত্ব শব্দটির পরিধিকে অতিবিস্তৃত করে। ভূমিদাসত্ব বলতে

কেবল ভূমিতে বাঁধা কৃষক, বেগার শ্রমদানকারী কৃষক বা পণ্যে খাজনা দেওয়া কৃষককেই বোঝানো হয় না, নগদে খাজনা দেওয়া আইনগত স্বাধীন কৃষককেও ধরে নেওয়া হয়। এই দুই শ্রমদানের প্রক্রিয়া চরিত্রের দিক থেকে এতই পৃথক যে তাদের একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করা উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংহত ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ডব দাবি করেছিলেন মার্কস নগদ খাজনাকে সামন্ততান্ত্রিক খাজনা বলে "স্পষ্টতই বোঝাতে চেয়েছিলেন[৯]"। মোটেই তা নয়, বরঞ্চ মার্কস সরাসরি বলেছেন যে নগদ খাজনা "বাণিজ্যের নগর শিল্পের সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরেই ঘটে থাকতে পারে[১০]"। এই বাস্তবকে মেনে নিতে হবে যে সামন্ততান্ত্রিক সঙ্কটের পরেও শিল্প বিপ্লবের শুরুর আগে পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে পণ্য উৎপাদনের একটি ব্যবস্থার মধ্যে খাজনা গ্রহীতা ভূস্বামীরাই ছিল অর্থনৈতিক ভাবে আধিপত্যকারী শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণী।

এই ব্যবস্থাকেই মার্কস নাম দিয়েছিলেন ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা (পেটি মোড অব প্রোডাকসন)। সামন্ততন্ত্র থেকে নয়, এই ব্যবস্থা থেকেই ধনতন্ত্র জন্ম নিয়েছিলো এবং একেই ধ্বংস করে ধনতন্ত্র বিজয়ী হয়েছিল। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য যথেষ্ট স্পষ্ট[১১]। "নিশ্চিতভাবেই এই ক্ষুদ্র উৎপাদন পদ্ধতি দাসব্যবস্থা, ভূমিদাসত্ব এবং অন্যান্য ধরনের অধীনত্বের পরিস্থিতিতে বিরাজ করে। কিন্তু তা বিকশিত হয়, তার সমগ্র শক্তিকে মুক্ত করে দেয়, তার চিরায়ত রূপে উপনীত হয় কেবল সেখানেই যেখানে শ্রমিক নিজেই তার শ্রমের উপায় সমূহের ব্যক্তিগত মালিক এবং যেখানে সে নিজেই তাকে সচল রাখে।[১২]"।

একবার এই পরিস্থিতি ষোড়শ শতকে তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ধনতন্ত্রের উদ্ভবের রাস্তা খুলে গেল। কেননা পণ্য উৎপাদন ধনতন্ত্রের জন্মের পূর্বশর্ত ছিল। সম্পদশালী কারিগর এবং কৃষকরা এখন শ্রম ভাড়া করে "ছোট পুঁজিপতিতে" পরিণত হওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু মার্কস দেখেছিলেন পুঁজিবাদী বিকাশকে এতে বড়জোর 'শম্বুকগতি' দেওয়া যেতে পারত[১৩]। বস্তুত আরো বেশি শ্রম ভাড়া করে মুনাফা অর্জনের সীমা খুব তাড়াতাড়ি বোঝা গেল। সম্পদশালী কৃষকরা এরপর জমি কিনতে থাকলেন, জমির মালিকে পরিণত হলেন, যাতে "যেখানে কারখানা হবে সেখান থেকে ভাড়া নেওয়া যায়"। তাঁরা ব্যবসায়ে হাত লাগালেন। এই হচ্ছে টনির 'কৃষি ধনতন্ত্র' (মার্কসের নয়) যাকে টনি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে ওঠার ভিত্তি হিসাবে দেখেছেন[১৪]। কারিগরদের মধ্যে অন্যরা

নিজেদের গৃহের উৎপাদন বাড়ানোর পরে তাদের বৃহত্তর আয় আরো বেশি হাত ভাড়া করার কাজে বিনিয়োগ না করে অন্য গ্রামীণ পরিবারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে নিজেরা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করত। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো পারিবারিক শ্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করা যায় এবং গৃহে নিযুক্তদের ব্যয় তুলনায় সস্তা হওয়ায় কৃষির শুখা মরসুমকে ব্যবহার করা যায়। এটা হচ্ছে "প্রোটো ইণ্ডাসট্রিয়ালিজম" বা আদি শিল্পায়ন, এখন মেণ্ডেলসের সূত্রে যার সাথে আমরা পরিচিত[১৫]। কিন্তু ডব নিজে লক্ষ্য করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের সাধারণ প্রবণতা ছিল "বিরাট কোম্পানীর অস্থায়ী বাহিনীর মধ্যে থেকে গড়ে ওঠা কারিগরদের একাংশের বণিক-নিয়োগকর্তার ক্রমবর্ধমান আধিপত্য[১৬]"।

অন্যভাবে বলতে গেলে ক্ষুদ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে আপনা থেকে কাজ করতে দিলে স্বতস্ফূর্ত প্রবণতাই ছিল ভূস্বামী শোষণ তীব্র করা (ভূস্বামী অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান শক্তির জোরে) এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকের পুঁজির বিনিময়ে বাণিজ্য পুঁজি বাড়িয়ে তোলা। এই বিষয়টি সম্ভব হচ্ছিল তহবিল সুদে খাটানোর ব্যবস্থার ফলে ("পুটিং আউট" প্রথা বলে পরিচিত)। মার্কস এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্পষ্টই যুক্তি দেখিয়েছেন যে তা যথাযথ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্মকে দেরি করিয়ে দিয়েছে[১৭]।

নিয়োগকর্তা দ্বারা বাজারে বিন্যস্ত, উৎপাদনের জন্য তৈরী শ্রমিকদের কেন্দ্রীভবন না থাকলে যথাযথ পুঁজিবাদ বিকশিত হতে পারেনা। এই কেন্দ্রীভবনের প্রথম রূপ হচ্ছে 'ওয়ার্কশপ' যার ভিত্তি শ্রমনিবিড় (মার্কসের ভাষায় ম্যনুফ্যাকচার)। দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমের বিভাজনের ফলে উদ্ভূত সুবিধা এখানে পাওয়া যেত। অ্যাডাম স্মিথ (১৭৭৬) এর ধ্রুপদী বর্ণনা দিয়েছেন, [১৮] এফ ব্রদেল এখন এই ওয়ার্কশপগুলির চমকপ্রদ ঐতিহাসিক বিবরণও হাজির করেছেন[১৯]। এই প্রক্রিয়ায় অনিবার্য সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে শ্রমের বিভাজনের বিকাশ শ্রমের সচলতাকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখত। ফলে কম মজুরি ব্যয় এবং পুঁজির অধিকতর মুনাফার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রলেতারীয় "মজুত বাহিনী" তৈরীর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছিল।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দ্বিতীয় এবং প্রকৃত একক হল ফ্যাক্টরি বা কারখানা যা যন্ত্র নির্ভর। রিকার্ডো (১৮২১) প্রথম এর পরিচয় ঘটিয়ে দেন[২০]। ফ্যাক্টরিতে শ্রম বিভাজন ভেঙে পড়ে, যন্ত্র সমস্ত শ্রমিককেই অদক্ষ শ্রমিকে নামিয়ে দেয়, শ্রমের সচলতা বাড়ে এবং গণ হারে প্রলেতারিয়েত প্রবেশ করে ইতিহাসে। *ক্যাপিটালের*

প্রথম খণ্ডে মার্কসের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ওয়ার্কশপ ও ফ্যাক্টরির অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈপরীত্য তুলে ধরা[২১]। যন্ত্র শিল্পের সৃষ্ট ফ্যাক্টরি কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এসে শিল্প সংগঠনের প্রধান রূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়, তাও প্রথমে শুধু ইংল্যাণ্ডেই। দীর্ঘ কালপর্বের গৃহ উৎপাদনের মধ্যে ম্যনুফ্যাকচারই ছিল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। তাহলে হঠাৎ কিভাবে ফ্যাক্টরির জন্ম হল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

ব্রদেল সঠিকভাবেই বলেছেন যে 'ম্যানুফ্যাক্টারি থেকে ফ্যাক্টরিতে রূপান্তর কোনো স্বাভাবিক যুক্তিপূর্ণ ঘটনা ছিলনা'।[২২] আদি শিল্পায়ন থেকে যন্ত্রশিল্পে এজাতীয় রূপান্তর আদৌ ছিল না। যখন গ্রামীণ উদ্যোগীরা পরিবারের শোষণ করার বদলে ফ্যাক্টরির শ্রমকে শোষণ করতে শুরু করলেন সেই সুবর্ণ মুহূর্তটি গ্রামীণ শিল্পের বিকাশের দ্বারা মোটেই পূর্ব নির্ধারিত ছিল না।

সাধারণ পাঠ্যবইয়ে শিল্পবিপ্লবের পেছনে ১৭৬০-উত্তর ইংল্যাণ্ডের হঠাৎ প্রায় দৈব যান্ত্রিক উদ্ভাবনকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। ডব চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন প্রযুক্তি কেন স্বাধীন উপাদান হতে পারে না[২৩]। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ইউরোপীয় কারিগর ও তাত্ত্বিকদের বিপুল সাফল্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে শিল্পবিপ্লবের যুগে উদ্ভাবকরা যে সমস্ত মৌলিক যান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তি করে এগিয়েছিলেন তার প্রায় সবকটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবিষ্কৃত। নিউকমেনের ইঞ্জিন কাজ শুরু করে ১৭১২-তে, কয়লা থেকে জ্বালানি উৎপাদনের রহস্য আবিষ্কৃত হয় ১৭০৯-র ধারেকাছে, স্টিয়ারিং হুইল ১৭০৫ সালেই ব্যবহৃত হয়। বস্তুত, দেখলে মনে হবে এর পরের পঞ্চাশ বছরে প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া যেন থেমে দাঁড়িয়েছিল (একমাত্র ব্যতিক্রম ১৭৩৩-এ আবিষ্কৃত কে'র ফ্লাই-শাটল)। সুতরাং, ১৭৬০-র পর থেকে হঠাৎ কেন নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হতে থাকলো তার ব্যাখ্যা অনুকরণের প্রেরণা বা প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। নিঃসন্দেহেই ডবের ভাষায়, 'শিল্পের পরিস্থিত ও অর্থনৈতিক সম্পদের' সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিলো[২৪]।

মূল কথা হলো 'অর্থনৈতিক সম্পদ'। 'শম্বুক-গতিতে' চলা কোন উৎপাদন ব্যবস্থা কি নব-আবিষ্কৃত যন্ত্র কিনে তা ব্যবহার করার মতো বা সেই যন্ত্রের উৎপাদিত সস্তা কিন্তু প্রচুর অনুকৃত অ-বিলাসপণ্যের বাজার তৈরী করার মতো বৃহৎ পরিমাণ

পুঁজির জন্ম দিতে সক্ষম? মার্কসের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে কেবল ক্ষুদ্র উৎপাদনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পুঁজিপতির সঞ্চয় থেকে এই অর্থনৈতিক সম্পদ আসতে পারে না। অ-ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্র ও অর্থনীতি থেকে অর্জিত ধনসম্পদ থেকেই এই পরিমাণ বিপুল 'আদিম' বা 'প্রাথমিক' পুঁজি সঞ্চয়ন ঘটেছিল[২৫]।

(২)

প্রাথমিক সঞ্চয়ের দুটি প্রধান উৎস ছিলো— অভ্যন্তরীণ শোষণ, যা কৃষকদের নিঃস্ব করেছিল এবং বিশ্বব্যাপী উপনিবেশের বিস্তার মারফৎ বহির্দেশীয় লুণ্ঠন।

যখন ভূমিদাস প্রথার অবক্ষয় ঘটতে থাকে, ইংল্যাণ্ডে মনিবপ্রথা (লর্ডশিপ) জমিদারিপ্রথায় রূপান্তরিত হয়, মৌজার জমি হয়ে যায় লর্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ভূমিদাসের জমি সামগ্রিকভাবে খাসজমিতে আইনী রূপান্তরের অন্যদিকটি ছিল বাধ্যতামূলক শ্রমের আর্থিক খাজনায় রূপান্তর। লর্ডের কাছ থেকে অন্যান্য সমস্ত প্রধান সামরিক ও বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব কর্তব্য সরিয়ে নেওয়ার পর তিনি পুরোপুরি একজন বেসরকারী জমির মালিকে পরিণত হলেন, যার শোষণের মূল হাতিয়ার হলো খাজনা। ফ্রান্সের থেকে পরিস্থিতি আলাদা হয়ে গেল। সেখানে কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষকের জমির মালিকানা দাবি না করেও 'সোনিওর' হিসেবে কৃষকদের ওপর নানা ধরণের কর বসাতেন জমিদাররা[২৬]। ইংল্যাণ্ডের কৃষক টের পেল সে কী হারিয়েছে, যখন টিউডর এনক্লোজারে বিরাট পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমিকে জমির মালিকরা ভেড়াপালনের জমিতে পরিণত করে ফেলল। ভূস্বামীদের চাপে নিয়মকানুন বদলে গেল। ১৫৪০-১৬৪০ পর্বে খাজনা বৃদ্ধি মূল্য বিপ্লবের মুদ্রাস্ফীতিকে পেছনে ফেলে দিল। অষ্টাদশ শতকেও আবার তা ঘটেছিল[২৭]। খাজনার লোভ অষ্টাদশ শতকের এনক্লোজারের জন্ম দিল কেননা বৃহৎ জমির মালিকরা দেখলেন যে নিউ হাসব্যাণ্ড্রি পদ্ধতি ব্যবহার করে পুঁজিপতি কৃষকরা তাদের চড়া হারের খাজনা দিতে পারেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডের কৃষকদের বড় অংশই হয় ব্যক্তিগত এনক্লোজার (যেখানে বৃহৎ জমির মালিকদের সম্পদ মোটামুটি সংহত ছিলো) বা সংসদীয় এনক্লোজার (মিশ্র সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে প্রজাস্বত্ব উৎখাতে সংসদের আইন প্রয়োজন হতো) মারফত উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের কাছেই অবশ্য ব্যক্তিগত এনক্লোজারের ব্যাপারটি কোনদিনই তেমন আপত্তির ছিল না। ইদানীং সংসদীয়

আইনে উচ্ছেদের সপক্ষেও বিদ্বৎজনের সওয়াল দেখা যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের কৃষকদের প্রায় পূর্ণাঙ্গ নির্মূল হয়ে যাওয়ার এই ঘটনা মানব ইতিহাসে অভিনব। অথচ এক ধরনের ইতিহাস-ব্যাখ্যাতাদের কাছে এ যেন অতি স্বাভাবিক ঘটনা, মালিকের ইচ্ছের কাছে প্রজাদের আত্মসমর্পণ মাত্র।

খাজনার লোভ যেমন এহেন ভয়ঙ্কর সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল তেমনই আন্দাজ করা যায় শিল্প বিপ্লবের অব্যবহিত আগে ও শিল্প বিপ্লবের সময়ে ইংল্যাণ্ডের জমিদার শ্রেণীর রাজস্বের কতটা বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছিল। খাজনা-রাজস্বের এই বৃদ্ধির সঙ্গেই সমতালে গ্রামীণ সর্বহারার জন্ম হচ্ছিল যারা পরিশেষে ব্রিটেনের নগর শিল্পের মজুত বাহিনীতে পরিণত হয়। দু'টি প্রক্রিয়া ছিল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা, এমনকি ডব ও ১৯৫০-র দশকের প্রথমদিকে *রূপান্তর* বিতর্কের শরিকরা, মার্কস চিহ্নিত প্রাথমিক সঞ্চয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসাহটিকে খাটো করে দেখেছেন[২৮]। এই উদাসীনতা দুর্ভাগ্যজনক। কেননা ঔপনিবেশিকতাকে উপলব্ধি না করে ধনতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস রচনার কথা কল্পনাই করা যায় না।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায়—আমেরিকার বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে স্পেনের রৌপ্য খনন; আটলান্টিকের এপার থেকে ওপার লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানকে জোর করে দাস হিসেবে চালান করা এবং এশিয়ার নৌ চলাচল ও জমির ওপর কর চাপানো[২৯]। শক্তিপ্রয়োগে অ-ইউরোপীয় অর্থনীতির দখলদারি ও ধ্বংসের এই তিনটি প্রক্রিয়াই প্রায় সমসাময়িক ছিল। ইংল্যাণ্ড এই তিনটি থেকেই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল।

স্পেনীয় দখলদারির মুহূর্তে (১৫১৮) মধ্য মেক্সিকোর জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ। ১৬২০ তে তা কমে দাঁড়ায় ওই সংখ্যার মাত্র তিন শতাংশে। বলা চলে, সম্পূর্ণ মারণযজ্ঞ[৩০]। কেবল পুরনো দিনের মহামারীই নয়, রৌপ্য খনির জন্য জোর করে শ্রমিক সংগ্রহ মেক্সিকো ও পেরুর এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য দায়ী। কিন্তু স্পেন ও পশ্চিম ইউরোপ প্রায় বিনামূল্যেই রূপো পেত। ১৫০০ থেকে ১৬৫০-র মধ্যে সরকারী পথেই স্পেনে বার্ষিক প্রথায় ১১২.৫ মেট্রিক টন রূপো চালান হয়েছে। ই জে হ্যামিলটন এই পরিসংখ্যান পেশ করার পাশাপাশি আন্দাজ করেছেন ইউরোপে তথাকথিত মূল্য বিপ্লবের ওপর এর কী প্রভাব পড়েছিল। এই

মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিয়োগকর্তা ও বণিকরাই উপকৃত হয়েছিল, ক্ষতি হয়েছিল মজুরি শ্রমিক ও খাজনাবদ্ধ কৃষকের। তাঁর ধারণা, পশ্চিম ইউরোপে এর ফলে যে পুঁজি তৈরী হয় তা থেকেই পরিশেষে শিল্প বিপ্লবের চাকা ঘুরতে শুরু করে[৩১]। এখানে স্পষ্ট বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে ধনতন্ত্রের জন্মের সঙ্গে নেহাত ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া কোন আর্থিক প্রক্রিয়ার যোগসূত্রের কথা বলা হচ্ছেনা। ধনতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে আমের-ইণ্ডিযান জনসমষ্টিকে বেপরোয়া লুণ্ঠনের যোগাযোগই এখানে লক্ষণীয়। যুদ্ধাস্ত্রের ঘাটতির কারণে এই জনসমষ্টি লোভী আগ্রাসকদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিলেন।

রূপো বেড়ে যাওয়ার আরেকটি দিক আছে। পশ্চিম ইউরোপে রূপোর মজুত বাড়তে থাকায় এবং বছরের পর বছর স্বর্ণমূল্যে রূপোর দাম বাড়তে থাকায় বাণিজ্যের লেনদেনে পশ্চিম ইউরোপ ক্রমাগতই অবশিষ্ট বিশ্বের সুবিধা পেতে থাকলো। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপ থেকে বছরে সম্ভবত ১০০ টন রূপো রপ্তানি হতো, সপ্তদশ শতাব্দীতে তা বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে বার্ষিক ১৫০-১৬০ টন। এশিয়ার কারখানাজাত উৎপন্ন বিশেষ করে বস্ত্র এবং অন্তঃ আঞ্চলিক পরম্পরাগত বাণিজ্যিক পণ্য, যেমন মশলা বা ওষুধ পাইকারীহারে চলে যেতে থাকলো পশ্চিম ইউরোপে। সবই রূপোর বিনিময়ে। নতুন বাণিজ্য প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করতো ইউরোপীয় বাণিজ্য-পুঁজি, যার নেতৃত্বে ছিল নেদারল্যাণ্ডস ও ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিগুলি। রূপো রপ্তানির ফলে এই পুঁজির ক্রমাগত সম্প্রসারণ ইউরোপীয় বাণিজ্যিক পুঁজির পরিমাণকে দারুণভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল।

আমের-ইণ্ডিয়ান জনসংখ্যা দারুণভাবে কমে যাওয়ায় ব্রাজিল, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা মহাদেশের (পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) বাগিচায় শ্রমিক সরবরাহের বিকল্প উৎসের প্রয়োজন দেখা দিল। আটলান্টিক ছুঁয়ে থাকা আফ্রিকার সমস্ত প্রান্ত ও মোজাম্বিক থেকে আফ্রিকানদের দাস বানিয়ে চালান করে এই সমস্যা মেটানো হল। কোন সংখ্যা বিচার না করলে এই ঘটনার বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যায়না। কার্টিন পরিমাপ করেছেন, ১৪৪০ থেকে ১৮৬০-র মধ্যে মোট ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষ আফ্রিকানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে হিসেব করে দেখা গেছে অন্তত ১ কোটি মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আরো অন্তত ১০ লক্ষ আসা-যাওয়ার পথেই প্রাণ হারান। অষ্টাদশ শতকেই ছিল দাস ব্যবস্থার রমরমা, তখন ৬০ লক্ষের বেশি মানুষকে চালান করা হয়েছে[৩২]। নিঃসন্দেহে এটিই ইতিহাসে

বৃহত্তম বাধ্যতামূলক মানব-অভিবাসন। অষ্টাদশ শতকে সবচেয়ে বড়ো নৌ সম্ভারের অধিকারী ইংল্যাণ্ডই ছিল দাস ব্যবসার বৃহত্তম শরিক।

দাসেরা কাজ করতেন আটলাণ্টিক সমুদ্রপাড়ের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকা ও নতুন পৃথিবীর দ্বীপে। চিনি, তামাক, সুতো, কফি ও নীল চাষে তাঁদের লাগানো হতো। এই এলাকায় অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বেশ বড়ো সড়ো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল। শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকেই ইংল্যাণ্ড ১৭৮৫-৯৪ পর্বে ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের আমদানি বিনা ব্যয়ে নিয়ে এসেছিল[৩৩]। এরিক উইলিয়ামস এই সাদাসাপটা তথ্য ও ল্যাঙ্কাশায়ারে পুঁজিবাদী বস্ত্র শিল্পের উদ্ভবের মধ্যে যোগসূত্রটি যথাযথভাবেই আন্দাজ করেছেন। মনে রাখতে হবে, দাস ব্যবসার প্রধান বন্দর ছিল লিভারপুল[৩৪]।

এশিয়ায় নৌ চলাচলের ওপর পর্তুগীজদের চাপানো কর এবং জাভার কৃষকদের ওপর নেদারল্যাণ্ডসের কর দিয়ে শোষণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পলাশীর (১৭৫৭) পর ভারতে ব্রিটিশ দখলদারি ছিলো তার চূড়ান্ত মুহূর্ত। ইংল্যাণ্ডের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দখলকৃত এলাকার সমস্ত রাজস্বই নিজেদের মুনাফা হিসেবে নিয়ে যেত। এদের তুলনায় পর্তুগীজ বা ওলন্দাজদের আগেকার সম্পদ নিতান্তই সামান্য ছিল। এভাবেই শুরু হলো কুখ্যাত 'সম্পদ চালান'। একটি বিশদ সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী ভারত থেকে রপ্তানী-আমদানির শেষে ইংল্যাণ্ডের মোট লাভ ১৭৮০-র দশকে ছিল গড়ে বার্ষিক ৪৯ লক্ষ ৩০ পাউণ্ডেরও বেশি[৩৫]।

বশ্যতাজনিত এই কর মূলত যেত ভারতীয় বস্ত্রের আকারে। এর আবার একাংশ ব্যয় করা হতো আফ্রিকার ক্রীতদাস কিনতে। অর্থাৎ এই পর্বে ভারতে ব্রিটিশ দখলদারি আফ্রিকান ক্রীতদাস ব্যবসার তেজীভাবের অন্যতম কারণ ছিল।

বহির্দেশীয় উৎস থেকে ইংল্যাণ্ড যে প্রতি বছরে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করতো তা নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে উইলিয়াম পিট হিসেব করে দেখেছিলেন পরিমাণটা হলো বছরে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু এর সঙ্গে শিল্প বিপ্লবের বিনিয়োগ সংক্রান্ত যোগসূত্রের ব্যাপারে ব্রিটিশ পণ্ডিতরা বিস্ময়কর রকমের নীরবতা দেখিয়েছেন। ডিন ও কোল রায় দেওয়া স্থগিত রেখেছেন এই বলে যে 'বিস্তারিত গবেষণা ছাড়া কিছু বলা অসম্ভব'[৩৬]। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডব তাঁর *স্টাডিজ ইন দি ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিজম* গ্রন্থে এ নিয়ে কিছুই বলেননি। সুইজি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন 'এই (বহির্দেশীয়) সঞ্চয় ঠিক

কিভাবে শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে তা নিয়ে মার্কস প্রায় কিছুই বলেননি'। তাঁর *স্টাডি*-এ দাবি করেছিলেন, প্রাথমিক সঞ্চয়েব প্রক্রিয়ায় যে জমির মালিকরা জমি দখল করেছিলেন, এখন তারা ভূসম্পত্তি বিক্রি করে শিল্পে বিনিয়োগ করলেন। সুইজি প্রশ্ন তুললেন, সেই সম্পত্তি কিনলো কোন শ্রেণী[৩৭]'? ডব কোন পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা ছাড়াই কোনক্রমে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের প্রসঙ্গে এসে পড়লেন। ডব লিখলেন ‘‘অষ্টাদশ শতকে অবসরপ্রাপ্ত ইস্ট ইণ্ডিয়ান ‘নবাব'-দের মতো লোকদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বণ্ড ও ভূসম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছিল। বিক্রেতার সেই অর্থ ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। অতএব বলা যায় যে ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন থেকে অর্জিত সম্পদ শিল্প বিপ্লবকে উর্বরতা দিয়েছে। এই অনুমান অনুসন্ধানের যোগ্য নিশ্চয়ই[৩৮]।

উপনিবেশ থেকে পাওয়া মজুরি-পণ্য (চা, তামাক, আখের রস, সুতীবস্ত্র) এবং কাঁচামাল (রেশম, নীল) জাতীয় হিসেবের স্তরে দেখলে ‘বিনামূল্যেই' মিলতো। ফলে, ব্যয় কমিয়ে শিল্প পুঁজিকে তা সম্প্রসারিত করেছে। বিশ্বজুড়ে বিরাট পরিমাণ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ কোন রসদ সংগ্রহ করেছে কিনা তা বুঝতে এরপরেও কেন যে ‘বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নথি' ঘাঁটতে হবে, তা বোঝা দুস্কর।

প্রাথমিক সঞ্চয়ের ইতিহাস থেকে নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রের জন্ম হতো না যদি না সেখানে কৃষক সমাজকে ধ্বংস করা হতো এবং বিশ্বজুড়ে অন্য দেশের অর্থনীতিকে দখল ও শোষণ করা হতো। ধনতন্ত্রের আবির্ভাব কোন স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ ঘটনা নয়। বহির্দেশীয় অর্থনীতিকে দখল করা অভ্যন্তরীণ শিল্প পুঁজি গঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিলো। অন্যভাবে বলতে গেলে, ক্রুরতম উপনিবেশবাদ কেবল ধনতন্ত্রের উদ্ভবের একটি সঙ্গী নয়, তা ছিলো ধনতন্ত্রের একটি, মৌলিক, অনিবার্য পূর্বশর্ত। ক্ষুদ্র উৎপাদনের মধ্যে ধনতন্ত্রের বিকাশের ‘শম্বুক গতি' অবশেষে দ্রুত বিকাশের চেহারা পেল। প্রমাণিত হলো, উপনিবেশের মূল ভিত্তি শক্তি প্রয়োগ ‘নিজেই একটি অর্থনৈতিক শক্তি[৩৯]।

(৩)

উবনিবেশবাদ যদি ধনতন্ত্রের অন্যতম প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হয়ে থাকে, সাম্রাজ্যবাদও ধনতন্ত্রের সমান প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। এই শতাব্দীর মার্কসবাদী আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই একটি দুর্ভাগ্যজনক ফাঁক হলো এই অবশ্য প্রয়োজনীয়

তথ্যটিকে উপেক্ষা করা। তার বদলে সাম্রাজ্যবাদকে কেবল ধনতন্ত্রের শেষ পর্বের একটি বিকাশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর অনেকটাই ঘটেছিলো অবাধ-বাণিজ্যপন্থী উদারনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হবসনের সাম্রাজ্যবাদ (১৯০২) গ্রন্থটির প্রভাবে[৭]। রোজা লুক্সেমবার্গ (১৯১২) সাম্রাজ্যবাদকে সংজ্ঞায়িত করলেন 'অ-ধনতান্ত্রিক পরিবেশের যতটুকু এখনও উন্মুক্ত রয়েছে তার জন্য প্রতিযোগিতায় পুঁজির সঞ্চয়ের রাজনৈতিক প্রকাশ' বলে[১]। পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদকে যুক্ত করে দেখা নিশ্চয়ই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। কিন্তু আবার যখন পৃথিবীতে 'অ-ধনতান্ত্রিক' এলাকা কমে প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে গেছে, শুধু সেই পর্বের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদকে সীমায়িত রাখার ফলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বের অনেকটাই ছেঁটে দেওয়া হল। লেনিন একটি পৃথক এবং আরও সুনির্দিষ্ট মাত্রা যুক্ত করেছিলেন। ১৯১৬ তে তিনি সাম্রাজ্যবাদকে ধনতন্ত্রের একচেটিয়া পর্বের ফসল বলে সংজ্ঞায়িত করলেন। তিনি এমনকি এও বললেন, 'গ্রেট ব্রিটেনে অবাধ প্রতিযোগিতার সর্বাধিক বিকাশের পর্বে, অর্থাৎ ১৮৪০ থেকে ১৮৬০-র মধ্যে, শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতারা ঔপনিবেশিক নীতির বিরোধী ছিলেন'[২]।

ডব এই থেকে সাম্রাজ্যবাদকে 'বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের মানসিকতা'-য় কমিয়ে আনলেন। এ এমন এক বৈশিষ্ট্য যা কেবল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে দেখা গেছে। অবাধ বাণিজ্যের পর্বে যে অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদ থাকতেই পারে না, ডব তার ইঙ্গিত দিলেন এই বলে যে উল্লিখিত মানসিকতা 'আগের শতকের মার্কেন্টাইলিজমের অনুরূপ'[৩]।

ইতিহাসের তথ্যের আলোকে আজ সাম্রাজ্যবাদের এই ধারণাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে মনে হয়। ধনতন্ত্রে নিখুঁত প্রতিযোগিতার অভিমুখে প্রবণতার সঙ্গেই মুনাফার গড় হার কমতে থাকে[৪]। কয়েকটি উপাদান দিয়ে এই প্রবণতা সামলানো যায়। মার্কস এই উপাদানগুলির মধ্যে কম অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণকে চিহ্নিত করেছিলেন। সেক্ষেত্রে প্রতিযোগীর আগে একটি নতুন আবিষ্কার ব্যবহার করে একজন উৎপাদক যে মুনাফা করবে তার চেয়ে অনেক বেশি 'উদ্বৃত্ত মুনাফা'র সুযোগ থাকছে[৫]। স্পষ্টতই, বৈদেশিক বাণিজ্যকে এ হেন উদ্বৃত্ত মুনাফা অর্জন করতে হলে অগ্রসর দেশকে অবাধ বাণিজ্য জোর করে চালু করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মেট্রোপলিটন দেশের গড় হারের তুলনায় উপনিবেশে বিনিয়োগ করা পুঁজিতে বেশি মুনাফা হবে। কেননা 'দাস, কুলি ইত্যাদিদের ব্যবহার'

করা যাচ্ছে[৪৬]। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক কাঠামোকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করতে হবে। বস্তুত, কেবলমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্রিটেনের পূর্ণ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে থাকা ভারতের মতো দেশের থেকে চীনের মতো আধা-স্বাধীন দেশে জোর করে বাণিজ্য বাধা ভেঙ্গে ফেলা সত্ত্বেও পণ্য নিয়ে যেতে অনেক বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে কেননা প্রথম ক্ষেত্রে রাজস্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্রিটিশরা কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ চালু করতে পেরেছিল[৪৭]। সুতরাং ব্রিটেনকে অবাধ বাণিজ্য থেকে 'উদ্বৃত্ত-মুনাফা' অর্জন করতে হলে ভূখণ্ডের ওপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা জরুরী ছিলো।

প্রাক-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের এই অন্তর্নিহিত অভিমুখ সম্পর্কে ধারণা ছিল বলেই মার্কস অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তাদের শান্তিবাদী ও উপনিবেশ বিরোধী ভনিতায় প্রতারিত হননি। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে দখলদারির ক্ষেত্রে 'ইংল্যাণ্ডের সমস্ত দলের নীরবতা' লক্ষ্য করেছিলেন মার্কস। এমনকি তাঁরাও, মার্কসের ভাষায় যাঁরা 'ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে শান্তি নিয়ে সবচেয়ে সোচ্চার হবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তবে তাদের তীব্র মানবদরদ দেখানোর জন্য আগে সাম্রাজ্যটা তো তাদের পাওয়া চাই'[৪৮]। ১৮৫৭-র ভারতীয় বিদ্রোহ দমনকে তিনি দেখেছিলেন "ম্যাঞ্চেস্টারের অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তাদের ভারতীয় বাজারে একচেটিয়া অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে" ভারতের "গৌরবজনক' পুনর্দখল" হিসেবে[৪৯]।

১৯৫৩-তে জে. গালাঘার এবং আর. রবিনসন 'অবাধ বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ' আবিষ্কারের অনেক আগেই মার্কস সাম্রাজ্য বিস্তার ও অবাধ বাণিজ্যের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন[৫০]। এই দু'জন অবশ্য যথার্থভাবেই দেখিয়েছেন যে ১৮৪০-র সেই সময়েই, যখন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতারা শান্তিপূর্ণ অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জোর করে ভারত ও তার চারপাশে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় বিরাট অংশের জনবসতি এলাকা দখল করেছে। ১৮৫০ ও তার পরেও এই আক্রমণাত্মক নীতি রূপায়িত হচ্ছে। সাধারণভাবে গালাঘার ও রবিনসনের থিসিস শক্ত জমিতেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় জোর সমালোচনা উঠেছে যে কোন কোন ব্যক্তি নীতিনির্ধারক অবাধ বাণিজ্যনীতির আন্তরিক ও অবিরত ভক্ত ছিলেন কিনা। মূল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তথ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি।

অবাধ বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা হলো কেবল গ্রেট ব্রিটেনই এই পথে চলছিল। সেই অর্থে, এটি ছিলো অন্তর্বর্তীকালীন সাম্রাজ্যবাদ

যেমন ব্রিটেন কেবলমাত্র অন্তর্বর্তী সময়ের জন্যই একমাত্র শিল্পসমৃদ্ধ শক্তি ছিলো। ১৮৭০-র দশক পর্যন্ত ব্রিটেন শিল্পে সব চেয়ে এগিয়ে থাকা দেশ ছিল। স্বভাবতই সমস্ত অবাধ বাণিজ্যেই ব্রিটেন লাভবান এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। জার্মানি, ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংরক্ষণমূলক নীতি নিলেও হয়তো তাদের ওপর অবাধ বাণিজ্য চাপিয়ে দিতে পারতো না ব্রিটেন। কিন্তু দুর্বলতর দেশগুলির ওপর নিজের কর্তৃত্ব চাপাতো, সরাসরি বা 'বেসরকারী' সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকা বা প্রভাবের এলাকার মাধ্যমে নিজের বাণিজ্যের অনিয়ন্ত্রিত পথ উন্মুক্ত করেছিল তারা। বিশ্বের একটি বিরাট অংশে অবাধ বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই ব্রিটেন গড়ে তুলেছিল সেই সাম্রাজ্য যেখানে সূর্য অস্ত যেত না।

একটি বিষয় চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা যদি হবসনের বদলে মার্কসকে দিয়ে শুরু করতেন তাহলে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ঠিক কী ধারণা তাঁদের গড়ে উঠতো। (একটি কথা বলে রাখা ভালো, নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে মার্কসের রচনার কথা সম্ভবত রোজা লুক্সেমবার্গ বা লেনিন জানতেন না) যদি প্রচুর মুনাফার লক্ষ্যে ধনতন্ত্রের বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ (এমনকি যদি অবাধ বাণিজ্যের কারণেও) এবং পূর্ণাঙ্গ উপনিবেশের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সাম্রাজ্যবাদের পথেই চলতে হতো—তা সে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার পর্বেই হোক বা একচেটিয়া পর্বে হোক। রোজা লুক্সেমবার্গের ধারণা ছিলো উদ্বৃত্ত মূল্য কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক ও অ-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে বিনিময়েই তৈরী হতে পারে। তা যদি হয়, তাহলে সব স্তরেই ধনতন্ত্রের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ আরো প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলতে গেলে ফিন্যান্স পুঁজি ও একচেটিয়া উদ্ভব হোক বা নাই হোক অবাধ-বাণিজ্যের পর্ব থেকেই সাম্রাজ্যবাদ অব্যাহত থাকতো। ১৮৭০-র পরে একাধিক শিল্পসমৃদ্ধ শক্তির আত্মপ্রকাশের পর অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিতভাবেই সংরক্ষণের বাধা পেত, কেননা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকায় নিজেদের বাজার নিশ্চিত করতো। নিশ্চিতভাবেই আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত সৃষ্টি হত। ১৮৭০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৮৯০-র দশকের প্রথম পর্বে বিস্তৃত গ্রেট ডিপ্রেশন-র মতো সঙ্কটে তা আরো তীব্র হতো।

সামগ্রিকভাবে ধনতন্ত্রের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের উৎস ছিল, এই অবস্থান মেনে নিলে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্ব আরো জোরদার হয়। উপনিবেশের

পুঁজি রপ্তানির ওপর সম্ভবত লেনিনবাদী তত্ত্বে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৫২] ১৯১৪ পর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে রেলওয়ে বাদ দিয়ে এ-জাতীয় বিনিয়োগের খুব বেশি গুরুত্ব ছিল না। মনে হয়, বিশুদ্ধ পুঁজি-রপ্তানিভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় পূর্বে উল্লিখিত প্রাক-একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদের ধরনই এখানে বেশি খাপ খাচ্ছে।[৫৩]

যেটায় জোর দেওয়া উচিত তা হলো শিল্প-ধনতন্ত্রের তৈরি ও প্রতিযোগী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়ার জন্য দারুণভাবে তীব্র হয়েছে। মার্কস যখন পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের 'কেন্দ্রীভবনে'র' প্রবণতা বর্ণনা করেছিলেন, তখনই তাতে একচেটিয়ার ধারণা নিহিত ছিল। শিল্পের সব শাখাতেই প্রতিযোগিতায় ক্রমশ পুঁজিবাদীর সংখ্যা কমতে থাকে, পুঁজিবাদীরা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আর আয়তনে বাড়ে।[৫৪] একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর একচেটিয়া পুঁজি একচেটিয়া বাজারের মধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। কেননা সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য উৎপাদনকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। যেখানে প্রান্তিক ব্যয় মূল্যের সমান হয়ে যায়, ততদূর পর্যন্ত যাবে যেখানে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। একই সঙ্গে, অ-একচেটিয়া বাজারে প্রতিযোগিতা আর তীব্র হবে। ফলে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেক সংস্থা ও সংস্থাগুলির পক্ষে সংরক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্যের এলাকাকে বাড়ানো সুবিধাজনক হবে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের অভিমুখে অভিযান আরো তীব্র হবে। এই যুক্তিতে, সাম্রাজ্যবাদের যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে তা প্রাক-একচেটিয়া পর্বের সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত নয়, বরঞ্চ তারই অবিরত প্রক্রিয়া ও তীব্রতাবৃদ্ধি।

অবশ্যই আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, হিলফারডিং-এর (১৯১০) 'ফিন্যান্স পুঁজি'। ফিন্যান্স পুঁজির সূত্র ছিল ব্যাঙ্কের বিকাশ, যা শিল্প পুঁজির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে এবং তার ওপর আধিপত্য করছে। এই পুঁজির শক্তির উৎসে ছিল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যাপ্তি এবং সবচেয়ে এগিয়ে থাকা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাদের কার্যত ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব। এই ঐক্য (চেক প্রথা বা নগদ-জমা অনুপাতের মাধ্যমে) ব্যাঙ্কগুলির টাকা 'তৈরী করার' ক্ষমতা বা ঋণের মাধ্যমে গতিবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছিল। এর ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে তৈরি তহবিলের অতিরিক্ত পুঁজি সঞ্চয়ের একটি নতুন উৎস তৈরি হল। এর ফলে একটি পুনর্বণ্টনের প্রতিক্রিয়া হল। কেননা জমানো টাকার প্রকৃত সম্পদের অবক্ষয় ঘটিয়েই এই মূলধন

তৈরি হল। যদি শুধু উদ্বৃত্ত মূল্যই পুঁজির একমাত্র উৎস থাকতো তাহলে যা হতে পারতো তার থেকে অনেক দ্রুততর বিকাশ ঘটলো পুঁজির। (ডব পর্যন্ত মার্কসবাদীদের আলোচনায় এই প্রক্রিয়াটি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি বলে আমার ধারণা)। পুঁজির এহেন দ্রুত আয়তন বৃদ্ধি থেকে দু'টি প্রতিক্রিয়া ধারণা করা যায়। বৃহত্তর বিনিয়োগের ফলে বৃহত্তর সংস্থা অনেক বড় মাত্রার উৎপাদনই শুধু করতে পারলো না, মূলধনী পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আরো বৃহত্তর বিনিয়োগও সম্ভব হল। এর ফলে একচেটিয়া আরো বাড়লো, তবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে আটকানোর জন্য একচেটিয়া চেষ্টাও খর্বিত হলো।

আরেকটি ফলাফল হল উদ্বৃত্ত পুঁজির ক্রমবর্দ্ধমান রপ্তানি। পুঁজি রপ্তানির ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাইরে থেকে আসা আয়বৃদ্ধির ব্যাখ্যা মিলবে এখানেই। সাধারণভাবে মিত্র ধনতান্ত্রিক দেশে ও নিজেদের উপনিবেশেই পুঁজি রপ্তানি করা হত। এই জাতীয় বিনিয়োগ রাজনৈতিক সুরক্ষায় ঘেরা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। যাতে একই এলাকায় বিনিয়োগে আগ্রহী প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করা যায়। ফলে আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিভাজন ও বিভিন্ন জোট গঠনের প্রক্রিয়া আরো বেড়ে যাবে।

কাউৎস্কি মনে করতেন, আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী সংঘাত হচ্ছে কৃষি প্রধান বা কম শিল্পোন্নত উপনিবেশকে ঘিরে। লেনিন সঠিকভাবেই এই প্রশ্নে কাউৎস্কির সমালোচনা করেছিলেন[৫৫]। সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যেক শক্তি চাইত শক্তি প্রয়োগে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করতে বা দুর্বল করতে, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা দখল করতে এবং তথাকথিত 'যাদের আছে' আর 'যাদের নেই' তেমন শক্তিগুলির মধ্যে উপনিবেশের পুনর্বন্টন করতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দু'টি পরস্পরবিরোধী জোটের মধ্যে এহেন সংঘাত থেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি বাড়তি মাত্রা যুক্ত হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে নির্মূল করার চেষ্টায়। অভূতপূর্ব জাতীয় বিদ্বেষ, হিংসা, গণহত্যার এই যুদ্ধগুলি কেবল কয়েকজন ব্যক্তি উন্মাদের কার্যকলাপের ফল নয়, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমার অযোগ্য অভিযানেই এই যুদ্ধ ঘটেছে। এই উন্মাদদের জায়গা করে দিয়েছে তারাই।

অতীতে যে-সমস্ত শক্তি সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে তারা আজও আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দীর্ঘ প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঢেউ নিঃসন্দেহেই সাম্রাজ্যবাদের রূপ ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এই পরিবর্তনগুলি ক্রমাগত পর্যালোচনা করা উচিত। দুই বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রথম সারি থেকে পিছু হঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিরাট এলাকায় অঘোষিত সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। ১৮১৫ থেকে ১৮৭০-র চ্যালেঞ্জহীন ব্রিটেনের মতই আজ তাদের অবস্থা। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলি এগোচ্ছে। আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা ও অস্থিরতার মৌলিক উপাদানগুলি বজায় আছে। যুদ্ধাস্ত্রের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যত একচেটিয়া আধিপত্য, তার অর্থনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে জনগণের তৎপরতা এবং সমাজতন্ত্রের শক্তির পুনরভ্যুত্থানে এই চিত্র আরো বদলাবে কিনা, তা দেখা যাবে ভবিষ্যতেই।

সূত্র নির্দেশ

(উল্লিখিত গ্রন্থ ও অন্যান্য উল্লেখ মূলানুসারী ইংরাজীতেই রাখা হলো।)

১. ".....The Asiatic, the ancient, the feudal and the modern bourgeois modes of production" (A Contribution to the Critique of Political Economy. tr N. I. Stoke, Bharati Library, Calcutta. n.d., p. 13)

২. Capital, I Moore-Aveling tr., ed Dona Torr, London, 1938 (facsimile ed. of the original Swan Sonnenschein ed., London. 1887). p. 776 CD "Transition from feudal to Capitalist mode of production" in Capital, III. Foreign Languages Publishing Moscow. 1959. p. 327.

৩. Cf. Karl A. Wittfoged. Oriental Despotism - a Comparative study in Total Power. New Haven. 1957. pp. 402-4.

৪. Studies in the Development of Capitalism. London. 1946.

৫. Selected Works of Mao Tse-tung, II. Foreign Languages Press. Peking. 1967. p. 309.

৬. India Today, People's Pub. House, Bombay, 1947. p. 85.

৭. Capital, I. pp. 774-86.

৮. Studies in the Development of Capitalism. pp. 142-3.

৯. The Transition from Feudalism to Capitalism London. 1954.

১০. Capital III p. 778.

১১. Chapter on "Historical Tendency of Capitalist Accumulation". Capital. I. pp. 786-90.

১২. Capital I, p 787.

১৩. Capital. I. p. 774 ডব মনে করতেন, ক্ষুদ্র উৎপাদকরা 'অসাধারণ' ভূমিকা পালন করেছিল। মার্কসের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

১৪. R.H. Tawney, "Rise of the gentry". Economic History Review, XI (1941). 1. reprinted in E.M. Carus- Wilson op.cit . pp. 153-206. esp pp. 186-7.

১৫. Franklin F. Mendels, 'Proto-industrialization the first Phase of the Industrialization Process' Journal of Economic History, XXXII (1972). pp. 241-61.

১৬. Studies p. 134.

১৭. Capital, III, p. 331. See also ibid.. p. 322 "The independent development of merchant's capital therefore, stands in inverse proportion to the general economic development of society.

১৮. An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dent & Co.. London. 1910. I. pp. 4-11.

১৯. The Wheels of Commerce. Fontana. London 1985, pp. 329-44.

২০. David Ricardo The Principles of Political Economy and Taxation, Dent & Co. London, 1911 pp. 263-71 (being chapter XXXI, on Machinery'. inserted in the 3rd ed. of 1821)

২১ Capital. I pp. 311-474.

২২. Braudel, Wheels of Commerce. p. 302 কিন্তু ব্রদেল মনে করেছিলেন যে মার্কস অন্যরকম ভাবতেন।

২৩ Studies. & C. pp. 268-71

২৪. Ibid. p. 271.

২৫. মার্কসের মৌলিক সংজ্ঞার জন্য : Capital, I. 736. Cf. Irfan Habib. Essays

in Indian History - Towards a Marxist Perception. Tulika, New Delhi, 1995. pp. 272-3.

২৬. Mare Bloch's perceptive remarks in French Rural History - an Essay in Basic Characteristics. London 1966. pp. 126 ff.

২৭. Eric Kerridge, 'Movement of Rent, 1540-1640'. Economic History Feview. 2nd ser VI (1953) I. reprinted. E.M. Carus-Wilson (ed.). Essays in Economic History. II London. 1966. pp. 208-26: and R.A.C. Parker. 'Coke of Norfolk and the Agrarian Revolution'. Economic History Review. 2nd ser.. VIII (1955). 2. reprinted in Carus-Wilson. op.cit.. p. 329.

২৮. Capital. I. p. 775.

২৯. Cf. Marx : "The discovery of gold and silver in America, the extirpation. enslavement and entombment in mines of the aboriginal popultion. the beginning of the conquest and looting of the East Indies, the turning of Africa into a Warren for the commercial hunting of black skins. signalised the rosy dawn of the era of capitalist production. These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation". (Capital. I. p. 775).

৩০. Shereborne F. Cook and Woodrow Borah Essays in Population History : Mexico and California. Berkely. 1979. II pp. 132. 168-76.

৩১. Eric J. Hamilton. 'American Treasure and the Rise of Capitalism'. Economica. November 1929. Cf. P. Vilar. A History of Gold and Money. London. 1976. pp. 103-193.

৩২. Philip Curtin. The Atlantic Slave Trade - A Census. Madison. 1976. See also Erie R. Wolf. Europe and the people without History. Berkely. 1982. pp. 195-6: Herbert S. Klein in Tracy. cd.. The Rise of Merchant Empires. & c..p 288; Stuart B. Schwartz in Indian Historical Review. XV (1988-89), pp. 23-24. By 1750 about one-tenth of those transported still died on the voyage (Klein. op.cit., p. 304)

৩৩. Cf. Sayera I. Habib proceedings of the Indian History Congress. 36th (Aligarh) session, Calcutta. 1976. p. xxiii.

৩৪. Capitalism and Slavery. Chapel Hill. 1944 - (Cf. Crouzet. Capital

Formation in the Industrial Revolution. pp. 7-8)

৩৫. K. N. Chaudhuri in Dharma Kumar (ed.) Cambridge Economic History of India. Cambridge. 1983. II. p. 817.

৩৬. Phyllis Deane and W. A. Cole, British Economic Growth, 1688-1959. Cambridge. 1962. pp. 34-35.

৩৭. Transition. p. 20.

৩৮. Ibid.. p. 29.

৩৯. Cf. Capital. I. p 776.

৪০. J. A. Hobson, Imperialism - a study. 3rd ed. London, 1988.

৪১. The Accumulation of Capital Eng. tr. by A. Schwarzehid. London. 1951. p. 446.

৪২. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, Eng. tr.. Progress Publishers. Moscow. 1988. p. 74.

৪৩. Studies. & c.. p. 311.

৪৪. Ricardo, Political Economy and Taxation. p. 71 : "The natural tendency of profits then is to fall".

৪৫. Capital III. pp. 232-3. Theories of Surplus Value. progress publishers. Moscow. 1971. pp. 105-6 তে মার্কস একটি দেশের মধ্যে দক্ষ-জটিল শ্রমের সঙ্গে অদক্ষ-সরল শ্রমের সম্পর্কের উদাহরণ টেনে বললেন, এ হেন পরিস্থিতিতে "the richer country exploits the poorer one. even where the latter gains by the exchange".

৪৬. Capital. III. p. 333.

৪৭. Art. in New York Daily Tribute. 3 December 1859 (Marx and Engels. Collected Works. Moscow, 1980. vol. 16. p 539)

৪৮. Art in NYDT. 11 July 1853 Marx and Engels. On Colonialism. Progress publishers Moscow. 1968. p. 49.

৪৯. Art. in NYDT. 30 April 1859. Marx and Engels, collected Works. Vol. 16. p. 286.

৫০. Art. of this title in Economic History Review. 2nd Ser. VI (1).

reprinted in A.G.L. Shaw (ed) Great Britain and the Colonies. London. 1970. pp. 142-63.

৫১. Shaw (ed.) op.cit. pp. 144-5.

৫২. Cf. D. K. Fieldhouse. Economics and Empire. 1830-1914. London 1984. pp. 53-62.

৫৩. ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এবং আরো পরে ব্রিটিশদের পুঁজির অনেকটাই এদেশেই তৈরি। (See Amiya Bagchi, Private Investment in India. Cambridge. 1972. pp 159. 165. 168. and Irfan Habib. Essays in Indian History. pp. 290-93.

৫৪. Capital. 1. pp. 788-9.

৫৫. Imperialism. the Highest Stage of Capitalism. pp. 86-7.

মানব সত্তা ঃ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ

পার্থসারথি গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সভায় আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। এই উপলক্ষ্যে আমার কয়েকটি চিন্তা ভাবনা আপনাদের কাছে নিবেদন করবো। প্রসঙ্গটি মূলতঃ মানবগোষ্ঠীর সত্তা-সচেতনতার বিষয়ে, সেই সচেতনতা থেকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্মেষ কেমন করে হয়, 'নেশন' নামক রাষ্ট্রই কি রাজনৈতিক সচেতনতার সর্বশ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে। প্রসঙ্গটি বহুবিতর্কিত, এ নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা হয়েছে। সেই বিভিন্ন তত্ত্বের কোন তথ্যগত ভিত্তি আছে কি না, ইতিহাস রচনার সময়ে প্রসব তত্ত্বের প্রয়োগ সত্যের অপলাপ করে কিনা, বিতর্ক এই নিয়ে।

আমার কাছ থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্ত আশা করবেন না। এ প্রসঙ্গ নিয়ে চিন্তা করতে করতে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে লেখা একটি কবিতার লাইন মাঝে মাঝে মনে পড়েছে ঃ "প্রথম দিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল/সত্তার নূতন আবির্ভাবে-/কে তুমি?/মেলেনি উত্তর/ .... দিবসের শেষ সূর্য/শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল/পশ্চিম সাগরের তীরে/নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-/কে তুমি?/পেল না উত্তর।"

মহাপ্রয়াণের নয়দিন আগে কবি যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন নিজের জীবন সম্বন্ধে, মানবগোষ্ঠীর সত্তাচৈতন্য (collective identity) প্রসঙ্গে আমিও হয়ত উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে অন্যান্য লেখকদের অভিমত আমার টিপ্পনী সহ আপনাদের কাছে পেশ করে বিতর্কটিকে কিছুটা প্রসারিত করতে উদ্যোগী হব।

বিদেশী পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্য ইতিহাসের অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে সব তত্ত্ব ও অনুমান ব্যক্ত করেছেন, তার প্রয়োগ আমাদের দেশের ইতিহাস চর্চায় করা হয়েছে কি না, বা যায় কি না, তারও উল্লেখ করবো।

সব ঐতিহাসিককে নিরপেক্ষভাবে চর্চা করতে বলা হয়, অনেকে সফল হন, অনেকে পারেন না। যাঁরা পারেন না, তাঁরা নিজেদের লেখার মধ্যে, ইতিহাসের

ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন, ব্যারাকপুর কলেজ, ১৯৯৬

ঘটনাবলীর মূল্যায়নের মধ্যে পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাঁদের পক্ষপাতিত্ব ঢুকিয়ে দেন। আমার বিশ্বাস প্রথমেই ঐতিহাসিককে নিজের bias টা স্বীকার করে ফেলা ভালো। এখন আমি সেটাই করবো।

সলিল চৌধুরীর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মর্মস্পর্শী গল্প "ড্রেসিং টেবিল" পড়েছিলাম ছেচল্লিশ বছর আগে। গল্পের শেষে গল্পের নায়ক ড্রয়িং মাষ্টার রহিম-উদ্দীনকে যখন পাকিস্তানী গুপ্তচর ভেবে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলে "একজন মানুষ।"[১] আমার bias ও মানবিকতার আদর্শের প্রতি আস্থা।

গত আড়াইশো বছরের ইতিহাসের উপর ফিরে তাকালে দেখা যায় যে একই ধরনের ঘটনা পরম্পরা আলোচ্য বিষয়ের উপর পণ্ডিতী গবেষণার সুযোগ দিয়েছে। এক একটি সমাজ বিপ্লব, এবং মহাযুদ্ধ ঘটেছে, তারপর যখন বিভিন্ন রাজ্যের পরিসীমার হ্রাসবৃদ্ধি হয়েছে, তখনই 'নেশন' কী, এ বিষয়ে বই-এর বাহুল্য।

ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের প্রথমার্ধ, সমকালীন ফরাসী বিপ্লব, আর নেপোলিয়নের যুদ্ধ বিগ্রহের পরে, যে দুই প্রজন্ম ১৮৭০ সালে ইটালী ও জার্মানির একীকরণ এবং ১৮৭৫ সালে ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধিজীবি এ বিষয়ে প্রচুর চিন্তা ও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ম্যাৎসিনীর মত যাঁরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের লেখা ছাড়াও জার্মানির একাধিক মনীষীর রচনা উল্লেখযোগ্য। ফ্রিড্‌রিখ লিষ্ট ১৮৪১ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জার্মান রাজ্যগুলির একীকরণ ও সরকারী সাহায্যের উপর জোর দিয়ে লিখলেন "দি ন্যাশনাল সিস্টেম অব পোলিটিকাল ইকনমি"। তার পঞ্চাশ বছর পরে— ততদিনে বিস্‌মার্কের কূটনৈতিক চালবাজীতে জার্মান ভাষাভাষীদের একটা বৃহদংশ একই রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে—অধ্যাপক ফ্রিডরিখ মাইনেকে 'ন্যাশনালিজ্‌ম' সম্বন্ধে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বইগুলি লিখতে শুরু করলেন। মাইনেকের লেখাগুলির প্রভাব জার্মানিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদূরপ্রসারী— কার্লটন হেংজ, হান্‌স্ কোন, এঁদের মাইনেকের মন্ত্রশিষ্য বলা যেতে পারে।

মাইনেকের প্রথম রচনায় একটি সুর ধ্বনিত হয় যেটা মনে রাখা দরকার, সেই সুরের অনুরণন আমার বক্তব্যের অনেক জায়গায় আপনারা শুনতে পাবেন। ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি হিসেবে বিস্‌মার্ক সৃষ্ট জার্মান রাষ্ট্রটিকে বিচার করলে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং অন্যান্য সম্ভাবনার প্রতি অবিচার করা হবে। ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে প্রুশিয়াতে এবং জার্মানির অন্যান্য কটি রাজ্যে উদারনৈতিক সাংবিধানিক সরকার স্থাপনের যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, সেটা ১৮২০ সালে মেটারনিখের কার্লসবাড ডিক্রী বানচাল করে দেয়। মাইনেকে এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন, প্রুশিয়ার উদারনৈতিক সংস্কারক (যথা ষ্টাইন, বয়েন্য)-দের উপর সন্দর্ভ লেখা ছাড়াও ঐ যুগের একটি প্রাঞ্জল ইতিহাস লেখেন "এজ অব জার্মান লিবারেশন, ১৭৯৫-১৮১৫" নাম দিয়ে। ওঁর রচনার মধ্যে একটা করুণ-সুর ধ্বনিত হয় এই মর্মে যে জার্মানির ন্যাশনাল একীকরণ উদারনীতি ত্যাগ করে কূটনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে হয়েছিল। ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ যদি মানবজনের সর্বশ্রেণীর উন্নতিসাধন করতে চায় তাহলে উদারনীতি-আশ্রিত সংবিধানের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না।[২]

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল উদারনৈতিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের প্রবক্তা বলে পরিচিত। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে উনিও জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন যে 'ন্যাশনালিজ্‌ম্‌' এর সঙ্গে এই ধরনের সরকার স্থাপনের যোগ থাকা উচিত। যেখানে ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন 'ন্যাশনালিটি" খুবই মিলে মিশে আছে সেখানে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সরকার স্থাপন কার্যকরী হতে পারে না, যথা হাঙ্গেরীতে মাগিয়ার, শ্লোভাক, ক্রোট, সার্ব, রুমানিয়ান আর জার্মান। এক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সমান আইন-কানুনের পরিবেশে তাদের একসাথে বাস করা উচিত।[৩]

আর একজন ফরাসী মনীষী-অর্নেস্ট রেনাঁ (জন্ম ১৮২৩ সালে) একটি বিখ্যাত ভাষণে বলেন, "১৮৮২ সালে, ঠিক যেমন একটি লোকের অস্তিত্ব তার জীবিত থাকার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, তেমনি একটি নেশনের অস্তিত্ব যেন প্রতিদিন গণভোটের মাধ্যমে প্রতীয়মান হচ্ছে। ... একটি প্রদেশ বলতে আমরা তার অধিবাসীদের বুঝি এবং শুধু অধিবাসীদের পরামর্শই এ ব্যাপারে নেওয়া যেতে পারে।"[৪]

তার বছর তিরিশেক পরে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হোলো, তার পরিসমাপ্তিতে ইউরোপের মানচিত্র বদলে গেলো। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক রাজবংশগুলির পতন হলো মধ্য পূর্বইউরোপে, রাশিয়াতে, তুর্কী সাম্রাজ্যে। ইউরোপের অনেক জায়গায় গণভোট দ্বারা সীমান্তর অদল বদল হোলো, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী শান্তির আশ্বাস পাওয়া গেল না। অতৃপ্ত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা তুষের আগুনের মতো জ্বলতে লাগলো, আবার যুদ্ধ বাধবে কি না সে ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে সময়ে ব্রিটেনের নয়জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক ই. এচ. কার-এর সভাপতিত্বে 'ন্যাশনালিজমে'র উপর একাধিক সেমিনার করে আখেরে একটি বই লেখেন, তাঁদের

সহায়তা করেন আরো বত্রিশ জন নাম করা মনীষী।[৫] বইটি প্রেসে গেল ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে—তিনমাস পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো, বইটি বেরোবার আগেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর অর্ধশতাব্দী কেটে গেছে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ধ্বজা এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে বিদায় নিয়েছে, অনেক নতুন রাষ্ট্র নিজেদের 'নেশন' বলে পরিচয় দিয়ে U.N.O.-র সদস্য হয়েছে, কিন্তু ঝগড়াঝাঁটির শেষ নেই, আভ্যন্তরীণ আত্মকলহ আছে। স্বভাবতঃই এই বিষয়ে গবেষণা আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে। গত দশপনেরো বছরের মধ্যে প্রকাশিত এ বিষয়ে অনেক বই-এর মধ্যে তিনটি মূল্যবান বই একটু খতিয়ে পড়া দরকার, আর্নেস্ট গেল্‌নার-এর "নেশন্‌স্ অ্যাণ্ড ন্যাশনালিজ্‌ম" (১৯৮৩), বেনেডিক্ট অ্যাণ্ডার্সনের 'ইম্যাজিন্‌ড কমিউনিটিজ" (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১), এবং এরিক হবস্‌বমের "নেশন্‌স অ্যাণ্ড ন্যাশনালিজ্‌ম সিন্স ১৭৮০" (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পরিশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯২)। আর একজন ইংরেজ লেখক, অ্যান্টনি ডেভিড স্মিথ, পেশায় সমাজবিজ্ঞানী, এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনেক লিখে চলেছেন, গত বৎসর থেকে ওঁর সম্পাদনায় কেমব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রেস 'নেশন্‌স্ অ্যাণ্ড ন্যাশনালিজ্‌ম" নামে একটি চতুর্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছে। তুলনামূলক আলোচনার জন্য ঐ পত্রিকাটির প্রতি নজর রাখা দরকার।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমি ইংরেজী নেশন কথাটাই ব্যবহার করে যাচ্ছি। তার কারণ আছে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন স্মরণ করা যাক্। যে ফরাসী মনীষীর লেখা একটু আগে উল্লেখ করলাম, তাঁর ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি লেখেন, "বাংলায় নেশন কথার প্রতিশব্দ নাই। ... নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।"[৬]

বাংলায় কয়েকটি স্বদেশী গান ও কবিতার লাইন পরীক্ষা করা যাক্। ১৯২৭ সালে কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনে নজরুল ইস্‌লামের গাওয়া বিখ্যাত গানের শেষ দুটি লাইন : আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ/দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

এখানে জাতি অর্থে নেশন, এবং সাম্প্রদায়িকতা অর্থে জাত কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে (বেঙ্গল প্যাক্ট বিরোধী হিন্দুবিপ্লবীদের লক্ষ্য করে)। চলিত ভাষায় আমরা যাকে 'জাত' বলি, সেটাই সাধুভাষায় জাতি বলা হয়। হিন্দু সমাজে জাতিভেদপ্রথা থাকার ফলে নেশন-নামক রাষ্ট্রকে জাতি বললে অনেক গোলমাল হবে। ইংরেজীতে

যাকে ethnicity বলে তারও প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে না।

নজরুলের গানের বছর ছয়েক আগে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পাই—

"বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই!
ভারতে উদয় হয় নেশনের
এসেছে সময়, দেরী তো নাই।'

নয়টি স্তবকে বিভক্ত এই দীর্ঘ গীতি কবিতার প্রতিটি স্তবকের পরে উপরে উদ্ধৃত শেষ দুই পংক্তি "কোরাস" হিসেবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কবিতার পরবর্তী অংশে লক্ষ্য করি যে কবি 'নেশন' কথাটি ব্যবহার করেছেন আরো ছয়বার, যদিও বৈচিত্র্যের খাতিরে 'কোরাস' অংশটিতে নেশনের বদলে "মহাজাতি", "মহাশঙ্খ", "বিশ্বরূপ", "মহামিলন", "মহামানব", "মহতো মহীয়ান", "বিরাট" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এই শব্দগুলির মধ্যে শুধুমাত্র "মহাজাতি" নেশন অর্থে অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে—অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গীতে "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান/বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান/দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান/জগজ্জন মানিবে বিস্ময়", এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ইমারৎটির নামে (মহাজাতি সদন)।

তবু নেশন-এর প্রতিশব্দ হিসেবে মহাজাতি ব্যবহার করতে আমার অস্বস্তি আছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা ভালো " 'গ্রেট নেশন' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয়, এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'ক্ষুদ্র মহাজাতি' বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।"[৭]

তাই 'নেশন' কথাটাই চলুক এই নিবন্ধে। 'জাতি' কথাটি আমি race বা ethnicity-র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছি। যেসব লেখকদের মতবাদ বিশ্লেষণ করবো তাদের মধ্যে একজন—অ্যান্টনি ডেভিড স্মিথ-জাতিসত্তা থেকে নেশনের উদ্ভবের উপর দশ বছর আগে একটি বই লিখেছিলেন (এথ্‌নিক অরিজিন্‌স অব নেশন্‌স, লণ্ডন ১৯৯৫), তাই নেশন এর বদলে জাতি লিখলে আলোচনা পরিষ্কার হবে না।

ন্যাশনালিজ্‌ম এর প্রতি আনুগত্যের প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্য কয়েকটি দিকে জনগোষ্ঠীর সত্তাচেতনার উদ্ভব নিয়ে আলোচনা হয়েছে গত বিশ বছরে। নিম্নবর্ণের শ্রেণীসংগ্রামের বিচিত্র রূপের মধ্যে কীভাবে শ্রেণী সচেতনতার উন্মেষ হয়, কী

ধরনের প্রতীক ধর্মিতা সেই চেতনাকে জিইয়ে রাখে, এই নিয়ে গবেষণার অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ন্যাশনালিজম্‌কে সাবলীল করে তুলতে যেমন বিভিন্নভাবে জনসংযোগের কায়দা রপ্ত করতে হয়, নানাধরনের প্রতীক ব্যবহার করা হয়, কিষান-মজদুরের আন্দোলন এগিয়ে নিতে এবং ওদের সংগঠন প্রচেষ্টাকে ছড়িয়ে দিতে অনুরূপ আঙ্গিকের প্রয়োজন হয়। একটার ইতিহাসে অন্যটার আভাস পাওয়া যায়।

অনেকে বলছেন যে একটার উপর গভীর মনোযোগ দিলে অন্যটার প্রতি অবিচার করা হবে। অনেক 'ন্যাশনালিষ্ট' ঐতিহাসিক তাই নিম্নবর্গের সত্তাচৈতন্যের, নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক জীবনের সাবলীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা তুলে ধরাতে নেশনের মহিমাময় আদর্শকে একটা খাটো করা হয় বলে মনে করেন। এঁরা ভুলে যান যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে নানা সত্তাচৈতন্য সম্ভব। স্থানকালপাত্র বিশেষে একই লোক নিজের সত্তার বিভিন্ন দিক প্রকট করে।[৮]

এবার আলোচনা করা যাক 'নেশন' সম্বন্ধে অলনার, আন্ডার্সন, হবস্‌বম, আর স্মিথ কী বলেছেন, আর তা কতটা গ্রহণযোগ্য। এই চতুষ্টয়ের মধ্যে একটি ব্যাপারে প্রথম তিনজন একদিকে, চতুর্থজন বিপরীত দিকে। প্রথম তিনজন বলতে চান যে 'নেশন' নামক যে ধরনের রাষ্ট্রকে আমরা বুঝি সেটার উদ্ভব হয়েছে ইউরোপে আধুনিক যুগে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সুদূর প্রসারী প্রভাবের ফলে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে 'মর্ডানিষ্ট' আখ্যা দেওয়া যায়। গেল্‌নার বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে নানা কারণে কৃষি নির্ভর সমাজে 'নেশন' গড়ে ওঠা শক্ত। শিল্পায়ন, পুঁজিবাদের বিস্তার, স্বাক্ষরতার প্রসার, জনসংযোগ প্রসারণের আঙ্গিকের উৎকর্ষ— ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমেই নেশনের জন্ম হয়।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যতো বিশ্বজোড়া শিল্পায়নের ব্যপ্তি দেখা যাচ্ছে, আর গণ মাধ্যমের প্রযুক্তিবিদ্যার অবাক করা কলকব্জা পরকে নিজ বন্ধু আর দূরকে ভাই করে তুলেছে, এবং চোখের সামনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া চলছে, তখন এই সব ঘটনার প্রাসংগিকতা নেশন সৃষ্টির ব্যাপারে স্বীকার করতে হবে।

যে তিনজনকে মডার্নিষ্ট আখ্যা দিয়েছি তাঁদের বিপরীত দিকে আছেন স্মিথ। যদিও আমি নিজে মডার্নিষ্টদের লেখার ঝোঁকটার প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল, তাঁদের তত্ত্বকটি ব্যাখ্যা করার আগে স্মিথ-এর দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার সঙ্গে আমার বিরোধিতা

কোথায় তার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। স্মিথ অন্যদের 'মডার্নিষ্ট' বলে নিজেকে 'পেরেনিয়ালিষ্ট' বা চিরন্তনপন্থী আখ্যা দিয়েছেন। উনিও নেশন বলতে একটি রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেন, তবে ওঁর মূল প্রতিপাদ্য তত্ত্ব নিম্নরূপ। সকল লোকের মধ্যেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকার প্রবণতা আছে, মনুষ্যমাত্রেই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উদ্দেশে বহুবিধ সংকেত, স্মারকচিহ্ন ও চিত্রকল্প ব্যবহার করে থাকে, সেহেতু বিশ্ব ইতিহাসে সব সময়েই 'নেশনের' অস্তিত্ব এবং ন্যাশনালিজ্‌ম-এর ভাবধারা দেখা যায়।[৯]

প্রচুর বইপত্র ঘেঁটে পাদটীকা কন্টকিত সাত অধ্যায়ের এই বইটিতে কয়েকটি বক্তব্য চিন্তার খোরাক জোগায়। কতগুলি পুরাণকথা, লোকাচার, প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ হিসেবে বংশপরম্পরায় লোকে ধরে রাখে, চারুকলা, স্থাপত্য, ধর্মোপাসনা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তার বিশিষ্টতা দেখা যায়, এবং তারই উপর ভর করে একটি জাতিসত্তা (ethnic identity) প্রকটিত হয়।[১০] রক্তে মিশে থাকে সে ভাষা, প্রতিপুরুষের স্বপ্নে ছিল তার যাওয়া-আসা।

এটা ঠিক কথা, কিন্তু এটাও ঠিক—এক জায়গায় স্মিথ সেটা মেনে নিয়েছেন—যে এই সচেতনতা চিরস্থায়ী নাও হতে পারে, বিশেষ করে যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বহিরাগত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য, অথবা কোন নতুন ধর্মের উপাসনা একটি জনগোষ্ঠীর প্রাক্তন জাতিসত্তার চিহ্নগুলিকে মুছে ফেলতে পারে।[১১]

কট্টর চিরন্তনপন্থীরা বলবেন, "মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর/বিস্মৃতির তলে/নাহি মনের উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির/ আঘাতে না টলে।"

আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে 'ন্যাশনালিজ্‌ম" এর আদর্শ অনেক সময়ে অতীত যুগের স্মৃতি সম্পদে পুষ্ট হয়েছিল, আমাদের দেশে তার অনেক উদাহরণ আছে, উপন্যাসে, গানে, কবিতায়, আপনারা সকলেই তা জানেন। কিন্তু সেই স্মৃতিসম্পদ কী সত্যিই জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের আচার ব্যবহারে, রুজি-রুটির লড়াইয়ে প্রতিফলিত হতো? না শিক্ষিত উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবিদের অনুসন্ধিৎসার ফলে তা জানা গেলো, এবং তারাই সেটা প্রচার করেছিলেন? ভাববার কথা।

এ প্রসঙ্গে ফরাসী-মনীষী রেনার পূর্ব-উল্লিখিত ভাষণ থেকে আরেকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, উদ্ধৃতিটি ভবিষ্যদ্‌ দ্রষ্টার মত এক অশুভ সংকেত বাণী বহন করেছিল : "এই

জাতিভিত্তিক প্রকল্প (ethnographic policy) তে বিপদ আছে। আজ আপনি এটা অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেন, এবং পরে দেখবেন এটা আপনারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। যে জার্মানরা আজ জাতি-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন, তারাই একদিন দেখবেন স্লাভরা স্যাক্শনি এবং লুসাৎসিয়াতে গ্রামগুলির নামগুলির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করবে? অথবা বলবে যে তাদের পূর্বপুরুষদের উপর অত্যাচারের বদলা নিতে হবে? আমাদের সকলকেই কিছু জিনিষ ভুলে যেতে শেখা উচিত।"[১২]

নানা রক্তপাত ও বীভৎস ঘটনার মধ্য দিয়ে রেনার আশংকা সত্যি হয়েছে। আজ ইউরোপে ডান্‌জিগ হয়ে গেছে গডাথক্, কালর্সবাড কাৎর্লোড ভারী, লাইবাখ্ ল্যুবলিয়ানা, ব্রেস্‌লাউ রোক্লাফ ইত্যাদি।

উদ্ধৃত অংশটির একটু আগে রেণাঁ আর একটা কথা বলেছিলেন সেটা এ প্রসংগে মনে রাখা দরকার : "একটা 'নেশন' তৈরী করতে হলে কিছু ভুলে যাওয়া দরকার এবং ইতিহাস পড়াতে ভুল করা দরকার" রবীন্দ্রনাথ ফরাসী জানতেন কি না আমি জানি না, তবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী, শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়ের 'বি. বি. দিদি' ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। হয়তো তারই সহায়তা নিয়েছিলেন কবিগুরু এই প্রবন্ধটি রচনা কালে। লক্ষ্যণীয় যে রেনাঁর প্রবন্ধের শেষ ভাগটি রবীন্দ্রনাথের "নেশন কী"র সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে তুলনা করলে দেখি রেণাঁর ভাবার্থ থেকে কবিগুরু এক ব্যাপারে একটু বিচ্যুত হয়েছিলেন। রেনাঁর কয়েকটি উচ্ছ্বাসপ্রবণ অতীতাশ্রয়ী বাক্য উনি অনেক আগ্রহসহকারে বাংলায় লিখেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে গণসমর্থনই যে 'নেশনের ভিত্তি' রেণাঁর এই কথাটি অতটা প্রাধান্য পায়নি।[১৪] যদি উনি রেণাঁর বক্তব্য আরো গভীরভাবে চেষ্টা করতেন বুঝতে তবে হয়ত এ সময়ে ওঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে যে পশ্চাদবলোকন দেখা যায় সেটা ফুটে উঠত না। মনে রাখা দরকার যে এই প্রবন্ধের পরেই "ভারতবর্ষীয় সমাজ" বলে যে লেখাটি ওঁর রচনাবলীতে আছে তা মাসিক পত্রিকায় "হিন্দুত্ব" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১৫]

রেণাঁর লেখা ও রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করার আগে চিরন্তনপন্থী স্মিথ-এর মতামত সম্বন্ধে যা বল্‌ছিলাম তাতে ফিরে আসা যাক্। বল্‌কান উপদ্বীপের ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে তুর্কী আক্রমণের আগে সার্বিয়াতে যে রাজবংশ রাজত্ব করতো সার্বিয়ার লোকগীতিতে সেসব রাজাদের শৌর্যের কথা ভাস্বর ছিল।[১৬] সার্বিয়ার অর্থোডক্স্ চার্চ তাঁদের 'সন-এর স্তরে উন্নীত করেছিল, এবং প্রতিনিয়ত

উপাসনার মধ্যে তাঁদের নামোল্লেখ হত।[১৭]

উল্টোদিকে, "ন্যাশনালিজম্"-এর স্বার্থে ইতিহাসকে আশ্রয় করে বুদ্ধিজীবিদের একটি অপপ্রয়োগের উদাহরণ ঐ উপদ্বীপেই পাওয়া যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে হাঙ্গেরীর ভূস্বামীদের রাজনৈতিক আধিপত্য হটাবার জন্য ক্রোয়াশিয়ার জনকয়েক বুদ্ধিজীবি প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ইলিরিয়া প্রদেশের ইতিহাস স্মরণ করে প্রস্তাব করেন ক্রোট, সার্ব, শ্লোভেনদের একত্র করে, এড্রিয়াটিকের উপকূলে ইলিরিয়া দেশ সৃষ্টি হোক। শ্লোভেন অঞ্চলের এক বিখ্যাত কবি সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন, তাঁর আশংকা ছিল এর দ্বারা এই কল্পনা প্রসূত দেশে স্লোভেনদের উপর সার্বো-ক্রোয়াশিয়ার ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।[১৮] (পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ এককালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দু চাপাবার যে চেষ্টা করেছিলেন তার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়)।

এ অবধি যা বললাম তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রাচীন স্মৃতির ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রে মরুপথে হারিয়ে যায়, যেখানে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে সেখানেও পরবর্তী যুগের, বিশেষ করে আধুনিক যুগের কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিরা তাকে পুনরুজ্জীবন করে।

স্মিথ-এর বিশ্লেষণের ত্রুটি হোল যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজা-রাজড়াদের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে যে ধরনের প্রচারধর্মিতা উনি লক্ষ্য করেছেন, সেই প্রোপাগণ্ডাটাকেই উনি জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন। সুপ্রাচীন যুগের গ্রীক ও পার্শিয়ানদের যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যেও এ যুগের নেশনে নেশনে মারামারীর প্রতিধ্বনি দেখেছেন।[১৯] গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ হলে "যুদ্ধং দেহি" মনোবৃত্তির কয়েকটা স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ আছে, সেটা লড়াই করার ভঙ্গীমাত্র, বিবদমান পক্ষ দুটির প্রকৃত পরিচয় তাতে পাওয়া যাবে না। "স্মৃতিসম্পদের" যে সব উদাহরণ উনি দিয়েছেন সেগুলোকে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে "বিধিবদ্ধ" করার নমুনা, সে রাষ্ট্র-সামন্ততান্ত্রিক রাজার হোক সম্রাট বা রাজচক্রবর্তীর শাসকের হোক, অথবা নগরভিত্তিক রাষ্ট্রেরই হোক্।

স্মিথ-এর বই থেকে দুটি তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য এক, লোকাচার, জীবনযাত্রার শৈলী, উপাসনা পদ্ধতি বংশপরম্পরায় একটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পরিবারকে জাতিসত্তার চেতনা অর্পণ করে ; দুই, বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন পদ্ধতি এবং সামাজিক অনুশাসন আধুনিকযুগের আগে জাতিসত্তাকে জিইয়ে রেখেছিল।[২০]

বেনেডিক্ট্ অ্যাণ্ডার্সন চিরন্তনপন্থী নন, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের উপরে উনি একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। জীবনমরণের সীমানা ছড়িয়ে মানুষের অস্তিত্ব কি, সে প্রশ্ন থেকে অনেক ধর্মবিশ্বাসের উদয় হয়েছে। সেই একই ধরনের অনুভূতি থেকে মানুষের মনে 'নেশনের' কল্পনা জাগে। "আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি"—এই কটি ছাত্রের যে তীব্র উন্মাদনা তা অনেকটা ভগবতভক্তির উচ্ছ্বলতার কাছাকাছি। আমি হয়ত মর্তকায়ায় রবো না, কিন্তু আমি যে নেশনের নাগরিক সে নেশন ত থাকবে, আগেও ছিল, পরেও থাকবে। ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করা শাস্ত্রগুলি যেমন সাধকদের কল্পনাপ্রসূত, 'নেশনের' মধ্যে নিজের সত্তাকে নিমজ্জিত করা তেমনি কল্পলোককে বাস্তবায়িত করা।[২১]

অ্যাণ্ডার্সনের আর একটি তত্ত্ব এ বিষয়ে গবেষকদের মনে সাড়া জাগিয়েছে অন্যান্য লেখকরাও এটার উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েছেন, সেটি হল Print-Capitalism এটার দ্বারা উনি বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রন্থ মুদ্রণের কৌশলটি আবিষ্কার হবার পরে বই-এর একটা বাজার সৃষ্টি হল, সেই বাজারে জনসংযোগের উপায় আগের চেয়ে সহজ হলো। কী ভাষায় বই-পত্রিকা ছাপা হচ্ছে, এবং কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে কী ধরনের বইপত্রের চাহিদা বেশী, তা থেকে ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠীসচেতনতা সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। আমাদের দেশের ইতিহাসে এই ধরনের গবেষণার অগ্রগতি হওয়া উচিত, এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকদের ভাষা ও সাহিত্যের গবেষকদের সঙ্গে ধ্যানধারণার বিনিময় করা উচিত।

মধ্যযুগে তখন ইউরোপে এবং অন্যত্র উচ্চবর্গের শাসকগোষ্ঠী ধর্মযাজকদের সহায়তায় রাজকার্য চালাতো, তখন যে ভাষা ব্যবহৃত হত, তা জনগণের ভাষা নয়। নেহাৎ শাসনকার্যের তাগিদে ধ্রুপদী ভাষাগুলির বদলে অনেক জায়গায় স্থানীয় কথা ভাষারও ব্যবহার শুরু হয়। Print-Capitalism সেই ব্যবহারগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী স্বীকৃতি দেয়। সেভাবেই ইউরোপের নেশনগুলির প্রধান প্রধান ভাষা বিস্তার লাভ করে ও পরে ইউরোপীয় গণরাষ্ট্রগুলির প্রধান ভাষা বলে বিবেচিত হয়।[২২]

ভাষা 'নেশন' সৃষ্টির পক্ষে কতটা জরুরী? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে দেখতে হবে নেশন-নামক রাষ্ট্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? এ অবধি যা বলেছি তা থেকে ধরতে পারবেন যে গণতন্ত্র ও জনমতের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত সেটাকেই আমি 'নেশন' বলি, অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি রাজ্য হতে পারে; একনায়কতন্ত্র হতে পারে, বা অন্য কিছু। একটি গণতন্ত্রের পক্ষে জনসংযোগের ভাষা যদি একটা ভাষাই হয়

তাহলে গণতন্ত্র চালানো সুবিধা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণ, কিন্তু সেখানে সকলে আগ্রহ সহকারে মার্কিন ইংরাজী শেখে, পিতৃপুরুষের ভাষার ব্যাপারে জোরদার করে না। হব্‌স্‌বম দেখিয়েছেন যে ভাষা আন্দোলন এবং 'নেশনের' সংহতির সম্পর্কটি জটিল। স্বাক্ষরতা এবং মুদ্রণ প্রসারণের আগেকার যুগে লোকে যে শুধু ভাষার মাধ্যমেই পারস্পরিক সান্নিধ্য অনুভব করতো তা নয়।

অনেক সময়ে 'ন্যাশনালিষ্ট' নেতারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার জন্য ভাষাগত তফাৎটা তুলে ধরেন। আর্য়াল্যাণ্ডে ন্যাশনাল আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল ইংরেজ জমিদারদের প্রভুত্ব ও শোষণ। আইরিশরা তাদের বিশিষ্ট উচ্চারণ সংগীতে ইংরেজী ভাষাই বলত। ১৮৯৩ সালে "গেরিক লীগ" যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কোন ধারণা ছিল না।[২৩]

নানা ধরনের নিপীড়নের ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একত্র হয়ে বিদেশী শাসকশ্রেণী অথবা স্বদেশী শোষকবর্গের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে। এই আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ভাষাভিত্তিক কার্যসূচীর প্রবক্তারা সাধারণতঃ পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। অনেকক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে মাতৃভাষার একটি বিশিষ্ট রূপকে ঘষে মেজে নেশনের ভাষা বলে চালাতে চেষ্টা করেন।

গেল্‌নারের একটা 'থিসিস' আমায় কিঞ্চিৎ ভাবিয়ে তুলেছে। কৃষিনির্ভর প্রাক্-বুর্জোয়া জগতে নেশন সম্ভব নয়, কেননা সেই জগতে জনগোষ্ঠী গুলির অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সীমিত ছিল। সত্ত্বাসচেতনতা তাই সেই যুগে নানা অঞ্চলে খণ্ডবিচ্ছিন্ন ছিল, ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করার একমাত্র উপায় ছিল কোন বিশ্বজনীন ধর্মের প্রভাবে, অথবা কোন ক্ষমতাসম্পন্ন সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের আদর্শে। স্বাক্ষরতা ও শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ এত কম ছিল 'নেশন' গড়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে শিল্পায়ন, পুঁজিবাদের বিস্তার ও বাণিজ্যের শিল্পায়ন, পুঁজিবাদের বিস্তার ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হলো, এবং জনমানবের আনাগোনাও অনেক বেশী হলো। এই অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে চেনাজানা না হলেও ছাপার অক্ষরে অন্য জায়গায় ও লোকদের খবর পাওয়ার ফলে সীমিত গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী লোকেদের মন থেকে সরে যায়, গোষ্ঠীর দিগন্ত প্রসারিত হতে হতে রাষ্ট্রের পরিধিতে গিয়ে ঠেকে। নেশন ও রাষ্ট্র এক হয়ে যায়।

মডেলটা সুন্দর। সমস্যা হলো আমাদের দেশের গত দুই শতাব্দীর ইতিহাসে এটা মেলানো যায় কি? এদেশে গণতন্ত্র কায়েম হয়েছে, জনসংযোগ মাধ্যম অনেক উন্নতি করেছে, কিন্তু সাক্ষরতা ও শিক্ষার বিস্তার জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে অসম্ভব পিছিয়ে পড়ে আছে। সামনের বছর আমর কী একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর উৎসব করবো, না একটি নেশনের?

মডেলটা মেলানো যায়, যদি আমরা স্মরণ করি কাজী আব্‌দুল ওদুদ সাহেবের একটি উক্তি। তিনি আমার দিদিমা প্রয়াত লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বলেন, "ইতিহাস এখনও শেষ হয়ে যায়নি।"[২৪]

যদিও আমাদের কলেজের পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হয় ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে, ঐ দিন ইতিহাস শেষ হয়ে যায়নি। বর্তমান দশকের দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের আলোচ্য বিষয়ের জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে কতগুলি ঘটনা যা সাধারণতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যসূচীতে পড়েঃ ১৯৫৭ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন, পরবর্তী দুই দশকে আরো কয়েকটি রাজ্যের আবির্ভাব, পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, শিল্পায়ন এবং প্রচারমাধ্যমের বিকাশ (যা সাহেবদের যুগে হয়নি বললেই চলে)[২৫] এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস পার্টির একাধিপত্যের অবসান। সাহেবদের আমলে এই উপমহাদেশের নিপীড়িত মানুষ বিভিন্নভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের জুলুমের প্রতিবাদ করেছিল। ওরা চলে যাবার পর সেই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি নেশন সৃষ্টি করার পথে যাত্রা শুরু করে।

ধন্যবাদ।

সূত্র নির্দেশ

১. গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়, যতদূর মনে পড়ে, অধুনালুপ্ত নতুন সাহিত্য পত্রিকায়। পুনর্মুদ্রিত হয়েছে একটি গল্পসংকলনে, আখতার হুসেন (সঃ), সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গল্প (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১) পৃ. ১৩৪-৪৩। এ প্রসঙ্গে একটি সত্যঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রয়াত রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান সাহেবের কাছে ১৯৮৮ সালে তিন ধর্মে দীক্ষিত এক ভদ্রলোক দেখা করেন, নাম বলেন পিটার মহম্মদ গাজী বংশী চক্রবর্তী। 'কোন ধর্মাবলম্বী', এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, "মানব"। (আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০ অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ. ১)

২. দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি : "An historical interpretation which took the national unification of 1870 as its point of reference could assume that everything had transpired exactly as it should have.....But

it may be permitted a younger generation, groaning under the burden of social problems which seem almost insoluble, to turn with a feeling of a nostalgia towards these luminous thoughts of the age of the reforms... " দ্রষ্টব্য Carlo Antoni, From **History to Sociology : the transition in German Historical thinking (London, Merlin Press 1962) P. 86.**

৩. জন স্টুয়ার্ট মিল, 'কনসিডারেন্‌স অন রেপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট, ষোড়শ অধ্যায়, (Mill, Collected Works. (ed. J. M. Robson), vol. XVIII (University of Toronto Press, 1977) pp. 548-9.

৪. Ernest Renan, 'What is a Nation', in Alfred Zimmern (ed), **Modern Political Doctrines** (London, Oxford University Press, 1939) pp. 203-4 থেকে অনূদিত।

৫. এই নয়জন ছিলেন ই্‌ এচ্‌ কার, জি. এম্‌ গ্যাথোর্ন-হার্ডি, মরিস গিন্‌স্‌বার্গ, এন. এফ্‌ হল, টি. এচ. মার্শাল, এল জি রবিন্‌শন্‌, ডি এ রৌথ, সি. জি. ভিকার্স, এম্‌ জি বালফোর। বত্রিশ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন আর্নেস্ট বার্কার, জে. বি. এস. হল্‌ডেন, হান্‌স্‌ কোন, সি. এ. ম্যাকার্টনে আর এচ্‌ টনি, ই. এল. উড্‌ওয়ার্ড, আল্‌ফ্রেড জিমার্ন ইত্যাদি। বাইটি Royal Institute of International Affairs-এর তরফ থেকে Nationalism-a report by a Study Group নামে ১৯৩৯ সালের শেষে প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে London এ Frank Cass নামক প্রকাশনাসংস্থা এটাকে পুনর্মুদ্রিত করে।

৬. রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ), দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৬৭৬।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য : Peter Burke, "We, the people : popular culture and popular identity in modern Europe, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই বইতে S. Lash and J. Friedman (ed). Modernity and Identity (Oxford, Blackwell 1992) pp. 294, 305

৯. A. D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (London 1986) P. 12.

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১২. পাদটীকা ৪ এ উল্লিখিত বই, পৃ. ১৯৭-৮.

১৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯০, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "নেশন কী" প্রবন্ধে এই বক্তব্যটি অনুবাদ করেন নি, যদিও অন্যত্র প্রায় হুবহু ভাবান্তরিত করেছেন।

১৪. প্রাগুক্ত পৃ. ২০২-২০৪ , পাদটীকা ৬-এ রবীন্দ্রনাথের লেখাটির উৎস দেওয়া হয়েছে।

১৫. প্রশান্তকুমার পাল, রবি-জীবনী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫.

১৬. Najdan Pasic, 'Varieties of Nation building in the Balkans and among the Southern Slavs ' in S N Eisenstadt & S. Rokkan (ed), Building States and Nations, volume II (London 1973), P. 124.

১৭. E J Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, programme, myth, reality (Cambridge University Press, 2nd ed 1992) P 75f.

১৮. ১৬ নং পাদটীকায় উল্লিখিত বই, পৃ. ১২২, ১৩৮.

১৯. স্মিথ, প্রাগুক্ত, p 57ff

২০ প্রাগুক্ত ch 5, বিশেষ করে pp 110-25

২১ A Anderson, Imagined Communities (revised edition 1991), pp 9-12

২২. প্রাগুক্ত pp 37-46

২৩. ১৭ নং পাদটীকায় উল্লিখিত বই, পৃ. ১০৬ ; এই বই-এর এই অধ্যায়ে এ ব্যাপারে অনেক সারগর্ভ আলোচনা আছে।

২৪. সুবীর রায় চৌধুরী ও অভিজিৎ সেন (সম্পাদিত), জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, ১ম খণ্ড (কলিকাতা, দে'জ, ১৯৯১) পৃ. ১২৬.

২৫. এ প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকদের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্রষ্টব্য, Radio and the Raj, 1921-1947 (Calcutta K P. Bagchi, 1995)

আর্যতত্ত্ব ও ভারত-ইতিহাসের সূচনা ঃ একটি বিতর্ক

রোমিলা থাপার

ভারতীয়-ইতিহাসের অনেক উনিশ শতকীয় ব্যাখ্যাই জন্ম নিয়েছিল নানা তত্ত্ব থেকে, যে তত্ত্বগুলি ভারত-ইতিহাসের সূচনাকাল ব্যাখ্যা করার জন্য সৃষ্ট বলে মনে করা হত। ঐ তত্ত্বগুলি একদিকে যেমন অতীত সম্পর্কে ধারণা গঠনের জন্য ব্যবহৃত হত, তেমনি মর্যাদা এবং অভিজ্ঞতা বা পরিচয় নিয়ে সমসাময়িক সংঘর্ষকেও বৈধতা দেওয়ার কাজে লাগানো হত। তত্ত্বগুলি ভারতীয় অতীত 'আবিষ্কার'-এর ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টার মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল। অথচ এ কথা স্বীকার করা হয়নি যে ঐ-সব আবিষ্কার ঔপনিবেশিক বর্তমানকেও সংক্রামিত করেছিল। তত্ত্বগুলি শুধুমাত্র ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের কাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর উভয় আমলের বর্তমানের সঙ্গে অতীত বিষয়ের ধারণাগুলি কীভাবে নিকটসম্পর্কিত হতে পারে, তত্ত্বগুলি ছিল তার দৃষ্টান্ত।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতীচর্চার ফলে উদ্ভূত ভারতীয় ইতিহাসসম্পর্কিত ধারণাগুলি থেকে উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ প্রত্যক্ষভাবে ঋণগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় অতীত সম্পর্কে ইয়োরোপীয়দের পূর্বকৃত ধারণাগুলিতে এই তত্ত্বগুলি মিশেছিল ; এই ধরনের কিছু ধারণা ও তত্ত্বে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ আপত্তি জানিয়েছিলেন (থাপার, ১৯৯২)। এইসব তত্ত্বের গুরুত্ব ব্রিটিশদের পাণ্ডিত্যের মধ্যে নিহিত ছিল, যে পাণ্ডিত্য মনে করত ভারতীয় সভ্যতায় ইতিহাসবোধের অভাব প্রকট। যে কাঠামোকে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে রেখে ভারতীয় পুনরাবিষ্কার করা হয়েছিল, তা হলে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা; এই প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা একদিকে আক্ষরিক অর্থে প্রাচ্য বিষয়ে গবেষণা এবং অন্যদিকে উপনিবেশের অতীত ব্যাখ্যা করার ঔপনিবেশিক পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টার মতাদর্শগত বাগ্‌বৈশিষ্ট্য।

ভারত-ইতিহাসের সূচনা শুধু নয়, তার বিবর্তনেরও রূপ গঠিত হয়েছিল, তার

চর্তুদশ বার্ষিক সম্মেলন, কলকাতা, ১৯৯৮

গড়ে ওঠার পিছনে দুটি প্রধান ঐতিহাসিক তত্ত্ব ছিল প্রভাবশালী। এর মধ্যে একটি ছিল আর্যজাতির তত্ত্বের মধ্য দিয়ে ভারত-ইতিহাসের সূচনাকাল অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। এই তত্ত্ব শুরু হয়েছিল অপরিহার্যভাবে ইয়োরোপীয়দের উৎপত্তি বিষয়ে ইয়োরোপীয়দের ব্যাপৃত থাকার মধ্যে, পরে তা ভারতীয় অতীতের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় (পোলিয়াকভ, ম্যাক্সমুলার)। দ্বিতীয় তত্ত্বটি এই ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে বিগত এক হাজার বছরের ভারতীয় সমাজ দুটি একশিলা সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত, এই দুই সম্প্রদায় হলো হিন্দু এবং মুসলমান—এবং এই দুটি সম্প্রদায় প্রায়শই একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে এবং তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতির ভিত্তি গঠন করেছে।

এই সব ঐতিহাসিকচর্চার প্রতি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী ও ক্রিয়াকলাপে যুক্ত নানা গোষ্ঠী কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। ঐ সব গোষ্ঠী তত্ত্বগুলি শুধুমাত্র নিজেদের অতীত ইতিহাস লেখার কাজে ব্যবহার করেছে এমন নয়, ভারতীয়দের নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরার ব্যাপারেও যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, এমনকি আরও একধাপ এগিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহার করেছে। যেহেতু বর্তমান বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত পরিসরে একইসঙ্গে দুটি তত্ত্ব বিচার-বিবেচনা করা অসম্ভব, আমি আমার বক্তব্য সম্প্রসারিত করব প্রথমটির মতাদর্শগত ভূমিকা প্রসঙ্গে , অর্থাৎ আর্যতত্ত্ব এবং তার বিভিন্ন পাঠ বিষয়ে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে উইলিয়াম জোনস্ গ্রিক এবং ল্যাটিনের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন এবং একটি 'কমন' পূর্বসূরী ভাষার সম্ভাবনাও ঐ বক্তব্যে ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বৈদিক সাহিত্যের বিষয়ে চর্চার ফলে এই যোগসূত্র আরও বর্ধিত হয়েছিল। ধ্রুপদী ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃতের তুলনা এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, ইয়োরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার বিবর্তন এতে উৎসাহিত হয়েছিল। গ্রিক-ল্যাটিন এবং সংস্কৃত উভয়ের একই পূর্বসূরী ভাষার ধারণা এতে মান্যতা পেয়েছিল। কালক্রমে এই ভাষাটি ইন্দো-ইয়োরোপীয় নামে অভিহিত হতে শুরু করে, যা ছিল বহু ভাষাগোষ্ঠীর পূর্বসূরী। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার ভারতীয় শাখাকে বলা হলো এরিয়ান অথবা ইন্দো-এরিয়ান, যার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো বৈদিক সংস্কৃত।

কমন পূর্বসূরী ভাষার ধারণা থেকে একটি ভ্রান্ত ভাবনার জন্ম হলো। তা এই যে, যাঁরা ঐ ভাষার সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতেন তাঁরা শারীরতত্ত্ব এবং

জাতিগত দিক থেকেও সম্পর্কিত। এর দ্বারা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাভাষী মানুষদের একই কমন বা একই পূর্বসূরী জাতির অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়েছে ভাষা এবং জাতি পারস্পরিক পরিবর্তনশীল ধরে নেওয়া হয়েছে। এবং এর থেকেই আর্য জাতির তত্ত্বের উদ্ভব। কিন্তু জাতি এবং ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। জাতি কথাটি জৈবিকসূত্রে উত্তরাধিকার বা বংশপর্যায়ের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত; অপরপক্ষে ভাষা হলো এক সাংস্কৃতিক বিষয় এবং তা যে কেউ লিখতে পারেন—তার জন্ম যেখানেই হোক না কেন। সুতরাং এরিয়ান বা আর্য কথাটি হলো একটি ভাষার নাম, যা আর্য ভাষাভাষী মানুষদের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কিন্তু তাই ভ্রান্তভাবে জাতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে ইয়োরোপীয় জ্ঞানচর্চা আর্যদের উৎপত্তি বিষয়ে ধারণার ব্যাপারে এবং আর্যদের আদি বাসভূমির অনুসন্ধানের ব্যাপারে অত্যুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

আর্যজাতির তত্ত্ব ইয়োরোপের প্রাচীন ইতিহাস বাইবেলে উল্লিখিত উদ্ভবের পরিবর্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল অন্য চিন্তায়, যা তৎকালে ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি 'বিজ্ঞানসম্মত', যেমন জাতিগত উদ্ভবের চিন্তাধারা। জাতি বিষয়ক ধারণা নানাবিধ সমকালীন তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতি বিজ্ঞানী লিনিয়াস গাছপালার বর্গ এবং প্রজাতির সংজ্ঞা নিরূপণের নীতি ঠিক করেছিলেন এক সর্বজনীন পদ্ধতি তৈরি করার জন্য। এটি পরে অন্যান্য শ্রেণীবিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে যেমন মানবগোষ্ঠীর বেলায় এক আদর্শ নমুনা হিসেবে কাজ করেছিল। সামাজিক বিবর্তনবাদ রূপ পেয়েছিল বিভিন্ন বৈচিত্রময় ধারণার মধ্যে যেখানে 'যোগ্যতমরাই একমাত্র টিকে থাকার বা বাঁচার অধিকারী' তত্ত্বের আদর্শস্থানীয় নমুনা হিসেবে ইয়োরোপীয়দের দেখা হত। আর্যদের দেখা হত এক উন্নত জাতি হিসাবে এবং জাতিবিজ্ঞান হলো জ্ঞানচর্চার এক বৈধ বিষয় (স্টেপ্যান)। জাতিগুলির মধ্যে উঁচু-নিচু স্তর বিন্যাসের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু জাতিকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নত হিসেবে দেখা হত। সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিত করেছিল যে যাঁরা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য শাসন করত তারাই যেন সামনের সারিতে থাকে।

'এরিয়ান' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছিল কারণ ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রাচীনতম গ্রন্থ দুটি, আবেস্তা এবং ঋগ্বেদ, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উল্লেখ করেছে 'ঐরিয়' এবং 'আর্য' বলে। আর্যদের একটি বাসস্থানে সংস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল, যে বাসস্থান থেকে তারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল বলে বলা হয়েছে এবং মধ্য

এশিয়াকে এই বাসস্থান ধরা হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ শাসিত এশিয়ার পরিবর্তে ইয়োরোপেই আদি বাসভূমির অবস্থান দেখাতে চেয়েছিল, সুতরাং উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই উত্তর ইয়োরোপীয় নর্ডিক সোনালী কেশযুক্ত মানুষজন আর্যদের আদিকল্প বলে আবির্ভূত হলেন (টেলর)। তখন এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে আর্যদের দুটি শাখা ছিল, একটি ইয়োরোপে বিবর্তিত হয়েছে এবং অপরটি মধ্য এশিয়া থেকে পরিযান মারফৎ ইরান এবং ভারতবর্ষে গিয়েছে। ম্যাক্সমূলারের মতে, এই শেষোক্ত আর্যগণই ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করেছিল, দেশীয় এবং আদিম জনগণকে পদানত করেছিল এবং উন্নততর আর্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করেছিল, যে সংস্কৃতি উত্তর ভারতের সীমানা ডিঙিয়ে আর্যজাতি নিজেদের সঙ্গে বহন করে নিয়ে গেয়িছিল। আর্য-অনার্য বিভেদ জাতিগত বলে বিশ্বাস করা হত, যার ভিত্তি ছিল চামড়ার রঙ, যেখানে অনার্যদের ঋগ্বেদের কৃষ্ণবর্ণ দাসদের সমগোত্রীয় বলে ধরা হত।

ম্যাক্সমূলার ছিলেন প্রথম বড়ো মাপের পণ্ডিত যিনি আর্যতত্ত্বকে ভারতের ইতিহাসে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মতে, ঋগ্বেদ ভারতীয় সভ্যতার সূচনা চিহ্নিত করে এবং এই গ্রন্থ বিশুদ্ধ আর্যবাদের 'টেক্সট্'। যদিও তিনি জৈবিক জাতিগত শ্রেণীবিভাগের বেলায় ভাষাগত শ্রেণীবিভাগ, এক্ষেত্রে ইন্দো-এরিয়ান ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন, তবুও তিনি 'আর্য' পরিভাষাটি ভাষা এবং জাতি উভয়ক্ষেত্রেই পারস্পরিক বদল করে ব্যবহার করে গেছেন। এই ভাষা এবং জাতির দ্বৈত সত্তা ছিল আর্যতত্ত্বের মেরুদণ্ড (ট্রাউটমান)। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে এই তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, যখন জাতীয়তাবাদ এবং সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মুখ্য হয়ে দেখা দিল পরিচয় বা অভিজ্ঞানের প্রশ্ন, তখনই বিভিন্নভাবে অনেক রাজনৈতিক মতাদর্শ তত্ত্বটিকে নিজেদের সুবিধার্থে কাজে লাগালো।

আর্যতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি তত্ত্ব ছিল, যাকে বলা যেতে পারে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত। ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রাচ্যবিদ্যাবলী ব্যাখ্যায় হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে খাড়াখাড়ি ভাগ করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় মানসে, পৃথিবী নানা "সভ্যতায়" বিভক্ত ছিল। সভ্যতাগুলিকে ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে ভাগ করা হয়েছিল এবং ভাষা অথবা ধর্মের ভিত্তিতে তক্‌মা এঁটে দেওয়া হয়েছিল, যেমন ইসলামী সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইস্‌লামী সভ্যতা সংযুক্ত ছিল পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এবং আরবীয়-

পারসিকদের সঙ্গে। অতএব তা ভারতের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বলে ধরা হত। ভারতীয় সভ্যতাকে দেখা হত বিশেষভাবে হিন্দু এবং সংস্কৃতঘেঁষা হিসেবে।

এটি ভারত-ইতিহাসের যুগ-বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত, আদিতে জেমস মিল যেমন করেছিলেন—অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা এবং ব্রিটিশ যুগ। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন পুনরায় ঘোষিত হলো। এটি শাসক রাজবংশগুলির ধর্মের উপর এবং সেই সঙ্গে, প্রথম দুই পর্বের অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতার পশ্চাদগামিতা এবং স্থবিরতার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। মিলের যুক্তি ছিল এই যে একমাত্র ব্রিটিশরাই আইন করে এই স্থবিরতা থেকে মুক্তি এনেছিলেন এবং ভারতীয় সমাজের আদিম প্রকৃতিকে বদলাতে পেরেছিলেন। মিলের হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া উনিশ শতকে একটি কর্তৃত্বস্থানীয় বই হয়ে ওঠে এবং যুগবিভাগের স্বীকৃতি ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও মেনে নেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ইতিহাস স্থায়ী সংঘাতে রত দুটি একশিলা সম্প্রদায়ের ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই যুগবিভাগে যতখানি দেখানো হয়েছে ধর্মীয় সংঘাত বলতে আমরা যা বুঝি তখন তা অতখানি ব্যাপক ছিল না। এমনকি, যখন তা ঘটেছে তখনও ধর্ম ছিল প্রায়শই কৃত্রিম বা লোক-দেখানো হেতু মাত্র, মূল লড়াইয়ের উৎপত্তি হয়েছে ক্ষমতার জন্য রেষারেষি এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও সুযোগ আদায়ের জন্য দর কষাকষির ভিতর থেকে। যাকে এখন হিন্দু এবং মুসলমান বলে দেখানো হচ্ছে, সেই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে প্রভূত বৈচিত্র্য ছিল কেননা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রভূত পরিমাণ সামাজিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য ছিল।

যাক, আমরা আবার আর্য তত্ত্বে ফিরে যাই। আমি যে পদ্ধতিতে তত্ত্বটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। এই কাজে আমি দুই ভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠীর উল্লেখ করব যাদের উভয়ের কাছে এই তত্ত্ব নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। আমি তত্ত্বটির দলিত ব্যাখ্যার কথা বলছি এবং সেই সঙ্গে হিন্দুত্বের মতাদর্শের মধ্যেও যেভাবে ঢুকে পড়েছে সেকথাও বলছি। উভয়েই ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা এবং প্রধান ধারার জাতীয়তাবাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে, উভয়েই তত্ত্বের একই উপাদান ব্যবহার করেছে কিন্তু কাজে লাগিয়েছে ভিন্নভাবে। সম্প্রতি ক্ষমতা দখলের বর্তমান সংঘাতের মধ্যে এই তত্ত্বের হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বিশেষত হিন্দুদের সংগঠিত করার মতাদর্শ হিসেবে। আর্যগণ ভারতীয় ছিলেন অথবা

বিদেশী, কিংবা ভারতীয় ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী কে বা কারা এই দুটি প্রশ্ন থেকেই তত্ত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা জন্ম নিয়েছে। বাছাই করা নিজস্ব লাইনের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাই প্রতিভাত হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যাখ্যার মধ্যে—তা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীই হোক অথবা বিরোধী পক্ষের অথচ ক্ষমতাকামী গোষ্ঠীই হোক। তারা তাদের মতকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন—হয় উচ্চ জাতির প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের স্বীকৃতিতে অথবা যারা এখন নিচু জাতি তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অথবা অন্যভাবে একক ধর্মীয় পরিচয় বৈধ এবং অন্য সব বাতিল করার মাধ্যমে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জ্যোতি বা পুলে তত্ত্বটিকে শূদ্র জাতির নিম্ন মর্যাদার উৎপত্তির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তত্ত্বটিকে ব্যবহার করেছিলেন। (ওমভেট, ও'হ্যানলন)। এই ব্যাখ্যাকে তত্ত্বটির দলিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বলা যায়। ফুলে ম্যাক্সমূলারের মতের রূপরেখা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, প্রাচীনতম অধিবাসীগণ ছিলেন আদিবাসীগণ অর্থাৎ শূদ্রগণ, দলিতগণ, উপজাতির বা জনজাতির মানুষেরা—এইসব মানুষ যাদের সকলকে সমষ্টিগতভাবে ক্ষত্রিয়, নামে উল্লেখ করেছেন। এই জনগণকেই বীর রাজা বলি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর্য আক্রমণকে দেখা হয়েছিল অপরিহার্যভাবে ব্রাহ্মণদের আক্রমণ হিসেবে, যাঁরা ছিলেন বহিরাগত এবং যাঁরা আদিবাসীদের আক্রমণ করেছিলেন। যদিও আদিবাসীরা প্রত্যাঘাত করেছিল তবু তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে. দাসত্বের শিকার হয়ে নির্যাতিত হয়েছিল। তখন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যুক্তি আবিষ্কৃত হলো আদিবাসীদের অধস্তন অবস্থায় রেখে দেওয়ার জন্য। ফুলে তাঁর ঐতিহাসিক মতামতের সমর্থনের জন্য পুরাণগুলি এবং মহাকাব্যগুলি থেকে অতিকথনগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

এই পাঠের মধ্যে, সুবর্ণ যুগ ছিল আর্যদের আক্রমণের আগেকার যুগ এবং আর্যতত্ত্বের দলিত ব্যাখ্যা বা রূপবর্ণনার ব্যাপারে আর্য আক্রমণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি প্রমাণ করার দরকার ছিল যে আর্যরা ছিলেন বহিরাগত। এটি আবার পর্বান্তরে উপদ্বীপে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যেখানে জাতি এবং ভাষার সংযুক্তির আরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে আর্য তত্ত্বের সমধর্মী ছিল দ্রাবিড়ীয় তত্ত্ব। এখানেও দেখা যায়, দ্রাবিড় ভাষাগুলির উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি উত্তরকালে এই যুক্তির ভিত তৈরি করেছিল যে স্বতন্ত্র দ্রাবিড় জাতিরও অস্তিত্ব ছিল। যে দেশীয় জনগণকে আর্যগণ পরাজিত করেছিলেন তাদের দ্রাবিড় বলে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাও হয়েছে।

একসময় ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনগুলি দ্রাবিড় ভাষা ও জাতি মিশিয়ে ফেলেছে দেখতে পাই, এবং সেই সঙ্গে জাতি বহিষ্কারের উপর আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ফুলের ব্যাখ্যাও কাজে লাগিয়েছে যেখানে নিচু জাতিগুলির (caste) স্বতন্ত্র জাতিগত (racial) উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে।

ফুলের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র নিচু জাতির উদ্ভব ব্যাখ্যা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি উঁচু এবং নিচু জাতিগুলির মধ্যে সংঘর্ষকেও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রূপকল্পের ফলে দেশের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিম্ন জাতির অধিকার বৈধতা লাভ করে। নৃতাত্ত্বিক জাতি নিয়ে তিনি ততখানি মাথা ঘামান নি, তাঁর দৃষ্টি ছিল বর্ণগত জাতির দিকে এবং আর্যদের ব্রাহ্মণ হিসেবে দেখানোর দিকে। যে ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় সমাজে স্থায়ী প্রাধান্য বিস্তারকামী 'অন্যান্য'দের নির্যাতন করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সামাজিক ইতিহাসচর্চায় দেখা গেছে যে জাতি সব সময়ের জন্য একটি জমাটবাঁধা স্তরবিন্যাস ছিল না। কিংবা এটি অবশ্যম্ভাবীরূপে সর্বদা অর্থনৈতিক মর্যাদার সমতুল ছিল না কিংবা এটি সর্বজনীন প্রয়োগসিদ্ধও ছিল না। নিম্ন সামাজিক স্তরের অল্প কিছু গোষ্ঠী কালে কালে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারত, এমনকি ব্রাহ্মণ বর্ণে উত্তরণ পর্যন্ত। নিচু জাতির উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা অবশ্য আপেক্ষিক ব্যাপার, এর জন্য কয়েক প্রজন্ম কিংবা সহায়ক সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন হত। যা ছিল পরিবর্তনাতীত তা হলো অস্পৃশ্যদের হীনাবস্থা।

বর্ণালীর অপর প্রান্তে আবির্ভূত হলো আর্যতত্ত্বের হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা। এর পূর্বসূরি ছিল ঐ বিষয়ে থিয়োসোফিকাল সোসাইটির ধ্যানধারণা, বিশেষত উনিশ শতকের শেষে কর্নেল অলকটের মতামত। এই থিয়োসফিকাল মত দ্বারা সম্ভবত হিন্দুতবাদী মত প্রভাবিত হয়েছিল (লিওপোণ্ড)। অলকট মনে করতেন যে আর্যগণ ছিলেন ভারতের দেশজ মানুষ এবং সেইজন্য আর্য আক্রমণের ঐতিহাসিকতা তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আর্যরাই সভ্যতা ইয়োরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সমস্ত ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের পূর্বসূরী হলো সংস্কৃত। তিনি আর্য বলতে একচেটিয়াভাবে হিন্দু বুঝতেন। উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই "হিন্দু আর্য" কথাটি অনেক জায়গাতেই প্রায়ই ব্যবহৃত হত। এই ব্যাপারটিই পরবর্তীকালে আর্যতত্ত্বের হিন্দু দৃষ্টিকোণসম্ভূত ব্যাখ্যায় অনেকখানি তুলে ধরা হয়েছিল, যে ব্যাখ্যা ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে, সাভারকর এবং গোলওয়ালকরের রচনাবলীতে বিকাশ লাভ করেছিল।

আর্যতত্ত্বের হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা জাতির ভূমিকা খাটো করে দেখিয়েছে এবং ধর্মের উপর জোর দিয়েছে। দেশজ ভারতীয় হিসেবে পরিচিত হবার হিন্দু আর্যদের অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করার এটি ছিল এক প্রচেষ্টা এবং একথা বলাও উদ্দেশ্য ছিল যে সব হিন্দুরাই আর্য। যখন তারা সিন্ধুনদীর তীরে বসতি স্থাপন করল তখন তারা একটি নেশন বা জাতিতে আবদ্ধ হলো এবং সিন্ধু থেকেই হিন্দু নামটি এলো—একথাও বলা হলো। ফুলের মতামতের কোনও উল্লেখই করা হলো না যদিও হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবে ছিল ফুলে-র তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর্য আক্রমণ বিষয়ে গোড়ার দিকে একটু দোনোমনো ভাব ছিল। কিন্তু ক্রমশ আর্য আক্রমণের ব্যাপারটি প্রবলভাবে অস্বীকার করা হয় যাতে আর্যগণ যে ভারতের দেশজ মানুষ সেই ধারণা ভালোভাবে খাপ খেতে পারে। হিন্দুদের সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে তাদের একটি জাতিগত তেজ ছিল এব এই জাতিগত তেজই তাদের বিদেশী আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

হিন্দুত্ব মতাদর্শ অনুসারে তিনিই ভারতীয়, ভারতীয় উপমহাদেশ একাধারে যাঁর কাছে পিতৃভূমি অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের দেশ এবং পুণ্যভূমি অর্থাৎ তাঁর নিজের ধর্মের দেশ। এটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার যে ভূমি বা ভৌগোলিক ভূমিভাগের যে ধারণার কথা বলা হচ্ছে তা ব্রিটিশ যুগে ভারতের সীমানার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে। সত্যিই সত্যি হোক আর অলীক হোক, সমস্ত ধরনের ভারতীয়রাই দাবি করতে পারতেন যে তাদের পূর্বপুরুষগণ এই ভূমিভাগ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুরাই এই ভূমিভাগকে তাদের পুণ্যভূমি বলে দাবি করতে পারতেন। মুসলমান এবং খ্রিস্টানগণ, যাঁদের ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে, তাদের কঠোরভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আর্যদের পরিচয় হলো হিন্দু পরিচয়। জাতি (caste) থেকে মুখ ফিরিয়ে হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা আর্যতত্ত্বকে এক পরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করেছে, হিন্দুদের মুসলমানদের থেকে আলাদা করবার জন্য। ভারতীয় ইতিহাসের সূচনাকাল বিষয়ক তত্ত্ব এবং দ্বি-জাতি তত্ত্ব, এই দুটির মধ্যে এখন এক সংযোগ ঘটল। আবার এই হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যখন হিন্দু পরিচয়কে কেন্দ্র করে এক বিশাল রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ হয়। উচ্চ জাতির (= বর্ণ) প্রাধান্য বজায় রাখা হলো এবং অ-হিন্দুদের 'অন্যান্য' গোষ্ঠীভুক্ত করা হলো।

যদিও কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী অভিমত ভিন্নভাবে আর্যতত্ত্বকে দেখেছিল কিন্তু

ভারতীয় সভ্যতার সূচনা হিসেবে বৈদিক সংস্কৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব সকলেই আরোপ করেছেন। দয়ানন্দ সরস্বতী সভ্যতার সূত্র হিসেবে বেদ-এ ফিরে যাওয়ার কথা প্রচার করেছেন এবং সমস্ত ভাষার জননী হিসেবে সংস্কৃতকে দেখেছেন, যার দ্বারা ব্রাহ্মণ-দের মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলো। সংস্কৃতের প্রাচীনত্ব এবং বিশুদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হলো এবং এর ফলে সেইসব হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য করা হলো যারা বর্তমানে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে বৈদিক সংস্কৃত অনার্য ভাষার অনেক উপাদান মিশে গেছে। বালগঙ্গাধর তিলক উত্তর মেরুর আর্কটিক অঞ্চল থেকে অপসৃয়মান তুষার যুগে মানুষদের এক লং মার্চ-এর কথা বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে আর্যরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি শাখা ইয়োরোপে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পুনরায় বর্বরতায় উপনীত হয়েছিল। অপরপক্ষে অন্য শাখাটি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উৎকর্ষসহ ভারতে এসেছিল এবং অনার্যদের জয় করেছিল। ফুলে কিংবা কর্নেল অলকটের থেকে তিলকের ভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল। তিলকের মতামত হিন্দুত্ববাদী তত্ত্বের সমর্থকদের পক্ষে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছিল কারণ তিনি আর্যদের বহিরাগত আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অবচেতনভাবে যা মুসলিম আক্রমণের সমতুল হয়ে দাঁড়ায়। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উল্টো উপায় ছিল একথা বলা যে, আর্যগণ আর্কটিক থেকে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু তখনকার দিনে উত্তর মেরুর অবস্থান ছিল বর্তমানকালের বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চলে (গোলওয়ালকার, ৮)।

ইতিহসচর্চার বা ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে যে সব জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা প্রতিফলিত হয়েছিল তা ছিল অনেক বেশি নিরপেক্ষ, অন্তত এইসব উগ্র একদেশদর্শী ব্যাখ্যার তুলনায়। কিন্তু তবু তাদেরও একটা লক্ষ্য ছিল। ভারতের নানা ইতিহাস থেকে এই ধরনের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত ঃ আর্যগণ, ইন্দো-এরিয়ান বা বৈদিক সংস্কৃতে কথা বলতেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, দেশজ আদিম ভিন্নজাতির জনগণকে পরাজিত করেছিলেন এবং ভারতের ইতিহাসের সভ্যতার মূলস্রোত হিসেবে আর্যবাদ বা আর্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করলেন। ম্যাক্সমূলারকে ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সহানুভূতিশীল বলে প্রশংসা করা হয়েছিল যদিও তিনি ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সহানুভূতিশীল বলে প্রশংসা করা হয়েছিল যদিও তিনি ভারতীয় সভ্যতাকে হিন্দু হিসেবেই তুলে ধরেছেন। আর্য আক্রমণের ফলে উচ্চ জাতি এবং নিম্নজাতির মধ্যে পার্থক্য হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক জাতিগত (ra-

cial) পার্থক্য সৃষ্টি ক্ষেত্রে জাতির (caste) ভূমিকা মেনে নেওয়া হয়েছিল কেননা তাহলে অতীতকাল থেকে অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। জাতি (caste)-কে একটি কঠোর সামাজিক প্রথা হিসেবে দেখা হলো—যা একবার সৃষ্টি হওয়ার পর মূলত অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। একে অনেকে ব্যবহার করেছেন আর্যদের থেকে এক বংশগত এবং জৈবিক উত্তরাধিকার দাবি করার ক্ষেত্রে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সম্পর্কে বলা হলো যে তারা ইয়োরোপীয় আর্যদের বংশোদ্ভূত ব্রিটিশদের মতোই একই জাতিগত গোষ্ঠীসম্ভূত। আর্য যোগসূত্রের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশদের সঙ্গে এই ধরনের জ্ঞাতিত্বের বন্ধনের দাবি ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের তরফে আত্ম-উন্নয়নের প্রচেষ্টা (সেন, ৩২৩)। নবোত্থিত মধ্যবিত্ত বৃত্তিজীবীদের পক্ষে এই ধরনের আত্ম-উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কারণ যদিও এই শ্রেণী প্রধানত উচ্চ বর্ণ থেকেই এসেছিলেন তবু তারা নতুন নতুন বৃত্তি গ্রহণ করছিলেন এবং তাদের নতুন পদমর্যাদার স্বীকৃতি দাবি করেছিলেন। যাই হোক, আরও যুক্তিবাদী অনেকে ছিলেন যাঁরা ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের একমাত্র উৎস হিসেবে বৈদিক সংস্কৃতিক চিহ্নিত করেননি, বরং অন্যান্য উৎসের উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকগণ এই তত্ত্ব আকর্ষণীয় মনে করেছিলেন কারণ এর দ্বারা ব্রিটিশদের ভারত জয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্তনের এক তুলনা পাওয়া গিয়েছিল। ব্রিটিশদের রূপ ধরে আর্যদের প্রত্যাবর্তনের উপরেই ভারতের প্রগতি নির্ভরশীল ছিল। জাতিগত বিভেদের পিছনে বর্ণের ভূমিকা এই তত্ত্বকে আরও ব্যাপ্তি দিয়েছিল এবং বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের নির্দেশ করা জটিল জ্ঞাতিত্বের তত্ত্ব এবং বিশুদ্ধতা ও দূষণের নিয়মাবলীর চেয়ে তা ছিল অনেক সহজ। ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিকগণ যেমন রিজলি আনন্দের সঙ্গে জাতিগত উপাদান লুফে নিয়েছিলেন এবং মত দিয়েছিলেন যে আর্য রক্ত বোঝার অন্যতম উপায় হলো নাসিকা-চিহ্ন। এজন্য তিনি বিভিন্ন জাতির নাসিকা মাপার কাজ শুরু করেছিলেন।

আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে এই সব ইতিহাস নির্মাণের পিছনে অন্তত তিন স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য কাজ করেছে। কীভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রয়োজন অনুযায়ী ইতিহাস পাঠ করা যায়, তার প্রচেষ্টার এ এক সবিস্তৃত উদাহরণ। সুতরাং ইতিহাসবিদদের দায় হচ্ছে এই সব ব্যাখ্যার ইতিহাসগত ভুলত্রুটিগুলি নির্দেশ করা। ফুলে-র ব্যাখ্যা বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র উৎপত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং নিচু জাতির মানুষজন ও দলিতরাই ভারতের প্রাচীনতম দেশজ বাসিন্দা এবং ব্রাহ্মণরা

বহিরাগত—এই মতের সমর্থনে বৈধতা সন্ধান করেছিল। হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মকেই মৌলিক উপাদান হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে হিন্দু আর্যগণ হচ্ছে দেশজ মানুষ এবং মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা বিদেশী। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উদ্‌গ্রীব ছিল, যে মধ্যবিত্তরা প্রধানত ছিলেন উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। কিন্তু এই তিন ধরনের ব্যাখ্যাই এখন প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক প্রমাণ দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

১৯২০-র দশকে সিন্ধু সভ্যতার প্রথম নগরগুলি উৎখননের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এই শতাব্দীতেই আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এক মুখ্য সভ্যতার আবির্ভাব বিষয়ে জানতে পারি। এই সভ্যতার কালনির্ণয় করা হয়েছে ২৬০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দ ; সুতরাং তা সাধারণভাবে গৃহীত ঋগ্বেদের তারিখ অর্থাৎ ১৫০০ খ্রিষ্ট পূর্ব সময়ের আগেকার, দলিতরা এই সভ্যতাকে আদিবাসীদের সভ্যতা এবং আর্য আক্রমণের পূর্বেকার 'সুবর্ণযুগের' প্রমাণ হিসেবে দাবি করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি আদিবাসীদের উন্নততর অবস্থা প্রমাণ করে, যেহেতু এটি বৈদিকযুগের কৃষি পশুচারণ ভিত্তিক সভ্যতার বদলে নাগরিক সংস্কৃতি। আর্য আক্রমণের বিষয়ে এতাবৎকাল চলে আসা ধারণা মেনে নিলে, এটাও ধরে নেওয়া হয় যে এই সভ্যতা আর্যদের আক্রমণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বহিরাগত সংস্কৃতির দ্বারা স্থানীয় সংস্কৃতির বদল ঘটানোর নির্দেশ করে না কিংবা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসও প্রমাণ করে না। সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলির ধ্বংসের আমলের প্রত্নতত্ত্ব কখনও কখনও ছড়ানো-ছিটানো এলাকায় ছোটোখাটো ধ্বংসের ইতস্তত প্রমাণ দেয় বটে, যার থেকে আঞ্চলিক সংঘর্ষ ও ক্ষুদ্র যুদ্ধের কথা মনে হয়। এর ফলে দলিতপন্থী ব্যাখ্যার পক্ষে সমস্যা দেখা যায়, কারণ তারা ব্যাপক আক্রমণের কথাই ধরে নিয়েছেন। অপরপক্ষে, এই প্রমাণাভাব হিন্দুত্ববাদীদের কাছে মনে হতে পারে যে আর্যগণ যে আসলে ভারতীয় এটা সেই দাবিরই সমর্থন করে।

বস্তুতপক্ষে হিন্দুত্ববাদীরা আরও একধাপ এগিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে সিন্ধু সভ্যতা ছিল বৈদিক, অনেকে তো ঋগ্বেদকে পিছিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দে ঠেলে দেন। এতে নিশ্চিত হয় যে ভারতীয় ইতিহাসের ভিত্তি ছিল বৈদিক এবং এদেশের আদি বাসিন্দারা হলেন হিন্দু আর্যগণ। সুতরাং বিভিন্ন উৎখনন কেন্দ্রগুলিকে বৈদিক সংস্কৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টাও হয়েছে। ঋগ্বেদ যেখানে রচিত

হয়েছিল তার ভৌগোলিক অবস্থান এখন পাকিস্তানে, যেমন সিন্ধু সভ্যতার সূচনা যেখানে হয়েছিল সেই অঞ্চলও বর্তমানে পাকিস্তানে। আর্যতত্ত্বের হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা এখন এই অঞ্চলকে বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করছে সিন্ধু সভ্যতাকে আর্যসভ্যতা বলার মধ্যে দিয়ে এবং একে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলতে শুরু করেছে, যদিও প্রমাণের ভিত্তিতে একথা আদৌ বলা যায় না। 'সিন্ধু-সরস্বতী' সভ্যতা বলতে শুরু করেছে, যদিও প্রমাণের ভিত্তিতে একথা আদৌ বলা যায় না। 'সিন্ধু-সরস্বতী' তক্‌মাটি অবশ্যই ঋগ্বেদের স্মৃতিজাগানিয়া।

যাই হোক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণকে এইভাবে ভোজবাজির কৌশলে ব্যবহার করা যায় না এবং এরকম ভ্রান্ত ব্যাখ্যাও করা যায় না। আমরা জানি যে প্রাক্-হরপ্পা সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল, প্রত্যেকটি এক একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাধারণভাবে সেগুলি উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এতগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হলো বেলুচিস্তানে যা প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম সহস্রাব্দে পিছিয়ে দেওয়া যায়। এই সংস্কৃতিগুলি হরপ্পার নাগরিক সংস্কৃতির পথ করে দিয়েছিল, উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে (অলচিন)। এইসব সংস্কৃতিকে হরপ্পার নগরগুলি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিল যদিও নগরায়নের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকাতেই ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব নাগাদ। সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলির সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল (পারস্য) উপমহাসাগরের সঙ্গে, মেসোপটেমিয়ার (ইরাকে) সঙ্গে, এলাম (ইরান)-এর সঙ্গে; এছাড়া পামির মালভূমির বাদখশান, গুজরাট, উত্তর মহারাষ্ট্র ইত্যাদি ক্ষেত্র তো ছিলই (রত্নাগর)।

বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার অনেক গুরুতর পার্থক্য আছে। একমাত্র আফগানিস্তানের ব্যতিক্রম বাদে, ঐ এলাকার কোন অঞ্চলই ঋগ্বেদের ভূগোলের সঙ্গে পরিচিত নয়। সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলির নাগরিক বাণিজ্যিক সংস্কৃতি বেদগুলিতে প্রতিফলিত হয়নি। বৈদিক সাহিত্যে উন্নত দূরপাল্লার বাণিজ্য, উৎপাদন কিংবা সম্পদের সংগঠন, শস্যাগারের বর্ণনা কিংবা কারিগরী কর্মশালা ইত্যাদি বিষয়ে ন্যূনতম উল্লেখ আছে। অথবা নগর পরিকল্পনার জটিলতার সঙ্গে পরিচয়ের কোনও সূত্রই সেখানে নেই। একই কথা প্রযোজ্য ইটের পাটাতনের উপর গৃহনির্মাণ কাঠামো সম্পর্কেও। এমনকি, লিপির মতন সহজতম বিষয়ও তখন জানা ছিল কিনা প্রমাণ নেই। হরপ্পার সংস্কৃতি ছিল ব্রোঞ্জ (এবং তামা) ব্যবহারকারী সংস্কৃতি, অপরপক্ষে বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরণ হয়েছিল লৌহযুগের প্রযুক্তিতে। অশ্বের, রথের এবং স্পোকযুক্ত চাকার

প্রচলন, যা অনেক সময় ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাভাষীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যার বর্ণনা ঋগ্বেদে আছে, তাকে প্রত্নতত্ত্বের আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আগে আদৌ স্থাপন করা যায় না। সেই সময় সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলির অবনতি শুরু হয়েছিল। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যের সংস্কৃতি এবং হরপ্পাবাসীদের সংস্কৃতি এক বা অভিন্ন বলে কোনোমতেই বর্ণনা করা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যের ভৌগোলিক পটভূমি ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পরিযান করেছে এমন গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। পরবর্তী বেদগুলিতে যেখানকার অবস্থানগুলি প্রায়শই গাঙ্গেয় উপত্যকায়, সেখানে প্রযুক্তিগত পরিভাষার এক ধারাবাহিকতা আছে। যেখানে গোষ্ঠীর পুরোহিত পরিবারের এবং আচার অনুষ্ঠানের নাম আছে, যা ঋগ্বেদের নিকট অনুসরণেই করা হয়েছে। তথাপি সিন্ধু সভ্যতায় গাঙ্গেয় উপত্যকা অধরাই থেকে গেছে। শুধু এই থেকেই বৈদিক সাহিত্য যে পরবর্তীকালের তা সমর্থিত হয়।

এটি আদৌ আশ্চর্যজনক নয় যে হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা আর এক ধরনের মুখ্যপ্রমাণ অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণকে হয় উপেক্ষা করেছে নতুবা অস্বীকার করেছে, কারণ এই প্রমাণ তাদের ব্যাখ্যার বিরোধী। হরপ্পা যুগের লিপির মর্মোদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু হরপ্পাবাসীদের ভাষা যাই হোক না কেন, তাদের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনেই অন্যান্য ভাষার সঙ্গে কিছু পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল—এই অন্যান্য ভাষা বলতে আক্কাডিয়ান প্রোটো-এলামাইট এবং সম্ভবত অক্ষু নদীর (Oxus) উপত্যকার উত্তরদিককার ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ঐ সমস্ত ভাষার কোনোটিই হরপ্পাবাসীদের কাছে প্রধান ভাষা হয়ে দেখা দেয়নি। অদ্যাবধি ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ হরপ্পা-লিপি পাঠের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় পাঠকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ ইন্দো-এরিয়ান এবং দ্রাবিড় ভাষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন; প্রথমোক্তটি হলো এমন ভাষা যেখানে বিভক্তি বা প্রত্যয়যোগে শব্দের বা ধাতুর রূপ পরিবর্তন করা যায় এবং দ্বিতীয়টি বিভক্তি প্রত্যয়াদি ব্যতীত কেবল শব্দে শব্দে যোগ দিয়ে অর্থাৎ যৌগিক শব্দ দ্বারা গ্রথিত।

সাধারণত উত্তর পশ্চিম ভারতে ইন্দো-এরিয়ান ভাষার আগমনের তারিখ বা সময়কাল বোঝাতে ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ ব্যবহার করা যায়। প্রশ্নটি জটিল এবং আফগানিস্তান থেকে তুরস্ক পর্যন্ত বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলের ইন্দো-ইয়োরোপীয়

ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনের সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলে কোনও ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষার উপস্থিতির প্রাচীনতম সময় খ্রি: পূ: দ্বিতীয় সহস্রাব্দ, তার আগে নয়। প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থ ঋগ্বেদকেও সাধারণভাবে খ্রি: পূ: দ্বিতীয় সহস্রাব্দের রচনা বলে কালনির্ণয় করা হয়। উত্তর মেসোপটেমিয়া এবং ইরানে প্রাপ্ত প্রমাণের সঙ্গেও এই সময়কাল যুক্ত। মেসোপটেমিয়ার প্রমাণ হলো অশ্ব প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সম্পর্কিত কিছু কিছু নাম এবং প্রযুক্তিগত পরিভাষা যা খ্রি: পূ: দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগের কিছু লেখমালায় পাওয়া গেছে (বারো, ম্যালোরি)। অল্প কিছুদিনের জন্য সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল এবং তারপরই সেগুলি অন্তর্হিত হয় এবং সেজন্য সেগুলিকে ভাষাগত অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিভাষাগুলির উৎপত্তি ইন্দো-এরিয়ান ভাষা থেকে কিন্তু ঋগ্বেদের সংস্কৃতের সঙ্গে তা মেলে না। অতএব এই শব্দগুলিকে প্রোটো ইন্ডো এরিয়ান বা 'প্রাক্-ইন্দো-আর্য' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, ঋগ্বেদের সময়কালের ইন্দো-এরিয়ান ভাষার সঙ্গে সেগুলির পার্থক্য বোঝাতে। এই তক্‌মা আঁটা বা চিহ্নিতকরণের তাৎপর্য হলো এই যে শব্দগুলি বৈদিক সংস্কৃতের চাইতে প্রাচীনতর। স্পষ্টতই ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে এই কথা স্মর্তব্য। কৌতূহলপ্রদ ব্যাপার হলো, উত্তর ভারতের মতন, পশ্চিম এশিয়া এবং ইরানেও অশ্ব এবং রথের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমমাণ খ্রি: পূ: দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আগেকার নয়। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো ঐ সময়কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তর মেসোপটেমিয়ার সংস্কৃতির কোনও মিল নেই। তেমনি দুই অঞ্চলের মধ্যে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক যোগসূত্রও নেই। সুতরাং সম্ভাব্য কারণেই ইন্দো-এরিয়ান ভাষার এই রূপগুলি একটি কমন উৎসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং অক্সাস বা অক্ষু অঞ্চলকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (বারো)।

ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের অন্য একটি দিক যা ইরান থেকে পাওয়া যায় তা জরাথুস্ত্রিয়দের প্রাচীনতম গ্রন্থ আবেস্তা সম্পর্কিত। প্রাচীন ইরানীয় এবং ইন্দো-এরিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে আশ্চর্যজনক মিল যা আবেস্তা এবং ঋগ্বেদে লক্ষ্য করা যায়, তা অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। অতীতে অনেক বিদ্বান প্রাচীন ইরানীয় এবং ইন্দো-এরিয়ান ভাষার ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিকট-সংযোগের কথা নির্দেশ করেছিলেন। একথাও সুপ্রতিষ্ঠিত যে অনেক অতিকথন, আচার-অনুষ্ঠান, ব্যবহারবিধি ইত্যাদিও উভয়ের মধ্যেই ছিল। আবার এর কিছু দুই সমাজে উল্টে গিয়েছিল এবং এই ধরনের উল্টে যাওয়া প্রমাণ করে যে দুটির সম্পর্ক ছিল নিকট। আবেস্তান ভাষার বিষয়ে

সুপণ্ডিত কিছু ব্যক্তির অভিমত হলো এই যে, এই ভাষার আদিরূপ ঋগ্বেদের সংস্কৃতের চাইতে পুরনো (কেলেন্স)। আবেস্তার বর্তমানে কালনির্ণয় করা হয়েছে ১৪০০-১২০০ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দের মধ্যে। অতএব এই দুই নিকট সম্বন্ধযুক্ত ভাষার থেকে প্রাপ্ত নানা ধরনের প্রমাণ মিলেমিশে যা দাঁড়িয়েছে তাতে ঐ ভাষাগুলি পশ্চিম এশিয়া, ইরান, ভারতবর্ষ যেখানকারই হোক, তা খ্রি: পূ: দ্বিতীয় সহস্রাব্দের আগেকার নয়। ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করে যে ইন্দো-এরিয়ান হলো প্রোটো-ইন্দো-এরিয়ান এবং প্রাচীন ইরানীয় ভাষার সগোত্র। এবং তাই এ ভাষা সীমান্ত পার হয়ে এসে ক্রমশ উত্তর ভারতে বিকশিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক একটি স্বীকৃতি অবশ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। এটি হলো ঋগ্বেদের এবং বৈদিক সংস্কৃতের মধ্যে অনার্য উপাদানের উপস্থিতি যা এসেছে আদিযুগে উত্তর ভারতে বিদ্যমান এবং প্রচলিত ভাষাগুলি, যেমন প্রোটো-দ্রাবিড়িয়ান এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা থেকে (চ্যাটার্জী, কুইপার, ইসেনো, বারো, এরডোসি)। এই ব্যাপারটি আগেকার পণ্ডিতরা সন্দেহের চোখে দেখতেন কিন্তু এখন এ বিষয়ে প্রমাণ অনেক সুনির্দিষ্ট এবং ব্যাপক। একটি মত হচ্ছে যে একসময় দ্বৈত ভাষার যুগ ছিল, যে সময় ইন্দো-এরিয়ান অপরাপর ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যদিও শেষ পর্যন্ত এটিই প্রধান ভাষা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বৈদিক সংস্কৃতে অনার্য উপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে যতই সাহিত্যের পটভূমি উত্তর পশ্চিম থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অভিযাত্রা করেছে (উইটজেল)। অনেকে যেমন মনে করেন, তেমনি ঋগ্বেদের সংস্কৃত যদি উত্তর ভারতেই শুধু উৎপত্তি হত, তাহলে প্রোটো-দ্রাবিড়িয়ান এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক উপাদানের অনুপ্রবেশ এমনভাবে হত না।

এই সব সাম্প্রতিক প্রমাণ কীভাবে ঐ যুগের ইতিহাস রচনা করা উচিত সে বিষয়ে নতুন দিক উন্মোচন করেছে। ভাষার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, আসলে যা সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, তাই হলো মূল ঐতিহাসিক প্রশ্ন। এটি আক্রমণ এবং জাতিগত পরিচয়ের সঙ্গে ততখানি সম্পর্কিত নয় যতখানি সম্ভাব্যভাবে জনপরিযানের সঙ্গে , কারণ আবেস্তা এবং ঋগ্বেদ উভয়ের কাছেই পরিযান বা প্রচরণ অজ্ঞাত ছিল না। ইন্দো-এরিয়ান এবং অন্যান্য ভাষা ব্যবহারকারীদের পার্থক্য যদি জাতিগত না হয়ে ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক হয়, তাহলে ঐ যুগে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে প্রচলিত পদ্ধতির বদলে নতুনভাবে ভাবতে হবে, কারণ প্রচলিত মতে তাদের ভিন্ন জাতি এবং জনগণ বলে ধরা হত। আর্য শব্দটির জাতিগত ব্যঞ্জনা

পরিবর্তন করতে হবে মর্যাদা এবং ভাষার ব্যঞ্জনা দ্বারা। মর্যাদা এবং সংস্কৃতি বললে তার মধ্যে যে পৃথকীকরণ থাকে তার ভিত্তি হিসেবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিতর্ককে ধরার ব্যাপারটি এর ফলে সূচিত হলো। অতিকথন, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বাগ্‌ধারার নানা বৈচিত্র্যময় উৎস থাকতে পারে এবং বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট বৈদিক সাহিত্যে তার স্থান নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।

বৈদিক সংস্কৃতের মধ্যে অনার্যের উপস্থিতি নতুন বিশ্লেষণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক চিত্র দেখিয়ে দেয় যে স্থানীয় ভিত্তিতে আদিবসতি আগেই গেড়েছিলেন কিন্তু মানুষজন যাঁদের সঙ্গে যারা ইন্দো-গাঙ্গেয় জলবিভাজিকা থেকে এসেছিলেন তাঁদের মানিয়ে নিতে হয়েছিল (রায়)। এই প্রক্রিয়ারই একাংশ ছিল পাঞ্জাবে ইতোমধ্যে ঘটা একই ধরনের প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা, যে প্রক্রিয়া বৈদিক সংস্কৃত এবং অন্যান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনার্য ভাষা-বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটায় সূত্রপাত হয়। কিন্তু এখন অনুপ্রবেশ শুরু হলো ব্যাপকভাবে। অন্তত দুটি ভাষাপদ্ধতির মিশ্রণ এই তত্ত্বকে জোরদার করেছে যে ইন্দো-এরিয়ান ভাষাভাষী মানুষরা উত্তর-পূর্ব ইরান এবং আফগানিস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং অনার্য ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিল এবং সম্ভবত এক দীর্ঘ দ্বৈতভাষার কাল অতিবাহিত হয়েছিল। বৈদিক বাগ্‌ধারার মধ্যে পার্থক্য এবং খ্রিঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যে বহুবিধ প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব, ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল হিসেবে পরিবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে মিশ্রণের কথা নির্দেশ করে।

আর্যতত্ত্বের ঐসব ব্যাখ্যার মধ্যে পৃথকীকরণ করা দরকার। যেমন হিন্দুত্ববাদী ব্যাখ্যা যার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য আহ্বান এবং নিজস্ব পরিচয় লাভের দাবি— সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে অন্যান্য ব্যাখ্যা যা বস্তুত নতুন নতুন প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার জন্য সন্ধানী প্রচেষ্টাগুলির পার্থক্য করতে হবে। তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরিচয়ের দাবি সমাজের কিছু উপাদানকে অন্তর্গত এবং অন্যদের বহির্ভুক্ত করার একশিলা নিমিত্তের বা প্রতিনিধিত্বের কাজ করে। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচয় অনেক ধরনের এবং তার সৃষ্টিও নানাবিধ উপাদান—পারিবারিক, ভৌগোলিক, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক ভাগ, শ্রেণী, লিঙ্গ। শুধুমাত্র এগুলি যে বহুবিধ তাই নয়, এগুলির মধ্যে অগ্রাধিকারও ক্রমাগত

পরিবর্তনশীল। ইতিহাস রচিত হয়, পুনর্লিখিত হয়, বিতর্ক হয় এবং বিশেষভাবে যখন কোনও সমাজের ইতিহাসের সূচনা কাল দিয়ে ইতিহাস রচনা করা হয়।

নতুন প্রমাণের ভিত্তিতে ইতিহাসের পুনর্লিখন প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলির ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা দাবি করে। এর মধ্যে অন্যতম কাজ হলো 'দেশজ' এবং 'বহিরাগত' ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিচার। যদি সংজ্ঞাটি ভৌগোলিক অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে হয়, তাহলে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত সীমানার অনুপস্থিতে ভৌগলিক অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ বস্তুত অসম্ভব। বিশেষত একথা আরও বেশি সত্য ভারত-ইরান সীমানা অঞ্চলের মতন জায়গার ক্ষেত্রে যেখানে উভয়দিকে যাতায়াত এবং পরিযান ইতিহাসের নানা যুগে ছিল জীবনযাত্রার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। আর যদি সংজ্ঞা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে হয়, তাহলে চার কিংবা পাঁচহাজার বছর আগে এই ধরনের জাতির সন্ধান করাটাই বাতুলতা

কে. ইলাইয়া, ১৯৯৬, হোয়াই আই অ্যাম নট এ হিন্দু, কলকাতা

জে. কেলেন্স এবং ই পিরার্ট, ১৯৯১, লা টেক্সটাস ডিইল আভেসটিকস্, ভাইসব্যাডেন।

এফ বি জে কুইপার, ১৯৯১, এরিয়ানস্ ইন দ্য ঋগ্বেদ, আমস্টারডাম

জে লিওপোল্ড, ১৯৭৪, "ব্রিটিশ অ্যাপ্লিকেশনস্ অফ দ্যা এরিয়ান থিয়োরী অফ রেস টু ইণ্ডিয়া", দ্য ইংলিশ হিস্টারিক্যাল রিভিউ, ৮৯, ৫৭৪-৬০৩

জে. পি. ম্যালোরি, ১৯৮৯, ইন সার্চ অফ দ্য ইন্দো এরিয়ানস্, লণ্ডন

এফ ম্যাক্সমুলার, ১৮৮৮, বায়োগ্রাফিস্ অফ ওয়ার্ডস্ অ্যান্ড দ্য হোম অফ দ্য আর্টস্, অক্সফোর্ড

আর ও'হ্যানলন, ১৯৮৫, কাস্ট কনফ্লিক্ট অ্যান্ড আইডিওলজি, কেমব্রিজ

জি ওমভেট, ১৯৯১, জ্যোতিবা ফুলে : অ্যান ইনকমপ্লিট রেনেশাঁস, সুরাট

জে. ফুলে, ১৯৮৫, আ ব্যালাড অফ দ্য রাজা ছত্রপতি শিবাজী ভোঁসলে, বোম্বাই

এল. পালিওকভ, ১৯৭৪ দ্যা আরিয়ান মিথ, নিউইয়র্ক

এস. রত্নাগর, ১৯৮১, এনকাউন্টার্স, নতুন দিল্লি

এইচ. রিজলি, ১৯০৮, দ্য পিপল্ অফ ইন্ডিয়া, লন্ডন

টি. এন. রায়, ১৯৮৩, দ্য গ্যাঞ্জেস সিভিলাইজেশন, নতুন দিল্লি

ভি ডি, সাভারকর, ১৯২২/১৯৬৯, হিন্দুত্ব : হু ইজ আ হিন্দু, পুণা

কেশবচন্দ্র সেন, কেশবচন্দ্র সেনস্ লেকচারস্ ইন ইন্ডিয়া, কলকাতা

এন. স্টেপ্যান, ১৯৮২, দ্য আইডিয়া অফ রেস ইন সায়েন্স : গ্রেট ব্রিটেন

১৮০০-১৯৬০, লন্ডন

আই. টেলর, ১৮৯২, দ্য অরিজিন অফ দ্য এরিয়ান্স, লন্ডন

আর. থাপার ১৯৯৭, দ্য টিরানি অফ্ ল্যাবেলস্, নতুন দিল্লি

আর. থাপার, ১৯৯২, ইন্টারপ্রেটিং আর্লি ইন্ডিয়া, দিল্লি

আর. থাপার, "দ্য থিয়োরী অফ এরিয়ান রেস অ্যান্ড ইন্ডিয়া : হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিকস্", সোসাল সায়েন্টিস্ট, ২৪, ১-৩, ৩-২৯

বালগঙ্গাধর তিলক, ১৯০৩, দ্য আর্কটিক হোম অফ দ্য বেদস্, পুণা

টি. ট্রাউটমান, ১৯৯৭, এরিয়ানস্ অ্যান্ড ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি

এম. উইটজেল, ১৯৮৯, "ট্রেসিং দ্য বেদিক ডায়ালেক্টস্", দ্র. সি. কাইলাট (সম্পা), ডায়লেক্টস দানস্ লা লিতারাচার ইন্দো এরিয়ানস্, প্যারিস

সেকাল ও একাল

তপন রায়চৌধুরী

আমার আজকের বক্তব্যের প্রধান সূত্র হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন (বিশেষত গত পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর)। ১৯৯৭ যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হল তখন সবাই লক্ষ্য করেছেন, দেশে কোথাও এই স্বাধীনতা নিয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ নেই। ১৯৪৭ সালের দেশ স্বাধীন হওয়ার দিন যাদের স্মরণ আছে তারা জানেন সমস্ত দেশে কি প্রচণ্ড উৎসাহ, আবেগ দেখা গিয়েছিল। পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে আবেগ আর নেই কেন, এবং সেই আবেগ না থাকার আমাদের জাতীয় জীবনে তাৎপর্য কি? এটাই আজকে আমার আলোচ্য বিষয়।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে '৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হল সে দিনটি কি সময়টি আাদের খুব সুখের সময় ছিল না। রক্তাক্ত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতার মুখ দেখলাম। বহু লোকের জীবন, সম্পত্তি, দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু সেই দুঃখের মুহুর্তেও আনন্দের, উচ্ছাসের কোন অভাব হয়নি। সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস পঞ্চাশ বছরে কোথায় মিলিয়ে গেল, কেন মিলিয়ে গেল? এর নানা ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয় দেশব্যাপী দুর্নীতি, দারিদ্র্য, আমাদের আর্থিক উন্নতি, প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, সাম্প্রদায়িক ও জাতিভিত্তিক ঝগড়া মারামারি এই সব কিছুতে স্বাধীনতার গৌরব আর অম্লান নেই। এসব কথাই হয়তো সত্য কিন্তু অন্য একটা সার্বিক পরিবর্তনের দিকেও যথেষ্ট ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি বলে আমি মনে করি। স্বাধীনতা দিবসের যে প্রচন্ড উল্লাস তার প্রধান কারণ জাতীয়তাবোধের সার্বিক আবেদন। যে আবেদন শ্রেণীর গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বশ্রেণীর কাছে পৌছেছিল। আজ সেই আবেদন ক্ষীণ। অন্য আদর্শ ও চিন্তা তার জায়গা নিয়েছে। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র আর উৎসাহের খোরাক জোগায় না। যে আদর্শ একদিন

ষষ্ঠদশ বার্ষিক সম্মেলন, বেথুন কলেজ, ২০০০

আমাদের রক্তে আগুন ধরাতো, [এক বিদেশী পর্যবেক্ষক আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন—it was a fire in the blood] সেই আদর্শ আজ বিপন্ন, নির্জীব।

জাতীয়তাবাদ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের প্রধান ধর্ম। জাতীয়তাবাদ খুব প্রাচীন ধর্ম নয়। আঠার শতকের মধ্যভাগে পঃ ইউরোপ এবং ভবিষ্যতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম। ক্রমে সেই আদর্শ অন্য পাঁচটা আদর্শের মত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার পাশাপাশি আরও নানান শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক আদর্শ মানুষের জীবনে এসেছে। কিন্তু একথা বললে বোধহয় সত্য হয় যে গত দু'শো আড়াইশো বছর ধরে, বিশেষ করে উনিশ শতকের মানুষের প্রধান রাজনৈতিক ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় জাতীয়তাবাদ। তার মানেই জাতীয়তাবাদ যে সর্বত্র খুব বাঞ্ছনীয় তা বলছি না। আজকের মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের দিকে যদি কেউ তাকিয়ে দেখেন, যুগোশ্লাভিয়ায় যা হচ্ছে চিন্তা করেন, তার আগে জাতীয়তাবাদের নামে জার্মানী, ইতালিতে যা হয়েছে সে সব ঘটনা স্মরণ করেন তাহলে জাতীয়তাবাদকে খুব একটা ভাল জিনিস বলে মনে হয় না। কতকটা এই কারণেও পৃথিবীর সর্বত্র বুদ্ধিজীবী, উদারনীতিতে বিশ্বাসী, মানুষের মঙ্গলে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে জাতীয়তাবাদ ম্লান হয়ে গেছে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেও, বিশেষ করে যাঁরা চরম বামপন্থী তাঁরা জাতীয়তাবাদকে একটা নিন্দাসূচক শব্দ বলে মনে করেন। এসবই সত্যি কিন্তু একথাও মানতে হবে যে এখনো এই একটি আদর্শের জন্য ঠিক হোক বা ভুল হোক, পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ স্বেচ্ছায় অস্ত্র তুলে নেয়, মরতে প্রস্তুত হয়। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক প্রভু বা ধর্মের প্রতি মানুষের যে আনুগত্য ছিল উনিশ/কুড়ি শতকে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতি সেই আনুগত্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে, বিশেষত সাম্প্রতিক কালে জাতীয়তাবাদের বীভৎস রূপ আমরা দেখেছি। তার ফলে তার গৌরব অস্তমিত। জাতীয়তাবাদ আজ তাই নির্বোধ ও পরজাতি বিদ্বেষের ধর্ম। তার প্রধান প্রকাশ জাতিগত বিশুদ্ধকরণ বা এথনিক ক্লিনসিং। ফলে যাঁরা চিন্তা করেন, তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস আজ হৃতগৌরব। আগ্রাসী স্বার্থবোধ, অন্য মানুষের সর্বনাশ করে নিজের বৈভব বাড়ানোর ইতিহাস, তার চরম প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদে। তার সঙ্গে অন্য জাতি, ধর্ম বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষও আছে। অবশ্য সে বিদ্বেষ অনেক সময় জাতীয়তাবাদ নিরপেক্ষ। এই সব কারণে আজ অনেক চিন্তাশীল মানুষ জাতীয়তাবাদের অবসান হওয়া মঙ্গলজনকই মনে করেন। আমাদের দেশে কিছু

চরমপন্থী এই শুভ পরিণাম এখনও ঘটে নি বলে চিন্তিত। অপরপক্ষে কিছু পশ্চিমী পণ্ডিত দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের কথা বলেন—শুভ ও অশুভ। মোট কথা তাদের চোখে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির জাতীয়তাবাদ প্রথম পর্যায়ের। এশিয়া, আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদ বিকৃত বিদ্বেষ প্রসূত আদর্শ। তার উৎস প্রাগ্রসর জাতিগুলির প্রতি ঈর্ষাবোধ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিমের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ যার ফলে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে এসব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক বলেছেন, এই সব পণ্ডিতদের চোখে দুধরনের জাতীয়তাবাদ আছে। আমার জাতীয়তাবাদ যা ভাল, তোমার জাতীয়তাবাদ তা খারাপ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক দিক অবশ্যই ছিল। বিশেষত অন্য জাতি বা সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ গৌণ হলেও তার অঙ্গ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু মূলতঃ এই উপমহাদেশের জীবনে জাতীয়তাবাদের অবদান শুভ। তার প্রধান মঙ্গলদায়ক দিক জাতিধর্মনির্বিশেষে এই উপমহাদেশের সব মানুষকে এক বিরাট মহাজাতি কল্পনা করা। ভবিষ্যত রাষ্ট্র এই অক্ষপথের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার অন্যতর ভিত্তি হবে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে উঁচু নৈতিক মান। পূর্বযুগের রাজনৈতিক বা সমাজ নেতারা এই কল্পনাই করেছিলেন। এই আদর্শ জাতীয় আন্দোলনকে গৌরব ও মহত্ব দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে আজ তাতে এই তুষারশুভ্র আদর্শ অনেকাংশেই বিপর্যস্ত। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে উৎসাহ যে নিভে গেছে তার একটি কারণ নেই। কিন্তু এই নিরুৎসাহতার অন্যতর পরিণাম রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নীতিবোধের অবসান। সেই সংস্কৃতি ক্রমেই প্রায় সম্পূর্ণভাবে নীতিনিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থসিদ্ধিই তার একমাত্র না হলেও অনেকার্থেই মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত দেশের গত পঁচিশ/তিরিশ বছরের রাজনীতিকে অনেকেই এই চোখে দেখেন। জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রকৃতির দান নয়। ভাষা বা সংস্কৃতিগত ঐক্য ছাড়াও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। বিশ্ব ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে নানা ঘাত প্রতিঘাতের ফলে এর জন্ম। জন্ম পশ্চিমী জগতে, পরে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে এই ইতিহাসের চেহারার মিল আছে। এক সংস্কৃতি ও ভাষা ছাড়া জাতি হয় না, এ চিন্তা সাম্রাজ্যবাদীরা চালু করেন, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। তাদেরই সুর ধরে, আজকাল কোন কোন দেশীয় পণ্ডিত বলছেন, কৌম বা কমিউনিটিই মানুষের স্বাভাবিক গোষ্ঠী। ইউরোপের ইতিহাসে এই তত্ত্বের বহু ব্যতিক্রম রয়েছে। জার্মানী ও ব্রিটেন রাষ্ট্রের জন্ম সংঘাতের মধ্যে। ব্রিটিশ রাষ্ট্র কোন এক কৌমের রাষ্ট্র নয়।

"যুক্তে রাজ্য" অন্তত তিনটি কি চারটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও ভাষাভাষী লোক নিয়ে গড়ে উঠেছিল। জার্মানীর ইতিহাস ষোল-সতের শতকে ধর্মভিত্তিক মারামারির ইতিহাস। তা সত্ত্বেও সেখানে সংহত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে অসুবিধা হয়নি। ব্রিটেনের ইতিহাসের শিক্ষা এই যে ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য থেকে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আরও বিচিত্র। সেখানে জাতীয়তাবাদ সংহত হয় গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

ভাষা বা সংস্কৃতিগত ঐক্য যে জাতীয়তাবাদের প্রধান উপাদান নয়, তার অন্যতম প্রমাণ আবার এই 'নতুন জগতে'র ইতিহাস থেকেই দেখতে পাই। যখন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করল তখন সীমান্তের অপরপারে আরও কতগুলি রাজ্য ছিল যারা ইংরাজিভাষী এবং ইংরাজের শাসনের অধীনে। তারা এই বিপ্লবের অংশগ্রহণ করেনি। কেন? ভাষাগত সংস্কৃতিগত ঐক্য থেকেই যদি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় তাহলে কানাডা কেন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ হল না? ভাষাগত সংস্কৃতিগত ঐক্য থেকেই যদি জাতীয়তাবাদ সংহতি লাভ করে তাহলে উনিশ শতকের শেষার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচন্ড গৃহযুদ্ধ হল কেন? সুতরাং এই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষেও এই জাতীয়তাবাদের সংহতি এইভাবে হয়েছিল। এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অস্বাভাবিক বা মেকি না। এটা যে মেকি তা উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদীরা বলতেন। আজকে অদ্ভুতভাবে প্রগতিবাদীরাই সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে একথা বলতে শুরু করেছেন। বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্বে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ মিথ্যে হয়ে যায় নি। এপ্রসঙ্গে উপমহাদেশের সংস্কৃতিগত ঐক্য বা মুঘল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একীকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আজ সে আলোচনায় যাবো না। আমার বক্তব্য উনিশ এবং বিশ শতকে ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয়, যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের এই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, সেটা তার প্রাচীন ইতিহাস নিরপেক্ষ। বিশেষ কতগুলি ঐতিহাসিক সংগঠনের মধ্যে থেকে এই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের জন্ম। শুধু একটা কথার উপরে জোর দিতে চাই, স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে দেশে জাতীয় ঐক্য ছিল না বলে কষ্টে অর্জিত জাতীয়তাবাদ বৃথা হয়ে যায় না। তবে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের ফলে দেশ ও রাষ্ট্রে সংহতি সৃষ্টি ও রক্ষা যে সমস্যা সঙ্কুল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে সব সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা যে ভারত

রাষ্ট্রের আছে একথা এখনও অপ্রমাণ হয়নি।

ভারতবর্ষ কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সত্যিই অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে? অথবা যেমন ইংরাজ পণ্ডিতরা নানা প্রকারে পাকেচক্রে বারবার বলেন যে এই স্বাধীনতা উদার ইংরাজের দান সে কথাই সত্যি? কেউ কেউ আবার বলছেন, এটা উদার ইংরাজের দানও নয় আবার ভারতবাসীও এই স্বাধীনতা অর্জন করে নি। এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তির সাম্রাজ্যরক্ষা করার ক্ষমতা প্রায় চলে যায় এবং তারই ফলে তারা ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারাই যে স্বাধীন ভারতে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতীয়তাবাদের শক্তি এবং নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনে তার অবদানের প্রমাণ এইখানে। নতুন শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার উৎস স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের নেতৃত্ব। বিদেশী শাসকদের ভারতবর্ষে সহযোগীর অভাব কখনো হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রিসভা ইংরাজের অধীনে কখনো কখনো ইংরাজের প্রত্যক্ষ সমর্থনে রাজত্ব করে গেছে। প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস তখন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত। সেই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নেতারা কারাগারে। তার যে অর্থসামর্থ্য তা সমস্ত সরকার কেড়ে নিয়েছে। এসব সত্ত্বেও এই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নেতারা '৪৫ সালে কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েই ইংরাজের সাথে ক্ষমতার হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আহুত হলেন। কেন? ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যে সব ভারতীয় নেতারা বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিত্ব করেছেন তাদের না ডেকে এই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ডাকা হল কেন? সেই নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের এক্ষেত্রে কোন অবদান আছে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। অবদান এখানে জাতীয়তাবাদের। কারণ এই নেতৃত্বের ফলে যে আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে দেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনায় কংগ্রেসকে ডাকায় সেকথাই প্রমাণ হয়। 'ক্যারিশমা' বলে যে শব্দটি ইংরাজিতে ব্যবহৃত হয় তার সার্থক বাংলা অনুবাদ করা কঠিন। জাতীয় আন্দোলন যে ক্যারিশমা অর্জন করেছিল, তা নেতা ও কর্মীদের আত্মত্যাগের কতগুলি কর্মপদ্ধতি, কতগুলি প্রচারের ভিত্তিতে অর্জন করেছিল। সেই প্রচার এবং কর্ম যে সাধারণ মানুষের সমর্থন পেয়েছিল তার প্রমাণ, ইংরেজ যখন রাজ্য হস্তান্তর করবে তখন সাম্রাজ্যের শত্রু এই নেতাদেরই কারাগার থেকে ছেড়ে দিতে, তাদের সঙ্গে আলোচনায়

বসতে হল। অনুগত সহযোগীদের ছেড়ে, নিতান্ত অনুগত রাজা মহারাজাদের পথে বসিয়ে এক বিদ্রোহী সংস্থার নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের হাতে এই জন্যই ক্ষমতা দিতে হল। কারণ জাতীয়তাবাদের পেছনে অধিকাংশ ভারতীয়ের সমর্থন তখন এসে গেছে। দেশীয় রাজ্য এবং অন্য ইউরোপীয় জাতি শাসিত অঞ্চলগুলিও এই নতুন ধর্মের আওতায় এসেছিল তার প্রমাণ পরবর্তী ইতিহাসে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শুরু ইংরাজিনবীশ মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে। জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের প্রথম যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য রাজনৈতিক আদর্শের অঙ্গ ছিল। ক্রমেই সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজভক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। ইংরাজের জাতিবৈর সম্পর্কে তারা বিশেষ স্পর্শকাতর ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা ও জগতব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে গর্ববোধ তবুও তাদের চেতনায় দীর্ঘদিন সহাবস্থান করত। জাতীয়তাবাদের পেছনে যে গভীর আবেগ ছিল প্রথম যুগে তার ভিত্তি এইখানে। ১৮৭০-এর দশকে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতারা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এই আবেগকে সংহতি দিতে চেয়েছিলেন। নবজাত জাতীয়তাবোধের প্রকাশ সেই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। আবার সেই সব প্রতিষ্ঠানই জাতীয়তা-বাদীদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্টরূপে দিতে সাহায্য করে ভবিষ্যত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সামাজিক খসড়া আঁকতে শুরু করে। নতুন রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সেই ঊষাকাল আজকের আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ স্বাধীনতা যখন রাজনৈতিক সত্য হয়ে দেখা দিল জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইতিহাস তখন ৭০ বছর ছাড়িয়ে গেছে। এই কথাটির উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক নতুন স্বাধীনদেশ জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেরই স্বাধীনতা আন্দোলনের বা জাতীয়তাবাদের ইতিহাস সময়ের হিসাবে অত্যন্ত হ্রস্ব, ভারতবর্ষে অন্তত সত্তর/আশি বছর ধরে এই জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ হয়েছে। এর আগেও চলে যাওয়া যায়। প্রায় ১৮৪০ সন থেকে আমরা দেখি কিছু কিছু মানুষের মনে এই চেতনার সঞ্চার হয়েছে। মোট কথা, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের কল্পনা প্রথমে অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে বহুদিন ধরে। আর আন্দোলনের মাধ্যমে বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে সেই দেশাত্মবোধ ছড়িয়ে গেছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে। অর্থাৎ ১৯৪৭-এ সেই গণ চেতনার বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। ১৯১৯ থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয় তার মারফত জাতীয়তাবাদের

আদর্শ শহর গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছেও পৌঁছায়। যেই প্রতিষ্ঠানটি সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ক্রমে জনগণের চোখে তা বিদেশী সরকারের বিকল্প হিসাবে দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে বর্তমানের একটি আলোচনা বা বিতর্ক উল্লেখ করা প্রয়োজন। এক ক্ষমতাশালী ঐতিহাসিক গোষ্ঠী বলছেন যে গণ আন্দোলনের নিজস্ব স্বাধীন চেতনা ছিল। জনগণ মধ্যবিত্ত নেতাদের কাছ থেকে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা নেয়নি। তাদের নিজেদের বিশিষ্ট প্রয়োজনবোধ ছিল, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। কথাটির মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বঞ্চিত মানুষ যদি মনে না করতেন যে এই আন্দোলনগুলি তাঁদের জীবনে প্রাসঙ্গিক, তাহলে সে আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করতেন না। কিন্তু অন্যদিকে একটা কথা বলা প্রয়োজন, সমস্ত ভারতব্যাপী একজাতি বা দেশ আছে সেই ভারতব্যাপী জাতি বা দেশ এক সময় এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে এই চিন্তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ জনগণের মনে জাতীয় আন্দোলনের আগে কখনো এসেছিল তার প্রমাণ আমরা পাই না। সুতরাং শুধুমাত্র বঞ্চিত মানুষের নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার ফলে তাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছে একথা বললে রোমান্টিক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। জনগণের প্রতিও সুবিচার করা হয় না। জাতীয়তাবাদী নেতারা ভাল বা মন্দ যাই হোক তারা যে একটা নতুন চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'ভারতমাতা' বলে শব্দটি জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষার অঙ্গ করে তুলতে পেরেছিলেন, সে ব্যাপারে তাঁদের দান অবহেলা করলে ইতিহাস বিকৃত করা হয়। ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে ৭টি প্রদেশ কংগ্রেসের জয় এই নতুন চেতনার দ্যোতক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজ সরকারের দুঁদে কর্মচারীরাও
চেতনার দ্যোতক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজ সরকারের দুঁদে কর্মচারীরাও
জাতীয়তাবাদের এই চেহারা দেখে চমকে গিয়েছিলেন। এর আগে অবধি তাদের বিশ্বাস ছিল যে জাতীয়তাবাদ মুষ্টিমেয় ধান্দাবাজ ভদ্রলোকের কারসাজি মাত্র। তার পিছনে গণসমর্থন নেই। কিছু ইংরাজ ভাঙা রেকর্ডের মত এখনও এই বুলি কপচে যাচ্ছেন। তারা দেখাচ্ছেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা জেলে গিয়েছিল তারা ভারতবর্ষের লক্ষ অংশেরও কম, অতি সামান্য কিছু লোক। এইভাবে বিচার করতে গেলে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে কজন যুদ্ধ করেছিল এবং তারা আমেরিকার জনসংখ্যার কত শতাংশ তা হিসেব করতে হয়। ১৯৩৭ অবধি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সত্যিই মনে করতেন যে গ্রামীণ ভারতবাসীর স্বাভাবিক অনুগত্য রাজা-জমিদার-

তালুকদার সম্প্রদায়ের প্রতি। চাষীর চোখে তারাই নাকি মা-বাপ। আর সেই স্থানীয় মা-বাপের মাথার ওপরে আছেন পরম পিতা ইংরেজ শাসক অর্থাৎ সরকার বাহাদুর। তাদের আরো বিশ্বাস ছিল ভারতীয় কৃষকদের কাছে রাজদ্রোহ নিতান্তই না পসন্দ। ১৮৫৭ সনটা মনে হয় তারা বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক ভুল বোঝার ব্যাপারটা আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক। বিদেশী শাসনের যুগে শাসক গোষ্ঠীর ভারতচিন্তায় আত্মতুষ্টির চেষ্টা স্পষ্ট। ভারতীয় মানুষ আসলে তাদের জান দিয়ে ভালবাসে এই বিশ্বাস না থাকলে সাম্রাজ্যের অনন্ত জীবন বিশ্বাস টেঁকে না। পরের দেশের মানুষের উপর ছড়ি ঘোরান যে নিতান্ত নীতিসঙ্গত এমন কথাও নিজেদের বোঝানো যায় না। আজকে যে চরমপন্থীরা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রকে শুধু শোষণযন্ত্র বলে মনে করেন, তাদের চিন্তায়ও আবেগ আর কল্পিত সিদ্ধান্তর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চোখে পড়ে। ফলে যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেটাও নিতান্ত মেকি এবং ধাপ্পা একথা তাঁরা বার বার ঘোষণা করছেন। সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার কত কাছে তারা পৌঁছে গেছেন এই খেয়াল বোধহয় তাঁদের নেই। দুই গোষ্ঠীর কাছেই জাতীয়তাবাদ স্বার্থপর ধান্দাবাজের তৈরি ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে নির্বাচনের ইতিহাস অন্যকথা বলে। দেশের বঞ্চিত জনগণ জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রকে অবান্তর মনে করেন নি। ১৯৩৭ সাল থেকে ভোটের ইতিহাস এই কথাই বলে এবং '৪৭-এর পরে গণভোটের যুগে তার সত্যতা আরও সুস্পষ্ট। পৃথিবীতে বোধহয় ভারতবর্ষেই প্রথম স্বাধীনতার মুহূর্তে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। অন্য সব দেশে এই অধিকার পেতে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের দেশের রাজনীতির চেহারা বদলেছে ঠিকই এবং সে চেহারায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র সম্পর্কে উৎসাহের চিহ্ন প্রবল নয়। কিন্তু এই অনীহার কারণ কৌম বা কমিউনিটির প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য বা বহুসংস্কৃতি গোষ্ঠীর অস্তিত্বের ফলে জাতীয়তাবাদের অসম্ভাব্যতায় খুঁজতে গেলে ভুল হবে। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল ভারতবর্ষ শতশত খণ্ডে ভেঙ্গে যাওয়ার লক্ষণ এখনও দেখা যায় নি। রাষ্ট্রে বিপদ দেখা দিয়েছে অন্য কারণে। সম্পূর্ণ নীতিবর্জিত রাজনীতি বহুমানুষকে রাজনীতি সম্পর্কেই বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ইন্ধন জুগিয়ে এবং তার সুযোগ নিয়ে গৈরিক দল ক্ষমতার প্রধান ভাগীদার হয়েছে। আঞ্চলিক আশা নিরাশার চাপে দেশ ভেঙ্গে যাওয়াই একমাত্র সম্ভাব্য বিপর্যয় নয়।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার স্বরূপ বুঝতে হলে স্বাধীনতার মুহূর্তে জাতীয়তাবাদের আবেদন কোথায় ছিল কেমন ছিল বোঝা দরকার। এই আবেদনের পিছনে রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, কোন একটি বিশেষ দলের নয়, তার নানারূপ আছে। গান্ধীবাদীরা অহিংস পথে আন্দোলনের চেষ্টা করেছেন, তাঁরা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সাধারণ মানুষের চোখে বিশেষ করে ১৯৩৭-এর পরে তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানটিকে ইংরেজ সরকারের বিকল্প এক ক্ষমতার উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু সুর ছিল। বামপন্থী নেতারা যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তাঁরা—এই সব বহু মানুষের আত্মদানে জাতীয়তাবোধ বহুলোকের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। আমরা জানি যে, যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয় সেই বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গান, ছড়া এখনও প্রচলিত। অর্থাৎ আমাদের যে সামাজিক চেতনা তারমধ্যে একটা রাষ্ট্রচেতনা, রাজনৈতিক চেতনা যার ভিত্তি জাতীয়তাবাদী বহু মানুষের কর্মে ও জীবনে বহু শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিসেবে দেখানো হয়েছে যে ১৯১৯ সাল থেকে যে আন্দোলনগুলি হয়েছে তা মোটেই মধ্যবিত্তের আন্দোলন নয়। নীরদ চৌধুরী মশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ১৯২০ সনের কলকাতার বর্ণনা করেছেন। যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে তখনকার খিলাফত ভলান্টিয়ারদের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন একেবারে সমাজের যে নিম্নতম স্তরের মানুষ, "scum of the earth" অর্থাৎ সাধারণ হতদরিদ্র মানুষ এই আন্দোলনে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯৩০-এর আন্দোলনে উত্তরপ্রদেশে যাঁরা কারাগারে গিয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশ ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীর অর্থাৎ একথাটা একেবারেই সত্যি নয় যে জাতীয় আন্দোলন যখন সত্যিকার সংঘর্ষের পথে গিয়েছে তখন তার শরিক শুধু মধ্যবিত্তরা। একথা বলছি জাতীয়তাবাদের প্রশংসা করতে নয়। শুধু বোঝাতে যে আমাদের দেশে সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনায় জাতীয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যার প্রকাশ ১৯৪৭ সন মধ্য অগাস্টে যেদিন দেশ স্বাধীন হল সেদিন দেশব্যাপী প্রচণ্ড উল্লাসে। এই চেতনা কতটা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছেছিল তার অন্যতর প্রমাণ ১৯৪২ সন। এসময় কংগ্রেস নেতৃত্ব আন্দোলন চালাবার জন্য কারাগারের বাইরে ছিলেন না। গান্ধী শুধু আন্দোলনের ডাক দিয়েই কারাগারে গিয়েছিলেন কিন্তু দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইংরেজরা নিজেদের লেখায় স্বীকার করেছেন যে ১৮৫৭-র পরে এতবড় দেশব্যাপী আন্দোলন তারা কখনো দেখেন নি। তাঁরা প্রকৃতই

ভয় পেয়েছিলেন। সেই আন্দোলনের মধ্যে অনেক ভুল ছিল, হয়ত অনেক বীভৎসতাও ছিল কিন্তু তার থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে সাধারণ দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের মনেও দেশ, জাতি সম্পর্কে একটা আবেগ গভীরভাবে শিকড় গেড়েছিল।

এখন আগের কথায় ফিরে আসি। দেশ স্বাধীন হল কি ভাবে? সত্যিই কি অসহযোগ আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হল, সত্যিই কি নেতাজী সুভাষচন্দ্র আই. এন. এ. গড়ে তুললেন বলে ইংরেজরা ক্ষমতা ছেড়ে দিল? হয়ত নয়। আমেরিকার মত ভারতবর্ষে কোন ইংরেজ সেনাপতি গান্ধীজী বা নেতাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। তাহলে ইংরেজদের চলে যাওয়ার কারণটা কি? যিনি ইংরেজ সরকারকে মতিলাল নেহেরু ও কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সাথে সমঝোতা করে তাদের হাতে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস তুলে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই হেইলি বলছেন, যে ১৯৩০ এর আন্দোলনে জাতীয়তাবাদীরা যে দুঃখ বরণ করলেন, যে অসাধারণ তিতিক্ষার সঙ্গে তারা ইংরাজের সাথে লড়াই করলেন, তাতে "মেন অব গুড উইল" তাঁদের পক্ষে চলে যাচ্ছে। "মেন অব গুড উইল" বলতে ইংরাজের সপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ইংরাজের কর্মচারীরা। তিনি বলেছেন যে ইংরাজের উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীরা এই আন্দোলনের তিতিক্ষায় আত্মদানে গর্ববোধ করে। চল্লিশের দশকে ওয়াভেল বলছেন, যদি আবার আন্দোলন হয় তাহলে ভারতীয় কর্মচারী, ভারতীয় পুলিশ বা সেনার উপর নির্ভর করা যাবে না। এর অন্যতম প্রমাণ হল, বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহ। সুতরাং জাতীয়তাবাদ একটা অবস্থায় এসে পৌঁছায় যখন যে সহযোগিতার উপরে ইংরাজের শাসন টিকে ছিল সেই সহযোগিতার ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। অসহযোগ আন্দোলন তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভ করেনি। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বার বার দেখাতে চান গান্ধীর ডাকে এই আন্দোলনে খুব সামান্য সংখ্যক লোকই চাকরি ছেড়েছে এবং আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। এটা সত্যি কথা তবে পাথরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল পড়ে যেমন পাথরও ক্ষইয়ে দিতে পারে, ক্রমাগত আন্দোলন, প্রচার, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখে দেখে ভারতবর্ষের মানুষের মনে ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সহযোগিতার উৎসাহ কমে যায়। ওয়াভেল সাহেব ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভাকে জানান যে সমগ্র ভারতবর্ষকে ধরে রাখা আর সম্ভব না, এ চেষ্টা ছাড়তে হবে। তিনি এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন—আস্তে আস্তে ক্ষমতা গুটিয়ে আনার। যে প্রদেশগুলিতে জাতীয়তাবাদীরা নির্বাচনে জিতেছেন সে সব প্রদেশ তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হোক এবং দিল্লীকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চল তাতেই

ইংরেজ শাসন সংহত করার চেষ্টা হোক। এই প্রস্তাব শুনেই অ্যাটলি পত্রপাঠ তাঁকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয় ভারত স্বাধীন হবার পরেও চার্চিল তা শুনে শঙ্কিত হয়েছিলেন, প্রস্তাব এসেছিল সেনা পাঠিয়ে ভারতবর্ষ পুনর্বার জয় করে নেওয়ার জন্য।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেই যে জাতীয় চেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল তার আরো প্রমাণ আছে। ১৯২০ সনে ভারতবর্ষের শিল্পপতিরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৩০-এ তাঁদের অনেকেই আন্দোলনের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন বোম্বাই-এর গভর্নর বলেছেন যে, এখন তারা জাতীয়তাবাদকে নিজেদের আদর্শ বলে গ্রহণ করে কিছুটা আত্মত্যাগ করতে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতেও রাজী। এই সময় অবশ্য বিড়লা এবং টাটার মধ্যে একটা মজার চিঠি বিনিময় হয় যেটা আজ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হবে। বিড়লাকে টাটা লেখেন যে দেশে সাম্যবাদের ক্ষমতা বাড়ছে, সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীরা শিল্পপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে। এর জন্য আমাদের একত্র হওয়া দরকার—এদের ক্ষমতাকে রোধ করার জন্য। বিড়লার উত্তরটা গভীর অর্থবহ। তিনি বলেন জোটবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষমতা বোধ করতে শিল্পপতিরা পারবে না, একমাত্র স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রই এটা রোধ করতে পারবে। একদিকে যেমন সাধারণ বঞ্চিত মানুষ জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে এসেছেন, তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন অন্যদিকে ১৯৩০ সালের পরে ভারতীয় শিল্পপতিরাও জাতীয়তাবাদের আওতায় এসেছেন। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর একটি গ্রন্থে দেখিয়েছেন, (এটা তাঁর সাবল্টার্ন গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার আগের রচনা) যে ১৯৩০-এর দশকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ জাতীয়তাবাদের সপক্ষে দাঁড়িয়েছে। তিনি সে সময়কার উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসে ক্ষমতার সঙ্গে চীন দেশের মাও সে তুঙের সেই বিখ্যাত লং-মার্চের সময়কার, বা নতুন পরিকল্পনার সময়কার সোভিয়েত রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংখ্যাগত তুলনা করে দেখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে বহু শ্রেণী ও সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদের সমর্থক হলেও সবাই হয়নি। তার একটা কারণ, যে শ্রেণীর মানুষ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাঁদের পক্ষে সব শ্রেণীর স্বার্থ সমানভাবে দেখা সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলি গভীর স্বার্থগত সংঘাত ছিল এবং আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের ক্ষমতা কত প্রবল কতগুলি ঘটনায় তা বোঝা যায়। কৃষকদের স্বার্থ বাঁচাতে স্বামী সহজানন্দ বিহার অঞ্চলে আন্দোলন করেছিলেন এবং গান্ধীবাদী নেতৃত্বের

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্পষ্টত গান্ধীজীর বিপক্ষে কথা বলেন নি ততক্ষণ কৃষকরা তাঁর সঙ্গে ছিল যে মুহুর্তে তিনি সোজাসুজি বলেন যে, তিনি গান্ধীর পথ সমর্থন করেন না সেই মুহুর্তেই তিনি সমর্থন হারালেন। এ নয় যে কৃষকরা নিজেদের স্বার্থ বোঝে না। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে নিজেদের স্বার্থবিরুদ্ধ হলেও জাতির সর্বোচ্চ নেতার পক্ষ সমর্থন করছে। সাধারণ মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদের আবেদন এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ ছেড়ে তারা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বর সাথে হাত মেলাতে রাজি ছিল। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। এইজাতীয় জাতীয়তাবোধের উপরে ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে দেখিয়েছেন, কংগ্রেস উত্তর প্রদেশে প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তার প্রধান সমর্থক নীচুজাতের অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু রায়তরা। এরা পরবর্তীকালে দেশস্বাধীন হওয়ার পরে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ, উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ বঞ্চিত কৃষক তা সত্ত্বেও বহুদিন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানটির সমর্থন করেছে। তারা নিজেদের রাজনৈতিক আবেগ জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের স্বার্থের দিকে তাকানো নেতাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। ১৯৩৭এ যে কংগ্রেস মন্ত্রী সভাগুলি প্রদেশে ক্ষমতাশীল হয়, তারা জমি বন্টনের বিষয়ে নীতি মৌখিক ভাবে গ্রহণ করলেও কার্যকরী করতে পারেন নি। আমি এটাই বলতে চাই যে জাতীয়তাবাদের বহু দুর্বলতা ছিল। বহুদিন তারা বিশেষ বিশেষ শ্রেণী স্বার্থের সমর্থন করেছে। সর্বশ্রেণীর ঐক্যের ভিত্তিতে আন্দোলন করণে সবশ্রেণীর স্বার্থ সমানভাবে দেখা সম্ভব নয়। এজাতীয় আন্দোলনে বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের প্রতি জনগণের প্রচণ্ড সমর্থন ছিল। আমাদের অল্পবয়সে যখন ইস্কুলে পড়ি, মনে আছে তখন প্রতিবছর কাগজে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা দেখতাম। রাষ্ট্রপতি মানে কংগ্রেস সভাপতি। সেই রাষ্ট্রপতিকে আমরা সত্যিকারের রাষ্ট্রপতি বলেই ভাবতাম। '৪৭-এর পরে যখন সত্যিই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির আসনে ভারতীয়দের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বসলেন তখন যে উদ্দীপক ছবি মানুষের মনে ছিল তা আজ অনেকটাই হতশ্রী, বিগতগরিমা।

এবার সেকালের সাথে একালের পার্থক্য প্রসঙ্গে আসি। ১৯৪৭ সনে যকন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল তখন ভারতীয় জাতি যে গঠিত হয়েছে এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। এবং সেই রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদও প্রবলভাবে বর্তমান। কিন্তু জাতি গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এর নানা কারণ ছিল। প্রথম কথা শিল্পপতি এবং

শ্রমিক, যারা খাজনা দেন তাঁরা এবং ভূমিহীন কৃষক, ব্রাহ্মণ এবং অচ্ছুৎ এদের সকলকে নিয়ে একজাতি গড়ে তোলা সহজ কথা নয়। তাছাড়া আমরা জানি যে ১৯৪০-এর দশকে স্বাধীনতা আন্দোলন রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মুসলমানের সমর্থন হারায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেই জাতি গঠনের অসমাপ্ত কাজ, সেই সমর্থন সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টায় সাফল্য সীমিত। একথা বললে ভুল হবে যে ভারতরাষ্ট্রের নানা ক্ষেত্রে যে সব মুসলমান নেতা দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা প্রতীক মুসলমান মাত্র। যাঁরা আবুল কালাম আজাদ বা রফিউদ্দিন কিদওয়াইফকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে এই সব মানুষকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এরা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের সমর্থন পান নি। কিন্তু পরবর্তী কালে আমাদের রাষ্ট্র গঠনে একটা প্রবল দুর্বলতা এই যে, কোন কোন সম্প্রদায়ে যে নতুন নেতৃত্ব বেরিয়ে এলেন তাঁরা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বর উপর জোর দিয়েছেন। এবং ভোটের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো এই সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। ফলে নানা দিক থেকে জাতি গঠনের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আশ্চর্যের কথা এই যে আমাদের সাধারণ বঞ্চিত মানুষ এই অসম্পূর্ণ জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতি একটা আনুগত্য বোধ করে। এই রাষ্ট্রে যে তাদের অংশ রয়েছে সেটা তারা বিশ্বাস করে। এর চরম প্রমাণ দুটি ঘটনা—প্রথমত, যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন তখন নির্বাচনের সুযোগ পাওয়া মাত্র ভারতবর্ষের দরিদ্রতম তার বিরোধীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিল। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দু'বছর পরে জনতা সরকার যখন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা একেবারেই মেটাতে পারল না, তখন গণভোটে শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলেন। অনেক সময় বলা হয় যে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ খেতে পরতে চায় তাদের রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন উৎসাহ থাকে না। কিন্তু ৭০ এর দশকের ইতিহাস এই ধরনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। দরিদ্রতম মানুষও একধরনের রাজনৈতিক শাসনে বিশ্বাস করে এবং সেই শাসন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত। এখানে উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে নির্বাচনের যেসব বিশ্লেষণ হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, যে সব গ্রামে শিক্ষা সাক্ষরতা নেই সে সব গ্রামে শিক্ষা সাক্ষরতা নেই সে সব গ্রামে যে সংখ্যক লোক ভোট দেয় তার তুলনায় দিল্লী শহরে ভোট দেয় অনেক কম সংখ্যক লোক।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আলোচনা

করতে চাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন আন্দোলনে নানা পথ, নানা মত দেখা দিয়েছে তখন বিভিন্ন দল, বিভিন্ন গোষ্ঠী, আগাগোড়াই চেষ্টা করেছে নিজেদের দলে আদর্শবাদী এবং যোগ্য মানুষকে টেনে আনার। এই প্রচেষ্টা ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আর দেখা যায় না। স্বাধীনতা পূর্ব যুগে শুধুমাত্র আত্মদানের ডাক আদর্শবাদী মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অতি সামান্য ছিল। ফলে যে সব যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ পরবর্তী যুগে নানা ক্ষেত্রে, চাকরী পেশা বা ব্যবসার ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবনের সুযোগ পেয়েছেন, বিদেশী শাসনে তাঁদের সঙ্গে তুলনীয় সব মানুষ অনেকেই কর্মহীন বা অতি সামান্য কাজে জীবন কাটিয়েছেন। সব রাজনৈতিক দলই সেই সুযোগ্য আদর্শবাদী মানুষের মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহ করতে পারত। আমি একথা বলছি না যে, চাকরি না পেয়ে লোক কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। কথাটা এই যে আদর্শবাদের আবেদনে অনেক মানুষ সাড়া দিতে পেরেছিল কেননা তাদের কাছে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। পরবর্তী যুগে নানা ভাবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে জীবিকায় যুক্ত থেকেও দেশের সেবা করার সুযোগ রয়েছে, অনুরূপ সুযোগ ইংরেজ আমলে দিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে নানা ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে অর্থনৈতিক সুযোগ খুলে যায়। বেকার সমস্যা ছিল এবং আছে। তা সত্ত্বেও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছে তা নগণ্য নয়। ইংরাজীতে যেটাকে টারসিয়ারি সেক্টর বলে, সেই চাকরি-বাকরির জগতে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন হল। একটা হিসেব দিলে বোঝা যাবে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল তখন সমস্ত উপমহাদেশে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২০০টি কলেজ ছিল। তার ২০ বছর পরে সেই সংখ্যা দাঁড়াল সম্ভবত ৮৫-১২০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২০০০ কলেজ এবং সে সংখ্যা আজ আরও অনেক বেড়ে গেছে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরীর বাজারও অনেক গুণ বেড়ে গেল। ফলে যে বিরাট জনসংখ্যার কোন অর্থনৈতিক সুযোগ ছিল না তাদের একাংশ নানাধরনের চাকরি পেল। আদর্শবাদী বহু মানুষ স্বাধীনতার পরে নিজেদের আদর্শকে প্রকাশ করেছেন গঠনমূলক কর্মের মধ্যে। গঠনমূলক কর্ম রাজনৈতিক অর্থে বলছি না। একটা উদাহরণ দিই—১৯৫০-এর দশকে বহু অর্থনীতিবিদ সরকারের চারপাশে এসে দাঁড়ালো এবং তাদের পরামর্শ দিল কিভাবে পরিকল্পনা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে। প্রযুক্তি, শিক্ষা, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আদর্শবাদী মানুষ কতগুলি কাজ করার সুযোগ পায়। খানিকটা এই কারণেই

রাজনৈতিক আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া এই নতুন যুগে বেশীরভাগ রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের দলে উপযুক্ত লোক টানবার কোন চেষ্টা করেন নি। পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক দেশে একটা প্রথা আছে যে জীবনের সবক্ষেত্র থেকে অল্প বয়েসে লোক রিক্রুট করা হয়। ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, কর্মীদের মধ্যে থেকে অল্প বয়সেই রিক্রুট সংগ্রহ করা হয়। এই রিক্রুটটাই ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক শিক্ষার ভিতর দিয়ে, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে উপরে ওঠেন, মন্ত্রী হন বা পার্লামেন্টের সভ্য হন। ভারতবর্ষে রিক্রুটমেন্টের পুরানো ভাষাটা বদলালো না। সেই যে আত্মত্যাগের আবেদন স্বাধীনতার আগে ছিল, তা এখনো চলতে লাগল। এই আবেদন একটি স্বাধীন দেশে খুব অর্থবহ নয়। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক কর্ম অন্য পাঁচটা কাজ বা পেশার জীবন যাত্রার মত সম্পূর্ণ নীতি সঙ্গত অন্যতর পথ। তাতে মানুষের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা খোঁজে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিদের কাছ থেকে সমাজেরও একটা প্রত্যাশাও থাকে। একটি মানুষ রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করে অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তির খাতে যে সব পুরস্কার পায় তার প্রতিদানে তাকে সমাজকে কিছু দিতে হয়। তুমি যদি পার্লামেন্টের সভ্য হও তাহলে তোমার নিজের কনস্টিটুয়েন্সিতে যাঁরা রয়েছেন তাদের প্রয়োজন দেশের সামনে তুলে ধরতে হবে, তাদের জন্যে কাজ করতে হবে। এই জিনিসটা ভারতবর্ষের জীবনে হল না। একেবারে হয়নি বলা না গেলেও খুব কমই হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে দুটো জিনিস ঘটল। এক, পুরোনো নেতারা শাসনের কাজে এত ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে তাদের আদর্শ প্রচার ও তার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের আদর্শ গড়ে তোলার কাজ অবহেলিত হল। দ্বিতীয় কথা, পার্টিগুলি বিশেষ করে কংগ্রেস পার্টি যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কাধারণ মানুষকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, তারা গণচেতনা প্রবুদ্ধ করার কাজ, mobilisation-এর চেষ্টা প্রায় ছেড়ে দিলেন। দলীয় সংগঠন নির্বাচন জেতার যন্ত্রমাত্র হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে নানা দিক থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা বিপর্যয় ঘটে। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল তখনও রিক্রুট সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন ঠিকই কিন্তু এঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধান স্থানীয় হতে পারেন নি। তাছাড়া পরবর্তী যুগে যখন ভারতীয়রা ক্ষমতার স্বাদ পেল তখন রিক্রুট যারা এল তারা দেশের স্বার্থে তত নয় যতটা নিজেদের স্বার্থে রিক্রুট হয়ে এলেন। ফলে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বহু জায়গায় একটা ফাঁক রয়ে গেল। বুদ্ধি, যোগ্যতা, আদর্শ সম্পন্ন

মানুষ রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব অল্প সংখ্যায় এলেন। ফলে যে বিরাট ফাঁক রয়ে গেল তা ভরল অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় লোক দিয়ে। ভারতবর্ষের একটি অঞ্চলে হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে বিধানসভায় এবং পার্লামেন্টে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের শতকরা ৩০ ভাগের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী কাজের প্রমাণ আছে। স্বাধীনতার কিছু পরে যখন দিল্লীতে কাজ করতাম, তখন একটা কথা খুব শুনতাম, যে ভারতের রাজনীতিতে দুরকম লোক আছে। এক, যাঁরা জেলে গিয়েছেন, আর দুই, যাঁদের জেলে যাওয়া উচিত। এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই ক্রমে বাড়তে থাকে।

তবে শুধু এই কথা বললে ভারতীয় রাষ্ট্রের যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে তার পুরো ব্যাখ্যা হয় না। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারের ফলে বেনোজলের মত অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার আমাদের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যে সব মানুষ কখনো কল্পনা করতে পারত না যে তারা সত্যিই ক্ষমতার অংশীদার হবে, তারা ভারতের নানা জায়গায় আজ ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক চেতনা, আদর্শ হয়ত অত স্পষ্ট নয় কিন্তু এই পরিবর্তন বর্তমানের পক্ষে যতই কষ্টকর, দুর্নীতির কারণ হোক ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনের একটা শুভ অবদান আমাদের জীবনে আছে বলে মনে হয়।

শেষ কথা এই বলতে চাই যে নানা কারণে জাতীয়তাবাদ আমাদের জীবনে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট। সেই জন্যই ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টে অত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও অত আনন্দ উল্লাস দেখেছিলাম। পঞ্চাশ বছর পরে তার সাথে তুলনীয় দুঃখ কষ্ট আমাদের জীবনে নেই। কিন্তু তবু কেন উৎসাহ নেই। আজকে বিদেশীরা হিসেব করে দেখাচ্ছেন যে ভারতবর্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং অর্থবান মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। কুড়ি কোটি লোকের হাতে যথেষ্ট অর্থ রয়েছে। তবে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের উৎসাহ নেই কেন? সবাই শুধু সমালোচনা করেন কেন? কারণ জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ তা থেকে যে কারণগুলির কথা আগে বলছি তা চলে গেছে। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, চাকুরিজীবী যারা তাদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চাকরির সম্ভবনা অনেক বেশি, কৃষক জানেন সর্বভারতীয় বাজার স্থানীয় বাজারের তুলনায় তার উৎপাদনের বিপণনের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক। কিন্তু এই জাতীয় স্বার্থবোধের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র সংহত থাকে সেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যত খুব ভাল নয়। মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারে, ঠিকই। এ

প্রসঙ্গে বলা হয়—man is a rational animal, মানুষ যুক্তিবাদী জীব। কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। আমরা rational animal না, we arc animals occasionally capable of rationality, বেশীরভাগ সময়ই আমরা যুক্তিবাদের পথে চলি না। আমরা বড়ই বোকা। চাকরী বা মুনাফা বাড়াতে আমরা জান কবুল করি না, কিন্তু যদি বলা হয় দেশ বিপন্ন, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ অস্ত্র তুলে নেয়। এই বোকামিটা আজ আমাদের জীবন থেকে প্রায় চলে গেছে। এই বোকামির যে প্রয়োজন তার একটা প্রমাণ হচ্ছে হিন্দুত্বের আবির্ভাব। যেখানে দেশাত্মবোধ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল, তার জায়গায় অন্য একটা আদর্শের প্রয়োজন ছিল। সে আদর্শ না পেলে তার জায়গা নেয় বিকৃত আদর্শবাদ। এক ইংরাজ পণ্ডিত গত পঞ্চাশ বছর ধরে বলছেন যে এই ভারত রাষ্ট্র টিকতে পারে না। হাজারটা জাতি, ভাষা ধর্মের এত পার্থক্য নিয়ে রাষ্ট্র স্থায়ী হয় না। অনুরূপ বৈচিত্র্য সামাল দিতে না পেরে যখন রুশ রাষ্ট্র ভেঙে গেল তখন তাঁরা বললেন এবার ভারতবর্ষেরও একই অবস্থা হবে। কিন্তু কথাটা এক নয়। ভারতবর্ষের সংবিধান যখন গড়ে তোলা হয় সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায় তাতে যোগ দেন। পরে যখন প্রদেশগুলিকে রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, অহমিয়া পণ্ডিত সঞ্জীব বড়ুয়া দেখিয়েছেন যে এককে ধরনের উপজাতীয়তাবাদ, স্থানীয় জাতীয়তাবাদ, দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদের অংশ হিসাবে স্থান নিল। তারফলে দেশে ভেঙে যায় নি। অনেক সময় খুব উৎসাহী ভারত সমালোচকরা শিখদের কথা বলেন। আমাদের অনেক পণ্ডিতরাও বললেন যে সত্যিই জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বড় ভাল ব্যাপার নয়, কৌমই ভাল। তারা কি চান বুঝতে পারি না। কৌমদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হলে কোন কমিউনিটির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে? হিন্দু-মুসলমান, কায়স্থ-ব্রাহ্মণ না উপজাতিগুলির হাতে? আর তাদের যে empower করা হবে, তাতে আঞ্চলিক শাসনের গতি হবে? রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, সিয়া মুসলমান, সাঁওতাল-ওঁরাও যে একই ভূমিখণ্ডে বাস করে? ক্ষমতাপ্রাপ্ত কৌমগুলি কোথায় রাজত্ব করবে? সৈন্য বাহিনী, রেলপথ, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা কৌমগোষ্ঠীরা কি ভাবে করবেন তা তারা ভাবেন নি। সেকথার মধ্যে না গিয়ে শুধু এটাই বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন প্রাদেশিকতার আবেদন রয়েছে অনেক সময় তা জাতীয় কেকের অংশ কে কতটা পাবে তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে। দুটি প্রমাণ দিই—তামিলরা মাদ্রাজের রাস্তায় মহা উৎসাহে ভারতীয় সংবিধান পোড়াতেন—যতক্ষণ না তাঁরা নির্বাচনে জিতে রাজ্যে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। যেদিন দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাড়গম নির্বাচনে জয়ী হলেন সেই দিনই তাঁরা ঘোষণা করল যে, যে সংবিধান তাঁরা আগের

দিন অবধি পুড়িয়েছেন তাঁর প্রতি তাঁদের আনুগত্য অনন্তকাল থেকেই আছে এবং থাকবে। এ নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই।

শেষ কথা ভারত রাষ্ট্র ভেঙে যাবে বলে আমি মনে করি না। ভেঙে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। কখনো সৎপথে, কখনো অত্যন্ত অসৎ পথে ক্ষমতা ব্যবহার করে এই রাষ্ট্রকে একত্র রাখার চেষ্টায় অধিকাংশ জনগণের সমর্থন আছে বলে মনে হয়। এটা সব সময় খুব ভাল কথা বলে মনে করি না কিন্তু এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ভেঙে যাওয়াই কোন রাষ্ট্রের পক্ষে একমাত্র চরম বিপর্যয় নয়। রাষ্ট্র ভেঙে না গিয়ে যদি রাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদ অধিষ্ঠিত হয়, কোন সাম্প্রদায়িক আদর্শের ভিত্তিতে দেশের রাজনীতি গড়ে ওঠে সেটা আমাদের পক্ষে আরও বেশি অমঙ্গলজনক বলে মনে করি। ভারতবর্ষ ভেঙ্গে ১০টা স্বাধীন রাষ্ট্র যদি নিজেদের কল্যাণের পথে চলে, সেটা এক অর্থে সর্বনাশের কথা কিন্তু ভারতবর্ষে যদি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যায় তাহলে তা মহত্তর। আরও একটা দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হল পৃথিবীব্যাপী নতুন জীবনাদর্শ। আজকে পৃথিবীতে ঘোষিত হয়েছে—নতুন দেবতা মুনাফা। মুনাফার পথে কেউ বাধা দেবে না। বাধাবন্ধহীন মুনাফার ভিত্তি অন্তহীন লোভ। সেই লোভকে প্রশ্রয় দিলে তবেই মুনাফা বাড়বে। এর একটা মুশকিল আছে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে শুধু লোভ এবং মুনাফার পথে দেশের উন্নতি হয়, দেশের ৩০ শতাংশ লোকের কাছে দৈনন্দিন জীবনধারণের উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার উপায় নেই। তারফলে, বৈষম্যভিত্তিক অন্যধরনের সংঘাত এখানে গড়ে উঠতে পারে। বঞ্চিত মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে বিপ্লবের পথে যায় না, যায় নানা ধরনের বিকৃত আদর্শের পিছনে। আমাদের জীবনে সেই আশঙ্কা আজকে প্রবল এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অগ্নিযুগের সূচনা ও স্বরূপ

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইতিহাস সংসদের সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় অতিথিবর্গ, এবং সমবেত ঐতিহাসিক বন্ধুগণ

আজ ২০০১ সালের চব্বিশে জানুয়ারি আপনারা সবাই আমাদের প্রিয় শান্তিনিকেতনে মিলিত হয়েছেন, আর আমি পড়ে আছি সুদূর প্রবাসে—এতে আমার অপরাধ যতটা, দুঃখও তার কম নয়। সেজন্য আমি একই সঙ্গে আপনাদের ক্ষমাপ্রার্থী, সহানুভূতি-প্রত্যাশী, এবং প্রশ্রয়-ভিখারী। অনিবার্য পারিবারিক কারণে আমার এই নির্বাসন, গৌতমদা জানেন। আজ আমার বক্তব্য তাঁরই কণ্ঠে আপনারা শুনতে পাবেন, এই ভরসা পেয়েছি। তিনি আমার অগ্রজ-প্রতিম, সুতরাং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে পারি না।

আজকের অধিবেশনে মূল নিবন্ধ পেশ করার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি তো যাকে বলে সম্মানিত বোধ করছি, কিন্তু খানিকটা সন্ত্রস্তও। ভাবছি আপনারা না শেষ পর্যন্ত এর জন্য অনুতাপ করেন। কেননা, যাঁরা আমার কাজকর্মের খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন, আমি আর যাই হই না কেন, পেশাদার ইতিহাসজীবী নই। বলতে পারেন আমি শুধুই ইতিহাস-প্রেমিক। আমাদের চতুর্দিকে ইতিহাস ঘটে চলেছে—কখনও নিঃশব্দে, কখনও সশব্দে এই চেতনা আমাকে স্পন্দিত করে; ইতিহাসের মূল প্রশ্ন নিয়ে আমি ভাবিত হই; ইতিহাসের বই পড়তে ভালবাসি, যদি অবশ্য পাঠযোগ্য হয়; কিন্তু ইতিহাস লিখতে গেলেই গায়ে জ্বর আসে। সংস্কৃত বচন অনুসারে মুর্খের পক্ষে চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ছেলেবেলায় শেখা এই সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে বুক্‌নি কিংবা হাল-ফ্যাশানের jargon-এর জালে আপনাদের জড়াতে সাহস পাই না। সোজা কথায় আমি মানুষটা একটু পুরনো। কলেজে আমার কাছে যাঁরা tutorial করেছেন, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে research, লেখার ব্যাপারে আমার এই

সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

ভীরু খুঁতখুঁতনির কথাটা অনেক দুঃখের মধ্য দিয়েই জেনে গেছে তাঁরা।

সুতরাং আজকের অধিবেশনের জন্য কী উপহার আনব তা নিয়ে আমার দ্বিধা ছিল। আমার রচনার বিষযবস্তু কী হবে এই সাত-পাঁচ চিন্তা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন ইতিহাস-সংসদের উৎসাহী কর্মী, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আজ আমার এই মূল নিবন্ধের বিষয় বাংলায় "অগ্নিযুগের সূচনা ও স্বরূপ"। বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা করেছি, একদা ইংরেজিতে আমার ভাবনা গ্রন্থিতও করেছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যবশত সেই লেখা বিশেষ কারও চোখে পড়েনি। রামকৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন বাংলাভাষায় আমার সেই ভাবনা সংক্ষেপে লিখে ফেলতে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যদিও জানিনা, মাতৃভাষায় ইতিহাসচর্চায় যাঁরা উৎসাহী রামকৃষ্ণর এই মন্ত্রণায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত কতটা উপকার পাবেন।

অনেকদিন আগে, বোধহয় ইতিহাস-সংসদেরও জন্মের আগে, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিক একটা বাংলা নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। নাম দিয়েছিলেন "বয়কট, বোমা ও ভদ্রলোক"। তাতে আমার অনুসন্ধানের পর্যায় ছিল অগ্নিযুগের সামাজিক ও আর্থিক পটভূমি। ঐ লেখার শিরোনামে একটা চমক ছিল, হয়তো সেজন্যই অনেকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। শুনেছি, অন্বিষ্ট বিষয়ের নতুনত্বও অনেকের কৌতূহল জাগিয়েছিল ঃ ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের দুর্গতি যে কীভাবে চরমপন্থী রাজনীতির দিকে তাঁদের ঠেলে দিচ্ছিল তা নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা এর আগে হয়তো হয়নি। কিন্তু অনেকে আবার লজ্জিত, আহত ও বিরক্ত হয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের আর্থিক ব্যাখ্যায়। "অগ্নিযুগ" নিয়ে বাঙালির ভাবালু উচ্ছ্বাস হয়তো ধাক্কা খেয়েছিল আমার কথায়। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে আন্দোলনের মহত্ব আর্থিক বিশ্লেষণে ক্ষুণ্ণ হয় না। বৃহত্তর তাৎপর্যময় ফরাসি বিপ্লবেরও তো আর্থনীতিক ব্যাখ্যা আছে।

তবে আর্থিক ব্যাখ্যাটাই একমাত্র নয়। কে যে কী কারণে একটা আন্দোলনে ভেসে পড়েন পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকের পক্ষে তা সনাক্ত করা শক্ত। এমন কি যাঁরা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন তাঁরাও স্পষ্ট করে সব সময় বলতে পারেন না কীসের ঝোঁকে তাঁরা প্রাণিত হয়েছিলেন। স্মৃতিকথার উপর আদ্যন্ত নির্ভর করা যায় না; তাছাড়া সবাই তো আর স্মৃতিকথা লিখেও যায় না। প্রায় একশ বছর আগে বঙ্গ ভঙ্গ-বিরোধী বয়কট আর বোমার আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে পুলিশী মন্তব্যও নির্বোধ ছেলেমানুষির উদাহরণ ঃ অর্থাৎ এঁরা সব বাপে-তাড়ানো

মায়ে-খেদানো 'Semi-educated' "professional agitators" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর অরবিন্দ ঘোষ (তখনও তিনি 'শ্রী অরবিন্দ' নন), এই দুজন নাকি I.C.S. স্বর্গ হতে বিচ্যুত হওয়ার অভিমানে স্বদেশী নেতা হয়েছিলেন। অন্যদিকে অরবিন্দ কিংবা বিপিনচন্দ্র পাল মানতে নারাজ পুলিশী অপপ্রচার ঃ স্বদেশী আন্দোলন, তাঁদের বিবেচনায়, একেবারেই আদ্যন্ত আধ্যাত্মিক, পশ্চিমি বস্তুবাদের নিরিখে এর বিচার অচল। অর্থাৎ পুলিশ বলছে স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে রয়েছে বাস্তব হিসেব, materialist calculation ; ওদিকে নেতারা বলছেন তাঁদের প্রেরণা একেবারেই spiritual—তাঁদের পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সন্ধানে নেমেছেন পশ্চিমি প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতাত্মার।

কোন দিকে যাই? তার উপর আমাদের বিচারবুদ্ধি আরও গুলিয়ে দিয়েছেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বংশধর কেম্‌ব্রিজের কোনও অতিচতুর ইতিহাসবিদ। তিনি বলছেন ঃ "Extremism was less an ideology than a technique." অর্থাৎ moderate-extremist-এ মতবাদের কোনও ফারাক নেই, প্রভেদ শুধু লড়াইয়ের কৌশলে। যাঁদের আমরা extremist আর moderate হিসেবে জানি তাঁরা নাকি একই সামাজিক শ্রেণীর মানুষ, ফলে একই ধান্ধা তাঁদের ঃ রাজানুগ্রহে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ আর উচ্চতর কর্মসংস্থান; তবে সরকারি চাকরি অভাব বশত তাঁদের কেউ-কেউ রাজ-সহায়ক (collaborator)-এর ভূমিকা ছেড়ে রাজ-সমালোচক ("critics") হয়েছেন। শীলবংশীয় এই ঐতিহাসিক যা বলছেন তা অনেক আগেই বলে গেছেন স্যর লিউইস নেমিয়ের (Sir Lewis Namier) Whig আর Tory দলের প্রভেদ-প্রসঙ্গে। কিন্তু মুশকিল এই যে নেমিয়ের এর কথাটা খাটে ছোটখাট দরবারি রাজনীতির (court politics) প্রসঙ্গে, যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ রাজনীতির বিচারে। সেখানে ছোট-ছোট clique, coterie-র মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভে পারস্পরিক গাঁটছড়া সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু পরাধীন ভারতের বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে, যেখানে অনুগ্রহদাতার সঙ্গে উচ্চাশী ভারতীয়ের কোনও সামাজিক সম্পর্কও নেই, সেখানে Namierite পদ্ধতি আমাদের পথনির্দেশ করতে পারে না।

আর তাছাড়া স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি extremist-moderate-এ বিবাদ একটা বেশ ভাল রকমই ছিল। আমরা দেখতে পাব এই দুই দল দু রকম ভাবে তাকাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজের দিকে, এঁদের বিচারভঙ্গীও দু রকম। ফলে, যা শুরুতে ছিল নেহাৎ কর্মসংস্থানের কিংবা প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা, তাই কালক্রমে হয়ে দাঁড়াল moder-

ate-দের কণ্ঠে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, এবং extremist-দের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের জন্য একটা পৃথক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক স্বরূপ আবিষ্কারের সাধনা। বিদেশী শাসন, কিংবা তার চেয়েও বড় কথা বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে এই সংঘর্ষে ঐহিক হিসেব আর পারত্রিক মতবাদ যেন পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমি যতদূর বুঝেছি তা যদি আমার মতন করে বলতে চাই তাহলে এই রকম দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য আন্দোলনের মতই আমাদের স্বদেশী-বিপ্লবী আন্দোলনে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নানা ঝোঁক কাজ করে থাকতে পারে। তাঁদের কোনও একজনের বেলায় হয়তো বিষয়-বিপন্নতা কাজ করেছে; আর একজন অনুভূতিপ্রবণ বাঙালি কিশোরের ক্ষেত্রে হয়তো প্রবল হয়েছে সহপাঠী-আদর্শবাদী কোনও বন্ধুর প্রভাব। কেউ-কেউ ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা যেমন তাড়িত হয়েছেন, কেউ-বা তেমনই চালিত হয়েছেন বিশিষ্ট কোনও মতবাদের দ্বারা। বাস্তব বিপর্যয় তো ছিলই। আমরা ভুলে গেছি তার কথা। মনে আছে শুধু "বন্দে মাতরম্" slogan আর বোমা-বিস্ফোরণের শব্দ। "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সেই প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল বন্যা, অন্নাভাব, এবং আকস্মিক ও দ্রুত মূল্যবৃদ্ধির। তাতে যেমন একটা এপার-গঙ্গা-ওপার-গঙ্গা মধ্যিখানে চর জাতীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তারই মধ্যে শিব-সদাগরের মতই আসীন ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত অথচ আশাহত বেকার বাঙালি : তাঁর চেতনায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে পশ্চিমি রোম্যান্টিক (romantic) সাহিত্যের হাতছানি; কলেজ-পাড়ায় গোলদীঘিতে সুরেন্দ্রনাথের তপ্ত বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন ফরাসি বিপ্লব আর ইটালীয় অভ্যুত্থানের (risorgimento) মদিরা; তাঁর মর্মে লেগেছে মার্কিন-প্রত্যাগত সদ্য-প্রয়াত বিবেকানন্দের বৈদান্তিক অভয়বাণীর অভিঘাত "ওঠো, জাগো...."। কিন্তু কে জাগবে? রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করে এবং একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি অগ্নিযুগের বাঙালি যুবকের যৌবনস্বপ্নে ছেয়েছিল বিশ্বের আকাশ, কিন্তু অধিকার ছিল না সেই আকাশ-পরিক্রমায়।

এই রকম একটা বৈদ্যুতিক বাতাবরণের মধ্যেই বুঝি বিপ্লব জন্ম নেয়! এই অগ্নিযুগের যাঁরা হোতা কী চাইছিলেন তাঁরা? ঐতিহাসিকেরা তাঁদের গায়ে "Extremist" লেবেল (label) সেঁটে দিয়েছেন, এবং তাঁদের ভাবখানা এই রকম যেন সমস্ত extremist একই শিবিরের অন্তর্গত, যেন উদ্দেশ্য ও প্রকরণে তাঁরা দুর্ভেদ্যভাবে যূথবদ্ধ। অর্থাৎ একদিকে দেখছি moderate নেতারা ব্রিটিশরাজের দৈব উপস্থিতি ("providential nature") মেনে নিয়ে আইন-সঙ্গত উপায়ে, নামান্তরে "con-

stitutional agitation"-এর মাধ্যমে, নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে আগ্রহী; ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছেন "চরমপন্থী" নেতারা, তাঁদের সকলেরই এক হাতে boycott অন্য হাতে বোমা।

আসলে কিন্তু moderate-বিরোধী শিবিরেও অনেক ভাগ, অনেক মতান্তর ছিল। প্রথমেই ধরুন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে স্মরণ করা হয় স্বদেশী আন্দোলনের চারণ-কবি রূপে ; যেন তাঁর কাজ ছিল শুধু দেশাত্মবোধক গান আর কবিতা-রচনা। আমরা ভুলে যাই যে, শ্বেতাঙ্গ শাসকের উপর নির্বোধ নির্ভরের ভঙ্গী ত্যাগ করে তিনিই প্রথম শেখালেন "আত্মশক্তির" সাধনা। ছেলেবেলায় তিনি সঞ্জীবনী সভার সভ্যরূপে বিপ্লব-বিপ্লব খেলা করেছেন; যৌবনে সে খেলায় ভঙ্গ দিলেও আর যাই হোক moderate সাহেব-ভক্ত সাজেন নি। কুড়ি বছর বয়সে কবিতা লিখেছেন তিনি "আবেদন আর নিবেদন"-এর ভিক্ষাপাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে; তারও বারো বছর পরে রচনা করলেন "ইংরাজ ও ভারতবাসী" প্রবন্ধ— "আত্মশক্তি"র সেই প্রথম আবাহন। আমরা যেন শাসকের কাছে সমাদর আর সম্মান ভিক্ষা না করি, বরং সরকারকে সাত হাত দূরে রেখে নিজেদের কর্তব্য পালন করে সম্মান ও সমাদরের যোগ্য হতে পারি এই ছিল তাঁর স্পর্ধিত বক্তব্য। সরকারকে দূরে রাখার এই নীতি রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেন ১৯০৪ সালে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে। ইংরেজের কাছে নিজেদের নাবালকত্ব বিসর্জন দিয়ে সনাতন গ্রামীণ সমাজের চর্চা করতে পরামর্শ দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে।

কবির এই পরামর্শে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ স্বাগত জানালেও "আত্মশক্তি"কে তাঁরা যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে শাণিত করতে চাইলেন ঃ সরকারকে শুধু দূরে রাখাই নয়, সরকারকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হোক। বিপিন পাল তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে এবং অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত The Doctrine of Passive Resistance (১৯০৭) নিবন্ধে ব্যাখ্যা করলেন কী কী উপায়ে এই অসহযোগ করা যেতে পারে ঃ অর্থনৈতিক শোষণ রুখতে বিলিতি বর্জন (boycott) করে স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহার, বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সরে এসে স্বদেশী বিদ্যালয় পত্তন, বিদেশী বিচার ব্যবস্থার আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং সরকারি লাল-পাগড়িকে এড়িয়ে স্বদেশী সমিতির সাহায্যগ্রহণ। আইনভঙ্গ না করেই এই কাজগুলি করা যায়, এই ধরণের অসহযোগে সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু আইন অমান্য করে সম্মুখ-সমরে নেমে পড়ার একটা আয়োজনও চলছিল সংগোপনে। তাই ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নাম পাই বিপিনচন্দ্রের। এবং খুব শীঘ্রই তিনি মা কালীর পুজোয় শ্বেত ছাগশিশু বলিদানের বিধান দিলেন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়। অন্যদিকে, কলকাতা অনুশীলন সমিতির সদস্যদের শুধুই ডন-বৈঠক করে যে সব যুবক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের "ছোট কর্তা" হয়ে দাঁড়ালেন বারীন ঘোষ, অগ্রজ অরবিন্দ "বড় কর্তা" (এই সাঙ্কেতিক পরিচয় রয়ে গেছে পুলিশ-ফাইলে)। তাঁদের প্রচারপত্র "যুগান্তর", যে-কারণে "যুগান্তর"-দল হিসেবে তাঁদের খ্যাতি।

"যুগান্তর" নামের মধ্যেই ছিল আসন্ন পরিবর্তনের অশনি-সংকেত। কিন্তু পরিবর্তন যে এত ও আকস্মিক হবে সেটা বারীন্দ্র কিংবা অরবিন্দ কারও জানা ছিল না। বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তি যদি অসত্য না হয় তাহলে বলতে হবে তাঁর দলবলের পরিকল্পনায় রক্তাক্ত বিপ্লব ছিল তখনও সুদূর পরাহত ("always thinking of a far off revolution") এখন চলছিল শুধুই তার প্রস্তুতি, অর্থ আর অস্ত্র সংগ্রহ, "মুক্তি কোন পথে" কিংবা "বর্তমান রণনীতি" জাতীয় পুস্তিকা আর "যুগান্তর" পত্রিকার গরম-গরম লেখার সাহায্যে, কিংবা যাত্রা-কথকতার প্রচারমাধ্যমে বিপ্লবের অনুকূলে জনমত তৈরি করা, সারা দেশ ঘুরে নিঃস্বার্থ দেশসেবক সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠী ধরণে "সন্তান" দল গড়ে তোলা, যে দল স্বাধীনতার জন্য অকাতরে ও নিঃশেষে প্রাণদান করবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল জনগণ তখনও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত নয়। অথচ যাঁরা অর্থসাহায্য করছেন সেই সব ধনী জমিদার ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকেরা সমিতির যুবকদের কাছ থেকে কাজের প্রমাণ চান। যুবকেরাও অস্থির বাঙালির ভীরু কাপুরুষ পরিচয়ের কালিমা ঘোচাতে। সেই অস্থিরতার যাঁরা বলি হলেন, পুলিশের হাত থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে আনতে গেলেও টাকার দরকার। অতএব টাকার জন্য ডাকাতি। সেই ডাকাতির মামলা ঠেকাতে ফের ডাকাতি। কোথায় গেল খোলাখুলি আমূল বিপ্লবের পরিকল্পনা? তার জায়গা নিল সন্ত্রাস-ডাকাতি-সন্ত্রাসের গোপন বিষচক্র।

পথভ্রষ্ট সেই সব আদর্শবাদী যুবকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পথের মিল ছিল না ঠিকই, কিন্তু এঁদের তিনি ত্যাগ করেন নি, এঁদের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা ছিল ষোল-আনা এবং এঁদের কথাই তিনি স্মরণ করেছেন "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) কাহিনীতে এলার

স্নেহাসক্ত কণ্ঠেঃ "যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড় করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই... এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার।"

দেখলাম অগ্নিযুগের নেতারা কেউই রাজভক্ত moderate নন, কিন্তু তা বলে তাঁদের সবাইকে একাকার করে মার্কা মেরে দেওয়াটা ঠিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ এঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (কে না জানে "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতা?) কিন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধাসত্ত্বেও এঁরা পৃথক। যাঁরা তাঁর "ঘরে বাইরে" (১৯১৫-১৬) পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন একদা moderate নেতাদের ভিক্ষাবৃত্তি যেমন রবীন্দ্রনাথের চোখে অশুচি লেগেছিল, তেমনি বিলিতি-বর্জন নিয়ে গরিব মানুষের উপর extremist জবরদস্তিও তাঁর কাছে রুচিকর হয়নি। দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে যুক্তিহীন উন্মাদনা তাঁর কাছে মাতলামির নামান্তর। তাঁর "ব্যাধি ও প্রতিকার" কিংবা "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারি তিনি আত্মশক্তির স্থির সাধক। বিদেশী শাসনের ফলেই ভারত দুর্বল একথা তিনি পুরো মানতে রাজি নন, তাঁর বিবেচনায় ভারতবর্ষের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সামাজিক দুর্বলতাই বিদেশী শাসনকে কায়েম করেছে। এবং যত বিলম্বই হোক, ধৈর্য ধরে স্বদেশী সমাজের চাষ করলে রাষ্ট্রনৈতিক লড়াই সেখানে সুফলা হতে পারে। পথিকের তাড়া থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য পথ তো ছোট হতে পারে না এটাই রবীন্দ্রনাথের সাফ কথা। কিন্তু, অন্যদিকে, বিপিনচন্দ্র কিংবা অরবিন্দ এবং "যুগান্তর"-দলের ভয়ঙ্কর দামাল শিশুরা (les enfants terribles) একটু অধীর, কেননা তাঁদের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের মতন সুস্থ সমাজগঠন নয়, তাঁদের লক্ষ্য অবিলম্বে বিদেশী-বিতাড়ন। রবীন্দ্রনাথ চাপ দিচ্ছেন সামাজিক প্রশ্নের উপর। অন্যেরা জোর দিচ্ছেন রাজনৈতিক দক্ষা দখলের, সমস্যা-সমাধানের দিকে একজনের গতি গঠনমূলক, অন্যদের ধ্বংসাত্মক।

পথ ও প্রকরণ নিয়ে যেমন বিতর্ক ছিল, মতভেদ ছিল তেমনই পথের শেষে গন্তব্যের ঠিকানা নিয়ে। ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে সভাপতি দাদাভাই নওরোজি গন্তব্য হিসেবে ঘোষণা করলেন "স্বরাজ" শব্দটি। Moderate কংগ্রেসিরা এই শব্দের অর্থ করলেন "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন," ইংরেজিতে "colonial self-government"। সে যুগে তার মানে ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রচ্ছায়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা—যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ছিল আর কি। প্রসঙ্গত

বলি, আজকাল ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্য আর উপনিবেশের তফাৎটা গুলিয়ে ফেলেছেন ঃ তাঁদের মুখে empire ও colony এবং imperial আর colonial একই অর্থে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। কিন্তু সে-আমলের নেতারা এখনকার নেতাদের চেয়ে তো বটেই, এমনকি আধুনিক ঐতিহাসিকদের চেয়ে শিক্ষিত ছিলেন। রামমোহনের আমল থেকেই তাঁরা জানতেন ভারত, আর যাই হোক, British colony বা উপনিবেশ নয় বরং ভারত একেবারেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি। ভারতে যা চালু ছিল তা British imperialism ; colonialism নয়। তাঁরা আরও জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদী (imperialist) শাসনের চেয়ে ঔপনিবেশিক (colonialist) শাসন ভাল (রামমোহন তাই British colony চেয়েছিলেন ভারতে) এবং সবচেয়ে কাম্য অবশ্যই স্বাধীনতা।

বিপিন পাল তাই স্পষ্ট জানালেন ভারতবাসী যা চায় তা সত্যকার স্বরাজ, 'absolutely free of the British control"; ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব আর স্বায়ত্তশাসন পরস্পরবিরোধী অভিধা। "হ্যাঁ, স্বরাজ"—বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গলা মেলালেন অরবিন্দ, এবং তর্ক জুড়লেন যে, ব্রিটিশ শাসনের যা কিছু ত্রুটি moderate-রা তাকে "Un-British" বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, ভারতবাসীর দারিদ্র্য নাকি "Un-British rule" এর ফল। অন্ধ রাজভক্ত নেতারা বুঝতে চাইছেন না যে, ব্রিটিশ বাণিজ্যিক শোষণের ফলেই ভারতবাসীর দারিদ্র্য; pax Britannica বা ব্রিটিশ শান্তি শৃঙ্খলার পরিণাম ভারতীয়ের ক্লীবত্ব; এবং ইংরেজি শিক্ষা কিংবা বিলিতি বুলির মোহে তাদের বিজাতীয়করণ (denationalisa-tion)। সমস্ত নষ্টের গোড়া এই বিদেশী শাসন, আমলা আর বানিয়ার সংমিশ্রনে যা হয় তাই। সুতরাং—অরবিন্দ জানালেন—বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অর্থহীন, ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগুক—এ তো খুব সামান্য ভিক্ষা, দূর হোক ব্রিটিশ, চাই স্বরাজ।

কিন্তু স্বরাজ-স্বরাজ করলেই তো হবে না, ঐ স্বরাজের রাষ্ট্রনৈতিক চেহারাটা কেমন হবে? দেখা গেল অগ্নিযুগের নেতারা তার উত্তর জানেন না। স্বপ্নদ্রষ্টা অরবিন্দ বললেন, কী হবে ভবিষ্যতের নক্‌শা এঁকে, "Revolutions are full of surprises"। বিপিন পাল বললেন, মার্কিন কায়দায় একটা প্রজাতন্ত্রী United States of India তৈরি করতে হবে, তার নির্মাতা হবেন আফগানিস্থানের আমির তাঁকে এনে সাময়িক dictator করে ভারতের সিংহাসনে বসাতে হবে, তাহলে নাকি দেশীয় রাজাদের আপত্তি থাকবে না, মুসলমান প্রজারাও খুশি হবেন। এই ব্যবস্থায়

হিন্দুপদ পাদশাহীতে বিশ্বাসী মারাঠা নেতারা কতটা খুশি হবেন তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ ছিল। অন্যদিকে, "যুগান্তর" দলের হেমচন্দ্র কানুনগোর স্মৃতিকথায় দেখছি, বিপ্লবী যুবকদের একটা আবছা-বালসরল-অবাস্তব রকমের বিশ্বাস ছিল যে একবার বিদেশী দৈত্যেরা নিধন হলেই সারা দেশে রামরাজ্য নেমে আসবে, সবাই সুখে নিদ্রা যাবে,—রূপকথায় যেমন হয় আর কি!

স্বাধীনতার পর ভারত-রাষ্ট্রের রূপরেখা নিয়ে extremist ধারণা যে স্পষ্ট ছিল না, তার কারণ আর কিছুই নয় ঃ extremist ছিল একটা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, moderate-দের মতন একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। প্রশাসনিক স্বাধীনতা নিয়ে moderate দল ব্যস্ত, extremist চিন্তা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিয়ে। Union Jack নিয়ে চরমপন্থীদের আপত্তি মূলত এই যে, ওটা বিদেশী সংস্কৃতির জয়পতাকা, যার কাছে নির্লজ্জ নরমপন্থীরা স্বেচ্ছায় মাথা মুড়িয়েছেন। চরমপন্থীদের ইংরেজ-বিদ্বেষ যেন নরমপন্থীদের বিলিতিয়ানার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। Moderate রা তাকিয়ে আছেন পশ্চিমের ইতিহাস-অনুসারী ভবিষ্যৎ ভারতের দিকে, Extremist রা আবিষ্কার করতে চলেছেন সনাতন-শাশ্বত ভারতবর্ষ।

স্বভাবতই চরমপন্থী চোখে সনাতন দেখা দিল মোহময় রূপে। আর এই romanticism-এর পালে চলতি বাংলা বুলির হাওয়া লাগিয়ে দিলেন "সন্ধ্যা" পত্রিকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ফলে, বেশ একটু আঁতে ঘা লাগলো সভ্যতা অভিমানী শ্বেতাঙ্গ প্রভুর। যিনি কিপলিং-ঘোষিত White Man's burden বহন করার অজুহাতে কৃষ্ণাঙ্গ native-দের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পাকা করে তুলছিলেন। হাতজোড়-করা নরমপন্থীদের শুনিয়ে ব্রহ্মবান্ধব বললেন, আমরা আর্যদের বংশধর, ওরা আমাদের native বলে তো আমরাও ওদের 'ফিরিঙ্গী' নামে ডাকব, এবং মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিতের বদলে যদি জনসাধারণকে দলে পেতে হয় তাহলে কংগ্রেসি মঞ্চে এখন থেকে আর ফিরিঙ্গী ভাষায় বক্তৃতা নয়। আবাল্য ইংরেজি-শিক্ষিত অরবিন্দ লিখলেন ঃ আর নয় ইওরোপের অনুকরণ, ভারতকে ভারত হতে হবে, "The return to ourselves is the cardinal feature of the natioinal movement" এখন থেকে "extremist" আখ্যায় তাঁদের মন ভরলো না, তাঁরা জানালেন তাঁরাই সত্যকার nationalist party অন্যেরা জাতিভ্রষ্ট (denationalised, déraciné)।

এই যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, বাংলায় অগ্নিযুগের মতোই এটা দেখা গেছে পৃথিবীর নানা জায়গায়, যখনই শক্তিশালী আক্রমণকারীর কাছে একটা উৎকৃষ্ট অথচ

সামরিক দিক থেকে দুর্বল সংস্কৃতি মার খেয়েছে এবং এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অভিমানে প্রায় সর্বত্রই রসদ জুগিয়েছে প্রধানত ধর্ম। ভারতের ক্ষেত্রে এই রসদ পাওয়া গেল হিন্দুত্বে; Hindu revivalism-এ বিশেষত বাঙালি হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানে। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের কথা বলছি। কেননা তাঁরাই প্রধানত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকেছিলেন সেই Young Bengal এর আমল থেকে। পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেজন্য তাঁদের অন্তরেই স্বাভাবিক। মুসলমানেরা তো পশ্চিমের মদিরায় মত্ত হন নি।

সুতরাং পরাধীন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদে মুসলমানেরা যে শরিক হতে নারাজ হলেন তার জন্য অগ্নিযুগের হিন্দু বিপ্লবীকে দোষী করাটা ফ্যাশন হলেও অনুচিত হবে। বস্তুত, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের পূর্ব থেকেই, বা ১৮৫৭-র ব্যর্থতার পর থেকেই, মুসলমান নেতারা ব্রিটিশ-বিরোধিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিলেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পাছে যোগ দিয়ে নিজেদের আখের গোছানো কাজ নষ্ট করেন, সেই কথা ভেবে বছর কুড়ি আগেই, ১৮৮০-র দশকে, আলিগড়ের স্যর সৈয়দ আহমদ তাঁর সম-সাম্প্রদায়িক প্রজাবৃন্দকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে অগ্নিযুগের জাতীয়তাবাদ হয়ে দাঁড়াল প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তার ধাক্কায় স্বাধীনতা আন্দোলনে কতগুলি নতুন ও দেশী প্রকরণ দেখা দিল। যেমন বঙ্গভঙ্গ ঠেকাতে কালীপুজো, অনশন, গঙ্গাস্নান, রাখিবন্ধন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দুটি নাটকে হিন্দু রাজা প্রতাপাদিত্য আর মুসলমান নবাব সিরাজ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদীর মনোহরণ করলেন, তাতে ইতিহাসের সত্য কতটা রক্ষা হলো সন্দেহ আছে, কিন্তু দেশপ্রেমের আগুনে তো বাতাস লাগলো।

স্বাধীনতার যুদ্ধ দেখা দিল ধর্মযুদ্ধের সাজে। অরবিন্দ লিখলেন ঃ "Nationalism is not a mere political programme ; Nationalism is a religion" "স্বাধীনতা" কিংবা "জাতীয়তাবাদ" ইত্যাদি শব্দ সাধারণ ভারতীয়ের কাছে তখনও প্রায় অচেনা। তাদের ভুলোতে তাই কাজে লাগানো হলো তাদের চিরচেনা ধর্মশাস্ত্রের প্রতীকী শব্দ। দেশপ্রেমিকেরা হঠাৎ "যোগী" হয়ে দেখা দিলেন, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মতো তাদের অভিষ্ট হলো 'মোক্ষ' অর্থাৎ স্বাধীনতা। মানিকতলায় বাগনবাড়ি যেন একটা 'আশ্রম', নতুন আনন্দমঠ। শাক্ত কালীসাধকের মতো তাঁরা ধরে নিলেন স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি কিংবা নরহত্যা কিছু নয়, সবই "মায়ের লীলা", বিপ্লবীরা "কর্মযোগী", তাঁদের উপর ভর করেছেন স্বয়ং কালী। অরবিন্দর ভাষায় "Kali

has entered into them"। এ সত্ত্বেও যুদ্ধে নামতে ইতস্তত করছিলেন যেসব বোতাম-আঁটা নিরীহ ভদ্রলোক, তাঁদের বলা হলো কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মতোই তাঁরা "মায়া"-গ্রস্ত, যাদের বধ করতে হবে তারা যে আগে থাকতেই শারীরিক অর্থে মৃত সেকথা তাঁদের অজ্ঞাত। তাঁরা সান্ত্বনা পেলেন গীতায় বিধৃত শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে যে, আত্মা অবিনশ্বর, ফলত কেউই মৃত নয়, কেউই নয় পাপস্পৃষ্ট ঘাতক। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা বাংলার নতুন কুরুক্ষেত্রে নব্য ক্ষত্রিয়, অরবিন্দর কাছে তাঁরা আশ্বাস পেয়েছেন জাতীয়তাবাদের হতাশার কারণ নেই ঃ "Nationalism is an *avatar* and cannot be slain." মাত্র কয়েক বছর আগেই, উনিশ শতকের শেষ দিকে, তাঁরা শুনেছেন বিবেকানন্দের রোমাঞ্চকর বাণী অভী, ভয় নেই। এখন পেলেন তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার ভরসা। নিবেদিতা, যিনি তাৎপর্যময়ী ব্রিটিশ-বিরোধী আইরিশ নারী এবং কলকাতা অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেত্রী, তিনি ডাক দিয়েছেন বিশ্ববিজয়ের ঃ "On, on, in the name of a new spirituality, to command the treasures of the modern world ! On, on, soldiers of the Indian Motherland" "Hinduism is become aggressive."

আর রবীন্দ্রনাথ? বিংশ শতাব্দীর সেই নব্য কুরুক্ষেত্রে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা, যেন সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির। তিনিও একদা মোহান্ধ হয়েছিলেন প্রথম পান্ডবের মতোই, হিন্দু revivalism-এর প্রভাব পড়েছিল তাঁর উপরেও। ১৮৯৩ তেকে এক দশক ধরে তিনিও শিখ-রাজপুত-মারাঠা বীরত্বের কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের, কন্তু এখন তিনি মোহমুক্ত। হিন্দু ঐতিহ্যের রোমাঞ্চ খসে পড়েছে যেন তাঁর চোখের সামনে। ভারত-সমাজ তার সত্য তার মিথ্যা নিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই কবির সামনে, যাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা নেব শুধু দেশপ্রেমের নয়, বিশ্বপ্রেমের। শুধু দেশ স্বাধীন করার প্রেরণা নয়, তিনি দেবেন এমন দেশ গড়ার ব্রত "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য," যেখানে পূর্ব আর পশ্চিম এসে মিলবে সেই ভারতের "মহামানবের সাগরতীরে"। তিনি লিখছেন "গোরা" (১৯০৭-১০), যেন নতুন ভারতের মহাভারত।

ঔপনিবেশিকতা, সংস্কৃতি এবং পুনরুত্থানবাদ

কে এন পানিক্কর

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের এই বছর বার্ষিক অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ পেশ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সংসদের উদ্যোক্তাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। অতীতে এই সংসদ বরাবরই ইতিহাস বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এসেছেন এবং যখনই এই ধরনের ইতিহাসচর্চা হুমকি বা সঙ্কটের সম্মুক্ষীণ হয়েছে, তখনই ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চাকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন। ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ যখন 'টুয়ার্ডস ফ্রিডম' শীর্ষক প্রকল্পের দুটি খণ্ডের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়, তখন আপনারা আমার ও অন্যান্য সমতাবলম্বী ঐতিহাসিকদের প্রতি যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা আমি স্মরণ করি। ইতিহাস গবেষণা ও রচনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সেই থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে; এতটাই যে, ইতিহাস বিষয়টিই তার বিজ্ঞানসম্মত চরিত্র হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শুধু মাত্র লোকপ্রিয় গ্রন্থাদিতে নয়, অ্যাকাডেমিক ইতিহাস গবেষণা-অনুসন্ধানেও। এই হস্তক্ষেপ বর্তমানে সারাদেশে যে সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মকান্ড চলছে তারই অংশ, যে কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির সংজ্ঞা নতুন করে তৈরি করা বা জাতির চরিত্র নতুন করে রূপান্তর ঘটানো যাতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রেক্ষিতের বদলে ধর্মীয় প্রেক্ষিত দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বা দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে ঐ কর্মকান্ডের বৈধতা খোঁজার কাজ চলছে। ধর্মীয় মোড়কে তাই অতীতকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো এবং নতুন ব্যাখ্যায় হাজির করানোর চেষ্টা চলছে। এই কাজে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর বা ঘটনাবলীকে ইচ্ছামতন সাজানো হচ্ছে, এমনকি মিথ্যের আশ্রয়ও নেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ইতিহাসকে অতিকথন বা মিথে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

তথ্যগত সমৃদ্ধি এবং পদ্ধতিগত অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে ইতিহাসের পুনর্লিখন

অষ্টদশ বার্ষিক সম্মেলন, সেন্ট পলস্ কলেজ, ২০০২

এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে ইতিহাস বিষয়টি জ্ঞানের নবতম সীমায় পৌঁছে যায়। এই কথা কিন্তু বর্তমানে যে প্রচেষ্টা চলছে সে সম্পর্কে বলা চলে না, যে প্রচেষ্টার পিছনে আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমর্থন। এই প্রচেষ্টা বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বাইরে থেকে ধার করা, সুতরাং এই কাজকারবার যে তথ্যগতভাবে দুর্বল এবং পদ্ধতিগতভাবে অবৈজ্ঞানিক হবে তা খুব স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুনর্লিখন নিয়ে অধুনা যে বিতর্ক তা কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে সংঘাত নয়। কিংবা এটি কেবলমাত্র কিছু ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর বাদ দেওয়া বা বিকৃতি ঘটানোর ব্যাপার নয়। একথা তো ঠিকই যে ইতিহাস মোটের উপর নির্বাচিত বিষয়। যা বিপন্ন হয়েছে তা হলো বিষয়টির চর্চার বিষয়ে যা আমাদের অবহিত করে সেই পদ্ধতি। যেমন ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকের কৃত্যকে সম্মান জানায় না, এমনকি সাধারণভাবে ইতিহাসের স্বীকৃত রূপকেই অস্বীকার করে। আমি এই সম্মান না জানানো বা অস্বীকৃতিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপায় বলে মেনে নিতে অপারগ। এর ফলে তো ইতিহাসচর্চা বিষয়টিই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। খ্যাতনামা হিন্দি লেখক মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দেই আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা স্বাধীনতা হারিয়েও ফেলি তাহলেও যেন আমাদের ইতিহাস হারিয়ে না যায়। কারণ যদি ইতিহাস ঠিকঠাক থাকে তাহলে হারানো স্বাধীনতা আবার জিতে নেওয়া যায়, কিন্তু যদি ইতিহাস নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যদি আমরা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারও করি, তবে তা করতে হবে দারুণ অসুবিধার মধ্যে দিয়ে।" ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্তমানে এমনই এক সঙ্কটকালের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কারণ আমাদের ইতিহাসের কতিপয় বিষয়েকে একেবারে প্রান্তিক বা অপাংক্তেয় করে দেওয়া হচ্ছে অথবা রাজনৈতিক অসুবিধার দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আবার একই সঙ্গে নতুন তত্ত্বগুলির সহায়ক হিসেবে কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ তথা বিকৃতি এবং পাঠ্যক্রমে পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ইতিহাস বিষয়ের ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তা একটি জাতির চরিত্র, রাষ্ট্রনীতি এবং সংস্কৃতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক ভাবনাই প্রতিফলিত করে, জাতির চরিত্রকে মূলত ধর্মীয় বলে গণ-চেতন্য সৃষ্টি করার ভাবনা। অতীত যা ছিল তার দৃশ্যরূপ সর্বদাই ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্রে এক জোরালো শক্তি হিসেবে কাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষ

অতীতের ভিত্তির উপর একটি ধর্মীয় জাতিসত্তা দাঁড় করানো কঠিন। সুতরাং ইতিহাসচর্চায় সাম্প্রদায়িক হস্তক্ষেপ তাই ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে কোনও অ্যাকাডেমিক প্রচেষ্টা নয়। এটি স্পষ্টতই রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ, যাতে অরুণ শৌরী, এন এস রাজারাম প্রমুখের হাতধরে ইতিহাসের ন্যূনতম প্রকরণের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়েছে। যাইহোক, সরকারি মদতপুষ্ট এই প্রচেষ্ঠা ইতিহাসকে সাধারণের নানা চর্চিত অভিসন্দর্ভ বা বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিতর্কমূলক ইস্যুতে পরিণত করেছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসচেতনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। আর্যদের আগমণের বিষয়েই হোক বা প্রাচীন ভারতের খাদ্যাভ্যাস বিষয়েই হোক, সরস্বতী সভ্যতা বা বৈদিকযুগ বিষয়েই হোক কিংবা জাতীয় আন্দোলনে হেডগেওয়ার-এর ভূমিকাই হোক, তুলে ধরা হচ্ছে এক বিকল্প ইতিহাস—প্রামাণিক তথ্য-ভিত্তিক ইতিহাসের থেকে সেগুলি যতই দূরবর্তী হোক না কেন।

এই বিকল্প ইতিহাসের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে হিন্দু হিসেবে সংজ্ঞায়িত এবং স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করা। এই লক্ষ্যে, প্রথমত, জাতিকে ধর্মীয় ধারণার দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টাকে বৈধতা দান করা হয়। কারণ এর ফলে অতীতে 'স্বর্ণযুগ' ও সমুজ্জ্বল হিন্দুসভ্যতার নিরবিচ্ছিন্ন ধারা দেখানো হয়। কালপরম্পরাকে পিছিয়ে দিয়ে এবং এর কৃতিত্বগুলিকে গৌরবান্বিত করে, ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনতম বলে দাবি করা হয়। যা অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে অগ্রগামী বলে দেখানো হয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে হিন্দুদের 'বহিরাগত'দের থেকে পৃথক করা হয়, যে বহিরাগতদের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সুতরাং বহিরাগতরা জাতির শত্রুস্বরূপ। বস্তুতপক্ষে বিনায়ক দামোদর সাভারকর সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসকেই হিন্দুদের সঙ্গে বহিরাগত আক্রমণকারীদের মধ্যে সংগ্রামের মিলিত বিবরণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয়ত, যা ভারতীয় জীবনচর্চার মৌলিক বা প্রধান বলে ধরা হয়, তা বস্তুতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক বিষয় নয়, তা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা, যা সাম্প্রদায়িকতা তার রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই আত্মপরিচয় থেকেই প্রেরণা গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস যে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে তা হচ্ছে আবশ্যিকভাবে চরিত্র পুনরুত্থানবাদী। জনগণের সাংস্কৃতিক আচরণের মধ্যে নানা পার্থক্যগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করে এবং বৈদিক যুগের অতীতে তার ভিত্তি সন্ধান করে। এইভাবে সাংস্কৃতিক চিরবিচ্ছিন্ন

বহমানতা জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের কালোত্তীর্ণ ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হয়, সাম্প্রদায়িক অভিসন্দর্ভ যে চেতনাকে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ভূত মনে করে। কিন্তু ধর্মীয় কিংবা পুনরুত্থানবাদী থেকে ভিন্ন এক রকমের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ঔপনিবেশিক যুগে উদ্ভব হয়েছিল, যা পুনরুত্থানবাদী না হয়েও জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়েছিল। ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এবং সক্রিয় কর্মিবৃন্দের বহুধা-বিস্তৃত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতেই, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রবণতা পরিস্ফুট।

ঔপনিবেশিক এবং ঐতিহ্যশালী এই দুধরনের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক বিকল্প সংস্কৃতির আদি প্রচেষ্টার উদ্ভব নবজাগরণের মধ্যে বেড়ে উঠলেও, তা আবার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতার দ্বারা কমজোরি হয়েছিল। রেনেশাঁসের অন্তঃস্থল থেকেই তাই বিকল্প হিসেবে পুনরুত্থানবাদ উঠে এসেছে। যেহেতু ঔপনিবেশিকতার ফলে যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান আধুনিকতা করতে সমর্থ হয়নি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই পুনরুত্থানবাদী সংস্কৃতি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এডওয়ার্ড সৈদ মন্তব্য করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ অনেক সময়েই রূপ নেয় এমন জিনিসে, তাকে আমরা বলি দেশীয়বাদে অন্তরঙ্গ প্রবেশ,... নিজেদের আত্মপরিচয়ের উপর যে সব বিকৃতি আরোপিত হয়েছে, তা এইভাবে দূর করে 'খাঁটি' দেশীয় সংস্কৃতির প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী যুগে ফিরে যাওয়া।" অন্যান্য অনেক দেশের মতোই ভারতেও পুনরুত্থানবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ এক ধরনের সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা থেকে জন্ম নিয়েছে। যদি এগুলি কালক্রমে অভ্যন্তরীণে বিরোধ থেকে অধিকতর রসদ লাভ করেছে।

কখন প্রকৃত ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ ঘটেছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মতকে দূরে সরিয়ে রেখে যদি আমরা ভারতে ঔপনিবেশিকতার সূত্রপাত ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের আগমন থেকে ধরে নিই, তাহলে ভারতীয় সমাজের উপর এর প্রভাব চারশো বছরেরও বেশি কাল ধরে ছিল। ঔপনিবেশিকতা বহু দিকেই অনুঘটকের কাজ করেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা কম নয়। রাজনৈতিক আধিপত্য দৃশ্যতই বাস্তব; ভারতীয় অর্থনীতি কিভাবে বিশ্ববাজারের দ্বারা অধীনস্থ তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন যদিও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত তবু তা স্বভাবতই আণবিক এবং তাই কম প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সব পরিবর্তনের বহুবিধ প্রেরণা উৎস—ঔপনিবেশিক

রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যাবলীর কথা বলা যায়। তাদের হস্তক্ষেপের পদ্ধতিও নানা ধরনের, তাদের মধ্যে প্রধান অবশ্যই আত্মসাৎ এবং আধিপত্যবাদ। ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও কার্যকারিতায় ঔপনিবেশিক কৌশলের সঙ্গে তা যুক্ত এবং পরিপূরক। এর ফলে দেশীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রথাগুলিকে সমালোচনা করা হয়েছিল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অননুমোদিত ও বাতিল করা হয়েছিল। ঐগুলির মধ্যে কিছু কিছু ঔপনিবেশিক প্রথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাকিগুলি এতটাই রূপান্তরিত হয়েছিল যে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে গিয়েছিল। এই জটিল টানাপোড়েন জনগণের অন্তত একটি অংশের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করেছিল এবং এর ফলেই পুনরুত্থানবাদী আদর্শ ও আচরণ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন ঘটেছিল।

ভারতের ঔপনিবেশিকতার জয়যাত্রা এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার মতো নয়। এই দীর্ঘসূত্রতা শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষির ফলেই হয়েছিল, এমন নয়; যদিও ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চায় প্রায়শই তেমনভাবে দেখানো হয়। মধ্যযুগের ভারতীয় রাজ্যগুলি সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী সরকারগুলি দ্বারা পরিচালিত হত, যে সরকারগুলির অশ্বারোহী সৈন্যদের দক্ষতা ছিল উচ্চমানের, তাছাড়া গোলোন্দাজ বাহিনীর কিছু পারদর্শিতা ছিল। যদিও ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি উন্নততর সামরিক প্রযুক্তির জ্ঞান নিয়েই এসেছিল, তবু যারা সীমিত লোকশক্তি জড়ো করতে পেরেছিল, তার দ্বারা ভারতীয়দের প্রতিরোধ অতিক্রম করা সবসময় সহজসাধ্য ছিল না। যা পর্তুগিজ, ফরাসি এবং ইংরেজদের নানা সময়ে চুক্তিবদ্ধ হতে প্রণোদিত করেছিল এবং ভারতীয় শক্তিগুলিকে অধীনস্থ সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল, তা হলো ঠিক এই কারণটি। ব্রিটিশরা মহীশূরের এবং মারাঠাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাজিত করতে বেগ পেতে হয়েছিল এবং উভয়ের বিরুদ্ধেই তিনটি করে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। প্রথমোক্ত শক্তির বিরুদ্ধে স্যর আয়ার কূট-এর কঠোর পরিশ্রম এবং শেষোক্ত শক্তির বিরুদ্ধে লর্ড লেক-এর কঠিন লড়াই ব্রিটিশদের সামরিক ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, এই ঔপনিবেশিক বিজয় ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা এবং মধ্যযুগের রাজনৈতিক শক্তির চেয়ে তা গুণগতভাবে ভিন্ন এক রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের সৃষ্টি করেছিল। যদিও আগেকার সাম্রাজ্যগুলি ভারতে যারা বহিরাগত তেমন ব্যক্তি বা তাদের উত্তরসূরিরাই প্রতিষ্ঠা এবং শাসন করেছিলেন তবু তা থেকে

সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র এক যুগ ভারতের ইতিহাসে সূচনা হলো, যে শাসন চরিত্রগতভাবে ঔপনিবেশিক।

ঔপনিবেশিক মানুষজনকে দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে দিয়ে বিশাল এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখা অবশ্য ঔপনিবেশিক বিজয় থেকে অনেক কঠিন কাজ। এই নিমন্ত্রণ আরও কঠিন হয়েছিল এজন্য যে মাতৃভূমি এবং উপনিবেশের মধ্যে ছিল বিশাল দূরত্ব এবং দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থারও অভাব ছিল। এর ফলেই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এনে দিয়েছিল। অবশ্যই ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগের ভূমিকাই ছিল প্রধান, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনের অদি পর্বে, যখন রাষ্ট্রের মতাদর্শগত যন্ত্রের গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু কেবল শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা দীর্ঘকালীন আধিপত্য নিশ্চিত করা যায় না। তা সম্ভবতও নয়। সুতরাং এর বিকল্প হলো অধীনস্ত মানুষদের দিয়েই আধিপত্যকে স্বীকার করিয়ে দিয়ে আধিপত্য চালিয়ে যাওয়া এবং এর পথ হলো আধিপত্যবাদের মধ্যেই 'গুণাবলী'র আন্তর্জাতিকরণ। উপনিবেশিক সংস্পর্শের ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, তারা এই প্রক্রিয়ায় ছিল অনেক সময় সক্রিয় সহযোগী, যদিও উত্তরকালে তাঁরা এটা মেনে নেয় নি। এই প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক নীতি ছিল দু'মুখো ঃ একদিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিন্দাবাদ ও ধ্বংসসাধন এবং অন্যদিকে আধিপত্যবাদ।

আফ্রিকার ঔপন্যাসিক Ngugi Wa Thiongo, ভাষার রাজনীতি বিষয়ে এক প্রণিধানযোগ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং মত প্রকাশ করেছেন যে 'সাংস্কৃতিক বোমা' হলো ঔপনিবেশিকতার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। তাঁর যুক্তি হলো, সাংস্কৃতি বোমার উদ্দেশ্য হলো অধীনস্ত মানুষদের 'তাঁদের নামের প্রতি বিশ্বাস, ভাষার প্রতি মমত্ব, পরিবেশ, লড়াইয়ের ঐতিহ্য, তাদের ঐক্যবোধ, তাদের ক্ষমতা ইত্যাদি ধ্বংস করে জনগণকে হীনবল করে দেওয়া।"

দেশীয় ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উপর যে ওয়া থিয়োনগো জোর দিয়েছেন, কারণ সারা পৃথিবীতেই এটাই ঔপনিবেশিকতার অন্তরঙ্গ অংশ এবং এর দ্বারা উপনিবেশে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র ধ্বংস এবং লুণ্ঠন নয়, যদিও তা ভালো মাত্রায় ঘটেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতার আমলের পিরামিডগুলির উপরিভাগ ধ্বংস করা হয়েছিল; ভারতের সৌধগুলির মণিমাণিক্য খুলে নেওয়া হয়েছিল—এগুলি থেকেই ঔপনিবেশিক আগ্রাসন

ও সম্প্রসারণবাদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয়দের মতন, গোয়াতে পর্তুগিজরাও উপাসনাস্থল বিনষ্ট করেছিল। এগুলি নিছক ধর্মীয় ব্যাপার নয়, মধ্যযুগে এমন ব্যাপার ছিল রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনেরও অঙ্গ।

বলা হয়ে থাকে যে ঔপনিবেশিকতা অধীনস্থ মানুষজনকে ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করে—কথাটির অর্থ এই যে ঔপনিবেশিকতা অধীনস্থ জনগণকে তাদের সাংস্কৃতিক অধিকার, আত্মা-পরিচয় এবং বিকাশের গতি থেকে বঞ্চিত করে। উপনিবেশভুক্ত দেশগুলি তাদের সাংস্কৃতিক হস্তশিল্পকর্ম প্রচুর হারিয়েছে। ইয়োরোপের অনেক যাদুঘরেই তার চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। এইসব সাংস্কৃতিক হস্তশিল্পকর্মের হস্তান্তর যা ঔপনিবেশিকতার ফলে ঘটেছিল তা শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের নমুনা নয়, তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও নতুন সাংস্কৃতিক সৃজন থেকে এর দ্বারা তারা বঞ্চিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে স্থান নামের পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। এর দ্বারা পুরাতন চিহ্ন লুপ্ত করে বলপূর্বক নতুন চিহ্ন আরোপ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে দেশীয় বিদ্যাকে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়, কখনও কখনও তা অপূরণীয় ক্ষতির পর্যায়ে চলে যায়।

তাদের সাংস্কৃতিক বিজয় অভিযানে ঔপনিবেশিকতা শুধুমাত্র দেশীয় সংস্কৃতিকে বাতিল বা ধ্বংস করার পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে এমন নয়। ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্যে ছিল উপনিবেশের অধীনস্থ জনগণের সাংস্কৃতিক আচরণকে গ্রাস করে তাতে নতুন অর্থ আরোপ করে দিয়ে ঔপনিবেশিক জনগণের নতুন এক পরিচয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপারটির এক ভালো উদাহরণ ব্রিটিশরা যেভাবে শাসকদের দরবারে, অথবা গৃহের অভ্যন্তরে অথবা উপাসনাস্থলে প্রবেশ করতে হলে ভারতীয়দের জুতো খুলে রেখে ঢোকার যে ঐতিহ্যগত অভ্যাস ছিল। তা গ্রহণ করার মধ্যে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারী ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে কর্মরত ছিলেন তাদেরও এই আচরণ পালন করতে হত সম্মান জানানোর অঙ্গ হিসেবে, অনেকটা ইয়োরোপীয়গণ যেমন টুপি খুলে সম্মান জানায়। ব্রিটিশ কর্মচারীবৃন্দ এই বিদেশী প্রথা ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সম্মানের পক্ষে হানিকর মনে করে বাতিল করেছিলেন। যাইহোক, কিন্তু সেই ব্রিটিশরাই যখন সার্বভৌম ক্ষমতায় শক্তিধর হয়ে উঠলো। তারা এই প্রথাটিই তাদের উচ্চক্ষমতা দেখাতে গ্রহণ করেছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এক ঘোষণায় বলা হলো যে, "যে কোনও দেশীয় ভদ্রলোক যদি সরকারি

ভবনে কিংবা বিচারালয়ে দরবারে যায়, তাহলে তাদের দেশীয় প্রথা বলে মেনে চলতে হবে এবং দরোজার সামনে জুতো খুলে ঢুকতে হবে।" আমোদ-প্রমোদের পার্টিতে ব্যতিক্রম হতে পারে বটে, তবে যদি ভারতীয়রা ইয়োরোপীয় জুতো-মোজা পরে যায়। ভারতীয়রা এটিকে ব্রিটিশ কর্তৃক সাংস্কৃতিক প্রথা চাপিয়ে দেওয়া বলে ব্যাখ্যা করেছিল। যদিও গোড়াতে এই আইন শুধু গভর্নর জেনারেলের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে আমলাতন্ত্র এটি সাধারণ প্রথা বানিয়ে ফেলে, কারণ ততদিনে ব্রিটিশ রাজ্যের সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'জুতো খুলে সম্মান জানানো', হিসেবে পরিচিত হয়। যেহেতু এই প্রথার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সমস্ত সরকারি অফিসে এবং বিচারালয়ে প্রয়োগের আইনকে ভারতীয়রা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। সেজন্য আইনটি শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীর কাছে সরকারি ও আধাসরকারি অনুষ্ঠানে যে সমস্ত ভারতীয় যাবেন, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল।[২]

'জুতো খুলে সম্মান জানানো'র প্রথা গ্রহণ করার পিছনে যৌক্তিকতা ছিল এটি নতুন কোনও উদ্ভাবন নয়, বরং দেশীয় অভ্যাস। ব্রিটিশরা দাবি করেছিল যে অতীতে শাসকশ্রেণীর লোকজন ও প্রজারা যে প্রথা ব্যাপকভাবে মেনে চলতেন, তারা সেই প্রথাই গ্রহণ করেছে মাত্র। কিন্তু এই ধরনের আত্মসাৎ করার কোনও প্রকৃত ভিত্তি নেই। কারণ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল ছিল না। উপনিবেশের অধীনস্থ মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কারণ ভিন্ন, দেশীয় মানুষদের সংস্কৃতির, অন্তত আংশিকভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে শাসনের বৈধতা লাভ। অদৃষ্টের পরিহাসে, এর দ্বারা ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে শাসিতদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য কমে না এসে বরং বেড়ে গিয়েছিল।

ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক প্রকল্পের প্রধানতম প্রণোদনা অবশ্যই সংস্কৃতি মেনে নেওয়া নয়, পরিবর্তন করা, এজন্য সাংস্কৃতিক বোধবুদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত মানসিকতা জড়িয়ে নেওয়ার দরকার ছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার মতাদর্শগত পরিকাঠামোর মধ্যে কাজ করতে করতে এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন করেছিল অন্যান্য এজেন্সিগুলি এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাতে ভারতীয়রাও অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয়দের সহযোগিতা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে তত্ত্ব এবং আচরণ আঙ্গীকরণ সহজতর হয়েছিল। এই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে এক ঔপনিবেশিক মন্ময়তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যার মাধ্যমে এক আত্মদর্শন বেরিয়ে আসে যা উপনিবেশিকতা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এ প্রক্রিয়ার

এক চিত্তাকর্ষক আলোচনা পাওয়া যায় মালয়েশিয়ার শ্রমজীবীদের মানসিক জগৎ নিয়ে লেখা এক উপন্যাসে। যার নাম 'দ্য মিথ অফ্ দ্য লেজি নেটিভ', লেখকের নাম সৈয়দ হুসেন আলাতাস। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন কী করে ঔপনিবেশিক প্রভাবে রবার চাষে নিযুক্ত শ্রমিকগণ তাদের নিজেদের আলস্যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল।[৫] ঔপনিবেশিক প্রভাবে জাতীয় চরিত্রের গঠন কিংবা পুনর্গঠন বিচার-বিশ্লেষণের এক চিত্তাকর্ষক ক্ষেত্র। যেমন ছিল তাঁর ঔপনিবেশিক অভিসন্দর্ভে যেমন চিরায়ত চরিত্রায়ন করেছিলেন, বিশ্বের সর্বত্র ভারতীয়রা এখন যা বিশ্বাস করে সেই ছলনাময় এবং প্রতারক চরিত্র ঔপনিবেশিকতারই সৃষ্টি কিনা, তা বিচার করে, দেখার মতো।[৪] অন্তত সাধারণভাবে যাকে 'আধুনিক ভারতের জনক' বলে স্বীকার করা হয়, সেই রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় চরিত্রে অনেক বৈশিষ্ট্যই ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপ থেকে জন্ম নিয়েছে।[৪] উপনিবেশের প্রজারা যে এক ধরনের হীনমন্যতা এবং পরনির্ভরশীলতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা সাধারণভাবে স্বীকৃত। কী করে ভারতীয়রা এগুলি আয়ত্ব করল, তা যতখানি মনস্তত্ত্বের বিষয় ততখানিই সংস্কৃতির। এই বিষয়েও ম্যানোনি এবং ফ্রান্‌জ ফ্যানন-এর মধ্যে আদানপ্রদান যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে। ম্যানোনি যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থা বলে পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। যদিও অবশ্যই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক। কিন্তু কিভাবে সেই অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট তার খুঁটিনাটিও ভালো করে বিচার করা দরকার। যেমন বলা যেতে পারে এটি সম্মানের জন্য লড়াই, বিচ্ছিন্নতাবোধ, পদ নিয়ে দরকষাকষি, কৃতজ্ঞতার ঋণ। নতুন অতিকথন আবিষ্কার এবং নতুন ধরনের ব্যক্তিত্বের সৃজনের মধ্যে লক্ষণীয়।"[৬]

যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঔপনিবেশিকতা ঘটাতে চেয়েছিল তার ভিত্তিভূমি ছিল দেশীয় সংস্কৃতির হীনমন্যতা, যে সংস্কৃতি আধিপত্যবাদের প্রক্রিয়ার দাপটে হয় প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল অথবা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি উপনিবেশিক সংস্কৃতিকে সুবিধে পাইয়ে দেবার ব্যাপারে কোনও পদ্ধতিই বাদ দেওয়া হয়নি। শিক্ষা, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, বস্তুত জ্ঞানের প্রতি শাখাতেই এই স্থানচ্যুতি ঘটেছিল। ভারতীয় সাংস্কৃতিক কৃতিত্বকে মেকলে যে বাতিল করে দিয়েছিল, তা কোনও বিকৃত বা অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না, এটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকে মদত দেওয়ার প্রতিফলন মাত্র। নতুন সাংস্কৃতিক নীতির ফলে যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী

শ্রেণীর উদ্ভব হলো, তারা মেকলে যেমন চেয়েছিলেন, তেমন 'তাদের এবং আমাদের মধ্যে দোভাষী' তো হলোই, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বাহক এবং ধারক হলো। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে বৈধতা দেওয়ার ব্যাপারে এবং এই ভাবে তাকে অধীনস্থ মানুষদের কাঙ্খিত লক্ষ্য করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

যাঁরা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মহিমায় বিভোর ছিলেন তাদের মানসিকতায় ঔপনিবেশিক বৃহৎ নগরী সংস্কৃতির পীঠভূমি হিসেবে প্রতিভাত হলো। এডওয়ার্ড শীলস্‌ যেমন দেখিয়েছেন, তারা এক সাংস্কৃতিক প্রাদেশিকরণ করে তুললো এবং নিজেদের জীবনে ধার করা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আচার-আচরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে নিতে চাইলো।[৭] অনেকে এই দূরবর্তী ও অনেক সময় বাস্তবে অগম্য আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলেন। যদিও এই প্রক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়ালো। এটিই ছিল সম্ভবত ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সবচেয়ে করুণ পরিণতি, যার ফলে অধীনস্থ তাদের নিজেদের সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ থাকার অধিকারও হারালো, আবার অপরেরটিও পূর্ণভাবে লাভ করতে পারলো না। এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক ট্রাজেডি এবং এর থেকে পরাধীন প্রজারা মুক্তি পেতে পারত কেবলমাত্র স্বাধীনতার দ্বারা। কিন্তু তখন ঔপনিবেশিক মতাদর্শের এতই প্রবল যে, তাদের এক বড়ো সংখ্যার মানুষই শেষ পর্যন্ত চরম হতাশায় ভুগলো, যেমন আমরা দেখি এম. মুকুন্দন এর লেখা মালায়ালাম উপন্যাস 'মায়ালি নদীর তীরে' (Mayyazhi Puzhayude Thirangali) বইতে।[৮]

ঔপনিবেশিক ভারতে যে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বিকাশ লাভ করেছিল, তা অবশ্য এক উৎসজাত নয়। এটির উৎপত্তি দেশীয় এবং ঔপনিবেশিক উভয়বিধ উর্মিমালা থেকে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এক নতুন আধুনিক সাংস্কৃতিক চেতনা মূল্যবোধ ও সংবেদনশীলতা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, যে মূল্যবোধ ঔপনিবেশিকতার মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে আসা পাশ্চাত্যের আদর্শ ও মূল্যবোধ সঞ্জাত, যদিও তা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। এটি এক জটিল আদন প্রদান, যা ১৮৯২-তে প্রকাশিত 'ইন্দুলেখা' উপন্যাসে অত্যন্ত সৃজনশীলভাবে আত্মস্থ করেছিলেন ও চান্দু মেনন। এটি এক আশ্চর্য দলিল। উনিশ শতকের মালাবার অঞ্চলে সামাজিক ও মতাদর্শগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার পরিচয় এতে বিধৃত। উপন্যাসটির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় কী ভাবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ঔপনিবেশিক

অধীনতার থেকে আধুনিকতার সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল অথচ ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেনি। উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র মাধবন এবং ইন্দুলেখা এই নবোত্থিত সংস্কৃতির ধারণার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইন্দুলেখার সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিগত গুণাবলী এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

> ইন্দুলেখা ছিল ইংরেজিতে খুবই পারঙ্গম, তার সংস্কৃত পড়াশুনোর মধ্যে ছিল নাট্যধর্মী লেখকদের রচনা, গানবাজনার ক্ষেত্রে সে শুধুমাত্র ঐকতানের তত্ত্ব শিখেছিল এমন নয়। নিজেও ভালো পিয়ানো, বেহালা এবং ভারতীয় বাঁশি বাজাতে পারত। একই সঙ্গে তাঁর কাকা সুন্দরী ভাইঝিকে সূচীকর্ম শিক্ষাদিতেও ভোলেন নি, যেমন অঙ্কনবিদ্যা ও অন্যান্য শিল্পকর্মে, যাতে ইয়োরোপীয় মহিলারা প্রশিক্ষিত। বস্তুত, তাঁর প্রাণের সাধ ছিল যে ইন্দুলেখা ইংরেজ মহিলাদের মতন গুণাবলী ও সুরুচি লাভ করুন। তাঁর এই অভীষ্ঠ সিদ্ধ হয়েছিল তাঁর মতন উদার ও সঠিক বিবেচনার মানুষের জন্যই ষোল বছর বয়সের মধ্যেই ইন্দুলেখা সব আয়ত্ত করেছিল।*

চান্দু মেনন যে এই সাংস্কৃতিক আদর্শ আনলেন, তা অনেকটাই নির্মাণ করা কেন তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে উনিশ শতকের মালাবারে ঐ ধরনের গুণাবলী সঙ্কলিত মহিলা আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ। তবু, এটা ছিল তারই নিদর্শন যা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আকাঙ্ক্ষা করত এবং ঔপনিবেশিক উপস্থিতি থেকে তারা এটি প্রত্যাশাও করত। বাস্তবজীবনে যদিও আকাঙ্ক্ষা ও পাওয়ার মধ্যে ছিল অনেক ফারাক।

সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের এমন কোনও ক্ষেত্র ছিল না যা ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। তথাপি ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধ ও জটিল সমাজের জন্য ও এর স্থিতিস্থাপকতার জন্য ঔপনিবেশিকতা যা করতে পেরেছিল, তা আংশিক রূপান্তর মাত্র, সম্পূর্ণ পুনর্গঠন নয়। তাছাড়া এটি ভারতে ঔপনিবেশিক নীতির বিষয়সূচীর মধ্যে ছিল না, কারণ ঔপনিবেশিকদের সাংস্কৃতিক নীতি দ্রুত পরিবর্তনের বদলে 'ধীরে চলো' পদ্ধতিতে প্রভাবিত ছিল। এই জন্যই অন্যান্য বাধ্যবাধকতা ছাড়াও, রাষ্ট্র একদিকে যেমন ধর্মান্তকরণে মদত দেয় নি, তেমনি দেশটিকে ইয়োরোপীয়দের বসতি হিসেবে গড়ে তোলেনি। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের বিষয়টি মাথায় রেখে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসাবে আত্মসাৎ এবং সৌহার্দ্যকেই অগ্রাধিকার দিত। তবু সংস্কৃতি বিষয়টি দ্বন্দ্ব এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল কেননা কিছু কিছু নীতি অধীনস্থ

জনগণের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের উপর আঘাত করেছিল। এই প্রতিরোধ নিজেদের নতুন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা এবং এই প্রচেষ্টা থেকেই পুনরুত্থানবাদের জন্ম।

ধর্মীয় সুদৃঢ়করণ এবং পুনরুত্থানবাদে ঔপনিবেশিকতার অনুঘটকের ভূমিকা তেমনভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে স্বাজাত্যবোধের বিকাশ হয়, তার উৎস জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঔপনিবেশিকদের হস্তক্ষেপ। অতীতের সংস্কৃতি অনুসন্ধান, যাকে আমিলকার কারবাল বলেছেন, 'উৎসমূলে ফিরে যাওয়া', তাই সম্প্রদায়গত চেতনার সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তারা যে তত্ত্বের জন্ম দেয় তা সকলের ব্যবহৃত এক সর্বজনগ্রাহ্য প্রবচনের মধ্যে দিয়ে চালু হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সতীদাহ দমন কিংবা বাল্যবিবাহ রোধ অথবা বিবাহের জন্য ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উদ্‌যোগ, হিন্দুদের অতীতের প্রকৃত সাংস্কৃতিক আচরণ নিয়ে এক ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি করে। যারা পক্ষে এবং যারা বিপক্ষে ছিলেন উভয় পক্ষই একই ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থকে সাক্ষী মেনেছিল এবং ধর্ম-জাত চৈতন্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এমনকি যারা বিরোধীপক্ষ তারাও।

সম্প্রদায়গত ঐক্য গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে, বিশেষত হিন্দুদের মধ্যে, একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরের লক্ষ্যে ক্রিয়াকলাপ। এটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ সরকারি উচ্চ পদাধিকারীদের সঙ্গে মিশনারীদের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যেত। যদিও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কখনও তেমনভাবে রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়ার কথা বিবেচনা করেনি, তবুও অনেকের কাছে ধর্ম হারিয়ে ফেলার ভয় ছিল এক বাস্তব সত্য, বিশেষত দেশের নানা স্থানে মিশনারীদের আগ্রাসী প্রচারকার্যের কারণে। এই শঙ্কার প্রথম বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি তত্ত্ববোধনী পত্রিকার বিভিন্ন লেখায়, যে লেখাগুলি শতকব্যাপী প্রকাশিত হয়েছিল নানাভাবে, কখনও রক্ষণমূলক কখনও আক্রমণাত্মকভাবে। পশ্চিমভারতে বিষ্ণু বাওরা ব্রহ্মচারীর মিশনারী প্রচারের বিরুদ্ধে তৎপরতা এই প্রবণতার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১১] চীন কিংবা অন্যান্য অনেক দেশের মতো মিশনারী-বিরোধী চেতনা ভারতবর্ষে জঙ্গী রূপ নেয়নি, এটা কেবল ধর্মীয় সংরক্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কতিপয় সুদৃঢ়করণ বৃদ্ধি পায়।

ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু এবং মুসলমানদের উভয়ের প্রতিক্রিয়াই ছিল মূলত অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে, অতীতের সাংস্কৃতিক সমাজের বিষয়ে এক বিচার-বিশ্লেষণী আত্মসমীক্ষা করে যার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সাংস্কৃতিক প্রথাগুলিকে শক্তিশালী করা। হিন্দুদের মধ্যে এই আত্মসমীক্ষায়, সংস্কৃতি ছিল প্রাচীন হিন্দু অতীতের সমার্থক। এই প্রক্রিয়ার ফলে হিন্দুদের মনে অতীতের কৃতিত্বগুলি স্বর্ণযুগের ধারণা সৃষ্টি করে তাতে সর্ববোধ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ এবং অনেকের বক্তব্যেই উনিশ শতকের হিন্দু ধর্মচিন্তার মধ্যে এই ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। সর্বজনীনতাকে তুলে ধরার পরিবর্তে, আধ্যাত্মিকতা এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁদের অনুরাগ তাদের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল।

এই ধরনের সংকীর্ণ চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের মধ্যস্থতা। ঔপনিবেশিক প্রবক্তারা ভারতের অতীতের এক সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছিল, যার খুব সুন্দর উদাহরণ হলো জেমস মিল কর্তৃক ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু এবং মুসলিম যুগে বিভক্ত করা, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধর্মভাবাপন্ন সদস্যগণ আত্মস্থ এবং সম্প্রসারিত করে নিয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিগত কয়েক শতকের হিন্দুদের অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছিল অন্যদের তৈরি অনুপ্রবেশকে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনুমান করে নিয়েছিল—এর পরিচয় পাওয়া যাবে ইউ এন মুখার্জির "*আ ডাইয়িং রেস*" বইতে, যেখানে পুনরুত্থানের মধ্যে এই বিপদের সমাধান খোঁজা হয়েছে।[১২]

ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে চলমান আলোচনার মধ্যে ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক ফলাফলের কিছু প্রাসঙ্গিকতা আছে। র‍্যাডিক্যাল থেকে নয়া-ঔপনিবেশিক নানা ধরনের পন্ডিতগণ তাদের আগেকার জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে করা ঔপনিবেশিকতার সামালোচনার মত পুনর্বিবেচনা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ মানব জাতির পক্ষে কল্যাণজনক এই পুরানো তত্ত্ব। বিশেষকরে এর শিকার যারা তাদের পক্ষে এটি ভালো, এই মত আবার সম্প্রতি নতুন করে উঠে এসেছে। একথা বলা হয়েছে যে ওপনিবেশিকতা হচ্ছে 'সামাজিক রূপান্তর এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক প্রবল শক্তি এবং এর প্রভাবে উপনিবেশগুলিতে অধিকতর বিকাশ সম্ভব হয়েছিল যা এটি ছাড়া অন্যভাবে সম্ভবপর ছিল না। ঔপনিবেশিকতার প্রগতিশীল চরিত্রের

উপর জোর দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে মার্কসের ভারত বিষয়ক প্রসঙ্গাবলীর উপরে, যেখানে মার্কস ভারতে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর পিছনে ইংল্যান্ডকে 'ইতিহাসের এক অচেতন হাতিয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্য মার্কস কর্তৃক ইয়োরোপের ঔপনিবেশিকতাকে যে 'রক্তক্ষয়ী প্রক্রিয়া' বলা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া হয়নি।[১৩]

ভারত ইতিহাসের সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা বলবার চেষ্টা করে যে ঔপনিবেশিক শাসন নতুন কোনও মৌলিক বিচ্ছেদ ঘটায় নি, বরং একাধিক দিক থেকে তা পূর্ববর্তী দেশীয় যুগগুলিরই অব্যাহত প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। নিরবিচ্ছিন্নতা দু'দিক থেকে চিহ্নিত। প্রথমত, ব্রিটিশরা ক্ষমতার জন্য লড়াইতে অংশ নিয়েছিল "নতুন পদ্ধতিগত নীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে বহিরাগত হিসেবে নয়, বরং উপমহাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সমষ্টিগতভাবে। একাজে তারা অন্যদের চেয়ে বিজয়াভিযানে অধিক সম্পদের অধিকারী ছিল।" দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপীয়রা তাই লাভ করেছিল, "যা ভারতীয় শাসকবৃন্দ বিগত একশো বছর ধরে চেষ্টা করে আসছিল, তবে তা ইয়োরোপীয়রা পেল অনেক বড়ো এবং সর্বগ্রাসী ভাবে। এই বিজয়ের অভীপ্সার ধাক্কায় সাড়া দিয়ে ভারতীয়রা হলে 'সক্রিয় এজেন্ট'। শুধু ঔপনিবেশিক ভারত প্রতিষ্ঠায় নিষ্ক্রিয় দন্ডায়মান দর্শক বা বিজয়ের বলি হিসেবে নয়।" এই যুক্তিগুলিই ভারতের আদি যুগের পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলি 'অধিকতর ভারি প্রমাণ' হিসেবে মেনে নিয়ে সমর্থন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শাসনকে ভাঙার কাজে কোম্পানির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায়। এর থেকে মনে হয় "ঔপনিবেশিকতা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার নিজের পুঁজিবাদী বিকাশের ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি।" পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেমন লিখেছেন :

> এক সময় অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গঠন হিসেবে ঔপনিবেশিকতাকে দেখা হত পুঁজিবাদের বিকাশের দেশীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। একই দেশীয় ইতিহাসের অন্তরঙ্গ অংশ হিসেবে, 'ঐতিহাসিক তত্ত্বের' অপরিহার্য যুক্তি রূপে যা কিছু ঔপনিবেশিক শাসনকে অনুসরণ করেছিল সবকিছুকেই ধরা হত। এই ভাবে ১৮২০ থেকে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন যখন আধুনিক শিল্পায়নে উত্তরণের সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ করার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অববিকাশের সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। তখন তা বহিরাগত শোষণমূলক শক্তির প্রক্রিয়া সঞ্জাত না ধরে,

ভারতীয় পুঁজিবাদের নিজস্ব ইতিহাসের অঙ্গ হিসেবেই ধরতে হবে।[১৭]

মূল প্রশ্নটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান ছিল কি ছিল না, তা নয়। সেগুলি না থাকাটাই আশ্চর্যজনক। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কিছু কিছু প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান ছিল। ঔপনিবেশিকতা সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার সবকিছুরই রূপান্তর ঘটায় নি। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ তাদের অনেক কিছুতে অংশও নিয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে তারা দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করত বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ চালানোর জোরদার প্রবনতা পরিত্যাগ করেছিল। নিরবিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিয়ে এবং 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব' খাড়া করে সংশোধনবাদী ইতিহাসচর্চা ঔপনিবেশিকতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেন পূর্বেকার রাজনৈতিক কাঠামোর মতোই এটি আর একটি রাজনৈতিক কাঠামো মাত্র। ঔপনিবেশিকতা সহ বৃহৎ আখ্যানগুলি সম্পর্কে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের সংশয় এর উদ্দেশ্য অনুসন্ধানমূলক এবং এই প্রবনতার কিছু পরিমাণে সংশোধনবাদী ইতিহাসচর্চার সঙ্গে মিল আছে। ঔপনিবেশিকতার মধ্যে থেকে তার শোষণ মূলক চরিত্রকে বাদ দিয়ে দেওয়া উভয়েই তাকে বৈধতা দান করে, যদি ভিন্ন ভিন্ন তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশ্বায়নের নয়া ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো এই বৈধতা দানের কিছু মতাদর্শগত কার্যকারিতা আছে।

সংশোধনবাদী ইতিহাস সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রার ধরণ থেকে বিচ্ছেদ, অন্তত যারা ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়েছিল তাঁদের কাছে। প্রত্যুত্তর ছিল বহুমুখী, তার মধ্যে উনিশ শতকের শেষের দিকে পুনরুত্থানবাদী প্রতিক্রিয়া বিশেষ মাত্রা পায়। এই পুনরুত্থানবাদ রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, বস্তুত সংস্কৃতিকে সুবিধা করে দিয়েছিল এবং এক ধর্মাশ্রয়ী সাংস্কৃতিক অতীতকে নতুন করে তুলে ধরেছিল। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংস্কৃতির পূর্বসূরী হিসেবে ইতিহাসকে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ সংস্কৃতি সম্পর্কে এক স্থবির ধারণা করে নিয়েছিল যার দ্বারা শুধুমাত্র ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার অস্তিত্বই যে উপেক্ষা করেছিল এমন নয়, নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনের চলমানতাও তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়েছিল। আরও খারাপ ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্যের প্রতিপর্দ্ধাকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোকাবিলা করতে পারার ব্যাপারে অক্ষমতা। এজন্য তারা বাইরের কারণকে দায়ী করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার নানা কৃতিত্বগুলির ধ্বংসের জন্য তারা দায়ী করেছিল বহিরাগত অনুপ্রবেশকে,

বিশেষভাবে মুসলমানদের যারা মধ্যযুগে দেশ শাসন করেছিল এর ফলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক-ভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে ইন্ধন যুগিয়েছে।

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে নবজাগরণ এবং পুনরুত্থানবাদ উভয়ই অন্তরঙ্গ অংশ। ঔপনিবেশিকতা সেগুলির আত্মপ্রকাশের সাংস্কৃতিক পটভূমি তৈরি করেছিল। কিন্তু সে দুটির কোনটিই প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করেনি। নবজাগরণের ক্ষেত্রে অবশ্য অতীত ছিল বলবর্ধক শক্তি, অপরপক্ষে পুনরুত্থানকদের ক্ষেত্রে অতীত ছিল শেষ লক্ষ্য। প্রথমটির উপাদানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল। আর শেষেরটি থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ তার রসদ লাভ করেছিল। সুতরাং সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ যে সাংস্কৃতিক বিকল্পের সন্ধান করছে তা নবজাগরণ এবং পুনরুত্থানবাদ এই উপাদানের মধ্যে বেছে নেওয়ার উপর নির্ভর করছে। এমন একটা সময়ে জাতির পরিচয় নতুনভাবে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। যখন এই বেছে নেওয়া শুধু সাংস্কৃতিক দিক থেকে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও অর্থবহ।

সূত্র নির্দেশ

১. Ngugi Wa Thiog'o *ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড : দ্য পলিটিকস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আফ্রিকান লিটারেচার, লন্ডন, ১৯৮৬, পৃ. ২।*

২. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. কে. এন. পানিক্কর, 'গ্রেট শু কোয়েশেন : ট্রাডিশন, লিজিটিমেসি অ্যান্ড পাওয়ার ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, *স্টাডিজ ইন হিস্ট্রি*, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, ১৯৯৮।

৩. সৈয়দ হুসেন আলাদাতাস, *দ্য মিথ অফ দ্য লেজি নেটিভ*, লন্ডন, ১৯৭৭।

৪. জেমস্ মিল বলেছিলেন যদি একটি ঘরের মাঝখানে রাখা স্বর্ণমুদ্রা নেওয়ার সুযোগ একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজকে দেওয়া হয়, তাহলে ভারতীয়রা সবগুলি লাভ করবে, কারণ এজন্য নয় ভারতীয়ের শারীরিক শক্তি বেশি, সে লাভ করবে প্রতারণার সাহায্যে।

৫. জে. সি. ঘোষ (সম্পা), দ্য ইংলিশ ওয়ার্কস অফ রাজা রামমোহন রায়, এলাহাবাদ, ১৯০৬, পৃ. ২৪১-৪২।

৬. ও ম্যানোনি, *ক্যালিবান অ্যান্ড প্রোপেরো : দ্যা সাইকোলজি অফ কলোনাইজেশন*, অ্যান আরবর, ১৯৯০ পৃ. ৮।

৭. এডওয়ার্ড সীলস্, দ্য ইন্টালেকচুয়াল বিটুইন ট্র্যাডিশন অ্যান মডার্নিটি, দ্যা ইন্ডিয়ান

সিচুয়েশন, দ্য হেগ, ১৯৬১, পৃ. ২৭-২৮।

৮. এই সূত্রটি বিস্তারিত আলোচনার জন্য কে এন পানিক্কর 'নভেল অ্যান ইমাজিনড হিস্ট্রি', *মালয়ালাম লিটারারি সারভে*, কেরলা সাহিত্য আকাদামি, ত্রিচুর, ২০০০।

৯. ও চান্দু মেনন, ইন্দুলেখা, ইংরেজি ভাষার W. Dumergue কালিকট, ১৯৬৫, পৃ. ১০।

১০. আমিলকার কাবরাল, রিটার্ণ টু দ্য সোর্সেস : সিলেকটেড স্পিচেস অফ আমিলকার কাবরাল, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃ. ৬৩।

১১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফ্রাঙ্ক এফ কনলন, 'দ্য পোলেমিক প্রসেস ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরি মহারাষ্ট্র : বিষ্ণুবাওরা ব্রহ্মচারী অ্যান্ড হিন্দু রিভাইভাল, দ্র কেনেথ ডবলু জোনস, *রিলিজিয়াস কন্ট্রোভার্সি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, নিউইয়র্ক, ১৯৯২।

১২. ১৮৭১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সেনশাসের তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে মুখার্জী দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতে 'সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন' হওয়ার পথে। "তাদের নিজেদের দেশেই জনগণ বিপন্ন হয়েছে। পরিশেষে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—এই ঘটনার অনেক কারণেই হতে পারে। আমাদের ভাগ্যেও তেমন ঘটার সম্ভাবনা।" ইউ এন মুখার্জী, *আ ডাইয়িং রেস*, কলকাতা, ১৯১০, পৃ. ১-৩, আরও দ্র. প্রদীপকুমার দত্ত। 'ডাইয়িং হিন্দুজঃ প্রোডাকশন অফ্ হিন্দু কমিউনাল কমন সেন্স ইন আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ১৯ জুন, ১৯৯৩ এবং *কার্ভিং ব্লকস্ : কমিউনাল আইডিয়োলজি ইন আর্লি টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল*, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯।

১৩. এই সংশোধনবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনার জন্য দ্র. আইজাজ আহমেদ, লিনিয়েজেস অফ দ্য পাস্ট, নতুন দিল্লী, ১৯৯৬, পৃ. ১-৪৩।

১৪. পার্থ চ্যাটার্জী, *দ্য নেশন অ্যান্ড ইটস্ ফ্র্যাকমেন্টস্*, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃ. ২৭-২৮।

[২০০০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল নিবন্ধ হিসেবে পঠিত। মূল ইংরেজি থেকে ভাষান্তর গৌতম নিয়োগী]

সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অনিরুদ্ধ রায়

ঐতিহ্যমন্ডিত মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের জিয়াগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে কার্যকরী সমিতি মূল প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিলুপ্ত মধ্যযুগের ইতিহাসের এক গবেষককে আমন্ত্রণ জানানো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি বাংলার মধ্যযুগের একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

এক

মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, যদিও সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। বাংলার সামাজিক অবস্থা নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা করেছেন বেশ কিছুকাল আগে কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন ইত্যাদি।[১] সুকুমার সেন[২] বহুকাল আগে একটা ছোট পুস্তিকায় এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দুর্গাচরণ সান্যালের *বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে*[৩] তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ সবের মধ্যে দুটি দিকের কথা ভাবা দরকার। প্রথমত মুঘল আমল নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, সুলতানী আমল নিয়ে অনেক কম। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক ইতিহাসের চর্চা এখনো উপেক্ষিত। এই দুটি ফাঁক পূরণের জন্য আমি সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারার আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করছি। নিষ্প্রয়োজন যে এখানে এই আলোচনা খন্ডিতভাবে এসেছে— সালতামামির হিসাব নিয়ে আসেনি।

এটা বলার বোধহয় প্রয়োজন হবে না যে সুলতানী আমলের (সাধারণত বক্তিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয় থেকে ধরা হয় যেটি হয়েছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের

শেষে বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলেছিল বলে ধরা যেতে পারে) সূত্র বা ইতিহাসের উপাদান খুবই কম। অগণিত শিক্ষা লেখ বা তাম্রপত্র থেকে শাসনকর্তাদের নাম, পদবী ও শাসনের সীমারেখা পাওয়া যায় যা এই যুগে সুলতানী শাসনের প্রসারতার ইঙ্গিত দেয়। এ যুগের প্রথম দিকের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক মীন হাজ-আস সিরাজের,[৪] যিনি বাংলায় এসেছিলেন, ইতিহাস থেকে এই প্রসারতার ইতিহাস পরিষ্কার। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মরোক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার লেখায় কিছু সূত্র পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে যে চারটি চৈনিক দল[৫] আসে তাদের আখ্যান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে পর্তুগীজদের লেখা থেকে বিশদ তথ্য মেলে। যে সূত্রগুলি এখনো প্রায় অব্যবহৃত, সেগুলি হল সমকালীন বাংলা কাব্য। সাধারণত ঐতিহাসিকরা এগুলি ব্যবহার করেননি। কোন কোন বর্তমানের ঐতিহাসিক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে খণ্ডিতভাবে ও পটভূমি ছাড়া এগুলি ব্যবহার করে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দুজন ঐতিহাসিকের লেখায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার উল্লেখযোগ্য মিশ্রণ দেখিয়েছেন, যদিও আমি তাঁদের বক্তব্যর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত নই। প্রথমজন বাংলাদেশের প্রয়াত ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার,[৬] যিনি হোসেন শাহী আমলের ইতিহাস লিখেছেন। দ্বিতীয়টি পশ্চিমবঙ্গে র রীণা ভাদুড়ি,[৭] যিনি সারা সুলতানী যুগের সামাজিক (এবং অর্থনৈতিক) কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা রয়েছে, যার মধ্যে অতি সম্প্রতি আমি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখায় (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ) সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা[৮] ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে ঐ ও অন্যান্য লেখার কিছু অংশ উপস্থাপনা করব যাতে পরবর্তীকালের আলোচনার বিশদক্ষেত্র তৈরি করা যায়।

দুই

স্বভাবতই প্রথমে একটি প্রশ্ন উঠে আসে। সেটি হল যে প্রাক-সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কিরকম ছিল এবং কতটা ও কোন শক্তি সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে চলেছিল কি না। অর্থাৎ বাংলার সুলতানী যুগের শেষদিকে যে অর্থনৈতিক শক্তির জোয়ার এসেছিল, সেটা সবটাই নূতন কিনা। প্রশ্নটির মীমাংসা পরিষ্কারভাবে হয়নি, আলোচনাও কম হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাবলীকে চলমান স্রোতের মধ্যে না ফেলে ঐতিহাসিকরা যুগ বিভাজন করার জন্য বিশেষ বিশেষ

ঘটনাকে ইতিহাসের মোড় বলে ধরেছেন। কয়েকজন ঐতিহাসিক এর বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণে সোচ্চার হয়ে আদি-মধ্যযুগ পর্ব নিয়ে এসেছেন।[৯] কিন্তু এই আদি মধ্যযুগের শক্তি মধ্যযুগে প্রকাশ পেয়েছিল কিনা তার হিসাব তাঁরা এখনো কষেন নি।

ইউরোপীয় ইতিহাস-চর্চ্চায় যুগের উত্তরণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে এই স্বল্প পরিসরে আমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। শুধু বলা যায় যে বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক হেনরী পিরেন সামন্তযুগের থেকে উত্তরণের যে চরিত্র ও কারণ দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে নানা মতবাদ গড়ে উঠেছিল।[১০] সামন্তযুগের উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে কিভাবে বাণিজ্যর পথ বেয়ে নগরায়ণ ও উত্তরণ হল তার ছবি নিয়ে বিতর্ক আছে। সর্বভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে রামশরণ শর্মা[১২] যে সামন্ত—যুগকে নিয়ে এসেছেন, সেটি তিনি প্রসারিত করেছিলেন সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল, অর্থাৎ মধ্যযুগে নূতন ধারা আসে যেটি আবার বাণিজ্য, নগরায়ণ, মুদ্রার ব্যবহার ইত্যাদি শুরু করে। শর্মা সামন্তযুগে নগরের অবক্ষয়, বাণিজ্যর অপ্রতুলতা মুদ্রার বদলে জমি দান প্রধানত ধর্মাশ্রমে—এগুলি দেখিয়ে উনি সামন্তযুগকে অবিহিত করেছেন। পরবর্তী কালে তিনি এই যুগের প্রসার অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত করেন যার মধ্য থেকে উনি বাংলাকে বাদ দিয়েছেন।[১৩]

প্রাক-সুলতানী বাংলার অর্থনৈতিক শক্তি ও তার পরিবর্তনের চিত্র নীহাররঞ্জন রায়ের[১৪] লেখায় পাওয়া যায়। উনি দেখিয়েছেন যে বাংলার বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবার ফলে নগরগুলির অবক্ষয় শুরু হয়; মুদ্রার প্রচলন কমে যাওয়ার ফলে জমির উপরে চাপ পড়েছিল বেশি এবং রাষ্ট্রের কাছে বণিকদের থেকে সামন্তদের গুরুত্ব বেশি বেড়ে গিয়েছিল। উনি অবশ্য সময় ধরেছেন অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত, যখন কোন কোন নগরের অবক্ষয় না হলেও প্রসার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৫] ওঁর বক্তব্যর সঙ্গে রামশরণ শর্মার বক্তব্যের মিল আছে। এই দুই ঐতিহাসিকের বক্তব্যর বিরোধিতা করা হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যর বিরুদ্ধে মমতাজুর রহমান তরফদার ও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্য চিত্র দিয়েছেন। শর্মার বক্তব্যর বিরোধিতা করেছেন আন্দ্রে উইনক, যিনি দেখাচ্ছেন যে পিরেনের বক্তব্যর বিরুদ্ধে বহু ঐতিহাসিক কলম ধরেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক মরিস লোম্বার্ড।[১৬] নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য ও বিরোধিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন রীণা ভাদুড়ি[১৭] এবং এখানে ঐ বিতর্কের পুনর্বার উপস্থাপনা অপ্রয়োজনীয়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে একাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বাংলার

নগর জীবনের যে উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যায় তার সঙ্গে নগর অবক্ষয়ের বক্তব্য মেলে না। যে সব পণ্য ও দ্রব্য ব্যবহার ঐ সব নগরের মধ্যে পাওয়া যায়, কবির অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও, বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের সন্ধান মেলে। সুতরাং প্রাক-সুলতানী যুগে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এটা বিনা বিচারে মেনে নেওয়া অসঙ্গত। এটা ঠিক যে তমলুকের পতনের পর (সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর শেষ) আর কোন সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্দর ঐ সময়ে পাওয়া যায় না। আর লেখকদের লেখায় ঐ সময়ে "সমন্দর" বলে যে বন্দরের কথা পাওয়া যায়, তাকে অনেকেই চট্টগ্রাম বলে ধরেছেন।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় নদীয়া[১৮] শহরে, যখন বক্তিয়ার খলজী এসেছিলেন বলে মীনহাজ বলছেন, যে সমৃদ্ধশালী শহর ছিল তার সমকালীন প্রমাণ আছে। মীনহাজের রচনায় দেখা যায় যে নদীয়াতে প্রচুর বণিক ও ব্যবসায়ী ছিলেন, যারা বক্তিয়ার খলজীর আসার আগেই পালিয়ে যায়। নদীয়া লুঠ করেছিলেন বক্তিয়ার তিনদিন ধরে এবং লুঠের টাকায় লক্ষণাবতীতে অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা করে দেন, যেগুলি মীনহাজ পরে এসে দেখেছিলেন।[১৯] দ্বাদশ শতাব্দীর শেষেই আমরাও নদীয়ার মত শহরের কথা পাই।

নীহাররঞ্জন রায় সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার একটা ছবি দিয়েছেন। এই ছবির সঙ্গে দশম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে লেখা চর্যাপদের বর্ণনার বিশেষ ফারাক নেই।[২০] সাধারণ লোকেদের সুখ-সমৃদ্ধির ইঙ্গিত হয়ত নেই, কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, কাজ-কারবার, কান্না-হাসির কথা আছে। এমন কি বাণিজ্যের কথাও আছে, যদিও সেটা বহির্বাণিজ্যর কথা নয় বলেই মনে হয়। আমার অনুমান এই চিত্র ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা বেশি হলে চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি থেকে চিত্রটা বদলাতে থাকে। কোন কোন লেখক বলেছেন যে রাজ্যপাঠ পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ সুলতানী শাসন শুরু হবার ফলে "কৃষক পিষ্ট ও জর্জরিত" হয়েছিল।[২১] এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে নদীয়া বিজয়ের পর প্রায় একশ বছর সেন বংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিল। এমনকি গঙ্গা-সরস্বতীর উপরে সপ্তগ্রাম অঞ্চল সুলতানরা জয় করেছিলেন ১২৯৮ সালে। সুতরাং সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বক্তিয়ার খলজী সারা বাংলা জয় করেছিলেন, এই বহুল-প্রচলিত মত মানা যায় না।

তিন

সুলতানী যুগের প্রথম থেকেই একটা পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায়। শাসনতন্ত্রের উপরের স্তরে পরিবর্তন ছাড়াও, রাজত্ব আদায়ের প্রথা বদলের আভাষ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের প্রথা অবলম্বন করে সুলতানী শাসনের গোড়া থেকেই আমীরদের উপর ভার দেওয়া হয় ভূমি-রাজস্ব (আসলে জমির খাজনা নয়, ফসলের উপর কর) সংগ্রহ করার ও আঞ্চলিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার। একেই উত্তর ভারতে ইক্তা প্রথা বলা হত, যদিও কালক্রমে এর পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রাক-সুলতানী যুগের ইতিহাসে নীহাররঞ্জন রায় ভূমধ্যকারীদের বিভিন্ন স্তর-বিন্যাস দেখিয়েছেন।[২২] এটিও অবিকৃত অবস্থায় ছিল বলে বোধ হয় না। তুর্কী আমীরদের মধ্যে অঞ্চলভাগ করে ঐ সব ভূমধ্যকারীদের উপরে বসিয়ে দেওয়া হল। বলা প্রয়োজন যে এই প্রথা সুলতানী যুগের গোড়া থেকে শুরু হলেও, চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ফার্সী সাহিত্যে ও ইতিহাসে "ইক্তা" শব্দটি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে "জমিদার" শব্দটিও গোড়ার দিকে ফার্সী লেখায় পাওয়া যায় না। ফলে বলা যায় যে তুর্কী আমীরদের তলায় পুরানো ভূম্যধিকারী। তাদের তলায় ছিল *মুকদ্দম, চৌধুরী* ইত্যাদি, যারা প্রথমে ছিল গ্রামের মোড়ল ও পরে হয়ে যায় জমিদার। ঐ তুর্কী আমীররাও ততদিনে "ইক্তাদার" বা "মুক্তি" বলে পরিচিত হয়েছেন। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতা ও অধিকার পরিষ্কার হয়ে এসেছে।[২৩]

উত্তরভারতের তুলনায় বাংলার শাসনতন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হত। মমতাজুর রহমান তরফদার দেখাচ্ছেন যে বাংলার বিভিন্ন অংশে *ইকলিম, আরসা, দিয়ার* ইত্যাদি শব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি সর-ই লস্কর-ওয়া ওয়াজিরের অধীনে ছিল। কিছুকাল পরে ওয়াজিরের হাতে আর্থিক ক্ষমতা রাখা হয়েছিল।[২৪] এটা মেনে নিলে মানতে হবে যে কার্যকরী ক্ষমতা (Executive) ও আর্থিক ক্ষমতা একজন আমলার হাতে চলে আসে, যেটি উত্তরভারতের প্রথার বিপরীত। অবশ্য এমন হতে পারে যে বাংলাতে প্রথম থেকেই এই দুটি ক্ষমতা আলাদা আমলাকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাসী লোকের অভাবে আবার দুটি ক্ষমতা একজনকে দেওয়া হয়।

সপ্তগ্রামের ও অন্যান্য শিলালেখ থেকে *আরসা সজলা মাখনাবাদ* শব্দটি পাওয়া যায়। *আরসা* নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়েছে। ব্লখম্যান ধরেছেন যে আরসা পরগণা নয়,

এটি মুঘল যুগের *সরকারের* সমতুল্য। শেরশাহ ও মুঘলরা সরকার শব্দটি প্রদেশের অন্তর্গত এলাকা বলে ধরেছেন এবং বাংলাতে প্রাক-মুঘল যুগে এ শব্দটি পাওয়া যায় না। মমতাজুর রহ্‌মান তরফদার বিস্তৃত আলোচনা করে দেখাচ্ছেন যে *আরসা* ও *ইকলিম* সমার্থক এবং এ শব্দদুটি প্রদেশ বোঝায়। *আরসা* মুঘলদের সরকার নয়, কারণ সরকার প্রদেশের অন্তর্গত। অন্তত হোসেন শাহী বাংলায় *আরসা* সরকারের থেকে বড় এবং এটি একটি প্রদেশ যার মধ্যে আর্থিক অঞ্চলও ছিল। ঐ একই ভাবে *মূলককে* দেখা যেতে পারে।[২৫] সুতরাং প্রাক-মুঘল যুগে বাংলায় কোন একটি শব্দ পাওয়া যায় না যার দ্বারা প্রাদেশিক বিভাজন বোঝায়।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সর-ই লস্কর ওয়া ওয়াজির বলে বলা হচ্ছে। ওঁর অধীনে *শিকদার* ও *জংদার* এর কথা পাওয়া যায়। মনে হয় প্রদেশের নীচুস্তরে সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতা ভাগ করা হয়েছিল। *জংদার* সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার করতেন। *শিকদারের* উল্লেখ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে আছে। তবে তিনি ক্ষমতা বা পদ-মর্যাদায় শের শাহর শিকদারের সমকক্ষ নন।[২৬]

এছাড়া আমরা আরো দুজন আমলার নাম পাই—একজন কোতোয়াল ও অন্যজন কাজী। প্রথমজন সম্বন্ধে বাংলার কবিরা বিশেষ কিছু না বললেও, কাজী ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে "দুষ্ট" চরিত্র। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব লেখকরা ব্রাহ্মণদের "পাষন্ড' বললেও কাজী সম্বন্ধে ভালো কথা বলেননি। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ও কাজীর সংঘাত এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২৭] যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল যে সপ্তগ্রামের অধীনে নদীয়া শহরে আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে কোতোয়াল ও কাজী ছাড়া আর কোন আমলা পাই না। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে যেখানে মুসলমানদের বসতি শুরু হয়েছে সেখানে কাজীকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে কাজীর অত্যাচারের কথা সুবিদিত হয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মনে করা যায় যে কাজীদের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হয়েছিল, যার পরিচয় পাওয়া যায় কৃষ্ণ দাস কবিরাজের লেখা থেকে।[২৮] মনে হয় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কাজীদের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কমে যায়। সুলতানী যুগের প্রথম দিকে স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে ক্ষমতা থাকলেও, সুলতানী শাসনতন্ত্রের প্রসারের ফলে এই ক্ষমতা কমতে থাকে বলে মনে করা যায়।

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো যে তখনো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এটা বোঝা যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে *ইজারাদারী* প্রথার প্রচলন থেকে, যাকে বাংলায় *মজুমদারী*

প্রথা বলে ধরা যেতে পারে।[২৯] সরকারী আইন মোতাবেক এদের রাজস্ব সংগ্রহ করার কথা। কিন্তু সবসময়ে তারা যে সেটা করতেন না তার প্রমাণ রয়েছে। ষোড়শ শতকে সপ্তগ্রামের ইজারাদার বার লক্ষ টাকার কড়ার করে বিশ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন এবং ধরাও পড়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বিশ লক্ষ টাকা শুধু সপ্তগ্রাম বন্দরের কর থেকে আসেনি; এর মধ্যে সপ্তগ্রামের অধীনের আশেপাশের এলাকার ভূমি-রাজস্ব ছিল। বন্দরের শুল্ক নেওয়া ও বন্দর দেখাশোনার জন্য রাজকর্মচারী ছিল যাদের কথা ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ ভ্রমণকারীদের লেখায় পাওয়া যায়। এরা শুল্ক সংগ্রহ করে ইজারাদারদের দেবেন, এটা ভাবার কারণ নেই। এছাড়া বলা যায় যে সপ্তগ্রাম বন্দরের শুল্ক থেকে বার লক্ষ বা বিশ লক্ষ টাকা হওয়া সম্ভব নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুরাটবন্দর যখন মধ্য গগনে, তখন ঐ বন্দরের আয় ছিল ষোল লক্ষ টাকা। ঐ সময়ের আয়ের মধ্যে ছিল বন্দরের সঙ্গে লাগোয়া জমির ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর।[৩০] ষোড়শ শতাব্দীর শেষে আবুল ফজল *আইনই আকবরীতে।*[৩১] যে চিত্র দিয়েছেন সেটি ১৫৮৭ সালে টোডরমল্লর *বন্দোবস্ত*-এর উপর নির্ভর করা। টোডরমল্লর সময়ে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এটাই স্বাভাবিক যে টোডরমল্ল পূর্বতন কারবারীদের কাগজপত্র থেকে হিসাব করেছিলেন। সেখানে প্রতি শহরের সঙ্গে লাগোয়া জমির কথা পাওয়া যাচ্ছে। শহরের আয়ের ফারাক হচ্ছে ঐ লাগোয়া জমির পরিমাণ ও উর্বরতার উপর। সম্ভবত বন্দরগুলির আয় এতটা বেশি ছিল না যার থেকে বন্দরের খরচ চলতে পারে। ঐ ঘাটতি খরচ মেটানোর জন্যই জমি লাগিয়ে দেওয়া হত, যাতে তার আয় থেকে বন্দর শহরের ব্যয় নির্বাহ করা যায়।

চার

বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইক্তাদার, ইজারাদার ও শাসনতান্ত্রিক আমলা বসে যাওয়ার ফলে ভূস্বামীদের ক্ষমতা কমেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আয় কমেছিল কিনা বলা শক্ত। ভাগীরথীর তীরে ভূস্বামীদের কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের সংগৃহীত খাজনার একাংশ যে শাসনতন্ত্রের হাতে তুলে দিতে হচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। প্রাক-সুলতানী যুগের শিলালেখ থেকে বহু আমলার কথা পাওয়া যায়। সুতরাং আগেও ভূস্বামীদের সংগৃহীত খাজনার একাংশ চলে যেত। কৃষি-প্রধান দেশে কতটা কর কৃষকরা দিত তার তথ্য সুলতানী যুগে বিরল। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পর্যটক ইবনে বতুতা সিলেটে ফসলের অর্ধেক কর হিসাবে দিচ্ছে—

বলেছেন।[৩২] এটা যে সারা বাংলার প্রথা সেটা বলেননি। সম্ভবত প্রান্তিক এলাকায় কর বেশি নেওয়া হত, যার পলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে সিলেটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় ও লোকে ভাগীরথীর পারে চলে আসতে থাকে, যার মধ্যে চৈতন্যর বাবা-মা ছিলেন। ওঁরা আসার আগেই সিলেট থেকে বহু লোক নদীয়াতে এসে পড়েছিল।[৩৩]

ইবনে বতুতা জমি জরীপ করার কথা বলেন নি, যদিও পরবর্তীকালের লেখা থেকে মনে হয় জমি জরীপ কোন কোন জায়গায় করা হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে মুকুন্দরাম বলছেন "হাল পিছু এক তঙ্কা" কর বছরে দিতে হত।[৩৪] অন্যধরনের প্রথাও চালু ছিল বলে মনে হয়। ঐ সময়ের লেখক আবুল ফজল লিখছেন *নজর* প্রথা ছিল। অর্থাৎ চোখে দেখে কতটা ফসল উৎপাদন হচ্ছে সেটা স্থির করে সম্ভবত উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসাবে নেওয়া হত।[৩৫] ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড একে *নাসক* প্রথা বলে ধরেছেন, মূলত *নাসক* প্রথা আগেকার প্রথাই অপরিবর্তনীয় রাখে। ইরফান হাবিব দেখাচ্ছেন যে উত্তর ভারতে এটি ছিল মুঘল যুগের গোড়ার দিকে *জাবতী* প্রথার অংশ। কিন্তু এটি কোনমতেই *মুকদ্দমের* সঙ্গে সমগ্র গ্রামের খাজনার বন্দোবস্ত নয়।[৩৬]

আবুল ফজলের লেখা থেকে পাওয়া যায় যে কৃষকরা বিভিন্ন কিস্তিতে সরাসরি নগদ টাকায় খাজনা দিচ্ছে।[৩৭] এটি সম্ভবত *খালিসা* এলাকা বা সরকারী জমিতে প্রযোজ্য। অন্যরকম হলে জমিদার বা তালুকদারের কাজ বদলে যাবে। এছাড়া কৃষকের পক্ষে নগদ রূপোর টাকা বা মোহরে খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়, *শিকদার* এই খাজনা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতেন। মুঘলরা দুয়েক জায়গায় জমি জরীপ করা শুরু করলে সে কাজও তিনি করতেন।[৩৮]

ইবনে বতুতা শস্যভাগ করার কথা বলেছেন এবং বাংলায় যে ঐ সময়ে উত্তর ভারতের তুলনায় পণ্যের মূল্যমান অত্যন্ত কম ছিল, মূল্যের তালিকা দিয়ে তিনি সেটা বুঝিয়েও দিয়েছেন।[৩৯] সারা মধ্যযুগ ধরেই উত্তর ভারতের তুলনায় বাংলায় পণ্যের মূল্যমান অনেক কম ছিল। মুহম্মদ আবদুর রহিম[৪০] প্রাক-সুলতানী যুগের বাংলার কড়ি ও টাকার (তঙ্কা) মূল্যমানের সঙ্গে ইবনে বতুতার দেওয়া মূল্যমানের তুলনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে রূপোর তুলনায় কড়ির মূল্যমান সুলতানী বাংলায় প্রায় ছয়গুণ কমে গিয়েছে যার জন্য তিনি বেশি রূপোর আমদানিকে সঙ্গতভাবেই দায়ী করেছেন। বলা বাহুল্য এই রূপোর আমদানি বাণিজ্যর ফলে হয়েছিল।

অবশ্য একটা প্রশ্ন থেকে যায় রহিমের পদ্ধতি মেনে নিলেও। দেড়শ বছর ধরে বাংলাতে এই পরিমাণ রূপো এলে পণ্যর দাম উর্ধমুখী হওয়ার কথা কিন্তু সেটা হয়নি। মজুরীর বিষয়টি ধরলে এটি হয়ত পরিষ্কার হতে পারে। আবুল ফজল উত্তর ভারতে মজুরীর হার দিয়েছেন। এর থেকে দেখা যায় যে নিম্নতর মজুরী ছিল বছরে আঠার টাকার সমান (অবশ্য এই হার আবুল ফজল তামার মুদ্র দামে দিয়েছেন এবং রহিম সেটি টাকায় পরিবর্তিত করেছেন)।[৪১] ইবনে বতুতার লেখা থেকে দেখা যায় যে বাংলায় তিনজন লোক বছরে সাত টাকায় প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে সুখে বাস করতে পারত।[৪২] এর আড়াইশ বছর পরে এই মূল্যমান দ্বিগুণ বা তিনগুণ হলেও ঐ ধরনের পরিবারের অসুবিধা হবার কথা নয়। অসুবিধা হচ্ছে এই যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলার মজুরীর হার আমরা জানি না এবং অদক্ষ শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা কি ছিল, তাও জানি না।

এর সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সেটি হল চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় টাকার প্রচলন কিরকম ছিল। সাধারণ কথায় বলতে গেলে দাঁড়ায় যে বাংলার এই মূল্যমান সাধারণ লোকেদের কাছে বেশি বা কম বলে মনে হয়েছিল কি না। ইবনে বতুতা বলছেন যে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে জানিয়েছে যে ঐ মূল্যমান তাদের কাছে বেশ বেশি বলে মনে হয়েছে।[৪৩] এর থেকে বোঝা যায় যে বাংলায় মজুরী উত্তর ভারতের তুলনায় নীচু ছিল, আরো মনে হয় যে উত্তর ভারতের তুলনায় নীচু মূল্যমান হলেও, বাংলায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে যার জন্য রূপোর আমদানি দায়ী।[৪৪] কিন্তু এই রূপো সাধারণের হাতে পৌঁছাচ্ছে না, সমাজের সম্ভবত দুটি অংশে ভাগ হয়ে জমা হচ্ছে। শাসকশ্রেণী ও বণিকশ্রেণী এই আমদানি থেকে ফায়দা তুলেছে, কিন্তু এই রূপো নীচুস্তরে না যাওয়ায় সাধারণ লোক বা অদক্ষ শ্রমিক এর কোন সুবিধা পায় নি। সীমাবদ্ধ টাকার প্রচলনের ফলে মূল্যমান ততটা বাড়েনি এবং মজুরীও ততটা বাড়েনি। বিশদ তথ্য না থাকায় আরো বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়।

পাঁচ

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় বিভিন্ন সূত্র থেকে পরিষ্কার যে বাংলার অর্থনৈতিক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। পঞ্চদশ শতকের প্রথম চার দশক ধরে চারটি চীনা দল বাংলাতে এসেছিল। ওদের লেখা[৪৫] থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাজধানী পাণ্ডুয়ার শহরতলীতে পথের দুপাশে সারিবদ্ধ দোকান, যেখানে দেশ বিদেশের সব পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।[৪৬] ১৪৩০ এর দশকের চীনা দূত মা-হুয়ান বিভিন্ন রকম তাঁতের

কাপড়ের উৎপাদনের কথা বলেছেন। যেটি নূতন বলেছেন সেটি হল রেশম শিল্প ও তার কাপড়। গুটিপোকা থেকে রেশম মনে হয় তখন উত্তরবঙ্গে সবে শুরু হয়েছে এবং চীনা রেশমের মত যে এই রেশম নয় সে কথারও উল্লেখ করেছেন মা-হুয়ান। এছাড়া উনি বলেছেন যে বাংলায় বড় বড় বণিকের জাহাজ আছে এবং বহির্বাণিজ্যর মাধ্যমে তারা ধনী। তাদের পরিবারের ছেলেরা ও মেয়েরা নানান রত্ন পরে।[৪৭] এই রেশম শিল্পকে কেন্দ্র করে এই সময়ে ঐ বহির্বাণিজ্যর প্রসার হচ্ছিল কিনা সেটা উনি বলেননি। পরে আমরা বহির্বাণিজ্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। এখানে বলা দরকার যে নূতন শিল্প আসায় বাংলার অর্থনৈতিক জগতের যে ছবিটা পাওয়া যায়, সেটা চতুর্দশ শতাব্দীর চিত্র থেকে আলাদা। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীর সূত্র কম থাকায় ঐ শতাব্দীর ছবি পরিষ্কার নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই বাংলার বণিকদের যে সমৃদ্ধির ছবি পাওয়া যায়, তার শুরু চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি।

বাংলার চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাস খুব পরিষ্কার না হলেও এটা বলা যায় যে ইলিয়াস শাহর রাজত্বে (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ, মতান্তরে ১৩৫৫ খ্রিঃ) সারা বাংলা শুধু একটা শাসনের মধ্যেই আসেনি, একদিকে সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম দখল ও অন্যদিকে সুবর্ণরেখা থেকে গোদাবরী হতে বালাসোর ও সমুদ্রতীর পর্যন্ত দখল করার ফলে বহির্বাণিজ্যর জন্য বন্দরের অভাব হয়নি। পাটনার বিপরীত দিকে হাজীপুরে শহর বসিয়ে গঙ্গার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এই উল্লেখযোগ্য বিজয়ের পর ইলিয়াস শাহ উত্তর দিকে বারাণসী, তিরহুত (মিথিলা) ও ডইরচ দখল করে নেপাল আক্রমণ করেছিলেন বলে বলা হয়। মনে হয় পার্বত্য ও স্থল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান, এই বিশাল এলাকা জয় করার ফলে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্-তুঘলকের আক্রমণ হয়। ইলিয়াস শাহর পরে সিকান্দার শাহ ও বারবাক শাহর সময়েও এই বিশাল রাজত্ব চলতে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রাজনৈতিক জগতে একটা গুণগত পরিবর্তন আসতে থাকে যার ফলে বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বদলাতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলার সুলতানদের বিরল কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা যা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ইলিয়াস শাহর স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে যার গুণগত মান দিল্লীর মুদ্রার সমতুল্য ছিল।[৪৮]

পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় যে রাজনৈতিক গোলমাল বিশেষ ছিল না, তারও

আভাষ চীনা লেখকদের লেখায় পাওয়া যায়। মাঠে চাষবাস হচ্ছে, কোথাও কোন গোলমাল নেই। বাংলা ভাষায় অভিজাত ও অন্যান্য লোকেরা কথাবার্তা বলছে, কেবল দুচারজন বড় অভিজাত ছাড়া। এটা পরিষ্কার যে একটা বাঙালী সত্তা গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে এঁরা হিন্দু-মুসলমান বিভাজন করেননি।

মনে হয় ইবনে বতুতার সময় থেকে পণ্যের মূল্যমান বিশেষ বাড়েনি। চীনারা বলছেন যে টাঁকসাল থেকে তঙ্কা বের হলেও, সাধারণ লোক কড়ি ব্যবহার করে তাদের দৈনন্দিন কাজে। এই মূল্যমান না বাড়ার একটা কারণ হতে পারে যে বহির্বাণিজ্যের ফলে যেমন রূপোর আমদানি বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি তার তাগিদে উৎপাদনও বেড়েছিল, যার ফলে মূল্যমান খুবই ধীরে বাড়ে। এর ফলে নূতন নগরায়ণের ছবি পাওয়া যায়।

ছয়

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইলিয়াস শাহ্ সোনারগাঁও জয় করে সারা বাংলাকে একটা শাসনের মধ্যে নিয়ে আসেন। সম্ভবত এই সময়েই উনি রাজধানী লক্ষণাবতী থেকে সরিয়ে পাণ্ডুয়াতে নিয়ে আসেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এর জন্য পাণ্ডুয়ার কাছে নদী সরে এসেছিল বলে মনে করেছেন যদিও পরিষ্কার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুকনো একটা খাত পাণ্ডুয়ার বর্তমানে অপসৃয়মাণ পাঁচিলের কাছে দেখা যায়, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় নদী যে পাণ্ডুয়ার কাছে ছিল না তার প্রমাণ আছে। চীনা দূতরা নবাবগঞ্জ থেকে নেমে প্রায় বিশ মাইল পথ হেঁটে পাণ্ডুয়া শহরে পৌঁছেছিলেন। ঐ বাধাঁনো পথের ভগ্নাংশ এখনো বর্তমান।[৪৯]

রিয়াজ উস সালাতিনের (১৭৮৮) লেখক গোলাম হোসেন সলীম বলছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই পাণ্ডুয়া ও গৌড়ে জনসমাগম বাড়ছিল। দুবার দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ থেকে বাঁচলেও পাঁচিল ঘেরা পাণ্ডুয়াতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। এর ফলে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদের সময়ে গৌড়ে রাজধানী চলে যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ঐ সময় থেকেই সপ্তগ্রাম বন্দরের আত্ম-প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।[৫০] অর্থাৎ গৌড়ে রাজধানী সরে যাওয়ার পিছনে ভাগীরথীর একটা বড় ভূমিকা আছে—সমুদ্র, সপ্তগ্রাম ও গৌড় একটি নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়।[৫১] উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চদশ শতাব্দীরর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আমরা ভাগীরথীর পাড়ে ছোট ছোট শহর তৈরির কথা পাই, যেগুলি প্রধানত তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। বলা বাহুল্য যে ভাগীরথী ধরেই এই শহরগুলির যোগ সপ্তগ্রাম

ও গৌড়ের সঙ্গে। সম্ভবত ঐ দুটি শহরের বাণিজ্যিক চাহিদার ফলেই ভাগীরথীর পাড়ের ছোট ছোট শহরগুলি তৈরি হয়েছিল। এই শহরগুলির মধ্যে নদীয়া, শান্তিপুর ইত্যাদি শহরগুলির উল্লেখ করা যায়।[৫২]

এই শহরগুলির চরিত্র ও গঠন পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম বা গৌড়ের থেকে আলাদা। এই ছোট শহরগুলির কোন পাঁচিল নেই এবং আশেপাশের গ্রামের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। এর ফলে এই সব ছোট শহরগুলিতে একটা মিশ্র নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে যার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের প্রভাব রয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদ থেকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এই সব ছোট নগরজীবনের ছবি পাওয়া যায়। দুএকটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া, সুখ ও সমৃদ্ধি (অবশ্যই সীমাবদ্ধ) বিরাট করছে।[৫৩] পরের শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই চৈতন্যর আবির্ভাব ও পর্তুগীজদের আগমনের ফলে ভাগীরথীর পাড় চঞ্চলা হয়ে উঠলেও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার চলমান প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায় নি। ঐতিহাসিক ফারনান্দ ব্রোদেলের কথামত রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ঘূর্ণাবর্ত আসার ফলে কাল দ্রুত লয়ে চলতে থাকে, কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনের নিস্তরঙ্গ জীবনে কাল তার নিজের ধীর লয়েই চলে।

কিন্তু সারা বাংলার ছবি এটা নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভাগীরথীর পাড়ে নূতন জীবন শুরু হচ্ছে, তখন সিলেটে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ চলছে, যার ফলে সিলেটের লোকেরা পালিয়ে ভাগীরথীর পাড়ে চলে আসছে। বলা যেতে পারে যে হিন্দুরা নদীয়ায়, যার প্রমাণ সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে রয়েছে, এবং মুসলমানরা গৌড়ে চলে এসেছিল। ১৪৭০ খ্রিঃ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গৌড়ের প্রাসাদের চারপাঁচ মাইলের মধ্যে অন্তর চার বড় মসজিদ তৈরি করা হয়, যার থেকে একটা বিশেষ সময়ে গৌড়ে লোক আসার আভাষ পাওয়া যায়।[৫৪]

সিলেট থেকে চৈতন্যর বাবা-মা আসার আগেই সিলেটের লোক নদীয়াতে এসে একটা বিশেষ মহল্লা তৈরি করেছিল। এটা ঠিক হিন্দুদের উপর মুসলমানী অত্যাচার নয়। কটকের রাজা ছিলেন হিন্দু। এসত্ত্বেও কটক থেকে বহু লোক নদীয়াতে এসে বসবাস শুরু করে। বাংলা-উড়িষ্যা যুদ্ধ এই ধরনের আসার কারণ বলে ধরা যায়। কিন্তু এক হিন্দু রাজার হিন্দু অধিবাসীরা তাদের বাড়ি ছেড়ে আক্রমণকারী মুসলমান রাজার রাজত্বে কেন যাবে সেটা বোঝা শক্ত। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে তারা এসেছিল এটা বলা বোধ হয় সঙ্গত। এর আলোচনা আমরা পরে করব।

সমগ্র ভারতের মতই বাংলায় জমি ও মানুষদের অনুপাত মানুষের পক্ষে ছিল। অর্থাৎ চাষযোগ্য অনাবাদী জমি প্রচুর পড়ে রয়েছে। কিন্তু এসত্ত্বেও ভূস্বামী, স্বচ্ছল কৃষক ও ভূমিহীন চাষীর উদ্ভব হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকের কবি বিপ্রদাস পিপলাই "লাখে লাখে ধেনু চরছে" বলেছেন।[৫৫] কবির অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও বলা যায় যে গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্রে অভাব ছিল না এবং সম্ভবত গবাদি পশুর উপর কর ছিল না। কবি হাসান-হুসেনের কথায় বলেছেন যে তারা "শতেক কিষাণ" লাগিয়ে চাষ করাত।[৫৬] এই "শতেক কিষাণ" হচ্ছে উত্তর ভারতের *পাহিকস্থ* বা ভূমিহীন কৃষক, যারা মূলধনের অভাবে, (অর্থাৎ গরু, বীজ ইত্যাদি) অন্যদের জমিতে দিনমজুরী করছে। এর ফলে স্বচ্ছল কৃষক ও সেখান থেকে ভূস্বামীদের উত্তরণ কিছু শক্ত নয়। কবির দেওয়া সংখ্যা মেনে নিলে বলা যায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা স্বচ্ছল কৃষকের (খুদকস্থ) তুলনায় বেশি। উত্তর ভারতেও ঐ একই ছবি পাওয়া যায়[৫৭] এবং ঐ ছবি যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অপরিবর্তনীয় ছিল তা মুকুন্দরামের রচনায় পাওয়া যায়, যদিও উনি সংখ্যা দেননি।

মমতাজুর রহমান তরফদার বলছেন যে এদের তুলনায় তাঁতীর অবস্থা ভালো ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে আর এক কবি বিজয় গুপ্তের লেখা থেকে বলা হচ্ছে যে তাঁতী বাজারে মাছ ও তরকারী কিনছে, যে ধরনের জীবন যাত্রা মধ্যবিত্ত জীবন যাত্রার সঙ্গে তুলনীয়।[৫৮] এই একটি ঘটনার উল্লেখ মেনে নিলেও স্বচ্ছল তাঁতীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল বলে ধরা যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন মুঘল বাংলার উজ্জ্বল বাণিজ্য ছিল, তখন ইউরোপীয় কোম্পানীর বণিকরা তাঁতীদের চরম দুরবস্থার কথা বলেছেন।[৫৯]

বাংলার শহরগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে জনসমাজে দ্রুত পরিপূর্ণ হতে থাকে। গোলাম হোসেন সলীমের পরবর্তী কালের লেখায় এ ছবি পাওয়া যায়।[৬০]

সপ্তদশ শতাব্দীর আগে সারাভারতে ও বাংলাতে মানুষের তুলনায় জমি ছিল বেশি। আগেই আমরা দেখেছি যে গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্র পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ শতকে বেশি ছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনবসতি ঘন হয়নি। ষষ্ঠদশ শতকের লেখক চূড়ামণি দাস বলছেন যে চৈতন্য যখন তীর্থযাত্রায় বের হল, তখন গাছের জঙ্গলে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না।[৬১] সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ের কাছের রামকেলী গ্রাম থেকে কানাই নাঠশালা যাবার পথে ছাড়া ছাড়া বসতির কথা বলেছেন। পথের দুপাশের বকুলের শ্রেণী,, মাঝে মাঝে পুকুর।[৬২] ১৫২১ সালে

অনামা পর্তুগীজ দেভাষী গৌড় শহরের কাছের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন।[৬৩]

বলা যায় যে গ্রামগুলি জঙ্গলে ঘেরা, যার মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি বাস করে। একমাত্র মুকুন্দরাম ছাড়া বাকি কবিরা এদের নিয়ে মাথা ঘামাননি, দুই একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া। কবি জয়ানন্দ[৬৪] শ্রীহট্ট দেশের জাজপুর গ্রামের মধ্যে মন্দির, পুকুর, মঠ, বাড়ি, চারপাশে নানান ধরনের ফলের গাছ ইত্যাদির কথা বলেছেন। কবি খালিকাপুর গ্রামের মধ্যে যে হাট বসত তার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালে মুকুন্দরাম বলেছেন যে এই সব হাট থেকে কিভাবে তোলা সংগ্রহ করা হচ্ছে।[৬৫]

সারা বাংলার গ্রামের চেহারা এক রকম নয়। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পর্তুগীজ দোভাষী চট্টগ্রাম থেকে গৌড়ে যাবার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি পূর্ববঙ্গতে ছোট ও বড় গ্রাম, দ্বীপ, ছোট ও বড় শহরের কথা বলেছেন। ছোট গ্রামের মধ্যে আখের চাষ হচ্ছে দেখেছেন। কাপড় তৈরি হচ্ছে দেখেছেন, যদিও লোকজন বড় কম বলে ওঁর মনে হয়েছে।[৬৬] মনে হয় পূর্ববঙ্গে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করার উদ্যোগ এই সময়ে শুরু হয়েছিল। এর ব্যাপক প্রসার লাভ করে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ক্রান্তিকালে আধা-স্বাধীন জমিদারদের উদ্যোগে। সুতরাং তরফদার যে অপরিবর্তনীয় গ্রাম্য জগতের কথা বলেছেন, সেটা বদলানো দরকার। এটাও বদলানো দরকার যে মধ্যযুগে গ্রামেই অধিকাংশ লোক বাস করত।

সাত

সুলতানী যুগে বাংলার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মূলে ছিল রেশম শিল্প, আখের ও তুলোর চাষের প্রসার যার জন্য জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা শুরু হয়েছিল। এই সময় থেকেই বহির্বাণিজ্যর উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর তুলনায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বহির্বাণিজ্যের যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল, সেটা চীনাদের লেখা থেকে আগে আমরা দেখেছি। আরো পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগীজদের লেখা থেকে। নীহাররঞ্জন রায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এই পুনরুত্থানের জন্য দায়ী দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নূতন রাজ্যগুলির উত্থান ও তার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ।[৬৭] এই বক্তব্য আপাতগ্রাহ্য হলেও কালক্রমে খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে ঐ বাণিজ্যের তথ্য খুব কম। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পাই।

ঐ সময়কার ইতালীয়ান ভ্রমণকারী লুডভিকো দ্য ভারথেমার[৬৮] লেখা থেকে

জানা যায় যে সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে তাঁতের ও রেশমের কাপড় নিয়ে বছরে পঞ্চাশটি জাহাজ ছাড়ে। সারা ভারত, তুর্কী দেশ, সিরিয়া, পারস্য ও আরব দেশে জাহাজগুলি যায়। উল্লেখযোগ্য যে ভারথেমা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যের কোন উল্লেখ করেননি।

ওঁর লেখাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তী ভ্রমণকারীদের লেখায় প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। দুয়ার্তে বারবোসা[৬৯] বলেছেন যে ভারতীয় জাহাজ বাংলা থেকে করমন্ডল, খাম্বাজ, মালাক্কা, সুমাত্রা, পেগু, সিংহল ইত্যাদি দেশে যাচ্ছে। ওঁর লেখা থেকে মনে হয় যে এই বণিকরা মুসলমান, কারণ এদের বিলাসী জীবন যাত্রার কথাও বলেছেন। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে গুজরাতী হিন্দু ও জৈন বণিকরা এসময়ে বাংলায় বসতি করে বাণিজ্যে করত না। এই মুসলমানরা ভারতীয় কিনা বলা শক্ত। বারবোসা বলছেন যে দেশের ভিতরে বড় শহরে (সম্ভবত গৌড়ের কথা বলছেন) বহু আরবিক ও পারসিক বণিক থাকে। এটা যে অনুমান নয় সেটা বোঝা যায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগীজ দোভাষী গৌড় দরবারে সুলতান নসরৎ শাহর সময়ে উনি তুর্কী ও পারসিক বণিকদের উপস্থিতির কথা বলেছেন যারা চাইছিল পর্তুগীজদের বাংলাতে বাণিজ্য অধিকার দেওয়া বন্ধ করত।[৭০]

উল্লেখযোগ্য যে বারবোসা প্রধানত তাঁতের কাপড়ের কথা বলেছেন, রেশমের কাপড় নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি। আরো উল্লেখযোগ্য যে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে রেশমের উল্লেখ বিরল। বলা যেতে পারে যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রেশমের বাণিজ্য যে উচ্চশিখরে পৌঁছেছিল, সে অবস্থা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল না। সুতরাং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ সুলতানী যুগের শেষ পর্যন্ত বাংলায় তাঁতের কাপড়ই ছিল বহির্বাণিজ্যের মূলস্তম্ভ। সপ্তগ্রাম থেকে কলিকাতা পর্যন্ত ভাগীরথীর দুপাড় ধরে যে ছোট ছোট শহরগুলি গড়ে উঠেছিল, তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন ও বাণিজ্যের তাগিদেই এগুলি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।[৭১] এই বাণিজ্যের বিস্তৃতির কথা পর্তুগীজ লেখক জোয়াও দ্য ব্যারোস[৭২] বলেছেন, যাঁর মতে বাংলার বাণিজ্য গুজরাট ও বিজয়নগরের সম্মিলিত বাণিজ্যের থেকে বেশি।

আগেই আমরা দেখেছি যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলার অর্থনীতি একটা নূতন মোড় নিতে শুরু করেছিল। এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে চরকার আবির্ভাব। তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের বিস্তার

লাভের জন্য যে চরকা দায়ী সে নিয়ে সন্দেহ নেই। ইরফান হাবিব[৭৩] দেখাচ্ছেন যে চরকা ব্যবহার করার ফলে উৎপাদন প্রায় ছয়গুণ বেড়ে গিয়েছিল। বারবোসা চরকার উৎপাদনের কথা বললেও, আশ্চর্য হননি। চরকা ততদিনে বাঙালী জীবনে অভ্যস্ত যন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরপরেও বহির্বাণিজ্যর চাহিদা বাড়ছিল কারণ মেয়েরা চরকার কাজ করতে শুরু করে দেয়। অর্থাৎ ছয়গুণ উৎপাদন বেড়ে যাবার পরও বাণিজ্যের চাহিদা বেড়ে চলেছিল। এই বহির্বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলায় মূল্যমান বিশেষ বাড়েনি, যা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। উৎপাদন বেড়ে যাবার ফলে মূল্যমান বাড়েনি, যদিও প্রাক-সুলতানী যুগের সঙ্গে এই যুগের ফারাক ছিল বেশি।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের পর্তুগীজ লেখক টমে পিরেস[৭৪] মালাক্কা থেকে লিখছেন যে এখানে প্রচুর বাঙালী বণিক বাস করে। কিন্তু তিনি বলেননি যে এরা হিন্দু না মুসলমান। সম্ভবত এরা মুসলমান কারণ এই শতাব্দীর শেষ দিকে মুকুন্দরাম লিখছেন যে সপ্তগ্রামের বণিকরা কোথাও যায় না।[৭৫] উনি যে হিন্দু বণিকদের তালিকা দিয়েছেন[৭৬], তারা সবাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বণিক, এরা ঐ বাণিজ্য ছাড়াও, বহির্বাণিজ্যর বণিকদের মাল জোগান দেয়। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে "দালাল" শব্দটি পাওয়া যায় না। সুতরাং এঁরা ঐ কাজ করতেন এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না।

চৈতন্যর আবির্ভাবের পরে বহু বণিক সপ্তগ্রাম ছেড়ে নদীয়া, শান্তিপুর ইত্যাদি জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেন। বৈষ্ণবরা দাবী করে যে এরা বৈষ্ণব হয়ে সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে আসে। এ মত কতটা মেনে নেওয়া যায় এটা ভাবা দরকার। অন্তত আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমল থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান শাসকরা বৈষ্ণদের কাজে কোন বাধা দেননি, সম্ভবত এই কারণে যে বৈষ্ণবরা ব্রাহ্মণদের বিরোধী। যদিও বৈষ্ণবরা মুসলমান শাসকদের সন্দেহ করত, কিন্তু হিন্দু সমাজের এই বিভাজন ও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য খর্ব করার প্রচেষ্টায় মুসলমান শাসকরা বাধা দেয়নি। এর বড় প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্যর "কাজীদলনের" প্রচেষ্টার মধ্যে। নদীয়া শহরে সন্ধ্যায় মশাল নিয়ে শোভাযাত্রা করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করলেও নদীয়ার কোতোয়াল শোভাযাত্রা থামানোর কোন চেষ্টা করেনি। এর পরে কাজীর বাড়ি আক্রমণ করে বাগান ধ্বংস করার পরেও সপ্তগ্রামের শাসকরা বৈষ্ণবদের কিছু বলেনি।[৭৭] সুতরাং সপ্তগ্রামের বণিকরা কেন সপ্তগ্রাম শহর ছেড়ে ভাগীরথীর পাড়ে

ছোট ছোট শহরগুলিতে আসতে আরম্ভ করলেন, এটা ভেবে দেখা দরকার।

চৈতন্য চেষ্টা করেছিলেন যে উৎপাদনকারী, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তোলা, যাতে এই বৈষ্ণব বণিকরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকেই সপ্তগ্রামে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। মুঘল-আফগান যুদ্ধের ফলে শের শাহর দুবার গৌড় আক্রমণ ও লুট সপ্তগ্রামের প্রধান পশ্চাদভূমিকে বিনষ্ট করে দেয়। এর পরে হুমায়ুনের আবির্ভাব ও হোসেন শাহী বংশের লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় গৌড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে উঠে। এর সঙ্গে দেখা যায় সরস্বতীর ধীরে ধীরে মজে যাওয়ার কাহিনী। এর ফলে পর্তুগীজরা বেতোড়ে বড় জাহাজ থেকে ছোট ছোট নৌকা করে মাল নিয়ে সপ্তগ্রামে আসছে।[৭৮] ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে তত জল নেই তখনো যে বড় জাহাজ যেতে পারে। ১৫৬৩ সালে পর্তুগীজরা ভাগীরথীর উপরে হুগলীর পত্তন করলে সম্ভবত বড় জাহাজ ভাগরথী দিয়ে আসতে পারে। এই অবস্থায় বৈষ্ণব বণিকরা ভাগীরথীর উপরের ছোট ছোট শহরে আশ্রয় নিচ্ছে, কারণ তারা বুঝতে পারছে যে সপ্তগ্রামের ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং এটা যে শুধু বৈষ্ণব ধর্মের তাগিদে ছিল না এটা বলাই বাহুল্য।

বৈষ্ণব বণিকরা সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও সপ্তগ্রাম হিন্দু শূন্য হয়ে যায়নি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী পরিব্রাজক ভিনসেন্ট ল্য ব্লঁ[৭৯] সপ্তগ্রামের বাজারের কাছে মুরগী কিনতে গিয়ে বহু মন্দিরে পুজোর আওয়াজ শুনেছেন। কিছু লোক ওঁকে জীবন্ত পাখী ছেড়ে দেবার কথাও বলছিল। উল্লেখযোগ্য যে শেষ যুদ্ধের আগে বাংলার শেষ সুলতান দাউদ কাররানী তাঁর পরিবার ও ধনরত্ন সপ্তগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। ১৬৩২ সাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম বন্দর যে চলছিল, তার প্রমাণ রয়েছে।[৮০]

হোসেন শাহী আমলে সুলতানরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নিজের জাহাজে বাণিজ্য করতেন।[৮১] সম্ভবত এই কারণেই বাংলার বন্দরের আমলারা বণিকদের উপর অত্যাচার করত।[৮২] এর মধ্যে পর্তুগীজরা বাংলায় কুঠি বানানোর ও বাণিজ্য করার অধিকার চাইলে বাংলার কর্জনা সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়।[৮৩] এরা প্রধানত মালের জোগানদার হলেও, এরা তুর্কী, আরবী ও পারসিক বণিকদের সঙ্গে ছিল, যারা পর্তুগীজদের বিপক্ষে। পর্তুগীজরা মালাক্কা দখল করলে ছবিটা বদলে যায়।

পিরেসের লেখা[৮৪] থেকে বোঝা যা বাংলাতে মধ্যপ্রাচ্যর বণিকরা ছাড়াও গোয়া, দাভোল ও চাউলের বণিকরা আসতেন, যাঁরা ছিলেন সম্ভবত পর্তুগীজ। পিরেস বলছেন যে বাংলা থেকে বছরে দুটি জাহাজ মালাক্কাতে যায় ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার

নানা ।কম পণ্য বাংলাতে নিয়ে আসে। বাংলার বন্দরের শুল্ক মালাক্কা বন্দরে তুলনায় বেশি। মালাক্কার তুলনায় বাংলাতে রূপোর দাম কম, কিন্তু সোনার দাম বেশি। এটা পরিষ্কার যে সুল্ক বেশি থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রচুর পরিমাণ রূপো বাংলাতে আসছে। সম্ভবত দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে রূপো বেশি আসছে না, বেশি আসছে পণ্য। পর্তুগীজরা মালক্কা দখল করার পর বাংলার প্রধান বাজার হয়ে দাঁড়ায় মধ্যপ্রাচ্য। পর্তুগীজরা সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহর দুটি জাহাজ মালাক্কাতে লুঠ করলে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার প্রধান হয়ে যায়। সম্ভবত এই পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে গুজরাতী বণিকরা পশ্চিম উপকূলে যেমন পর্তুগীজদের সঙ্গে হাত মেলায়, তেমনি পূর্ব উপকূলেও পর্তুগীজ বাণিজ্যকে সাহায্য করতে থাকে। এর ফলে তারা বাংলায় বাণিজ্য আবার শুরু করে। চীনের বাণিজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বন্ধ হয়ে গেলেও মালক্কা পর্তুগীজদের দখলে গেলেও, বাংলার বাণিজ্যর বিশেষ ক্ষতি হয়নি। পর্তুগীজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুজরাতীরা মালাক্কার মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চালাতে থাকে।

আট

বক্তিয়ার খলজীর সতেরজন অশ্বারোহীকে নদীয়ার দ্বাররক্ষকরা মনে করেছিল অস্ত্র বিক্রেতা।[৮৫] এ রকম মনে করা স্বাভাবিক কারণ লক্ষণাবতীর কাছে একটা ঘোড়া বিক্রীর বাজার ছিল। হিমালয় অঞ্চল থেকে আসত টাঙ্গন ঘোড়া, যেগুলি পরবর্তীকালের বাংলার *মঙ্গলকাব্যে* জমিদার-বণিক নৌকা করে বাণিজ্যের জন্য নিয়ে যেত। বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ পাটনার বিপরীত দিকে হাজীপুরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি উত্তর ভারত থেকে আসা ঘোড়া বিক্রীর কেন্দ্র হয়ে যায়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ হাজীপুরে লোক রেখেছিলেন ঘোড়া কেনার জন্য। কি পথে লক্ষণাবতীতে প্রথম দিকে ঘোড়া আসত পরিষ্কার নয়। পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে আর একটি পথ ছিল নদীপথে চট্টগ্রামে ঘোড়া আনা। মনে হয় চীনদেশের বহির্বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে স্থলপথের এই বাণিজ্য জোর ধাক্কা খায়। ততদিনে বর্মা থেকে রূপো আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।[৮৬] পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই আরাকান ও ত্রিপুরার আগ্রাসী ভূমিকার ফলে চট্টগ্রামের শাসনের হাত বদল হচ্ছে। পর্তুগীজদের আসার পর অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর বাংলার সুলতানদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে।[৮৭] এর ফলে বাংলার বহির্বাণিজ্য ভাগীরথী দিয়ে চলতে থাকে, যার ফলে গৌড় সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি

হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ভাগীরথীর দুপাড়ের নগরায়ণের কথা পাওয়া যায়। সম্ভবত ভাগীরথী দিয়ে পণ্য চলাচল শুরু হয়েছিল বলেই এই নদীর পাড়ের নগরায়ণ শুরু হয়। দুপাশের ছোট ছোট শহরে চাল ও তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন চলছে এবং এগুলিই ছিল প্রধান পণ্য। সমকালীন বাঙালী কবিদের জমিদার-বণিক অবশ্য বিভিন্ন ধরনের ফল, টাঙ্গন ঘোড়া ও অন্যান্য পণ্য নিতেন যার মধ্যে মশলাও ছিল। এ সবের থেকে আমরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কারিগরদের কথা পাই। পর্তুগীজদের, চীনাদের ও মুকুন্দরামের দেওয়া কারিগরী পেশার তালিকা তেকে বলা যায় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় কারিগরদের যে পেশা ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এই অপরিবর্তনীয় উৎপাদন পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তৃতি বিস্ময়কর। মধ্যযুগের বাংলার নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ না হওয়ায় কারিগরদের কর্মপদ্ধতি ও কুশলতা বিশেষ জানা যায় না। ১৫৩৮ সালে হুমায়ুণের সহযোগী[৮৮] বলেছেন যে হুমায়ুণ গৌড়ে ঢুকে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং গৌড়ের নাম বদলে জিন্নতাবাদ রাখেন। যেটি স্বর্গের সমান। বাড়ির মধ্যে বিভিন্ন রঙের টালী বসানো দেওয়ালের কথা বলেছেন। এই ধরনের একটি মেঝে গৌড় প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে গৌড় ও সপ্তগ্রাম থেকে একই ধরনের পোর্সিলিনের খোদাই করা পাত্র পাওয়া গিয়েছে। এখনো বলা হচ্ছে, যদিও প্রচুর বিতর্ক হয়েছে, যে এগুলি চীন দেশেই করা হয়েছিল। ১৫২১ সালে পর্তুগীজ দোভাষী গৌড় শহরের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি উত্তর ভারতের শহরের মতই।[৮৯]

আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আগে মাত্র দুটি সোনার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। হোসেন শাহর রাজত্বকালে আর দুটি পাওয়া যায়। ওঁর পরে আর কারুর সোনার মুদ্রা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই উত্তর ভারতের তুলনায় বাংলার রূপোর তঙ্কায় রূপোর পরিমাণ বেশি। এর থেকে পরিষ্কার যে বাংলায় বাইরে থেকে রূপোর আমদানি কমেনি। বহির্বাণিজ্য ঠিকমত চলছিল বলে রূপোর ঘাটতি হয়নি। তুলনায় সোনা কম আসছে, ফলে বাংলায় সোনার দাম বেশি। তরফদারের মতে সোনার মুদ্রা আনুষ্ঠানিকভাবে বের করা হত ও বাকিটা জমানো হত। প্রথমটা মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সোনার অলংকার করার প্রবণতা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে চিরকালই ছিল। সেটা সোনা-রূপার মূল্যমানের হারের উপর নির্ভর করত না।[৯০]

নয়

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের পর্তুগীজদের লেখা থেকে উচ্চবিত্তদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায়। উঠতি মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা যায় রাজকার্যে নিযুক্ত কায়স্থদের, যাদের উল্লেখ বৈষ্ণব কাব্যে রয়েছে, ছোটখাট বণিক এবং পেশাদারী কিছু লোক, যেমন কবিরাজ, শিক্ষক ইত্যাদি। এছাড়া এই গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায় ছোটখাট ভূস্বামীদের (প্রধানত তালুকদার) এবং স্বচ্ছল কৃষকদের, যারা ভূমিহীন কৃষকদের দিয়ে কাজ করায়।[৩২] তরফদার সঙ্গতভাবেই এই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাহ্মণ শিক্ষকদেরও ধরেছেন, যারা টোল চালিয়ে ও চণ্ডীমণ্ডপে শিক্ষা দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন। এদের কারুরই বিলাসবহুল জীবন-যাত্রা ছিল না, কিন্তু স্বচ্ছল অবস্থা ছিল।[৩৩] গ্রামে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের জমিজমা ছিল। নদীয়া শহরে কোন শিক্ষকের নিজের বাড়ি ও চণ্ডীমণ্ডপ ছিল যেখানে একশোর বেশি ছাত্র পাঠ নিত।

নীচুতলার লোকেদের কথা খুব কম পর্যটকই লিখেছেন। ১৫২১ সালের পর্তুগীজ দোভাষী দেখেছেন যে শীতের সকালে গৌড়ের রাস্তায় লোক মনে আছে। আর এক সময়ে তিনি দেখেছেন যে সুলতান খাদ্য বিতরণ করছেন।[৩৪] ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে এই শ্রেণীর লোকেরা নবদ্বীপের প্রান্তে বাস করত বিভিন্ন মহল্লায়। এদের একজনের বাড়িতে চৈতন্য যেতেন যিনি খড় বেচে সংসার চালাতেন। শহরের হিন্দুরা একে গালিমন্দ দিত। এই ধরনের লোকেদের কথা সব থেকে ভালো পাওয়া যায় মুকুন্দরামের লেখায়।

মুকুন্দরামকে সব সমালোচকই মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন। বর্ধমান জেলায় রত্না নদীর ধারে দামুন্যা গ্রামে ওঁর পূর্বপুরুষের জমিজমা ও ভিটেবাড়ি ছিল। সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম লোক দিয়ে চাষবাস করে সুখে কালপাত করছিলেন।[৩৫] মুঘল বিজয়ের পর রাজা মানসিংহ সুবাদার হয়ে এসে *জাবতী* প্রথা চালানোর চেষ্টা করা হয় বর্ধমানে, যার মধ্যে জমি জরীপ করা ছিল অত্যাবশীয় অঙ্গ। মুকুন্দরামের আত্মকথাতে জানা যায় যে ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের ফলে তিনি সপরিবারে গৃহত্যাগ করেন ও নদী পার হয়ে জমিদারের কাছে আশ্রয় পান। ওখানেই উনি *চণ্ডীমঙ্গল* লেখেন। এই লেখার মধ্যেকার কিছু বক্তব্য আমরা এখানে আলোচনা করলে সমকালীন বাংলার একটা অংশের ছবি পাব। ওঁর বক্তব্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, নানারকম মত প্রকাশ করা হয়েছে।[৩৬] আমরা এখানে ঐ সব বিতর্কের মধ্যে

না গিয়ে ওঁর বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

মুকুন্দরাম বলেছেন যে ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের ফলে তিনি সপরিবারে গৃহত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগের কাল নিয়ে বিতর্ক আছে।[৯৭] যেহেতু মান সিংহের উল্লেখ আছে, অতএব মান সিংহের প্রথম সুবাদারীর সময় (১৫৯৪ খ্রি) এই গৃহত্যাগ হয়েছিল ধরা যেতে পারে। রচনাটি সম্ভবত শেষ হয় আরো পরে।

বিতর্ক আছে "ডিহিদার" শব্দটি নিয়ে। উত্তর ভারতে এ শব্দ বিরল। একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে ক্ষুদিরাম দাস লিখছেন যে "ডিহিদার" হচ্ছেন গ্রাম-প্রধান বা দু-চারটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চলের শাসন কর্তা।[৯৮] নানা কারণে এমন মানা যায় না। সুলতানী যুগের শেষদিকে বা মুঘল যুগের প্রথমে বা পরে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকে কখনো "ডিহি" বলা হয়নি। সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে সুলতানী যুগের শিলালেখ থেকে বোঝা যায় "ডিহি" বলতে বড় অঞ্চলকে বোঝায়। এটিও মানা শক্ত।[৯৯] সপ্তদশ শতকের শেষে "ডিহি কলকাতা" বলে যে অঞ্চলকে বোঝানো হচ্ছে, সেটি একটি গ্রাম মাত্র, যার লাগোয়া অন্য গ্রাম ছিল অন্য নামে। মুঘল যুগে ফার্সী শব্দ " দেহ" থেকে "ডিহি" শব্দটি এসেছে। এখানে জমি জরীপ করার ব্যবস্থা হলে ডিহিদার নিয়োগ করা হয়, যিনি জমি জরীপ করে করের হার নির্ধারণ করবেন ঐ গ্রামের জমিতে।[১০০] এর ফলে ডিহিদারের হাতে লস্কর পেয়াদা ইত্যাদি ছিল, কিন্তু তিনি যে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এটা মুকুন্দরামের রচনায় পাওয়া যায় না।

মুকুন্দরাম বর্ণিত উজীরকে ক্ষুদিরাম দাস সমগ্র বাংলার উজীর বলে ধরেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই এমন গ্রহণ করেননি।[১০১] মুঘল যুগে বাংলায় কোন উজীর ছিল না। ঐ সময় যে দুটি উচ্চপদ ছিল, সেগুলি হচ্ছে *সুবাদার* ও *দেওয়ান-ই সুবা।* সুলতানী যুগের সাহিত্যে ও শিলালিপিতে বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ে উজীরের কথা পাওয়া যায়। সুলতানী যুগে উজীর ছিলেন কোন বিশেষ অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের আমলা। এদের উপরেই সম্ভবত কেন্দ্রীয় উজীর ছিলেন।[১০২] কিন্তু দামুন্যা গ্রামের আর্থিক ভারপ্রাপ্ত উজীরের সঙ্গে সারা বাংলার উজীরের কোন মিল নেই।

ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচার কিরকম ছিল তার বর্ণনা কবি দিয়েছেন। প্রধানত জমি জরীপ করে বিঘা কম দেখিয়ে খাজনা নগদ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছিল।[১০৩] ক্ষুদিরাম দাসই প্রথম যিনি এটিকে জাবতী প্রথা প্রবর্তন বলে ধরেছেন। আমরা আগেই দেখেছি যে সুলতানী যুগে জমি জরীপ করার রেওয়াজ ছিল না। হাল

পিছু একটা নির্দিষ্ট টাকা খাজনা হিসাবে নেওয়া হত।[১০৪] এই প্রথার বদল করে ডিহিদারের লোকেরা বিশ কাঠার বিঘা ধরার বদলে পনের কাঠা হিসাবে বিঘা ধরেছে এবং বিঘা প্রতি ফসলের উপর কর নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও অনাবাদী জমিকে আবাদী ধরে তার উপর কর নেওয়া হতে থাকে।[১০৫]

বিভিন্ন পণ্ডিতরা এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দিয়েছেন, সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমেই বলা দরকার যে মধ্যযুগের ভারতে এবং বাংলাতেও ভূমির উপর কোন কর ছিল না। কর সব সময়ই নেওয়া হত ফসলের উপর থেকে *খারাজ*, *মাল* ইত্যাদিভাবে বলা হত। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী পর্যটক ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার সব জমিই রাজার বলে ধরেছেন এবং ইউরোপীয় প্রথায় জমির উপর করকে "রেন্ট" (Rent) বলে ধরেছেন।[১০৬] ইংরাজরা ক্ষমতা পাবার পর জমির উপর কর বসায়, যার থেকে ভূমি রাজস্ব কথাটা এসেছে। মুঘলদের সময়ে ফসল না হলে কর দেওয়া হত না বলে রাজশক্তি সব সময়ে চেষ্টা করেছে অনাবাদী জমি আবাদী করার জন্য এবং লোক বসতি করলে বিশেষ ছাড় ও অন্যান্য সুবিধাও পাওয়া যেত। বিভিন্ন ধরনের ফসলের উপর বিভিন্ন ধরনের করের হার ছিল। রাজা মান সিংহ বাংলায় আসার আগে (১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের আগে) আকবর *আইন-ই দশশালা* চালু করেন (দশ বৎসরের নিয়ম)। যে প্রদেশে সবটা জমি জরীপ করা যায়নি, যেমন বাংলাতে, সেখানে বিভিন্ন জায়গার অংশ বিশেষ জরীপ করে কত ফসল হচ্ছে তা নির্ধারণ করা হত। এরপর ঐ ফসলের পরিমাণ ও খাজনার হার একই পরিমাণ অনাবাদী জমিতে লাগানো হত খাজনা সংগ্রহ করার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল অনাবাদী জমিতে ফসল করা যাতে খাজনা বাড়ে।[১০৭] মুকুন্দরাম করের হার বাড়ানোর কথা বলেননি, স্বভাবতই মনে করা যায় যে পুরানো হারই বিঘা প্রতি হিসাব করে নেওয়া হচ্ছিল। যেটিকে অত্যাচারের অঙ্গ বলে মুকুন্দরাম ধরেছেন, সেটি করের হার নয়। সেটি ছিল জোর করে নগদে খাজনা আদায় করা।[১০৮]

মুকুন্দরামের প্রধান অভিযোগের একটি ছিল যে কুড়ি কাঠায় এক বিঘা না ধরে পনের কাঠায় এক বিঘা ধরা হচ্ছে ও তার উপর বিঘাপ্রতি ফসলের জন্য কর নেওয়া হচ্ছে। এই বিঘার মাপ করা হচ্ছে দড়ি দিয়ে। সিকান্দার লোদী নূতন মাপ তৈরি করেন যাকে *সিকান্দারী গজ* বলা হত এবং যেটি শের শাহ ও ইসলাম শহর সময়ে বলবৎ ছিল। ১৫৮৩ সালে আকবর *গজ-ই ইলাহী* চালু করলে *সিকান্দারী গজ* বাতিল হয়ে যায়। এই *ইলাহী গজে* যে নূতন বিঘা তৈরি হয়, সেটি ছিল পুরানো

বিঘার থেকে ১০১/২% ভাগ কম। অর্থাৎ আবুল ফজল বলছেন যে নূতন বিঘা পুরানো বিঘার থেকে ছোট। এই নূতন বিঘা হওয়া উচিত ছিল ১৭১/২ কাঠায়। কিন্তু মুকুন্দরাম বলছেন যে ডিহিদার এই বিঘাকে নূতন ভাবে মেপে পনের কাঠায় নিয়ে এসেছে।[১০৯] বিঘা ছোট করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, তবে আকবরী মাপ থেকে ২১/২ কাঠা কমিয়ে ডিহিদারের কোন লাভ নেই বলে মনে হয়। মুকুন্দরাম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ডিহিদার ঘুষও নেয় না।[১১০] বলা যেতে পারে যে বহু পরে মুকুন্দরাম এটি লিখছেন বলে তাঁর আড়াই কাঠা ভুল হয়েছিল। এটি যে সুবাদারের ব্যাপার নয়, সেটা মুকুন্দরাম বুঝেছিলেন, কারণ মান সিংহর প্রশস্তি (হিন্দু বলে নয়) করেছেন। এটি সাম্রাজ্যের নীতি ও সেটি রূপায়ণ করছিলেন *দেওয়ান০ই সুবা*।[১১১] পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, জমি জরীপ ও *জাবতী* প্রথার প্রসার হয়।

বিঘা কমানো ছাড়া আর একটি অভিযোগ মুকুন্দরামের ছিল। উনি বলেছেন যে ওঁর গ্রামে পোদ্দার ছিল, যার কাজ ছিল টাকা বদল করা।[১১২] এটা আশ্চর্যর বিষয় যে দামুন্যার মত একটা সাধারণ গ্রামে এই ধরনের লোক রয়েছে। ততদিনে অবশ্য গ্রামের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ডিহিদারের "অত্যাচারের" ফলে প্রজারা ধান, গরু ইত্যাদি বেচে পালাতে চেষ্টা করছে যার ফলে টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে। ডিহিদার গ্রামের সীমানায় পাহারা বসিয়েছেন। ধান বা গরু কেউই কিনতে রাজি হচ্ছে না। পোদ্দার টাকায় আড়াই আনা কম দিচ্ছে বা বাট্টা কেটে নিচ্ছে, যেটি খুব বেশি। গ্রামের তালুকদার গোপীনাথ নন্দী এর বিরুদ্ধতা করায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। প্রজাদের নানান অনুরোধ-উপরোধে কোন কাজ হয় না। ফলে অন্যদের মত মুকুন্দরাম গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গ্রাম ত্যাগ করেন।[১১৩]

এখানে পোদ্দারের উপস্থিতি আশ্চর্যজনক। মনে করা যেতে পারে যে নগদ টাকায় গ্রাম থেকে খাজনা তোলার কথা হলে পোদ্দারকে আনা হয়েছিল। মুকুন্দরাম পোদ্দারকে চিনতেন না এবং তার নামও দেননি বলে এই সন্দেহ আসে। অন্যদিক থেকে বলা যায় যে দামুন্যা গ্রামটি ছিল বড় এবং সঙ্গে বাজার ছিল। রত্না নদীর ধারে গ্রামটি থাকায় এ মত গ্রহণ করা যায়। এর ফলে পোদ্দারের উপস্থিতিতে আশ্চর্যর কিছু নেই। এই "অত্যাচারের" কাহিনীর মধ্যেও মুকুন্দরাম বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জগতের যে ছবি দিয়েছেন, সেটি অনন্য। বাংলায় ষষ্ঠদশ শতকের শেষে যে নূতন প্রাণ-স্পন্দন হচ্ছে এবং সেটি যে পরম্পরার সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে, তার

ইতিহাস আমরা এবার দেখব।

দশ

মুকুন্দরামের অনন্য চিত্র দেখার আগে আমরা একটি লেখা আগে দেখব, যেটি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার কথা বললেও সুলতানী যুগের চরিত্র নিয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ১৫৭৫ সালে লেখা দ্বিজ বংশীদাস[১১৪] কাজীর সঙ্গে হিন্দুদের যে সংঘাতের বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মতই চেহারা নিয়েছিল। কাজী সব মুসলমানকে ডাকছেন ব্রাহ্মণদের ধর্মান্তরিত করার জন্য। কাজী হিন্দুদের লেখায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মান্ধ ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্য অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে কাজীকে নরম করে দেখিয়েছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কাজীর সাম্প্রদায়িক চেহারা বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ও পরবর্তীকালের কোন কোন ঐতিহাসিক কাজীকে সরকারী আমলা হিসাবে ধরেছেন। এটি সঠিক বলে ধরা যায় না। সরকার কাজীকে নিয়োগ করে ঠিকই, তবে কাজীর নীতি সরকারী নীতি নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী[১১৫] বলেছেন যে কাজী মুখীসুদ্দীন আলাউদ্দীন খলজীর রাষ্ট্রনীতি ধর্মের পথে চালিত করে হিন্দু কাফেরদের উচ্ছেদ বা দমন করার কথা বলেছিলেন। সুলতান জানিয়েছেন যে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি আলাদা এবং রাষ্ট্র ধর্মের সব অনুশাসন মানে না। সুলতানী যুগের কবিরা এটা জানতেন। তাঁরা কাজীকে ধর্মান্ধ ও অত্যাচারী বলে বর্ণনা করলেও, সুলতানের প্রশস্তি করেছেন।[১১৬] এখানে বলা দরকার যে প্রধানত ক্রান্তিকালে ও প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে কাজীর অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল যার মূলে ছিল কেন্দ্রের প্রশাসনিক দুর্বলতা। নবদ্বীপ শহরে কাজী কীর্তন বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন প্রধানত শহরের ব্রাহ্মণদের অভিযোগক্রমে। কাজীর সঙ্গে গোলমালের পর চৈতন্যর কোন শাস্তি হয়নি। সাম্প্রতিক কালের কোন কোন ঐতিহাসিক কাজীর অত্যাচারকে সমগ্র হিন্দুদের উপরে মুসলমান রাষ্ট্রর অত্যাচার বলে ধরেছেন।[১১৭] এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটুকু অবশ্য বলা যায় যে রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে কাজীরা অত্যাচার করেছিলেন। বাংলার বা দিল্লীর সুলতানরা যে ঐ নীতি মেনে চলেছিলেন এর দৃষ্টান্ত বিরল।

এগারো

মুকুন্দরামের রচনায় দুটি বিপরীত চিত্র দেখা যায়। প্রথমটি তাঁর আত্মকাহিনীর

অন্তর্গত, যেখানে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে প্রজারা গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। ওঁর দ্বিতীয় চিত্র হচ্ছে নূতন নগর বসানো হচ্ছে, তার বর্ণনা। এই নূতন নগরের নাম উনি দিয়েছেন গুজরাট। এখানেও শহরের সঙ্গে লাগোয়া জমি আছে, যেটি মধ্যযুগের চিরাচরিত প্রথা। বলরাম মণ্ডল জমির বিলিব্যবস্থ করে লোক বসাচ্ছে, এমন কি কৃষকদের পাট্টা দিচ্ছে।[১১৮] একাজ বসরাম করার অধিকারী ছিল কিনা বলা শক্ত। সাধারণত সরকার এই পাট্টা দিতেন। নূতন জন-বসতিতে যে জমিদার বা মোড়ল বিশেষ অধিকার পেয়েছিল সন্দেহ নেই। মুঘল আক্রমণের আগে বা পরে জমিদার ও মোড়লরা যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এটি তারই ইঙ্গিত। এই বলরাম মন্ডল বিগত শতাব্দীর বিপ্রদাস পিপলাইর "প্রধান কিষাণ", যদিও বিপ্রদাস জনবসতি তৈরি করার কথা বলেননি। মুকুন্দরামের বলরাম কৃষকদের কৃষি ঋণ দিচ্ছে *(তাকাভী)* গরু, বীজ, ধান, দড়িদড়া কেনা ও বাড়ি তৈরি করার জন্য। বলা হচ্ছে যে বসতির জন্য সালামির প্রয়োজন নেই। ধানের বিক্রীর উপরও কর নেই।[১১৯] ভাগীরথীর তীরে যে বসতিগুলি গড়ে উঠেছিল, এটি তার এক পরিষ্কার বর্ণনা।

মুকুন্দরামের বসতির মধ্যে মধ্যবিত্ত রয়েছে। বলা হচ্ছে যে কায়স্থদের জমি আলাদা করে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে।[১২০] সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বৈষ্ণব কবি বলছেন যে কায়স্থরা রাজকার্য করে ও অত্যন্ত লোভী।[১২১] এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে বসতি স্থাপন করার পিছনে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও, উৎসাহ ছিল। সম্ভবত কায়স্থরা তারা সুযোগ নিত বলেই এই বসতিতে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য যে এই বসতিতে শাসনকর্তা কে সেটা বলা হয়নি। বলরাম লোক বসানোর পর জমিদার হয়ে যাবার কথা এবং সেক্ষেত্রে জমিদার / তালুকদার শাসনাধীনে এটি চলবে। কিন্তু মুঘল সরকারের নীতি এখানে চালানো হবে না সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে এখানে জমি জরীপ করা হবে না এবং স্বভাবতই ডিহিদার বসানো হবে না।[১২২] অর্থাৎ এটি হবে জমিদারী/তালুকদারী এলাকা যেখানকার অভ্যন্তরীণ নীতি মুঘল সরকারী আইন মেনে চলবে না। এরা হচ্ছে *বাহির-আমলা* জমিদার যারা শুধু পেশকাস দেয় ও প্রয়োজনে যুদ্ধ করে।[১২৩] শেষ দুটি অংশ মুকুন্দরামে অনুপস্থিত থাকলেও, এই ধরনের বসতি যে কবির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়।।

শহরের নাম গুজরাট দিলেও, মুকুন্দরাম তাঁর শহরের মধ্যে বণিকদের বসাননি।

উনি বৈশ্যদের কথা বলেছেন যারা প্রধানত ব্যাপারী ও মহাজনী।[১২৪] বিপ্রদাস শহরের মধ্যে যে "ছত্রিশ আশ্রমের লোক"[১২৫] কথা বলেছেন, সেটিও মুকুন্দরামের শহরে পাওয়া যায় না।

দ্বিজ বংশী দাসের লেখার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়, মুকুন্দরামের লেখায় সেটা পাওয়া যায় না। ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচার যে মুসলমান রাষ্ট্রের অত্যাচার এরকম কোন ইঙ্গিত তাঁর লেখার মধ্যে নেই। দামুন্যা গ্রামে মুসলমান ছিল ওঁর লেখায় পাওয়া যায় এবং এটা পরিষ্কার যে মুসলমান সমাজের সঙ্গে মুকুন্দরামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পাঠানদের মধ্যে যে ভাগ ছিল সেটা উনি বলেছেন। কোন কোন ফকীর যে দশভাঁজ করা টুপী পরে তার কথাও বলেছেন। মোল্লারা মুরগী বা বখরী ঠিকমত জবাই করা হচ্ছে কিনা সেটা সুপারিশ করার জন্য একটা মূল্য পায়। কবির গুজরাট শহরের পশ্চিমদিকে মুসলমানদের জন্য আলাদা মহল্লা করা হয়েছিল। ওখানে মসজিদ ও শিশুদের জন্য মক্তব তৈরি করা হয়েছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রতি তাঁর একটা ক্ষোভ ছিল কারণ তারা মুসলমানদের ধার্মিক অনুষ্ঠান ঠিক মত জানে না। মুসলমানদের বিভিন্ন পেশার কথা বলে কাজীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি।[১২৬] দ্বিজ বংশীদাস যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমকালীন বাংলার সমাজকে দেখেছেন, সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ মুকুন্দরামের লেখায় তার কোন আভাষ নেই। ক্রান্তিকালের এই দুই কবির দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন বাংলার সমাজের মধ্যেকার বিভাজনকে সামনে নিয়ে আসে।

বার

মঙ্গলকাব্যের কবিরা পরম্পরা অনুযায়ী লেখার চেষ্টা করতেন, যার থেকে মুকুন্দরাম পৃথক নন। ওঁর জমিদার-মহাজন পসরা নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে যায় সপ্তডিঙা সাজিয়ে। এই ডিঙা ছিল লম্বায় একশ গজ ও চওড়ায় বিশ গজ, যেটি সমুদ্রের অভ্যন্তরে যাবার মত নয়। ডিঙাতে একটি মাস্তুল আছে। ডিঙা তৈরির ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং শেষ হত নভেম্বর মাসে।[১২৭] ঐ সময় মৌসুমী বাতাস পশ্চিম থেকে পুবে আসছে। সুতরাং বলা যায় যে পুবে যাওয়ার রেওয়াজ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দেশে যাওয়ার প্রথা চালু ছিল, যদিও উড়িষ্যা ও সিংহল ছাড়া আর কোন দেশে যাবার কথা পাওয়া যায় না। যেটা ইতিহাসের সঙ্গে মেলে না সেটা হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলার একটা হাত যে

মধ্যপ্রাচ্যর দিকে ছিল, তার কোন হদিস বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। মুকুন্দরাম পাটন বন্দরের কথা বলেছেন।[১২৮] এটি সম্ভবত অনিলওয়াড়া-পাটন যেটি একাদশ শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যায় ও খাম্বাজ বন্দর তার জায়গায় চলে আসে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে বৈদেশিক বাণিজ্য কেবল পরম্পরাগত লেখা। মুকুন্দরাম ব্যাপারী, বণিক, বাণিয়া ও সওদাগরের মধ্যে কোন তফাৎ করেননি। তাঁর উল্লেখ্য বণিকদের মধ্যে—অধিকাংশই রাঢ়ের অধিবাসী, যদিও রাঢ় সম্বন্ধে মুকুন্দরাম ভালো কথা বলেননি।[১২৯] এরা ছিলেন ব্যাপারী। মুসলমান ব্যাপারীরা যে সাপ্তাহিক হাটে জিনিষপত্র কেনা করছেন, তার কথা বলেছেন।[১৩০]

মুকুন্দরাম সপ্তগ্রাম বা হুগলীর পর্তুগীজদের উল্লেখ না করলেও, ভাগীরথীর মোহনায় হার্মাদের কথা বলেছেন।[১৩১] ভালো করে পড়লে বোঝা যায় যে কবি ঐ জলদস্যুদের উড়িষ্যার কাছে রেখেছেন। এটিই সঠিক অবস্থান। ভাগীরথীর মোহনা দিয়ে ষষ্ঠদশ শতকের শেষে সমুদ্রপথ ছিল না। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বড় জাহাজ বালাসোরে এসে ছোট নৌকা করে মাল ভাগীরথীতে নিয়ে যেত। এই ধরনের যাত্রার অভিজ্ঞতা যে কবির নেই এটাও পরিষ্কার।

মুকুন্দরামের লেখায় শহরে মধ্যবিত্তদের প্রধান হয়ে দাঁড়ানোর কথা পাওয়া যায়। শহরের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকেদের কথাও পাওয়া যায়। এর থেকে শহরে যে দুটো অর্থনৈতিক ধারা চলছিল, এটাও বোঝা যায়। একটি ধারাকে বাজারী অর্থনীতির ধারা বলে ধরা যেতে পারে, যেখানে পণ্য টাকায় বা কড়িতে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে।[১৩২] সাপ্তাহিক হাট বসছে যেটা মিশ্র গ্রামীণ ও শহর সভ্যতার অঙ্গ। এখানে সব কিছু নগদ টাকা বা কড়িতে চলে। নদী পার হতে গেলে পারানীকে কড়ি দিতে হয়; কয়েক কড়িতে ঘাস কাটানো যায়। কিন্তু এখানেও চতুর্বর্ণ রয়েছে যার মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। শহরের প্রান্তে বেশ্যারা রয়েছে। আর এক প্রান্তে দর্জীরা (সম্ভবত মুসলমান) রয়েছে যারা মাস মাহিনাতে কাজ করে। কারিগর মিষ্টান্ন তৈরি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রী করে—উৎপাদক ও মালিক আলাদা হয়ে যায়নি এবং দোকান বসানোর মত লগ্নী নেই। কয়েকধরনের কারিগর শহরের বাইরে থাকে যাদের মধ্যে রয়েছে *মলঙ্গী* বা নুন তৈরির কারিগর। এদের সঙ্গে আছে ডোমেরা যারা অবসর সময়ে কৃষকদের জন্য খড়ের টুপী তৈরি করে। শহর বিন্যাসে চতুর্বর্ণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। মুহম্মদ হাবিব[১৩৩] বলেছিলেন যে তুর্কীরা আসার পর কারিগররা মুক্ত হয়েছিল, তার চেহারা নগর-বিন্যাসে পাওয়া যায় না। এই বাজারী অর্থনীতির

মধ্যে মধ্যবিত্ত পেশাগত লোক উঁকি ঝুঁকি দেয়।

বাজারী অর্থনীতির সঙ্গে শহরে আর একটা সমান্তরাল ধারার কথা মুকুন্দরাম বলেছেন।[১৩৪] এটি বহু প্রাচীন *যজমানী* প্রথা, যার মধ্যে টাকা পয়সার লেনদেন নেই। প্রধানত ব্রাহ্মণরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, প্রধানত মহারাষ্ট্রে, এটি চালু ছিল। এটা পরিষ্কার যে মুকুন্দরামের শহরে এই দুই ধারার কোন বিরোধ নেই।

বাজারী অর্থনীতির যে নূতন প্রাণের স্পন্দনের কথা পাওয়া যায়, সেটি এই সময়ে পূর্ববঙ্গে দেখা যায়। এই বঙ্গেয় শহরের উন্নতির চেহারাটা একটু অন্যরকম পশ্চিমবঙ্গের তুলনায়। দাউদ কাররানীর মৃত্যুর পর কিছু আফগান ও হিন্দু আমলারা পূর্ববঙ্গে পালিয়েছিল। এরা ওখানে আধা স্বাধীন জমিদারী গড়ে তোলে ও মুঘলদের বিরুদ্ধাচরণ করে বাংলা সাহিত্যে "বার ভুঁইয়া" নামে অমর হয়ে রয়েছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে জেসুইট পাদ্রীদের লেখা চিঠি থেকে দেখা যায় যে এই সব ভূস্বামীরা চাল, কাপড় ও চিনির উৎপাদন ও ব্যবসা করে প্রচুর উন্নতি করছে।[১৩৫] এখানে মনে হয় পরাক্রান্ত ভূস্বামীদের থাকার সুবাদে চৈতন্যর আদর্শবাদ বিশেষ আসেনি। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে এই সময়ে মধ্যবিত্তর দেখা পাওয়া শক্ত যেটা আমরা এই সময়ে ভাগীরথীর পাড়ের শহরগুলির মধ্যে পাই। পেশাদার লোক ও কারিগরদেরও বিশেষ উল্লেখ পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে এই সময়ে পাওয়া যায় না।

সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে মধ্যযুগের বিশেষত সুলতানী যুগের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস অপরিবর্তনীয় নয়, যদিও এর কাল খুব ধীর লয়ে চলেছিল। এই সময়ের অর্থনৈতিক ইতিহাস সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আমাদের প্রয়োজন সমকালীন সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারাগুলিকে পরিষ্কারভাবে দেখা।

সূত্র নির্দেশ

১। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাঙলা*, কলিকাতা, ২০০১; (পুনর্মুদ্রণ); দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, কলিকাতা, দুই খন্ড, ১৯৯৩ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৩৫ সংস্করণ); নগেন্দ্র নাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কলিকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ

১৩৩৪ সংস্করণ); জগদীশ নারায়ণ সরকার, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক* (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৯৮ (পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৮ সংস্করণ)।

২। সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী,* বিশ্বভারতী, ১৩৬৯ (পুনর্মুদ্রণ ১৩৫২ সংস্করণ)।

৩। দুর্গাচরণ সান্যাল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, দুই খন্ড, ১৯১১।

৪। মীনহাজ-আস সিরাজ, *তবাকৎ-ই নাসিরী* (বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা এ.কে.এম জ্যাকেরিয়া) ঢাকা, ১৯৮৩।

৫। P.C. Bagchi, "Political Relations between Bengal and China in the Pathan period", *Viswa-Bharati Annals,* 1945, Vol-I, ৯৬-১৩৪, এছাড়া দ্রষ্টব্য Haraprasad Ray, *Trade and Diplomacy in India-China Relations,* New Delhi, 1993.

৬। Mamtajur Rahman Tarafdar, *Hussain Shahi Bengal,* Dacca University, 1999, 2nd revised ed. (first published 1965)

৭। Reena Bhaduri, *Social Formation in Medieval Bengal,* Kolkata, 2001.

৮। অনিরুদ্ধ রায়, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান ঃ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী", নন্দন, আগষ্ট ২০০২, ৩৮ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ২০-২৪।

৯। B.D. Chattopadhya, "Political Processes and Structure of Polity in Early Medieval India Problems of Perspective" in *The Proceedings of the Indian History Congress,* 44th session, 1983, 25-63.

১০। মরিস লোমবার্ড ও কয়েকজন সমকালীন জার্মান ঐতিহাসিকরা হেনরী পিরনের তত্ত্ব *(Historic Ewortmique et Social de l' Inrope,* Belgium, 1934) মানতে চান নি (দ্রষ্টব্য ঃ Maurice Lombard, L'Islam Dans sa Premiere Grandeur, Paris, 1971.)

১১। M. Dobb, *Studies in the Development of capitalism,* London, 1970, reprint ; *M.M. Postan, Medieval Trade and Finance,* Cambridge, 1973.

১২.। R.S. Sharma, *Indian Feudalism,* Calcutta, 1965, অনেকে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন যাদের মধ্যে দ্রষ্টব্য Andre Wink, *Al-Hind,* Oxford University Press, 1990.

১৩। R. S. Sharma, *Urban Decay in India,* C : 300-C, 1000, New Delhi, 1987.

১৪। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৪০০ (পুনর্মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬)।

১৫। ঐ, পৃঃ ৩০৮-১০।

১৬। দ্রষ্টব্য টীকা ১০, ১১।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০, ৩২।

১৮। Maqbul Ahmed, *Arabic classical Accounts of India and China*, Simla, 1980; G. F. Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean, Princeton, 1951.

১৯। মীনহাজ, প্রাগুক্ত, ২৫-২৭।

২০। নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, ৪৪১ হইতে। চর্যাগীতির জন্য দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যর ইতিহাস*, কলিকাতা, চার খন্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১। প্রথম খন্ড ৫৪-৭৫।

২১। সুকুমার সেন, *প্রাগুক্ত*, ৭৮-৭৯।

২২। নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, ২৬৮ থেকে।

২৩। Irfan Habib, "Agarian Economy" in I. Habib & T. Ray Choudhury (ed), *The Cambridge Economic History of India*, Orient Longman, 1984, 2 vol, vol. I, 55-56; A.B. Shamsuddin Ahmed, "Administram Units under the Early Iliyas Shahi Sultans of Bengal" in *Bangladesh Historical Studies*, 991-95, Vol. *XV-XVI*, 1-14.

২৪। তরফদার, *প্রাগুক্ত*, ১১৩-১২৬।

২৫। ঐ।

২৬। ঐ।

২৭। বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভাগবৎ*, নদীয়া, তৃতীয় সংস্করণ, ৮০৩-৮০৪।

২৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, বসুমতি সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭২-৭৩।

২৯। তরফদার, *প্রাগুক্ত*, ১১৩-১১৬। তরফদারের বক্তব্য যে আবুল ফজল ইজারাদারী ও জমিদারী প্রথা গুলিয়ে ফেলেছিলেন (পৃঃ ১১৮) মানা যায় না।

৩০। Ashin Dasgupta, *Indian Merchants and the Decline of Surat, c. 1700-1750*, Weisbaden, 1979 অসীন দাশগুপ্ত সুরাটের খাজনার মধ্যে বন্দরের লাগোয়া জমির খাজনা ধরেননি।

৩১। Abul Fazl. *Ain-i Akbari* (tr. by Garret and annotand by J.N. Sarkar), The Asiatic Society, 1993, II (reprint), 129-162 for Bengal Suba.

৩২। H.A.R. Gibb (tr.) *Ibne battuta,* New Delhi, 1986 (1st ed. 1929), 271. বতুতার মতে এরা হিন্দু এবং এ ছাড়াও তারা অন্যান্য কর দিত।

৩৩। জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল* (এস. মুখোপাধ্যায় ও বি.বি. মজুমদার সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৭১, ১০-১১।

৩৪। মুকুন্দরামের গুজরাট নগরে এই প্রতিশ্রুতি (প্রাগুক্ত, ৩৩৫)। তপন রায় চৌধুরী বলছেন যে বাংলায় জমি জরীপ করা হত (দ্রষ্টব্য, Tapan Roy Choudhury, "Revenue Administration of Bengal in the Early Days of Mughal Rule" in *Journal of Asiatic Society of Bengal,* 17, No. 1, 1951. এ নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Aniruddha Roy, Adventurous, *Landowners and Rebels, Bengal, c. 1575- c. 1715,* New Delhi, 1998.

৩৫। আবুল ফজল বলছেন জমি জরীপ করার জন্য জোর করা হত না এবং চোখে দেখে ফসলএর পরিমাপ নির্ধারণ করা হত। আবুল ফজল আরো বলছেন যে সম্রাট এই প্রথা মেনে নিয়েছিলেন, (*প্রাগুক্ত,* দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৪)

৩৬। বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, Oxford University Press, 1999 (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩), ২৫৪-২৫৯।

৩৭। আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, ১৩৪। উনি বলছেন যে কৃষকরা আট ক্ষেপে খাজনা দেয় এবং সরাসরি মোহর ও রূপোর টাকা নিয়ে আসছে।

৩৮। হাবিব বলছেন যে উত্তরভারতে চতুর্দশ শতাব্দীতে বড় এলাকাগুলি *শিক* বলা হত যার অধিকর্তা ছিলেন *শিকদার*। এর খাজনা সংগ্রহ করার, প্রধানত পরগণা থেকে, কাজ পান ও ক্রমে ছোট খাজনার আমলাতে পরিণত হন (*প্রাগুক্ত,* ৩১৮-১৯)। বাংলাতে ষোড়শ শতাব্দীতে *শিকদারের* বিচার করার ক্ষমতা ছিল (বৃন্দাবন দাস, *প্রাগুক্ত,* ১১৯-১২১)।

৩৯। বতুতা, *প্রাগুক্ত,* ২৬৭, এ সম্পর্কে নীরদভূষণ রায়ের মনোজ্ঞ আলোচনা (Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal,* Vol. II, Dacca University, 1971 (পুনর্মুদ্রণ ১৯৪৮)। ১০০-১০৩।

৪০। মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক* ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮২ প্রথম খন্ড, ৩৫৭-৩৬০।

৪১। ঐ, ৩৬১-৩৬২।

৪২। বতুতা, প্রাগুক্ত, ২৬৭।

৪৩। ঐ।

৪৪। তরফদার আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন এই দেখে যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমলে অস্বাভাবিকভাবে রূপোর আমদানি ঘটেছিল (প্রাগুক্ত, ১৫১)। কড়ির বেশি ব্যবহার ছিল কিনা উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নীচুস্তরে, দৈনন্দিন জীবন কড়ির প্রচলন বাংলায় সাবা মধ্যযুগ ধরেই চলেছিল, তার প্রমাণ আছে।

৪৫। প্রবোধ বাগচীর প্রবন্ধ, *প্রাগুক্ত*, ৯৬-১৩৪।

৪৬। ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম পান্ডুয়ার শহরতলীর দুপাশে দোকানের সারির কথা বলেছেন *(Archaeological Report : A tour in Bihar and Bengal in 1879-80,* Calcutta, 1882, 81) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বুখানন হ্যামিলটন এগুলি দেখতে পান (আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, এইচ.ই.ষ্টেপলটন (সম্পা), এম আবিদ আলি খানের *মেময়ার্স অফ গৌর এ্যান্ড পান্ডুয়া,* কলিকাতা, ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ, ৮০-৮১)।

৪৭। J V G Mills (Tr. & ed) *Ma Huan,* Cambridge University Press, 1970, 160-165.

৪৮। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল* ঢাকা ১৯৮৭ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭), ১৪২ থেকে। এ ছাড়া, তরফদার, প্রাগুক্ত, ১৫৮-১৬৩।

৪৯। M M Chakraborty, "Notes on the Geography of Old Bengal," *Journal of Asiatic Society of Bengal,* May 1908, II, No. 5, 217. উনি দেখাচ্ছেন যে রেণেলের সময়ে এক মাইল দূরে নদী ছিল। ১৮৪৮ সালে সার্ভে যে মানচিত্র করেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে নদী পাঁচিলের কাছে ছিল (Map showing remains of Pandua, Malda, office of the Settlement Officer, M.P. 913 (5415). এখন National Library, No. M 292 Pan. কিন্তু চীনারা কেন নবাবগঞ্জে নৌকা থেকে নেমে হেঁটে পান্ডুয়া গিয়েছিলেন, সেটা পরিষ্কার নয়।

৫০। গৌড় ও সপ্তগ্রামের প্রায় একই সঙ্গে উত্থানের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Aniruddha Ray, "Urbanization in Medieval Bengal, C. AD 1200 to C. AD 1600" in *The Procedings of the Indian History Congress,* 53rd Session. Warangal, 1982-83, 150-151

৫১। Aniruddha Ray, "Morphology of Medieval Saptagram" in *Journal of Bengal Art,* Dhaka, 1999, Vol-4, 220-222.

৫২। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, অনিরুদ্ধ রায়, "ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে নগর বিন্যাস ও সামাজিক বিবর্তন", অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৯৯২, ৬১-৮৬।

৫৩। ঐ।

৫৪। এম. আবিদ আলি খান, প্রাগুক্ত, ৫১-৬০।

৫৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *বিপ্রদাসের মনসা বিজয়*, এশিয়াটিক সোসাইটি। কলকাতা, ৫৮।

৫৬। ঐ, পৃঃ ৬৩; তরফদার, প্রাগুক্ত, ১৪৪-১৪৫।

৫৭। Satish Chandra, *Medieval India*, Macmillan India, 1982, article "The Structure of Village Society in Northern India : The Khud Kasht and Pahi Kasht", 29-45.

৫৮। তরফদার, *প্রাগুক্ত*, ১৫৫-১৫৭; রহিম, *প্রাগুক্ত*, ৩৫৫ (প্রধানত বিজয় গুপ্ত ও মুকুন্দরামের লেখার উপর নির্ভর করে)।

৫৯। Aniruddha Ray, "The French Establishment in Bengal" in Om Prakash & D. Lombard (ed), *Commerce and Culture in the Bay of Bengal, 1500-1800*, New Delhi, 1999, 211-212 ফরাসী বণিক দেলান্দের চিঠি, হুগলী, ১৯ নভেম্বর ১৭০০।

৬০। গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস সালাতিন* (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৭৪।

৬১। সুকুমার সেন (সম্পা), *চূড়ামণি দাস : গৌড়াঙ্গ বিজয়*, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৭, ৭৮।

৬২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *প্রাগুক্ত*, ৮২।

৬৩। G. Bouchan & L.F. Thomaz (Tr. & ed.), *Voyage*, Paris, 1988 (এখানে *ব্রিটো দলিল* বলে বলা হবে), ৩১৬-৩১৮।

৬৪। জয়ানন্দ, *প্রাগুক্ত*।

৬৫। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৩৬২-৩৬৩।

৬৬। *ব্রিটো দলিল*, ৩১৬-৩১৮।

৬৭। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Arun Dasgupta, "Aspect of Bengal's Sea-borne Commerce in the pre-European period", presented to Bangladesh Historical Conference, 1973. প্রবন্ধটি ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য আমি শ্রী দাশগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ।

৬৮। J.W. Jone (tr) *The Itinerary of Ludvico de Varthema,* A.E S 1997 (reprint of 1863 ed.) 79-80 ভারথেমা ১৫০২ থেকে ১৫০৮ সাল ভারতে ছিলেন।

৬৯। M L Dames (tr) *The Book of Duarte Barbosa,* AES, 1989, 2 vols , II, 135-147

৭০। *ব্রিটো দলিল,* ৩৩২।

৭১। দ্রষ্টব্য র‍্যালফ ফিচের বক্তব্য ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে (W. Foster (cd), *Early Travels in India,* New Delhi, 1985, 24-28)।

৭২। আলোচনার জন্য তরফদার, প্রাগুক্ত, ১৪১, ব্যারোসের বক্তব্য কতটা নির্ভরযোগ্য এটা ভেবে দেখা দরকার।

৭৩। ইরফান হাবিব, "ইতিহাস গবেষণায় প্রযুক্তি চর্চার গুরুত্ব", ইরফান হাবিব (সম্পাদিত), *মধ্যকালীন ভারত,* কলিকাতা, ১৯৯০, ১৮।

৭৪। A courtesao (ed.), *The Suma Oriental of Thome Pires,* AES, 1990, 2 Vols , I, ৮৮-৯৫।

৭৫। মুকুন্দরাম, প্রাগুক্ত (এলাহাবাদ সংস্করণ), ১৯২১, ২০১।

৭৬। ঐ ১৭৯।

৭৭। বৃন্দাবন দাস, প্রাগুক্ত, ৮০৩-৮০৪।

৭৮। Caeser Fredrick (Purchas, Edinburg, 1911, V, 410-411).

৭৯। Vincent Le Blanc, *Voyage,* Paris, 1648, 133-34.

৮০। ষষ্ঠদশ শতকের শেষে আবুল ফজল বলেছেন যে সপ্তগ্রাম বন্দরের বার্ষিক আয় ছিল ত্রিশহাজার টাকা (আইন, দ্বিতীয় খন্ড, ১৫৪)। ১৬২২ সালে পাটনা থেকে লেখা দুটি চিঠিতে ইংরাজরা বলছে যে পর্তুগীজরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে মাল সপ্তগ্রামে নিয়ে এসেছে (উদ্ধৃত L.S.S. O'Malley & M. Chakrabarty, Bengal District Gazetteer, Hooghly, Calcutta, 1912, Vol. 29, 187-191.

৮১। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় মা-হুয়ান বলেছিলেন যে বাংলার সুলতান নিজের জাহাজে বাণিজ্য করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহর দুটি জাহাজ মালাক্কাতে পর্তুগীজরা দখল করে নেয় (*ব্রিটো দলিল,* ৩৩৩)।

৮২। টমে পিরেস, প্রাগুক্ত, ৯৩-৯৫।

৮৩। মহাশ্বেতা সান্যাল, "সপ্তগ্রাম (আনুমানিক ১৩০০-১৬৩২)", *ঐতিহাসিক,* জানুয়ারী ১৯৭৭, নং ৪, ১-২৬।

৮৪। টমে পিরেস, *প্রাগুক্ত,* ৯৩-৯৫।

৮৫। মীনহাজ, *প্রাগুক্ত,* ২৬-২৭।

৮৬। মঙ্গোলদের আক্রমণে চীন দেশের সঙ্গে স্থল বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেলে পাড়ুয়া ও দেবকোটের গুরুত্ব কমতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ও উত্তরবঙ্গে পার্বত্য ঘোড়া আসছিল সম্ভবত কম সংখ্যায়। মুকুন্দরামের সওদাগর গৌড় থেকে দুটো চাঙ্গন ঘোড়া কিনেছিল (প্রাগুক্ত, ১৫৬)।

৮৭। S.B. Qanungo, *A History of Chittagong,* Chittagong, 1988, Vol I

৮৮। I.H. Siddiqui (tr. 2 ed.), *Wakiat-e-Mustaenqui,* New Delhi, 1993, 126.

৮৯। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Aniruddha Ray, "Archaeological Reconnaissance at the city of Gaiur", *Pratna-Samiksha,* 1995, Vol 2-3, 245-263.

৯০। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, তরফদার, *প্রাগুক্ত,* 158-63 লোদীদের যেখানে মুদ্রায় ১৪৫ গ্রেণ এর বেশি নেই, সেখানে হোসেন শাহীদের গড়পড়তা ছিল ১৬৬ (পৃঃ ১৬১)। হোসেন শাহী আমলে এত বেশি রূপো আসায় তরফদার আশ্চর্য হয়েছেন এবং এর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যকে দায়ী করেছেন (পৃঃ 159)। হঠাৎ বৈদেশিক বাণিজ্য এত বাড় কেন, সেটা আলোচনা করা হয়নি।

৯১। বারবোসা প্রধানত মুসলমান বণিকদের কথা বলেছেন, যাদের নিজেদের জাহাজ ছিল। প্রধানত তাঁতের কাপড় ও চিনি থেকে এই বাণিজ্য চলছে বলেছেন (*প্রাগুক্ত,* ১৪২-১৪৮)।

৯২। উত্তরভারতে সুলতানী যুগের শেষ দিকে কারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়বে, এজন্য দ্রষ্টব্য I.A. Khan, "Middle Class in the Mughal Empire", *Proceedings of the Indian History Congress,* 1975, 36th Sessian, Aligarh, 113-141.

৯৩। তরফদার বলছেন যে এরা অনেকে ছিলেন ধনী (*প্রাগুক্ত,* ১৫৯-১৬০)। কিন্তু এদের জীবনযাত্রা বিলাসবহুল ছিল তার কোন প্রমাণ নেই।

৯৪। *ব্রিটো দলিল,* ৩৩৩।

৯৫। কালক্রম নিয়ে আলোচনা, দ্রষ্টব্য সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,* কলিকাতা, ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ। জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য, পঞ্চানন মন্ডল (ভূমিকা ও সম্পাদনা) *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল।*

কলিকাতা, ১৯৯২ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১) পৃঃ ক-চ।

৯৬। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন ক্ষুদিরাম দাস তাঁর প্রবন্ধে "মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্য রচনা প্রসঙ্গ", বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, কার্তিক-পৌষ, ১০৫-১১৫। সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অনিরুদ্ধ রায়, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান; মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডী-মঙ্গল, নন্দন, আগষ্ট, ২০০২, ৩৮ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ২০-২৪।

৯৭। সুকুমার সেন মনে করেন যে কবি ১৫৪৪-৪৫ *খ্রিস্টাব্দে* গৃহত্যাগ করেন ও ১৫৫৫-৫৬ সালে তাঁর প্রথম *পাঁচালী* গান করা হয় (সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, ৪২১-৪২৩। পঞ্চানন মন্ডল ১৫৮৬ সাল গ্রন্থ রচনাকাল বলে ধরেছেন (প্রাগুক্ত, পৃঃ জ-ঝ। ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন পাঠের ফলে এই সমস্যা জটিল হয়েছে। ক্ষুদিরাম দাস গৃহত্যাগের সময় ১৫৯৪ সাল ধরেছেন।

৯৮। ক্ষুদিরাম দাস, প্রাগুক্ত।

৯৯। সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১৫৭।

১০০। গ্রামভিত্তিক খাজনার পরিমাণ কত হবে (জমা) তাকে দেহ *বা-দেহি* বলা হত (Irfan Habib, *The Agrarian System of The Mughal Empire,* প্রাগুক্ত, ৩০৩ টাকা ১৯। উল্লেখযোগ্য যে ডিহিদার শব্দটি উত্তরভারতে পাওয়া যায় না।

১০১। মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ১৬৭-১৬৮।

১০২। তরফদার একে প্রধানত সেনাপতি বলে ধরেছেন, যদিও প্রথমে উনি এসেছিলেন অর্থ-বিভাগের কর্তা হিসাবে (প্রাগুক্ত, ১০৮-১০৯)। উল্লেখযোগ্য যে এখানে মুকুন্দরাম উজীরের ক্ষমতা বেড়েছে বলে দেখাচ্ছেন (উজীর হল রায়জাদা, এলাহাবাদ সংস্করণ, ৪)। প্রশ্ন থাকে যে খালিসা জমিতে জরীপ না করে তালুকদারী জমিতে কেন জরীপ করা হচ্ছে।

১০৩। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত,* ৪-৫।

১০৪। আলোচনার জন্য অনুরুদ্ধ রায়, মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত,* ২১-২২।

১০৫। 'মাপে কোনে দিয়ে দড়া, পনের কাঠায় কুড়া"। আবার "খিলভূমি লিখে লাল", প্রাগুক্ত, ৪।

১০৬। অনিরুদ্ধ রায়, *ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ারের দেখা ভারত,* কলিকাতা, ২০০৩, ৭৯-৯৭।

১০৭। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ইরফান হাবিব, *এ্যাগ্রারিয়াম সিস্টেম, প্রাগুক্ত,* ২৪৬-২৪৭।

১০৮। মুকুন্দরাম পরিষ্কার করে এ কথা বলেননি। কিন্তু প্রজারা যে গরু, ধান রোজ

বেচছে। তার থেকে এটা বোঝা যায় (*প্রাগুক্ত*, ৫)

১০৯। *প্রাগুক্ত*, ৪ ("পনের কাঠায় কুড়া")।

১১০। "ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ" (ঐ)।

১১১। *আইন-ই দশশালার* জন্য-দ্রষ্টব্য, ইরফান হাবিব *এ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম*, ২৪৬-২৪৭। ইলাহী গজ চালু করার জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, ৪০৬-৪১২।

১১২। "পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম" (*প্রাগুক্ত*, ৪)।

১১৩। ঐ, ৫।

১১৪। আশুতোষ ভট্টাচার্যর গ্রন্থে উদ্ধৃত (*বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, ৫৮-৬০)।

১১৫। •জিয়াউদ্দীন বারানী, *তারিখ-ই ফিরোজশাহী*, (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৮২, ২৩৮-৩৯।

১১৬। বিজয় গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ*, কলিকাতা, ১৯৬২, ১২২-১২৬। একই সঙ্গে বিজয় গুপ্ত সুলতান জালালুদ্দীন ফতে প্রশংসা করেছেন।

১১৭। R.C. Majumder, *History of Medieval Bengal*, Calcutta, 1973, 247-52 সমালোচনা জন্য দ্রষ্টব্য, সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশ বছর, কলিকাতা, ১৯৯৮, চতুর্থ সংস্করণ, ৪৮২-৮৩); অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা, ১৯৬৮, ৫০-৫৮।

১১৮। মুকুন্দরাম, প্রাগুক্ত, ৮৫-৮৭।

১১৯। ব্রাহ্মণদের উপর নেই এবং ডিহিদার বসাবেন না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রথম তিন বছর কর লাগবে না ও তারপরে বছরে "হাল পিছু এক তঙ্কা" অর্থাৎ পুরানো প্রথায় কর নেওয়া হবে যেখানে জমি জরীপ করা হবে না (ঐ, ৮৫)।

১২০। ঐ, "প্রজাগণে দেহ দান, ভূমি বাড়ী করিয়া চিহ্নিত" (৮৯)।

১২১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, নবম বসুমতি সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, ২০০-২০১।

১২২। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৮৫।

১২৩। S. Nurul Hasan, "Zamindars Under the Mughals", R.E. Frykenberg (ed), *Land Control and Social Structure in Indian History*, New Delhi, 1979, 17-31.

১২৪। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত*, ৮৮ ("বৈদ্য বসে মহাজন")।

১২৫। বিপ্রদাস, *প্রাগুক্ত*, ১৪৩।

১২৬। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত।* ৮৬-৮৭।

১২৭। ঐ, ২২৭।

১২৮। ঐ, ২৩০। কবি দক্ষিণ পাঠনের কথাও বলেছেন।

১২৯। "আমি নীচু কূলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়, কেহ্ না পরশে জল লোকে বলে রাড়", (ঐ, ৭৩)।

১৩০। ঐ, ১৮১।

১৩১। "রাত্রিদিন বাহে যায় হার্মাদের ডরে" (ঐ, ২০৫)।

১৩২। ঐ, ৮৮-৯১।

১৩৩। Muhammed Habib, "History of India" Aligarh, 1952 (reprint), 55 এর কিছু পরিবর্তন করেছেন Irfan Habib, "History of Delhi Sultanate", *The Indian Historical Review,* 1978. Vol. 4, No. 2, 287-330.

১৩৪। মুকুন্দরাম, *প্রাগুক্ত,* ৯০-৯১।

১৩৫। অনিরুদ্ধ রায়, " ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে নগর-বিন্যাস", *প্রাগুক্ত,* ৭৫-৮৬।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণবিদ্রোহ — ফিরে দেখা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও ইতিহাস সংসদের সদস্য বন্ধুরা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা ভারতে যে বিপুল গণবিদ্রোহ ফেটে পড়ে, যাতে অংশগ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র, শ্রমিক ও একটু পরে ব্যাপক কৃষক সমাজ, তার ফল কি হয়েছিল তাই নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে তখনও নানান বির্তক ও ভিন্নমত ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। এই গণবিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী একজন ছাত্র সংগঠক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকেও পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদ হিসেবে আমার একটা মূল্যায়ন অবশ্যই ছিল। আজ ফিরে দেখতে গিয়ে আমার সেই মূল্যায়নই রয়েছে, তবে তাতে কিছু কিছু পরিবর্তনও করা উচিত বলে মনে করছি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দখলের শেষ সংগ্রামের ডঙ্কা বাজিয়ে ছিল সর্বপ্রথম নিঃসন্দেহে ভারতের ছাত্রসমাজই। মহাচীনে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে গণবিপ্লবের সূচনায়, বিশেষ করে ১৯১৯ এর ৪ঠা মে-র গণবিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে চীন বিপ্লবের মহানায়ক মাও জে দং লিখেছিলেন যে চীনের ছাত্র সমাজই ছিল গণবিপ্লবের "Bugler, Bridge and standard bearer"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের বিশাল গণবিদ্রোহেও তেমনই ভূমিকা পালন করেছিল এদেশের ছাত্রসমাজ। গর্বের কথা যে সেই গণ বিস্ফোরণের সূচনা হয়েছিল আমাদেরই মহানগরী কোলকাতায়, ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বর তারিখে।

১৯৪৫ এর ২১শে নভেম্বর সকাল হয়েছিল অন্য যে কোনও দিনের মতই। জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংস্থারা ডাক দিয়েছিল লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারের প্রহসন বন্ধ কর, মুক্তি দাও তাদের সকলকে। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছিল ছাত্রদের এই সাধারণ ধর্মঘটকে। যদিও এই ছাত্র সংগ্রাম থেকে যুদ্ধোত্তর গণবিদ্রোহ ফেটে পড়বে, তা কেউই তখন উপলব্ধি করেনি—না জাতীয়তাবাদীরা, না কমিউনিষ্টরা। দ্বিপ্রহরে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী জমায়েত হল ওয়েলিংটন

বিংশতিতম সম্মেলন, নিউ আলিপুর কলেজ, ২০০৪

স্কোয়ারে। মুখে তাদের রণধ্বনি "আজাদহিন্দ ফৌজকো ছোড় দেও" আর "আজাদহিন্দ ফৌজ হামারা দোস্ত" 'ছাত্রফেডারেশনের পতাকা হাতে কয়েকশত ছাত্রকে সভাস্থলে প্রবেশ করতে দেখেই, মঞ্চ থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংস্থার নেতৃবর্গ ব্রর্জধ্বনি দিলেন "বন্ধুগণ, কমিউনিষ্টপার্টি ও তাদের নেতৃত্বাধীন ছাত্র ফেডারেশন নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে বলেছে ফ্যাসিস্ট। তাই আমরা বলি 'কমিউনিষ্ট পার্টি হামারা দুশমন"। হাজার হাজার ছাত্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল "কমিউনিষ্ট পার্টি হামারা দুশমন"। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা কোনও কথা না বলে; দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাজার হাজার ছাত্রের মিছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে সোজা এগোতে শুরু করল। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাও মিছিলের পিছনে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁদের মুখে স্লোগান "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এক হও।"

মিছিল চলল ড্যালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। ম্যাডান ষ্ট্রীট আর ধর্মতলা ষ্ট্রিটের মোড়ে নিউসিনেমার সামনে ঘোড়ায় চড়ে ফিরিঙ্গি সার্জেন্টরাও গুর্খা পুলিশ বন্দুক হাতে মিছিলের পথ রোধ করল, আর এগোতে দেবে না। মিছিল সুশৃঙ্খলভাবে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে বসে পড়ল। ছোট ছোট দলে ভাগ হওয়া ছাত্রদের সামনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তৃতা বলতে লাগল। একটি অবাঙ্গালী ছাত্র দৃপ্ত কণ্ঠে গান গেয়ে মিছিলের সামনে থেকে পিছনে ঘুরতে লাগল — সেই আজাদ হিন্দ ফৌজেরই গান 'কদম কদম বাড়ায়ে যা, এ খুসীকা গীত গায়ে যা, এ জিন্দেগি হ্যায় ফৌজ কি, ফৌজসে লুটায়ে যা'। ক্রমে সারা মিছিলই সেই গানে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। দীর্ঘ বহুবছর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে মিছিলে এসেছে। তাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ প্রায় ছিল না। তারা বল্ল আজ যারাই মিছিলে এসেছে, তারা ছাত্র-কংগ্রেসেরই হোক, আর ছাত্র ফেডারেশনেরই, তারা সবাই আমাদের বন্ধু। "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির দাবিতে সমগ্র ছাত্র সমাজ এক হও" এই ছিল তাদের স্লোগান।

ধর্মতলা ষ্ট্রিটে বেশ কয়েকটি ঝালাই এর দোকানে কর্মরত বেশ কিছু মুসলিম নওজোয়ানও এসে ধ্বনি দিতে লাগল "সাম্রাজ্যবাদী হুঁশিয়ার, হাম নওজোয়ান হ্যায় তৈয়ার!" আর মাঝে মাঝেই ধ্বনি দিল "হিন্দু-মুসলমান এক হো"। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। জাতীয়তাবাদী ছাত্রনেতারা নেতাজী সুভাষের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর কাছে খবর পাঠালেন, তিনি মিছিলের সামনে এসে নেতৃত্ব দিন। কিছুক্ষণ পরে শরৎবসুর অনুগামী একজন কংগ্রেসী এম.এল. এ. শরৎবসুর লেখা চিঠি নিয়ে এসে তা পড়ে শুনিয়ে দিলেন মিছিলের সামনে। তাতে লেখা ছিল "ছাত্ররা তোমরা উস্কানিদাতাদের প্ররোচনায় মিছিল করেছ. এটা কমিউনিষ্টদের চক্রান্ত। তোমরা ফিরে যাও।" ছাত্ররা চিঠিটির বয়ান শুনে

স্তম্ভিত। বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টির (RCPI) একজন ছাত্র নেতা (নিরঞ্জন সেন) লাফ দিয়ে উঠে কংগ্রেসী এম.এল.এর হাত থেকে চিঠিটি কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলে দিলেন। ছাত্ররা জয়ধ্বনি করে উঠলো।

সন্ধ্যার মুখে মুখে পুলিশ কমিশনার এসে ছাত্রদের বল্ল তোমরা মিছিল ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাও, নইলে আমরা গুলি চালাবো ছাত্ররা উঠে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল যে তারা ফিরবে না, বর্জগর্জন উঠল "চল চল ড্যালহাউসী চল, দিল্লি চল" "আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই" "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসহোক"। আচমকা গুলি চালাতে শুরু করল পুলিশ, আর ঘোড়ার আক্রমণ। ছাত্ররা পালাল না, হাতের কাছে যা পেল ভাঙ্গা ইট, সোডার বোতল তাই ছুঁড়ে প্রতিরোধ করতে লাগল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ঝালাই দোকানের মুসলিম তরুণেরা। পুলিশের গুলিতে ও ঘোড়ার আক্রমণে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল বেশ কয়েকজন ছাত্র ও মুসলিম নওজোয়ান। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (সে কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য বা কোন দলভুক্ত ছিল না) গুলিতে নিহত হ'ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণবিদ্রোহের রামেশ্বরই প্রথম শহীদ। তার একটু দূরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল মুসলিম জঙ্গী নওজোয়ান আবদুস সালাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (পরে প্রসিদ্ধ গায়ক ও গীতিকার) সলিল চৌধুরি সেই মিছিলে ছিল। পরে সে গান বেঁধেছিল। 'রামেশ্বব শপথ তোমার, ভুল না ধর্মতলা, সালাম ভাই শপথ তোমার ভুল না ধর্মতলা, ভুলনা তোমার মিছিলে মিছিল পতাকা পতাকা মেলা, ভুল না তোমার গর্জন সাম্রাজ্যসাহী হুঁশিয়ার! চল চূর্ণ করি এ জীর্ন কারাগার।" মাস দুই পরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক "স্বাধীনতা" কবিতা লেখেন "রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসমভাই ভারত জোড়া এই রক্ত গাঙ্গের আজ জবাব চাই। পরে এই কবিতাতে সুর দিয়ে গান গেয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ছাত্ররা কেউ বাড়ি গেল না। সারারাত ধর্মতলা ষ্ট্রীটে বসে রইল। কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে ট্রাম, বাস, রিক্সা ধর্মঘট হয়ে গেল। বিভিন্ন হষ্টেল থেকে ছাত্ররা রাত্রে এসে রাস্তায় বসে থাকা ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দুজন কংগ্রেসী মহিলানেত্রী সারারাত বসে রইলেন ছাত্রদের সঙ্গে — জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি ও বিমল প্রতিভাদেবী। মায়ের মত সেবা করতে লাগলেন আহত ছাত্রদের। প্রাক্তন বিপ্লবী নেত্রী বীনা দাসও এসেছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। শতাধিক আহত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিষ্ট ছাত্র কর্মী অরুণ সেন। তাঁর পেটের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গিয়েছিল। সরকারি হিসেবে ২০/২১ জন ছাত্র ও নওজোয়ান মারা গিয়েছিলেন, বে-সবকাবি হিসেবে অনেক বেশী।

শরৎবসুর ফিরে যাবার পরামর্শ শুনে কয়েকজন ছাত্রনেতা মিছিল ছেড়ে চলে গেলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রধান জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতারা কিন্তু চলে গেলেন না অনেকে। রাস্তায় বসে থাকা ছাত্রদের সঙ্গে বসে রইলেন ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিটি কর্মী, নেতা ও সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এই নিবন্ধের লেখক নিজে, ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠক কমলাপতি রায়, ছাত্র নেতা রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্র ফেডারেশনের নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়, সরোজ হাজরা প্রমুখ। প্রাণ তুচ্ছ করে কয়েকজন আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন তরুণ ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী নৃপেণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়াও রাস্তায় বসে রইলেন আর. এস. পি. দলের ছাত্র নেতা বিজন বিশ্বাস, সৌরীন ভট্টাচার্য, বদরুল হায়দার চৌধুরী, ফরোয়ার্ড ব্লকের মালবিকা দত্ত, আর. সি. পি. আই দলের নিরঞ্জন সেন প্রমুখ। এঁরাও নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বহু আহত ছাত্রকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে মানুষের চেতনার কিভাবে রূপান্তর ঘটে তা ঐ সন্ধ্যাতেই দেখা গিয়েছিল। আর.এস.পি. -র ছাত্রনেতা সৌরীন ভট্টাচার্য যিনি কয়েকঘন্টা আগেও স্লোগান দিয়েছিলেন "কমিউনিষ্ট পার্টি হামারা দুশমন", তিনি কমিউনিষ্ট ছাত্র সংগঠকদের আলিঙ্গন করে বল্লেন যে তাঁরা যেন পার্টি অফিসে গিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের বোঝান যে এই ছাত্র সংগ্রামের সমর্থনে তাঁরা যেন শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করনে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই পারে একাজ করতে। পার্টি অফিসে গিয়ে দেখা গেল যে তাঁরা ইতিমধ্যেই ২২ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। ট্রাম, বাস, রিক্সা অবশ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিষ্ট নেতা রমেন সেন সেই রাতেই চলে গেলেন মেটিয়াবুরুজে সেখানকার সমস্ত শ্রমিককে ধর্মঘটে সামিল করতে। সোমনাথ লাহিড়ীও মহম্মদ ইসমাইল চলে গেলেন ট্রাম শ্রমিকদের মেসে ও বাসের ডিপোতে ট্রাম, বাস ধর্মঘট করাতে। কমিউনিষ্ট নেতা নৃপেণ চক্রবর্ত্তী চলে এলেন ধর্মতলা ষ্ট্রীটে, সারারাত বসে রইলেন ছাত্রদের সঙ্গে।

২২ নভেম্বর সকাল থেকে ফিরিঙ্গি সার্জেন্টদের জায়গা নিল ইংরেজ সৈন্যরা, বাংলার গভর্ণর কেসি যাদের নির্দেশ দিলেন রাস্তায় মিছিলকারী দেখলেই গুলি কর। কিন্তু তাতে পিছু হঠল না ছাত্রছাত্রীরা, পিছু হঠল না শ্রমিকরা ২২ নভেম্বর সকাল থেকেই জনস্রোত এগিয়ে চলেছিল ধর্মতলা ষ্ট্রীটের দিকে। কোনও যানবাহন চলছে না। কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে ট্রাম, বাস, রিক্সা সম্পূর্ণ ধর্মঘট করেছে। সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছে বজবজ থেকে কাঁকিনাড়া, চেঙ্গাইল থেকে চাঁপদানি পর্যন্ত কয়েক লক্ষ চটকল, সূতাকল ও ইনজিনিয়ারীং শ্রমিক।[১]

২২ নভেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। চারিদিকে উড়ছে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতারা নিয়ে এসেছেন। মাঝে মাঝে উড়ছে বেশ কয়েকটি স্বাধীনতা, শান্তি প্রগতি লেখা ছাত্র ফেডারেশনের পতাকাও। কিছুক্ষণ পরে ইসলামিয়া কলেজ থেকে কয়েকশত মুসলমান ছাত্র মিছিল করে এসে সমাবেশে যোগ দিলেন, তাঁদের হাতে মুসলিম লীগের পতাকা পূর্ব কলকাতা থেকে রংকল মজুরদের বড় মিছিল সমাবেশে এল লাল ঝাণ্ডা হাতে। এগিয়ে গিয়ে ছাত্ররা তেরঙ্গা ঝাণ্ডার সঙ্গে বেঁধে দিলেন লাল ঝাণ্ডা ও মুসলিম লীগের পতাকাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে বজ্রধ্বনি উঠল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিন্দুমুসলমান এক হও, কংগ্রেস লীগ কমিউনিষ্ট এক হও। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সংগ্রামী ঐক্যের চেতনা লুপ্ত করেছে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ।[২]

শরৎবসু তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র অমিয়নাথকে নিয়ে সমাবেশে এলেন। ছাত্ররা ভাবলেন যে বোধ করি তিনি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। তা নয় তিনি ছাত্রদের বল্লেন বাড়ি চলে যেতে, সব ব্যাপারটাই একটা কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র। একথা শোনা মাত্র হাজার হাজার ছাত্র তাঁকে ধিক্কার দিয়ে উঠল এবং স্রোতের মত এগিয়ে চল্ল ধর্মতলা ষ্ট্রীটের দিকে যেখানে সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ে মেশিনগান হাতে মিছিলের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল ইংরেজ সৈন্যরা। ছাত্ররা অবিরাম স্লোগান দিচ্ছে 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, চল চল ড্যালহাউসী চল, দিল্লি চল'। কিন্তু গুলি চল্‌ল না। চারিধার থেকে মৃত্যুভয়হীন মিছিল দেখে ভয় পেয়ে গেল ইংরেজ সৈন্যরা ও তাদের কর্তা ব্যক্তিরা সাঁজোয়া গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে তারা চলে গেল একেবারে ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতরে গড়ের মাঠে। আর প্রত্যাশ্যাতীত জয়ের আনন্দে ছাত্রও নওজোয়ান — শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ মিছিল উদ্দাম বেগে এগিয়ে গেল ড্যালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। মুখে তাদের রণধ্বনি 'জয়হিন্দ' আর "আংরেজ তুম ভারত ছোড়ো'। নাড়ীতে নাড়ীতে সেদিন নতুন অনুভূতি — স্বাধীনতা প্রায় আমাদের মুঠোর মধ্যে। আমাদের শক্তি : সবদল, সব মানুষের সংগ্রামী ঐক্য। আমাদের এগোবার পথ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। পথ দেখাল কারা? কলকাতার ছাত্রনওজোয়ান শ্রমিকরা।[৩]

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিক মুখপাত্র 'পিপল্‌স এজ' ১৯৪৫-এর ৭ ডিসেম্বরে "ভবিষ্যতের ইঙ্গিত" শিরোনাম দিয়ে এক সম্পাদকীয়তে লিখল "কলকাতার গত সপ্তাহের ঘটনাতে ভারতের বর্তমান অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক বিচারকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাতি সমূহের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে কাঁধে

কাঁধ মিছিলে ভারতও পা বাড়াক, এটাই আজ সমগ্র জাতির আকাঙ্খা। সাম্রাজ্যবাদ এই বিক্ষোভ দমনে ব্যবহার করেছে পুলিশ ও মিলিটারির বুলেট। তার বিরুদ্ধে ছাত্র-নওজোয়ান-শ্রমিকদের মৃত্যুভয়হীন প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। সে ঐক্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সংকীর্ণতা ও অন্ধ কমিউনিষ্ট বিদ্বেষের ফলে সে সুযোগ ও সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে।

পিপলস্ এজ তার সম্পাদকীয় শেষ করে এই কটি কথা বলে ঃ "দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের যে অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠেছে, সে আগুনকে জাগ্রত রাখতেই কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"[৫] অনেকবছর পরে লণ্ডন থেকে ম্যানসার্ট ও মুন, সম্পাদিত 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার ষষ্ঠ খন্ড থেকে আমরা জানতে পারি যে ভারতের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি সারক্লর্ড অকিনলেকও একগোপন হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছিলেন ইংলান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলিকে। তাতে তিনি বলেছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এখনই ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আপস মিটমাট করুন, না হলে ভারতে অদূর ভবিষ্যতে গণবিদ্রোহ ঘটে যাবে, আর তাকে সমর্থন জানাবে ভারতীয় সৈন্যরাও।

১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরেজ সরকার আবার দিল্লিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্য একজন সেনানী ক্যাপ্টেন রশীদ আলির বিচার শুরু করল। তার প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুযারি কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল মুসলিম ছাত্র লীগ। তাকে সমর্থন জানিয়েছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। ফলে কলকাতা ও শহরতলীতে পরিপূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট হয়ে গেল এবং এক বিরাট ছাত্র মিছিল এগোতে লাগল ড্যালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় এই ধর্মঘট ও মিছিলের যে বর্ণনা দিয়েছিল তার থেকে একটু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছিঃ "হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের সম্মিলিত মিছিলের মুখে রণধ্বনি ছিল "হিন্দু-মুসলমান এক হও" ও "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।" বিকেল ৪টে নাগাদ সশস্ত্র পুলিশ ক্লাইভ স্ট্রীটে মিছিলের পথরোধ করল। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এস.এম.দোহার নেতৃত্বে পুলিশ লাঠি চালনা করে বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। আহত হন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্নদা শঙ্কর ভট্টাচার্য। চারিপাশ থেকে লোকজন এসে পথে ভীড় করে ও মিছিলকারীদের সমর্থনে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা কলকাতায়। ট্রাম ও বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, লরি, বাস ও ট্রাক জ্বলতে থাকে। সারারাত কলকাতা বিক্ষোভে উত্তাল থাকে।"[৬]

ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টেও একইধরনের লেখা হয়: "আজাদ হিন্দ

ফৌজের ক্যাপ্টেন রশীদ আলির কারাদণ্ডের প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারি আবার কলকাতায় ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। নেতৃত্ব দিচ্ছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগ। ঐক্যের প্রতীক হিসেবে মিছিলকারীরা উড্ডীন রাখছে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকাকে। পুলিশ থানা অনেক জায়গায় আক্রান্ত হয়েছে, ফলে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। স্কুল কলেজ সমস্তই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"[৭]

১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ও শহরতলীতে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দুই শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল ও সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বাধীন ইউনিয়ানদের ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করল। ট্রাম, বাস ও রিক্সা শ্রমিকরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ডাক দেয় সাধারণ ধর্মঘটের। নৈহাটি থেকে বজবজ পর্যন্ত ১০ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট পালন করে।[৮] ৪/৫ লক্ষ নরনারীর বিশাল ঐক্যবদ্ধ মিছিল কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা হাতে নিয়ে সারা কলকাতা ও শহরতলী মিছিলে তোলপাড় করে দেয়। তাদের মুখে রণধ্বনি ছিল "হিন্দু - মুসলমান এক হও" আর "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক"[৯]

দ্বিপ্রহরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কয়েকলক্ষ মানুষের বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা করলেন গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাসগুপ্ত, মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাসিম, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতা গুণদা মজুমদার, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেতা যতীন চক্রবর্ত্তী, কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, মুসলিম ছাত্র লীগের নেতা মোয়াজেম হোসেন প্রমুখ। সবাই বক্তৃতা করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সপক্ষে। ছাত্র নেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "গতকাল আমাদের মিছিলকে পুলিশের বড়কর্তা দোহা গুলি করে চূর্ণ করার ভয় দেখিয়েছিল। সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের তরফ থেকে আমি বলছি : তোমরা আমাদের পেটাতে পার, গুলি করতে পার কিন্তু চূর্ণ করতে পারবে না।"[১০]

কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী এক ধারালো ভাষণে বল্লেন যে নেতাদের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়তে বহু সময় লেগেছে, কিন্তু নীচের তলার জনগণ ইংরেজ সরকারের বুলেটের জবাবে ক্রম মূহুর্তে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেছে। তারপরেই ঐ বিশাল জনসমুদ্র বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত এগিয়ে গেল মিশনরো দিয়ে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের দিকে। একটি জাতীয়তাবাদী ইংরেজি দৈনিক পরদিন লিখল "গতকাল ও আজ কলকাতায় যা ঘটে গেল তাকে একটা গণ অভ্যুত্থান ছাড়া কিছু বলা যায় না।"[১১]

১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলাতেই বাংলার গভর্ণর কেসি কলকাতার শাসনভার তুলে দিলেন ব্রিটিশ মিলিটারির হাতে। তারা ফতোয়া জারী করল; মিছিলধারী দেখলেই

গুলি চালাও। তার জবাবে কলকাতা ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করল। আর ছাত্র নওজোয়ানরা শুরু করল ডাষ্টবিন ও ঠেলাগাড়ি দিয়ে বড় রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড করে ভাঙ্গা ইঁট আর সোডার বোতল নিয়ে খন্ডযুদ্ধ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ বাংলা ঔপন্যাসিক তাঁর নতুন উপন্যাস "ঝড় ও ঝরাপাতায়, আরম্ভ করলেন এই বলে "আজ রশিদ আলি দিবস। আজ কলকাতায় হরতাল। শ্রমিকনেতা মহম্মদ ইসমাইলের ডাকে ট্রাম, বাস, রিক্সা সব বন্ধ। ছাত্ররা প্রাচীরপত্রে লিখে দিয়েছে "Calcutta is declared out of bounds for British troups"। কলকাতার রক্তাক্ত সংগ্রামে শহীদ হলেন শতাধিক ছাত্র, নওজোয়ান ও শ্রমিক। কলকাতার এই গণ-অভ্যুত্থানের সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট ও পরিপূর্ণ হরতাল হল সারা বাংলায়, ঢাকাতে, চট্টগ্রামে, বরিশালে মৈমনসিংহে এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশের বড় বড় শহরগুলিতে।[১২]

কলকাতার এই গণবিদ্রোহ থামতে না থামতেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের রণডঙ্কা বাজল বোম্বাই ও করাচিতে। এবার বিদ্রোহী হল সরকারের বেতনভুক নৌ সেনারা ১৮ ফেব্রুযারি বোম্বাইয়ের যুদ্ধ জাহাজ তলোয়ারে ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে তারা উড়িয়ে দিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা — স্বাধীনতার লড়াই-এ সর্বাত্মক ঐক্যের প্রতীক।[১৩] বিদ্রোহী নৌ সেনাদের সমর্থনে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। বোম্বাই ও শহরতলীর ৫ লক্ষ শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট করল ১৯ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি। সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্রাকে চড়ে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করেও সে সাধারণ ধর্মঘট ভাঙ্গতে পারল না ব্রিটিশ ফৌজ। গুলি চালিয়ে তারা হত্যা করল ২৭০ জন শ্রমিক ও ছাত্র নওজোয়ানকে। গুলিতে নিহত হলেন ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কমিউনিষ্ট শিক্ষায়িত্র কমল ঘোষ।[১৪]

আতঙ্কিত হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত্রেই পার্লামেন্টে ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাট্লি ঘোষনা করলেন "ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা করার জন্য শীঘ্রই এক ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনকে ভারতে পাঠানো হচ্ছে। অতএব এই নৌবিদ্রোহ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।"[১৫] তাতে সাড়া দিলেন কংগ্রেসনেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মুসলিম লীগনেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। তাঁরা বিদ্রোহী নৌ সেনাদের পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে। প্যাটেল বল্লেন" এটা নৈরাজ্য এবং কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র।"[১৬] জিন্নাহ্ বল্লেন "এই বিদ্রোহ দায়িত্বজ্ঞানহীন।"[১৭] কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন মাত্র সদস্য শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি, ভারত ছাড় আন্দোলনে প্রসিদ্ধ নেত্রী, প্রকাশ্যে নৌবিদ্রোহিদের সমর্থন করে ঘোষণা করলেন নৌ বিদ্রোহী সেনারা প্যাটেল

বা জিন্নার কথা শুনে অস্ত্রত্যাগ করো না, আত্মসমর্পণ কোর না। কলকাতা ও বোম্বাই্এর পথে ভারত জোড়া ঐক্যবদ্ধ বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য।"[১৮]

জাতীয় নেতাদের পরামর্শ শুনে বিদ্রোহী নৌসেনারা সেদিন আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তবে দেশবাসীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন এক মর্মস্পর্শী আবেদন "আমাদের জাতির জীবনে আমাদের বিদ্রোহ এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই চিহ্নিত থাকবে। এই প্রথম একই আদর্শর জন্য রাজপথে সেনাবাহিনীর রক্ত ও জনগণের রক্ত একই সঙ্গে প্রবাহিত হ'ল। সেনাবাহিনীতে যারা আছি, আমরা তা কখনও ভুলব না। আমরা জানি যে প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারাও তা কখনও ভুলবেন না। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক। জয়হিন্দ!" (বিদ্রোহী নৌসেনাদেব কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির বিবৃতি ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)।

ঐ একই দিনে লন্ডনে, ভারত থেকে সদ্য প্রত্যাগত ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দলের সদস্য অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক রিচার্ডস সাংবাদিকদের বলেন "আমাদের এখনই ভারত থেকে সরে পড়তে হবে। নইলে ভারতীয়রা আমাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।"[১৯] ১৯৪৬-এ পূর্বভারতে ব্রিটিশ বাহিনীর অধিনায়ক সার ফ্রান্সিস টুকার তাঁর স্মৃতি চারণে লিখেছেন যে ১৯৪৬-এ আর ভারতীয়দের গণবিদ্রোহকে অস্ত্র দিয়ে দমন করা সম্ভব ছিল না।[২০] ফ্র্যাঙ্ক রিচার্ডস ও ফ্রান্সিস টুকারের কথা যে কত সঠিক তা বোঝা যায় দুটি ঘটনা থেকে। নৌসেনাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সেনাপতিরা মারাঠা রেজিমেন্টের এক সহস্র ভারতীয় সৈন্যকে পাঠিয়েছিল। তারা নৌসেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছিল। আর ভারতীয় বৈমানিকরা ধর্মঘট করে নৌসেনাদের বিদ্রোহী জাহাজগুলির উপর আকাশ থেকে গোলাবর্ষণ করতে অস্বীকার করেছিল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এ সব কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

বোম্বাইএর সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী নৌসেনাদের প্রতি সেই কটা দিন অকুণ্ঠ ভালবাসা দেখিয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ বোম্বাইএর টাইমস অব ইন্ডিয়াতে যে খবর বেরিয়েছিল তার থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অ্যাপোলো বন্দরে লোকের ভিড় জমেছে। নাবিকরা লঞ্চে করে কূলে এসে দর্শকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তারপর লঞ্চের পর লঞ্চ ভর্তি খাদ্য, ফল এবং মিষ্টান্ন জাহাজের দিকে যেতে লাগল। এ সবই জনসাধারণের ভালবাসার দান। সে এক অভিনব দৃশ্য।"

২২ ফেব্রুয়ারির টাইমস অব ইন্ডিয়াতে আরও লেখে "ক্যাসেল ব্যারাকের উপর গুলি চালাবার সময় বহু সাধারণ মানুষ পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরে খাবার ফেলে দিয়েছে। তাতে অনেকের জীবন বিপন্ন হয়েছে। আঠারো বছরের একটি শ্রমিক সন্তান এক প্যাকেট ছোলা নাবিকদের দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে ব্রিটিশ সরকার ধর্মঘটী নাবিকদের উপোস করিয়ে নতি স্বীকার করাতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই শহরে অলিগলি থেকে খাবারের প্যাকেট হাতে বহুলোক ছুটে এল। তারা গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার কাছে এসে নাবিকদের হাতে খাবারের প্যাকেট ও বালতি ভর্তি জল তুলে দিল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে পাহারারত ভারতীয় সৈনিকদের দেখা গেল লোকজনদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে লঞ্চে তুলে দিচ্ছে। ইংরেজ অফিসাররা অসহায়ের মত তাকিয়ে রয়েছেন।"

২৩ ফেব্রুয়ারির টাইমস অব ইন্ডিয়াতে খবর বের হয় যে ২২ ফেব্রুয়ারি সারাদিন ধরে বোম্বাই-এর পথে পথে রক্তস্রোত বইতে থাকে। সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে টমিগান ও রাইফেলধারী ব্রিটিশ ফৌজ মোতায়েন থেকেছে ও যথেচ্ছ গুলি চালিয়েছে। বহুলোকের তাতে মৃত্যু হয়, বহু লোক আহতও হয়। জনতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মিলিটারি লরির উপর আক্রমণ চালাতে থাকে এবং কয়েকটি লরিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে উঠেছে। ভেন্ডীবাজার অঞ্চলের সমস্ত মুসলমান দোকানদার পূর্ব হরতাল পালন করে। সর্বত্র একধ্বনি "হিন্দু-মুসলমান এক হও" আর "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।" নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে সমস্ত সওদাগরী জাহাজের নাবিকরাও ধর্মঘট করে। ছাত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমস্ত ছাত্র ধর্মঘট করে।

লালঝান্ডার ভলান্টিয়াররা বহু আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের সাহায্য করতে মুসলিম লরি ড্রাইভাররা এগিয়ে আসে। বেলা তিনটে নাগাদ দাদার রোড ধরে মিলিটারি লরি আসতে থাকে। প্যারেলে বিনা কারণে মিলিটারি লরি বারবার গুলি ছোঁড়ে। প্যারেল মহিলা সংঘের সম্পাদিকা কমরেড কুসুম রণদিভে, কোষাধ্যক্ষ কমল ঘোষ এবং কমরেড অহল্যা রঙ্গমেকুর রেলওয়েস্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। কমরেড কমল ঘোষের দেহ ভেদ করে একটি বুলেট চলে যায়। গুলি লাগল এসে কমরেড কুসুমের পায়ে। হাসপাতালে কমরেড কমল ঘোষের মৃত্যু হল এই জায়গায় আরও ৪০জন লোক আহত হয়। মানুষের রক্তে জায়গাটা লাল হয়ে যায়।

গণবিপ্লবের স্রোতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হতে চলেছে দেখে যেমন আতঙ্কিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তেমনই ভয় পেয়েছিলেন জাতীয় বুর্জোয়া নেতারা তাই গণবিপ্লব

দমন করার জন্য আপস রক্ষা হয়েছিল বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। তার মাশুল গুনেছে দেশবাসী বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে সর্বস্বান্ত হয়ে, দেশ ভাগ হয়ে ছিন্ন মূল জীবন যাপন করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই শেষ পর্বের ভারতীয় সেনাদলের, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর, ছাত্র ও নওজোয়ানদের বৈপ্লবিক ভূমিকা তাই আজও উপযুক্তভাবে স্থান পায় না অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের লেখায়। ব্যাতিক্রমী ইতিহাসবিদ ২/৪ জন অবশ্যই আছেন যেমন অধ্যাপক সুমিত সরকার, যিনি তাঁর বহুল প্রচারিত বই "মর্ডান ইন্ডিয়া"তে লিখেছেন "১৯৪৬ এর১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতে নৌসেনাদের যে বিদ্রোহ হয় এবং তার সমর্থনে যে গণবিস্ফোরণ দেখা যায়, তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সবচেয়ে গৌরবময় অথচ বিস্মৃত প্রায় অধ্যায়"২১ তাছাড়াও আছে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা R/N Shike ও গোলাম কুদ্দুসের লেখা তথ্য ভিত্তিক উপন্যাস "লেখা নাই স্বর্ণাক্ষরে"

আর আছে বামপন্থী কবি সমর সেনের একটি অসামান্য কবিতা ঃ

"বম্বেতে দিন রেখে গেল বারুদের গন্ধ
রাস্তায় রক্তের ছিটে।
বন্দুকের খর শব্দ থামলে শহরে
বিপ্লবী নেতারা জমে বক্তৃতার মাঠে।
সর্দারের ধমকের গমকে পার্কের রেলিং কাঁপে,
হয়তো কৃত পাপের লজ্জা লাগে মর্গে জমা ২৭০ টা লাশে।
ধোঁকায় জব্দ জাহাজেরা বন্দরে স্তব্ধ।
মাঝে মাঝে উদ্যতসঙ্গীন, সাম্রাজ্যের উদ্ধত প্রতীক।
আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন প্রায়।
মন্ত্রী সভার বিলিতী দূতেরা আগত প্রায়।
জয়হিন্দ"।[২২]

অবশ্য এই সব বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছেন কোনও কোনও বামপন্থী ইতিহাসবিদও। সুনীতি কুমার ঘোষ তাঁর ইংরেজি বই "India and the Ray" এর দশম অধ্যায়টি লিখেছেন The role of CPI from the outbreak of the war to Transfer of Power নামে। তার একটি অংশের নাম CPI and the Post war upsurge of struggle. নানান ভাষ্যকারের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখাতে চাইছেন যে

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণসংগ্রামের ঢেউ সমগ্র ভারতে আছড়ে পড়েছিল, এবং যখন তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা কেঁপে উঠেছিল, তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব "বিহুল ও উল্টেপাল্টা বুঝেছিল" "(Confused and bewildered)। সুনীতি কুমার ঘোষ আরও বলেছেন যে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭, যখন ভারতবর্ষ তাঁর ভাষায় "একটা আগ্নেয় গিরির মাথায় বসেছিল", তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব শ্রেণীসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। আর তার মূল কারণ ছিল যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব বৈপ্লবিক গণসংগ্রামকে ভয় পেত। তবে তিনি এইটুকু স্বীকার করেছেন যে সি পি আই এর নীচের তলার কর্মীবা এই সমস্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল, এমনকি তাদের নেতৃত্বও দিয়েছিল।

সুনীতিকুমার ঘোষের সমালোচনার এইটুকু সঠিক যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ১৯৪৫-৪৬এর সংগ্রামে প্রথম দিকে সত্যই বেশ খানিকটা "Confused" ছিল কিন্তু তারা কোনও সময়ই গণসংগ্রামের বিরোধিতা করেনি। ১৯৪৬ এর ১৩ ফেব্রুয়ারি কমিউনিষ্ট পার্টির দৈনিক "স্বাধীনতা"য়, পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি কমিউনিষ্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী একটি সম্পাদকীয় লেখেন "প্রস্তুত হও" নাম দিয়ে। তাকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আত্মসমালোচনা করে লেখেন যে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার গণ অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতে তাঁদের ভুল হয়েছিল। এখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এখন সারা ভারতে মাঝে মাঝেই ছাত্র নওজোয়ান ও শ্রমিকদের যে উত্তাল গণসংগ্রামগুলি ফেটে পড়ছে, তা হচ্ছে ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে উচ্ছেদ করে পূর্ব স্বাধীনতা- অর্জনের বৈপ্লবিক সংগ্রামেরই সূচনা।

নৌবিদ্রোহের সময় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির এই ভূমিকা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোমনাথ লাহিড়ী এই সময় আর একটি অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় লেখেন "ইহাদের ভুলিবনা" আর ১৯৪৬ এর ৩ মার্চ "পিপলস্ এজ" এ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য বি. টি. রণ দিভে বোম্বাইএর রাজপথে ব্রিটিশ মিলিটারির গুলিতে নিহত শহীদ কমল ঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন "কমল, আমরা লাল পতাকা অর্ধনমিত করছি। ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে সাম্রাজ্যবাদী বুলেটের আঘাতে তোমার জীবনাবসান হ'ল। বোম্বাই শহরের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া যারা নামিয়ে এনেছে, সেই জনশত্রুরাই তোমার জীবন ছিনিয়ে নিল। তোমায় শহীদ হতে হ'ল, কারণ তুমি আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যাওনি। সামরিক বাহিনীকে দেখে তুমি তোমার নিজের স্থান ত্যাগ করনি। তুমি ভারতের বীর কন্যা। তুমি কমিউনিষ্ট পার্টির বীর কন্যা।"[১১]

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর অপর এক সদস্য গঙ্গাধর অধিকারী লেখেন "বাচাল রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনাকে 'রাজকীয় নৌবাহিনীর' ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চান। সাম্রাজ্যবাদের বড় সাহেবরা রক্তচক্ষু দেখিয়ে এই বিদ্রোহকে দমন করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিকরা এক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের শেষ অধ্যায় বলে অভিহিত করবেন।"

সুনীতি কুমার ঘোষ স্বীকার করেছেন যে ১৯৪৬ এর ২৯ জুলাই ডাক-তার বিভাগের কর্মীদের ভারত জোড়া ধর্মঘটের সমর্থনে বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি কলকাতায় এক ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট আহবান করেন এবং কার্যতঃ সেদিন কলকাতায় কোনও ফৌজ বের করতে বা পুলিশ পাঠাতে সরকার সাহস করেনি। অবশ্য সুনীতি কুমার ঘোষ ১৯৪৬ এর ২৪ জুলাই সমস্ত দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বিধানসভা ভবনে যে সাহসী মিছিল ও অবরোধ করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে শ্রমজীবী কৃষকরা জমির-দাবীতে বাংলাদেশে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ জুড়ে কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বাধীন কৃষকসভার নেতৃত্বে যে তেভাগার সংগ্রাম করেছিলেন তা এক উল্লেখযোগ্য যুদ্ধোত্তর গণসংগ্রাম। একই ভাবে সংগ্রাম করেছিল মহারাষ্ট্রের থানা জেলার ওয়ারলি আদিবাসী কৃষকরা কমিউনিষ্ট নেত্রী গোদাবরী পারুল করের নেতৃত্বে, কেরালায় পুন্নাপ্রা ও ভায়লারের সাহসী শ্রমিকরা এক বীরত্বপূর্ণ রক্তাক্ত সংগ্রাম করেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ত্রিবাঙ্কুর কোচে সমস্ত স্বৈর শাসনের অবসানের জন্য এবং সর্বোপরি অস্ত্র হাতে নিজাম শাহীর অবসানের জন্য তেলেঙ্গানার কৃষকরা কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার পরিচালনাধীন অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে, যেখানে শহীদত্ব বরণ করেন। সহস্রাধিক কমিউনিষ্ট কৃষক কর্মী ও নেতা এসবই ইতিহাসের স্মরণীয় সংগ্রাম। এসবই ঐতিহাসিক সত্য, তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অর্ধশতাব্দীরও পরে এই পুরানো ইতিহাসকে ফিরে দেখতে গিয়ে সেযুগের কমিউনিষ্টদের ও ইতিহাসবিদদের কতকগুলি গুরুতর ঘাটতি এখন চোখে পড়ছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম যা মনে হচ্ছে যে এই যে হিন্দুমুসলমান, সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠছিল, যা যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিল, তার গভীরতা কতটা ছিল? সাম্প্রদায়িকতার উৎস পর্যন্ত গিয়ে শিকড় শুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাকে দেশের মাটি থেকে তা উপড়ে ফেলা যায় নি। তা না হলে ১৯৪৬ এর ২৯ জুলাই এর ভারতব্যাপী অভূতপূর্ব গণ-ঐক্য সংঘটিত হবার মাত্র এক পক্ষকাল পরে ১৬ আগষ্ট মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" দিবসে যুদ্ধোত্তর গণবিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র কলকাতীয় যে বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেল তা কি করে সম্ভব হল? আমরা

তখন এর জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে দায়ী করেছি। সন্দেহ নেই যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ঐক্যকে ভাঙবার জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ মৎলব খুঁজছিল। কিন্তু কোন ছিদ্র পথে তারা সেই ঐক্যকে চুরমার করতে সক্ষম হল?

১৯৪৬ এর অর্ধশতাব্দী আগে ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানদের একটা বড় অংশ যোগ না দেওয়ায় যখন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তাদের তীব্র সমালোচনা করছিলেন, তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের সঙ্গে দ্বিমত হয়েছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি হিন্দু ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন যে মুসলমানরা বা তথাকথিত নীচু জাতের মানুষেরা হিন্দু উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকদের (যারাই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের) সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তাঁদের ফরাসে বসতে দেওয়া হত না, হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হত। একাজ করা হ'ত বহু বছর ধরে। তাতে মুসলমানরা ও হিন্দু সমাজের তথাকথিত নীচু জাতের মানুষের মনে যে দারুণ ক্ষোভ বছরের পর বছর জমা হচ্ছিল, তা কি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব মনে রেখেছিলেন? তাঁরা সমস্ত দোষই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছিলেন, নিজেদের দীর্ঘ বছরের অন্যায়ের কোনও আত্ম সমালোচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায় "শনির কাজই তো রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সর্বনাশ করা; প্রশ্ন করি ঃ হে গৃহস্থ তুমি রন্ধ্রপথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলে কেন? যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাখীবন্ধন উৎসবের সূচনা করেছিলেন, যিনি গান বেঁধেছিলেন "বাঙ্গালির ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, হে ভগবান," সেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের এই ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে চলে গেলেন, আস্তানা গড়লেন শান্তিনিকেতনে। তিনি রচনা করলেন তাঁর অসামান্য উপন্যাস "ঘরে বাইরে"। নিখিলেশ ও সন্দীপের দুই বিপরীত চরিত্রের মধ্যে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের আত্ম সমালোচনামূলক দৃষ্টি ভঙ্গীটি ফুটিয়ে তুললেন।

কিন্তু এই মারাত্মক ভ্রান্তি জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা ধরতে পারলেন না। আর সেই ভুলের মাশুল দেশবাসীকে দিতে হ'ল দেশ ভাগ, ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং ছিন্নমূল জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে। সম্ভবতঃ একমাত্র গান্ধীজি প্রথম থেকেই জাতীয় আন্দোলনের এই গভীর ত্রুটি ধরতে পেরেছিলেন, অস্পৃশ্যতা বিরোধী হরিজন আন্দোলন করেছিলেন। মন্ত্রের মত গান জপে চলেছিলেন 'ঈশ্বর-আল্লা তেরি নাম'। ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বাহ্নে একমাত্র তিনিই কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলেছিলেন যে এখন হস্তান্তরে রাজি না হয়ে, তাঁরা আবার গোড়া থেকে অনৈক্যের উৎস সন্ধান করে তা শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার সময় সাপেক্ষ

ধৈর্যশীল কাজে হাত লাগান। কিন্তু তাতে একমাত্র সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্‌ফ্‌র খান ছাড়া কোনও নেতাই সম্মত হলেন না, এমনকি গান্ধীজির গভীর অনুরক্ত জওহরলাল নেহরুও না। গান্ধীজি তাঁর হাতে গড়া কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং অবিরাম বড় বড় প্রার্থনা সভা করে যেতে লাগলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। চলে গেলেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে ও কলকাতায়। আশ্চর্য রকমভাবে ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্টের একদিন আগে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে গেল, ১৫ আগষ্ট পরিণত হ'ল হিন্দু মুসলিম মিলনের উৎসবে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সাপ মরে নি, আহত হয়ে গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল মাত্র। বার বার মাথা তুলছিল। গান্ধীজি কলকাতায় দাঙ্গা থামার পর চলে গেলেন দিল্লিতে, প্রার্থনা সভা করে যেতে লাগলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য। নতুন রণধ্বনি দিলেন দেশবাসীর সামনে। "হিন্দুস্থান ঔর পাকিস্তান মিলকে রহেঙ্গে, মিলকে চলেঙ্গে"। কিন্তু এই রণধ্বনি উগ্রসাম্প্রদায়িকতবাদীর ক্রুদ্ধ করল এবং ১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারি প্রার্থনা সভায় প্রার্থনারত গান্ধীজিকে গুলি করে হত্যা করল, উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক সংঘের কর্মী নাথুরাম গডসে। গান্ধীজির শহীদত্ব বরণ তখনকার মত থামিয়ে দিল দেশ জোড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে, কিন্তু তার মূলোচ্ছেদ করতে পারল না। সে দায়িত্ব বামপন্থীরাসহ দেশের জাতীয় নেতৃত্ব দীর্ঘ বহু বছর পালন করতে পারলেন না।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানী নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা থেকে এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"এ সমস্যা রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিল, তবে কিছুটা পরে ও অন্যভাবে। তাছাড়া তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল আর একটি নূতন সমস্যা এবং তা ভয়াবহ। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন যখন উত্তেজনার শিখর চূড়ায়, তখন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটি প্রচন্ড দাঙ্গা হয়ে গেল। সেই দাঙ্গায় প্রথম আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। মনে হল, কোথায় যেন বড় রকমের একটা হিসেবের গোলমাল হয়ে গেছে। কাউকে কিছু না বলে, কোনও কৈফিয়ৎ ওজুহাত না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর আর কোনও যোগ রইল না। কিন্তু তখন বেশী দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে দেশে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্বন্ধটা ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রভুদের রাজনৈতিক দাবা খেলার বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ১৯৪৭এ সেই দাবা খেলার শেষপর্ব। সে-পর্বে যেভাবে ঘুটি চালাচালি হল উভয়পক্ষে তাতে আমরা

হেরে গেলাম। সেই হেরে যাবার দাম আজও আমরা দিচ্ছি। আরও কতকাল দিতে হবে, কে জানে!"

২০০৪ খৃষ্টাব্দের সূচনাতেও সেই হেরে যাবার দাম আজও আমরা দিচ্ছি। এসব কিছু সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারত ব্যাপী যে অভূতপূর্ব গণবিদ্রোহ হয়েছিল, যাতে অংশ নিয়েছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র, যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আমাদের মত যে তরুণেরা ছিলাম, তাদের মধ্যে যারা সাম্রাজ্যবাদের দমননীতিতে প্রাণ দিয়েছেন, কারাবরণ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের দিন তারা এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছে, যে ভারত ব্যবচ্ছেদকে তারা রুখতে পারেনি, তার ফলে যে সাম্প্রদায়িকতা বারে বারে দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে যে বহু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসী ঘুরে দাঁড়িয়েছে, স্বৈরতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয়কে যে তারা প্রতিহত করেছে, ভারতে যে কখনও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে তারা দেয়নি, এসবই অতীতের সেই গণবিদ্রোহের ঐতিহ্য থেকে তারা এগোবার শক্তি পেয়েছে। এসব কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণবিদ্রোহের আলোচনা করতে গিয়ে সে যুগের যে সব অবদান, শক্তি ও দুর্বলতার কথা বলেছি, সে সবই এখন ফিরে দেখে সঠিক বলে মনে হয়, তবু এই গণবিদ্রোহের ঐতিহ্য আমাদের দেশের ইতিহাসের এক গর্ব। ঐ যুগের তরুণ বিপ্লবী কবি সুকান্ত ঐ যুগের সংগ্রামীদের সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তাই দিয়েই শেষ করছি।

"বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে!
আমি যাই তার দিন পঞ্জিকা লিখে।
এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ!
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
আজ দেখ তারা সবেগে সমুদ্যত!
নয়া ইতিহাস লিখেছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট!
তাদেরই দলে আমিও যে আছি
তাদেরই মধ্যে আমিও মরি বাঁচি!
তাই তো চলেছি দিন পঞ্জিকা লিখে।
বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে!"[২৬]

পদটীকা ঃ-

১। অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩ নভেম্বর ১৯৪৫

২। তদেব

৩। অমৃতবাজার পত্রিকা ২২, ২৩ ও ২৪ নভেম্বর ১৯৪৫, December 1945 এর Bombay থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক The Student পত্রিকায় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ "In Letter of Blood" এবং Home/Pol/FN21/11/45, NAI.

৪। "Peoples' Age" organ of the (weekly) Communist Party of India, 7 December 1945. Bombay.

৫। তদেব

৬। অমৃতবাজার পত্রিকা ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

৭। ক্যালকাটা ডিসটারবেন্স রিপোর্ট, ১২/২/৪৬ সিক্রেট হোম/পল/এফ.এন ৫/১২/৪৬

৮। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

৯। তদেব

১০। তদেব ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের দিনলিপি থেকে

১১। তদেব

১২। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

১৩। টাইমস অফ ইন্ডিয়া, বোম্বাই ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

১৪। টাইমস অফ ইন্ডিয়া বোম্বাই ২০, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৫। স্টেটসম্যান কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৬। অমৃতবাজার পত্রিকা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৭। তদেব

১৮। ষ্টেটসম্যান, কলকাতা ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬

১৯। অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩/২/১৯৪৬

২০। সারফ্রান্সিস টুকার ঃ হোয়াইল মেমারি সার্ভস, লণ্ডন, ১৯৪৯

২১। সুমিত সরকার ঃ মর্ডান ইন্ডিয়া ১৮৮৪-১৯৪৭, পৃঃ৪২৩

২২। সমর সেনের কবিতা, কলকাতা ১৯৫৪

বর্মার মুক্তিসংগ্রামে বাঙালী কমিউনিস্ট বীরেরা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১

পটভূমিকা

১৮২১-২২ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত, ৬০ বছরেরও বেশী পর পর কয়েকটি আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ধাপে ধাপে দখল করে বর্মাকে। স্বাধীন, পশ্চাৎপদ একটি রাজ্যকে পরিণত করে তাদের লুণ্ঠনের উপনিবেশে। এই সাম্রাজ্যবাদী অভিযান চালনা করা হয়েছিল ভারত, বিশেষত বাংলাদেশকেই ঘাঁটি করে। আর ইংরেজ অফিসারদের অধীনে বর্মা জয় করতে সাহায্য করেছিল ইংরেজের বেতনভূক ভারতীয় সৈন্যরাই; ইংরেজ শাসকদের অধীনে প্রশাসক, কেরাণী ও বিভিন্ন পেশাদারী কাজে নিযুক্ত হয়ে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনাতেই বর্মাতে এসে বসবাস শুরু করলেন বহু সহস্র ভারতীয়-বাঙালী ও দক্ষিণ ভারতীয়।

যেসব শিক্ষিত ভারতীয়রা এই প্রথম যুগে বর্মাতে এলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হয় ডাক্তার, নয়ত শিক্ষক, আইনজীবী বা সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের বেতনভূক কর্মচারী। বর্মার সমস্ত সরকারী দপ্তর, রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি ভর্তি ছিল ভারতীয় কর্মচারী দিয়ে, যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল বাঙালী। তাছাড়া ছিলেন তামিলনাড়ু থেকে আসা ব্যবসায়ী-মহাজনরা, চেট্টিয়াররা। ১৯২৯-৩০-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সময়, বর্মার চাষীদের দারিদ্রের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে, এই অর্থ পিশাচ চেট্টিয়াররা বেহাত করে নেয় বর্মার চাষ-যোগ্য সমস্ত জমির শতকরা ৬০ ভাগ। বলা বাহুল্য এই চেট্টিয়াররা ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত সাকরেদ। আর বাঙালী কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবিরাও বর্মীদের প্রতি ব্যবহার করতেন উদ্ধত মনিবেরই মত।[১]

পরবর্তী কালের একজন বর্মা-প্রবাসী বাঙালী বিপ্লববাদী (পরে বর্মার কমিউনিস্ট

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সভাপতি

পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) মন্তব্য করেছেন ঃ "আমার বাবা বর্মাতে বসবাস শুরু করেন ১৯০৯-তে। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও বর্মীভাষা শেখেন নি এবং এর জন্য তিনি বেশ গর্বই বোধ করতেন। অনেক বর্মীরাই সেই যুগে ভারতীয়দের ডাকতেন 'যাকিন' বলে—যে শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভু।"[২]

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের সূচনাতে বর্মাতে শিল্প প্রায় ছিল না বললেই চলে। যেটুকু সামান্য শিল্প ছিল—করাতের কারখানা, চালকল ও পরে তৈল শোধনাগার তাতে প্রায় সমস্ত শ্রমিকই ছিল ভারতীয়। অন্ধ্রপ্রদেশ ও উড়িষ্যার দারিদ্র্যপীড়িত জেলাগুলি থেকে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষদের সংগ্রহ করে বর্মাতে তাদের শ্রমিক হিসাবে চালান দিত একদল ঠিকাদার—বর্মী ভাষাতে যাদের বলা হত 'মেইস্ত্রি'। বন্দর শ্রমিক ও জাহাজের খালাসীরা প্রায় সবাই ছিল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর দরিদ্র বাঙালী মুসলমান। ১৯৩০ অবধি বর্মীরা মজুরদের চাকরী নিত না বললেই চলে। কিন্তু ১৯২৯-৩০-এর বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক সংকটে যখন বর্মাতেও হাহাকার পড়ে গেল, তখন হাজার হাজার সর্বস্বান্ত বর্মী চাষী মজুরদের চাকরী নিতে ভীড় করল রেঙ্গুনে ও অন্যান্য শহরে। তখনই তারা প্রথম আবিষ্কার করল যে সমস্ত মজুরের চাকরি প্রায় একচেটিয়া তেলেগু-ভাষী ভারতীয় শ্রমিকদের। ফলে বর্মী গরীবদের দারিদ্র্য-বিরোধী অন্ধ রাগ ফেটে পড়ল তেলেগু-ভাষী ভারতীয় বিরোধী প্রবল গণ-বিস্ফোরণে।[৩]

বর্মার গরীব মানুষ কিন্তু কোনদিনই মাথা পেতে মেনে নেয় নি ইংরেজ শাসনকে। বারবারই সেদেশে ফেটে পড়েছে কৃষকদের খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ। রক্তাক্তভাবে সেগুলি দমন করেছে ইংরেজরা, প্রধানত ভারতীয় সৈন্যদেরই মাধ্যমেই। ফলে ভারতীয়দের সঙ্গে বিশেষ কোনও প্রীতির সম্পর্ক ছিল না বর্মীদের। এর মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম ছিল, বর্মাকে ঘাঁটি করে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের গুপ্ত কার্যকলাপ। ১৯১৫ ও ১৯১৬তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের গদর বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা দুটি ষড়যন্ত্র-মামলা পরিচালনা করে বর্মাতে, তাতে ফাঁসী যান একাধিক ভারতীয় বিপ্লবী—সোহনলাল, হরণাম সিং, মুজতাবা হুসেন প্রমুখ।[৪]

১৯৩১-এ মধ্যবর্মার থারাওয়াডি জেলাতে (থারাওয়াডি শব্দটি সরস্বতীর অপভ্রংশ) একটি বিরাট গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বর্মাতে ইংরেজ শাসনের এবং জমিদারি ও মহাজনী শোষণের উচ্ছেদ-সাধন। এই কৃষক বিদ্রোহের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন সেয়া সান। দেড় বছর ধরে এই কৃষক

বিদ্রোহ, বর্মার বহু জেলাতে ইংরেজ শাসনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেছিল। তারপর, প্রধানত ভারতীয় সেনাদের সাহায্যে, বহু গ্রাম জ্বালিয়ে, বহু নরনারীকে হত্যা করে, ইংরেজরা নৃশংসভাবে দমন করতে সক্ষম হয় এই গণবিদ্রোহকে। সেয়া সান ও তাঁর বহু সহযোদ্ধার ফাঁসী হয়। ইংরেজদের সরকারী হিসাব অনুযায়ী ফাঁসী হয় ২৭৪ জন বর্মী বিপ্লবীর ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় আরও ৬০০ জনের।[৫]

একজন পুরানো বাঙালী বিপ্লবী তখন বন্দী ছিলেন মৌশমীনের কারাগারে। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন ঃ

"আজও মনে পড়ে ব্রহ্মের সেই বিপ্লবী বীরদের ফাঁসিমঞ্চে যাবার সময় ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে শেষ বিদায় সম্ভাষণবাণী—বাবুরং, তোয়ারমে, তোয়ারমে—বাবুরা, আমরা চললাম...।[৬]

২

বর্মাতে মুক্তি সংগ্রামে নতুন হাওয়া (১৯৩২-৩৮)

সেয়া সানদের পরিচালিত গণবিদ্রোহই বর্মাতে জাতীয় গণজাগরণের সূচনা করে। অল্পদিনের মধ্যেই বর্মায় অগ্রণী দেশপ্রেমিকরা একত্র হয়ে গঠন করেন তাঁদের প্রথম জাতীয় সংগঠন 'দো বামা' (আমাদের বর্মা) দল। এই একই সময়ে বর্মা-প্রবাসী বিপ্লববাদী বাঙালী ছাত্ররা গঠন করেন বেঙ্গলী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, যার আড়ালে চলত গুপ্ত বিপ্লবী প্রচার।[৭] অল্পদিনের মধ্যে এঁদেরই মাধ্যমে ভারতীয় ও বর্মী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে স্থাপিত হয় প্রথম সখ্যতার যোগসূত্র।

১৯৩৭-৩৮-এ বর্মা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবীতে বর্মার সমস্ত কলেজে ছাত্র ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন তরুণ বর্মী বিপ্লবী আউং সান, আর তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন কয়েকজন বামপন্থী, বিপ্লবী বাঙালী ছাত্র—হরিনারায়াণ ঘোষাল, মাধব মুন্সী, সুবোধ মুখার্জি, অমর নাগ, বারীন দে প্রমুখ।[৮]

তাঁদেরই একজন বহু বছর পরে বলেছেন ঃ

"তখন আমাদের রক্ত চঞ্চল— দেশ স্বাধীন করতেই হবে। হাতের কাছে বামপন্থী পত্র-পত্রিকা যা পেতাম, তাই আমরা গোগ্রাসে পড়তাম—বিশেষত 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট' মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া' এবং ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত বামপন্থী পত্রিকা 'ট্রিবিউন'। এটা ছিল অন্ধকারে পথ হাতড়ানো, কিন্তু হোঁচট খেয়েও

এগিয়ে যাবার যুগ।[৯]

আউং সান ও বাঙালী বিপ্লবীরা ঠিক করলেন, ভারতে যেতে হবে, জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ১৯৩৮-এর শেষে তাই ঢাকা হয়ে কলকাতায় গেলেন মাধব মুন্সী, হরিনারায়ণ ঘোষল ও অমর দে। ঢাকাতে সংযোগ হল আদি যুগের অন্যতম প্রথম মহিলা কমিউনিস্ট লতিকা দাসের (পরে ডঃ রণেন সেনের সহধর্মিনী) সঙ্গে ও তাঁর মারফৎ কলকাতায়, বে-আইনী সি. পি. আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রণেন সেনের সঙ্গে।[১০] তাঁরই পরামর্শে বর্মা থেকে আগত বিপ্লবীরা গেলেন জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে, কথা বললেন, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, জয়প্রকাশ ও পি. সি. যোশীর সঙ্গে। সিদ্ধান্ত করলেন দুটি ঃ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের, বিশেষত বামপন্থীদের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন আর বর্মাতে ফিরে গিয়ে গড়ে তুলবেন একটি কমিউনিস্ট পার্টি।[১১]

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। আর ১৯৪০-এর সূচনাতে রেঙ্গুনের শহরতলী কামায়ুতে গোপন এক সভা থেকে জন্ম নিল বর্মার কমিউনিস্ট পার্টি। সেই সভাতে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে যাঁরা হাজির ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম আউং সান, যাকিন সো, থান দুন, বা হিয়েন, হরিনারায়ণ ঘোষাল, মাধব ও গোপাল মুন্সী, অমর নাগ, অমর দে, সুবোধ মুখার্জি, বিনয় সেন, অরবিন্দ দত্ত প্রমুখ। পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন আং সান।[১২] ১৯৪০-এ রামগড়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধিদল নিয়ে যোগ দিতে এলেন স্বয়ং আউং সান। তাঁদের শিবিরে উড়ত লাল ঝাণ্ডা তাই নিয়ে গান্ধীজী আপত্তি করলে, নেহরুর হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয়।[১৩]

৩

জাপানী আক্রমণ ও মুক্তিসংগ্রামের নতুন পর্ব (১৯৪১-১৯৪৭)

১৯৪১-এর মধ্যে বর্মার কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গড়ে উঠল বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন—বন্দরে, তৈল শোধনাগারে, করাত কলে। তেলেগুভাষী শ্রমিকদের মধ্যে বেরিয়ে এলেন জঙ্গী নেতা সুরি নারায়ণ, যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। বর্মী কমরেডরা প্রধানত কাজ করতেন দো বামা দলের মধ্যে, ভারতীয় কমরেডরা শ্রমিকদের মধ্যে, যেখানে ভারতীয়ই বেশী। ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজ সরকার ব্যাপকভাবে

গ্রেপ্তার করল বর্মার কমিউনিস্টদের—বর্মী ও ভারতীয় সবাইকে।

১৯৪১-র ডিসেম্বরে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১৯৪২-এ তারা দ্রুত এগোতে লাগল বর্মার দিকে। হাজার হাজার ভারতীয় বর্মা ছেড়ে, গহন অরণ্য পথে ভারতের দিকে যাত্রা করলেন, বহু মানুষ প্রাণ হারালেন। ইংরেজ শাসকরা পালিয়ে গেল বর্মা থেকে কলকাতায়। আউং সান মনে করলেন বর্মাকে স্বাধীন করা যাবে জাপানীদের সাহায্যে, যোগ দিলেন তাদেরই সঙ্গে। পরে অবশ্য তাঁর মোহভঙ্গ হয় এবং ১৯৪৪-এর শেষে জাপানী দখলকারীদের বিরুদ্ধে বর্মার কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলে সংঘটিত করেন সশস্ত্র গণউত্থান।[১৪]

বাঙালী কমিউনিস্টদের অনেকে জেল ভেঙে বেরিয়ে এসে, অবর্ণনীয় বিপদ ও দুঃখকষ্ট সহ্য করে ভারতে চলে আসতে সক্ষম হন। সুবোধ মুখার্জীর মত কেউ কেউ থেকে যান বর্মাতে, থান টুন ও থাকিন সো'র সঙ্গে, সংগঠিত করেন জাপবিরোধী গেরিলা সংগ্রাম।[১৫] যুদ্ধ শেষ হলে তাঁরা বেশীর ভাগই ফিরে গেলেন বর্মাতে। আউং সানের সঙ্গে একত্রে গড়ে তুললেন ফ্যাসী-বিরোধী জনগণের সংঘ। ১৯৪৬-এ তার মহাসম্মেলন হল। গণবিক্ষোভে উদ্বেল হল বর্মা। পিছু হঠল ইংরেজরা। ১৯৪৮ বর্মা স্বাধীন হবে এই ঘোষণা করে। গঠন করল অন্তর্বর্তী সরকার—আউং সান হলেন তার প্রধানমন্ত্রী। কমিউনিস্ট নেতা থান টুন রইলেন সংঘের প্রধান সম্পাদক। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে আততায়ী দিয়ে হত্যা করাল আউং সান ও তাঁর ৬ জন নেতৃস্থানীয় মন্ত্রীকে।[১৬]

বর্মার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্টে চীড় ধরল। দক্ষিণপন্থী, আপসমুখী ঝোঁক দেখা দিল বর্মা জাতীয়তাবাদী নেতা উ নু ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে। থান টুন, ঘোষাল প্রভৃতি বহিষ্কৃত হলেন সংঘ থেকে, পরিকল্পনা করলেন চীনা-বিপ্লবের পথে ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের ও সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের। দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলে সেই অসীম বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র গণমুক্তির সংগ্রাম। একে একে তাতে শহীদ হন প্রায় সব কমিউনিস্ট নেতাই—থান টুন, ঘোষাল, সুবোধ মুখার্জী, গোপাল মুন্সী, অমর দে ও অমর নাগ। তার বিস্তৃত, গৌরবময় বিবরণ এই প্রবন্ধের পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু ১৯৫০-এ, বোম্বাইয়ের একটি সাপ্তাহিক বর্মার মুক্তিসংগ্রামের এই পর্বের যা মূল্যায়ণ করেছিল, তার একটু তুলে দিচ্ছিঃ

"বর্মাতে আসলে যা হচ্ছে, তা হল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সংহতি সাধন। ১৯৫০-এর ২৯শে মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর থেকে

বোঝা যাচ্ছে যে বর্মার জনসংখ্যার শতকরা ৪১ ভাগ বা ৭০ লক্ষ লোক ও ৭১ হাজার বর্গমাইল এলাকা এখন মুক্ত।"[১৭]

বর্মার এই বীর বাঙালী কমিউনিস্টরা বর্মাকেই তাঁদের মাতৃভূমি মনে করে, আরামের জীবন ছেড়ে, বর্মার শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ মনে করে সারা জীবন লড়েছেন। দীর্ঘ ২০ বছর তাঁদের ঘরবাড়ি ছিল বর্মার পাহাড় ও জঙ্গল। রাজনীতির যাই ভুল-ভ্রান্তি ঘটুক, মুহূর্তের জন্যও তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি বর্মার মেহনতী জনগণের সঙ্গে। শেষ অবধি বরণ করেছেন বীরের মৃত্যু, সশস্ত্র সংগ্রামে। তাই তাঁদের জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

সূত্র নির্দেশ

১। হল, বার্মা (লণ্ডন, ১৯৩৮) ও ডরোথি উড ঃ বার্মা (লণ্ডন, ১৯৫৯)

২। বারীন দে, সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ৩০শে মার্চ, ১৯৬৯

৩। মাধব মুন্সী, সাক্ষাৎকার, কলকাতা ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮

৪। কালীচরণ ঘোষ ঃ রোল অব অনার, কলকাতা ১৯৬৫, পৃঃ ৩৫৮

৫। বর্মা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ (ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা থেকে)

৬। গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, অবিস্মরণীয়, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ ২৪৭

৭। জিতেন ঘোষ, জেল থেকে জেলে, ঢাকা, ১৯৬৯

৮। মাধব মুন্সী, সাক্ষাৎকার, পূর্বোধৃত

৯। ঐ

১০। রণেন সেন, সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ৫ই নভেম্বর, ১৯৮২

১১। মাধব মুন্সী, সাক্ষাৎকার, পূর্বোধৃত

১২। মাধব মুন্সী ও অরবিন্দ দত্ত, সাক্ষাৎকার, কলকাতা ৩০শে মার্চ, ১৯৬৯

১৩। পট্টভি সীতারামাইয়া, হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং নেহরু, দি ফার্স্ট সিক্সটি ইয়ারস

১৪। থেন পে, দি অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট ওয়ার ইন বার্মা, বোম্বাই, ১৯৪৫

১৫। গৌতম চট্টোপাধ্যায়,, বর্মার মুক্তিসংগ্রামে বাঙালী কমিউনিস্ট বীরেরা, শারদীয় সপ্তাহ, ১৩৭৭ (১৯৭০), কলকাতা।

১৬। পিপলস এজ, ৬ই আগস্ট, ১৯৪৭, বোম্বাই

১৭। ক্রশরোডস্, ৫ই মে, ১৯৫০

দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয়দের ভূমিকা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৭৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের কিংবদন্তীর নায়ক নেলসন ম্যাণ্ডেলা আন্তর্জাতিক মৈত্রীর জন্য জওহরলাল নেহরু পুরস্কার পান। তখন তিনি বর্ণবিদ্বেষী প্রিটোরিয়া সরকারের কারাগারে। জেল থেকে তিনি নেহরু পুরস্কার কমিটির সম্পাদক শ্রীমতী মনোরমা ভাল্লাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

"আমাদের দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ দীর্ঘদিনের। আমরা তাদের কাছে প্রেরণা পেয়েছি, আমাদের আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। ভারতীয়দের কাছে আমরা বাস্তব সহযোগিতা অর্জন করেছি। ... ১৮৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচীনতম সংগঠন—নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস—মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই ছিলেন ঐ সংগঠনের প্রথম সম্পাদক। দীর্ঘ ২১ বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। আমরা তাঁর চিন্তার উৎস এবং প্রতিবাদ সংগঠিত করার পদ্ধতির প্রত্যক্ষদর্শী।"[১]

১৮৯৪এ দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের সঙ্গে সেখানকার ভারতীয় বাসিন্দাদের সংগ্রামী ঐক্যের যে সেতুবন্ধের সূচনা হয়েছিল, সেই অঙ্কুর ক্রমে বনস্পতিতে পরিণত হয়। এই শতাব্দীর ষাটের দশকে যখন ষড়যন্ত্র মামলাতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন নেলসন ম্যাণ্ডেলা ও তাঁর সহযোদ্ধারা এবং বেআইনী ঘোষিত হল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি, তখন তার সঙ্গেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ১৮৯৪তে গান্ধীজি প্রতিষ্ঠিত নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসও। আর দীর্ঘ তিন দশক পরে ১৯৯০ এর ফেব্রুয়ারিতে যখন এ. এন. সি. ও কমিউনিস্ট পার্টি আবার আইনী ঘোষিত হল সেই একই দিনে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের উপর থেকেও। এর থেকে আমরা একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই যে বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিষ্ট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের ভূমিকা কি ধরনের ছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত আলোচ্য প্রবন্ধটি ইতিহাস অনুসন্ধান (৩) তে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল স্রোত দেখা দিল, তখন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের নরমপন্থীদের হঠিয়ে, তাদের স্থানে এলেন সংগ্রামী নেতারা নাটালে ডঃ নাইকার ও ট্রান্সভালে ডঃ ইউসুফ মহম্মদ দাদু। ১৯৪৫এর মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসীবাদের পরাজয় ও মিত্রশক্তির জয়কে অভিনন্দিত করে জোহানেসবুর্গে লক্ষ মানুষের সুবৃহৎ মিছিল বের হয়। একে সংগঠিত করেছিলেন সম্মিলিতভাবে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস ও অ-শ্বেতকায় ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ।[২]

এ. এন. সি.র সংগ্রামী নেতৃত্বে তখন রয়েছেন ডঃ এ. বি. জুমা। তাঁকে জোরালো সমর্থন জানাচ্ছিলেন এ. এন. সি.র উদীয়মান যুব নেতৃত্ব—অলিভার টাম্বো, সিসুলু ও নেলসন ম্যাণ্ডেলা। তাঁরা উদ্যোগ নিলেন কৃষ্ণ আফ্রিকান ও ভারতীয়দের মধ্যে সংগ্রামী মৈত্রী গড়ার। ভারতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে সাড়া দিলেন ডঃ নাইকার ও ডঃ দাদু। ১৯৪৭ এর মার্চ মাসে জোহানেসবুর্গে স্বাক্ষরিত হল ডঃ জুমার সঙ্গে ডঃ নাইকারও ডঃ দাদুর চুক্তি।[৩] কৃষ্ণ আফ্রিকান ও ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার মঞ্চ রচিত হল।

ডঃ ইউসুফ মহম্মদ দাদু ট্রানসভালের কৃতী চিকিৎসক ও শ্রমিক নেতা। বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছেন বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনার "অপরাধে"। ষাটের দশকে তিনি নির্বাচিত হন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে। দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির তিনিই ছিলেন সভাপতি এবং সমগ্র কৃষ্ণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। ষাটের দশকেই ভারতে এবং মহানগরী কলকাতায় তিনি এসেছেন, আমাদের সামনে অবিস্মরণীয় বক্তৃতায় বলেছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত নিপীড়িত মানুষেরই রঙ এক ও তাদের সংগ্রাম ও মুক্তি একই সূত্রে গাঁথা।[৪]

১৯৮১তে নির্বাসনে, ইংলণ্ডে ডঃ দাদুর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি রয়েছে লণ্ডনের প্রান্তে হাইগেট কবরখানায়, যেখানেই সামান্য দূরে রয়েছে কার্ল মার্কসের সমাধি।

নেলসন ম্যাণ্ডেলার সঙ্গে আরও ৬ জন মুক্তিসংগ্রামী নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এ. এন. সির যুব নেতা ও কমিউনিস্ট, ভারতীয় বংশোদ্ভূত আহমেদ কাথরাডা।

২৬ বছর কারারুদ্ধ থাকার পর ১৯৮৯তে তিনি মুক্তি পান সিসুলুর সঙ্গে, নেলসন ম্যাণ্ডেলার কয়েক মাস আগে। মুক্তি পেয়েই তিনি আবার ঝাঁপিয়ে

পড়েন বর্ণবৈষম্যবাদী শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে।

এ. এন. সি. পরিচালিত দুই দশকব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার শতাধিক ভারতীয়। এ. এন. সি.র সামরিক শাখার অন্যতম প্রধান ছিলেন একজন ভারতীয়, এ. এন. সি.র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য 'ম্যাক' মহারাজ। তিনি মুক্তি পেয়েছেন সবার শেষে, ১৯৯১র জুন মাসে।[৫]

তাছাড়া, প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিকের, জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী শ্রমিক সংস্থা কোসাটুর সাধারণ সম্পাদক একজন ভারতীয়—জয় নাইডু।[৬]

কোসাটু, এ. এন. সি. নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের এক যুক্ত বৈঠকের পর ভারতীয় ও কৃষ্ণ আফ্রিকানদের মধ্যে ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়েছে। নয়া সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করছে জুলু উপজাতিকে উস্কিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে ফাটল ধরাতে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে, ঐক্যের রণনীতি নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন নেলসন ম্যাণ্ডেলা, সিসুলু ও জয় নাইডুর মত নেতারা। কৃষ্ণকায় আফ্রিকান, ভারতীয় বাসিন্দা ও প্রগতিশীল শ্বেতকায়দের সম্মিলিত উদ্যম বর্ণবিদ্বেষের পড়ন্ত দুর্গটিকে অচিরেই ধুলিসাৎ করতে সক্ষম হবে—ইতিহাস আমাদের এই ভরসাই দেয়।

নেলসন ম্যাণ্ডেলার চিঠির অংশ দিয়েই শেষ করি—

"আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাই ভারতের মানুষের মিছিলে, পৃথিবীর মিছিলে— যে মিছিল আগামী দিনের উজ্জ্বল আলোকধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে এই পৃথিবী হবে সমস্ত মানুষের জন্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীরই স্বপ্ন দেখেছিলেন ঃ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য
উচ্চে যেথা শির .....।"[৭]

সূত্র নির্দেশ

১। ভারতবর্ষের প্রতি নেলসন ম্যাণ্ডেলা ঃ কালান্তর, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯০

২। আফ্রিকান কমিউনিস্ট, সংখ্যা ৪৬, ১৯৭১

৩। ঐ

৪। সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ, কলকাতায় সম্বর্ধনা সভার উত্তরে ডঃ দাদুর ভাষণ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

৫। সেচাবা (এ. এন. সি.র ইংরেজি মুখপত্র), জুলাই, ১৯৯১

৬। ইন্টারন্যাশনাল ভিউপয়েন্ট, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

৭। কালান্তর, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯০

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তিসাধন ঃ একটি সঠিক পদক্ষেপ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯১৯ এ রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় এবং লেনিন, ট্রট্স্কি, জিজোভিয়েভ প্রমুখর উদ্যোগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক, সংক্ষেপে যাকে বলা হত কমিষ্টার্ন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা এসে যোগ দেন এই সংস্থায়। ১৯২০তে অনুষ্ঠিত কমিষ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিপ্লবীও, যাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামেই তখন পরিচিত। ১৯৪৩ এ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে একটি ছোট পুস্তিকাতে এম. এম. রায় লেখেনঃ "২৫ বছর আগে যেদিন থেকে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের জন্ম হয়েছে, সেদিন থেকে ঐ সংস্থাটি বিশ্বের সমস্ত শাসক শ্রেণীর কাছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। আজও কট্টর প্রতিক্রিয়াশীলদের ও নির্বোধ রক্ষণশীলদের কাছে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের তেমনই আতঙ্কের বিষয়।"[১]

জার্মান ফ্যাসীবাদের সঙ্গে মৃত্যুপণ যুদ্ধের যখন সোভিয়েত ইউনিয়নও সমগ্র মানব সভ্যতা লিপ্ত, তখন ১৯৪৩-এর ১৫মে, কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির সভাপতিমণ্ডলী এক যুক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে জানিয়ে দেন যে তাঁরা দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তকে সোচ্চার অভিনন্দন জানান, প্রকাশ্যেই আশা প্রকাশ করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিরা বিশ্ববিপ্লবের আদর্শকে নিশ্চয় এবার পরিত্যাগ করবেন।

ব্যারাকপুরে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত আলোচ্য প্রবন্ধটি ইতিহাস অনুসন্ধান (১২) তে প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্টদের কাছে এই ঘোষণা এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল, যে তাঁরা সকলেই তৎক্ষণাৎ এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারেননি। ১৯৩০ এর দশক থেকেই পৃথিবীর কমিউনিষ্ট মহলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমালোচনা করতে শুরু করেছিলেন, যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে সংগঠিত করার ও নেতৃত্ব দেবার বদলে, কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক কার্যতঃ সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের সমালোচনা প্রকাশ্যে করেন রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক ও কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লিয়ঁ ট্রট্স্কি। তাছাড়াও জার্মানি, পোল্যাণ্ড, স্পেন, ইতালী ও জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের একাংশ এই ধরনের সমালোচনা করতে থাকেন। তবে ১৯৪১ এর ২২ জুন নাৎসী সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করলে, এই সব সমালোচনা মুলতবী থাকে। ম্যাসীবাদকে চূর্ণ করাই সব প্রবণতার কমিউনিষ্টদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই পটভূমিতেই আসে ১৯৪৬এর ১৫মে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক বিলুপ্তির ঘোষণাপত্র।

অর্ধশতাব্দীরও পরে আজ প্রথম প্রয়োজন ঐ ঘোষণা পত্রটিতে কি বলা হয়েছিল, তা ভাল করে পড়া ও তার মূল্যায়ণ করা। দলিলটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক জর্জি ডিমিস্ট্রভ, ইতালীর কমিউনিষ্ট নেতা এম. এরকালি (পালামিরো তোগলিয়াত্তি) ফরাসী কমিউনিষ্ট নেতা আন্দ্রে মার্তি, জার্মান কমিউনিষ্ট নেতা উইলহেলেন পিয়েক, ফরাসী কমিউনিষ্ট নেতা মরিস তোঁরেজ, চেকোস্লোভাক কমিউনিষ্ট নেতা ক্লিমেন্ট গোটওয়াল্ড, বুলগারিয়ান কমিউনিষ্ট নেতা ভি কোলারভ, রূমানিয়ান কমিউনিষ্ট নেত্রী আমা পাউকার, স্পেনের কমিউনিষ্ট নেত্রী ভলরেড ইবারুবি, হাঙ্গেরির কমিউনিষ্ট নেতা মাতিয়াস রাকোসি, ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিষ্ট নেতা অটো কুসিবেন, সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিষ্ট নেতা এ. জ্ দানভ ও ডি. মানুইলস্কি।[২] বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে চীন, জাপান, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও কমিউনিষ্ট নেতার সই দলিলটিতে নেই, যদিও তাঁদের সই পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিলনা।

ঘোষণাপত্রটিতে বলা হয়েছিল ঃ "গত ২৫ বছরের ঘটনাবলীর স্রোতধারা এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম মহাসম্মেলনের (১৯১৯) সিদ্ধান্ত যেভাবে তৎকালীন বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল, আজ তা একেবারেই অচল। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের জটিলতা বুঝে তার নেতৃত্ব দেবার বদলে, কমিন্টার্ন

তাদের অগ্রগতির পথে বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিটলার শাহীর নেতৃত্বে এখন যে বিশ্বযুদ্ধ চলছে, তা পৃথিবীতে স্পষ্টতঃ দুটি খাড়াখাড়ি ভাগে বিভক্ত করেছে— যারা হিটলারী স্বৈরাচারের পতাকাবাহী এবং স্বাধীনতাকামী জনগণ দ্বারা হিটলার-বিরোধী জোটে সমবেত হয়েছে। তার ফলে যেসব দেশ এখন হিটলারের পদে বা হিটলারের পদানত, সেই সব দেশের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর ও সমস্ত প্রগতিশীল নরনারীর কর্তব্য হচ্ছে হিটলার শাহীকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং হিটলার শাহীর সামরিক শক্তি সর্বপ্রকারে বিপর্যস্ত করা। হিটলারের অনুগামী সরকারদের উৎখাত করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

আর যে যে দেশ হিটলার শাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, সেইসব দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ও প্রগতিশীল নরনারীর কর্তব্য হচ্ছে হিটলার-বিরোধী যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করা, হিটলার-বিরোধী সমমস্ত দেশের মধ্যে মৈত্রীকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করা তবে এরই পাশাপাশি, প্রতিটি দেশের নিজস্ব স্বতন্ত্র বিপ্লবী দায়িত্বও ভুলে যাওয়া অনুচিত হবে।

...হিটলার শাহীর বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাতিধর্মদলমত নির্বিশেষে প্রতিটি দেশে যে ব্যাপক জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম গড়ে উঠেছে, নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ব্যাপক ঐক্য গড়ে সেইসব সংগ্রামকে পরিচালিত করতে হবে।

...এই ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারীরা মহান কার্ল মার্কসের কথা মনে রেখেছেন, যিনি ১৮৬৪তে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ওয়াকিং মের্নস অ্যাসোসিয়েশন বা ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশে স্বাধীন বিপ্লবী শ্রমিক দল গড়ে উঠল, তখন তার নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক খাপ খাচ্ছে না, বুঝতে পেরে মার্কস তাঁর নিজের হাতে গড়া আন্তর্জাতিক সংগঠনকে বিলুপ্ত করে দিলেন।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পথে পরাক্রান্ত জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিদের নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে এবং একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে তাদের সবাইকে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভাবনা। প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে একটি কমিউনিষ্ট মহাসম্মেলন ডাকাও সম্ভবপর। তাই নিম্নস্বাক্ষরকারীরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করছেন যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিককে বিলুপ্ত করা হল এবং তার সমস্ত শাখা সংস্থারা বিভিন্ন দেশে এখন থেকে স্বাধীনভাবে তাদের মত ও পথ স্থির করবেন। তবে এ বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নেই যে এই মুহূর্তের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মানবতার নিকৃষ্টতম শত্রু জার্মান ফ্যাসীবাদ ও তার তাঁবেদারবর্গকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা।[৩]

পৃথিবীর বেশীরভাগ কমিউনিষ্ট পার্টিই এই ঘোষণাপত্রকে মেনে নেন, কিন্তু খুব গভীরভাবে একমত হয়ে নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট পার্টিরা মিলে ১৯৪৭ এ গড়ে তোলেন একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠন "কমিনকর্ম"। কিন্তু এটিও বেশিদিন টেকে না, বিশেষ করে ১৯৫৬তে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত যেমন একদিকে তৃতীয় জগতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে অগ্রসর দেশের সমাজতন্ত্রী শক্তিদের সুদৃঢ় মেলবন্ধন করল, তেমনই সোভিয়েত-চীন মতাদর্শর বিরোধও এই সময় থেকে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে প্রথমে দ্বিধা ও পরে বহুধা বিভক্ত করল। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তা নিয়ে নয়।

কিন্তু ১৯৯১তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর এবং ১৯৯৭তে পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের বহু রাষ্ট্র নতুন করে, নানান পথে সমাজতন্ত্রী শক্তিদের পুনরুভ্যুদয় সে ক্যাবিলার নেতৃত্বে বঙ্গোতেই হোক আর সমাজতন্ত্রী কমিউনিষ্ট জোটের নেতৃত্বে ফ্রান্সেই হোক— যতরকম বিতর্ককেই জন্ম দিক না কেন, একটা কথা প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীর একটি কোনও কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার আধিপত্য পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগোবে না, তা এগোবে ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন মতের পতাকা উড়িয়ে, কিন্তু অভিন্ন শোষণমুক্তির আদর্শ নিয়ে। এদিক থেকে মনে হয় যে ১৯৪৩ এর ১৫মে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিককে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বিচারে সঠিক পদক্ষেপই হয়েছিলো।

সূত্র নির্দেশ

১। এম. এন. রায় ঃ *দি কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল*, বোম্বাই, ১৯৪৩, পৃ. ৭

২। *কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিককে বিলুপ্ত করার ঘোষণাপত্র*, লেবার মান্থলি, জুন ১৯৪৩, লণ্ডন, পৃ. ১৯০-৯১

৩। তদেব

ইন্দোনেশিয়ার গণমুক্তির সংগ্রামে সাহসী ইংরেজ মহিলা কারমেল বুদিয়ারজো

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কারমেল বুদিয়ারজো, যাঁর জন্ম ১৯২৫ এ ইংল্যান্ডে কারমেল ব্রিকম্যান নাম নিয়ে একটি ইহুদি পরিবারে। একটি অনন্য সাধারণ মহিলা ইংল্যান্ডেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেন তিনি। ২০ বছর বয়সে ১৯৪৫এ যোগ দেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে। ১৯৪৬এ চেকোস্লোভিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে আহৃত হয় প্রথম বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেস, ব্রিটেন থেকে তার আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি কমিটিতে আরও অনেকের সঙ্গে ছিলেন কারমেল ব্রিকম্যানও। ১৯৪৬এর আগষ্ট মাসে সর'সরি ভারত থকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি হয়ে ঐ বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দিয়ে যান এই প্রবন্ধের লেখক। তখনই তাঁর পরিচয় হয় কারমেল ব্রিকম্যানের সঙ্গে। সেই বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেসের বিশদ বর্ণনা দেওয়া এই প্রবন্ধের কাজ নয়। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে বিপুল ভোটাধিক্য নবজাত আন্তর্জাতিক ছাত্র সংগঠন International Union of Students এর (IUS) সভাপতি নির্বাচিত হ'ন চেকোস্লোভাক ছাত্রনেতা যোশেফ গ্রোহ্মান ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হ'ন বামপন্থী ইংরেজ ছাত্র নেতা টম ম্যাডেন। কার্যকরী সমিতির নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন যুগোস্লাভ ছাত্রনেতা রাইকো টমোভিচ ও মিশরীয় ছাত্রীনেত্রী ইঞ্জি ইখালাতুনা। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক পঞ্চম স্থান অধিকার করে কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হ'ন।

বিশ্ব ছাত্র কংগ্রেস চলাকালীনই যুগোস্লাভ ছাত্রনেতা রাইকো টমোভিচ ও হাঙ্গেরিয় সমাজতন্ত্রী ছাত্রনেতা আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিনিধিদের ২৫ জনকে তাঁদের দেশে গিয়ে হিটলার শাহির ফৌজের বর্বরতা ও তার বিরুদ্ধে সমগ্র ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করে আসার জন্য আমন্ত্রণ

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত আলোচ্য প্রবন্ধটি ইতিহাস অনুসন্ধান (১৬) তে প্রকাশিত হয়েছে।

জানান। অবশ্য পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়ার ছাত্র প্রতিনিধিরাও একই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যেহেতু সমগ্র পূর্ব ইউরোপে প্রায় একা হাতে লড়ে নিজেদের দেশের শতকরা ৯০ ভাগ অংশ নাৎসীফৌজের হাত থেকে মুক্ত করছিল যুগোস্লাভ গণমুক্তিফৌজ, তাদের প্রসিদ্ধ নেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে, তাই ছাত্র প্রতিনিধিরা অগ্রাধিকার দিলেন যুগোস্লাভ আমন্ত্রণকে। আর হাঙ্গেরি পরে, যাবার পথে, সেখানে দুদিন থামা কঠিন নয়। তাছাড়া হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেষ্টে ট্রেন বদলাতে হয়। তাই হাঙ্গেরির ছাত্রবন্ধুদের আমন্ত্রণও গ্রহণ করা হ'ল। ভারতীয় ছাত্র প্রতিনিধি দলে ছিলেন তিনজন, ইংল্যান্ডের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিস্ট ছাত্র নেতা রামস্বামী, বোম্বাই এর ছাত্রনেতা অরবিন্দ মেহ্‌তার (তিনি তখন অক্সফোর্ডে গবেষণা করছেন) স্ত্রী কুমুদ মেহ্‌তা এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। রামস্বামী এবং কুমুদের সারা ইউরোপ ঘোরার পাসপোর্ট ও ভিসা ছিল। কিন্তু ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আমাকে যে পাসপোর্ট গিয়েছিল, তাতে পূর্ব ইউরোপের চেকোস্লোভাকিয়া ছাড়া অন্য কোনও দেশে যাবার অনুমতি দেওয়া ছিলনা। আর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখা ছিল যে আমি যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন যাবার চেষ্টা করি, তাহলে পাসপোর্টটি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তাহলে আমি কি করে যাব যুগোস্লাভিয়াতে? সহায় হলেন কারমেল ব্রিকম্যান। তিনি রাইকো টমোভিচের বান্ধবী, অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়া যাবেন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন প্রাগ শহরে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসে। সেখানকার উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তাঁর সাহায্যে আমার যুগোস্লাভিয়া ও হাঙ্গেরির ভিসা মঞ্জুর হয়ে গেল। ১৯৪৬ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রেনে করে আমরা ২৫টি ছাত্রছাত্রী রওনা হলাম বুদাপেষ্ট হয়ে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের পথে। সঙ্গে ভারতীয় দলের রামস্বামী, কুমুদ ও আমি, কারমেল ব্রিকম্যান, মার্কিন ছাত্রনেতা বিল রাষ্ট, ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রনেতা সোয়েরিপ্‌নো আরও অনেকে।

সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। স্বতন্ত্রভাবে তা লেখার বাসনা রইল ভবিষ্যতে কোনও দিন। শুধু ২/১টা কথা বলব। বুদাপেষ্ট শহর লালফৌজ মুক্ত করছিল ৮০দিন প্রবল যুদ্ধের পর। দানিয়ুব নদীর এক পারে বুদা, অপর পারে পেষ্ট। মাঝের সেতুটি যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে, তখন মেরামত হয়নি। একটি সমাজতন্ত্রী ও একটি কমিউনিষ্ট হাঙ্গেরিয় ছাত্র আমাদের সব দেখাচ্ছিল, বোঝাচ্ছিল। কারমেল সমাজতন্ত্রী ছাত্রকর্মীটিকে প্রশ্ন করলেন, জার্মান আক্রমণের সময় তোমাদের উভয়দেশের মধ্যে তো প্রবল বিরোধ

ছিল। এখন কি অবস্থা? সমাজতন্ত্রী ছাত্রটি কমিউনিষ্ট ছাত্রটিকে আলিঙ্গন করে বল্ল : বুদাপেষ্টের ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেছে আমাদের বিরোধ। এখন নতুন জনগণতান্ত্রিক হাঙ্গেরি আমরা এক সঙ্গেই গড়ব।

বুদাপেষ্ট থেকে ট্রেন আমাদের নিয়ে চল্ল বেলগ্রেডের পথে। ট্রেনে শোবার জায়গা ছিল না। ঠেস দিয়ে বসে থাকাই চল্লেন। ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রনেতা সোয়েরিপ্নোর কাছে শুনলাম ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা। ভারত স্বাধীন হবার পর সোয়েরিপ্নো যুবপ্রতিনিধিদল নিয়ে ভারত এসেছিলেন, কলকাতাতে তাঁরা বিরাট সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন ছাত্রদের কাছে। ১৯৪৮ এ মাদিউম শহরে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় তিনি নিহত হ'ন ওলন্দাজদের গুলিতে। কারমেলের সঙ্গে সোয়েরিপ্নোর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। কারমেলের ইন্দোনেশিয়া প্রীতির সম্ভবতঃ সেটাই সূচনা।

যুগোস্লাভ অভিজ্ঞতার কথা এখন বন্ধ করে, চলে আসি কারমেলের কথায়। ১৯৪৮ এ কলকাতায় বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক ছাত্র সংস্থার যুক্ত উদ্যোগে ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সমর্থনে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ছাত্র যুবসম্মেলন।

সেই উপলক্ষ্যে কারমেলে ব্রিকম্যান ও বিদ্যা কানুগা (এখন মুন্‌সী) W.F.D.Y. ও I. U. S. এর প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগ দিতে আসেন। সম্মেলনের প্রায় দেড়মাস আগে ১৯৪৮ এর জানুয়ারিতে। ঘটনাচক্রে তাঁরা ও প্রস্তুতি কমিটির অন্যান্য সদস্যারা (তার মধ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সর্বভারতীয় নেতা সৎপাল ডাংও ছিলেন) থাকতেন ১ নম্বর পাম প্লেসে সুরেন ঠাকুরের খালি বাড়িতে। তার বিপরীতে ২ নম্বর পাম প্লেসে এই প্রবন্ধ লেখক এখনও থাকেন।

খুব কষ্ট করে থাকতেন কারমেল ও সব প্রতিনিধিরাই। খাট ছিলনা। সতরঞ্চি পেতে সবাই শুতেন, রাতে মশা ধূপ জ্বালিয়ে। খুব মশার উপদ্রব ছিল বাড়িটিতে। ভাতডাল তরকারি রান্না হত সবার জন্য। কারমেল, বিদ্যা, ইন্দোনেশিয়ার যুবনেত্রী ফ্যান্সেস্কা, শিল্পী চিত্তপ্রসাদ, ছাত্রনেতা সৎপাল ডাং—সবাই তো খেতেন। পরবর্তীকালে যখন সমাজতন্ত্রী দেশের প্রতিনিধিরা এসে পঞ্চতারকা যুক্ত হোটেল ছাড়া থাকতেন না ও আমাদের খ্যাতিমান নেতারাও তখন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন, তার সঙ্গে ১৯৪৮ এর অভিজ্ঞতার কি বিরাট আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

১৯৪৮ এর ২৬মার্চ পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত

হল। বাজেয়াপ্ত হল পার্টির দৈনিক পত্রিকা "স্বাধীনতা", গ্রেপ্তার হলেন শত শত নেতা ও কর্মী। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হ'ল অনেকের নামে, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। চারবছর আত্মগোপন করে কাটাবার পর ১৯৫২র মে মাসের গোড়ায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হলে, ফিরে এলাম স্বাভাবিক মুক্ত জীবনে। তখনই খবর পেলাম বন্ধু সোয়েরিপ্‌নোর মৃত্যুর। খবর পেলাম কারমেল বিবাহ্ করেছেন প্রাগে অবস্থিত ইন্দোনেশীয় যুবনেতা বুদিয়ারজোকে। ভাসা ভাসা খবর পেলাম ১৯৫৭তে যে কারমেল বুদিয়ারজো চলে গেছেন জাকার্তায়, ইন্দোনেশীয় কমিউনিষ্ট পার্টির (PKI) দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে। আর তাঁর স্বামী তখন শুধু যুবনেতাই নন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৪লক্ষ সদস্যের বিশাল ইন্দোনেশীয় কমিউনিষ্ট পার্টি, পার্লামেন্টের ১/৩ সদস্য কমিউনিষ্ট। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি আহমেদ সুকার্ণের সঙ্গে প্রগাঢ় মৈত্রীতে আবদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টি। সেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক আইদিৎ একাধিকবার ভারতে এসেছেন। সিপিআই এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়েছেন সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের।

তারপর এল ১৯৬৫র সেই ঘোর দুঃসময়। সামাজিক ক্যুর মারফৎ ক্ষমতা দখল করল সেনাপতি সুহার্তো। সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করল ৫/৬ লক্ষ কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থককে। হত্যা করল আইদিৎকে, আরো অনেক নেতাকে। সেই হত্যা কান্ডের সময় কোনও খবর পেতাম না কারমেলের বা তাঁর স্বামী বুদিয়ারজোর। ১৯৭০এর দশকের গোড়ায় হঠাৎ খবর পেলাম যে কারমেল বেঁচে আছেন, তাঁকে মুক্তি দিয়ে সামরিক পাহারায় তাঁকে সুহার্তোর সৈন্যরা তুলে দিয়েছে ব্রিটিশ বিমানে করে লন্ডনের পথে। তাঁর মেয়ে তরী ও ছেলে অস্তকে আগেই তারা যেতে দিয়েছে ইংল্যান্ডে, কারমেলের মা-বাবার কাছে। বুদিয়ারজো তখনও জেলে, ছাড়া পান নি। এখবর আমি পাই পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রর কাছে। একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে জাকার্তায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বিমান থেকে নেমে তিনি দেখেন বিপরীত দিকে বন্দুকের পাহারায় চলেছেন কারমেল ব্রিটিশ বিমানের দিকে। দৌড়ে গিয়ে অশোক মিত্র চেঁচিয়ে বলেন আমি কলকাতার অশোক মিত্র। কাউকে কিছু বলবেন? কারমেল বলেন ' গৌতমকে বলবেন আমায় ইংল্যান্ডে পাচার করে দিচ্ছে, ফিরতে দেবে না।' আর কিছু বলার আগেই সৈন্যরা বন্দুকের খোঁচা দিয়ে তাঁকে বিমানে তুলে দিল।

তারপর বহু চেষ্টা করেছি কারমেলের খোঁজ পাবার। সফল হইনি। তারপর

১৯৮৯তে ফরাসী বিপ্লবের ২০০ বছর উপলক্ষে আমি প্যারিসে আমন্ত্রিত হলাম আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে প্রবন্ধ পেশ করার জন্য। তার আগে গেলাম লন্ডনে, সঙ্গে আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ও ছোট পুত্র ধীমান। সেখানে যাঁর গৃহে ছিলাম—ইংরেজ কমিউনিষ্ট শ্রীমতী ব্রেন্ডা কার্শ, তিনি আমাকে বল্লেন ঃ কারমেল বুদিয়ারজোর সন্ধান পেয়েছি। ৭ আগষ্ট ১৯৮৯ সন্ধ্যায় ব্রেন্ডার আস্তানায় কারমেল আমাকে খোঁজ করলেন, পরদিন সন্ধ্যায় সস্ত্রীক আমাকে ও ব্রেন্ডাকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে। ৪১ বছর পরে কারমেলের সঙ্গে দেখা হ'ল, কোনও অসুবিধা হ'লনা চিনতে। পরস্পরকে উচ্চ আলিঙ্গন করলাম আমরা তারপর মধ্যরাত অবধি শুনলাম তাঁর বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা। বল্লেন ঃ আমি মনে প্রাণে এখনও কমিউনিষ্ট। কিন্তু পার্টিতে যোগ দিই নি। বাকি জীবনটা কাটাতে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষাধিক বন্দীর মুক্তি ও ইন্দোনেশিয়াতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে। একটা দ্বিমাসিক ইংরাজি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করছেন, তার নাম TAPOL - ইন্দোনেশীয় ভাষায় যার মানে রাজনৈতিক বন্দী।

১৯৮৯ থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত TAPOL পাঠাচ্ছেন কারমেল আমার নামে, দৈনিক "কালান্তর" এর ঠিকানায়। অবিশ্রান্ত অভিযান চালিয়ে গেছেন তিনি সুহার্তো ও তার জহ্লাদ সরকারের বিরুদ্ধে, পূর্ব টিমোরের স্বাধীনতার সপক্ষে। তাঁর এই কাজের জন্য দু'বছর আগে তাঁকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা কমিটি সম্মানিত করেছে এক বিশেষ পুরস্কার দিয়ে, যাকে তাঁরা বলেন বিকল্প নোবেল পুরস্কার। নাতি ও নাতনীদের অনুরোধে কারমেল ১৯৯৮তে লিখেছেন ইন্দোনেশিয়ার বন্দীশালায় তাঁর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণা। বইটির নাম "A western woman in Indonesia's Gulag."

২০০০ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুর রহমান ওয়াহিদের সরকার কারমেল বুদিয়ারজোকে ইন্দোনেশিয়াতে ফিরে আসবার অনুমতি দেয়। কারমেল এক মাসের জন্য ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব টিমোরে সফরে যান। জাকার্তায়, ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র, পূর্ব টিমোরে গণতান্ত্রিক মানুষ বিশেষতঃ তরুণতরুণীরা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। প্রায় চার দশক বন্দী থাকার পর যে অল্প কয়েকজন পুরানো কমিউনিষ্ট নেতা ও সামরিক বাহিনীর বামপন্থী সংগঠক এখনও জীবিত আছেন, তাঁরাও মিলিত হ'ন কারমেলের সঙ্গে। লন্ডন ফিরে সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কারমেল লেখেন যে তিনি একেবারে অভিভূত হয়েছেন। তাঁর স্বামী বুদিয়ারজো আর এখন বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁকেও মনে রেখেছেন পুরানো কমিউনিষ্টরা। তাঁরা বলেছেন যে ইন্দোনেশিয়া দুঃস্বপ্নের রাতের অবসান ঘটিয়ে,

নতুন সূর্যোদয় আনতে যারা সাহায্য করেছেন। তাদের মধ্যে কারমেল বুদিয়ারজো অবশ্যই একজন। কারমেল এখনও লিখে যাচ্ছেন ইন্দোনেশিয়াতে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে। লক্ষ লক্ষ কমিউনিষ্টকে হত্যা করার জন্য তদন্ত করে সুহার্তো ও তার সঙ্গীদের কঠোরতম শাস্তি দেবার দাবি করে।

এত কাজের মধ্যেও কারমেল কিন্তু কলকাতাকে ভোলেননি। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আরোপিত ভিয়েৎনাম, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়া নিয়ে এক আলোচনা চক্রে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আসতে পারেন নি কিন্তু একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিলেন। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ইতিহাস সংসদকে। আমাকে তিনি নিয়মিত TAPOL পাঠিয়ে চলেছেন, মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন খবর দিয়ে ও আমরা কি করছি জানতে চেয়ে। এরকম অসামান্য মহিলা খুব কমই আছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে আমি গর্বিত। ইতিহাস সংসদের এবারের বার্ষিক সম্মেলনে সমস্ত প্রতিনিধিদের কাছে তাঁর পরিচয় দিতে পেয়ে আমি গভীর আনন্দবোধ করছি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে তিনজন ইংরেজ প্রগতিবাদী

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সমর্থনে ইংলন্ডে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা পত্র-পত্রিকা সোচ্চার হয়েছিল, একথা জানলে কিছুটা বিস্ময়ই জাগে। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হচ্ছে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের দীপ্ত মধ্যাহ্ন, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সূর্য তখন প্রবল প্রতাপান্বিত। ১৮৪৮-এর বিপ্লব প্রায় একদশক আগে পরাজিত। ইংলন্ডের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐতিহ্য তখন ম্লান ও ম্রিয়মাণ। তথাপি কিছু প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী ইংরেজ সবাক হয়েছিলেন ভারতীয় বিদ্রোহীদের সপক্ষে, যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়েও।

ইংলন্ডের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বহুল প্রচারিত "রেনল্ডস্ নিউজপেপার" ১৮৫৭-র ৫ জুলাই লেখেন ঃ "ভারতের ব্রিটিশ সরকার ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অপরাধ সংঘটিত করেছে। ... আমাদের সমর্থন ও সহানুভূতি রয়েছে বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে। ভারতের পরাধীন ও শোসিত জনসাধারণের সঙ্গে যারা সংগ্রামে নেমেছে তাদের উৎপীড়কদের শৃঙ্খলকে ভাঙ্গবার জন্য।"[১]

বিদ্রোহর পরাজয়ের পর "রেনল্ডস নিউজ" লিখল ঃ "ভারত আর কখনও ইংরেজ শাসনে নিরাপদ থাকবে না, যদি না আমরা সেখানে আমাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও লুণ্ঠনের নীতিকে বর্জন না করি।"[২]

তবে সবচেয়ে ধারালোভাবে ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন ইংরেজ শ্রমিকনেতা ও চার্জিস্ট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এর্নেষ্টি জোনস্। ১৮৫১-তে তিনি যখন শ্রমিক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন সেখানেই তিনি একটি মহাকাব্য রচনা করেন যার নাম "দি রিভোল্ট অব হিন্দুস্থান।" বইটির মুখবন্ধে

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের দশম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত আলোচ্য প্রবন্ধটি ইতিহাস অনুসন্ধান (৯) তে প্রকাশিত হয়েছে।

জোনস্ লেখেন ঃ "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্ত যায় না। ঠিকই, কিন্তু তাদের উপনিবেশগুলিতে সূর্যও অস্ত যায় না, রক্তের দাগও কখনও শুকিয়ে যায় না।"[৩]

১৮৫৭-র জুলাই এর্নেস্ট জোনস, পূর্ব লন্ডনে একটি বড় শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ঃ "ইংলন্ডের শ্রমিক ভাইএরা। মানুষের সর্বাধিক পবিত্র অধিকারের জন্য লড়াই করছে ভারতীয়রা... এখন এই মহান মুক্তিসংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য ইংরেজ শ্রমিকভাইরা, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ দিতে বলা হচ্ছে। ভাইরা, বন্ধুরা, অপরের স্বাধীনতা হরণ না করে, নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম কর।"[৪]

১৮৫৭-র ১ আগষ্ট বামপন্থী চার্টিস্টদের মুখপত্র "পিপল্স পেপার" এ এর্নেষ্ট জোনস লিখলেন ঃ "ভারতীয়দের দাবী ন্যায্য, ভারতীয়দের সংগ্রাম মহান। ঈশ্বর ভারতীয়দের সহায় হোন।"[৫]

ঐ একই দিনের "পিপ্লস্ পেপারে" খবর ছিল যে চ্যাথাম ও রবেষ্টার শহরে ২০০ জন ইংরেজ সৈন্য, সবাই শ্রমিকের সন্তান, ভারত থেকে ফিরে আর সেদেশে লড়াই করতে যেতে অস্বীকার করেছেন।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ পরাজিত হবার পর, যখন ব্রিটিশ শাসকরা দেশে হিংস্র দমননীতির তাণ্ডব চালাচ্ছিল, তখন তাকে বহু প্রবন্ধে তীব্র নিন্দা করেছেন জোনস। ১৮৫৮-র ১৯ জুন "পিপল্স পেপারে" এক সম্পাদকীয়তে জোনস লেখেন যে এখন ভারতের "প্রায় সমগ্র জনসাধারণই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে"।

ভারতের স্বাধীনতা বিদ্রোহকে সমর্থন করায় এর্নেষ্টি জোনস্কে ইংলন্ডে বহু দুর্গতিভোগ করতে হয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তাঁর মুখপত্র "পিপলস্ পেপার" কে চাপ দিয়ে বন্ধ করতে বাধ্য করেন। জোনসের শেষ জীবন কাটে দারিদ্র্য ও একাকিত্বের মধ্যে। কিন্তু আদর্শচ্যুত হন নি জোনস। ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণীর শোষণমুক্তি।

ভারতের জনগণের ব্রিটিশ দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রাম একসূত্রে গাঁথা—এ দৃঢ় বিশ্বাস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অম্লান ছিল চার্টিষ্ট নেতা এর্নেষ্ট জোনসের মনে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিদেশী বন্ধুদের নামের তালিকায় এর্নেষ্ট জোনসের নাম আজ খুঁজেই পাওয়া যায় না। এই প্রবন্ধে তার যৎসামান্য প্রতিকার করার চেষ্টা করা হল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে একজন ইংরেজ সাংবাদিক ভারতের

বুকে থেকেই সাহসের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে যান। তাঁর নাম বি. জি. হর্নিম্যান, "বোম্বে ক্রনিকল" দৈনিক পত্রিকার দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন সম্পাদক। ১৯১৯-এ যখন সাম্রাজ্যবাদ দমনপীড়নমূলক রাউলাট আইন ভারতে চালু করে এবং তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণ-প্রতিবাদ দেখা দেয়, তখন ব্রিটিশ দমননীতির মুখোস খুলে "বোম্বে ক্রনিকল"-এ নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন হর্নিম্যান।

১৯১৯-এর এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হলে, হর্নিমান পাঞ্জাবে চলে যান এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সহ পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসকরা যে বর্বর ও নৃশংস দমননীতি চালাচ্ছিল, তার অকাট্য ও সচিত্র তথ্য সংগ্রহ করেন বি. জি. হর্নিম্যান। ব্রিটিশ সরকার জানতে পেরে তাঁকে পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কৃত করে ও পরে তাঁকে সামরিকভাবে ভারত থেকেও বহিষ্কার করে দেয়। নাছোড়বান্দা হর্নিম্যান, পাঞ্জাবে বর্বর অত্যাচারের আলোকচিত্র সহ বহু অকাট্য তথ্য দিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন; Amritsar : the Truth নামে।[৮] সারা পৃথিবীর কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর গোপন থাকে না। সেই বইতে আলোকচিত্র থাকে, রাস্তায় থামে বেঁধে, পুরুষদের উলঙ্গ করে চাবুক মারা হচ্ছে, মেয়েদের ধর্ষণ করা হচ্ছে ও প্রখর রৌদ্রে মধ্যাহ্নে শিশুদের খালি পায়ে ও খালি মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকতে কিভাবে বাধ্য করা হচ্ছে। ভারতের জনগণের সপক্ষে হর্নিম্যানের এ এক অবিস্মরণীয় অবদান।

ব্রিটেনের পার্লামেন্টের প্রথম কমিউনিষ্ট সদস্য ও শ্রমিক নেতা সাপুরাজি সাকলাৎওয়ালা ১৯২৭-এ ভারতে এলে, বোম্বাই-এ তাঁকে যে বিপুল গণ-সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তাতে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও বি. জি. হর্নিম্যান। ১৯২৭-এর ১৮ জানুয়ারি বোম্বাইতে এক বিরাট জনসভায় শাকলাওয়ালাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে দৃপ্ত ভাষণ দেন বি. জি. হর্নিম্যান।[৭]

১৯২৯-র ২০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার করে সারা ভারত জুড়ে কমিউনিষ্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের, শুরু করে প্রসিদ্ধ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা এই গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করেন বি. জি. হর্নিম্যান।[৮] পরে বোম্বাইতে মীরাট বন্দীদের সমর্থনে যে সহায়ক সমিতি গড়ে ওঠে তারও অন্যতম সদস্য ছিলেন হর্নিম্যান। কি জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বি. জি. হর্নিম্যান আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম।

ক্লাইভ ব্র্যাডসন ছিলেন একজন তরুণ ইংরেজ কমিউনিষ্ট, ১৯০৭ ভারতের

আহমদনগর শহরেই যাঁর জন্ম। ১৯৩২-এ ২৫ বছর বয়সে তিনি যোগ দেন ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টিতে, যখন চিত্রকর হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। ১৯৩৬-এ তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডর শাকলাৎওয়ালা ব্যাটালিয়নে যোগ দেন এবং ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে একটি যুদ্ধে আহত হয়ে বন্দী হন। ৮ মাস তাঁকে কাটাতে হয় ফ্রাঙ্কোর বন্দী শিবিরে। তখন তিনি অনেকগুলি চমৎকার কবিতা রচনা করেন। ছাড়া পেয়ে ১৯৩৮ এ ইংলন্ডে ফিরে তিনি প্রজাতন্ত্রী স্পেনের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করেন।

১৯৪১ এ তিনি যোগ দেন সাঁজোয়া গাড়ির একটি ব্রিটিশ বাহিনীতে। ১৯৪২-এ তিনি ভারতে প্রেরিত হ'ন এবং কলকাতা সহ ভারতের বহু শহর ও গ্রামে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘোরেন। প্রত্যক্ষ করেন ১৯৪৩ এ বাংলার মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষকে, সাম্রাজ্যবাদী দমননীতিকে। ১৯৪৪ এর ২৫ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বর্মার রণাঙ্গনে তিনি নিহত হ'ন।

ভারতবর্ষ থেকে তিনি নিয়মিত চিঠি লেখেন তাঁর স্ত্রী নোরা ম্যানসন্‌কে। সেই চিঠিগুলি সম্পাদনা করে ১৯৪৫ এই তা প্রকাশ করেন বই আকারে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টি "ব্রিটিশ সোলজার ইন ইন্ডিয়া" নাম দিয়ে। তার থেকে সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে ক্লাইভ ম্যানসন কতখানি ভারতবন্ধু ছিলেন।

১৯৪৩-এর ২০ জুলাই বোম্বাই থেকে স্ত্রীকে একটি চিঠিতে ক্লাইভ লিখছেনঃ "ভারতের আমলাতন্ত্র এখনও কমিউনিষ্টদের দমনপীড়ন করছে, শত শত কমিউনিষ্ট এখনও জেলে। দক্ষিণ ভারত রেল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলনে মেলান। মোট ৩৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার এই ইউনিয়নের সভ্য। এরা ৮ ঘন্টা কাজের দাবী আদায় করেছে। এদের নিজেদের ছাপাখানাও আছে। সম্মেলন মঞ্চে ছিল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের বিশাল ছবি। ইউনিয়নের কর্মকর্তারা কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন না, এই মর্মে একটি প্রস্তাব সম্মেলনে মাত্র ৫ ভোট পেয়ে পরাজিত হল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন সি পি আই-এর অন্যতম নেতা কমরেড রণদীভে।"[৯]

১৯৪০-এর ৫ সেপ্টেম্বর স্ত্রীকে আর একটি চিঠিতে ক্লাইভ লিখছেন ঃ "এ সপ্তাহের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ খবর হচ্ছে যে কারুর কমরেডরা (যাদের ফাঁসীরা হুকুম হয়েছে) জাপানী ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবার ডাক দিয়েছেন, এই খবরটি পার্টির সাপ্তাহিক "পিপল্‌স্ ওয়ার" এ ছেপে

বের করায়, সরকার তাদের কাছে ৩ হাজার টাকা জামানৎ চেয়েছে। অন্যদিকে খবর হচ্ছে অবিরাম দুর্ভিক্ষ মানুষের মৃত্যু—শুধু কলকাতায় নয়, সারা বাংলা জুড়ে।"[১০]

আর একটিমাত্র চিঠির অংশ উদ্ধৃত করব, যেটি ২৯ নভেম্বর ১৯৪৩-এ লেখা।

"ছাউনির বাইরে চেয়ারে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি। কাছেই বসে বই পড়ছে একটি দৃপ্তকায় আফ্রিকান সৈনিক। একজন হোৎকা ইংরেজ সার্জেন্ট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল "তুমি পড়তে পার? কি পড়ছ, ডিকেটিভ বই?" আফ্রিকান সৈন্যটি জবাব দিল "হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছ যে পড়তে পারি, আর বইটা হচ্ছে বার্নার্ডস'র 'পিগম্যলিয়ন'।" চমৎকার উত্তর, নয় কি!

.. আর কি লিখব? দিল্লীর নির্বোধ সরকার আমাদের আসল মিত্র ভারতের জনগণকে চটাবার জন্য কি না করছে। ... যতই ভারতবর্ষ দেখছি, ততই জারতন্ত্রী রাশিয়ার কথা মনে আসছে। এখানেও ভবিষ্যতে কি হবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহে।"[১১]

১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসে কলকাতার কমিউনিষ্টরা খবর পান যে ফেব্রুয়ারি মাসে বর্মার রণাঙ্গনে জার্মানী ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ক্লাইভ ম্যানসন। তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কলকাতা কমিটি তাঁর স্ত্রী নোরাগে ২৫ এপ্রিল যে চিঠিটি লেখেন, তা দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করেছি ঃ

"প্রিয় শ্রীমতী ম্যানসন,

আজ দুঃখের দিনে আমরা আপনাকে চিঠি লিখছি, আপনারা যে নিদারুণ ক্ষতি হ'ল ও যে প্রবল দুঃখ পেলেন, তার একটু ভাগ আমরাও নিতে চাই।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার স্বামী ক্লাইভ ব্র্যানসনকে চিনতাম। তিনি কলকাতাতে এসেছিলেন। অল্পদিনের এই পরিচয়, কিন্তু মানুষটিকে আমরা গভীরভাবে চিনেছিলাম—ভারতের জনগণের একজন আন্তরিক বন্ধু বলে। রণাঙ্গনে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সহাস্যমুখ, দরদী এই কমরেডটি ফিরে আসবেন, আমাদের এই আশা ছিল। ক্লাইভ ব্র্যানসনের মৃত্যুতে ভারতের জনগণ তাদের একজন বন্ধুকে হারাল। তিনি প্রাণ দিলেন আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে—ভারতের, বৃটেনের এবং সারা পৃথিবীর মানুষের মুক্তির জন্য।

আপনি আমাদের অন্তরের গভীর সহানুভূতি জানবেন।

ইতি

ক্লাইভের ভারতীয় বন্ধুরা"[১২]

সূত্র নির্দেশ

১। হেমস ব্রাইন ঃ ব্রিটিশ ওপিনিয়ন অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান রিভোল্ট্ পিসিযোশী সম্পাদিত "রেবেলিয়ান ১৮৫৭" পৃঃ ৩০১

২। পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩০২

৩। পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩০২

৪। পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩০৩

৫। পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩০৪

৬। বি. জি. হর্নিম্যান ঃ অমৃতসর ঃ দি ট্রুথ বোম্বাই ১৯১৯

৭। টাইমস অব ইন্ডিয়া, বোম্বাই ১৯ জানুয়ারি ১৯২৭

৮। টাইমস অব ইন্ডিয়া, বোম্বাই ২২ মার্চ ১৯২৯

৯। ক্লাইভ ব্র্যানসন ঃ ব্রিটিশ সোলজার ইন ইন্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৪৫ পৃঃ ৭৬

১০। ঐ, পৃঃ ৮৭

১১। ঐ, পৃঃ ১০৭

১২। ঐ, পৃঃ ১৯

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার তিন ইংরেজ আসামী—স্প্র্যাট, ব্র্যাড্‌লি ও হাচিনসন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯২৯ এর ২০ মার্চ ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার অতর্কিতে গ্রেপ্তার করে সারা ভারতের ৩১ জন কমিউনিষ্ট ও বামপন্থী শ্রমিক নেতাকে—প্রধানতঃ বাংলা, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেই তারা যুক্ত ছিলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল ৩২ জনের বিরুদ্ধে, কিন্তু একজন, আমীর হায়দর খাঁ, ইংরেজ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে দীর্ঘ চারবছর আত্মগোপন করে থাকেন। বোম্বাই থেকে গ্রেপ্তার হ'ল ১২ জন—এস. এ. ডাঙ্গে, কে. এন. যোগলেকর, এম. ভি. ঘাটে, এম. এস. মীরাজকর,, আর. এস. নিম্বকর, এ. এ. আলওয়ে, ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী, ভি.থেংডি, এম. জি. দেশাই, এল. কদম, ডি. আর. কাস্‌লে ও এল. এইচ. ঝাবওয়ালা। বাংলা থেকে গ্রেপ্তার হ'ন ৮ জন—মুজফ্‌ফার আহ্‌মদ, সামশুল হুদা, গোপাল বসাক, গোপেন চক্রবর্ত্তী, ধরনী গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র, কিশোরীলাল ঘোষ ও শিবনাথ ব্যানার্জি। উত্তর প্রদেশ থেকে ধরা পড়েন পূরণ চাঁদ যোশী, অযোধ্যা প্রসাদ, গৌরী শংকর ও ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জি। পাঞ্জাব থেকে গ্রেপ্তার হ'ন শউকৎ উসমানি, সর্দার সোহন সিং যোশ ও আবদুল মজিদ। আর ছিলেন তিনজন ইংরেজ—ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন্ ব্র্যাড্‌লি ও লেষ্টার হাচিমসন। স্প্র্যাট ও ব্র্যাডলি কলকাতা ও বোম্বাই থেকে গ্রেপ্তার হ'ন। আর হাচিমসন ধরা পড়েন কয়েকদিন পরে, ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে।

১৯২৯ এর মার্চ মাসেই সমস্ত বন্দীকে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয় মীরাট জেলে, শুরু হয়ে যায় প্রসিদ্ধ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। আর দীর্ঘ চার বছর পরে, ১৯৩৩ এর ১৬ জানুয়ারি মীরাটের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক আর. লে. ইয়ক তাঁর

উলুবেড়িয়া কলেজে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের নবম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত আলোচ্য প্রবন্ধটি ইতিহাস অনুসন্ধান (৮) তে প্রকাশিত হয়েছে।

রায় দেন— মুজফ্ফর আহমদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড; এস.এ.ডাঙ্গে, এম. ভি. খাটে, কে.এন. ঘোগলেকর, আর এম. নিম্বকর ও ফিলিপ স্প্র্যাটকে দেন ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; সউকৎ উসমানি, এস. এস. মীরাজকর ও বেন ব্র্যাডলির ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড। লেষ্টার হাচিমসনকে দেওয়া হয় ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। পরে অবশ্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে আসামীরা আপীল করলে, অনেকেই কেসুর খালাস হ'ন, বাকীদেরও দণ্ডাদেশ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়।[১]

এত দীর্ঘ ও বিশাল মামলা পৃথিবীর ইতিহাসে কমই হয়েছে। "যত-সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল তা ফুলস্ক্যাপ সাইজের ছাপানো পাতায় বাঁধাই করে ২৫ খণ্ডে রক্ষিত আছে—গড়ে প্রতিটি খণ্ডে আছে এক সহস্র পৃষ্ঠা ফরিয়াদ পক্ষ, অর্থাৎ সরকারের তরফ থেকে ৩৫০০ দলিল বিচারালয়ে প্রদর্শিত হয়েছিল। আসামীরা পেশ করছিলেন ১৫০০ দলিল। সর্বসমেত ৩২০ জন ব্যক্তি আদালতে সাক্ষী দেন। মীরাটের দায়রা বিচারক ইয়র্কের রায় ছাপতে ৬৭৬ ফুলস্ক্যাপ পাতা লেগেছিল।"[২]

বিচারক ইয়র্ক যখন রায় লিখছিলেন, তখন মীরাট জেলেই অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন ৬৮ বছরের অভিযুক্ত বন্দী ও বোম্বাই ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজাণ্টস পার্টির সভাপতি ভি. আর. বেংডি। বিচারক ইয়র্ক তিনজন আসামীকে বেকসুর খালাস দেন—শিবনাথ ব্যানার্জি, কিশোরীলাল ঘোষ ও ডাঃ বিশ্বনাথ মুখার্জি। বাকী ২৭ জনকে তিনি কঠোর, দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রাক্তন প্রসিদ্ধ নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় দেশে ফিরে ধরা পড়ে যান ও নিম্ন আদালতের বিচারে তাঁর ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তখন প্রসিদ্ধ আইনজীবি ও কংগ্রেস-সেবী ড: কৈলাশনাথ কাটজু এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল আদালতে জোরালো ওকালতি করে রায়ের দণ্ডাদেশকে কমিয়ে ৬ বছর করতে সক্ষম হ'ন। তাকে উৎসাহিত হয়ে মীরাট বন্দীরাও ইয়র্কের রায়ের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করেন এবং এখানেও তাঁদের পক্ষে প্রধান আইনজীবী ছিলেন কৈলাশ নাথ কাটজু। ১৯৩৩ এর আগষ্ট আপীল আদালতের রায়ে বহু বন্দী মুক্ত হ'ন, বাকীদের দণ্ডাদেশ হ্রাস পায়।[৩]

কারামুক্ত হলেন লেষ্টার হাচিমসন ও বেন ব্রাডলি। স্প্র্যাট মুক্ত হলেন আরও ২ বছর জেল ভোগ করে। ভারতীয় বন্দীদের মতই দীর্ঘ চার বছর মীরাট জেলে বন্দী থেকেছেন, সমস্ত দুঃখকষ্ট বরণ করেছেন আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এই তিনজন বীর সহযোদ্ধা। এঁদের মধ্যে ব্র্যাডলি ও স্প্র্যাট ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি

অব গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃস্থানীয় সদস্য, হাচিমসন ছিলেন বামপন্থী সাংবাদিক, কমিউনিষ্টদের বন্ধু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষ করে শ্রমিক ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, অথচ তাঁদের স্মৃতি আজ কার্যতঃ বিস্মৃতির অতল গর্ভে। সেই ঘাটতি পূরণের সামান্য চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হ'ল।

১৯২৭ এ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র ও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ফিলিপ স্প্র্যাট ভারতে আসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে ভারতের কমিউনিষ্টদের সাহায্য করতে। প্রায় একই সময় আসেন ব্রিটিশের আর এক কমিউনিষ্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী বেন ব্র্যাড্‌লি। তিনি আস্তানা গাড়েন বোম্বাইতে, স্প্র্যাট ঘাঁটি করেন কলকাতা ও বঙ্গ দেশকে।

১৯২৭—২৮ এর কলকাতার খবরের কাগজ ও ইংরেজ গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে রেলে, চটকলে, ধাঙ্গড়দের মধ্যে যেখানেই ধর্মঘট হচ্ছে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ফিলিপ স্প্র্যাট। কোথাও তাঁর সঙ্গী গোপেন চক্রবর্ত্তী ও রাধারমন মিত্র, কোথাও বা ধরণী গোস্বামী ও মুজফ্‌ফার আহমদ, কোথাও বা বঙ্কিম মুখার্জি। তাঁর বাসস্থান ছিল মুজফ্‌ফার আহমেদের ঘরে, ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে। রেলপথে জঙ্গী ধর্মঘটকে প্রসারিত করার জন্য স্প্র্যাট গেছেন লিলুয়া থেকে অণ্ডাল ও আসানসোলে। চটকল ধর্মঘট সংগঠিত করতে তিনি গেছেন চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়াতে। বহু রাত কাটিয়েছেন চটকল শ্রমিকদের বস্তীতে, তাদেরই ঘরে বা একটা চা-এর দোকানে।

রাধারমণ মিত্র এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঃ " রেলপথে ধর্মঘটকে ছড়িয়ে দেবার জন্য আমরা প্রথম গেলাম অণ্ডালে। আমাদের দলটা ছিল স্প্র্যাট, ধরণী (গোস্বামী), গড়বড়ে, চিরঞ্জীলাল স্রফ ও আমি। এক সপ্তাহ দাঁতে দাঁত দিয়ে চেষ্টা হ'ল। সেখানকার রেলমজুররা নামল ধর্মঘটের রাস্তায়। লিলুয়ায় ধর্মঘট যতদিন চালু ছিল, অণ্ডালের শ্রমিকরাও আর ততদিন কাজে ফিরে যায় নি।"[৪]

কয়েকমাস পরে চেঙ্গাইলের চটকলে ধর্মঘট শুরু হ'ল। রাধারমণ মিত্রকে সাহায্য করতে গেলেন বঙ্কিম মুখার্জি ও ফিলিপ স্প্র্যাট।[৫] বহু বছর পরে ফিলিপ স্প্র্যাট একটি চিঠিতে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ণ করেছেন ঃ

"আমার ভূমিকা ছিল একজন সাদা চামড়ার শ্রমিক নেতা হিসাবে ধর্মঘটী মজুরদের মনোবলে চাঙ্গা করা। কয়েক সপ্তাহ ধরে বহুবার আমি চেঙ্গাইলে গেছি, কখনও কখনও রাতও কাটিয়েছি একটা চা-এর দোকানে। কিছুদিনের মধ্যে আরও

কয়েকটি চটকলে ধর্মঘট বেধে গেল। তাদের ২।১ টা সভাতেও আমি বলেছি। তবে তত দিনে আমি জড়িয়ে পড়েছি অনেক বেশী লিলুয়া রেল ধর্মঘটের সঙ্গে। ... লিলুয়ার ধর্মঘটকে জোরদার করার জন্য আমরা নানান রেল শ্রমিক কেন্দ্রে প্রচার করতে যাই—রানীগঞ্জ, আসানসোল ও আরও কয়েকটি জায়গায়। ... ধর্মঘটীদের মধ্য থেকে শ্রমিক ও কৃষকদলে এবং সিপিআইতে সভ্য সংগ্রহ করাও আমার একটা কাজ ছিল। তবে আমার ধারণা যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাতে সরকার পক্ষের উকিল এইসব ধর্মঘটে আমার ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করেই বলেছিলেন।"[৬]

বাংলাদেশের (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) অবিসম্বাদী কমিউনিষ্ট নেতা মণি সিং তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন : "এরপর আসেন ফিলিপ স্প্র্যাট। তখন তার বয়স ছিল ২৭ বছর। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স অনার্সে (ট্রাইপোস) নিয়ে বি. এ. পাশ করেছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে কমরেড মুজফ্‌রের আস্তানা ২।১ ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে উঠেন এবং সেখানে দেশী খাবার খেয়ে অতিকষ্টে জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি নিজেই এই অবস্থা বরণ করে নেন। তিনি লিলুয়া রেলওয়ে স্ট্রাইকের এবং পরে ধাঙ্গড় ধর্মঘটের সময় কাজ করেন। তাঁর চাল-চলন ছিল খুব সাধাসিধা। তিনি 'এ কল্ টু অ্যাকশন' নামে একটি পুস্তিকাও লেখেন। এটা পার্টিতে আলোচিত হবার পর প্রকাশিত হয়। ফিলিপ স্প্র্যাট বাইরে বা জেলে, কোনওখানেই তাঁর বিপ্লবী মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।"[৭]

অপর একজন প্রবীন কমিউনিষ্ট নেতা ধরণী গোস্বামীও এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

"ফিলিপ স্প্র্যাট খুব ভাল ক্লাস নিতে পারতেন। আমাদের কয়েকজনের উদ্যোগে তখন গড়ে উঠেছিল, ৩৭ নং হ্যারিসন রোডে একটি ঘর ভাড়া করে, 'ইয়ং কমরেড্স্ লীগ'। বহু তরুণ বিপ্লবী যাঁরা তখনও সন্ত্রাসবাদের পথ পুরোপুরি ত্যাগ করেন নি, আবার সাম্যবাদের দিকেও ঝুঁকছেন, তংারা নিয়মিত যাওয়া আসা করতেন ইয়ং কমরেডস্ লীগের দপ্তরে। এই খানেই তাঁদের নিয়ে বহু আলোচনা-চক্র পরিচালনা করেছিলেন ইংরেজ কমিউনিষ্ট ফিলিপ স্প্র্যাট।"[৮]

১৯২৮ এর মে দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয় কলকাতায়। সেখানেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন স্প্র্যাট। সংবাদপত্রের রিপোর্টে লেখা হয় :

"১৯২৮ এর পয়লা মে খুব বড় করে মে দিবস হিসাবে পালন করল কলকাতার শ্রমিকশ্রেণী। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে প্রায় দশ হাজার শ্রমিকের মিছিল বেরিয়ে শেষ

হল মনুমেন্ট ময়দানে। মিছিলের পুরোভাগে ছিল উর্দিপরা ট্রাম শ্রমিকরা ও ধর্মঘটী রেল শ্রমিকরা। সমাবেশে বক্তৃতা করলেন মৃণাল কান্তি বসু, রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জি ও ফিলিপ স্প্র্যাট। মে-দিবসের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করলেন ফিলিপ স্প্র্যাট।"[৯]

১৯২৮ এর ধর্মঘটের জোয়ারে তরুণ কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগী ভূমিকাতে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন বাংলাদেশের ইংরেজ ধনকুবেররা। স্প্র্যাট ও ব্র্যাডলিকে তারা আক্রমণ করেছিলেন "মস্কোর চর" বলে। তাঁদের তৎকালীন মুখপত্র "স্টেটসম্যানে" লেখা হয়েছিল ঃ

"ভারতের শিল্পাঞ্চলে যে মস্কোর প্রতিনিধিরা কাজ করছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ধর্মঘটের সমস্ত নেতারাই, সে তাঁরা ভারতীয়ই হ'ন আর অন্য কেউই হ'ন, সবাই প্রকাশ্য কমিউনিষ্ট। সম্প্রতি তাঁরাই ইনজিনিয়ারিং, চটকল ও সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছেন। ... মস্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে"[১০]

এর কয়েকমাস পরে ১৯২৯ এর মার্চ মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ চার্জশীট পেশ করা হয়, তাতে প্রধান "ষড়যন্ত্রকারীদের" চিহ্নিত করে লেখা হয়েছিল ঃ

'(৪) ১৯২১ এ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত করেছিল যে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে তারা একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করছে, যার প্রধান সদস্য ছিলেন শ্রীপদ অমৃৎ ডাঙ্গে, সউকৎ উসমানি, মজফ্ফর আহমদ। ... (৫) এরপর এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্র্যাড্লি ও ফিলিপ স্প্র্যাট, যাদের ভারতে পাঠিয়েছে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকই, তাদের শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠার ও প্রসারের এবং তাদের লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে ...।"[১১]

আগেই বলা হয়েছে যে মীরাট দায়রা আদালতের রায়ে ফিলিপ-স্প্র্যাটকে ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে হাইকোর্টে আপীলের ফলে সেই দণ্ডাদেশ কমে যায়। স্প্রাট জেল থেকে বের হ'ন ১৯৩৬এ। ততদিনে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়েছে, তিনি কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলে যোগদান করেন। মাদ্রাজে গিয়ে তিনি বিবাহ করেন প্রবীন শ্রমিক নেতা-সিঙ্গারাভল্লু চেট্টিয়ারের কন্যাকে, স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ভারতবর্ষেই। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ এ ভারতের

কমিউনিষ্ট আন্দোলনে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি বই রচনা করেন—Blowing up India।

ইংলণ্ডের একটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ফিলিপ স্প্র্যাট তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অকাতরে উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের শ্রমজীবী জনগণের শোষণমুক্তির সংগ্রামকে বিজয়ী করার জন্য। যৌবনের ৬/৭ বছর তাঁর কেটেছিল মীরাটের কারাগারে। এদেশের তৎকালীন কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মীদের মতই তিনি হাসিমুখে দুঃখকষ্ট বরণ করেছিলেন; তার জন্য কোনও খেদ প্রকাশ করেন নি। সত্তরের দশকে, কঠিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও এক চিঠিতে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন সে যুগের বাংলার সমস্ত কমিউনিষ্ট সহ যোদ্ধাদের বিশেষতঃ গোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রাধারমণ মিত্রকে।[১২] পরে তাঁর মতের যাই পরিবর্তন হয়ে থাকুক না কেন, ভারতের সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের এক অকৃত্রিম বিদেশী বন্ধুকে আমাদের মনে রাখা উচিত শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায়।

২৮ বছর বয়সের বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্র্যাডলি (বেন নামেই বেশী খ্যাত) ছিলেন ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক। ১৯২৭এ ভারতে এসে তিনি জড়িয়ে পড়েন বোম্বাই প্রদেশের সূতাকল ও রেল শ্রমিকদের সংগ্রামের সঙ্গে। উদ্যোগী ভূমিকা নেন ১৯২৮এ বোম্বাই প্রদেশে ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস দল গড়ার কাজে। বোম্বাই থেকেই তিনি গ্রেপ্তার হ'ন ১৯২৯ এর ২০ মার্চ। দীর্ঘ চার বছর আবদ্ধ থাকেন মীরাটের কারাগারে। দায়রা বিচারক ইয়ার্কের রায়ে তাঁর ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে আপীলে আদালতের রায়ে বন্দীত্বের মেয়াদ কমে ব্র্যাড্‌লি মুক্তি পান ১৯৩৪এ। অল্প কিছুদিন আবার কাজ করেন বোম্বাই সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে। তখন তাদের একটি সাধারণ ধর্মঘট চলছিল, তাতেও তিনি অংশ নেন।

পরে এই ধর্মঘটের মূল্যায়ণ করে তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন ১৯৩৫ সালে। তাতে তিনি বলেন ঃ

"আমার এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট আছে। ১৯৩৩এ বোম্বাইতে সংঘটিত সূতাকল ধর্মঘট চলাকালে গিড়নি কামগর ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক কমিটি ভেঙ্গে কেন ছ'টুকরো হ'ল, তার তদন্ত করার জন্য নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি এই ভাঙ্গনের ও ধর্মঘটের ব্যর্থতার জন্য কমিউনিষ্টদের দায়ী করেছেন, কিন্তু এটা এক তরফা রায়। তদন্ত কমিটি কমিউনিষ্টদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেয়নি। তদন্ত

কমিটির রিপোর্টে ধর্মঘট চলাকালীন সরকারের দণ্ড দমননীতিব অথবা মিল মালিকদেব কার্যকলাপের কোনও উল্লেখ নেই।

আমার প্রবন্ধটি সেই একতরফা রায়ের জবাব। প্রবন্ধটি সাধারণ ধর্মঘটের ও শ্রমিক-ঐক্যের প্রশ্নের একটি আত্মসমালোচনামূলক মূল্যায়ণ।"[১৩]

দীর্ঘ দলিলটির উপসংহারে ব্র্যাডলি লেখেন ঃ

"এই ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে আত্মগোপন করতে বাধ্য করেছেন। এখন তাঁরা বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে চূর্ণ করতে উদ্যত। মালিকের নামে সরকার একটা আইন প্রবর্তন করেছে যাতে কার্যতঃ কেড়ে নেওয়া হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট করার অধিকার, তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র থাবার সামনে, আর কারারুদ্ধ করা হয়েছে বিপ্লবী শ্রমিক নেতাদের। ..... তবে জনগণ সর্বত্র রুখে দাঁড়িয়ে লড়ছেন। ... বিপ্লবী শ্রমিক নেতৃত্বই দায়িত্ব জনগণের উদ্দীপনাকে সংগঠিত করে শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং তার জন্য যথাযথ বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের রণকৌশলকে গ্রহণ করা"[১৪]

বেন ব্র্যাডলি ইংলণ্ডে ফিরে প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক নেতা রজনী পাম দত্তের সঙ্গে একত্রে রচনা করেন ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্য সংকীর্ণতা দোষমুক্ত রণনীতির নতুন দলিল, কমিণ্টার্ণের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভের ঐতিহাসিক বক্তৃতার আলোকে। ব্র্যাডলি—দত্ত থীসিস নামে পরিচিত এই দলিলে লেখা হয় ঃ

"এই মুহূর্তে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ—বিরোধী সংগ্রামের সম্মেলন। ..... এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীগণ ফ্রন্ট গড়ার কাজে কংগ্রেস তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কংগ্রেসের মধ্যেকার সমস্ত বামপন্থী শক্তিদের কাজ করা উচিত একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ভিত্তিতে।"[১৫]

বেন ব্র্যাডলি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সদস্য ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির, অকৃপণ সাহায্য করে গেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বামপন্থী শক্তিদের।

লেষ্টার হ্যাচিনসন কোনদিনই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। কিন্তু মীরাট মামলায় দীর্ঘ চার বছর বন্দী থাকার সময়, একদিনের জন্যও তিনি আপস করেন নি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। কমিউনিষ্টদেব সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যর কথাও কোনদিন আদালতে ঘোষণা করেন নি। তাই তাঁকেও ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন দায়রা আদালতের বিচারক ইয়র্ক।

তাঁর মুক্তি দাবী করে তাঁর মা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক খোলা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে আমার ছেলে ভারতের নিপীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে যা লিখেছেন, তার জন্য আমি গর্বিত।[১৬]

কারামুক্ত হয়ে দেশে ফিরে লেষ্টার হাচিনসনই সর্বপ্রথম বিশ্বসমক্ষে পেশ করলেন মীরাট মামলার প্রকৃত তথ্যসমূহকে—"মীরাট কন্‌সপিরেসি কেস" নামে প্রামাণ্য গ্রন্থে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের মুখোস খুলে তিনি রচনা করলেন আর একটি তাৎপর্য পূর্ণ গ্রন্থ ঃ "এম্পায়ার অব দি নবাবস্।"

স্প্র্যাট্ ব্র্যাডলি ও হাচিনসনের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ৪ বছর বিচারাধীন বন্দী থাকা ও পরে শাস্তি হওয়া, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইংলণ্ডে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী আছে, তেমনই বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও সচেতন বুদ্ধিজীবীরা আছেন যাঁরা সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ—একথা ভারতের হাজার হাজার বিপ্লবী তরুণের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল, কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বাড়ানো মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সমাপ্তির ৬০ বছর পূর্ণ হ'ল ১৯৯৩ তে। সেই উপলক্ষে এই তিন বীর বিদেশী সহযোদ্ধাকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে।

সূত্র নির্দেশ

১। ১৯৩৩ এর ৩ আগষ্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল আদালতের রায় থেকে। মূল দলিলের একটি মুদ্রিত অনুলিপি রক্ষিত আছে অজয়ভবনের (দিল্লী) পাঠাগার ও মহাফেজখানায়।

২। পুর্বোদ্ধৃত।

৩। মীরাট আদালতের ১৮ জন কমিউনিষ্ট বন্দীর যৌথ বিবৃতি সম্পাদনা করে ১৯শে প্রকাশ করেন মুজফ্ফার আহমদ "কমিউনিষ্টস চ্যালেঞ্জ ইম্পিরিয়ালিজম ফ্রম দি ডক" নাম দিয়ে। সেই বইতেই তাঁর রচিত মুখবন্ধ থেকে এই তথ্যগুলি সংগৃহীত।

৪। রাধারমণ মিত্র ঃ লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৮।৪।১৯৭৮, কলকাতা।

৫। পূর্বোদ্ধৃত।

৬। ফিলিপ স্প্র্যাট ঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে ইংরেজিতে লেখা দীর্ঘ চিঠির (মাদ্রাজ থেকে ২৩।৫।১৯৭০) বাংলা ভাবান্তর।

৭। মণি সিংহ ঃ জীবনসংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ: ২২।

৮। ধরণী গোস্বামী ঃ লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪।

৯। অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা ২ মে, ১৯২৮।

১০। ষ্টেটসম্যান, কলকাতা, ৩১ মে ১৯২৮।

১১। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, সেসন্‌স্ মামলা নং ২, নথিপত্র প্রথম খণ্ড, ১৯৩২, পৃঃ ৩ ও ৪, দিল্লীর অজয় ভবন মহাফেজখানায় সংরক্ষিত।

১২। ফিলিপ স্প্র্যাট ঃ গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে ইংরেজি ভাষাতে লেখা দীর্ঘ চিঠি, মাদ্রাজ থেকে, ২৩।৫।১৯৭০

১৩। বেন ব্র্যাডলি ঃ লেমনম্ অব দি সেণ্ট্রাল টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ষ্টাইক ইন ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৯৩৫, মুখবন্ধ (মস্কোতে কমিণ্টার্ণের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ও ১৯৯৩র আগষ্ট মাসে অবনী লাহিড়ী কর্তৃক সংগৃহীত।)

১৪। পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৫৮।

১৫। দত্ত-ব্রাডলি থীসিস, খোলা চিঠির আকারে প্রকাশিত, "কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট" মার্চ ১৯৩৬, পৃঃ ২৮।

১৬। লেষ্টার হ্যাচিনসনের মায়ের চিঠি, ডেইলিওয়ার্কার, লণ্ডন, ৩০।১।১৯৩০।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ ঃ একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ইংরাজী ও বাংলা ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক কালান্তর, সপ্তাহ, কম্পাস, পরিচয়, Mainstream, Link, মূল্যায়ন, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, Indian Left Review ও আরো বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি ইতিহাস ও সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। লেখকের নিজের কাছেও সেগুলি সংগৃহীত নেই। তাই নীচের প্রবন্ধ তালিকা খুবই অসম্পূর্ণ। উপরন্তু, তিনি ইতিহাস বিষয়ক যে সব পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, সেগুলিও এই তালিকায় রাখা হয় নি। রাজনৈতিক প্রবন্ধ বা পুস্তিকা কেবল তখনই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যখন তার কোনো ইতিহাস বিষয়ক তাৎপর্য রয়েছে।

ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এই তালিকয় নেই।

ক। গ্রন্থ / সম্পাদিত গ্রন্থ / পুস্তিকা

বাংলা

১) *রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন*, কলকাতা, ১৯৬৭।

২) (মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে) *লেনিন ও সমকালীন বাংলাদেশ*, কলকাতা, ১৯৭০।

৩) *ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে কমরেড শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে*, কালান্তর প্রকাশনী, কলকাতা (তারিখ নেই)।

৪) *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয় স্বার্থ ও কমিউনিষ্ট পার্টি*, সমীক্ষা পরিষদ, কলকাতা (তারিখ নেই)।

৫) *সংকীর্ণতাবাদী ভেদপন্থার পতাকাবাহী ভালচন্দ্র ত্র্যম্বক রণদিভে*, সমীক্ষা পরিষদ, কলকাতা (তারিখ নেই)।

৬) *সাম্রাজ্যবাদ মানবমুক্তি ও ভিয়েতনাম*, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭২।

৭) *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ*, কলকাতা, ১৯৭৩।

৮) (সম্পাদিত), *মার্কিন-ইস্রাইল আক্রমণ ও পি. এল. ও.- র প্রতিরোধ*, *কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশনী*, কলকাতা (তারিখ নেই)।

৯) *মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাক্ষুসে মাকড়সা ঃ সি. আই. এ.*, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ, কলকাতা (তারিখ নেই)।

১০) *পেশোয়ার থেকে মীরাট ঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন*, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৮৪।

১১) ভাড়াটিয়া মসিজীবির কমিউনিষ্ট বিরোধী, সোভিয়েত বিরোধী কুৎসার জবাব, (ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও সি পি আই প্রসঙ্গ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, কলকাতা, ১৯৮৪।
১২) (সম্পাদিত) *ইতিহাস-চর্চা : জাতীযতা ও সাম্প্রদায়িকতা*, কলকাতা, ১৯৮৫।
১৩) (অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে) *ভারত সরকারেব নয়া শিক্ষানীতি — শ্রেণী বৈষম্যকে শিক্ষাজীবনে চিরস্থায়ী করার ঘোষণা পত্র*, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশনী, কলকাতা (তারিখ নেই, সম্ভবত ১৯৮৫ বা ১৯৮৬)।
১৪) *বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার কথা*, মনীষা, কলকাতা, ১৯৮৯।
১৫) *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ*, মনীষা, কলকাতা, ১৯৯০।
১৬) স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! এ. আই. টি. ইউ. সি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১।
১৭) *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিষ্ট পার্টিব ভূমিকা*, কলকাতা, ১৯৯২।
১৮) *সমাজতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা ও ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯২।
১৯) (সম্পাদিত) *সংহতি, লাঙ্গল, গণবাণী*, কলকাতা, ১৯৯২।
২০) *গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন*, মনীষা, কলকাতা, ১৯৯৫।
২১) *সর্বহারা বিপ্লবের জয় শঙ্খ* (সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৮), পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৮।
২২) *ইতিহাসের পাতা থেকে*, ধীমান চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০১।

ইংরেজী

1) *I Saw Yugoslavia*, AISF, Calcutta, 1946.
2) (Ed) *Awakening in Bengal*, Calcutta, 1964.
3) *Communism and Bengal's Freedom Movement*, Vol - I, PPH, New Delhi, 1970.
4) *Subhas Chandra Bose and Indian Communist Movement · A Study of Co-operation and Conflict*, PPH, New Delhi, 1973 and reprints. Also translated in Hindi and Telugu.
5) *Revolutionary and Pionecring Communists*, New Delhi, 1976.
6) *The Triumph of Angola*, PPH, New Delhi, 1976.
7) (Ed.) *Bengal Early 19th Century, Riddhis India*, Calcutta.
8) Central America in Revolt, CPI Publication, Calcutta, 1982.
9) Bengal : Electoral Polities and Freedom Struggle (1861-1947), ICHR Publication, PPH, New Delhi, 1984.
10) *The Working Class in India's Struggle for Freedom — A Historical Perspective (Sectional President's Address, Modern India*, Indian History Congress 47th Session, University of Kashmir), Srinagar, 1986.

11) Member of Editional Committee - *India's Struggle for Freedom : An Album,* Department of Information and Cultural Affairs, Governement of West Bengal, Calcutta, 1987.
12) *The Major Strike Struggles in India (1890-1947)) : A Bird's Eye View,* AIBEA, Calcutta, 1996.
13) *Subhas Chandra Bose : A Biography,* New Delhi, 1997.
14) *Subhas Chandra Bose. The Indian Leftists and Communists,* PPH, New Delhi, 1997.

খ। প্রবন্ধ

বাংলা

১) 'বাংলার নবজাগরণের কয়েকটি স্বল্প আলোচিত দিক', *অনীক,* রেনেসাঁস সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৮৩।
২) 'নূতন যুগের ভোরে', রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত *ডিরোজিও,* কলকাতা, ১৯৮৩।
৩) 'ভারতের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার গুরুত্ব', গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাস-চর্চা, জাতীয়তা ও সম্পাদায়িকতা,* কলকাতা, ১৯৮৫।
৪) 'মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের অসামান্য রূপকার', *পরিচয় চিন্মোহন সেহানবীশ স্মরণ সংখ্যা,* মে-জুন, ১৯৮৮।
৫) 'জাতপাতের সমস্যা, সম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণী সংগ্রাম', সুজিত সেন সম্পাদিত *জাতপাতের রাজনীতি,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯।
৬) 'বিশ্বনাথ দা' ভানুদেব দত্ত ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বিশ্বনাথ মুখার্জী : তত্ত্ব ও সংগ্রামের প্রতীক।*
৭) 'মৃত্যুর শতবর্ষের আলোকে দেশপ্রেমের মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র', *শারদীয়া কালান্তর,* ১৪০১।
৮) 'নভেম্বর বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত', সোমনাথ লাহিড়ী ও অন্যান্য, *নভেম্বর বিপ্লবের পথই আমাদের পথ,* মনীষা, কলকাতা, ১৯৯২।
৯) এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ : বাংলার ছাত্র আন্দোলন (১৯৩৭-৪৭) বরুণ দে সম্পাদিত, *মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ,* টিচার্স কনসার্ন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ: ১৫২-১৮৮।
১০) 'ফ্যাসীবাদকে প্রতিহত করতেই হবে', *ইতিহাস সংসদ বার্তা,* দশম বার্ষিক সম্মেলন সংখ্যা, ১৯৯৩।
১১) 'সুভাষচন্দ্র ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন', পশ্চিমবঙ্গ, নেতাজী সংখ্যা ১৪০৩, পৃ: ১৭৩-১৭৬।
১২) 'মহাত্মা গান্ধী (১৮৯৩-১৯৪৮)', *সাপ্তাহিক কালান্তর,* ১ অক্টোবর, ১৯৯৪।
১৩) 'সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন : একটি মূল্যায়ন', *কালান্তর,* ২৩ জানুয়ারী ১৯৯৬।
১৪) 'সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন', *পরিচয়,* জুন-জুলাই ১৯৯৬।

১৫) 'রোজা লুকসেমবুর্গ ও সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র সমস্যা', *মূল্যায়ন*, নবপর্যায়, অক্টোবর '৯৭—মার্চ '৯৮।
১৬) 'ভারতে ফ্যাসিবাদের সর্বনাশা বিপদের উৎস সন্ধানে', রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সংকলক), *টুয়ার্ডস ফ্রিডম, বিকৃতি ও কুৎসা বনাম তথ্য ও সত্য*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০০।
১৭) 'সুশোভন সরকারকে যেমন দেখেছি', *উজানে*, অক্টোবর—ডিসেম্বর, ২০০১।
১৮) 'গুজরাট ঃ সাম্প্রদায়িক তান্ডবের জন্য দায়ী কারা?' - রুদ্রদেব মিত্র ; (সংকলিত ও সম্পাদিত), *গুজরাট নরমেধ যজ্ঞ*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০২।
১৯) 'মুখবন্ধ' *সংঘ পরিবারের ফ্যাসিবাদ ঃ প্রতিরোধ কোন পথে*, ইনকিলাবী কমিউনিষ্ট সংগঠন, কলকাতা, ২০০২।
২০) 'গুজবাট, কাশ্মীর এবং ভারতের ভবিষ্যৎ', *শারদীয় কালান্তর*, ১৪০৯, পৃ: ২৮-৩৩।

ইংরেজী

1) 'Rosa Luxemburg and the Problems of Socialist Democracy', *Indian Left Review*, Vol I, No. 1, 1970, New Delhi.
2) 'Transfer of Power and Partition of Bengal : Some Questions, IHC, 36th Session, Aligarh, 1975.
3) 'The Almost Revolution', in B. De et. al. (Eds), *Essays in Honour of Prof. S C. Sarkar*, PPH, New Delhi, 1976.
4) 'The Real Face of 'Left" Nationalists of Bengal (1922-29)', IHC, 39th Session, Hyderabad, 1978.
5) 'The Impact on Bengali Literature", in Qamar Rais (Ed.), *October Revolution : Impact on Indian Literature*, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1978.
6) 'The Communist Impact on Bengal's Working Class Movement (1927-29)", IHC, 44th Session, Burdwan, 1983.
7) 'Bengal's Student Movement", in Nisith Ranjan Ray, Kalpana Joshi (Dutt) and others (Ed.), *Challenge : A Saga of India's Struggle for Freedom"*, PPH, New Delhi, 1984.
8) "Post-war Upsurge in India (1945-46)", in Jagannath Sarkar, A. B. Bardhan, N. E. Balaram (Eds) *India's Freedom Struggle, Several Streams*, PPH, New Delhi, 1986.
9) 'M. N. Roy, Comintern and India", in *Society & Change*, Vol. V, Nos, 2 & 3, Juby - December 1988.
10) 'Rabindranath Tagore on the Problems of Nationalism and Communalism', IHC, 52nd Session (1994), New Delhi, 1992.
11) 'Aggressive Hindutva. : The Indian Road to Fascism', in *Communalism in Contemporary India*, Burdwan University, Burdwan, 1994.

12) 'Suhas Chandra Bose, INA and the Raj : Some Re-evaluations', Proceedings of the Indian History Congress, 55th Session, Aligarh, 1995.
13) 'Subhas Chandra, INA an the Raj', *The Visva Bharati Quarterly,* New Series, Vol 6, No 1-4, May 1995-April, 1996, Special Number, 100th Birth Anniversary of Subhas Chandra Bose, Visva Bharati, Santiniketan.
14) 'Subhas Chandra, Indian Leftist Movement and the Communist Party', *Ajanta,* Vol 35, No. 2, Netaji in India's Liberation Struggle Seminar Issue, New Delhi, 1996.
15) 'How the Axis Powers Viewed Subhas Chandra Bose and his Activities (1941-45)', Proceedings of the Indian History Congress, 57th Session, Madras, 1996.
16) 'Subhas Chandra Bose and the Communist Movement of India : A Birth Centenary Evaluation', Prof. Alok Roy & others (Ed.), *Netaji Subhas Chandra Bose Commemoration Volume · A Tribute in this Centenary Year,* Scottish Church College, Calcutta, 1998.
17) 'Teaching of History and the Challenge of Religious Nationalism', *Mind and Development,* December, 2000.
18) 'Sommath Lahiri — Revolution's undying flame!' — In - troductory article to Somnath Lahiri, Collected Writings Volume II, Calcutta, Manisha Granthalaya Pvt. Ltd., 1986.
19) 'Burma's Fight for Freedom and the Unforgettable Indian Comrades', Marxist Miscellany, No. 2, PPH, New Delhi, 1971, pp. 133-153.
20) 'Bengal Students in Revolt Against the Raj, 1945-46' in Amit Kumar Gupta ed, Myth and Reality. The Struggle for Freedom in India, 1945-47, Manohar, New Delhi, 1987.
21) 'Tilak's Chela to Lenin's Chela', in Gopal Banerjee and Panchanan Chattopadhyay, Editors, S. A. Dange : *A Fruitful Life,* Progressive Publisher, Kolkata, 2002.
22) 'A Critical Appreciation of Professor K. P. Chattopadhyay's was an Educationist', in G. Chattopadhyay, Ed. *Life and Times of an Indian Anthropologist, K. P. Chattopadhyay*. The Asiatic Societs, Calcutta, 2000.